ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বরণ (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	১০০০
বসন্ত সঙ্গীত (গান) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৯২৩
বর্ণ-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ ...	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য এম-এ ...	৬৬১
বন্দেমাতরম্ (গল্প) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৫৮১
বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল ...	৬২৮
বাংলার ব্রত ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৫৬, ৬৬২, ৭১২, ৭৭৭, ৮৮২
বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৭০৭
বার্হস্পত্য-সূত্রম্ ...	শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ ...	৭৬৭
বুকের ধন (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ ...	৫৮১
বিদায়ের পর (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৫৯১
ভারতের গ্রাম ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬৪৪
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি ও চাষবাস	ঐ ...	৭৩৮
ভারতের নগর ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮০৮
ভারতের দারিদ্র্যের কারণ ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৫৮
মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধ শিল্প-কলা ...	শ্রীকালীপদ মিত্র এম এ, বি-এল ...	৯২৭
মনের কুয়াসা (গল্প) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৯৩৬
"মাতৃগুপ্ত" ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৫৫
মাসকাবারি— ...	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	
আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল ?	...	৫০৪
বাংলার মাসিকপত্র ...	... ...	৭৬৩
ভারতের স্থান ...	... ...	৬৭৮
যুদ্ধ শেষ ...	... ...	৬৭৭
মালাদান (গল্প) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৭২৮
ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৬৩৩
রাজা রামমোহনের স্বরূপ ...	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ ...	৬৪৬
রেখা লেখা (সচিত্র) ...	শ্রীঃ— ...	৫৬২
শরৎ-সুন্দরী (গান) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৫১৯
শিক্ষা ও সাধনা ...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ ...	৭২৪
সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল ...	৫৪১
সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৭৫
সমালোচনা ...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	৫৯৮, ৬৮০, ৮৩৭, ৯২০, ১০০০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুসময় (কবিতা) ...	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৯৯৯
সোনার কাঠি (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৭৫৭
স্বর্ণ-মৃগ (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৩৬
স্বরলিপি ...	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী	৫৯২, ৬৭৪, ৭০৮, ৮২২, ৮৮৯, ৯২৩
স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ...	... ...	৮৩৫
স্বপ্ন ...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ...	৯০২, ৯৯০
স্মরণে (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯৮৯
স্যাবাইন-রমণী (নাটিকা) ...	শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায় ...	৭৯৫, ৯০৭
হিন্দুদিগের মস্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ...	৬৯৪

চিত্রসূচী

চন্দ্রমুখী (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত ... ৬৮১
জলকে (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত ... ৭৬৫
জঙ্গবাহাদুর ৬৭২
তীর্থযাত্রী
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত ... ৭৫৫
নেপালের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী ... ৬৭১
পান্থ ৫৬৭
পৃথ্বীনারায়ণ ৬৬৭
প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা ... ৫৬৩
ঐ ৫৬৪
ফরাসী শিল্পী বুশে'র নক্সা ... ৫৬৮
ভীমসেন থাপা ৬৬৯
মা—শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত ৯২১
মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা ... ৫৬৫
রোদাঁর নক্সা ৫৬৬
শাপসন্তপ্ত অহল্যা (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ অঙ্কিত ৮৩৯
সচকিতা
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত ৫৯৯
স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ... ৮৩৬
হর-পার্ব্বতী (বহুবর্ণ)
প্রাচীন চিত্র হইতে ... ৫১৭

ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

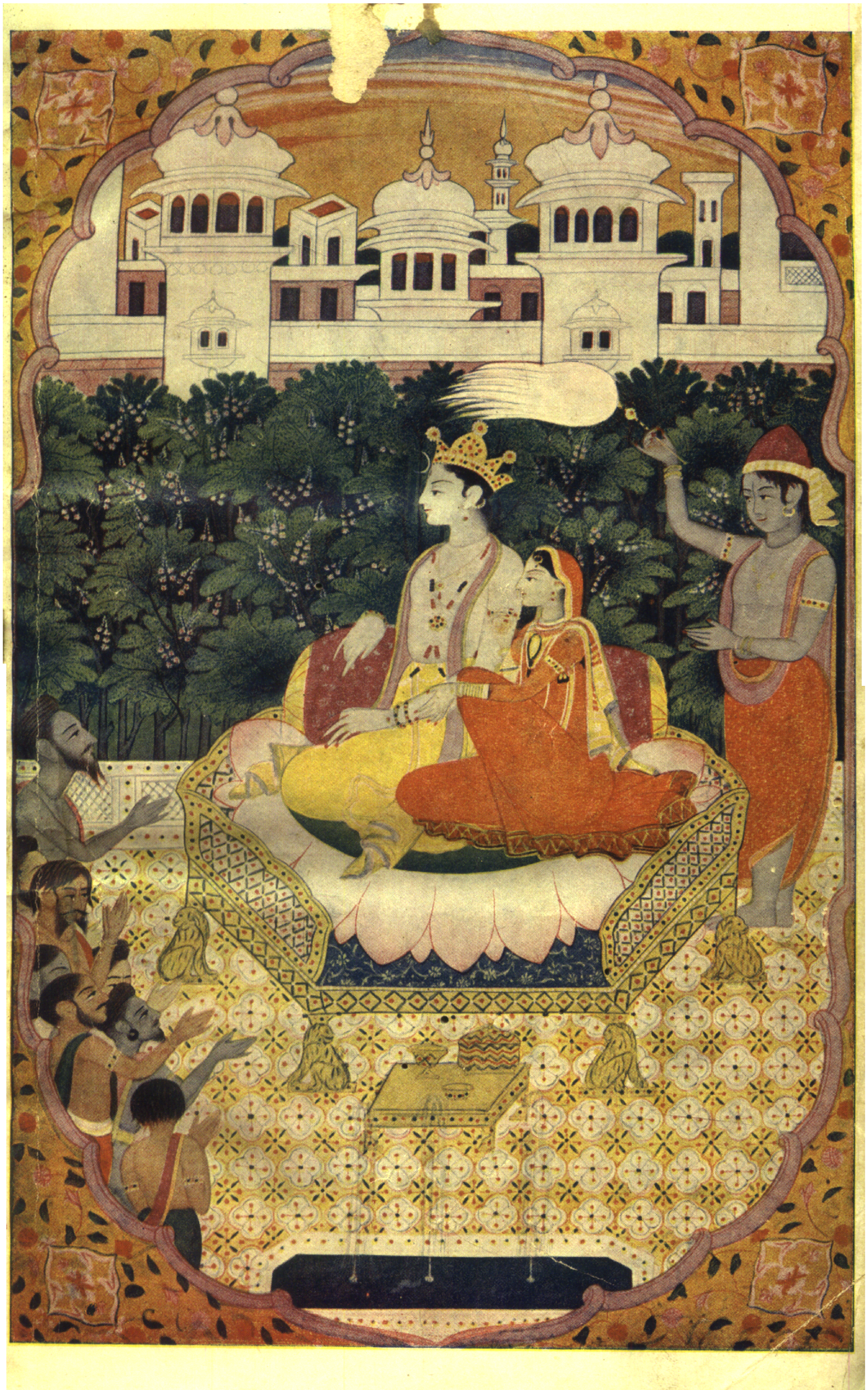
শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বরণ (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	১০০০
বসন্ত সঙ্গীত (গান)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৯২৩
বর্ণ-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য এম-এ	৬৬১
বন্দেমাতরম্ (গল্প)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৫৮১
বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	৬২৮
বাংলার ব্রত	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৫৬, ৬০২, ৭১২, ৭৭৭, ৮৮২	
বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৭০৭
বার্হস্পত্য-সূত্রম্	শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ	৭৬৭
বুকের ধন (কবিতা)	শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	৫৮১
বিদায়ের পর (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	৫৯১
ভারতের গ্রাম	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৪৪
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভূ-প্রকৃতি ও চাষবাস	ঐ	৭৩৮
ভারতের নগর	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮০৮
ভারতের দারিদ্র্যের কারণ	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৫৮
মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধ শিল্প-কলা	শ্রীকালীপদ মিত্র এম এ, বি-এল	৯২৭
মনের কুয়াসা (গল্প)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৯৩৬
"মাতৃগুপ্ত"	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৫৫
মাসকাবারি—	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	
আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল ?		৫০৪
বাংলার মাসিকপত্র	...	৭৬৩
ভারতের স্থান	...	৬৭৮
যুদ্ধ শেষ	...	৬৭৭
মালাদান (গল্প)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৭২৮
ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৬৩৩
রাজা রামমোহনের স্বরূপ	শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এ	৬৪৬
রেখা লেখা (সচিত্র)	শ্রী :—	৫৬২
শরৎ-সুন্দরী (গান)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৫১৯
শিক্ষা ও সাধনা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ	৭২৪
সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	৫৪১
সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতা	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭৫
সমালোচনা	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা ৫৯৮, ৬৮০, ৮৩৭, ৯২০, ১০০০	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুসময় (কবিতা) ...	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৯৯৯
সোনার কাঠি (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৭৫৭
স্বর্ণ-মৃগ (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৩৬
স্বরলিপি ...	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী	৫৯২, ৬৭৪, ৭০৮, ৮২২, ৮৮৯, ৯২৩
স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ...	... ...	৮৩৫
স্বপ্ন ...	শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী ...	৯০২, ৯৯০
স্মরণে (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৯৮৯
স্বাবাইন-রমণী (নাটিকা) ...	শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায় ...	৭৯৫, ৯০৭
হিন্দুদিগের মস্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ...	৬৯৪

চিত্রসূচী

চন্দ্রমুখী (বহুবর্ণ)		ফরাসী শিল্পী বুশে'র নক্সা ...	৫৬৮
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৬৮১	ভীমসেন থাপা	৬৬৯
জল্‌কে (বহুবর্ণ)		মা—শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত	৯২১
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৭৬৫	মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা ...	৫৬৫
জঙ্গবাহাদুর	৬৭২	রোদাঁর নক্সা	৫৬৬
তীর্থযাত্রী		শাপসন্তপ্ত অহল্যা (বহুবর্ণ)	
শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ অঙ্কিত	৭৫৫	শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ অঙ্কিত	৮৩৯
নেপালের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী ...	৬৭১	সচকিতা	
পান্থ	৫৬৭	শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত	৫৯৯
পৃথ্বীনারায়ণ	৬৬৭	স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ...	৮৩৬
প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা ...	৫৬৩	হর-পার্ব্বতী (বহুবর্ণ)	
ঐ	৫৬৪	প্রাচীন চিত্র হইতে ...	৫১৭



হর-পার্ব্বতী।

ভারতী

৪২শ বর্ষ]　　　কার্ত্তিক, ১৩২৫　　　[৭ম সংখ্যা

শরৎ-সুন্দরী

(গান)

হাতে মুখ আড়াল ক'রে
　　কে যায় পথের বাঁক দিয়ে!
আঁখি ওর কার পানে ধায়
　　আঙুল গুলির ফাঁক দিয়ে!
　সখীরা জান্‌লে না কেউ
　হৃদয়ে উঠ্‌ল কি ঢেউ!
হাসি ওর খুসী ভরা
　　যায় নিকষে আঁক দিয়ে!

দু'টি ঠোঁট না যায় ঢাকা, ঢাকা ঠিক যায় না হাসি,
বাঁকা চোখ মিঠিয়ে চেয়ে ফোটালে শিউলি রাশি!

　কাঁখে ওর কল্‌সী অথির
　ঘেমেছে ঢুল্‌টি মোতির
নেমেছে কোঁক্‌ড়ানো চুল
　　চাঁদ্ কপালে থাক দিয়ে।

গোপনের ওই হাসি ওর দেখে কি সাঁঝের রবি
পুলকের পাঞ্জাখানির আকাশে আঁকায় ছবি!

　হেরে তাই হ'ল কিও
　সরমে রমণীয়!
ম'ল সব মাতাল আঁখি
　　ভোম্‌রা হেন পাক দিয়ে!

আলোতে ফিনিক ফোটে রূপসীর চলন লীলায়!
ভুবনে ঝড় যে ওঠে হাসি ওর যেম্‌নি মিলায়!

　ওকি গো খাম্‌খেয়ালি
　হাসে কি খাম্‌কা খালি!
আঁখি ওর চায় না শুধুই
　　যায় নীরবে ডাক দিয়ে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কিঙ্করী

(গল্প)

কিঙ্করী সাধন বৈষ্ণবের মেয়ে। তাহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন বাপের মৃত্যু হয়। ধানগাঁয়ে বাপের একখানি ছোট দোকান ছিল; বাপ সাধনের মৃত্যুর পর কিঙ্করীর মা রাধা বৈষ্ণবী স্বামীর দোকান খুলিতে না খুলিতে পাওনাদারের দল আদালতের পেয়াদা-সমেত আসিয়া সব জিনিষ-পত্র বাহির করিয়া দোকান-ঘর সাফ করিয়া ফেলিল। পাঁচ বৎসরের মেয়ে কিঙ্করীকে লইয়া রাধা বৈষ্ণবী দারুণ দুর্ভাবনায় পড়িল।

কি করিবে কিছুই সে যখন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, তখন ও-পাড়ার যদু গোঁসাই আসিয়া বলিলেন, "দিগম্বরের মেয়ে-যাত্রার দলে মেয়েটিকে দে,—সখী সাজিয়া এইবেলা হইতে কিছু-কিছু সে রোজগার করুক্!" ইচ্ছা থাকিলে গোঁসাইয়ের গৃহে রাধা বাসন-কোসন মাজিয়া দুইবেলা দুইমুঠা ভাত অনায়াসে খাইতে পারে, সে বিষয়ে গোঁসাইজীর কোন আপত্তি নাই, কারণ তিনি বাঁচিয়া থাকিতে—দেশের মেয়ে না খাইয়া মরিবে, ইহা ত আর তিনি চোখে দেখিতে পারেন না! এ কথাটাও সেই সঙ্গে তিনি বলিয়া ফেলিলেন।

রাধা অকূলে কূল পাইল। মেয়েটি ছিল দেখিতে সুশ্রী; দিগম্বর একেবারে তাহাকে মাসিক পাঁচ-সিকা মাহিনায় যাত্রার-দলে ভর্ত্তি করিয়া লইল। পায়ে ঘুঙুর আঁটিয়া মেয়ে রাখাল-বালক সাজিয়া নাচিতে নাচিতে আধ-আধ ভাষায় কখনো গাহিত, "আয় রে কানাই, আয় গোঠে যাই, বাজায়ে মোহন বেণু—", কখনো-বা মাথায় রঙিন ন্যাকড়ার ফুলের মুকুট পরিয়া বিশাখা সাজিয়া গাহিত, "ও রাই, ছেড়োনা ছেড়োনা এ মান—" তখন সে-গান শুনিয়া আনন্দে-গর্ব্বে মার চোখে জল আসিত।

এমনি করিয়া পাঁচ-সাত বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। তারপর নানা দিক দিয়া বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিঙ্করী এখন পাঁচ-সিকার জায়গায় সাত টাকা মাহিনা ও বিদেশে গেলে অতিরিক্ত আরও-কিছু পায়, এবং সখীর দল ছাড়িয়া সে এখন নায়িকার গ্রেডে প্রোমোশন পাইয়াছে। বছর-খানেক পূর্ব্বে মেয়েকে মানভঞ্জনের পালায় শ্রীরাধা সাজিতে দেখিয়া রাধা প্রসন্নচিত্তে ইহলোকের দেনা-পাওনা চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছে। দিগম্বরের দলে কেনারাম এখন মালিক। কেনারাম পূর্ব্বে দিগম্বরের দলে পালা বাঁধিত, সেজন্য দলে তাহার খাতির ছিল খুবই। সুতরাং দিগম্বরের মৃত্যুর পর ছত্র-ভঙ্গ দলটাকে হাত করিয়া বাঁধিয়া লইতে তাহার একটুও অসুবিধা হইল না। কেনারাম গুণের কদর বুঝিত। কিঙ্করী গাহিত ভাল, তার উপর চেহারায় চটক্ ছিল, তাই সে আড়াই টাকার জায়গায় কিঙ্করীর একেবারে সাত টাকা মাহিনা করিয়া দিয়াছে।

এই গুণের উপর আরো-একটা কারণ ছিল। কেনারামের তিন কুলে আপনার বলিতে কেহ ছিল না; সংসারে শুধু একটি-মাত্র আকর্ষণ ছিল, সে এই গান-বাজনার নেশা,—এই গান-বাজনার নেশাই তাহাকে দেশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; নহিলে সে যে এতদিনে কোথায় থাকিত, কি করিত, কেহ তাহা বলিতে পারে না। ছেলে-বেলায় গ্রামে স্কুলে যাইবার পথে সে এক হাফ্-আখড়াইয়ের দলে জুটিয়া পড়ে, সেখানে তামাক সাজিয়া ফরমাস খাটিয়া সে সকলের মন পাইয়াছিল; তারপর হঠাৎ একমাত্র অভিভাবক মাতুলের মৃত্যু হইলে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়া দিস্তরমত সে আসরে নামিয়া পড়িল;—কবির দলেই তাহার যাত্রার পালা বাঁধার হাতেখড়ি হয়, এবং সহসা একদিন "রাবণ-বধের" পালা লইয়া দিগম্বরের দলে আসিয়া সে যোগ দিল।

দলে আসিয়া কিঙ্করীর উপর প্রথমেই তাহার নজর পড়িল। চমৎকার মেয়েটি! দেখিতে যেমন সুশ্রী, নাচিতে-গাহিতেও তেমনি মজবুত! এই কিঙ্করীকে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখাইতে পারিলে যাত্রার পশার যেমন বাড়িবে, তাহার পালাগুলাও তেমনি উতরাইয়া যাইবে। অমনি সে কাজে সে লাগিয়া গেল। কিঙ্করীরও এদিকে একটা আশ্চর্য্য টান ছিল—অত্যন্ত সহজেই সে এই সুযোগটুকুকে আয়ত্ত এবং সফল করিয়া তুলিল। কিঙ্করীর চেহারায়, হাবভাবের লীলায় আর অভিনয়-কৌশলে দেশময় যাত্রার দলের সুখ্যাতি পড়িয়া গেল।

মাঝের-পাড়ায় জমিদার-বাড়ীতে যাত্রা করিতে গিয়া কিঙ্করী দৈবাৎ কলিকাতার এক থিয়েটার-ওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল! একে থিয়েটার-ওয়ালা, তায় কলিকাতার লোক, সে বুঝিল, কিঙ্করীকে কলিকাতার থিয়েটারে লইয়া যাইতে পারিলে শস্তায় অনেকখানি লাভের সম্ভাবনা! গোপনে কিঙ্করীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া এ বিষয়ে বন্দোবস্তও সে পাকা করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু যাইবার দিন কেনারামকে না বলিয়া চলিয়া যাইতে কিছুতেই কিঙ্করীর মন সরিল না। ব্যাপার বুঝিয়া কেনারাম চিন্তিত হইল, স্থিরদৃষ্টিতে কিঙ্করীর মুখের পানে চাহিল। চাহিতেই আর-একটা জিনিষ কেনারামের চোখে পড়িল। কিঙ্করীর সারা অবয়বে এক অপরূপ তারুণ্যের ছটা দেখা দিয়াছিল। আজ কিঙ্করীকে সে দেখিল, সম্পূর্ণ নূতন চোখে, নূতন মূর্ত্তিতে! দেখিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। কিঙ্করীও কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের পালার যশের কথাও সেই সঙ্গে কেনারামের মনে পড়িল; কেনারাম তখন পাকা চাল চালিল। সে কিঙ্করীকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। থিয়েটার-ওয়ালাকে অত্যন্ত নিরাশ-চিত্তে কলিকাতায় ফিরিতে হইল।

কিঙ্করীর বয়স তখন পনেরো বৎসর সুমধুর লাবণ্য কিঙ্করীর দেহে তখন অপূর্ব্ব তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া খেলা সুরু করিয়াছে।

২

তারপর হঠাৎ একদিন যাত্রার দুর্দ্দিন আসিল। কলিকাতার স্কুল-কলেজ-ফেরত

ছোকরার দল পাড়ায়-পাড়ায় সখের থিয়েটার খুলিয়া যাত্রার সর্ব্বনাশ সাধিল। ছেঁড়া ন্যাকড়ায় রঙ মাখাইয়া বাঁশের মাচায় চড়িয়া হরেক রকমের চীৎকার করিয়া সারা গ্রামে তাহারা এমনি চমক লাগাইয়া দিল যে কেনারামের ব্যবসা তাহাতে একেবারে মাটি হইতে বসিল। যাত্রায় খরচ ও বায়নাক্কা বিস্তর, তাহার উপর ঐ জুড়িদের গানে নব্য পল্লীর কান ঝালাপালা, এবং ঐ যে আসরে বসিয়া যশোদা বৃন্দা প্রভৃতির নির্লজ্জ ধূমপান—এ সমস্ত ব্যাপার দর্শকের চোখে থিয়েটারের নেপথ্য-যবনিকার ফাঁক দিয়া অত্যন্ত বীভৎস কদর্য্য ঠেকিতে সুরু করিয়াছিল, কাজেই সখের থিয়েটারগুলা পর্দ্দা খাটাইয়া আমোদ জোগাইয়া অতি-সহজেই সকলের চিত্ত অধিকার করিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় দাওয়ায় বসিয়া চালের খুঁটিতে পিঠ-ঠেস্ দিয়া কিঙ্করী অনেক কথা ভাবিতেছিল।

আকাশের পূব্ দিকে একটু-একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল, বাতাসে ভিজা মাটির একটা মিষ্ট গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। কিঙ্করী স্বামীর আশায় পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। কেনারাম গিয়াছিল ও-পাড়ায়, তাহারই কথায় বিধু গাঙ্গুলির বাড়ী দুর্গোৎসবে বায়না ঠিক করিতে।

বিধু গাঙ্গুলি দিগম্বরের আমলের যাত্রার পৃষ্ঠপোষক, দেশের একজন প্রবীণ সৌখীন ব্যক্তি। দুর্গোৎসবে পূজার কয়টা দিন এ-দলের সাদর-নিমন্ত্রণ সে-বাড়ীতে বাঁধা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এবারে মহালয়ার পর-দিনও যখন বুড়া সরকার মহাশয় আসিয়া পালা ঠিক করিয়া দিয়া গেল না, তখন কেনারামের কেমন ভাবনা হইল, বুকটাও ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এখানকার অন্নও বুঝি-বা মারা গেল!

আখড়ায় সকালে কমলে-কামিনী পালার মহলা চলিয়াছিল;—স্ত্রী কিঙ্করী শ্রীমন্ত সাজিয়া গাহিতেছিল—

"ঘাটেতে সাজানো শত তরী,
যেতে দাও মাগো ত্বরা করি—
আঁখি-জল মুছি হাসিমুখে বল,
এসো রে আমার বাছনি রে—"

এমন সময় কেনারাম আসিয়া বলিল, "গান থামা কিঙ্করী—বিধু গাঙ্গুলির লোকের আজো দেখা নেই, কার জন্যে আর এ-সব করছিস্?"

তখন দলে চকিতে কেমন বিমর্ষতার ছায়া পড়িল, বিপুল উৎসাহ দারুণ অবহেলার ঘা খাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। আখড়ায় লোক ইদানীং পূর্ব্বেকার মত নিত্যই আসে, গান হয়, গল্পও চলে, কিন্তু কোনটাই তেমন জমে না। আজ কেনারামের কথায় সকলেরই মুখ শুকাইয়া দুঃখে বুক ভরিয়া উঠিল। দেখিয়া কিঙ্করীই তাই স্বামীকে বলিয়া-কহিয়া দুপুরবেলায় গাঙ্গুলি-বাড়ীতে বায়নার সন্ধানে পাঠাইয়াছিল, এবং এই সন্ধ্যার সময় স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া সে পুরানো সেই দিনের নানান্ কথা ভাবিতেছিল। দিনের শেষ আলোটুকু যখন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, তখন বাহিরে কেনারামের গলা শুনা গেল—"আখড়া তুলেদে রে বিন্দু, দেশে আর থাকা হল না।"

কিঙ্করী উঠিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি হলো ?"

"কি আর হবে ! বাবুর ছেলে, ঐ যিনি কলকেতায় পড়েন, সেই চোখে চসমা-আঁটা, তিনি বলেছেন, যাত্রা-ফাত্রা হবে না আর ! শুধু কতকগুলো মুখ্যু গুলিখোরের বিকট চীৎকার, প্রাণ জ্বলে যায়, তার চেয়ে থিয়েটার হোক। তারা না কি, কি ঐ "মহম্মদ খিলিজী" আর "বেদম প্রহারের" পালা দেখাবে।" কেনারামের চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল, "তাহলে আর উপায় কি !"

কেনারাম আগাইয়া আসিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল, বলিল, "বাবুর আমাদের দয়ার শরীর। আজকালের ছেলে, তার কথা একেবারে ত আর ওড়াতে পারেন না, অথচ আমাদেরই বা ফেলেন কি বলে ?—তাই তিনি বললেন, বেশ, তিন দিন ত—তার দুদিন ছেলেদের দল থিয়েটার দেখাক্ আর বাকী দিনটায় যাত্রা হোক্ ! যাত্রা আমি একবারে বন্ধ করতে পারি না। যে ক'দিন আমি বেঁচে আছি, সে ক'দিন অন্ততঃ ত নয়। তাই ঐ শেষের দিনের জন্য আমায় বললেন, তোমার কমলে-কামিনীর পালা দেখিয়ে দাও হে কেনারাম।"

কিঙ্করী বলিল, "ভগবান তাহলে একেবারে বিরূপ হননি। যাক্, তাহলে ভালো করে আখড়া বসাও—"

"আর কিসের আখড়া কিঙ্করী ! বছরে একদিন একটা বাড়ীতে পালা দেখাবার জন্যে এত মাথা ঘামানোয় লাভ কি ? এত খরচ-পত্র —"

"তা ঠিক—" কিঙ্করীর মুখে আর কথা ফুটিল না। নবমীর দিন পালা দেখানো হইবে ভাবিয়া একটুখানি আনন্দ তাহার বুক-ভরা বিপুল আঁধারের মধ্যে প্রদীপের আলোর মত যে ক্ষীণ রশ্মিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর এই শেষ-কথার ফুৎকারে সে আলোটুকুও নিবিয়া গেল। আহা, স্বামী কত যত্নে এই নূতন পালাটি বাঁধিয়াছে—এত টানাটানির মধ্যেও ঘরের জিনিষ বেচিয়া পয়সা জুটাইয়া কতখানি আশায় আখড়া বসাইয়াছে। থিয়েটারের দলগুলাকে গানে, অভিনয়ের ভঙ্গীতে হারাইয়া দিবে বলিয়া স্বামী বড় দমে বুক বাঁধিয়াছে যে,—সে ও কত করিয়া বিচিত্র নূতন সুরে শ্রীমন্তের গানগুলিতে প্রাণ জোগাইয়াছে—অত সাধে, অত আশায়, এমনি করিয়াই কি নিষ্ঠুর আঘাত দিতে হয়, ভগবান্ ?

যাত্রার দলে কিঙ্করী মানুষ হইয়াছে, এই যাত্রার দল একদিন তাহার শিশু-চিত্তে অপূর্ব্ব মোহের সঞ্চার করিয়াছিল, আর আজ বিচিত্র-রসে তাহার তরুণ-যৌবনটিকে ফেনিলোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে ! গানের ছন্দের দীপ্ত মায়া-লোকে বসিয়া কতদিন যে সে আপনাকে অসামান্যা মনে করিয়া গর্ব্বে সারা হইয়া উঠিয়াছে ! আবার এই যাত্রার দলের শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া তাহার কিশোর হৃদয়ে প্রেমের সাড়া মিলিয়াছে ! কত সাধ, কত আশা, কত ক্ষোভ, কত তৃপ্তি বিচিত্র লীলায় ঢেউ তুলিয়া গিয়াছে ! এই যাত্রার দল তাহাকে প্রাণ দিয়াছে, তাহার মনের খোরাক জোগাইয়াছে ! সে-ও এই দলের জন্য কি না করিয়াছে

ছোটখাট সমস্ত ত্রুটির দিকে সর্ব্বক্ষণ কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে রাখিয়া আসিয়াছে! এ দলে এই যে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, অদ্ভুত পারিপাট্য বিরাজ করিতেছে, এ শুধু তাহারই গুণে! যাত্রার দলের জন্য খাটিয়া কখনও তাহার শ্রান্তি হয় নাই—বিদেশে দলের সামান্য একজনের অসুখ হইলেও স্বামী যখন ভাবিয়া কূল পায় নাই, কিঙ্করী তখন অপরূপ সহজ ভঙ্গীতে সেই রোগীর সেবার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। দলের কাহারো টাকা-কড়ির প্রয়োজন হইলে গোপনে আসিয়া যখনই তাহারা কিঙ্করীর কাছে হাত পাতিয়াছে, তখনই কিঙ্করী টাকা দিয়াছে, কখনও একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই! কেহ সে টাকা শোধ না দিলে কিঙ্করী কোনদিন অনুযোগ করে নাই বা স্বামীর কাছে নালিশের সুরে ইঙ্গিতেও সে কথা উত্থাপন করে নাই! তাই আজ দলের লোক পয়সা না পাইলেও নিত্য এখনও আখড়ায় আসিয়া যোগ দেয়, ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র আঁকিয়া কিঙ্করীর নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার করিয়া তোলে! আজ নিজের প্রয়োজনে টাকার টান দেখিয়া কিঙ্করী একান্তে বসিয়া শুধু চোখ মুছিত, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া দুঃখ জানায় নাই।

৩

নানা দুর্ভাবনায় কেনারামের শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; ভাদ্রমাস পড়িতেই রাত্রে অল্প অল্প জ্বর দেখা দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাশি। দেখিয়া কিঙ্করীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। একনিমেষে তাহার মুখ শাদা হইয়া গেল।

আর এখন দল! কিসের জন্য কাহার জন্যই বা দল! কেনারামের বলিয়াই না যাত্রার দলের উপর তাহার এতখানি টান ছিল! দল ভাঙ্গিয়া দিয়া গায়ের গহনা বেচিয়া স্বামীর চিকিৎসার জন্য সে স্বামীকে লইয়া কলিকাতায় আসিল; সঙ্গে আসিল শুধু বিশু।

কার্ত্তিকের শেষে জ্বরটা একটু ছাড়িতে ডাক্তার বলিল, এইবেলা হাওয়া বদলাইতে পারো ত সারিবার সম্ভাবনা আছে, না হইলে—

কথাটা ছুরির ফলার মত কিঙ্করীর মর্ম্মে বিঁধিল। কেনারামের কঙ্কাল-সার দেহের পানে চাহিয়া তাহার অন্তর একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘর-বাড়ী সব বেচিয়া স্বামীকে সে পশ্চিমের একটা জায়গায় হাওয়া বদলাইতে পাঠাইল। নিজে সঙ্গে গেল না, যাওয়া চলে না—সে গেলে বিদেশে স্বামীর খরচ যোগান হয় কি করিয়া? তাই সে কলিকাতায় থাকিয়া গেল। বিশু চালাক ছোকরা—রোগ তদ্বিরের ফাঁকে ফাঁকে কোথায় সে একটা কাজ বাগাইয়া লইয়াছিল; এখন বিশুই কিঙ্করীকে এক অফিসের বাবুদের মেশে একটা ঝীয়ের চাকরি জুটাইয়া দিল। তাহার মহা-দুর্ভাবনা দূর হইল।

সারাদিন কাজ-কর্ম্মের মধ্যে সময় একরূপ কাটিয়া যাইত, কিন্তু বিপদ ঘটিত রাত্রিবেলায়। চারিধার যখন নিস্তব্ধ আঁধারে ঢাকিয়া আসিত, তখন সেই আঁধারের অতল গহ্বর হইতে দূষিত বাষ্পের মত রাশি রাশি দুশ্চিন্তা আসিয়া কিঙ্করীকে ছাইয়া একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিত। মাথার শিয়রের

জানালা খুলিয়া দিয়া সে একটা মাদুরে গা গড়াইয়া শুইয়া পড়িত। কলিকাতার রাজপথে অত রাত্রেও চলন্ত মানুষের জুতার ভারী শব্দ,—অদূরে তেলের কলের একঘেয়ে ঘর্ঘরধ্বনি—গাড়ী-ঘোড়া-মোটর-মাতাল-পুলিশের বিচিত্র কলরব বিচিত্র সুরে চারিধার মুখরিত করিয়া চলিয়াছে—কিছুই তাহার মনে একটা আঁচড় টানিতে পারিত না। সে জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের পানে চাহিয়াই পড়িয়া থাকিত। থানার ঘড়িতে বারোটা, একটা, দুইটা, তিনটা বাজিয়া যাইত, তবুও চোখে ঘুম আসিত না! অতীতের সহস্র স্মৃতি অজস্র শর সন্ধান করিয়া তাহাকে কাতর ব্যথিত করিয়া তুলিত। হায়রে, বেচারা স্বামী কোথায় কতদূরে কোন্ বিদেশে সেই রুগ্ন শরীর লইয়া পড়িয়া আছে! দেখিবার কেহ নাই, কথা কহিয়া দুইদণ্ড সান্ত্বনা কি আশ্বাস দিতেও কেহ নাই! পিপাসায় না জানি শুইয়া পড়িয়া কত ছট্‌ফট্ করিতে হয়, মুখে জলটুকুও হয়ত পড়ে না—আহার জোটে কি না, তাই বা কে জানে! ভাবিয়া সে আর কোন কূল পাইত না! দুঃখে চোখে হু-হু করিয়া জল ঝরিত, বেদনায় বুকের পাঁজরাগুলা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভাবিত, কাহার শাপে তাহাদের অমন সোনার নীড় আজ এমন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল!

এমনি দুর্ভাবনার মধ্যে একদিন চূড়ান্ত ঘটনাটাও ঘটিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যার পর বক্ষে বিস্তর পোষ্ট অফিসের ছাপ পরিয়া এক চিঠি আসিয়া হাজির, খামের উপরে নানান্ দেশের অসংখ্য অস্পষ্ট ছাপ, খামের মধ্যে চিঠিতে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে, "কাল রাত্রে মুখে রক্ত উঠিয়া কেনারাম বাবু হঠাৎ মারা গিয়াছেন।"

সব ফুরাইয়াছে! চিরদিনের সহচর, বন্ধু সহসা স্বপ্নের মত কোথায় কোন্ ছায়ার মধ্যে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! বাহিরের আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার গায়ে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল! "মাগো—"বলিয়া চীৎকার করিয়া কিঙ্করী ধুলায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৪

তিনমাস পরে হঠাৎ একদিন গঙ্গার ধারে বিশুর সঙ্গে কিঙ্করীর দেখা। কেনারামের মৃত্যুর পর কিঙ্করী মেশের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিল—দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া গঙ্গার ধারের ঠাকুর-বাড়ীতে যে সে কি করিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সে সব কথা কিঙ্করীরও স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে পড়ে না।

বিশু বলিল, "জন্ম-মৃত্যু বিধাতার লিখন, কিঙ্করী। এ রকম ভেবে-কেঁদে আর কি করবে, বল? তোমার চেহারা যা হয়েছে দেখচি, তাতে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না মোটে! আমারি প্রথমটা চিনতে কষ্ট হচ্ছিল! যাক্, জানো ত বিপদে ধৈর্য্য ধর্‌তে হয়। তুমি ত বোঝো সব, তোমায় আর কি বোঝাব, বল?"

বিশুর পানে চাহিয়া কিঙ্করী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, কোন কথা বলিল না। বিশুকে দেখিয়া অতীতের সব কথা আবার নূতন করিয়া তাহার মনে পড়িল। সেই গান-বাজনার বিপুল সমারোহ, আনন্দ-

কৌতুকের বিরাট মেলা! সে কি ঘটা! আর আজ?

বিশু বলিল, "কিনুর কথা যখন ভাবি, তখন আর জ্ঞান থাকে না—আহা, বেঘোরে প্রাণটা দিলে বেচারা! তোমার সঙ্গেও বোধ হয় শেষটা আর দেখা হয়নি! আহা!"

কিঙ্করী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখের কোণে জল উপ্‌ছাইয়া আসিল।

বিশু আবার ডাকিল, "কিঙ্করী—" বিশুর গলার স্বর ঈষৎ ভারী। কিঙ্করী মুখ তুলিয়া বিশুর পানে চাহিল, দেখিল, বিশুর চোখে জল।

কিঙ্করী আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না—তাহার চোখে বন্যা নামিল।

বিশু বলিল, "এখানে পড়ে থাকে না, কিঙ্করী—এসো, আমার সঙ্গে এসো—। বিধাতার কৃপায় আমার অবস্থা একটু যাহোক্ ফিরেছে এখন। নিজে ছোট-খাট একটা খাবারের দোকান করেছি—মন্দ চল্‌ছে না। তুমি পুরোনো বন্ধু—আমি থাক্‌তে তুমি পথে দাঁড়াবে, এ হতেই পারে না!"

বিশুর খাবারের দোকান বেশ চলিতেছিল। এই দোকানটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার অবস্থাও ফিরিয়া গিয়াছিল। তবে দোকানে সে একা। স্ত্রী বেচারী দেশে ছিল, অবস্থা ফিরাইয়া স্ত্রীটিকে সে কলিকাতায় আনিয়াছিল, কিন্তু বেচারীর অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য সহিল না। সে আজ ছয়-সাত মাসের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে! সংসারে আবার ও পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াই সে স্ত্রীর শোক ভুলিয়াছিল। তবে রাত্রে দোকান বন্ধ করিবার পর নিরালায় একলা যখন সে পড়িয়া থাকে, তখন সমস্ত জগৎ তার বিরাট শূন্যতা লইয়া বিশুর বুকের উপর চাপিয়া বসে! এই যে কাজ করা, গতর খাটানো, পয়সা-উপার্জ্জন, এ কেন রে কেন? কাহার জন্য? কি হইবে এ টাকা উপার্জ্জন করিয়া? বিশুর সমস্ত মন টল্‌মল্ করিয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, দোকান-পাঠ বেচিয়া দিয়া কোথাও সে চলিয়া যায়। কিন্তু রাত্রের সে সঙ্কল্প দিনে কাজের ঝঞ্ঝাটে চাপা পড়িত! সকালে দোকানের ঘর খুলিতে না খুলিতে একটি-দুইটি করিয়া লোক আসিয়া দেখা দিত,—কাজেই কথা এবং কাজের ভিড়ে রাত্রের বৈরাগ্যের সঙ্কল্প মন হইতে মুছিয়া যাইত।

এমনি করিয়াই বিশুর দিন কাটিতেছিল, —হঠাৎ এমন সময় গঙ্গার ধারে কিঙ্করীর সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল।

কিঙ্করী বিশুর কথায় রাজী হইয়া দোকানে আসিল। দোকান হাল-ভাঙ্গা নৌকার মত স্রোতের মুখে এতদিন নিজের ভাবেই ভাসিয়া চলিয়াছিল—আজ কিঙ্করী আসিয়া পাকা হাতে নূতন করিয়া সেখানে হাল ধরিল।

সারাদিন কাজের ভিড়ে দুই জনের কথা-বার্ত্তা বড় হইত না। রাত্রের নির্জ্জনতায় দুই জনে বুকের মধ্য হইতে অতীত-স্মৃতির তল্পী বাহির করিয়া বসিত,—হাসি ও অশ্রুর

পল্লীর সেই যাত্রার আসর, স্নিগ্ধ শ্যামল সেই তরু-কুঞ্জ, অবারিত পথ-ঘাট, ছায়ায় ঘেরা সেই ছোট্ট নদীর তীর বায়োস্কোপের ছবির মতই কিঙ্করীর চোখের সাম্‌নে দিয়া অপরূপ বৈচিত্র্যে ভাসিয়া যাইত।

কাজের অন্ত ছিল না—তবু দুইজনেই বুঝিয়াছিল, কাহার জন্যই বা কাজ করা! নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন জীবন-দুইটাকে বোঝার মত দুই জনে ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে! সীমা-হীন এক অনন্ত পারাবারে দুইজনে যেন গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—কোনদিকে কূলের রেখাও দেখা যায় না! কি উদ্দেশ্যে, কিসের সন্ধানেই বা মিছা এই-ভাবে ভাসিয়া বেড়ানো—! তার চেয়ে হাত-পা এলাইয়া এই অসীম অনন্ত পারাবারে ডুব দিলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়।

কিন্তু ডোবা গেল না। তাই একদিন ভাসিতে ভাসিতে একটা কথা বিশুর মনে হইল। আকাশে সেদিন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল—দোকানের পিছনে খোলা একটু জায়গা ছিল—সেইখানে একটা বেঞ্চে বসিয়া দেওয়ালে পিঠ ঠেশ দিয়া কিঙ্করী আপন-মনে শ্রীরাধার বিরহ-গাথা গাহিতেছিল,

"এমন জোছনা রাতি, এমন মধুর বায়
তোমার বিরহ বঁধু, আর ত না সওয়া যায়—"

ঠিক রে ঠিক! সত্যই আর সহ্য হয় না! বিশুর বুকের মধ্যে এক অসহ্য বেদনা ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কিঙ্করী মৃদু সুরে গান গাহিতেছিল। বিশু পা টিপিয়া আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। কিঙ্করীর মুখে জ্যোৎস্না একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া আর তাহার কণ্ঠে ঐ গান শুনিয়া বিশুর মনে হইল, কিঙ্করীকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের বিরহ-বেদনা যেন আজ এই চাঁদের আলোয় আপনাকে মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে!

গাঢ় স্বরে বিশু ডাকিল, "কিঙ্করী—"

কিঙ্করী চমকিয়া উঠিল।

বিশু বলিল, "আবার তুমি সেই সব কথা ভাবছ!"

কিঙ্করীর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে বলিল, "না ভেবে পারি কৈ?"

বিশু কহিল, "ঠিক বলেছ। আমিও আর পারছি না! ভেবে লাভই বা কি বল,—শুধু মন খারাপ করা বই ত নয়। তাই আমি ভাবছিলুম, এ রকম করে ত আর টেঁকা যায় না, তাই বল্‌ছিলুম কি, জানো?"

কিঙ্করী বিশুর পানে চাহিল,—চোখের দৃষ্টি তাহার পুতুলের চিত্র-করা দৃষ্টির মত। কিঙ্করী কহিল, "কি?" স্বরটা শুষ্ক রুক্ষ মনে হইল। সে স্বর শুনিয়া বিশু কেমন ভড়কাইয়া গেল—তবুও সে জোর করিয়া কথা কহিল; বলিল, "আমার সঙ্গে যদি কণ্ঠী-বদল—"

কথাটা শেষ হইল না। কিঙ্করী ডাকিল, "বিশু—" এই ছোট্ট ডাকটুকুতে আগুনের হল্‌কার মত এতখানি তীব্র ভর্ৎসনা ঠিক্‌রিয়া পড়িল যে বিশুর সমস্ত সাধ-আশা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল।

এ ঘটনার পর দোকানের কাজে কিন্তু কোন গোল দেখা গেল না। বিশু ভৃত্যের মত কাজ করিতে লাগিল, এবং কিঙ্করীরও তাহাকে ফাই-ফরমাস করিতে এতটুকু সঙ্কোচ

দেখা গেল না। অর্থাৎ দুইজনের মনে-মনে এতখানি সংঘর্ষ হইয়া গেলেও বাহিরের লোক তাহার এতটুকু আঁচ পাইল না। দুইজনে পূর্ব্বের মতই কাজ করিতে লাগিল,—ঠিক যেন কলের পুতুল কলে কাজ করিতেছে!

ইহার একমাস পরে বিশুকে হঠাৎ একটা বড় কাজের অর্ডার লইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইল।

কিঙ্করী নিজের হাতে বিশুর জিনিষ-পত্র গুছাইয়া দিল, বিদেশে সাবধানে থাকিতে সহস্রবার উপদেশ দিল। যাইবার সময় বিশু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার আবার ভাল থাকা—!"

"কেন?" অসন্দিগ্ধ অচপল স্বরেই কিঙ্করী এ প্রশ্ন করিল। বিশু অত্যন্ত হতাশভাবে কিঙ্করীর পানে চাহিল; কিঙ্করী সে দৃষ্টি দেখিল। সে মুখ ফিরাইয়া লইল—তাহার চোখ সজল আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে একটা নিশ্বাস চাপিল। মুখে কোন কথা ফুটিল না।

বিশু চলিয়া গেলে কিঙ্করীর পক্ষে কিন্তু একলা দোকানে টেঁকা দায় হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, জীবনের ফাঁকগুলা কোথা দিয়া ভরিয়া আসিতেছিল, আবার সব শূন্য হইয়া গেছে। রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া চাপা গলায় সে ডাকিল, "বিশু—" কেহ সাড়া দিল না; কিন্তু কবেকার সেই জ্যোৎস্না-রাত্রির এক হতাশ-কাতর দৃষ্টি কিঙ্করীর মনে ফুটিয়া উঠিল—জগতে আজ যেন আর কিছু নাই, শুধু ঐ হতাশ-কাতর-দৃষ্টি!

৫

দোকানে বিশুর এক বন্ধু জুটিয়াছিল, বনমালী। বনমালী প্রায় তাহারই বয়সী; সে বিস্তর কথা কহিতে পারে, এক মার্চ্চেণ্ট অফিসের হেড-বিল-সরকার। তাহার দৌলতে অফিসে বিশুর কয়েকটি বাঁধা খরিদদারও জুটিয়াছিল।

কিঙ্করীর অবস্থা দেখিয়া বনমালীর দুঃখ হইল। বিশু ও কিঙ্করীর মধ্যে সম্পর্কটা সঠিক না জানিলেও রসজ্ঞ সে নিজে হইতে একটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কাজেই রাত্রের নির্জ্জন অবকাশে বনমালী প্রায়ই আসিয়া দেখা দিত, যদি কথায় বার্ত্তায় কিঙ্করীকে সে একটুখানিও সান্ত্বনা দিতে পারে! বনমালী বেশ ভাল বাঁশী বাজাইতে পারিত। সে দোকানে বসিয়া বাঁশী বাজাইত, অনেক সময় বাঁশীর সুরে সব ভুলিয়া কিঙ্করীও সে বাঁশীর সঙ্গে গান ধরিত। তা-ছাড়া বনমালীর প্রতি কিঙ্করীর একটু মায়া পড়িয়াছিল; মায়া পড়িবার কারণ ছিল।

বনমালীর বাড়ী আমতার ওদিকে; এখানে চাঁপাতলায় একটা মেসে সে থাকিত—দেশে ছিল স্ত্রী ও একটি ছেলে। স্ত্রীর সঙ্গে মোটেই বনিবনা ছিল না। স্ত্রীর চরিত্র-সম্বন্ধে দেশের লোকে কাণাঘুষাও একটু-আধটু করিত। সে রহস্যালাপ বনমালীর অশ্রুত ছিল না, এবং স্ত্রীর চিত্তও বনমালীর প্রতি বড় প্রসন্ন ছিল না, কাজেই স্ত্রীকে বনমালী মোটেই দেখিতে পারিত না,—তবে ছেলেটির জন্য তাহার থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করিত, তাই মাসে একটি দিনের জন্যও অন্ততঃ সে একবার দেশে গিয়া ছেলেটিকে

দেখিয়া আসিত। সে-সময় ছেলের জন্য নানান্ জিনিষ সে কিনিয়া লইয়া যাইত, পুতুল, লজন্‌চুষ্, লাট্টু, টিনের বাঁশী—এই সব; মাঝে মাঝে টাকাও পাঠাইত।

কিঙ্করী বনমালীর এ দুঃখের কাহিনী শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল। আহা, বেচারা বনমালী! ব্যাপারটা তাহার কেমন আশ্চর্য্য ঠেকিত। স্ত্রীলোক ভাল না বাসিয়া কি করিয়া থাকে! স্ত্রীলোক যে বড় দুর্ব্বল, একটা অবলম্বন যে তাহার চাইই! তাই সে বনমালীকে প্রায়ই বলিত, "বউটিকে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এস, ঠাকুরপো,—নিজের কাছে নিয়ে এসে তাদের রাখো— ছেলেটির মুখ চেয়ে বৌকে সহ্য করে চল ভাই, তার উপর কোন দুর্ব্যবহার করো না। ছেলেমানুষ, কাছে থাকলে ও-সব বুদ্ধি তার সেরে যাবে'খন।"

বনমালী বলিত, "তুমিও যেমন বিশুর বৌ!" বনমালী কিঙ্করীকে বিশুর বৌ বলিয়া ডাকিত—শুনিয়া কিঙ্করী মনে মনে হাসিত, কিন্তু কথায় বা ভঙ্গীতে কখনও আপত্তি কি বিরক্তি প্রকাশ করে নাই! আজ এ সম্বোধনটা প্রাণের মধ্যে কোথায় এক সুপ্ত তারে ঘা দিল। সমস্ত প্রাণটা অব্যক্ত যাতনায় ছটফট করিয়া উঠিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী বলিল, "কেন আনবে না, শুনি!"

বনমালী বলিল, "পাগল হয়েছ তুমি! এখানে একটা কেলেঙ্কারী হবে কি শেষে?"

কিঙ্করী বলিল, "কিসের কেলেঙ্কারী! আচ্ছা, আমার কাছে নিয়ে এসে তুমি রাখো দেখি। আমি কেমন না বুঝিয়ে সুঝিয়ে

ছলছল করিয়া আসিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে তখন—" বলিয়াই বাশীটা উঠাইয়া লইয়া বাজাইতে বসিল। কিঙ্করী নির্ণিমেষ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বাঁশীর করুণ সুরে তাহার চিত্তে দারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। সে অপলক স্থির দৃষ্টিতে বনমালীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সে দৃষ্টি বনমালীর বাহিরটা ভেদ করিয়া সমস্ত অন্তরখানা দেখিয়া লইল—অশ্রুর রাশি সেখানে একেবারে টল্ টল্ করিতেছে! সেই সঙ্গে আর-একটা ছবিও চোখে পড়িল,—পল্লীর মাজা-ঘষা ছোট্ট একটি আঙিনা, হরিণ-শিশুর মত ছেলেটি লাফাইয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে, আর মেটে দাওয়ায় বনমালীর তরুণী স্ত্রী বসিয়া দাঁতে ফিতা চাপিয়া ধরিয়া চুল বাঁধিতেছে, সম্মুখে আর্শি চিরুণী পড়িয়া আছে! আর্শির বুকে নবযৌবনা রূপসীর দৃষ্টির সগর্ব্ব ভঙ্গীটুকুও তাহার দৃষ্টি এড়াইল না।

মফঃস্বল হইতে বিশু বাড়ী ফিরিল জ্বর-গায়ে। কিঙ্করী চিন্তিত হইল, এতটুকু বিলম্ব না করিয়া বড় বড় ডাক্তার আনাইল, ঔষধের শিশিতে ঘর ভরাইয়া ফেলিল। ঔষধ খাওয়াইয়া গা ফুঁড়িয়া ডাক্তারের দল নিমকের মর্য্যাদা এতটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না। শিয়রে বসিয়া কিঙ্করী বিস্তর সেবা করিল, রাত্রি জাগিল, কাঁদিয়া কত ঠাকুরের মানত করিল, কিন্তু সে সমস্তই ব্যর্থ করিয়া এক মাস রোগে ভুগিয়া বিশু এক প্রত্যুষে ইহজীবনের লীলা

ঘাট হইতে কিঙ্করীকে অতি কষ্টে যখন ঘরে আনা হইল, তখন সকলে দেখিল, এ যেন সে কিঙ্করী নয়, একটা ম্লান ছায়া! ঘরে ফিরিয়া কিঙ্করী সেই যে শয্যা লইল, আর উঠিতে চাহিল না,—দেখিয়া সকলে বলিল, সবই বাড়াবাড়ি!

বনমালী পূর্ব্বের মতই দেখা করিতে আসিত, সান্ত্বনা দিত। সে বুঝাইত, জীবনটা হেলায় নষ্ট করিবার জন্য তৈয়ার হয় নাই। জীবনটাকে যখন রাখিতেই হইবে, নষ্ট করা চলে না, তখন মানুষের মতই সেটা রাখা দরকার। নহিলে পরের হাতে পুতুল হইয়া থাকাটা কিছু নয়! পরের দয়ায় চলা-ফেরা বসা-দাঁড়ানো—ছিঃ! কিঙ্করী তাহার কথায় উঠিয়া বসিল। বনমালী তখন শোক ভুলাইবার জন্য রাজ্যের খবর বহিয়া আনিতে লাগিল, কিঙ্করীও বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে সব শুনিত,—কিন্তু মনে সে সব ঢুকিত কি না, কে জানে! দোকানের কাজেও অত্যন্ত ত্রুটি দেখা দিল। বনমালী মাহিনা দিয়া লোক রাখিল। কিঙ্করীকে দেখিবার শুনিবার জন্য অবশেষে বনমালীকে মেস ছাড়িতে হইল। সে এখন এখানেই থাকে, খাওয়া-দাওয়াও এই-খানেই, রাত্রে এইখানেই শোয়। কিঙ্করীর মনে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাঁশীও মাঝে মাঝে বাজাইতে হয়, গল্পও বাদ যায় না।

পাড়ার লোকে রহস্যের সন্ধানে উন্মুখ হইয়াছিল, এই ছোট-খাট ব্যাপারটায় তাহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল,—ব্যাপারটা তাহাদের অনেকখানি রসালাপের খোরাক জোগাইয়া দিল—তাহারা এই বিষয়ের আলোচনায় মাতিয়া মসগুল হইয়া উঠিল। আলোচনার দুই-একটা ইঙ্গিত বনমালী ও কিঙ্করী—দুই জনেরই কানে গেল। শুনিয়া বনমালী হাসিল, কিঙ্করী ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

রহস্যের বিচিত্র ইঙ্গিত-সত্ত্বেও দিনগুলা আবার সহজ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু কিঙ্করীর অদৃষ্টে দিনগুলা নাকি অবিরাম সহজে কাটিতে পারে না, তাই সাহেবের হুকুমে বনমালীকে অকস্মাৎ একদিন চাটগাঁয়ে চলিয়া যাইতে হইল; সেইখানেই তাহাকে এখন থাকিতে হইবে। সে চলিয়া গেল। কিঙ্করী নির্জ্জন অবসরে নিভৃত ঘরের কোণে পড়িয়া আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার আলোচনা করিয়া দেখিল; দেখিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে চারিধারে বিপুল পরিবর্ত্তন চলিয়াছে—পুরাতন মহল্লা ভাঙ্গিয়া নূতন মহল্লার পত্তন, বহুকালের সাবেক বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন পথ-ঘাট দেখা দিতেছে। সময় চলিয়াছে না স্রোত ছুটিয়াছে! কিঙ্করীর দোকান-ঘর অযত্নে কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে, সম্মুখের পর্দ্দাখানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ঘরের দেওয়াল ধোঁয়ায় ঝুলে আচ্ছন্ন, তাহার নিজের মাথার চুলে অবধি পাক ধরিয়াছে। তাহার উপর লোক-গুলাও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে,—পূর্ব্বে যাহারা ডাকিয়া কথা কহিত, এখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! কিঙ্করী ইহার অর্থ বুঝিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি অসহ্য জীবন! কাহারো চিত্তে এতটুকু সহানুভূতি নাই! এই একলা শোকের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিতে চলিতে তাহার শ্রান্তি ধরিয়াছে, পা আর চলিতে চাহে না, ইহার জন্য করুণা দূরে থাক, নির্ম্মম নিষ্ঠুর

সমালোচকের মত ক্রূর হাসি মুখে লইয়াই সব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুর্ব্বলের পানে চাহিয়া আছে। কিঙ্করী ভাবিল, আর না! সেই অতীত—মধুর অতীত,—আহা, তেমন দিন কি জীবনে আর কোন দিন মিলিবে! না, না, না! দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে ঝড়ের মত আথালি-পাথালি করিয়া উঠিল। বুকে কে যেন মুগুরের ঘা মারিল। মনের হ্রদটুকু বেদনার শৈবালে এমনি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে সে বাহিরের কোন আঘাতে আর এতটুকু চঞ্চল হয় না। বিছানায় শুইয়া আকাশের পানে শূন্য দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে—আকাশে সেই চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, রাত্রি হয়, সবই ঠিক পূর্ব্বেকার মত, কিন্তু তাহার প্রাণে কোনটাই আর এতটুকু আলো বা আঁধারের পরশ লাগাইতে পারে না! আজ সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে!

৬

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা। কিঙ্করী একা দোকানে বসিয়াছিল—সরকার তাগাদায় বাহির হইয়াছে, এমন সময় মস্‌মস্ করিয়া একজন লোক আসিয়া দোকানে ঢুকিল। কিঙ্করী চাহিয়া দেখিল, এ কি! স্বপ্ন? না, এ যে বনমালী! সত্যই ত, বনমালীই! বনমালীর চুল পাকিয়াছে, অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে সে—হঠাৎ দেখিলে তাহাকে চেনা যায় না! সেই বনমালী দুইদিনে এ কি হইয়া গিয়াছে!

বিস্ময়ের মোহ কাটিলে কিঙ্করী একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। বনমালী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ কিঙ্করী?"

কিঙ্করী বলিল "সত্যিই মনে পড়েছে? আবার তুমি ফিরে এসেছ!"

"এসেছি কিঙ্করী—কিন্তু শোনো, অনেক কথা আছে। আমি আবার কল্‌কেতায় বদলি হয়েছি। এখানে থাকতে চাই। ছেলেটি বড় হয়ে উঠেছে, তাকে স্কুলে পড়াতে হবে কি না! আর তোমার কথাই রেখেছি—ঐ ছেলের জন্যই স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা করে ফেলেছি!"

"কোথায় তারা?"

"তারা আমার এক আত্মীয়ের বাসায় এসে উঠেছে, রামকৃষ্ণপুরে—কিন্তু সেখানে থাকলে ত চলবে না। আমার ভারী অসুবিধা হবে, দেখব-শুন্‌বো কি করে? তাই এধারে একটা বাসা খুঁজ্‌তে বেরিয়েছি। ভাবলুম, দেখি, তুমি কেমন আছ—তাই—"

"বাসা চাই!" আনন্দে কিঙ্করীর প্রাণটা দুলিয়া উঠিল। "কেন, এইখানেই তোমরা থাকো না! আমি দোকানের একধারে পড়ে থাক্‌বো'খন। যতদিন আমি বেঁচে আছি, আর যতক্ষণ হেথায় আমার একটু ঠাঁই আছে, ততক্ষণ কোথায় আবার তুমি পয়সা খরচ করে আলাদা বাসা নিতে যাবে! কি বল?"

চারিধারে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বনমালী বলিল, "বেশ।"

পরদিন মিস্ত্রী ডাকা হইল—ভাঙ্গা দেওয়ালে চূণ-বালি পড়িল—জানালাগুলা রঙের পরশ পাইয়া হাসিয়া উঠিল। কিঙ্করী নিজে ঘুরিয়া ফিরিয়া দোকান-ঘরটিকে পরিপাটী ছাঁদে সাজাইয়া তুলিল। আজ তাহার জীর্ণ দেহে-মনে নূতন বল নূতন শক্তি সে ফিরিয়া পাইয়াছে!

স্ত্রী-পুত্র লইয়া বনমালী অচিরেই দেখা দিল। স্ত্রীটি সাদা-সিধা ধরণের মানুষ—তবে ভারী কড়া মেজাজ। দশ বৎসরের ছেলে খাঁদু রোগা—গালের উপর মস্ত একটা জড়ুল—ছেলেটি শান্ত। খাবারের পাহাড় দেখিয়া সানন্দে খাঁদু বলিল, "এত খাবার কে খাবে, মাসিমা?"

কিঙ্করী তাহাকে বুকে টানিয়া বলিল, "তুমি খাবে বাবা।"

"এ-সব আমি খাব?"

"হ্যাঁ বাবা"—বলিয়া কিঙ্করী মিষ্টান্ন তুলিয়া খাঁদুর হাতে দিল। খাঁদু সানন্দে তাহা মুখে পুরিল।

এই ছেলেটিকে বুকে ধরিয়া আজ কিঙ্করীর প্রাণ জুড়াইয়া গেল—এতদিনকার এত বেদনা মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইল! খাঁদুর মুখে চুমা দিয়া কিঙ্করী আদর করিল, "যাদু আমার—মাণিক আমার—সোনা আমার—"

খাঁদু কহিল, "আমি অনেক বই পড়ি মাসিমা—সব মুখস্ত আছে—শুন্‌বে? দ্বীপ কাকে বলে জানো? যে ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকে জল,—তাহাকে বলে দ্বীপ। কেমন, শুন্‌লে ত? তার চারদিকে শুধু জল—কোন দিকে ডাঙা নেই। তুমি দ্বীপ দেখেছ, মাসিমা?"

"না বাবা।"

খাঁদুর সঙ্গে কিঙ্করীর দুই দিনেই বেশ ভাব জমিয়া গেল। কিঙ্করী বসিয়া বসিয়া রূপকথা বলিত, আর খাঁদু নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শুনিত—শুনিতে শুনিতে নানা প্রশ্ন তুলিত, "রাজার নাম কি? কত বড় বাড়ী? রাজা যুদ্ধ জানে? আমি বড় হলে যুদ্ধ

পাখীর মত? তার ল্যাজ আছে? তুমি পরী দেখেছ মাসিমা?" এমনি বিস্তর কথা! কিঙ্করী নিজের হাতে খাঁদুকে স্নান করাইত, খাবার দিত, পোষাক পরাইত—খাঁদুর বাপ-মা অনেকখানি ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে রক্ষা পাইল। খাঁদু খাইতে বসিলে কিঙ্করী বলিত, "দেখ, খাঁদুকে একটা ভাল স্কুলে দাও, ও লেখা-পড়া শিখে মানুষ হবে—ডাক্তার হবে, উকিল হবে, কত পয়সা আন্‌বে ও। কি বল বাবা, তুমি উকিল হবে, ডাক্তার হবে, কেমন?"

"হ্যাঁ মাসিমা, আমি ডাক্তার হব, উকিল হব।"

খাঁদুকে স্কুলে দেওয়া হইল। কিঙ্করী মাহিনা যোগাইত—মাহিনা দিয়া বাড়ীতেও সে মাষ্টার রাখিল। ছেলেটিকে লইয়া সে এক নূতন জীবনের পত্তন করিল।

খাঁদুর মার কিন্তু এখানে মন টিঁকিতে ছিল না,—মাসখানেক পরে একদিন সে বলিল, "দেশে বোনের বড় ব্যামো। বোনের দ্যাওর এসেছে আমায় নিতে। তার সঙ্গে গিয়ে বোনকে দেখে আস্‌ব—" কিঙ্করীকে বলিল, "ছেলে ত দিদি তোমারই ন্যাওটা হয়েছে—আমাকে ছেড়ে খুবই ও থাকতে পার্‌বে—ওকে আর নিয়ে যাব না, কি বল? রাখতে পারবে ওকে?" একমুখ হাসিয়া কিঙ্করী বলিল, "তা ওকে আমি খুব রাখতে পার্‌ব বৌ। তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে এসো গে!"

মা চলিয়া গেল। বনমালী বাড়ী ফিরিয়া কিঙ্করীর মুখে শ্যালীপতির ভাইয়ের বর্ণনা

পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "রাখতে পারলে না ত, বিশুর বৌ!"

খাঁদু রাত্রে কিঙ্করীর কাছেই ভিতরের ঘরে শয়ন করিত। বনমালী আজকাল প্রায়ই বাড়ী থাকিত না; যেদিন থাকিত, সেদিন দোকান-ঘরে শুইয়াই রাত্রি কাটাইত। রাত্রে বিছানায় শুইয়া খাঁদু লক্ষ্মীছেলেটির মত মাসির কাছে গল্প শুনিত—নিজেও কত গল্প বলিত—স্কুলের কথা, মাষ্টারদের কথা, পোড়োদের কথা! বেহারী সেদিন পড়া বলিতে পারে নাই বলিয়া মাষ্টার মশাইয়ের কাছে কি মারটাই খাইয়াছে! মোধো এমনি পাজী যে পণ্ডিত মশাইয়ের ক্লাশে বইয়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া রোজ গাধার ডাক ডাকে, সেদিন ভূতো তাহাকে ধরাইয়া দিয়া হেডমাষ্টারের কাছে আচ্ছা বেত খাওয়াইয়াছিল, মোধোও কিন্তু তেমনি, স্কুলের ছুটির পর ভূতোকে ঠ্যাঙাইয়া দিয়াছিল, শাণের উপর পড়িয়া ভূতোর দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়! নূতন মাষ্টারটা এত-বেশী পড়া দেয় যে কোন ছেলেই তা মুখস্থ করিতে পারে না। নিজের কি, মুখস্থ ত করিতে হয় না, শুধু বই ধরিয়া পড়া লওয়া—ব্যস্! মাষ্টারদের ভারী মজা! না, সে বড় হইয়া ডাক্তার হইবে না, উকিল হইবে না, স্কুলের মাষ্টার হইবে। এমনি নানান্ কথা অনর্গল সে বকিয়া যাইত, আর কিঙ্করী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে সমস্ত শুনিত।

এই দশ বৎসরের বালকটি কিঙ্করীর মনের মধ্যে এমনি আধিপত্য বিস্তার করিল যে তাহার আর কেহ রহিল না, কিছু রহিল না। দশটা বাজিলে খাঁদুকে সাজাইয়া-গুছাইয়া সে স্কুলে পাঠাইত—নিজে দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। সে মোড় বাঁকিলে কখন্ যে নিজের অজ্ঞাতে কিঙ্করী তাহার পিছু-পিছু স্কুলের ফটক-অবধি আসিয়া পড়িত, সেদিকে তাহার হুঁসই থাকিত না। খাঁদু হঠাৎ পিছনে মাসিকে দেখিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলিত, "আঃ, কি কর্‌ছ মাসিমা? চলে যাও না, তুমি—এখনি ছেলেরা দেখতে পেলে আমায় ক্ষ্যাপাবে যে!" তখন মাসির চমক ভাঙ্গিত—তাইত! এতদূর আসিয়া পড়িয়াছে সে! ফিরিবার পূর্ব্বে আর একবার খাঁদুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সলজ্জ মুখখানিতে চুমা দিয়া মাসি বলিত, "এই যে যাচ্ছি, বাবা।" বলিয়া আবার ঐ স্কুলের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে কিঙ্করী দোকানে চলিয়া আসিত।

স্কুলের ছুটির পর দোকানের গলিতে ঢুকিয়া খাঁদু দেখিত, মাসিমা পথের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! খাঁদুর প্রতি কিঙ্করীর ভালবাসার সীমা ছিল না। খাঁদুর মুখে হাসি দেখিবার জন্য সে আপনার প্রাণটাকে আজ বলি দিতে পারে! এ যে কি সুখ! এত সুখ, এত আনন্দ তাহার অদৃষ্টে ছিল, এ কল্পনাও যে তাহার মনে কোনদিন ঠাঁই পায় নাই! আর খাঁদুও তেমনি 'মাসি' বলিতে অজ্ঞান! মাসির আদরে নিজের মা ও বাপের কথা সে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কিন্তু এ আনন্দের মধ্যে বেদনাও অল্প ছিল না। যখন-তখন এক অজানা ভয়ে কিঙ্করীর বুক থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিত.

—যদি হঠাৎ খাঁদুর মা আসিয়া এখন ছেলের দাবী করে! খাঁদুকে কাড়িয়া লইয়া যায়! ভাবিতে গা শিহরিয়া উঠিত! তাহার উপর ছেলে আসিয়া যখন অনুযোগের স্বরে বলিত, "আমি ও স্কুলে পড়ব না আর, মাসিমা—এত পড়া দেয় যে মুখস্থ হয় না!" তখন সে অস্থির হইয়া উঠিত, নিজের ভয় ভুলিয়া রাগে সে পথে ঘাটে সকলকে ডাকিয়া বলিত, "দেখদেখি দিদি, মিন্সেদের আক্কেল! এই দশবছরের ছেলে, ওকে কিনা বারো খানা বই পড়তে দেছে! ছেলেটা কাল রাত দশটা অবধি জেগে বসে পড়ছিল, ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল তবু শোবে না! এত বললুম, শো বাবা, শো, ঘুমো—তা বললে, না মাসিমা, ঘুমুলে পড়া হবে না, আর পড়া না হলে মাষ্টার মশায় মারবে। আমার ভাই ভারী ভাবনা হয়েছে, ছেলেটা দিন-দিন পড়ার চাপে শুকিয়ে যেন দড়ি হয়ে যাচ্ছে। পরের ছেলে ভালোয় ভালোয়—" এই কথাটা মনে হইতেই আবার বুক কাঁপিয়া উঠিত—জিভ্ কাটিয়া মনে মনে সে বলিত, না, না, না, খাঁদু আমার, আমার! যে মা অমন করিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহার আবার কিসের দাবী! সে আবার মা হইতে আসে কি বলিয়া? ওদিকে বাপেরও ত ঐ দশা! না, না, খাঁদু পরের নয়, সে আমার, আমার!

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাল ঘুম হইতেছিল না। শুইয়া সে ভবিষ্যতের নানা কথা ভাবিতেছিল,—খাঁদু বড় হইলে তাহার বিবাহ হইবে। গাড়ী-ঘোড়া, লোক-জন, কত সে, ওঃ! কি অগাধ ঐশ্বর্য্যে চারিদিক ঝলমল করিবে—খাঁদুর ছেলেমেয়ের ঘর ভরিয়া যাইবে! তাহাদের কল-কল হাসি, সরল দুষ্টামি—! ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সহসা বাহিরের দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বনমালী সে রাত্রে দোকানে ছিল না, থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিল। বুড়া বয়সে তাহার প্রাণে নিত্য নূতন সখ দেখা দিতেছিল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া কিঙ্করী দেখে, এ ত বনমালী নয়,—এ যে খাঁদুর মাসির সেই দ্যাওরটি, যাহার সহিত খাঁদুর মা বোনের বাড়ী গিয়াছিল। খাঁদুর মার কাছ হইতে সে আসিয়াছে, খাঁদুকে লইয়া যাইবে, সেইখানেই সে এখন থাকিবে, সেখানে স্কুল আছে, ভগ্নীপতি ছেলেকে দেখিবে-শুনিবে। খাঁদুর মা কলিকাতায় আর আসিবে না। বনমালী ত ঐ! নেশা ধরিয়াছে, বদখেয়ালিও খুব, রাত্রে ঘরে থাকে না—খাঁদুর মার এ-সব সহ্য হইবে না। ছেলেকে এখনই চাই! না,—বনমালীর জন্য দাঁড়াইয়া দেরী করা চলিবে না—গাড়ী হাজির। খাঁদুকে ডাকিয়া দাও,—এখনই।

এই রাত্রে?

লোকটি কহিল, "হ্যাঁ, নৌকো এখনই ছাড়বে!"

ভয়ে কিঙ্করীর সর্ব্বশরীর হিম হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে সে? তাহার ত কোন জোর নাই! জোর করিলেই বা শুনিবে কে? আঁচলে চোখের জল মুছিয়া

যেখানে যাহা ছিল, সমস্ত গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া খাঁদুর বিছানার পাশে আসিয়া সে দাঁড়াইল। খাঁদু ঘুমাইতেছে, মুখে ফুলের মতই শুভ্র নির্ম্মল হাসি! সু-স্বপ্ন দেখিয়াছে বুঝি! আহা, বাছারে! কিঙ্করী লুটাইয়া পড়িয়া তাহার কচি মুখখানি অজস্র চুমায় ভরাইয়া দিল।

বাহিরে ডাক পড়িল, "দেরী হয়ে যাচ্ছে যে গো—শীগ্‌গির খাঁদুকে নিয়ে এসো না।"

নির্ব্বাক বেদনায় কিঙ্করীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কি করিবে সে! তাহার কোন জোর নাই—পরের ছেলে খাঁদু—কিঙ্করী খাঁদুর কে? কেহ নয়—সে পর, পর—ওগো পর!

—কিন্তু সত্যই কি সে খাঁদুর কেহ নয়? বোনের জাওর আবার বাহির হইতে তাড়া দিল, "আঃ, মিছে দেরী করছ কেন গো! না পারো ত বল, আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি—"

না, না, না—চোখের জল মুছিয়া খাঁদুকে বুকে করিয়া আনিয়া কিঙ্করী গাড়ীতে তুলিয়া দিল, অত্যন্ত সাবধানে। বাছার ঘুমটুকু না ভাঙ্গে! আহা, কাল সকালে উঠিয়া যখন খাঁদু আর মাসিমাকে দেখিতে পাইবে না, তখন—! তাহাকেও আর কাল হইতে ভোরে উঠিয়া কাহারো জন্য খাবার সাজাইতে হইবে না! কতদূরে কোথায় থাকিবে খাঁদু, কে জানে! হয়ত বা জন্মশোধ এই দেখা! গাড়োয়ান বলিল, "এই মাগী, হঠো—" বলিয়া সে ঘোড়ার রাশে টান দিল! গাড়ী চলিল।

যতক্ষণ দেখা যায়, কিঙ্করী গাড়ীর পানে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল। গাড়ী গড়্ গড়্ শব্দে কলিকাতার নিস্তব্ধ রাজপথ সচকিত করিয়া ছুটিল—কিঙ্করীর মনে হইল, তাহার বুকের উপর দিয়া তাহার অস্থি-পঞ্জরগুলাকে মড়্-মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল! গাড়ী চোখের আড়ালে অদৃশ্য হইলে "খাঁদু, বাবা আমার—" বলিয়া চীৎকার করিয়া সে দ্বারের সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইল।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে চোখ মেলিয়া কিঙ্করী চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া খাঁদু, মৃদু ঠেলা দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, "মাসিমা, ও মাসিমা ওঠোনা,—অনেক বেলা হয়ে গেছে যে। আজ আমার এগ্‌জামিন, মনে নেই বুঝি? বাঃ! সকাল সকাল স্কুলে যেতে হবে না? কাল রাত্তির থেকেই ত বলে রেখেছি—বা রে—"

ঘরে সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ধড়্মড়িয়া উঠিয়া কিঙ্করী খাঁদুকে বুকে টানিয়া লইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া ভালো করিয়া আবার চোখ মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল, না—এ ঘুম নয়, স্বপ্ন নয়, সত্য, সত্যই যে খাঁদু! খাঁদুকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া চুমা দিয়া সমস্ত অকল্যাণ মুছিয়া লইয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কিঙ্করী তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরের দিকে ছুটিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বর্ণ-মৃগ

কে এখানে পাঠিয়ে দিলে এই জাগরণ-মাঝ ?
মাথার 'পরে মেঘ-নগরে বজ্ররাগে ধ্রুপদ বাজে আজ ।
পর্দ্দা দিয়ে আড়াল করে'
লুকোচুরি খেল্‌ছে ওরে !
সম্‌ঝাইতে পারিনে সেই মহাশিবের মহান্ অভিপ্রায় ;—
নিব্‌ল দিনের শেষ-সোনালি, আমার দিনের আঁধার কিনারায় ।
দুঃখ-সুখে অবিচ্ছেদে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে
কর্‌ছ পরখ্ কে গো আমায় নিয়ে ?
কে তুমি মোর চিন্‌ব কবে ? কম্‌নে আছ শুধাই গো তোমায় ।

ছিলাম না কি জন্মের আগে, বিস্মরণী বৈতরণীর পারে
রইব কিনা বল্‌বে কে আমারে ?
মাঝ্‌খানে এই আধেক-ভীতি-আধেক-পুলকভরা,
কান্নাহাসির এই দেয়ালা, একটু আশা একটু প্রীতি-ঝরা,
স্বপ্ন বলে'ই হচ্ছে মনে—বুঝ্‌ব কি গো সার্থকতা এর ?
আসল্‌টুকু কখন্ পাব টের ?

মর্‌ছি ঘুরে' গোলোক-ধাঁধায়, বাইরে যাবার দ্বার
কোন্ মরণে, দিগ্‌বিদিকের পার ?—
পথের ধারেই ফুল-কিশোরীর স্বয়ংবরে আজ
রজনীগন্ধার সোহাগে মাতাল গন্ধরাজ,
কিন্তু পলক না ফেলতে হায়
মধুর কণা সোয়াদ হারায়—
উঠ্‌ল গেঁজে রসের তাড়ী, এক চুমুকে নিঃশেষিয়া তায়
ইন্দ্রিয়েরা বাউরা হ'য়ে যায় ।
এই প্রমাথী শত্রুগুলোয় কেমন করে' কর্‌ব ওগো জয়,

দৃগ্-গণিতে ঐক্য নাহি, সর্ব্বগ্রাসী সূর্য্যগ্রহণ হ'ল,
আমার মনের দূরবীনে তার কালীর ছায়া প'ল।
উঠ্‌ল তুফান বুকের তলায়, কপটতার তৃপ্তি ছুটে যায়,
ঘরের যারা পর হোল' রে—পুঁতুল সম কাচের চোখে চায়,
দৃষ্টিভরা শুষ্ক দেমাক, সহজ হাসি লুকিয়েছে কোথায়!
পাড়্‌লে কথা তাদের কাছে,
বখ্‌রা দিতে হয় গো পাছে
তাদের সুখের একটি রতি, আশঙ্কাতে পাশ কাটিয়ে যায়,
চাইনে কিছু তাদের কাছে—একটা কথা শুন্‌তে নাহি চায়।

ধন দৌলৎ জোয়ার-ভাঁটা; সুরতি-খেলায় পড়্‌তো পড়ে কারো,
যে যত পায়, চায় সে ততই আরো;—
ছেলেবেলায় দোলায় শুয়ে, হারিয়ে গেলে রঙীন্ 'চুষিকাঠি'
বায়না ধরে' অবুঝ কান্নাকাটি।
র‍্যালা করে' সেই বোকামি হায়
পড়্‌লে মনে আজ্‌কে হাসি পায়—
আজও কি সেই তেম্‌নিতরই ফেল্‌ছি না রে চোখের নোনা জল
হারাই যখন সোনার কুচি, যাদুকরীর কটাক্ষ টল্‌মল্?
প্রাণ-কমলের পাপ্‌ড়িগুলির মাঝ্‌খানে
লুকিয়ে তারে রাখ্‌ছি না কি সাব্‌ধানে?
সে যদি হায় চায়না আমায়, ফল্গু-সমান বহায় সে উজান
সোহাগ-অভিমান।
বুঝ্‌তে যদি পারি গো তার ভালবাসার ভাণ
আজও কেন ডুক্‌রে ওঠে প্রাণ?
বুঝে-সুঝেও আঁক্‌ড়ে ধরি ঢেউএর মাণিক হায়
ঝাঁপিয়ে পড়ি ভুলের দরিয়ায়।
ঝুটো বলে'ই মান্‌ছি বটে,—ক্ষেপার মতন তবু গো তাই খুঁজি!
সাঁচ্চা বলে'ই কর্‌ছি না কি পুঁজি?
যারেই দেখি শুধাই এ নিখিলে
রয় শুনিয়া অবাক হ'য়ে, এই হেঁয়ালির জবাব নাহি মিলে

চাঁদের হাসি ডুব্‌ল কবে পাহাড়গুলোর পিঠে ?
সুধার নেশা লাগ্‌ছে না আর মিঠে।
বুড়ো হয়েই গেছে সে চাঁদ আমার সাথে সাথে,
নেই সে চুমু শারদ জোছনাতে,
চুম্বকেরি টানে যখন যুগল এসে মিল্‌ত হাতে হাতে,
টান্ পড়িত ফুলের সে 'ছিলা'তে !

শিশু এসে জড়িয়ে গলা দিচ্ছে হেসে খুসির পরিচয়,
পুরাণো এই খেলার দেশে নতুন অভিনয়।
অরুণ রঙে রঙীন্ যে তার প্রাণ,
পূর্ণিমাকে দেয় সে হাসি, হাওয়াকে দেয় গান।—
আমার সাঁঝে ফুট্‌ছে গো তার রাত-পোহানোর আলো,
তার সে শাদা আমার কাছে কালো।
ওই যে হোথা হাস্‌ছে হাসি যুগল-তারার আলো,
কবির মত লাগ্‌ছে গো তার কতই না সে ভালো।
বুঝ্‌বে না সে কী যে জ্বালা, কি বিদ্রোহ লাল-শিখাতে,
পুড়ে-পুড়েই বুকের পাঁজর ছাই হ'ল রে দিবস-রাতে !

এম্‌নি খেলাই খেল্‌ছে মহাকাল—
'রাই' হয়ে সে ঢাল্‌ছে সোহাগ, বিলাস-দোলে দিচ্ছে জলদ্ তাল ;
পা'র কাছে তার ভেট দিয়েছে ঋতুপতি ফুলের শিরস্ত্রাণ,
মিলন-দিনে নিধুবনে ফাগুন-মধুপান।
চুল্‌টি বাঁধা
রইল আধা,
হঠাৎ কাণে লাগ্‌ল বাঁশীর তান,
চম্‌কে ওঠে সম্পা সম চম্পাতরুণ প্রাণ ;
সেই মরমীর মুখের রুচি বক্ষে চাপি' পাগল সে মুকুর,
যুগে-যুগের বাঁশীর কাঁদন, মিলন-রতি বিচ্ছেদে-মধুর।
ডাক দিয়েছে বর-নাগর উপমাহীন পরম-মনোরম,
ক্ষয় নাহি তার যৌবনেরি—ব্যাকুল ব্রজে অনন্ত সঙ্গম।
মন-যমুনায় ঢেউ তুলেছে বাঁশীর ব্যঞ্জনা,
বাজিয়ে নূপুর আয় রে রঞ্জনা,

আয় রে আয় হৃদ্‌মাঝার,
চাইগো তায় হইছি যার।
পরকে চাই, পরকে চাই,
নইলে পর সুখ তো নাই।
মুছিয়ে নীর পর চোখের,
ঘুচিয়ে দুখ পর বুকের,
চাইতে মোর কিছু নাই।
সুখ-সাধন উন্মাদন,
প্রেম-রভস রাস-ঝুলন
রঙ্গ মোর রস-লীলাই।
চাউনি আর রয় না থির,
লাগ্‌ল মিল দিল্‌ আঁখির।'
ভাঙ্গিয়ে নিদ্‌ গায় তোতায়,—
'মন্‌-চোরার সিঁধ্‌ কোথায়?'
ফুল-ফাঁদের বন্দীকে
দিগ্‌ ভোলায় কোন্‌ দিকে!
যৌবনের নৌকোতে
বাইছে দাঁড় জোর-স্রোতে—
সাঁঝ-বেলায় জল-কেলির
জল-তরং সুর মদির
ভাসিয়ে দেয় লাজ-বসন,
স্তন-কদম আধ মগন।
সুখ-মদের মৌ-ধারায়
মন মাতায় সুখ-ব্যথায়।
নিশ্বাসের খোস্‌বোতে
লিখ্‌ছে নাম দাস-খতে;
গুল্‌ফ-মূল পা'র পাতায়
রক্তগুল্‌ লজ্জা পায়।
লাক্ষাকীট ঢাল্‌ছে রাগ
আল্‌তা-পায় খেল্‌তে ফাগ।
কস্তুরীর যশ লুকায়
শৈল-পা'র কুঞ্জ-ছায়।

কোন্‌ শাওণ রোদ-জলে
মন্ত্রে কার মন গলে!
কোন্‌ বিহান স্বর্ণ-ধূল
ঝরিয়ে দেয় সব বকুল।
গাঁথ্‌ছে হার, নাই সে ফাঁস,
টুট্‌ছে আধ্‌—ঘোম্‌টা-পাশ।
মুখ-পরশ চুম্‌-সরস,
অঙ্গ আর রয় না বশ;
রোম-কূপের ফাঁক দিয়ে
সব সুধাই নেয় পিয়ে।
মজিয়ে দেয় এক 'পেয়ার'
লাখ্‌ জনম, লাখ্‌ হিয়ার,
লাখ্‌ যুগের তৃষ্ণাতে
সাধ মেটায় দিন-রাতে।
সয় দরদ্‌ বেদ্‌নাতে,
ছয় ঋতুর ঝুল্‌নাতে।
হয় তিলেক অন্তরাল,
কল্‌জে-তল দেয় রে তাল,—
মন হাজির হয় কাণে,
চোখ বুজে তার ধ্যানে,
তার পথে, মন্‌-রথে
জয় করে' মন্মথে,
নেয় বরে' ফুল-ডোরে
প্রাণ-বঁধুর হাত ধরে'।
বন-বিহার ফুল-খেলায়
চন্দনের গন্ধ বায়,
বিলিয়ে দেয় নগ্ন প্রাণ,
মাঙ্গ্‌তে ভিক্‌ চায় না মান,
আশ্লেষের সম্মোহন,
রয় না ভেদ পর-আপন।
লগ্ন যায়, লগ্ন যায়,
আয় রে রাই আয় রে আয়—

ভাঙ্ছে মান বংশীর ইন্দ্রজাল,
রসিয়ে দেয় অশোক লাগে লাল।
এম্নি করে'ই খেল্ছে মহাকাল।

খেল্ছে যারা দেখ্ছি দিনে-রাতে,
ঐ খেলাতে মন যে নাহি মাতে ;—
নতুন খেলার ধ্যান করে চোখ অশ্রু-কোটর-তলে
অগাধ কৌতূহলে—
হারিয়েছে মোর ভাবের ঘরে অসার অভাব শুনে'
ক্রান্তি কড়া নিইছি মিছে গুণে'।
বুঝ্ছি এখন কি ঝক্মারি!
রাত-ভিখারী দিন-ভিখারী
করেছি হায় মনটিকে মোর, তাই তো ভুগে মরি,
স্বার্থ-বেড়ায় আপ্নাকে হায় খর্ব্ব করি' ক'রি'।
রসাতলের পাশার ছকে, হার জিতে হায় ফতুর হ'ল প্রাণ,
মেকির হাটে সওদা করে' আসল-পুঁজি হ'ল রে লোক্সান।

পূজার সাজির অপ্রাজিতা ফুট্‌ছে আমার সন্ধ্যামণির পানে,
মিঠা বিষের মথন-শেষে আনন্দ-সন্ধানে।
সয় না দেরি, মুল্তুবী আর—যে সুখ-রসে নিখিল পরিপূর,
এই সরাইএর দুয়ার থেকে আব্ছায়া তার দেখ্ছি বহুদূর।
সাগর-বারির বুদ্‌বুদেরা চায় আকাশের নীল বিথারেই চায়,
সৈকতে দেয় কইয়ে কথা, গোষ্পদে তার কুলায় না যে হায়!—
চাইছে বুক
দিব্য সুখ,
সুখ অভয়,
দ্বন্দ্ব-ক্ষয়,
মৃত্যুজিৎ
ছন্দগীত,
তার নাগাল পায় না মৃৎ।
নিত্য-রূপ, কল্পভূপ,

এক অনুপ পূর্ণ সেই—
সেই ভূমায় অর্ঘ্য দেই।
নিখিল-শ্রীর তারার নাট-
মন্দিরের মন্ত্রপাঠ,
সাত্বিকের শান্তি-শ্লোক,
মুক্ত ওই চৌদ্দ লোক—
বিশ্বাসের বিরাট্ মেরুর জ্যোতি
চিরন্তন কর্‌ছে দীপারতি।
ওগো আমার যুগেযুগের জীবন-ভুলানো,
কই গো তোমার পরশ-মণির হরষ-বুলানো!
দাও গো দেখা, দাও গো মোরে দেখা,
জাগ্‌তে নারি পারের বাসর এমন একা-একা—
দাও রাঙায়ে আঁধার রাতে আলোর অভিসার,
বন্ধু হে আমার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভ্যতা বনাম বর্ব্বরতা

পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, 'সভ্যতা' মানবজাতির পক্ষে আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ তাহা বলা কঠিন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, সভ্যজাতিরা বর্ব্বরজাতিদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। এই হিসাবে বলিতে হয় 'সভ্যতা' মানুষের পক্ষে 'উন্নতি' নয়,—'অধোগতি'। শক্তিমন্ত্রের প্রচারক আধুনিক যুগের কোন কোন পণ্ডিতও এমন কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কথাটা এত সহজে মীমাংসা করা চলে না। সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমরা আর-একটু ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

এই যে বর্ত্তমানে পশুবলদৃপ্ত জর্ম্মাণীর সঙ্গে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের লড়াই বাধিয়াছে, তাহাতে একটা বড় রহস্যময় ব্যাপার দেখা যাইতেছে। জর্ম্মাণী বলিতেছে যে, জর্ম্মাণ 'Kultur'ই মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বস্তু। পৃথিবীর আর সকল জাতি—টাকা-কড়ি ধন-দৌলত লইয়াই ব্যস্ত—সুতরাং প্রকৃত সভ্যতা লাভ করে নাই। আর পৃথিবীময় যাহাতে সেই অপূর্ব্ব জর্ম্মাণ 'Kultur' বিতরণ করা যায়, তাহাই জর্ম্মাণীর উদ্দেশ্য—আর তাহারই ফলে এই ঘোরতর যুদ্ধ। প্রতিপক্ষ অন্য জাতিরা বলিতেছে যে, জোর করিয়া পৃথিবীর অন্য দুর্ব্বল-জাতিদিগকে পদানত

করাই জর্ম্মাণীর উদ্দেশ্য আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া জর্ম্মাণী যোগাড়-যন্ত্র করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এতকালের মানব-সভ্যতা কি জর্ম্মাণীর শক্তি-মন্ত্রের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে! অন্যান্য দুর্ব্বলতর জাতির শান্তি ও স্বাধীনতা কি তাহার নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণীকৃত হইবে? আধুনিক যুগের উন্নত আদর্শ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পরম বাণী কি জর্ম্মাণীর বর্ব্বরতার কবলে পড়িয়া বিলীন হইয়া যাইবে? না, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। সেই দুর্ব্বলতর জাতিদের স্বাধীনতা-রক্ষা, পৃথিবীময় শান্তি ও প্রেমের আদর্শ-স্থাপন, বিশ্বমানবের মুক্তির জন্যই বর্ব্বর জর্ম্মাণীকে পদদলিত করা দরকার!—তাহার বিষদাঁত না ভাঙ্গিলে পৃথিবীর আর মঙ্গল নাই।

বেশ কথা। কথাটা শুনিলে প্রাণে আশা হয়; বুদ্ধদেবের দেশের লোক আমরা—আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু এতকাল আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম যে জর্ম্মাণীই প্রতীচ্য 'সভ্যতা'র মুকুটমণি। ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা যে সভ্যতার গর্ব্ব করে, জর্ম্মাণীর সভ্যতা যে তাহা হইতে কিছু ভিন্ন রকমের ছিল, ইহা ত আমরা এতদিন শুনি নাই! বরং যে কাব্য-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-দৌলত, বিলাস-ব্যসনের জন্য জর্ম্মাণী বিখ্যাত ছিল, তাহা যে ইউরোপীয় সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ দান এবং উহারই আবহাওয়ার 'আওতার' মধ্যে তাহা যে বাড়িয়া উঠিয়াছে এই কথাই প্রতিনিয়ত শুনিয়া আসিয়াছি।

জর্ম্মাণী বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে পদদলিত করিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সভ্যতা ভিন্ন-রকমের হইয়া উঠিল! উহার বদলে জর্ম্মাণী যদি চীন ও তুর্কীস্থান আক্রমণ করিয়া দখল করিত, তাহা হইলে কথাটা কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা এখন আন্দাজ করিয়া বলা শক্ত।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই দেখা যাইবে যে, জর্ম্মাণী নূতন বিশেষ কিছুই করে নাই। সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বকালেই যে-সকল জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাই অন্য দুর্ব্বল জাতিকে জোর করিয়া পদানত,—এমন-কি, ধ্বংস পর্য্যন্ত করিয়াছে। তাহাদের সকলেরই যে উদ্দেশ্য খুব মহৎ ছিল, এমন কথা বোধ হয় বলা যায় না। আর্য্যজাতি যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতের আদিমনিবাসী দ্রবিড় প্রভৃতি জাতিদিগকে কতক মারিয়া, কতক বনে-জঙ্গলে তাড়াইয়া এই 'সুজলা সুফলা' ভূমিকে দখল করিয়া ছিল, তখন যে তাহাদের 'বৈদিক সভ্যতা' প্রচারের খুব বড়রকম একটা উদ্দেশ্য ছিল, এমন কথা বলাও শক্ত। 'নেবুচেদনেজারের' কর্ত্তৃত্বে পারসীক বাবিলন যখন হিব্রুজাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ছিল, তখন যে তাহাদের কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এমন সন্দেহ কেহই করে না। রোমের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য যে পরমার্থ তত্ত্ব প্রচার নয়—পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যভোগ, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আর তৈমুরলঙ্গ ও চেঙ্গিস খাঁর বিপুল বাহিনী যখন ইউরোপ

বহাইয়া, গ্রাম-নগর ধ্বংস করিয়া, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকারী শিবানুচর প্রমথদের তাণ্ডবলীলার পুনরভিনয় করিতেছিল, তখন যে কোন সুগভীর তাতার Culture প্রচার করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইতিহাসে তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মহম্মদের নূতন মন্ত্রে জাগ্রৎ হইয়া আরবজাতি যখন বিশ্ববিজয়ে বাহির হইয়াছিল, তখন প্রথমটা তাহাদের মধ্যে নবধর্ম্ম-প্রচারের একটা মহৎ উদ্দেশ্য যে ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত ইউরোপ ও এসিয়ার কতকগুলি সিংহাসন দখল করাই যে তাহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে সেখানে যখন দলে দলে ইউরোপীয় নানা জাতি আড্ডা করিয়াছিল ও প্রাচীন অধিবাসীদিগকে শিকার করিয়া মারিয়াছিল তখন তাহাদের মধ্যে বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রীর কোন নূতন বার্ত্তা প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। আর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিরা যে এসিয়ার শান্তিপ্রিয়, 'অনুন্নত' নানা জাতির পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়াছিল, তাহার মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মের মহতী বাণী প্রচার করাই যে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, এতখানি বিশ্বাস করাও কঠিন হইয়া উঠে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে জর্ম্মাণীর পৃথিবী-বিজয়ের চেষ্টা যে তথাকথিত দিগ্বিজয়-পরম্পরারই শেষ ফল, তাহা বলিলে বোধ হয় ঐতিহাসিক ভুল হয় না।

সোজা কথায় পশু-জগতের ন্যায় মানব-জগতেও এ-যাবৎ মারামারি কাড়াকাড়িই জীবনের প্রধান কার্য্য ও নিজের স্বার্থের পরিধি বাড়ানোই প্রধান আদর্শ হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের দিব্যদৃষ্টিতে আচার্য্য ডারুইন সাধারণ জীব ও উদ্ভিদ-জগতে যে জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মানব-রূপ বিশেষ জীবের মধ্যে যে তাহা অপেক্ষা অন্য তত্ত্ব বা নীতি কার্য্য করিয়াছে, তাহার ত কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে 'যোগ্যতমে'র আদর্শ যে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, এ-কথা কতকটা মানা যায়। নিম্নতর জীব ও আদিম মানবের ভিতর একমাত্র গায়ের জোরই 'যোগ্যতমে'র মাপকাটি ছিল। 'জোর যার মুলুক তার' এ-কথা তখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে শুধু 'গায়ের জোর' আর প্রধান মাপকাটি থাকিল না। গায়ের জোরের সঙ্গে বুদ্ধির জোরও আসিয়া যখন যোগ দিল, তখন যাহাদের গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর উভয়ই প্রবল ছিল, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। শুধু গায়ের জোর বা শুধু 'বুদ্ধির জোরে'র বিশেষ-কিছু মূল্য কোন কালেই হয় নাই। সেইজন্য যে-সকল জাতি গায়ের জোরের দিকে তেমন মন না দিয়া, কেবল বুদ্ধির চালনাই করিতেছিল, তাহাদের সেই অসম্পূর্ণ 'মানসিক' সভ্যতা—প্রবলতর 'দৈহিক' সভ্যতার কাছে বিধ্বস্ত হইয়া ছিল। প্রমাণ, গথদিগের দ্বারা রোমের ধ্বংস, মোগল-পাঠানদের দ্বারা ভারতীয় হিন্দুর নির্য্যাতন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যে ইউ-রোপীয় জাতিরা পৃথিবীময় আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার আসল কারণ এই যে, তাহারা গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর—দৈহিক ও মানসিক সভ্যতা—উভয় হিসাবেই 'যোগ্যতম' ছিল। তাই একদিকে নিগ্রোদের কেবল 'গায়ের জোর' ও আর-একদিকে এসিয়ার সভ্যজাতিদের কেবল বুদ্ধির জোর, কিছুই তাদের কাছে টিকে নাই; আর বলা বাহুল্য আধুনিক ইউরোপের মধ্যে জর্ম্মাণীই সেই 'গায়ের জোর' ও 'বুদ্ধির জোর' উভয় হিসাবেই সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত। তাই জর্ম্মাণীর পৃথিবী-জয়ের চেষ্টা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতারই চরম পরিণতির চেষ্টা। এই চেষ্টার ফলে যে বিষম প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই বর্ত্তমানে এই মহাযুদ্ধের আকারে দেখা দিয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, এই 'সভ্যতার' মধ্যে কোথাও যেন 'খুঁৎ' আছে, কোথাও এমন মারাত্মক ব্যাধির বীজ লুক্কায়িত আছে যে, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব-মানবের দেহটাই বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

এই যে স্বার্থের আদর্শ, ভোগের আদর্শ, ঐশ্বর্য্যের আদর্শ, মারামারি-কাড়াকাড়ির আদর্শ মানবসমাজে এ-পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়া কি আর কোন আদর্শের ইঙ্গিত মানবসমাজে এ-পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই? এই যে দম্ভ, অহঙ্কার ও প্রতিযোগিতা ইহার বিপরীত প্রেম, সহযোগিতা ও ত্যাগের বাণী মানবসমাজ কি কোনদিন শোনে নাই? শুনিয়াছে বৈকি!

নাই। পৃথিবীতে প্রধানতঃ তিনজন মহা-পুরুষ বা ভগবানের অবতার (যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন) এই প্রেম ও ত্যাগের বাণী শুনাইয়াছেন। প্রথম রাজ-পুত্র সিদ্ধার্থ—যিনি রাজ্য, ভোগ-ঐশ্বর্য্য সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া মানবের দুঃখে কাঁদিয়া ভিখারীর বেশে বিশ্বের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন—এই সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার পরমবাণী তিনি জগৎকে শুনাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়—জেরুজেলমের যীশু-খ্রীষ্ট, যিনি সহস্র নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও প্রেম ও ত্যাগের আদর্শ মানুষের জন্ত প্রচার করিয়াছিলেন, নিজের প্রাণ দিয়াও অহঙ্কারী, ধনগর্ব্বী, অত্যাচারী মানবের মঙ্গলকামনা করিয়াছিলেন। তৃতীয়—নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ—যিনি সমস্ত বাহ্য ঐশ্বর্য্য ও জ্ঞানগর্ব্বের ভিতর হইতে টানিয়া আনিয়া মানুষকে প্রেমের রাজ্যের পথ দেখাইয়াছিলেন, বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার কুহকে আত্মবিস্মৃত মানুষকে বিশ্বপ্রেমের বার্ত্তা শুনাইয়া ছিলেন। ইহাদের সকলের কথাই মানুষ শুনিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল; আর এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ইহাদেরই শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। কিন্তু সত্যকথা এই যে, মানবসমাজ কোনস্থলেই গভীরভাবে ইঁহাদের কথা উপলব্ধি করে নাই,—রাষ্ট্রে, সমাজে, জীবনে কোনদিনই ইঁহাদের ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুখে মানুষ যত-বড় কথাই বলুক না কেন, কার্য্যত তাহারা সেই স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার সভ্যতাই

অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান বা বৈষ্ণব হইলেও, জাতিতে জাতিতে মারামারি কাড়াকাড়ি কিছুমাত্র কমে নাই।

এই যে ত্যাগ, সহযোগিতা ও প্রেমের আদর্শ, উহা খাঁটি এসিয়ার আদর্শ। যদি মানব-সভ্যতাকে এই নব আদর্শের উপর স্থাপন করিতে পারা যায় তবেই তাহার মঙ্গল হইতে পারে। অবশ্য আমরা জানি যে অনেক পণ্ডিত এই "ত্যাগে"র আদর্শকে "দুর্ব্বলের ধর্ম্ম" বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন। কিন্তু তথাকথিত "সবলের ধর্ম্ম"—ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রতিযোগিতার আদর্শ মানুষকে কি কোন শান্তি দিতে পারিয়াছে? উহার অন্তরে যে লালসা—উহার বাণী যে "আরো চাই, আরো চাই"—উহা মানুষের অতৃপ্তিকে

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"।

আর ইহাই প্রকৃত 'বর্ব্বরতা'। উহার যতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের গর্ব্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যের বহর, ধন-দৌলতের পরিমাণ ও আরাম-বিলাসের উপকরণ থাকুক না কেন—উহা মূলতঃ বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে হয়ত হূণ, তাতার ও গথদের মত স্থূল বর্ব্বরতা নহে—জ্ঞানবিজ্ঞানের বার্ণিশে মার্জ্জিত নূতন ধরণের বর্ব্বরতা। আর যতদিন ইউরোপ এই বৈজ্ঞানিক বর্ব্বরতার আদর্শকে ধরিয়া চলিবে, ততদিন সে "Pan-christianism", "League of Nations", "Freedom of the World" প্রভৃতি যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, পৃথিবীতে কিছুতেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। মারামারি, কাড়াকাড়ি ও প্রবলের জয়,—ইহাই নির্ব্বিচারে চলিতে থাকিবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জীব-হিসাবে মানুষ জীবজগতের সাধারণ নিয়মের অধীন। সুতরাং তাহার মধ্যে "Struggle for existence", "Natural Selection" (প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন) প্রভৃতিই স্বাভাবিক। জোর করিয়া ত্যাগ, প্রেম ও সহযোগিতার আদর্শ তাহার মধ্যে প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। কিন্তু আধুনিক জীবতত্ত্বের আবিষ্কার এ-বিষয়ে আমাদিগকে আশা দিয়াছে। প্রতিযোগিতা ও জীবন-সংগ্রামই যে জীবজগতের সমগ্র নীতি নহে, একাংশ মাত্র—তাহা আমরা আজকাল বুঝিতেছি। জীবজগতের নিম্নতম স্তরেও প্রেম ও সহযোগিতার ক্রিয়া চলিতেছে। আর যতই জীবরাজ্যের ঊর্দ্ধস্তরে উঠা যায়, ততই এই নিয়মের সফলতা দেখা যায়। মানুষের ক্রমবিকাশের উচ্চস্তরে কালে যে এই উচ্চতর নীতি কার্য্য করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; বরং ইহাই যে মানুষের পক্ষে সত্য নীতি—দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা নহে—ভবিষ্যতের জীবতত্ত্ব তাহা হয়ত প্রমাণ করিয়া দিবে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয় যে, এই ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শ জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, প্রবলের হস্তে আত্মরক্ষায় তাহাকে অক্ষম করিয়া তোলে। কথাটা কিয়দংশে সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পশুবলই কি মানুষের একমাত্র বল? সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন-দৌলত, ক্ষমতা, প্রভুত্ব—ইহাই কি জাতির একমাত্র লাভ? ইহা ছাড়া মানুষের আর কি কিছু কার্য্য নাই? জাতির আর কি কোন লক্ষ্য নাই? এই দিক দিয়া চিন্তা করিলে বোধ হয় যে, হয়ত-বা এই

সকলের বাহিরে আরও কিছু মহৎ বস্তু আছে। আর ত্যাগ ও প্রেমের আদর্শের ভিতর দিয়াই সেই বস্তু লাভ হইতে পারে। ইহাতে হয়ত মানুষের "Efficiency" বাড়িবে না, হয়ত-বা অনেক জাতি পরপদদলিত হইবে, হয়ত-বা কেহ কেহ প্রবলের অত্যাচারে ধ্বংস হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত এই ত্যাগ ও প্রেমের 'সভ্যতা'ই জয়ী হইবে, —এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা উহাই বিশ্বমানবের চরম পরিণতি। বর্ত্তমান যুদ্ধের লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই ভীষণ বর্ব্বর-'সভ্যতার' একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে। বলগর্ব্বী ও ধনগর্ব্বী জাতিরা ধনে-প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া হয়ত-বা ত্যাগের মহিমা বুঝিতেও পারে। রক্তেরাঙ্গা পৃথিবীর বুকে হয়ত-বা একদিন প্রেম ও শান্তির নিশান উড়িতেও পারে। আর তাহাই যদি হয়, তবে এই ভয়াবহ নরমেধ যজ্ঞ বৃথা যায় নাই বলিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

জলের আল্পনা

পনেরো

আল্‌বোলার নলটি মুখে লাগাইয়া জগৎবাবু স্তিমিত চক্ষে সোফার উপরে আড়্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার ঠোঁটের দুইপাশ দিয়া ধোঁয়ার দুটি সাদা রেখা ফুটিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া জান্‌লার দিকে উড়িয়া যাইতেছিল।

তাঁহার প্রিয় ভৃত্য মাণিক একখানা পত্র হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। জগৎবাবুর হাতে পত্রখানা দিয়া বলিল, "একজন লোক এসে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল। বল্‌লে, জরুরি চিঠি।"

চিঠিখানা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "কার চিঠি এ? কোত্থেকে এসেছে, তা বল্‌লে না?"

—"না হুজুর! দিয়েই সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।"

তামাকের নল ফেলিয়া জগৎবাবু ভালো-করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর টেবিলের উপর হইতে চশ্‌মার খাপ্‌খানা তুলিয়া লইয়া, চশ্‌মা বাহির করিতে গিয়া দেখেন, খাপ্‌ খালি। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও চশ্‌মা নাই।

—"মান্‌কে!"

—"হুজুর!"

—"আমার চশ্‌মা কোথায় গেল?"

—"জানি না, হুজুর!"

—"ছাখ্‌ দেখি, নীচে পড়ে গেছে কিনা!"

মাণিক টেবিল, চেয়ার সোফার তলা ও ঘরের আশপাশ আঁতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া বলিল, "চশ্‌মা নেই হুজুর!"

জগৎবাবু খাপ্পা হইয়া বলিলেন, "নেই ত গেল কোথায়?"

—"জানি না হুজুর!"

—"আল্‌বৎ জানিস্‌! দেখ্‌ছিস্‌ জরুরি চিঠি, জানি না বল্‌লেই হোলো? দে, চশ্‌মা বার করে' দে!"

—"আমার কাচে নেই হুজুর!"

—"আল্‌বৎ আছে! নেই বল্‌লেই হোলো! খাপ্‌ রইল টেবিলে আর চশ্‌মা গেল উড়ে? চশ্‌মার ডানা আছে—না?"

বেগতিক বুঝিয়া মাণিক কাঁচুমাচু মুখে মাথা চুল্‌কাইতে সুরু করিল!

জগৎবাবুর মেজাজ ক্রমেই বেশী গরম হইতে লাগিল। সপ্তমে গলা চড়াইয়া তিনি বলিলেন, "পাজী, চোর কোথাকার! বলা নেই, কওয়া নেই—চোখের সাম্‌নে চশ্‌মা লোপাট্‌, দিনে ডাকাতি? বার কর্‌ চশ্‌মা!"

—"জানি না হুজুর!"

জগৎবাবু সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া রুখিয়া বলিলেন, "এম্‌নি এক চড়্‌ মার্‌ব মান্‌কে, যে মাথাটা তোর ঘুরে যাবে! খালি-খালি এককথা—চালাকি পেয়েছিস্‌, না?"

হঠাৎ জগৎবাবুর কপালের উপরে চোখ পড়িতেই, মাণিক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হুজুর, চশ্‌মা ত আপনার কপালেই রয়েছে!"

কপালে হাত বুলাইয়া জগৎবাবু দেখিলেন, অ্যাঁ, তাই ত! তখন তাঁহার মনে পড়িল, খবরের কাগজ-পড়া হইয়া গেলে পর, চশ্‌মাখানা নাকের উপর হইতে টানিয়া সরাইয়া তিনি কপালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। বেকুব বনিয়া তিনি আবার বসিয়া পড়িলেন এবং অপ্রতিভ স্বরে বলিলেন, "মাণিক, কিছু মনে করিস্‌-নে বাবা!"

প্রিয় ভৃত্য মাণিকচাঁদ জো পাইয়া মুখখানা কাঁদোকাঁদো করিয়া বলিল, "হুজুর আমাকে চোর বল্‌লেন!"

—"বড্ড ভুল হয়ে গেছে মাণিক, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! আচ্ছা, আচ্ছা,—দাঁড়া!" বলিয়া, পকেটে হাত পুরিয়া জগৎবাবু তিনটি টাকা বাহির করিয়া, সশব্দে মেঝের উপরে ফেলিয়া দিলেন।

মাণিকচাঁদের বুঝিতে একটুও দেরি হইল না যে, টাকা-তিনটি তাহারই বখ্‌শীষ! কেননা, এমন লাভ তাহার অদৃষ্টে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে;—ধমক, চড়্‌চাপড় এবং বখ্‌শীষ দিতে জগৎবাবুর মত সমান-তৎপর লোক অন্য-কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ!

চশমাখানা ফের নাকের ডগায় নামাইয়া জগৎবাবু চিঠিখানা খুলিলেন। তাতে লেখা ছিল:—

"জগৎবাবু,

আপনার মঙ্গলের জন্যে এই পত্র লেখা হচ্ছে।

আপনি যার হাতে কন্যা-সম্প্রদান করবেন, সেই জয়ন্তের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত কদর্য্য; আপনার অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি,—অথচ, এক বাইজীর সঙ্গে তার বিশেষ মাখামাখি আছে। প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে সেই বাইজীর বাড়ীতে গিয়ে সে গানবাজনা করে' থাকে। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে

আপনি এখনি --নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে সেই বাইজীর বাড়ীতে গেলে জয়ন্তের দেখা পাবেন।"

পত্রে লেখকের নাম-ধাম কিছুই ছিল না।

জগৎবাবু পত্রখানা হাতে-করিয়া জড়ীভূতের মত বসিয়া রহিলেন।

এও কি সম্ভব? জয়ন্ত,—যার স্বভাবে, ভাবে-ভঙ্গীতে, কথায়-বার্ত্তায় আজ-পর্য্যন্ত তিনি কোন খুঁৎ দেখিতে পান নাই,—সে কিনা—সে কিনা—আরে ছ্যাৎ, এ হ'তেই পারে না!

জগৎবাবু আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "না, এ মিথ্যেকথা—ডাহা মিথ্যে!"

কিন্তু পত্রের শেষে এ কী লেখা রহিয়াছে? বৌবাজার ষ্ট্রীটে বাইজীর বাড়ীতে এখনি গেলে জয়ন্তের দেখা পাওয়া যাইবে!

জগৎবাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আপন মনেই বলিলেন, "হ্যাঁ, দ্যাখা অমনি পেলেই হ'ল কিনা! এ উড়ো-চিঠি নিশ্চয় কোন হিংসুকুটে বদ্‌লোক পাঠিয়েছে!"—একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক্...একবার খোঁজ নিয়ে এলে মন্দ কি? মনের ভেতরে মিছে একটা ধোঁকা রাখা কিছু নয়!"

জগৎবাবু চিঠিখানা আবার খামের ভিতরে পুরিয়া হাঁকিলেন, "মাণ্‌কে!"

মাণিকচাঁদ তখন চাকর-মহলে মেঝের উপরে পা-ছড়াইয়া বসিয়া কর্ত্তার চশমা-চুরি ও তাহার বখশীষ-লাভের কাহিনীটা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিতেছিল,—কর্ত্তার ডাক্ শুনিয়া সাড়া দিল, "হুজুর!"

—"শীগ্‌গির গাড়ী জুত্‌তে বল্!"

—"আচ্ছা হুজুর!"

জগৎবাবু মনের ভিতরে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটে পৌঁছিলে পর, সহিস যখন বাইজীর বাড়ীটা খুঁজিয়া বাহির করিল, তখন উপর হইতে গানের শব্দ পাইয়া জগৎবাবু গাড়ীর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা স্বপ্নাতীত!

ইলেক্‌ট্রিকের আলোকে রাস্তা হইতে দ্বিতলের একটা ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। সেখানে নারী-কণ্ঠে গান হইতেছে—এবং সেইসঙ্গে বাজ্‌না ও পায়ের ঘুঙুরের শব্দও শোনা যাইতেছে। আর, সেই ঘরেরই একটা জান্‌লার কাছে বসিয়া আছে,—জয়ন্ত!

জগৎবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আবার চাহিয়া দেখিলেন,—হ্যাঁ, ও মূর্ত্তি জয়ন্তেরই!

তাঁহার চোখ যেন পুড়িয়া গেল, বিকৃতস্বরে হাঁকিয়া উঠিলেন, "এই! গাড়ী ঘুমাও!"

ষোলো

হারমোনিয়ামের সাম্‌নে ইন্দুলেখা মাসিকপত্রের স্বরলিপি দেখিয়া একটা গান অভ্যাস করিতেছিল, এমনসময়ে জগৎবাবু সজোরে ধাক্কা মারিয়া দরজাটা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

—"উঃ, অত জোরে কি দর্‌জা খুল্‌তে হয়, বাবা? একেবারে চম্‌কে গিয়েছিলুম্!"

—"তোর বাজ্‌না থামা ইন্দু!"

পিতার গলার স্বর শুনিয়া, বাজ্না বন্ধ করিয়া ইন্দুলেখা অবাকমুখে চাহিয়া রহিল।

—"ওঃ, মানুষ এমন কপট হ'তে পারে—এতদিন আমি কোন সন্দেহ করতে পারি-নি !"

—"কি হয়েছে বাবা ?"

—"হবে আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! কি আশ্চর্য্য, দুনিয়ায় লোক-চেনা দায় !"

—"হ্যাঁ বাবা, তুমি কার কথা বল্‌ছ ?"

জগৎবাবু ঘরের ভিতরে এলমেল পায়ে ঘুরিতে-ঘুরিতে আপনমনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "অ্যাঁ, আমার মেয়েকে আরেকটু হ'লেই পথে বসিয়েছিলুম ত! ভগবান ভারি বাঁচিয়ে দিয়েছেন !"

ইন্দুলেখার বুকটা কি-এক অশুভ আশঙ্কায় দুপ্‌দুপ্‌ করিয়া উঠিল। কাতর স্বরে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, বল-না, কি হয়েছে ?"

জগৎবাবু হঠাৎ ইন্দুর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জানিস্ ইন্দু, জয়ন্তের সঙ্গে তোর বিবাহ হওয়া অসম্ভব !"

অসম্ভব! কেন,—কিছুই না-বুঝিয়া ইন্দু ফ্যাল্‌ফেলে চোখে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল!

—"জানিস্, জয়ন্ত খারাপ স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যায়,—সে দুশ্চরিত্র !"

ইন্দুর প্রাণটা যেন দমিয়া বুকের ভিতরে বসিয়া গেল—সে নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না; ফস্‌-করিয়া বলিয়া ফেলিল, "না বাবা, না—এ মিছে কথা !"

—"মিথ্যেকথা! তুই কি আমাকে মিথ্যে-বাদী বলতে চাস্ ইন্দু ? আমি যে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখে এলুম !"

ইন্দুর মুখ মোমের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। এলাইয়া একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সে বলিল, "তুমি দেখে এলে ? তুমি ?"

—"হ্যাঁ, আমি—আমি! জয়ন্ত দুশ্চরিত্র—তার সঙ্গে তোর বিবাহ ? সে হয় না ইন্দু !"—এই বলিয়া জগৎবাবু ঘর ছাড়িয়া অস্থির পদে আবার বাহির হইয়া গেলেন।

স্তব্ধ ও স্থির হইয়া ইন্দু সেইখানে বসিয়া রহিল।... ... ...

বহুদূরের তিমিরে-লিপ্ত প্রাসাদ-শ্রেণীর উপরে অতি-ধীরে রক্তরাঙা চন্দ্রলেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। অস্পষ্ট আলোকে বাগানের উপর হইতে অন্ধকারের পর্দা আস্তে-আস্তে সরিয়া যাইতেছে এবং ঘরের সাম্‌নেই একটা বকুলগাছ বাতাসে থর্‌থর্ কাঁপিয়া আকুলস্বরে মর্‌মর্ করিয়া উঠিতেছে!

চাকর আসিয়া খবর দিল "দিদিমণি, খাবার তৈরি হয়েচে !"

ইন্দু তাহার স্বরে চমকিয়া উঠিল; ধমক্ দিয়া বলিল, "কি চাস্ তুই ?"

—"খাবার তৈরি হয়েচে !"

—"যা, চলে যা এখান থেকে! আমি খাব না !"

চাকরটা অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল।

ইন্দু তেম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ ঠায় বসিয়া রহিল।... ...তারপর ধীরে-ধীরে উঠিয়া আগে দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া দিল। কিন্তু ঘর তবু অন্ধকার হইল না—বাহির হইতে দুরন্ত একটি

মেয়ের মত, হাস্যময়ী জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িল!

ইন্দু একে-একে সমস্ত জান্‌লা ভেজাইয়া বাহিরের সমস্ত আলো-কে ঘর হইতে নির্ব্বাসিত করিল। ঘরের বাহিরে শব্দময়ী, গীতিময়ী, দীপ্তিময়ী ধরণী; ঘরের ভিতরে সুধু নিস্তব্ধ, নিবিড়, নিরন্ধ্র অন্ধকার!... ...

সে অন্ধকার তাহার দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত এবং চোখের জলে সিক্ত হইয়া উঠিল!

* * * *

ইন্দুর কাছ হইতে চলিয়া আসিয়া জগৎবাবু বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে তখন অনেক লোকজন আসিয়া জমিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের গোল টেবিলের চারিধারে বসিয়া জন-চারেক ভদ্রলোক 'ব্রিজ' খেলায় অত্যন্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন; আর-এক কোণে, কৈলাসবাবুর সাম্‌নে বসিয়া অবনী দাবার ছকের উপরে বিভোরভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

জগৎবাবুকে দেখিয়া কৈলাসবাবু বলিলেন, "এই যে! এতক্ষণ ছিলেন কোথায়?"

—"বাড়ীর ভেতরে"—এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া জগৎবাবু একখানা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঘরের ভিতরে সবাই তখন খেলায় তন্ময় হইয়া আছে,—তাই জগৎবাবুর মুখের অস্বাভাবিক ভাব কাহারো নজরে ঠেকিল না।

মাণিক আসিয়া আল্‌বোলার মাথায় কল্‌কে চড়াইয়া দিয়া গেল।

জগৎবাবু চিন্তিতমুখে মাঝে-মাঝে তামাকে এক-একটি টান দিতে লাগিলেন।

এমনসময় জয়ন্ত ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল!

জগৎবাবু এতক্ষণ তাহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন,—জয়ন্তকে দেখিয়াই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নমস্কার করিয়াই জয়ন্ত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল; কিন্তু জগৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়াও জয়ন্ত!"

যাইতে-যাইতে জয়ন্ত আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল।

জগৎবাবু তেম্‌নি স্বরে বলিলেন, "দ্যাখ জয়ন্ত, ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপুরে না-গেলে আমি সুখী হব।"

ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বলিল, "কি বল্‌ছেন!"

—"ভবিষ্যতে তুমি আমার অন্তঃপুরে আর না-ঢুক্‌লেই আমি সুখী হব।"

—"আপনি এইকথা বল্‌ছেন!"

—"হ্যাঁ, আমার অন্তঃপুরে দুশ্চরিত্রের প্রবেশ নিষেধ।"

জয়ন্তের মুখ পাঙাশ হইয়া গেল। জগৎবাবু কি তাহা হইলে—

—"তুমি যে এত অসৎ আমি তা জানতুম না। ছিঃ, ছিঃ, যাকে আমি সরল প্রাণে অনায়াসে আমার অন্তঃপুরে ঢুক্‌তে দিয়েছি, সে কিনা অভদ্র ইতর স্ত্রীলোকের বাড়ীতে গিয়ে—"

বাধা দিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে জয়ন্ত বলিল, "দেখুন জগৎবাবু, এ-সব কথা আপনি আমাকে গোপনে বল্‌তে পার্‌তেন।"

—"তাতে আবশ্যক? আমি ইচ্ছে করেই সকলের সামনে এই কথা তুলেছি।

লুকোচুরিকে আমি ঘৃণা করি। দশজনের সাম্‌নে আমি তোমার মুখোস খুলে দিতে চাই! আজ থেকে তুমি আমার সদর মহলে আর পাঁচজনের মতই আস্‌তে-যেতে পার—তাতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু আমার বাড়ীর ভেতরে আর তুমি যেতে পার্‌বে না।"

ঘরের ভিতরে ততক্ষণে সকলের খেলা-ধূলো সব ঘুরিয়া গিয়াছে—লোকগুলির মুখ দেখিলে মনে হয়, এরা-সবাই যেন আকাশ হইতে সস্ত-সস্ত খসিয়া পড়িয়াছে!

বিশেষ-করিয়া দেখিবার মত হইয়াছিল, অবনীর মুখ! বিস্ময়, ঘৃণা ও আনন্দ প্রভৃতি নানা ভাবের আভাসে তাহার মুখখানা এম্‌নি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে মুখ অনায়াসে একজন ভালো চিত্রকরের চিত্রাদর্শ হইতে পারিত!

জয়ন্ত একবার সকলকার মুখের উপরে কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "জগৎ-বাবু, অকারণে আমাকে অপমান কর্‌বেন না, আগে আমার কথা শুনুন—"

—"অকারণে! তুমি কি বল্‌তে চাও অকারণে আমি তোমাকে এ-সব কথা বল্‌ছি?"

—"নিশ্চয়। আমি নির্দ্দোষ।"

—"কী! তুমি এতবড় মিথ্যাবাদী! জানো, আমি স্বচক্ষে তোমাকে কুস্থানে দেখে এসেছি?"

—"তা দেখ্‌তে পারেন। কিন্তু, আমি সেখানে গিয়ে থাক্‌লেও—"

—"থাক্, যথেষ্ট হয়েছে—আর আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না।"

—"জগৎবাবু!—"

—"চুপ্! তোমার কপটতা অসহ্য। আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে।"

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, আমি চল্লুম। কিন্তু যে অপমান আজ আমাকে কর্‌লেন তার জন্যে পরে আপনাকে অনুতাপ কর্‌তে হবে। আমি নির্দ্দোষ।"—বলিতে-বলিতে জয়ন্তের চোখের পাতা জলে ভিজিয়া আসিল; কিন্তু তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া সে চলিয়া গেল।

ঘরের ভিতরে সকলে তখনো হাঁ-করিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছে।

সকলের আগে অবনী মুখ খুলিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য, জয়ন্তবাবুর চরিত্র এত খারাপ!"

জগৎবাবু আল্‌বোলার নলটা আবার তুলিয়া লইয়া তিক্ত-বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "থাক্, ও আলোচনায় আর কাজ নেই, অন্য কথা বলুন।"

অবনী আর-কিছু না-বলিয়া একটুখানি ঠোঁট্-টেপা হাসি হাসিয়া, আবার দাবার ছকের উপরে হেঁট্ হইল;—জয়ন্তের অপমানে তাহার মত খুসি আজ এখানে আর কেউ হয় নাই!

সতেরো

এঃ মেল পায়ে জগৎবাবুর বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া জয়ন্ত যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, রাগে দুঃখে অপমানে তখন তাহার আর হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান ছিল না। দিশেহারার মত সাম্‌নে সে যে রাস্তা পাইল সেইদিকেই আপনমনে চলিয়া গেল। এম্‌নি ভাবে অনেকক্ষণ সে এ-পথে সে-পথে ঘুরিতে

লাগিল ;—কতবার লোকের গায়ের উপরে পড়িয়া যা-তা গালাগালি খাইল, একবার এক-খানা গাড়ীর সুমুখে গিয়া পড়াতে গাড়োয়ান ছিপ্‌টি মারিয়া তাহার গণ্ড ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল—জয়ন্ত আজ কিন্তু কিছুতেই উচ্চবাচ্য করিতেছে না। তাহার বুদ্ধি এবং অনুভব-শক্তি আজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে !

গভীর নিশীথে গীর্জ্জার ঘড়ীটা আচম্‌কা যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল ! পথে তখন লোকজন নাই বলিলেও হয় ; কেবল একটা মাতাল গ্যাস্‌পোষ্টে ঠ্যাসান্ দিয়া কোনমতে খাড়া হইয়া নেশার ঘোরে আপনমনে ঝিমাইতেছিল ; হঠাৎ গাড়ীর শব্দে চম্‌কাইয়া বিড়্‌বিড়্ করিয়া জড়াইয়া-জড়াইয়া বলিল, "এই, চ্যাঁচাস্-নে—চ্যাঁচাস্ নে, অনেক কষ্টের নেশা বাবা, এক্ষুনি চট্-করে' চটে যাবে !"—বলিতে বলিতে গ্যাস্‌পোষ্ট ধরিয়া রাস্তার উপরেই সটান লম্বা হইয়া পড়িল।

তখন জয়ন্তের খেয়াল হইল। বুঝিল, অনেক রাত হইয়া গিয়াছে, ভজহরি এখনো তাহার জন্য জাগিয়া বসিয়া আছে। এমন ভাবে পাগলের মত পথেপথে ঘুরিয়া মরিয়া লাভ কি ?... ...তাড়াতাড়ি ফিরিয়া সে আবার বাড়ীমুখো হইল।

জয়ন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা মস্ত চক্রান্ত হইয়াছে। নইলে স্বর্ণেন্দু আজ থাম্‌কা তাহাকে বাইজীর বাড়ীতে লইয়া যাইবেই-বা কেন, আর তাহার সেখানে যাওয়ার খবর জগৎবাবুই-বা এত-শীঘ্র টের পাইবেন কি-করিয়া ? ...কিন্তু স্বর্ণেন্দুর এতে স্বার্থ কি ? আরো-খানিক ভাবিয়া জয়ন্ত আন্দাজ করিল, এর-মধ্যে অবনীরও হাত আছে ; অবনী ইন্দুকে বিবাহ করিতে চায়, সে-ই তার পথের কাঁটা হইয়াছে ; তাই অবনী তাহার বন্ধু স্বর্ণেন্দুর সাহায্যে আজ তাহাকে এই বিপদে ফেলিয়াছে ! জয়ন্ত যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার সন্দেহ ততই দৃঢ় হইয়া উঠিল ; হ্যাঁ, আজ্‌কের ব্যাপারের মূলে আছে, ঐ অবনী !... ... ...

সারারাত অনিদ্রায় কাটাইয়া, খুব ভোরবেলায় জয়ন্ত যখন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, ধরণীর মুখ হইতে তখনো কালো ছায়ার ঘোম্‌টা খসিয়া পড়ে নাই। পূর্ব্ব-তোরণে প্রাতঃসন্ধ্যার আরতি-প্রদীপে তখন আলোর ক্ষীণ শিখাটি সবেমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং নীলগগনের ছেঁড়া মেঘের ভাঙা আসরে চিরমৌন শুকতারাটি করুণ নয়ন মেলিয়া পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে।

জয়ন্ত আপনমনে ভাবিতে-ভাবিতে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া ভোরের হাওয়ায় তাহার চিন্তাক্লান্ত প্রাণ অনেকটা শান্ত হইল। আস্তেআস্তে সে আবার ঘরের ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছিল—কিন্তু হঠাৎ জগৎবাবুর বাড়ীর বাগানের দিকে চোখ পড়িতেই সে আবার দাঁড়াইয়া পড়িল।

হাস্‌নাহানার সবুজ ঝোঁপের পাশে, ঠিক-একটি প্রতিমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া ইন্দু একলাটি দাঁড়াইয়া আছে।

ডুবুডুবু লোক যেমন-করিয়া দূরের নৌকার দিকে তাকাইয়া থাকে, তেম্‌নি করিয়া জয়ন্তও ইন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ইন্দুও নিশ্চয় পিতার মুখে সমস্ত

শুনিয়াছে—আজ তাহার হৃদয়ে হয়ত তার আর একটুও ঠাঁই নাই—তাহার চোখে সে এখন নিষ্ঠুর প্রতারক বৈ অন্য-কিছু নয়! জয়ন্তের মনটা হা-হা করিয়া উঠিল।

তারপরেই সে ভাবিল, 'আচ্ছা, মিথ্যা এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের শান্তিসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাক্‌ব কেন? ইন্দু ত জানেনা, চক্রীর চক্রান্তে পড়ে আজ আমার এই বদ্‌নাম! তার কাছে যদি সমস্ত খুলে বলি, সে কি আমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে না? আমি কি তার চোখে এতটা নীচু হয়ে পড়েছি?'... ...

আরো-খানিক ভাবিয়া জয়ন্ত স্থির করিল, সে এখনি ইন্দুর কাছে গিয়া তাহার ভুল ভাঙিয়া দিয়া আসিবে! ইন্দু বিশ্বাস করুক্‌ না-করুক, সে পরের কথা।

জয়ন্ত তখনি নীচে নামিয়া গেল।

বাগানের ফটক তত-সকালে খোলা ছিল না। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া জয়ন্ত দেখিল, ইন্দু তখনো ঠিক সেইখানটিতে তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে।

কম্পিত, সঙ্কুচিত স্বরে জয়ন্ত ডাকিল, "ইন্দু!"

ইন্দু চমকিয়া পিছন ফিরিল। জয়ন্তকে এ-সময়ে এখানে দেখিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না; সমস্ত ভুলিয়া ঠিক আগেকার মতই হাসিমুখে তাড়াতাড়ি তাহাকে কি বলিতে গিয়াই সে আবার থামিয়া পড়িল। —গেল কাল্‌কের সেই ব্যাপারটার কথা মনে হওয়াতে তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! জড়সড় হইয়া চুপ-করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়ন্ত বলিল, "ইন্দু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ফটকটা একবার খুলে দেবে?"

ইন্দু কি যে করিবে, বুঝিতে পারিল না। সে জানিত জয়ন্তের সঙ্গে মেলামেশা করিলে তাহার পিতা রাগ করিবেন; অথচ জয়ন্ত যে চোখের সুমুখে তাহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবে, এও ত সে প্রাণ ধরিয়া সহিতে পারিবে না!

ইন্দুর ইতস্তত দেখিয়া জয়ন্ত সমস্ত বুঝিল। অভিমানে তাহার মনটা ফুলিয়া উঠিল—আক্ষেপভরে বলিল, "থাক্‌ ইন্দু, থাক্‌ থাক্‌, আর আমার বল্‌বার কিছু নেই—স্রোতের শেওলার মত তোমাদের কাছে আমি ভেসে এসেছিলুম—আবার ভেসেই চলে যাব—আমি তোমাদের কোথাকার কে!"

মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া মিনতির স্বরে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু!"

জয়ন্ত তাহার কথায় কাণ না-দিয়াই বলিল, "তোমার বাবা আমার ওপরে অবিচার করেছেন আর তুমিও আমার কি বল্‌বার আছে তা না শুনেই কুকুর-বিড়ালের মত আমাকে—"

গভীর যাতনায় ইন্দুর বুক যেন ফাটিয়া যাইবার মত হইল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন জয়ন্তবাবু, থামুন! এমন কথা আর বল্‌বেন না, আপনি ভিতরে আসুন—আমি ফটক খুলে দিচ্ছি!"

ইন্দু আগাইয়া গিয়া ফটকের অর্গল খুলিয়া দিল।

ফটক ঠেলিয়া জয়ন্ত ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছে, সহসা উপর হইতে ক্রুদ্ধ—তিরস্কারের স্বর আসিল—"ইন্দু!"

সচমকে দুজনেই উপরে চাহিয়া দেখিল, বারান্দার রেলিং ধরিয়া জগৎবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে!

আকাশের মেঘের উপরে তখন প্রদীপ্ত আলোক-পদ্মের মত সূর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু ইন্দু চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সুধু অন্ধকার আর অন্ধকার! নতমুখে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

জগৎবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "জয়ন্ত, তুমি আর যাই হও—আমি তোমাকে অন্তত ভদ্রলোক বলেও জান্‌তুম!"

জয়ন্ত আর দাঁড়াইল না—কাল্‌কের অপমানের উপরে আবার এই নূতন অপমানে পাগলের মত হইয়া, দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল।

... ...

জয়ন্ত যখন নিজের বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল, তখন তাহার দেহের রক্ত ফুটন্ত তেলের মত তপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়াইয়া দিতেছে।

অবশ হইয়া বিছানার উপরে শুইয়া পড়িয়া, দুইচোখ বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ সে চুপচাপ রহিল—চাপা আবেগের নিশ্বাসে বুকখানা তাহার ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

খানিক পরে হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া, দুইহাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রুদ্ধ আক্রোশের স্বরে বলিল, "না—এমন চুপ করে' থাকা চল্‌বে না—আমি এখনি আবার জগৎবাবুর কাছে যাব—তাঁর মেয়ের সঙ্গে তিনি আমার বিবাহ দিন আর না-দিন—আমি তাঁকে যেমন করে' পারি বুঝিয়ে দেবই দেব, যে আমি কোন দোষে দোষী নই!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়া দেখিল, একখানা টেলিগ্রামের লেপাফা হাতে করিয়া ভজহরি উপরে উঠিতেছে।

সাম্‌নেই বাধা পাইয়া জয়ন্তের মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ভজহরি বলিল, "খোকন, তোর নামে একটা তার এসেচে রে!"

—"টেলিগ্রাম! কোত্থেকে?"

—"আমি ত আর তোর মতন অ্যাংরেজি পড়া পণ্ডিত নই, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল! এই নে,—পড়্!"

ভজহরি টেলিগ্রামখানা জয়ন্তের হাতে অর্পন করিল।

জয়ন্ত কম্পিত ভীত হস্তে টেলিগ্রামের মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল—কেননা, বাঙালীর সংসারে তারবার্ত্তায় ভালো খবর পাওয়া যায় খুব কম।

টেলিগ্রামে সুধু লেখা ছিল—

"অন্নপূর্ণা মৃত।"

—"মাগো!"—বলিয়া জয়ন্ত সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মন হইতে সমস্ত অপমানের কথা, জগৎবাবু ও ইন্দুর কথা ঢেউএর টানে খড়-কুটোর মত কোথায় ভাসিয়া গেল!

ভজহরি খবর শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল—জয়ন্তের ভাব দেখিয়া তাহার বুক উড়িয়া গেল। খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা

বলিল, "অ খোকন, অমন করে' উঠ্লি ক্যানো, কি হয়েচে, বল্ ভাই, বল্!"

জয়ন্ত ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওরে ভজা, মা আর নেইরে!"

—"আঁ্যা, মা-ঠাক্‌রোণ? মা-ঠাক্‌রোণ নেই?"—ভজহরি স্তম্ভিত হইয়া গেল!

শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে অন্নপূর্ণাকে কত মূর্ত্তিতেই জয়ন্ত দেখিয়াছে, তাঁহার স্নেহে যত্নে প্রেমে হৃদয় তাহার কানায়-কানায় ভরিয়া আছে—সেই-সব তাহার চোখের সুমুখে এক-লহমায় যেন আকার ধরিয়া বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা মুখে তাহাকে যতই কড়া কথা বলিয়া থাকুন, তবু সে জানে তিনি তাহারই করুণাময়ী জননী—তিনি বিমাতা নন—তাহার পায়ে ব্যথা লাগিবার ভয়ে তিনি আপন বুক পাতিয়া দিতে পারিতেন, হাসিমুখে অবহেলায়! নিজের ছেলেকে ত সকল মা ভালোবাসেন, কিন্তু পরের ছেলেকে এমন নিজের মত ভালোবাসিতে আর কোন্ মা পারেন? এই মাকে সে কিনা বিমাতা বলিয়া গালি দিয়াছে! হয়ত সে কথা শাণিত অস্ত্রের মত তাঁহার বুকে গিয়া বিঁধিয়াছিল, হয়ত সে আঘাত সহিতে না-পারিয়াই তিনি আজ তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন!

ফুঁপাইতে-ফুঁপাইতে জয়ন্ত বলিয়া উঠিল, "ভজা, আমার জন্যেই মা গেলেন, আমি মাতৃহন্তা রে, মাতৃহন্তা!"—বলিয়া, সে নিজের কপালে সজোরে করাঘাত করিল।

ভজহরি সাশ্রুচোখে জয়ন্তের হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "এখন আর ও-সব কতা ভেবে মন খারাপ করিস্ নে রে, মার্‌তে কেউ কারুকে পারে না—ভাই, কপাল ছাড়া পথ নেই!"

জয়ন্ত উদাস ভাবে দেয়ালের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ভজহরি বলিল, "খোকন্, এখন যে দেশে যেতে হবে ভাই, কখন্ গাড়ী আচে জানিস্?"

—"দেশে ফির্‌তে মন আর সর্‌চে না ভজা! কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কে আর আমাকে আগ্‌-বাড়িয়ে নিয়ে যাবে?"

—"তা বল্‌লে ত চল্‌বে না ভাই! মা-ঠাক্‌রোণের শ্রাদ্ধ যে এখনো হয়-নি, গৌরী দিদি ছেলেমানুষ—সে যে সেখানে একলাটি চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, তাকে দেক্‌বে কে, তার ভার যে এখন তোর ওপরেই!"

গৌরীর মুখ মনে করিয়া জয়ন্তের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল—গৌরী, গৌরী! তার সাম্‌নে গিয়া সে কেমন করিয়া কোন্ মুখে দাঁড়াইবে!... ...

কিন্তু যাইতেই হইবে! এ যে কর্ত্তব্য!

জয়ন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঘরের দেয়ালে পিঠ রাখিয়া, অন্নপূর্ণার মুখ ভাবিতে-ভাবিতে চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাংলার ব্রত

আমাদের দেশে দু রকমের ব্রত চলিত রয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর-কতকগুলি শাস্ত্রে যাকে বলছে যোষিৎ প্রচলিত বা মেয়েলী ব্রত। এই মেয়েলী ব্রতেরও দুটো ভাগ ; একপ্রস্থ ব্রত কুমারী-ব্রত —পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা এগুলি করে, আর বাকিগুলি নারী-ব্রত, বড় মেয়েরা বিয়ের পর থেকে এগুলি করতে আরম্ভ করে। এই শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ব্রত যেগুলি হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে এদেশে প্রচার লাভ করেছে, এবং দুই-থাকে বিভক্ত এই মেয়েলী ব্রত যার অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পূর্ব্বেকার বলে বোধ হয় এবং যার মধ্যে হিন্দু-পূর্ব্ব এবং হিন্দু এই দুই ধর্ম্মের একটা আদান-প্রদানের ইতিহাস পড়তে পারি, এই দুই প্রস্থ ব্রতের গঠনের ভিন্নতা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। শাস্ত্রীয় ব্রত, নারী-ব্রত এবং কুমারী-ব্রত, ব্রতকে এই তিনভাগে রেখে প্রত্যেকটির গঠন কেমন দেখা যাক। কিছু কামনা করে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।

শাস্ত্রীয় ব্রত—প্রথমে সামান্যকাণ্ড —যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্ম্মারম্ভ, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শান্তিমন্ত্রঃ, সামান্যার্ঘ, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকা-যাগাদি এবং বিশেষার্ঘস্থাপন। এর পরে ভক্তি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা দিয়া কথা-শ্রবণ বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শোনা। সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই হ'ল পৌরাণিক ব্রতের উপাদান।

নারীব্রত—শাস্ত্রীয় ব্রতের অনেক-খানি এবং খাঁটি মেয়েলী-ব্রতেরও কতকটা মিলিয়ে এগুলি। এইগুলি শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় দুই অনুষ্ঠানের যুগলমূর্ত্তি বলা যেতে পারে। বৈদিক অনুষ্ঠানের গভীরতা ও সজীবতা অনেকখানি চলে গিয়ে এবং লৌকিক ব্রতের সরলতাও প্রায় নষ্ট হয়ে পূজারী ব্রাহ্মণ এবং সামান্য কাণ্ডের জটিল অনুষ্ঠান-ন্যাস-মুদ্রা-তন্ত্র-মন্ত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

কুমারীব্রত—এই ব্রতগুলিই অনেকখানি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়, এদের গঠন এইরূপ—আহরণ যেমন, ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা, আচরণ যেমন, কামনার প্রতিচ্ছবি, আল্পনা দেওয়া, পুকুর-কাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রতকথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ-কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ। পূজারী এবং তন্ত্র-মন্ত্রের জায়গাই এখানে নেই।

লোকের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের জটিল অনুষ্ঠান এবং নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তন্ত্র ও পুরাণকে

রচনা করা হয়েছে। বেশ বোঝা যায় হিন্দুধর্ম্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুব্রতমালা-বিধান চিনির ডেলার আকারে যেন কুইনাইনপিল! খাঁটি পুরাণগুলির ইতিহাস-হিসাবে একটা দাম আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি না পুরাতন আচার-ব্যবহারের চর্চ্চার বেলায় না লোক-সাহিত্য বা লৌকিক ধর্ম্মাচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে লাগে। লোকের সঙ্গে এই ব্রতগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়। ছাঁচটা এদের ব্রতের মতো হ'লেও জোড়া-তাড়া দেওয়া কৃত্রিম পদার্থে যে জড়তা সেটা এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির সমস্তটার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যজু এবং সাম বেদের অনেক মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এই ব্রত-গুলিতে থাকলেও বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে এগুলির কলের পুতুলে আর জীবন্ত মানুষের মত প্রভেদ, শুধু তাই নয়—যে লৌকিক ব্রতের ছদ্মবেশে এগুলিকে সাজানো হয়েছে সেই খাঁটি মেয়েলী-ব্রতগুলির সঙ্গেও এদের ঐ একই রকম প্রভেদ। খাটি মেয়েলী ব্রতগুলিতে তার ছড়ায় এবং আল্পনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সুক্তগুলিতেও সমগ্র আর্য্যজাতির একটা চিন্তা, তার উত্তম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ দুয়েরই মধ্যে লোকের আশা আশঙ্কা চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দুয়ের মধ্যে এইজন্যে বেশ-একটা মিল দেখা যাচ্ছে। নদী সূর্য্য এমনি অনেক বৈদিক দেবতা, মেয়েলী-ব্রতেও দেখি এঁদেরই উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হচ্ছে। বৈদিক যুগে ঋষিরা উষাকে এবং সূর্য্যের উদয়কে আবাহন কচ্ছেন—

(উষাদেবতা। অঙ্গিরাপুত্র কুৎস ঋষি ॥)

"সূর্য্যের মাতা শুভ্রবর্ণা দীপ্তিমতী উষা আসিয়াছেন!"

(সূর্য্যদেবতা। কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি ॥)

"তাঁহার অশ্বগণ তাঁহাকে সমস্ত জগতের ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে!"

আবার নদী-সকলকে উদ্দেশ ক'রে—"কোনো কোনো জল একত্রে মিলিত হয়, অন্য জল তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রের বাড়বানলকে প্রীত করে।"

এর পরে যেগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্য্যস্তব—

"নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ,
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ-কারণ
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়,
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন প্রভু দেবরায় ॥"

বৈদিক সূর্য্য আর শাস্ত্রীয় ব্রতের সূর্য্য—দুয়ে তফাৎ যে কতটা তা দেখতে পাচ্ছি। এইবার খাঁটি মেয়েলী-ব্রতের ছড়াতে সূর্য্যকে উষাকে এবং নদনদীকে কি ভাবে লোকে বর্ণন করছে দেখি—

(নদী থেকে জল-তোলবার মন্ত্র বা ছড়া।)

"এ নদী সে নদী একখানে মুখ
ভাদুলী-ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ"
"এ নদী সে নদী একখানে মুখ
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ ॥"

(সমুদ্রে ফুল-ধরবার মন্ত্র বা ছড়া।)

"সাত সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন্ সমুদ্রে ঢেউ তুলে?"

(সকালের কুয়াশা-ভাঙার মন্ত্র।)

"কুয়া ভাঙ্গুম, কুয়া ভাঙ্গুম বেথলার আগে—
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে"

(উষা ও সূর্য্যোদয়ের ছড়া।)

"উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ি
ঐ যে দেখা যায় সূর্য্যের মার বাড়ি!
সূর্য্যের মা লো! কি কর দুয়ারে বসিয়া!
তোমার সূর্য্য আস্‌তেছেন
যোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।"

তারপর বসন্তের কন্যা চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের প্রেমের একটুখানি রূপক যেমন—

"চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ,
তাই দেখিয়া সূর্য্য ঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন সাড়ি,
তাই দেখিয়া সূর্য্য-ঠাকুর ফিরেন বাড়ি বাড়ি।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল-খাড়ু়য়া পায়,
তাই দেখিয়া সূর্য্য-ঠাকুর বিয়া করতে চায়।"

বেদের সুক্ত সাধু ভাষায় তর্জ্জমা করা হয়েছে আর ছড়ার ভাষা চল্‌তি বাংলা, সেইজন্যে একটা শোনাচ্ছে গম্ভীর, আর একটা শোনাচ্ছে ছেলেমানুষি রকম, কিন্তু যদি ইংরিজি ভাষায় তর্জমা করা যায় তবে মেয়েলী ছড়া আর বৈদিক সুক্ত দুইই প্রায় একই জিনিষ বোধ হবে।

"Young Moon, daughter of Spring has united her tresses, and the Sun goes seeking her through many lands. Spring's daughter the Young Moon has unfolded her silver robe and the Sun peeps into many houses seeking her. The slender Moon the Spring's lovely maiden is wearing the silver anklet, seeing which the Sun seeks her union in marriage."

কিন্তু তাই বলে পুরাণ ভেঙে যেমন শাস্ত্রীয় ব্রত তেমনি বেদ ভেঙে এই মেয়েলী ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে একথা একেবারেই বলা যায়না। কেননা সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু সূর্য্য চন্দ্র এঁরা উপাসিত হচ্ছেন ভারতবর্ষে ইজিপ্তে মেক্সিকোতে! সুতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালীর ঘরের জিনিষ বলে ধরা যেতে পারে, এটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে ব্রতগুলির সম্পূর্ণ চেহারাটি আমরা যখন দেখবো। একদিকে ভারতে প্রবাসী আর্য্যদের অনুষ্ঠান আর-একদিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, একদল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন আর একদল নদীমাতৃক পল্লিগ্রামের নিভৃত নীড়ে বসতি করছেন! এই প্রবাসী এবং নিবাসী দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মূর্ত্তিতে এবং তারি বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে, কর্ম্মের উপরে, তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফূর্ত্তি সবলে নিষ্পেষিত করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ এবং পুরাণের চেয়েও যা পুরোনো এই সব লৌকিক ব্রত-অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই প্রমাণ করছে—দুইদিকে দুটো বড় জাতির প্রাণের কথা, মাঝে একটি দল-বিশেষের স্বপ্ন!

আর্য্য এবং আর্য্য-পূর্ব্ব দুজনেরই সম্পর্ক যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে,

এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ, ধন ধান সৌভাগ্য স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমনি-সব পার্থিব জিনিষ ; দুজনে ব্রত করছে যা কামনা করে' সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত-অনুষ্ঠান মেয়েদের এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন—ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি ; আর বাঙালীর মেয়েরা চাইছে—'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।' এর সঙ্গে পৃথিবী-ব্রতের শাস্ত্রীয় প্রণাম-মন্ত্রটি দেখি—

'বসুমাতা দেবী গো ! করি নমস্কার।
পৃথিবীতে জন্ম যেন না হয় আমার।'

এই যে পৃথিবীর যা-কিছু তার উপরে ঘোর বিতৃষ্ণা এবং 'গোক'লে গোকুলে বাস গরুর মুখে দিয়ে ঘাস আমার যেন হয় স্বর্গে বাস' এই অস্বাভাবিক প্রার্থনা ও স্বপ্ন, এটা বেদেরও নয় ব্রতেরও নয়। বৈদিক সূক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, বনের সবুজের উপরে নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষিমাতার মধুর কাকলী—কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা !

খাঁটি ব্রতের অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া এবং

যে ভিন্নতা রয়েছে সেইটে পরিষ্কার ধরবার চেষ্টা করলে দেখবো যে, শাস্ত্রীয় ব্রতে প্রায় সকলগুলিতে যে-কামনা করেই ব্রত হোক না, কামনা চরিতার্থ করবার উপায় বা অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া অনেকটা একই, যেমন—আমলকীদ্বাদশী ব্রত, প্রথম স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যসোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে—ওঁ আদ্যেত্যাদি মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে দ্বাদশ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী (বা শূদ্র হ'লে দাসী) পুত্র-পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি ধনধান্যসৌভাগ্যাদি প্রাপ্যান্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা অদ্যারভ্য একবর্ষ পর্য্যন্তং প্রতিমাসীয়ং শুক্লদ্বাদশ্যাং গণপত্যাদি দেবতাপূজাপূর্ব্বক বা সলক্ষ্মীক বিষ্ণুপূজামলকীযুক্তভোজ্যদানপূর্ব্বকং ব্রহ্ম-পুরাণোক্ত বিধিনামলকীদ্বাদশীব্রত মহং করিষ্যে—পরে সামান্যার্ঘ্য আসনশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি সামান্যকাণ্ডের পুরো অনুষ্ঠান করে ব্রতকথা শ্রবণ,—মোটামুটি সব ব্রতেরই এই প্রক্রিয়া ! পুত্রপৌত্র ধনধান্য কামনা, তারও চরিতার্থতার যে মন্ত্র যে ক্রিয়া, অন্য-কিছু কামনা করেও সেই-সব মন্ত্র, সেই-সব ক্রিয়া ; কেবল কোনটা ব্রহ্মপুরাণের মতে, কোনটা বিষ্ণুপুরাণের মতে একটু-আধটু এদিক্-ওদিক করে'। সব কামনার এক ক্রিয়া, সব রোগের এক ওষুধ বা সব সিন্দুকের একই চাবি !

মেয়েলী-ব্রত বা খাঁটি ব্রত তা নয়। সেখানে কামনা যতরকম তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও তত-রকম। বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে এই কামনা

কাটা, তার মধ্যে বেলের ডাল-পোঁতা, পুকুর জল ঢেলে পূর্ণ করা, তারপর বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারিধারে ফুল-সাজানো এবং ছড়া বলে বেলের ডালে ফুল-ধরা—

"পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা ?
আমি সতী লীলাবতী,
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না" ইত্যাদি।

আবার যখন বৃষ্টির কামনা করে' বসুধারা ব্রত,' তখন আল্‌পনায় আট তারা আঁকতে হচ্ছে, একটি মাটির ঘটে ফুটো করে' বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে—এমনি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ কামনা জানাচ্ছে—

"গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকী
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী"।

হিন্দুধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন অদল-বদল হয়ে গিয়েছে যে, এখন যে-ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প, এবং দু-চারটি ছাড়া সেগুলিও খণ্ড-অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা পাই। বাংলার ব্রতগুলি কতক-কতক সংগ্রহ হ'তে আরম্ভ হয়েছে, সবগুলি সম্পূর্ণ আকারে এখনো সংগ্রহ ও প্রকাশ হবার অনেক দেরী, এবং অন্তঃপুরের জীবন-যাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই-সব ব্রত করবার এবং ব্রতগুলির অনুষ্ঠান ঠিকঠাক মনে রাখবার চেষ্টাও ক্রমে চলে গিয়েছে। এ অবস্থায় যা হচ্ছে তাতে খাঁটি-নকল সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ সবই আমরা গ্রহণ করতে চলেছি। ব্রতের আল্‌পনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই খাঁটি নক্সার মধ্যে মেকিও চলেছে। তেমনি ছড়াগুলির মধ্যেও হয়তো যেখানকার যা সেগুলো উল্টে কোথাও একছত্র নতুন, কোথাও এক ব্রতের ছড়া অন্য ব্রতে—এমনি সব কাণ্ড! এ ছাড়া নানাগ্রামের নানা অনুষ্ঠান, একই ব্রত এখানে এক-রকম ওখানে অন্য! এম্‌নি সব নানা জঞ্জালের মধ্যে থেকে খাঁটি ব্রতের চেহারাটির একটা আদর্শ বার করে' আনতে হ'লে শুধু এদেশের ব্রতগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে' ফল হবে না, পৃথিবীতে সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে ব্রত-অনুষ্ঠান কি ভাবে চলেছে তার ইতিহাসগুলিও দেখা চাই। আমাদের যা-কিছু সমস্তই আর্য্যদের দেওয়া, শিল্প-সাহিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই—এই ধারণাটার মূলে অনেকটা সত্যও যেমন আছে মিথ্যেও তেমনি রয়েছে। সূর্য্য আর্য্যদেরই দেবতা এটা আর এখন বলা চলেনা, আর্য্যেতর জাতি যাঁরা ভারত-বর্ষের এবং পৃথিবীর নানা দেশের আদিম অধিবাসী, তাঁরাও সূর্য্যকে উপাসনা কচ্ছেন দেখি। এদেশে ব্রতের ছড়া থেকে দেখা যাচ্ছে সূর্য্যকে 'রাঙ্গ' বা 'রায়' কিনা 'রাজা' অথবা রাউল বা রাওল কি না রাজপুত্র বলে ডাকা হচ্ছে। ইজিপ্তে সূর্য্যকে ডাকা হচ্ছে 'রা' বা রাআ, আবার সুদূর মেক্সিকোর অধিবাসী সূর্য্যকে ডাকছে 'রায়মি'! এবং এই সূর্য্যের নানা ব্রত সূর্য্যের উদয়-অস্ত ষড়ঋতুর মধ্যে দিয়ে তাঁর আনাগোনা নিয়ে নানা রূপক ও অনুষ্ঠান চলছে। মেক্সিকোর পুরাণ ও ইতিকথা থেকে এই অংশটুকু,—

"The most picturesque if not the most important solar festival was that of 'Citoc Raymi' (gradually increasing sun) held in June when nine days were given up to the ceremonial. A rigorous fast was observed for three days previous to the event, during which no fire was kindled. On the fourth day the Inca accompanied by the people en-masse proceeded to the great square of Cuzco to hail the rising sun, which they awaited in silence. On its appearance they greeted it with a joyous tumult, and, joining in procession marched to the Golden Temple of the Sun, where Llamas were sacrificed and a new fire was kindled by means of an arched mirror followed by sacrificial offerings of grain, flowers &c."

(The Myths of Maxico and Peru. Luis Spence)

এমনি আবার মা-লক্ষ্মীকে আমরা হিন্দুদেরই বলে জানি, কিন্তু মেক্সিকোরও এক লক্ষ্মী আছেন যিনি অনেকটা আমাদেরই লক্ষ্মীর মত। আবার ভেক মণ্ডুক বা বেঙ—কোন হিন্দুই তাঁকে দেবতা বলেন না, কিন্তু মেক্সিকোতে বেঙ হলেন জলদেবতার স্ত্রী এবং ঋগ্বেদে মণ্ডুক-দেবতার স্তব দেখতে

বশিষ্ঠ ঋষি) বৃষ্টিকামনা করে' এই মণ্ডুক সূক্ত উচ্চারিত হচ্ছে। নিরুক্ত বলছেন, বশিষ্ঠ বৃষ্টি কামনা করে' যখন পর্জ্জন্য-ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই সময়ে মণ্ডুক সকল পর্জ্জন্য-দেবতার সূক্ত পাঠের সময় ধ্বনি করে' আপনাদের অনুমোদন ঋষিকে জানিয়েছিল সেইজন্য বশিষ্ঠ সেই মণ্ডুকগণকে স্তুতি করলেন এই বলে—

(মণ্ডুকদেবতা। বশিষ্ঠঋষি)

১। সম্বৎসর ব্রতচারি স্তোতাদিগের ন্যায় (সম্বৎসর) শয়ান থাকিয়া (এখন) মণ্ডুক-গণ পর্জ্জন্যের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

৩। বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জ্জন্য যখন কামনাবান ও তৃষ্ণার্ত্ত মণ্ডুকগণকে জল দ্বারা সিক্ত করেন তখন পুত্র যেমন অখ্খল শব্দ করতঃ পিতার নিকটে গমন করে সেইরূপ এক মণ্ডুক অন্যের নিকট গমন করে।

৭। হে মণ্ডুকগণ! অতিরাত্র নামক সোমযাগে স্তোতাগণের ন্যায় সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ (সরোবরের) চতুর্দ্দিকে শব্দ করতঃ যেদিন প্রাবৃট সঞ্চার হইল সেইদিন চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি কর।

৯। নেতা মণ্ডুকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে, ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুকে হিংসা করেনা। সম্বৎসর পূর্ণ হইয়া বর্ষা আগত হইলে, গ্রীষ্মস্থ তাপপীড়িত মণ্ডুকগণ গর্ত্ত হইতে বিমুক্তি লাভ করে।

১০। ধেনুবৎ শব্দবিশিষ্ট মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, অজবৎ শব্দবিশিষ্ট

মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডুক আমাদিগকে ধনদান করুক। সহস্র (ওষধি) প্রসবকারী (বর্ষা-ঋতুতে) মণ্ডুকগণ অপরিমিত গো-প্রদান করতঃ আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধিত করুন। (ঋগ্বেদ-সংহিতা, শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত)

আমাদের লক্ষ্মীর মন্দিরে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা থাকেন, মেক্সিকোতে লক্ষ্মীপেঁচার -মন্দিরই ছিল যেটির নাম The Knue (Palace of Owls)!

ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্মতি, কোন ধর্ম্মবিশেষের কিম্বা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা-বিপর্য্যয় ঘট্‌তো সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রত-ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হ'ল ব্রত-পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সম-সাময়িক কিম্বা তারো পূর্ব্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেখা লেখা

আর্ট-স্কুলের ছাত্রদের প্রথম কাজ হচ্ছে, ভালো রেখা টান্‌তে শেখা। ভাষার প্রথম শিক্ষা যেমন বর্ণপরিচয়, শিল্পশিক্ষারও প্রথম ভাগ তেম্‌নি রেখা লেখা।

কিন্তু শিল্পের এই প্রথম কাণ্ডটি,—এই রেখাপাত করে' নক্‌সা লেখা, এতে রপ্ত হওয়া বড়ই শক্ত। প্রত্যেক শিল্পীই ছাত্রজীবনে সর্ব্বপ্রথমেই হাত-মক্‌স করতে নক্‌সা লিখ্‌তে বাধ্য হন; এবং এ-বিভাগে পূরো-দখল না-হ'লে তাঁরা বর্ণ-চিত্রের ক্লাশে প্রমোশন পান না। তবু, এতটা কড়াকড়ি সত্ত্বেও—প্রত্যেক শিল্পীই পয়লা নম্বরের নক্‌সা-লেখক (draughtsman) নন। এমন অনেক বিখ্যাত চিত্রকর এবং ভাস্কর আছেন যাঁরা উঁচুদরের ড্রইংয়ে খুব কম পটু। (এখানে বলে রাখা দরকার ড্রইং মানে নক্‌সা ছাড়া আমরা আর-কিছু ধর্‌ছি না।)

বিশেষ-করে' য়ুরোপীয় তৈলচিত্রের হাটে এই ড্রয়িং বা নক্‌সার আদর ভারি কম। যাঁরা তৈল-চিত্র আঁকেন তাঁদের মতে, নক্‌সাতে মোটামুটি একরকম দক্ষতা জন্মালেই শিল্পীর কাজ চলে যায়। ইংরেজ শিল্পী Collier ছাত্রদের শিক্ষা দিতে বসে দিব্যি সোজা-সুজি বলে দিয়েছেন, "In oil painting the original drawing may be clumsy, untidy, vacillating—in short, have every possible fault of execution" প্রভৃতি। (A Manual of Oil Painting, p. 5.) এর কারণ হচ্ছে এই যে, তৈল-চিত্রের পটে ভাল করে' নক্‌সা লেখা শিল্পীর পক্ষে মস্ত-একটা পণ্ডশ্রম

হয়, কেননা ছবিতে রং-মাখাবার সময়ে খুব-মন দিয়ে-আঁকা নক্‌সাও—মেঘের আড়ালে চাঁদের মত—ঢাকা পড়ে যায়। কাজেই নক্‌সা ভালো হোলো কি মন্দ হোলো তা নিয়ে শিল্পীরা মোটেই মাথা-ঘামাতে রাজি নন।

কিন্তু আমাদের প্রাচ্য চিত্রকলায় এটি হবার যো নেই। চৈনিক, জাপানী বা ভারতীয় চিত্র সাধারণত জলীয় রঙে আঁকা হয়। কাজেই, স্বচ্ছ জলের তলায় যেমন মৎস্যদের লীলা দেখা যায়, প্রাচ্য চিত্রের বর্ণ-আলিম্পনের তলা থেকে রেখার খেলাও তেম্‌নি দর্শকদের চোখের সাম্‌নে জেগে ওঠে। প্রতীচ্যের অনেক চিত্রকর অনভ্যাসের দরুণ নিখুঁত নক্‌সা আঁকৃতে পারেন না, কিন্তু প্রাচ্য চিত্রকররা একসঙ্গে রেখা আর রঙের জুড়ী চালিয়ে-চালিয়ে এমন হাত-দুরস্ত করে' ফেলেন যে, প্রতীচ্য এখানে প্রাচ্যের কাছে হার মান্‌তে বাধ্য! ছোট-বড় সমস্ত জাপানী ছবিতেই রেখার এই আশ্চর্য্য বাহাদুরি দেখা যায়। অজন্তার সুপ্রাচীন ভিত্তি-পটেও রেখা-কাব্যের মাধুর্য্য বড় অল্প নয়। মধ্য-যুগের মোগল-চিত্রে এবং আধুনিক যুগের ভারত-চিত্রেও কারু রেখার চারু মায়া-লেখা সকলকে মুগ্ধ করবে। বিশেষ-করে' গগনেন্দ্রনাথের স্পষ্ট, শক্তি-ব্যঞ্জক ও নিখুঁত রেখার টান এবং অবনীন্দ্রনাথের আধ-ফোটা চন্দ্রকলার মত বিলীয়মান, কোমল ও মৃদু রেখার স্বপ্ন-সুষমা সকলের প্রাণ-মন ভুলিয়ে দেবেই-দেবে। এই শিল্পী-ভ্রাতৃযুগলের রেখার ভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা হ'লেও একবিষয়ে এঁদের নক্সায় একটা মিল পাওয়া যায়। এঁদের হাতের



প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা



প্রাচীন জাপানী ছবির রেখা

রেখা অনেকসময়ে শরীরিণী ও ইঙ্গিতময়ী গীতি-কবিতার মত।

য়ুরোপের অনেক আর্টিষ্ট রেখাপাতে ভালোরকম কার্‌দানি দেখাতে পারেন-নি বটে; কিন্তু তাহ'লে কি হয়,—নক্সা-লেখাতেও সেখানে আবার এত-বেশী শিল্পী উৎকর্ষ লাভ করেছেন যে, এখানে তাঁদের নামাবলী দিতে গেলে 'ভারতী'র পূর্ণ-এক-সংখ্যায় কুলিয়ে ওঠা ভার। তাঁদের সকলকার নক্সা সূক্ষ্মতায় জাপানী ছবির সঙ্গে তুলনীয় না-হ'লেও, কল্পনা-বৈচিত্র্যে তাঁরা প্রাচ্য শিল্পীদের ছাড়িয়ে গেছেন।—কথাটা কঠোর বটে, কিন্তু অত্যন্ত সত্য।

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে রেখা-চিত্রের আদর বর্ণ-চিত্রের চেয়ে কম নয়। জার্ম্মানী রেখাচিত্রের জন্যে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যত-বেশী বিখ্যাত, তার বর্ণচিত্র ততটা-বেশী সুখ্যাতি অর্জ্জন কর্‌তে পারে নি। ষোড়শ শতাব্দীতে Dürer, নক্‌সা-লেখায় অদ্বিতীয় বলে য়ুরোপ যোড়া নাম কিনেছিলেন। এ-যুগে ফ্রান্সের মত, সে যুগে ইতালী শিল্প-সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেছিল। ইতালীর শিল্পীরা তখন আর্টের আর সব-দিকেই অধিক-অগ্রসর হয়েও Dürerএর এই রেখাচিত্রের কাছে মাথা হেঁট কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন। এমন-কি Compagnola ও Marcantonio প্রভৃতির মত অনেক ওস্তাদ-চিত্রকরও, Dürerএর নক্সার সুধু নকল নয়—চুরি-পর্য্যন্ত করতেও পিছ্‌পাও হন-নি! Martin Schonganer নামে আর-একজন জার্ম্মান শিল্পীর আঁকা নক্সা (Temptation of St. Anthony) দেখে

মাইকেল এঞ্জিলোর মত লোকেরও রীতিমত তাক্ লেগে গিয়েছিল!

কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে রেখা-চিত্রের আদর একরকম নেই বল্‌লেই হয়। খুব ধ্যাব্‌ড়া আর জ্যাব্‌ড়া করে' হরেক-রকম রং লেপে না-দিলে যে-দেশের লোক ছবিকে ভালো বল্‌তে নারাজ, সে দেশে নক্‌সার মত বর্ণহীন ছবির আদর হওয়াও শক্ত কথা বটে। আমরা—বাঙালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠজাতি বলে প্রসিদ্ধ এবং গর্ব্বিত; কিন্তু আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ যে প্রায় মাড়োয়াড়ীদের মতই চোতা আর ভোঁতা, তা না-মেনে আর উপায় নেই! তা-নইলে হাজার-হাজার বাঙ্‌লা গল্পের বইয়ে নিত্যই রেখাচিত্রের নামে যে বিষম কেলেঙ্কারী বেরুচ্ছে, আমরা অম্লানবদনে তা সহ্য করছি কি-করে'?... ...



মাইকেল এঞ্জিলোর নক্সা

বাঁধা দস্তুরের মোহ কাটাতে না-পার্‌লে আর্টিষ্টের পক্ষে ভালো নক্‌সা লেখা অসম্ভব। একটা চল্‌তি আদর্শ সাম্‌নে রেখে যাঁরা রেখাপাত করেন, তাঁরা নিতান্তই শিক্ষানবীশ। তৈল-চিত্রে এ-পদ্ধতিতে কাজ চলে যায় বটে, কিন্তু নক্‌সাতে এটি একেবারেই অচল্। কারণ, নক্‌সার মধ্যে ছোট-বড়, সরু-মোটা প্রত্যেক রেখার টানে এক-এক বিশেষ শিল্পীর বিশেষ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠা চাই;—"A drawing should be a personal expression"—হল্যাণ্ডের এক শিল্প-সমালোচক এই খাঁটি কথাটি বলেছেন, এবং এ কথাটি কোন রেখা-শিল্পীরই ভোলা উচিত নয়। যে-সব বড় শিল্পী রেখা-চিত্র এঁকে সুখ্যাতি পেয়েছেন, মন দিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে, তাঁদের প্রত্যেকের রেখাই প্রত্যেকের নিজের মতন। Rem-

brandtএর রেখা হচ্ছে ত্বরিত, বিচিত্র ও জীবন্ত; Dürerএর স্পষ্ট, সুনিশ্চিত ও ব্যাপকভাবদ্যোতক রেখা এথেকে ভিন্ন। আবার, Gainsboroughর অনায়াস ও স্বাভাবিক সুষমায় ভরা রেখাগুলি থেকে Watteauর সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজালের মত রেখাগুলি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। এম্‌নি Holbein, Leonardo da Vinci ও Michiel Angelo প্রভৃতি শিল্পী,—যাঁরা রেখা-চিত্রেও ওস্তাদ বলে বিখ্যাত,—এঁদের প্রত্যেকেই রেখার মধ্যে আপনাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে রেখে গেছেন। কিন্তু এঁরা যদি বাঁধা-দস্তুরের বাইরে পা না-ফেল্‌তেন, তাহলে এঁদের নক্‌সাগুলি বাজারের আর-পাঁচজনের আঁকা নক্‌সার মতই চল্‌তি ছবি হয়ে থাক্‌ত,—কারুর মনে বিশেষ ভাবে একটা নূতন ভাবের সংকেত দেগে দিতে পার্‌ত না।



রোদাঁর নক্সা

বর্ণচিত্রের চেয়ে রেখা-চিত্রের গুণ বোঝাও আরো শক্ত। বর্ণচিত্র একেই ত রঙ্‌চঙে হয়; তার-উপরে তাতে যে মাজা-ঘষা রূপ ও সম্পূর্ণতা থাকে, রেখা-চিত্রে তা আদৌ থাকে না;—সুতরাং জনকতক বাছা-বাছা সমঝ্‌দার ছাড়া নক্‌সার আসল গুণাগুণ আর-কেউ বুঝতে পারবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আমরা ফরাসী-দেশের প্রসিদ্ধ রেখা-শিল্পী Steinlenএর আঁকা "পান্থ" নামে ছবিখানি দিলুম।

... ... দীর্ঘ পথের কিনারায় কাঙাল দুই নরনারী। আর হাঁটতে না-পেরে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে রমণী মাঠের উপরেই অবশ হয়ে বসে পড়েছে;—দৃষ্টি তার দৃষ্টিহীন! পৃষ্ঠের বোঝা ও বার্দ্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়ে, বৃদ্ধ পুরুষটি যষ্টিতে ভর্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—চক্ষু তার সুদূরে বিক্ষিপ্ত। দুজনেরই শীর্ণ চেহারা ও জীর্ণ পোষাক তাদের কঠোর দারিদ্র্যের পরিচয় দিচ্ছে। বহু-দূরে—প্রান্তর-প্রান্তে হয়ত কোন্-এক ভোগবিলাসীর রম্য প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে—কিন্তু মানুষ হয়েও এই দুই অভাগা আজ মানুষের কাছ থেকে একটুও দয়া-মায়ার প্রত্যাশা রাখে না, তাই সেদিকে তারা ফিরেও দেখ্‌ছে না।

সাধারণের চোখে দেখ্‌লে, এ নক্সা-খানিতে সুখ্যাতি করবার কিছুই পাওয়া যাবে না। ছবিখানি সম্পূর্ণ নয়, অনেক

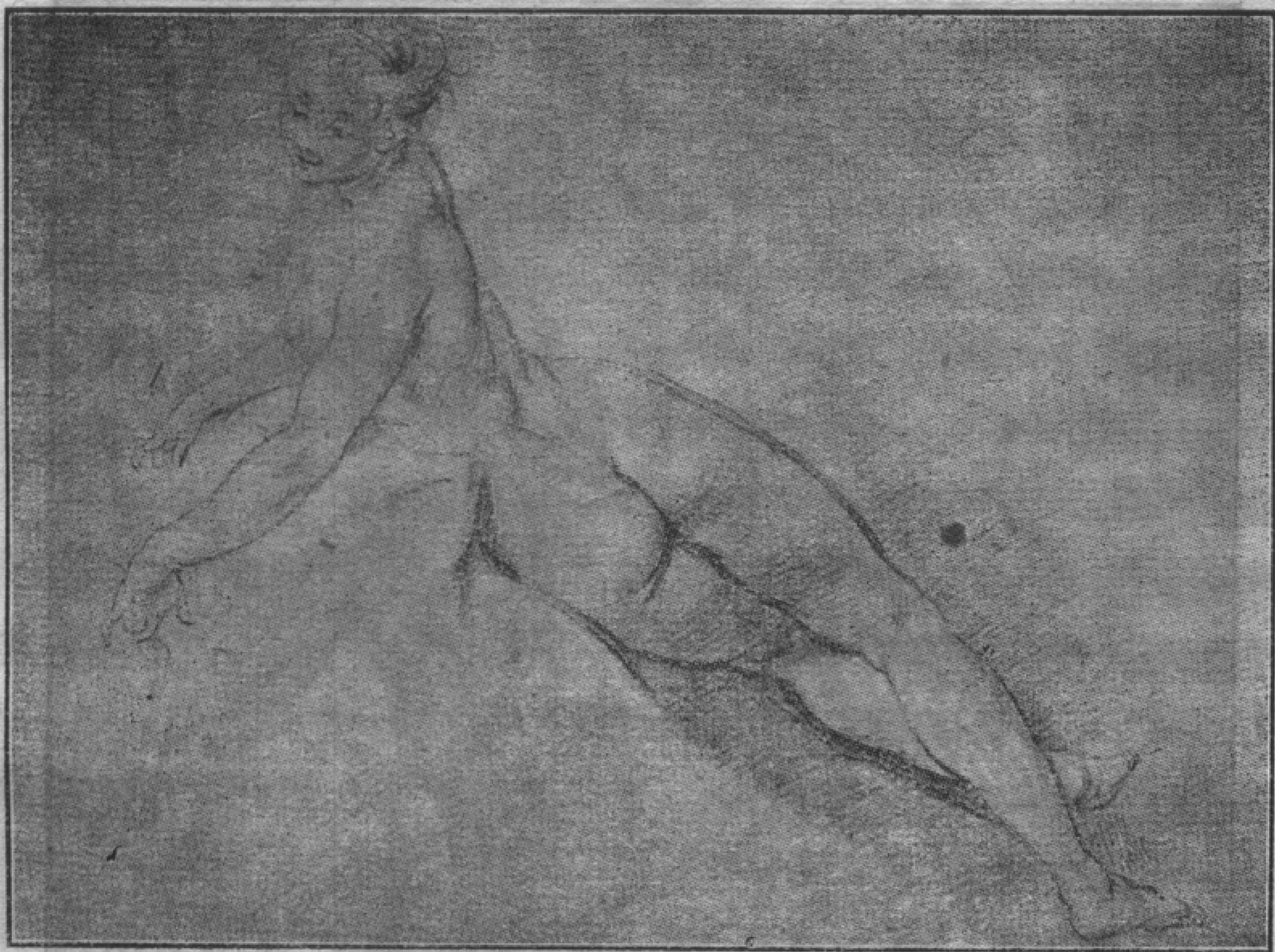


পান্থ

জায়গাই কেবল ইঙ্গিত দিয়েই সারা হয়েছে —সবটা এঁকে দেখানো হয়-নি; লাইনগুলিও সূক্ষ্ম ও সুন্দর নয়—অনেকটা ঠিক হিজিবিজির মতই! কাজেই, সকলে একে ছেলেমানুষের হাতের 'কাকের ছানা বকের ছানা' বলে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইবেন।

কিন্তু যিনি বোঝ্‌দার, তিনি দেখ্‌বেন, সম্পূর্ণতার চেয়ে ইঙ্গিতে বক্তব্য বিষয় ফোটানো যখন অধিক-কঠিন, তখন শিল্পী এখানে যথার্থ আর্টিষ্টের কাজই করেছেন। ছবির রেখা এখানে কেন যে সূক্ষ্মসুন্দর নয়, কলারসজ্ঞ তাও অনায়াসে বুঝ্‌তে পারবেন। সুধীর, সুশ্রীর, বিলাসীর ছবি আঁক্‌বার সময়েই নক্‌সার রেখা হয় সূক্ষ্ম, সুন্দর ও কোমল; কিন্তু শোক-দুঃখ-হাহাকারের ছবি, ভগ্নজীবনের অশ্রুসজল 'ট্র্যাজেডী',—অসমান, কর্কশ ও ভাঙা-ভাঙা রেখাপাতেই ফোটে ভালো।

সাহিত্যেও ওস্তাদ-লেখকরা আর্টের এই গুপ্তকথাটি অনেক স্থলেই ব্যক্ত করে' দিয়েছেন। কঠিনকে তাঁরা কোথাও কোমল ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন-নি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হেমচন্দ্রের "কূর্ম্ম-কমঠী কূট উর্ম্মিতে



ফরাসী-শিল্পী বুশে'র নক্সা

লট্‌পট্‌" প্রভৃতি পংক্তি এবং রবীন্দ্রনাথের "বৈশাখ" প্রভৃতি স্মরণ করুন।)

উপরে যে ইঙ্গিতের কথা বলেছি, রেখাচিত্রে তার সার্থকতা যতদূর হ'তে হয়। একখানি ছবির সমস্তটা এঁকে দেখালে তা চোখের উপরেই সম্পূর্ণ হয়ে জেগে ওঠে;—গুণী দর্শকের কল্পনা তা-থেকে কোন খোরাক্ পায় না। কিন্তু কোন বিষয়ের একটুখানি ইঙ্গিতমাত্র দিলে, চিত্রকরের অসম্পূর্ণতা দর্শককেই সম্পূর্ণ করে' নিতে হয়—এখানে যাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ভাব্‌বার ক্ষমতা যতটা-বেশী, ছবির রস আপন-আপন যোগ্যতা-অনুসারে তিনি ততটা বেশী উপভোগ কর্‌তে পারেন। নক্সাতে সম্পূর্ণতার চেয়ে ইঙ্গিত (Suggestion) অনেকসময়ে বেশী ফলপ্রদ হয় কেন, একজন জার্মান-শিল্প-সমালোচক তার আর-একটি উত্তর দিয়েছেন;—

"We are fully aware of the fact that often an apparently slight sketch embodies more genuine knowledge of natural forms than one has seen compassed by careful drawings, the "solidity" of which approximates them dangerously near to, what might be called, the "photographic" style of execution."

সম্পূর্ণ ছবি আঁক্‌লে শিল্পী সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হ'তে পারেন; কিন্তু ইঙ্গিত-প্রধান চিত্রের আদর কেবল দু'দশজন ভাবুক দর্শকের কাছে। ভারতীয় চিত্র-কলা-পদ্ধতি

অনেকস্থলেই এম্‌নি ইঙ্গিতপ্রধান বলেই Majority তাতে সাড়া দিচ্ছে না।

আর এইজন্যেই রেখাচিত্র বোঝা বড় শক্ত কথা। এমন এক সময় গিয়েছে, যখন রেমব্রাণ্টের মত প্রতিভাবানের অঙ্কিত নক্সাকেও লোকে তুচ্ছ করে' উড়িয়ে দিত। যদিও সেদিন আর নেই, তবু রেমব্রাণ্টকে সকলে কি এখনো বুঝতে পারেন? ব্রিটিস মিউজিয়ামে রেমব্রাণ্টের একখানি নক্সা আছে, তার বিষয়, 'দুটি রমণী একটী শিশুকে হাঁটতে শেখাচ্ছেন'। এই নক্সাখানি কিন্‌তে একজন ধনকুবের অনেক টাকা খরচ করেছিলেন। এ ছবির রেখাগুলি আশ্চর্য্যরকমের জীবন্ত,—দেখলেই মনে হয়, রমণীদুটির রেখায়-আঁকা মূর্ত্তি যেন জ্যান্ত মানুষের মতই নড়্‌ছে আর সেইসঙ্গে শিশুটিও যেন সত্যসত্যই ক্ষুদে মাতালের মত টলে-টলে চল্‌তে শিখছে! কিন্তু সাধারণ দর্শকরা তবু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, এই সামান্য গুটিকতক আঁচড়ের মত রেখার জন্য একজন কোটিপতি খাম্‌কা কেন অতগুলো টাকা বাজেখরচ কর্‌লেন! মেয়ে-দর্শকরা হয়ত ভাববেন, 'ঐ টাকায় স্ত্রীর গলায় একছড়া মুক্তোর মালা গড়িয়ে দিলে তবু যা-হোক একটা দেখ্‌বার মত জিনিষ হোত!'

ললিতকলা জীবনের যাত্রাপথে বসে হাতেনাতে কাজ-কর্ম্ম করতে পারে না। সংসারী মানুষ অকেজো জিনিষের 'পরে হাড়ে-হাড়ে চটা। শিল্পী ও কবি তাই দুনিয়ার কাজের হাটে অপদার্থ নাম কিনেছেন।

শ্রীঃ—

উন্‌পাঁজুরে

আমার বয়স কত জানো?... ... আট-বছর! কিন্তু বয়স শুনেই তোমরা যেন মুখ বেঁকিয়ে বোসো না—কারণ, আমি কম-বয়সেই ভারি চালাক ছেলে! লোকে তাই বলে, আমি নাকি এঁচড়ে-পাকা!

কিন্তু চালাক ছেলেদেরও যে ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করে' মর্‌তে হয়, এ দুঃখু আমার রাখ্‌বার ঠাঁই নেই। লেখাপড়ার সময়ে আমার চালাকি একেবারেই খাটে না। এই ভাবনা কেন, কাল সকালবেলায় একটু ফূর্ত্তি করে' লাট্টুতে সবে লেত্তিটি জড়াতে সুরু করেচি, আর অম্‌নি কিনা ধাঁ-করে' দাদা এসে আমার কাণ মলে লাট্টু কেড়ে নিলে! আচ্ছা বাবা, আমারও দিন আস্‌বে; দাঁড়াও না, আগে আর-একটু বড়সড় হই, তখন দাদার দাদাগিরি ফলানো বার করে' দেব!.. ...বড় হয়ে আমি দিন-রাত খালি মার্ব্বেল খেল্‌ব, লাট্টু ঘোরাব আর ঘুঁড়ি ওড়াব! মা, বাবা, দাদা কারুর কথা শুন্‌ব না—বক্‌লে-টক্‌লে বল্‌ব, আমি এখন বড় হয়েচি, বুড়ো-মিন্‌সের আবার পড়া-শুনো কি!

বড় হয়ে কিন্তু আর-একটা কাজ করতেই হবে! আমাদের ছিদামের মত একটা মণিহারীর দোকান না-কর্‌লে ত কিছুতেই চল্‌বে না! ছিদামটা হচ্ছে পাজীর পা-ঝাড়া —তার কাছে কিছু কিন্‌তে গেলেই হতভাগাটা পয়সা চেয়ে বসে! এটুকু বুদ্ধি তার মাথায় নেই যে, আমি হলুম গিয়ে ছেলে-মানুষ, পয়সা-টয়সা কোথায় পাব! হ্যাঁ, বড় হয়ে আমাকে একটা মণিহারীর দোকান কর্‌তে হবেই-হবে! তাতে টিনের বাঁশী, ভেঁপু, মস্তমস্ত কাঠের ঘোঁড়া, হাজার হাজার রাঙা-টুক্‌টুকে লাঠি, বস্তা-বস্তা রজক্লুস্‌, ব্যাটম্বল, ফুটবল এই-সব থাক্‌বে। আমার যখন যেটা খুসি হবে সেইটেই নেব, ছিদাম দাম চাইতে এলে মার্‌ব ব্যাটাকে এক থাব্‌ড়া—চোখ রাঙিয়ে বল্‌ব, আমার দোকান, আমি নিচ্ছি, তুই পয়সা চাইবার কে রে ইষ্টুপিড্‌? ছিদাম তখন আচ্ছা জব্দ হয়ে মুখখানি চুণ করে' চলে যাবে—ওহো, কি মজা!...

এই-সব ভাবচি, এমনসময় দাদা এসে চোখ পাকিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ রে হরে, বাঁদরের মত হাঁ-করে' বসে-বসে কড়িকাঠ গোনা হচ্চে বুঝি?"

দাদার দিকে আমি রেগে-মেগে কট্‌মট্‌ করে' তাকালুম।

দাদা সাম্‌নের চেয়ারখানা জান্‌লার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বসে বল্‌লে, "হনুমানের মত আবার চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌চিস্‌ কি? দেব এক্ষুনি চোখে প্যাট্‌ করে' ছুঁচ্‌ বিঁধিয়ে! নে, নে, চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ কর্‌!"

খানি যে থির্‌ হয়ে বসে থাক্‌ব, তার যোটি নেই! খালি পড়্‌, পড়্‌, পড়্‌! কেন, পড়ে কি আমার চার্‌টে হাত বেরুবে?

কি আর করি, মার খাবার ভয়ে সুড়্‌-সুড়্‌ করে' টেবিলের কাছে গিয়ে চাণক্য-শ্লোক পড়্‌তে বস্‌লুম। এক জায়গায় লেখা রয়েছে—

"অতএব কিবা পুত্র কিবা ছাত্রগণে
না দিবে আদর সদা রাখিবে শাসনে।"

দাদা মস্ত মুরুব্বির মত মাথা নেড়ে পা নাচাতে-নাচাতে বল্‌লে, "শুন্‌চিস্‌ ত হরে, চাণক্যের মত অত-বড় পণ্ডিত কি বল্‌চেন! এই সব বুঝে-সুঝে ঠাণ্ডা হয়ে পড়াশুনো কর্‌—নৈলে তোর পিঠের ছাল-চাম্‌ড়া আর আস্ত থাক্‌বে না! শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌?"—এই বলে দাদা পাখার বাঁটটা দিয়ে ঠকাং করে' আমার পিঠের ওপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে।

মার খেয়ে-খেয়ে আমার পিঠখানা গরুর গাড়ীর গরুর মত এম্‌নি শক্ত হয়ে গেছে যে, পাখার বাঁটের অমন এক-আধ ঘায়ে আমার কিছু আসে-যায় না!... ... কিন্তু এই চাণক্য লোকটা কে? তার ওপরে আমার এম্‌নি রাগ হচ্চে! আমি যখন বড় হব, আমার গায়ে যখন জমিদার-বাবুদের দরোয়ান রঘুবীর পাঁড়ের মত খুব জোর হবে, তখন যদি এই চাণক্য-পণ্ডিতের একবার দেখাটি পাই, তাহলে আর ছেড়ে কথাটি কইব না—একেবারে তার মাথা থেকে টিকিটি ধরে, পটাস্‌ করে' উপ্‌ড়ে নেব!

দাদা আমার দিকে পিছন ফিরে বসে

মানেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না—কিন্তু কথাগুলোর কতক-কতক মনে আছে—

"রয়ে রয়ে কেন তার মুখ মনে পড়ে,
ও মেঘেরি বারি বিনে চাতকিনী প্রাণে মরে।

… … … …

এই লও তীক্ষ্ণ ছুরি, হান মম বক্ষোপরে,
নিভে যাক্ আঁখিতারা হেরিতে হেরিতে তোরে!"

—মাথা নাড়তে-নাড়তে টেবিল বাজিয়ে দাদা গান গাইতে লাগল, আমিও জিভ্ বার করে' তাকে ভ্যাংচাতে লাগলুম! দাদা আমাকে দেখ্তে পাচ্ছিল না, কাজেই কিছু বুঝ্তেও পার্লে না। কেমন জব্দ!

হঠাৎ দাদা ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাইরের দিকে চেয়ে কি দেখ্তে লাগ্ল। তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লে, "হরে, তুই এইবার কথামালা পড়্—আমি ততক্ষণ বাইরে থেকে একবার চট্-করে' ঘুরে আসি।"

লক্ষীছেলের মত ঘাড় গুঁজে আমি 'কথামালা' পড়্তে লাগলুম। "এক সিংহ, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; সুতরাং তাহার আহার বন্ধ হইয়া আসিল। * * * * এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত গুহার দ্বারে উপস্থিত হইল। * * * * সিংহ, শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিল, "কেও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল! আইস ভাই আইস; আমি ভাবিতেছিলাম—"

দাদা তাড়াতাড়ি চলে গেল—আমারও অমনি বামুন গেল ঘর ত লাঙল তুলে ধর্! বইখানা ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দিয়ে ভাবতে লাগলুম, দাদাটা গেল কোথায়? এই ঠিক দুপুরবেলা, রোদ কর্‌চে ঝাঁ-ঝাঁ, এটা ত আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাবুর মত বেড়াবার সময় নয়! অথচ দেখ্‌ছি দাদা বাঁশবাগানটা ঘুরে ডানদিকের পথ ধরে কোথায় চলে গেল!… … …ভাব্‌তে-ভাব্‌তে দাদার মৎলব্‌টা ঠিক এঁচে ফেল্‌লুম—আমি কম-বয়সেই খুব চালাক ছেলে কিনা! হুঁঃ, এ আর কিছু নয়, মুকুয্যেদের বাগানে বড়-বড় বাতাবি লেবু হয়েছে, দাদা নিশ্চয় সেই লেবু চুরি কর্‌বার ফিকিরে আছে! ঐ লেবুগুলোর ওপরে আমারও খুব নজর ছিল; কাজে-কাজেই আমি যে হাঁদা-গঙ্গারামের মত বসে-বসে পড়া মুখস্থ করে' মর্‌ব, আর দাদা বেড়ে মজা করে' লেবু পেড়ে-পেড়ে খাবে, তা কিছুতেই হ'তে পারে না! আমাকেও দেখ্‌তে হ'ল—দু'-একটা লেবুতে যদি আড়াল থেকে ছোঁ লাগাতে পারি!

চট্‌পট্ উঠে পড়ে তখনি দাদার পেছু নেওয়া গেল। বাঁশবাগানের মোড় ফির্‌তেই পুকুরের ধারে, একটা পেয়ারা-গাছের তলায় দাদাকে দেখ্‌তে পেলুম। সুধু দাদা নয়—তার সাম্‌নেই পটলি-দিদিও চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে!

*পটলি-দিদি আমাদের গাঁয়ের যদুজ্যাঠা-মশায়ের মেয়ে! ওরা আমাদেরই জাত্—ওদের বাড়ীতে আমরা খুব যাওয়া-আসা করি বলে পটলি-দিদির বাপকে আমি জ্যাঠামশাই বলে ডাকি। শুনেছি পটলি-দিদির সঙ্গে আমার দাদার বিয়ের সমন্দ হচ্চে।

কিন্তু পটলি-দিদি অমন চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে কেন? দূর থেকেই দেখ্‌তে

পেলুম, দাদা কি যেন বল্‌চে, আর পটুলি-দিদি তাই শুনে মাথা হেঁট্ করে' ফিরে দাঁড়াচ্চে। ও, বুঝেছি, পটুলি-দিদি নিশ্চয় আমাদের গাছ থেকে পেয়রা চুরি করে' খাচ্ছিল, আর তাই দেখ্‌তে পেয়ে দাদা তাকে ধম্‌কাচ্ছে! ঐ যে, পটুলি-দিদির হাতে আধখানা পেয়রা রয়েছে!

একটা কৃষ্ণকলির ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে বসে, আমি তাদের রকম-সকম দেখতে লাগ্‌লুম। পাছে দাদা আমাকে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে আমি মাথাটা নীচু করে' বসে রইলুম।

খানিক পরেই দেখি, দাদা ভয়ে-ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে কি দেখ্‌লে—তারপর কর্‌লে কিনা—আস্তে আস্তে পটুলি-দিদির হাত না ধরে টপ্ করে' তার মুখে একটা চুমু খেয়ে নিলে! পটুলি-দিদি অম্‌নি দাদার হাত না ছাড়িয়ে, নিজেদের বাড়ীর দিকে দে-ছুট্ ত দে-ছুট্!

ও হরি, চুমু খাওয়া? কম-বয়সেই আমি বেজায় চালাক কিনা,—কাজেই মেয়েমানুষের মুখে ব্যাটাছেলের চুমু খাওয়া যে ভারি খারাপ, সেটা জান্‌তে আমার বাকি ছিল না! দাঁড়াও দাদা, মজাটা টের পাওয়াচ্চি—ভারি যে আমাকে মার্-ধর্ করা হয়, এবার কে আমাকে মারে একবার দেখে নেব!

দাদা আবার বাড়ীর দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল—আমিও লুকিয়ে-লুকিয়ে উঠে, সেখান থেকে একছুটে একদম বাড়ীতে এসে হাজির! দাদাকে আজ আমার হাতে মুঠোর ভিতরে পেয়েছি বলে প্রাণটা যেন আহলাদে আটখানা

তাড়াতাড়ি 'কথামালা'-খানা টেনে নিয়ে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে 'সর্প ও কৃষকে'র গল্পের একটা জায়গা পড়্‌তে লাগ্‌লুম, "কৃষক দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে বলিল, অরে ক্রূর, তুই অতি কৃতঘ্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়া করিয়া, গৃহে আনিয়া, আমি তোর প্রাণরক্ষা করিলাম; তুই সে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে উদ্যত হইলি।—"

দাদা আস্তে-আস্তে ঘরে এসে ঢুক্‌ল। আমি আড়্-চোখে চেয়ে দেখ্‌লুম, দাদা ভারি হাঁপাচ্চে। একবার আমার দিকে তাকিয়ে দাদা আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বস্‌ল। আমিও অম্‌নি বইখানা মুড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

দাদা বল্‌লে, "কিরে, উঠ্‌লি যে?"

আমি দরজার দিকে এগুতে-এগুতে বল্‌লুম, "পড়্‌তে আর ভালো লাগ্‌চে না!"

—"কী! পড়্‌তে তোর ভালো লাগ্‌চে না?"

আমি ঘাড় নেড়ে বল্‌লুম, "নাঃ!"

—"আবার 'না'! নবাব-বাহাদুর হয়েচিস্ দেখ্‌চি যে! ঘুসি মেরে দাঁত ভেঙে দেব, জানিস্?"

আমিও রেগে-মেগে বল্‌লুম, "ওঃ, ঘুসি অম্‌নি মার্‌লেই হ'ল কিনা! দাঁড়াও-না, আগে মাকে গিয়ে সব বলে দিয়ে আসি, তারপর তুমি ঘুসি খাও কি আমি ঘুসি খাই দ্যাখা যাবে!"

দাদা মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এসে বল্‌লে, "মাকে গিয়ে বল্‌বি? আমাকে আবার ভয় দ্যাখানো হচ্চে?"—বলেই আমার একটা

—"কাণ ছাড়ো বল্‌চি দাদা, নইলে মার কাছে গিয়ে এখনি বলে দেব যে, দাদা পেয়রাগাছের তলায় গিয়ে—"

আমার মুখের কথা মুখেই রইল—সব কথা শোন্‌বার আগেই দাদা চম্‌কে আমার কাণ ছেড়ে দিলে,—তার মুখ ভয়ে শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল!

আমি আজ দাদার সাম্‌নে এই প্রথম বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ফিক্‌-ফিক্‌ করে' হাস্‌তে লাগ্‌লুম্‌।

দাদার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথাই বেরুল না। অনেকক্ষণ পরে খুব চুপিচুপি দাদা বল্‌লে, "হরি, কি বল্‌ছিলি ভাই?"

—"কী আবার বল্‌ছিলুম! পটলি-দিদিকে চুমু খাওয়ার কথা বল্‌ছিলুম! এখন—"

তাড়াতাড়ি দু-হাতে আমার মুখ চেপে ধরে দাদা বলে উঠ্‌ল, "চুপ্‌, চুপ্‌! অত চ্যাঁচাস নে ভাই, সবাই শুন্‌তে পাবে যে!"

—"কেন, তুমি যে বড্ড মার্‌বে বল্‌ছিলে! এখন মার-না দেখি!"

—"সে কি ভাই, আমি কি তোকে সত্যি-সত্যিই আর মার্‌তুম হরি, আমি যে ঠাট্টা কর্‌ছিলুম!"

—"তোমার ও-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, আর ও-রকম ঠাট্টা কর্‌ব না। কিন্তু তুই ভাই মাকে আর বাবাকে কি আর-কারুকে কিছু বলিস্‌-নে যেন! লক্ষ্মী মাণিক আমার!"

—"বেশ, তা যেন বল্‌ব না! কিন্তু তুমি আমাকে কি দেবে বল?"

—"কি নিবি বল্‌! টাকা নিবি, টাকা? নিবি? এই নে! যা, খেল্‌না কিন্‌-গে যা—আমি আর তোকে বক্‌ব না!"

ছোঁ-মেরে দাদার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে আমি আগে একটা ডিগবাজি খেয়ে নিলুম। তারপর উঠেই তখনি ছিদামের দোকানে দৌড়লুম। মস্ত একটা বোমা-লাটাই, ক'-কাটিম কাকের ডিমে মাঞ্জা-দেওয়া সুতো আর অনেকগুলো দো-ঘয়লা ঘুঁড়ি—টাকা দিয়ে আজ এই-সব কিন্‌তে হবে!

... ...

তারপর থেকে দাদার কাছ থেকে প্রায়ই টাকাটা-সিকিটা আদায় কর্‌তুম। আমি হাত পাত্‌লে দাদা আর না-বল্‌তে ভরসা পেত না! বাবা আমাকে দাদার হাতে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্তি, এদিকে দাদা যে আমার হাতের মুঠোয়, সে খোঁজ কেউ পেলে না! পড়াশুনোও আমাকে আর বেশী কর্‌তে হয় না—যখন-খুসি পড়্‌তে বসি, যখন-খুসি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াই, ঘুঁড়ি ওড়াই, লাট্টু ঘোরাই আর মনের সুখে ডিগ্‌বাজি খাই! দাদা-বেচারী জুল্‌-জুল্‌ করে' আমার দিকে তাকিয়ে গুম্‌ হয়ে বসে থাক্‌ত—মনে-মনে সে যে আমার ওপরে ভয়ানক চটে আছে, বাগে পেলে সে যে আমার মুণ্ডুটা এক্ষুনি কড়্‌মড়িয়ে চিবিয়ে খায়, এ আমি তার মুখ দেখে বেশ বুঝ্‌তে পারি!

এদিকে সেই কথাটা মা-বাবাকে বলে দেবার জন্যে আমার মুখ যেন নিস্‌পিস্‌ কর্‌তে থাক্‌ত! কিন্তু আমারও কিছু বল্‌বার যো নেই, কারণ এখন যদি আমি পেটের কথা ফাঁস করে' ফেলি, তাহলে আর কি

আমার রক্তে আছে? সব জানাজানি হয়ে গেলে, দাদার ভয় একবার ভেঙে গেলে, আমাকে বিষম মুস্কিলে পড়্‌তে হবে! আমি কম-বয়সেই ভারি চালাক ছেলে কিনা, কাজেই এটুকু বুঝ্‌তে আমার একটুও দেরি লাগ্‌ল না।

তবু একদিন প্রায় বলে ফেলেছিলুম আর কি! সেদিন দাদা, আমি আর বাবা একসঙ্গে খেতে বসেচি, মা পরিবেশন কর্‌চেন।

হঠাৎ আমার মাথায় কি খেয়াল ঢুক্‌ল, আমি বলে ফেল্‌লুম, "মা, পেয়রা-গাছের তলায় সেদিন কী মজাটাই হয়েচে!"

মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কি হয়েচে রে?"

—"পট্‌লি-দিদিকে দাদা—"বল্‌তে-বল্‌তে আমি থেমে গেলুম। দাদার মুখ তখন ভয়ে আর রাগে কেমন-একরকম হয়ে উঠ্‌ল!

মা বল্‌লেন, "থাম্‌লি ক্যান্ রে হবে, কি বল্‌ছিলি বল্‌না!"

কম-বয়সেই আমি খুব চালাক বলে, ধাঁ-করে' কথাটা ঘুরিয়ে নিলুম।:—"পট্‌লি-দিদি আমাদের গাছ থেকে পেয়রা চুরি করে' খাচ্ছিল, দাদা তাকে ধরে ফেলেচে!"

মা হাস্‌লেন, বাবা হাস্‌লেন, দাদা নিশ্বেস ফেলে বাঁচ্‌লেন।

... ...

এর-মধ্যে একদিন দাদার সঙ্গে পট্‌লি-দিদির খুব ঘটা করে' বিয়ে হয়ে গেল।... ...

বিয়ের দিন-পাঁচেক পরে, দাদা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়্‌চে, আমি গিয়ে বল্‌লুম, "আমাকে গোটা-ছয়েক টাকা দিতে হবে দাদা!"

খিঁচিয়ে উঠে বল্‌লে, "টাকা গাছের ফল পেয়েচিস্, না? বেরো এখানে থেকে!"

অনেকদিন পরে দাদা ফের আমার সঙ্গে চড়া-গলায় কথা কইলে! আমিও গরম হয়ে বল্‌লুম, "আমি পায়রা কিন্‌ব, টাকা দেবে ত দাও বল্‌চি!"

দাদা খবরের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "তুই কি ভেবেচিস্ বল্ দেখি হরে? আমাকে তোর গোলাম পেয়েচিস্ শুয়োর?"

দাদার জোর-জোর কথা শুনে আমার হাড় যেন জ্বলে গেল! আমিও তেরিয়া হয়ে বল্‌লুম, "টাকা দেবে না তাহলে?"

—"তবে রে রাস্কেল! খালি খালি শাসানো?"—এই বলেই দাদা দুম্ করে' আমার পিঠে এক বোম্বাই কিল বসিয়ে দিলে!

কিল খেলে যে-রকম করে' চ্যাঁচাতে হয় তেম্‌নি করে'ই চেঁচিয়ে আমি বলে উঠ্‌লুম, "কী! আবার কিল মারা? আমি এই চল্লুম মার কাছে সেই কথাটা বল্‌তে!"

—"যা, বল্-গে যা উল্লুক, বল্‌গে যা, তোকে আমি আর থোড়াই কেয়ার করি!"—বল্‌তে-বল্‌তে দাদা আমার পিঠের ওপরে দু-হাতে ক্রমাগত ঘুসি আর চড় মার্‌তে লাগ্‌ল।

আমি রাগের আর মারের জ্বালায় অস্থির হয়ে, একছুটে মার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লুম। মা আর বাবা দুজনে বসে কি কথা কইছিলেন, আমি চেঁচিয়ে ঘর ফাটিয়ে বল্‌লুম, "মা, মা, দাদা আমাকে মেরেচে!"

—"কিছু না মা! দাদা পটুলি-দিদিকে চুমু খেয়েছিল, সেই কথা আমি তোমাদের বলে দেব বলাতে দাদা আমাকে—"

বাবার দিকে তাকিয়ে মা তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন, "থাম্ হতভাগা, থাম্,—ও-সব কথায় তোর দরকার কি? এমন উন্‌পাঁজুরে ছেলেও ত কোথাও দেখি-নি বাপু!"

বাবা আমার কাণ মলে দিয়ে বল্‌লেন, "পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার! এখনি থেকে এঁচড়ে পেকে উঠ্‌চ? দূর হ, দূর হ!"

হতভম্ব হয়ে সেখান থেকে চলে এলুম।... ...

অনেক ভাবলুম। কিন্তু কম-বয়সে আমি এত-বেশী চালাক হয়েও, এটা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলুম না যে, দাদার ভয়টা হঠাৎ ভেঙে গেলই-বা কেন, আর চুমু-খাওয়ার কথা শুনে মা বাবা উল্টে আমাকেই-বা ধমক দিলেন কেন?... ... ...আচ্ছা, আচ্ছা, এখন না-পারি দুদিন পরেই সব সম্‌ঝে নেব—এ-সব কথা হয়ত বড় না-হ'লে বোঝা যায় না! *

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতা

যে সকল বৈষয়িক ও নৈতিক উপাদানের সমবায়ে কোন সভ্যতা গড়িয়া উঠে, তাহা একই ক্রমবিকাশের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ এবং একই ক্রমবিকাশের অনুসরণ করে। কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট যুগে, কোন জাতির বা লোকসমূহের মধ্যে যে সকল প্রবণতা থাকে, সেই সকল প্রবণাতাই আবার তাহাদের পরিবারের মধ্যে, সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে, আচার-ব্যবহারের মধ্যে, বিধিব্যবস্থার মধ্যে, শাসন-তন্ত্রের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, শিল্পকলার মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে, শ্রমশিল্পের মধ্যে, কৃষি-বাণিজ্যের বিবিধ শাখার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই সকল প্রবণতার ক্রমাগতই অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন হয়; কারণ যুগধর্ম্ম ও নূতন নূতন ঘটনা, লোকের ও জাতির চরিত্রেও ক্রমাগত অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। অবশ্য, কোন বিশেষ ধরণের মানসিক প্রবণতা কোন বিশেষ বুদ্ধি-বৃত্তির প্রতিকূল হইতে পারে, কোন বিশেষধরণের সাধারণ মনোভাব, চরিত্রগত কোন বিশেষ গুণের অন্তরায় হইতে পারে কিংবা কোন বিশেষ গুণকে বিকৃত করিতে পারে; কিন্তু সকলেই একই পরিমাণে

---

* এই গল্পে আন্তন শেখভের যৎসামান্য ছায়া আছে। এই যৎসামান্য ছায়াকে কেউ যেন অসামান্য কায়া বলিয়া ভাবিবেন না। লেখক

সেই বিশেষ প্রবণতা ও মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি সর্ব্বপ্রধান প্রবণতা কি? একটি—যৌক্তিকতা (rationalism) এবং আর-একটি স্বাভাবিকতা (naturalism)। এই দুই প্রবণতা মহাকাব্যেরও প্রতিকূল, গীতি-কাব্যেরও প্রতিকূল; তাই ঐ শতাব্দীতে, ঐ দুই শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যে নিতান্ত মাঝারি ধরণের রচনা বাহির হইয়াছে। ঐ যুগে যে সকল রচনা বাহির হইয়াছে—যথা Henriade, La Pucelle, ভল্‌টেয়ারের হাল্কা ধরণের কবিতা, রুসো ও Parny-র গীতিকবিতা—সে সমস্তই যুক্তিবাদমূলক কিংবা উচ্ছৃঙ্খল স্বভাববাদমূলক। সেইরূপ আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, অবরোহণ-পদ্ধতি অনুসারে এবং কতকগুলি সাধারণ প্রতীতি অনুসারে চলিয়াছে; পক্ষান্তরে ঊনবিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞান, আরোহণ-পদ্ধতি ও পরীক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছে। এইজন্যই ঊনবিংশতি শতাব্দীর পূর্ব্বে বৈষয়িক সভ্যতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাব অল্পই লক্ষিত হয়; ঊনবিংশতি শতাব্দী, বৈষয়িক সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। সেইরূপ আবার সভ্যতার বিভিন্ন রূপের সহিত, শাসন-তন্ত্রের প্রত্যেক রূপের মিল আছে; এবং কোন বিশেষ অঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্য, তত্রত্য অধিবাসীদিগের দৈহিক ও নৈতিক গুণসমূহ,—মানব-ক্রমবিকাশের কোন এক সময়ে, কোন জাতির প্রাধান্য যেমন একদিকে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করে সেইরূপ আবার অন্য এক সময়ে দ্রুতবেগে

সমসাময়িক ভারতের বৈষয়িক সভ্যতার মধ্যে আমরা সেই একই লক্ষণ সকল দেখিতে পাই যাহা ভারতের নৈতিক সভ্যতার আলোচনায়, আমাদের চোখে ঠেকিয়াছিল—সেই ইতস্তত ভাব, সেই গোলযোগ, সেই লৌকিক আচার-ব্যবহারের পরস্পর-বৈপরীত্য, সেই সহসা-সংসাধিত মৌলিক পরিবর্ত্তন—সবশুদ্ধ মিলিয়া সেই এসীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একদিকে মিলন-চেষ্টা, আর-একদিকে সংগ্রাম।

* * *

ভারতের অধিকাংশ লোকই পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। অতএব ভারতের বৈষয়িক আলোচনার আরম্ভেই কৃষিপ্রধান ভারতের আলোচনা করা আবশ্যক।

তিনটি আলোচ্য বিষয় যথা,—ভূ-সত্বাধিকারের পদ্ধতি; গ্রামের গঠনপদ্ধতি; প্রধান প্রধান চাষের বিবরণ।

* * *

এই ভূ-সত্বাধিকার পদ্ধতিটি বড়ই জটিল ও গোলমেলে ধরণের; এই পদ্ধতি হইতেই ভারতীয় সভ্যতার সমস্ত ক্রমবিকাশ আমরা অবগত হই।

* * *

প্রথমে, যে-সকল সমাজ অ-সম্যক্‌-পরিপুষ্ট তাহাদের সমাজ-গঠন সাধারণসম্পত্তিমূলক হইয়া থাকে। কেহ কেহ রুস-দেশীয় "মিরে"র সহিত ও জাপানী 'মুরার' সহিত ভারতীয় গ্রামের তুলনা করিয়া থাকেন।

দুই ধাঁচার গ্রাম আছে।

সাধারণ। প্রত্যেক পরিবারের পৃথক পৃথক গৃহ, পৃথক্ পৃথক্ মাঠ। কিন্তু সকল অধিবাসীই সাধারণ ধনসম্পত্তির অধিকারী, উৎপন্ন দ্রব্য সকলেই আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লয়। দ্বিতীয় ধাঁচার গ্রাম, কোন এক জাতের, কোন এক পরিবারের কিংবা কতকগুলি পরিবারের অধিকার-ভুক্ত। যে জাত এই গ্রামের স্বত্বাধিকারী সেই জাতের লোকই সাধারণধনসম্পত্তি উপভোগ করিয়া থাকে; অন্য জাতের লোকেরা নিজের নিজের বাড়ীর ও মাঠের জন্য ভাড়াস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট কর দেয়। তাহারা গ্রামের স্বত্বাধিকারী নহে, তাহারা অধিবাসী মাত্র। এই ধাঁচার গ্রাম উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খুব সাধারণ।

* * *

এই আদিম-ধরণের সমাজ-গঠনের উপর আবার সামন্তপদ্ধতি চাপান হইয়াছে। মোগল শাসন-পদ্ধতির অধীনে এই সামন্ত তন্ত্রও একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। লোকেরা সম্রান্ত ও দাস এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল; এখন দাসদিগের দাসত্ব মোচন হইয়াছে, কিন্তু অনেক প্রদেশেই পুরাতন জাগীরদার বা সামন্তদিগের অধীনস্থ প্রজা এখনও বিদ্যমান আছে—যথা বাঙ্গলার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, মধ্যভারতের মালগুজার ইত্যাদি (১)।

* * *

যে তত্ত্বটি প্রথমে প্রাচীন হিন্দু আইন স্থাপন করে, এবং মোগলেরা চীনেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিপুষ্ট করে, সেই তত্ত্বটি এই:—সমস্ত জমি সরকারের; এবং রাজস্ব ও ভূমিকর একই; উহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। পরিশেষে ইংরেজের শাসন-তন্ত্রও এই তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া সমস্ত অনিশ্চিত ও অস্থায়ী অধিকারের বিরোধ নিবারণার্থ কতকগুলি উপ-স্বত্বাধিকারী সৃষ্টি করে। ছয়টি বড় রকমের পদ্ধতি। বঙ্গদেশে, জমিদারের জমি:—কৃষকেরা জমিদারের রায়ৎ; রায়তেরা জমিদারকে খাজনা দেয়। জমিদারেরা আবার ১৭৯৩ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে সরকারকে চিরনির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক খাজনা দেয়: এই রাজস্বের পরিমাণ আজকাল—উৎপন্ন কাঁচা মালের উপর শতকরা ৫ হইতে ৬। নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া জমিদার ও রায়তের মধ্যে মামলা চালাইতে সরকার বাধা দেন না। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন, ১৮৬৮ অব্দের ৮ আইন, এবং রায়ৎকে ১৮ ৫ অব্দের রায়তী স্বত্বের আইনের সর্ত্ত অনুসারে জমিদার রায়ৎকে জমি হইতে অন্যায়রূপে উচ্ছেদ করিতে পারেন না, এবং অন্যায়রূপে খাজনাও বাড়াইতে পারেন না। রায়ৎদিগের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ জমিদারের

(১) M. Baden Powell-এর বিবেচনায়, (Land Systems of British India) এই দ্বিতীয় ধাঁচার গ্রামগুলি—সামন্ততন্ত্র হইতে উৎপন্ন, গ্রামের স্বত্বাধিকারী কোনও জাত—প্রাচীন কোন অধিপতির বংশ। আমার মতে অনেক স্থলেই এই স্বত্বাধিকারী জাত—প্রথম অধিবাসীর বংশ, সামন্ততন্ত্রাধীন বংশ নহে।

খাজনা-হিসাবে প্রাপ্য (২)। অযোধ্যায় ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, জমি যেমন রায়তের তেমনি বড় বড় ভূস্বামীরও (জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি); উহাদিগকে রায়তের খাজনা দিতে হয়। কেবল বেনারস জেলাটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন; অন্য সর্ব্বত্র, রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারীরা ৩০ বৎসর অন্তর জমি নূতন করিয়া জরিপ জমাবন্দী করে; ভূমির উৎপন্ন মূল্যের শতকরা ৮ হইতে ১০ অংশ পরিমাণ ভূস্বামীদিগকে রাজস্ব দিতে হয়। ১৮৫৫ অব্দের শাহারানপুরে যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সরকার উহাদের নিকট হইতে ভূমিকরের অর্দ্ধাংশের বেশী দাবী করিতে পারিবেন না (পূর্ব্বে সরকার কখন কখন ⅔ দাবী করিতেন) বঙ্গদেশের ন্যায় এই সকল প্রদেশে জমিদারের অত্যাচার হইতে রায়তের স্বত্বাধিকার তেমন সুরক্ষিত নহে, রায়তেরা ভূস্বামীকে গড়-পড়তার উৎপন্ন মূল্যের পঞ্চমাংশ খাজনা দেয়।

পঞ্জাবে অধিকাংশ ভূমি গ্রামের জনসাধারণ-মণ্ডলীর অধিকারভুক্ত:—রাজস্বের হার সাধারণতঃ ৩০ বৎসরের জন্য স্থিরনির্দ্দিষ্ট। শাহারানপুরের প্রবর্ত্তিত নিয়ম উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় পঞ্জাবেও প্রচলিত রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় পঞ্জাবেও রাজস্ব ও ভূমিকরের হার প্রায় একই সীমায় পৌছিয়াছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বড় বড় ভূম্যাধিকারী খুবই কম এবং রায়তেরা সরকারেরই খাস প্রজা; ভূমি-কর ও রাজস্ব সেখানে একীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রতি ৩০ বৎসর অন্তর রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়। এই রাজস্বের হার অতিশয় উচ্চ; M. Dutt বলেন,—কাঁচামালের হিসাবে, শতকরা ২০ হইতে ৩৩ অংশ; কিন্তু ইংরেজ-সরকার তাঁহার এই নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

মাদ্রাজে, অল্প কতকগুলি জমিদার আছে—তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রায় সকল চাষাই সরকারের খাস প্রজা; সরকার তাহাদিগকে ৩০ বৎসরের মুদ্দতে কিংবা তাহারও কম মুদ্দতে পাট্টা দিয়া থাকেন। সরকার উহাদের নিকট হইতে বাদ-খর্চ্চা মোট আয়ের অর্দ্ধেক দাবী করেন, কাঁচামালের হিসাবে ⅓ বা ⅔-এর অধিক দাবী করেন না। M. Duttএর গণনা-অনুসারে, শুষ্ক জমি শতকরা ১২ হইতে ২০ অংশ পরিমাণ এবং জল-সিক্ত জমি (সরকার-কৃত খালের জলে সিক্ত বুঝিতে হইবে) শতকরা ১৬ হইতে ৩১ অংশ পরিমাণ

---

(২) বঙ্গদেশে যে সকল জমিদারের ভূসম্পত্তি আয়তনে ১১,৭৮৬,৭২৫ square acres, (১ acre= ৩ বিঘা), তাহাদিগকে ৫০,০০০ টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয়। ১১টা জমিদারির আয়তন গড়-পড়তায় ৩৯৭,৮৯৬ acre এবং উহাদিগকে গড়-পড়তায় ২৭৬,৫০২ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। অযোধ্যায় ভূসম্পত্তি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আরও ক্ষুদ্র।

Tenancy Act রায়ৎদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে, এক—যাহাদের দখলীসত্ব, আর এক—যাহাদের উঠবন্দী স্বত্ব। প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্বত্বাধিকার জমিদারেরই ন্যায় পাকাপোক্ত।

খাজনা দেয়। এই সংখ্যাঙ্কগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। (৩)

মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি ভূস্বামী আছে, এবং কতকগুলি রায়ৎ আছে। জমিদারের নিকট সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব এবং রায়তের নিকট জমিদারের প্রাপ্য ভূমি-কর বা খাজনা উভয়ই সরকার স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ভূমি-করের অর্দ্ধেক বা শতকরা ৬০ অংশ পর্য্যন্ত রাজস্বের হার উঠিতে পারে। M. Dutt বলেন, ১৮৯০ অব্দের পুনর্বন্দোবস্ত অনুসারে কতকগুলি জমিকে ভূমিকরের সমান রাজস্ব দিতে হইবে। কিন্তু এ কথা সরকার অস্বীকার করেন।

* * *

এই ভূস্বামিত্বের পদ্ধতি হইতে কতকগুলি কথা মনোমধ্যে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী একমাত্র সরকার—এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ এশিয়াদেশীয়।

তাহার পর, ইংরেজ আচার-ব্যবহার ও ভারতীয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে একটা রফা করিয়া সমস্ত ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী যে সরকার, সেই সরকার কতকগুলি উপ-স্বত্বাধিকারীর সৃষ্টি করিয়াছেন :—বস্তুতঃ এই উপ-ভূস্বামীদিগের স্বত্বাধিকার প্রকৃত ভূস্বামীর স্বত্বাধিকারেরই অনুরূপ; যেহেতু —উহাদের প্রাপ্য খাজনা ভূমি-করের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তথাপি মধ্যপ্রদেশে, রায়তের নিকট হইতে প্রাপ্য উপ-ভূস্বামীর খাজনা সরকার স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ সেই ইংরেজী মতামতের প্রভাব, এমন কি, যে-সকল মূলতত্ত্ব ইংরেজের বড় দুই রাজনৈতিক দলকে পরিচালিত করে, সেই সকল মূলতত্ত্বের প্রভাবও ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যে "জমিদার" বড় কৃষক মাত্র সেই জমিদারকে ইংরেজদের রক্ষণশীল দল Land lord করিয়া দিলেন; যে দাস-কৃষকদিগের কখনই কিছুই ছিল না, উদার-নৈতিকদল তাহাদিগকে ভূস্বত্বাধিকারী করিয়া দিলেন।

পরিশেষে ভারত জয় করিতে, এবং ভারতের প্রতিষ্ঠানাদির মর্ম্ম বুঝিয়া ভারতের শাসন-প্রণালী স্থির করিতে ইংলণ্ড যে-সকল বাধা পাইয়াছিল, তাহা স্মৃতিপথে পতিত হয়। কোনও দেশে আইন-ঘটিত এমন কোন ব্যবস্থা কি আছে—বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে? কোন ভূস্বামী তাহার রায়ৎদিগের খাজনা কখনও বাড়াইবে না বলিয়া বচন-বদ্ধ হইলে, তাহাও বরং বুঝা যায়, কিন্তু কতকগুলি প্রজাদিগের রাজস্ব কখনও বাড়াইবে না বলিয়া কোন গভর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, অর্থাৎ অন্য সমস্ত করদাতাদের সহিত কোন চুক্তি না করিয়া সরকারের সমস্ত ভাবী খরচের বোঝা সমস্ত করদাতার উপর চাপাইয়া দেওয়া—এই যে বন্দোবস্ত ইহা নিশ্চয়ই ন্যায়-বিরুদ্ধ, সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে ৩০ বৎসরের বন্দোবস্তটা আরও অদ্ভুত।

(৩) যে শ্রেণীতে স্বয়ং রায়ৎ ভূস্বামী বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাকে "রায়তোয়ারী প্রণালী" বলে।

অবশ্য সাধারণ ভূস্বামী শুধু ৩০ বৎসরের জন্য রায়তদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারেন; এবং ৩০ বৎসর অতীত হইলে আবার খাজনা বাড়াইতে পারেন। কিন্তু ভারতের রাজ-সরকারই সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী এবং এমন দেশে স্বত্বাধিকারী যেখানে অধিকাংশ অধিবাসী কৃষির দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে; তাই, সরকার রায়তদের সহিত আপসে চুক্তি করেন না, পরন্তু নির্দ্দয়ভাবে স্বকীয় হুকুম তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। ভারত-সরকার শুধু ভূমি-কর-নির্দ্ধারণ-কারী ভূস্বামী নহেন,—ভারত-সরকারের অসীম আধিপত্য; ভারত-সরকার কোন জনসভার সম্মতি না লইয়াই রাজস্বের হার নির্দ্ধারণ করেন। প্রজারা নিজের জমির যে উন্নতি সাধন করে, সেই হিসাবে যদি কোন গভর্ণমেণ্ট কোন প্রদেশে ত্রিশ বৎসরের জন্য, কোন প্রদেশে দশ বৎসরের জন্য জমির মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন এবং প্রজারা স্বকীয় কায়িক শ্রমে যে আয় বৃদ্ধি করে, সেই আয়ের তুল্য পরিমাণ কিংবা প্রায়-তুল্য পরিমাণ রাজস্ব যদি কোন গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করেন তাহা হইলে সেই গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে তুমি কি বলিবে? ইহার দ্বারা কৃষকদিগকে নিরুৎসাহ ও কৃষিসংক্রান্ত সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ করা হয় না কি?

উপরি-উক্ত কথাগুলি হইতে দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ভারতের ভূমি-কর-পদ্ধতি হইতে ইহাই প্রদর্শিত হয় যে ভারতীয় সমাজ এখনো পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে, এবং এই দরিদ্র দেশ স্বকীয় দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে চেষ্টা প্রযত্ন করে, এই পদ্ধতি অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে তাহার অন্তরায় (৪)।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(৪) এইজন্য ইংরেজ-শাসনকে দোষী করা আমার আদৌ অভিপ্রায় নহে। আমি শুধু দেখাইতেছি, যে-দেশে একটা বিশেষ সমাজ-কাঠামের মধ্যে অবরুদ্ধ ত্রিশকোটি লোক, সে দেশকে রূপান্তরিত করিবার বাধা প্রায় অলঙ্ঘনীয় বলিলেও চলে। কিন্তু আমি আর একটা কথা বলিব। ভারতে কোন কোন প্রদেশে প্রত্যেক নূতন জমাবন্দিতে, রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারীরা, কৃষকদিগের কিংবা পত্তনীদারদিগের দ্বারা সংসাধিত উন্নতির মূল্য হিসাবে সেই মূল্যের তুল্য পরিমাণ খাজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; কিন্তু ইংলণ্ডে ভূস্বামী কোন জমি কাহাকেও ভাড়া দিলে, একশো বৎসরের পর, সেই ভাড়াটিয়ার নির্ম্মিত সমস্ত ইমারৎ-আদি সহ সেই ভূমি পুনর্গ্রহণ করিতে পারে; যদি সেই ব্যক্তি আবার ভাড়া লইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার স্ব-নির্ম্মিত ইমারতাদির জন্যও ভূস্বামীকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু ভারতের পক্ষে তিনটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ ভারতের সম্বন্ধে এমন একটা আইন প্রয়োগ করা হয় কেন, যে আইন সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রবেত্তারা দুষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন? তার পর, ইংরেজ ভাড়াটিয়া স্বাধীন, ভারতীয় রায়ৎ স্বাধীন নহে। (যে আইরিশ রায়তের অবস্থা ভারতীয় রায়তের অপেক্ষা কম প্রতিকূল ছিল,—ইংলণ্ডের মহাসভা সেই আইরিশ রায়ৎদিগের স্বত্বাধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন)। পরিশেষে বক্তব্য, ভারত-সরকারের ভূমিকর সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাটা (বাস্তব পক্ষে ভারতের রাজস্ব একটা কর, ভূমির ভাড়া নহে) সাধারণের

বুকের ধন

পেলেছি যে ছাগলছানা একরত্তি হ'তে
দাদাঠাকুর বেচ্‌তে তাহা নারবো কোনমতে।
শূন্য বুকে ভরতে আমি ছাগল পুষি ঘরে
করিনিক ব্যবসা পাঁঠার তোমার পেটের তরে।
ব'লছ তুমি কালীপূজার জন্য নিবে পাঁঠা,
সেই ভয়েতে আমার গায়ে দিচ্ছেনাক কাঁটা।
উচ্ছন্নে যেতে হ'বে বল্‌ছো বটে ডাকি'
উচ্ছন্নে যেতে আমার নেইত কিছু বাকী।

অনেকগুলি ডাঁটো এবং অনেকগুলি কাঁচা
মা কালীরে বছর বছর দিয়েছি ত বাছা।
দেখা হ'লে বলো ঠাকুর এবার শ্যামা-মায়
পাগল বুড়ী ছাগল দিতে হয়না রাজী হায়।
পেটের ছেলে অনেক দেছে মিটেনি তার ক্ষোভ,
শেষ-বয়সের বুকের ধনে কেন গো মার লোভ ?
সবই যদি নেবে তাহার কি নিয়ে সে থাকে ?
তার চেয়ে মা সকাল-সকাল নিক্‌না বুড়ীটাকে!

শ্রীকালিদাস রায়।

বন্দেমাতরম্

(৭)

"আর বলো না পণ্ডিতমশায়, আমার সর্ব্বশরীরে রক্ত চন্‌চন্ ক'রে উঠ্‌ছে, আমি আর শুনতে পারি নে।" বলিল রাজকুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার পণ্ডিত দেবব্রত ভট্টাচার্য্যকে।

প্রায় দুই বৎসরকাল ভট্‌চায মহাশয় বালিকার সংস্কৃত শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়াছেন, বাড়ীর সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছে—এইবার অচিরাৎ ভারতে দ্বিতীয় 'গার্গী' বা 'উভয় ভারতীর' অভ্যুদয় তাহারা দেখিবে। পণ্ডিতমহাশয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা আরও অধিক,—দ্বিতীয় কেন ছাত্রীকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত করিয়া তোলাই তাঁহার অভিপ্রায়। কেন না এই জন্যই তিনি বেতনভোগী, অধিকন্তু এই কার্য্য সাধন করিতে পারিলে—পরলোকের অপেক্ষায় আর তাঁহাকে থাকিতে হয় না, ইহলোকেই হাতে-হাতে পুরস্কৃত হইতে পারেন। কিন্তু সকলের এত বাসনা কামনা ব্যর্থ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সংস্কৃত শিক্ষার উপলক্ষে দীক্ষিত হইল কিসে? না দেশানুরাগে।

রাজকুমারীর সংবাদপত্র পড়িবার নেশা কখনও ছিল না—এখনো নাই, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী শুনিতে চাহুক বা নাই চাহুক, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না,—যতরাজ্যের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়া পণ্ডিতমশায় ছাত্রীকে শুনাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কোন্ ইংরাজের পদাঘাতে, কোন্ কুলির প্লীহা ফাটিয়াছে, ট্রেণের গাড়ীতে, ট্রাম গাড়ীতে ইংরাজ ফিরিঙ্গি কর্ত্তৃক কোন্‌দিন কোন্ ভারতবাসী লাঞ্ছিত অপমানিত হইয়াছে,

কোর্টে ইংরাজ ভারতবাসীর মকদ্দামায় কথন কিরূপ অবিচার হইতেছে, এই সব খবরই প্রধানত পণ্ডিতমশায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বলেন। শুনিয়া ক্রোধে বেদনায় জ্যোতির্ম্ময়ীর গোলাপী বর্ণ আগুনের মত রাঙ্গা হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের দেশ-পীড়নজনিত মনের জ্বালা যেন প্রশমিত হইয়া আসে।

এখন পণ্ডিতমশায় বলিতেছিলেন, মফস্বলের একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী একজন ভদ্রলোককে চাবুক মারিয়াছে। ভদ্রলোকটির অপরাধ, অন্যমনাবশত তাঁহাকে সেলাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।"

এই সংবাদে জ্যোতির্ম্ময়ী যেন নিজের অঙ্গেই কশাঘাত অনুভব করিয়া উদ্দীপ্ত কাতরস্বরে কহিল—"আমি আর শুনতে পারি না"। পণ্ডিতমশায় এত সহজে যদিও দমিবার পাত্র নহেন, কেন না মুখ বন্ধ রাখিতে হইলে দম ফাটিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, তথাপি তিনি একটু হতাশার স্বরে কহিলেন—"তবে থাক্, এসব কথা তোমার মত বালিকার না শোনাই ভাল। 'পড়।"

"না এখন আমার পড়তেও ইচ্ছা করছে না।"

পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার হাতের অমৃতবাজার পত্রিকাখানির পাতা উল্টাইয়া, তাহার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অন্যমনে বলিলেন "তবে অন্বয় কর? কস্মিনশ্চিৎবনে ভাসুরকো নামঃ সিংহঃ প্রতিবসতিস্ম।"

হইয়াছে—এখন সে পড়ে রঘুবংশ মুগ্ধবোধ ইত্যাদি। কিন্তু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ না করিয়া বালিকা অন্বয় করিল—কস্মিনশ্চিৎ প্রদেশে অসুরকো নামঃ সিংহঃ ত্রাসয়তি সর্ব্বানি জনগণাম্।

পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, একটা গলদ করিয়া ফেলিয়াছেন, বালিকার দিকে চাহিয়া একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"দেখ রাজকুমারি, হাসি তামাসার কাল এ নয়।"

"আমি হাসি তামাসা করিনি—প্রাণ থেকে যা অনুভব করছি তাই বলছি। পড়তে পারব না এখন পণ্ডিতমশায়।" বলিয়া হাতের বইখানা জ্যোতির্ম্ময়ী ছুঁড়িয়া নীচে ফেলিয়া দিল।

গৃহের একপার্শ্বে তাহার শিক্ষয়িত্রী কুন্দবালা চৌকিতে বসিয়া নীরবে সেলাই করিতেছিল। বইখানা উঠাইয়া টেবিলে রাখিয়া সে কহিল, "রাজকুমারি—সংবাদপত্রে কটা পীড়নের কথাই বা প্রকাশ হয়—! আপনি তাই শুনেই এত অধীর হয়ে ওঠেন, সব কথা কানে গেলে না জানি কি করতেন! দেখুন দুর্ব্বল হলেই সহ্য করতে হয়, এটা জগতের নিয়ম, ইংরাজ বাঙ্গালীর কথা ছেড়ে দিন, আমাদের দেশে দুর্ব্বলা অসহায়া নারী জাতির যে কিরূপ কষ্ট, কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় একটু বড় হলে তখন বুঝবেন।"

পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন বেগতিক, কিছু দিন পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, আর তাঁহার অযত্ন অনাদর যে কতক পরিমাণে ইহার কারণ নয় তাহা ত তিনি মনে করিতে পারেন না। একটু তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন, —"তবে আমি আজ উঠি, আজ ত দেখছি তোমার পড়া হবেই না।"

"না পণ্ডিতমশায় বসুন, আর কিছু খবর থাকেত বলুন। আমি ভেবে দেখছি—কষ্ট হয় ব'লে কথাগুলো শোনা বন্ধ করাটা ঠিক নয়। তাতে ত পীড়ন বন্ধ হবে না।" জ্যোতির্ম্ময়ীর অনুজ্ঞায় পণ্ডিতমশায় পরিত্যক্ত চেয়ার পুনর্গ্রহণ করিলেন। কুন্দবালা বলিল—"আমি প্রত্যক্ষ ঘটনা দু-একটা জানি, শুনবেন রাজকুমারি? আমার একটি খুড়তুত ভাই ভাগলপুরের ষ্টেসন-মাষ্টার, তিনি স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখেছেন।"

"বল না কুন্দবালা?" বালিকা কিছু বলিবার পুর্ব্বেই পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে এই অনুরোধ করিলেন।

কুন্দ পণ্ডিতের দিকে চাহিতে গিয়া সম্মুখের দেয়ালের আয়নাখানায় অগ্রে দৃষ্টিপাত করিল,—মাথার শিথিল সাড়ীখানা ঠিক করিয়া লইবার ছলে কপালের কেশদাম অলক্ষ্যে ঠিক করিয়া লইয়া কহিল—"সেখান-কার একজন বড় সাহেব—নাম করব না, কল্‌কাতায় যাবেন,—ট্রেন ছাড়তে একটু দেরী ছিল, ষ্টেসনের খানাঘরে বসে গেলাশের উপর গেলাশে মদ ঢাল্‌ছেন—আর খাচ্ছেন, দুট ঘণ্টা দিলেও তাঁর হুঁস নেই, তৃতীয় ঘণ্টা পড়লো—আমার ভাই তাঁ'কে খবর দিলে যে এইবার গাড়ী ছাড়বে। তাড়াতাড়ি উঠে তিনি গাড়ীর উদ্দেশে ছুটলেন। তিনি তখন নেশায় চুরচুরে। পথে দু-চারজন কুলি জনতা করে দাঁড়িয়েছিল,—লাথি-মেরে তাদের সরিয়ে পথ করে নিলেন—ধাক্কায় একজন লোক ঠিক গাড়ীর সামনে পড়ে গেল, তিনি এমন জোরে জুতোর ঘায়ে তাকে ঠেলে দিলেন—যে তার মাথা ফেটে রক্তারক্তি হয়ে উঠল,—সাহেব তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।" জ্যোতির্ম্ময়ী নিস্তব্ধ হইয়া শুনিল, তাহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। খানিক পরে বলিল—"পণ্ডিতমশায় একটা কথা বলব? আমার মনে হয় খবরের কাগজে এ রকম দুর্ব্বল-পীড়নের কথা পড়ে আপনারা আনন্দভোগ করেন। আর জানেন, সেই মনে করেই আমার বেশী কষ্ট হয়।"

"আনন্দভোগ করি?" পণ্ডিতমহাশয়ের নয়ন বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

"নিশ্চয়ই! যেমন রাস্তায় মারমারি হলে, পথিকেরা মজা অনুভব করে সেই রকম। নইলে ভাই বোন মা-বাপ লাঞ্ছিত হচ্ছে দেখলে বা শুনলে কেউ কি চুপ করে থাকতে পারে?"

"কি করব বল? উপায় কি?"

"কি করবেন? প্রতিকারের চেষ্টা করুন।"

"প্রতিকারের চেষ্টা!" পণ্ডিতমহাশয় অবাক হইয়া গেলেন। লম্বা দাড়ীতে হাত বুলাইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভগবান যদি ইচ্ছা করেন তবেই প্রতিকার হবে। আমাদের মত দুর্ব্বল জীবের প্রতিকার চেষ্টা, আর যূপকাষ্ঠে কণ্ঠদান—, একই কথা।"

"প্রতিদিন জীবন্ত দগ্ধ যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে যূপকাঠে কণ্ঠদানও আমি ভাল মনে করি।" পণ্ডিতমহাশয় অসহায় বালকের মত কুন্দবালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন নীরবে প্রশ্ন করিলেন—"এ মেয়ে পাগলের মত বলে কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"আপনি ত আমাকে পড়িয়েছেন—উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ। ইংরাজিতেও একটা প্রবাদ আছে নিজেকে যে সাহায্য করে ভগবান তার সহায় হন। জাতির মঙ্গল চেষ্টা করা ত আর বিদ্রোহিতা নয়—যে আপনি ফাঁসি যাবেন! আল্‌সেমির আরামটুকু ছাড়তে চান না বলেই এসব কাজে আপনারা উদ্যম-হীন। আমি স্ত্রীলোক হয়ে যে কাজ অসাধ্য-সাধন মনে করি না—আপনারা পুরুষ হয়ে সে কাজে ভগবানের মুখ চেয়ে নিবৃত্ত থাকেন। ভগবান ত মানুষের দ্বারাই কাজ করিয়ে নেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, তিনি মুগ্ধের মত কহিলেন —"কি করতে বল তুমি?"

"সহরে নগরে, গ্রামে পল্লীতে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি রীতিমত ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শারীরিক তেজের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে মনের তেজও বাড়বে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। তখন তাদের পীড়ন করতে কারো সাহসই হবে না।"

কুন্দবালা বলিল—"এক সময় হিন্দু মেলা নামে কল্‌কাতায় একটা মেলা হয়েছিল,—তার উদ্যোগে দিনকতক নাকি ছেলেদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"হাঁ সে অনেক দিনের কথা,—আমরা তখন ছেলেমানুষ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী প্রশ্ন করিল—"বন্ধ হোল কেন?"

কুন্দবালা উত্তর করিল—"আমাদের ত কার্য্যের উৎসাহ সূর্য্য চন্দ্রের আলোক নয় যে স্থায়ী হবে; তেলের বাতি আর কতক্ষণ জ্বলে?"

"সংসারে ত তেলের বাতির প্রভাব কম নয়। সূর্য্য চন্দ্রকে ধরে রাখা যায় না,—কিন্তু সহজেই আমরা প্রদীপে তেলের যোগান্ দিতে পারি। আমাদের দেশের কবিরা দেশনায়করা কি বহুদিন ধরে তাই কর্‌ছেন না? যখন পড়ি "তোমার তরে মা সঁপেছি দেহ তোমার তরে মা সঁপেছি প্রাণ"—তখন আমার দেহপ্রাণ নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে,—যখন পড়ি—

"তবু—তারা হাসে খেলে—
তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর—গৃহ ধন্ ধান্য পূর
অন্নজল তবু নাহি মেলে—
তবু—তারা হাসে খেলে।"

তখন আর হাসতে খেলতে ইচ্ছা করে না।"

"কিন্তু সকলের মনের ভাব এই রকম না হলে ত কোন কাজ হয় না।" বলিল কুন্দবালা;—উত্তর স্বরূপ পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন—"মনের ভাবের অভাব বশতই যে লোকে নিরুদ্যম—আমার তা মনে হয় না। গভরমেণ্টের অসন্তুষ্টি বলে ত একটা জিনিষ আছে!"

বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী এইবার অবাক্ হইয়া গেল,—কথাটা এমনই তাহার নিকট হাস্যজনক মনে হইল। হাসিয়া সে বলিল—"গভরমেণ্টের ভয়? কেন? গভরমেণ্ট, আমাদের ত শত্রু নয়, আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাজা। আমাদের পীড়ন করে যারা—তারা সাধারণতঃ ছোট লোক ইংরাজ—নয়ত হীনচেতা গভরমেণ্ট কর্ম্মচারী। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের অপরাধের দায়ী কি গভরমেণ্ট?

গভরমেণ্টই ত আমাদের মঙ্গল কামনায় সহরে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন,—আর আমরা ব্যায়াম চর্চ্চা কর্‌তে গেলে তাঁরা নিষেধ কর্‌বেন? এ কখনই হতে পারে না। দেশের লোকের মন যে কত হীন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—এইরূপ বৃথা ভয়ই তার প্রমাণ। একথা শুনলে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিশ্চয়ই হাসবেন।"

পণ্ডিত বলিলেন—"আমরা ত গভরমেণ্ট কর্ম্মচারীকে গভরমেণ্ট থেকে পৃথক কর্‌তে পারি নে। তাঁরা পদে পদে তাদের কার্য্যে জানিয়ে দেন যে, আমরা তাঁদের জুত বহনেরও যোগ্য নই—কর্ম্মচারীদের আমাদের প্রতি এই যে অসম্মান ঘৃণা, গভরমেণ্ট তা থেকে কি আমাদের রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করেন?

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"অবশ্যই করেন, নইলে শাসননীতির অর্থ কি? গভরমেণ্ট ত আর আমাদের জন্যে আর ইংরাজের জন্যে আলাদা আইন করেন নি। দণ্ডনীতি ত ইংরাজ ভারতবাসী উভয়ের পক্ষে একই! এই খানেই ব্রিটিস রাজ্যের উদারতা।"

"হ্যাঁ বহির পাতাতে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক বিপরীত।"

"আপনি আবার ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে গভরমেণ্টকে এক কর্‌ছেন। গভরমেণ্ট যে অত্যাচারীর পক্ষপাতী—এইরূপ মনে করাই যথার্থ বিদ্রোহিতা। আমি যদি বিচারক হতুম—আর দেখতুম কোন বাঙ্গালী ইংরাজের প্রতি অত্যাচার করেছে—তাহলে তাকে এক তিলও কম দণ্ড দিতুম না।—এ আমি খুব জানি। ন্যায়ের কাছে ত স্বদেশ বিদেশ শাসন কর্‌ছেন—এ রকম পক্ষপাতী নীতি কি তাঁরা অবলম্বন কর্‌তে পারেন?"

পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি এখনো অর্ব্বাচীন, পরে বুঝবে তা পারেন কি না এবং করেন কি না? আমরা যদি ইংরাজের সমাধিকার পেতুম—তাহলে ত আমাদের ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ থাকৃত না! দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে পুত্রকন্যাকে রাজার হাতে সঁপে দিয়ে বৃদ্ধকালে নিশ্চিন্ত মনে বনগমন কর্‌তুম। ইলবার্টবিলের সময় কি হয়েছিল রাজাবাহাদুরকে জিজ্ঞাসা কোরো। আর একজন ট্যাসফিরিঙ্গিও অস্ত্র ধারণের অধিকারী কিন্তু তোমার বাবারও লাইসেন্স দিয়ে তবে ঘরে অস্ত্র রাখতে হয়। তিনি ত কনগ্রেসের একজন নেতা, কোন্ দুঃখে কনগ্রেসের সূচনা—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই জানবে। তুমি এইমাত্র বল্লে রাজা আমাদের মঙ্গল চেষ্টার বিরোধী হতে পারেন না, কিন্তু কোন গভরমেণ্ট কর্ম্মচারী দেশের লোকের কনগ্রেসে যোগ দিতে সাহস করেন না কেন?—না গভরমেণ্ট কনগ্রেসকে সুনজরে দেখেন না। আর রাজপুরুষের এই বৃথা সন্দেহ ভুল বিশ্বাসই আমাদের উদ্যম-হীনতার প্রকৃত কারণ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিস্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিল, এই বিষয়ের একটা দিক যেন সে আজ প্রথম দেখিতে পাইল। কিছু পরে বলিয়া উঠিল—"কোন মিথ্যা বা ভুল চিরদিন কখনো স্থায়ী হয় না। এমন এক সময় নিশ্চয় আসবে যখন রাজা প্রজা উভয়েই আপনাদের ভুল বুঝতে পারবে। প্রজা বুঝবে

জন্যে রাজ-ভয়ের বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে, আর রাজাও বুঝবেন, প্রজার মঙ্গলে রাজারই মঙ্গল—তাঁহারই শক্তি বৃদ্ধি, অতএব প্রজা-শক্তিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রশ্রয় দেওয়াই রাজ-কর্ত্তব্য।"

কুন্দবালা বলিল—"কোন ভুল কি সহজে ভাঙ্গে রাজকুমারি? ভুল ভাঙ্গতে অনেক সময় জীবন পর্যন্ত নাশ হয়।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর নয়নে অনুরাগ-আলোক,—স্বরে উৎসাহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, মূর্ত্তিমতী কল্যাণী যেন কহিল—"বেশ, প্রাণ দিয়েও যদি এ ভুল ভাঙ্গাতে হয় তাতেও আনন্দ ছাড়া দুঃখ করবার কি আছে? আমি একজন সামান্য বাঙ্গালী মেয়ে, অন্যায়ের দমনে এত তেজ এত বল অনুভব করছি আমি কোথা থেকে? আমাদের দেশের আকাশে বাতাসেই কি সে তেজ ছড়ানো নেই? আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমি যেমন আজ এখানে এ রকম করে ভাবছি—তেমনি আরও অনেকেই ভাবছেন। প্রাণে প্রাণে আমাদের বৈদ্যুতিক সংবাদ চালিত হচ্ছে। আমরা কৃতকার্য্য হবই হব। সময় এসেছে—সময় এসেছে,—অন্যায় চিরদিন জয়ী হয় না।"

দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের নয়নে আনন্দমঠের দেবীমূর্ত্তি সহসা বিভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাল্মীকির প্রথম গীতি ধ্বনির ন্যায় উচ্চারিত হইল—দেবী, মা, তুমি ধন্য! বন্দেমাতরম্‌!

(৮)

অতুলেশ্বর যখন নিতান্ত শিশু তখন তাঁহার পিতা রাজা ধর্ম্মেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সন্তানের মতই স্নেহ করিতেন। কর্ম্মেশ্বর লোক মন্দ ছিলেন না—কিন্তু পান-দোষে তাঁহাকে নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রসাদপুরের রাজাগণ চিরদিনই কলা-বিদ্যার অনুরাগী এবং উৎসাহদাতা। অতুলেশ্বরের পিতামহ রচিত সঙ্গীতাবলী বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীর ন্যায় পূর্ব্বাঞ্চলে সমাদরে গীত হইয়া থাকে। কর্ম্মেশ্বরের যদিও রচনা ক্ষমতা নাই কিন্তু গানবাদ্য লইয়াই প্রায় তাঁহার সময় কাটে। যাত্রাদি পর্ব্বের ত কথাই নাই—সময় সময় কলিকাতা হইতে বাইজির [illegible]ন—এবং থিয়েটারও আসে। তিনি [illegible]য়াছিলেন—কলিকাতার কোন ধনীভবনে হীরা বুলবুল নামে দুই সুবিখ্যাতা গায়িকার সহিত সঙ্গত্‌ করিতে গিয়া অদ্বিতীয় পাখোয়াজি গোলাম আব্বসের এত পরিশ্রম হইয়াছিল যে গান শেষে হার্টফেল করিয়া তথান তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় গোলাম আব্বসের অভাবে তিনি যে বাইজি দুই জনকে রাজসভায় ডাকিতে আহ্বান করিতে পারিলেন না—এই আপশোষে তাঁহারও হার্ট ফেল করিবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহা ছাড়া তাহার মোসাহেব দল মাঝে মাঝে সখের যাত্রাও করিত এবং তাঁহার সভায় কবির লড়াইও চলিত। এই যুদ্ধে তিনি যাহাকে বাহবা প্রদান করিতেন—তাহার অবস্থা ফিরিয়া যাইত। নিম্নে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

একটু ফিকা-রঙের খোস মেজাজে রাজা কহিলেন—"আজ অমাবস্যার রাত, চাঁদ উঠবে

একজন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গান ধরিল—

আমরা মোদের রাজারেই জানি ;
সূর্য্য চন্দ্রের না ধারি ধার যমকে না মানি।
রাজা মোদের ঢালেন সুধা—
তৃপ্ত করেন তৃষ্ণা ক্ষুধা—
সর্ব্বপ্রাণে স্তুতিগানে—তাঁরেই বাখানি।

তাহার গান শেষ হইলে দ্বিতীয় জন গায়িল—

শ্রীবৃন্দাবনে ওগো শ্রীবৃন্দাবনে—
ধরা দিল অমার শশী রাধিকার সনে।
যে দেখিল সেই মজিল—প্রাণে মনে।

তৃতীয় জন তখন উঠিয়া গায়িল—

প্রেমের বন্যা উথ্‌লে যখন উঠেগো মনে—
আধারের বাঁধ আপনি যায় টুটে—
অমাবস্যায় ভরা চাঁদ ফোটে
আলোক-ফুলের ঝরণা লোটে—বিশ্ব-ভুবনে।

রাজা ইহাকেই সভা-কবির শিরোপা প্রদান করিলেন।

রীতিমত নেশা সুরু হইলে কিন্তু রাজা ভিন্ন লোক হইয়া পড়েন—তখন তাঁহাকে সামলান দায় হইয়া উঠে। সে সময় প্রায়ই তিনি পদব্রজে ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার দল-বল সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে থাকে। অগ্রগামী রাজার আর্শ্বে পার্শ্বে পশ্চাতে থাকিয়া—মোসাহেবগণ কেহ ধরেন আলবোলা (নলটি কিন্তু রাজার মুখে) কাহারো হাতে মদের বোতল, কেহ লইয়াছেন গ্লাস, কাহারো গলায় মৃদঙ্গ ঝুলিতেছে—কেহ বা সেতার তান-পুরা বহিয়া চলিয়াছেন। এই অপরূপ দৃশ্য যে দেখে তাহার হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অতুলেশ্বর কলিকাতায় থাকিয়া পড়া-শুনা করিতেন। ছুটিতে যখন বাড়ী আসিতেন তখন কর্ম্মেশ্বর খুব সাবধান হইয়া চলিতেন—এরূপ দৃশ্য তাঁহার নজরে পড়িত না।—একবার মাত্র অসময়ে বাড়ী আসিয়া খুল্লতাতের এই অবস্থা তিনি দেখিয়াছিলেন—কিন্তু দেখিয়া তাঁহার হাসি পায় নাই, হৃদয় লজ্জায় বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার সমবয়সী দূরসম্পর্কীয় একজন আত্মীয়কে তখন হাসিতে দেখিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, তাহাকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক গৃহে গিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। মদ্যপানে মানুষ যে কিরূপ পশুর অধম হইয়া পড়ে এই দৃষ্টান্তে তাহা তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি মদ স্পর্শ করিতেন না।

কর্ম্মেশ্বর পারতপক্ষে ইংরাজদের সহিত মিশিতেন না—কিন্তু দেখা হইলে নত হইয়া সেলাম করিতে বা মন যোগান' কথা কহিতে ত্রুটি করিতেন না। জমীদারের পক্ষে কার্য্য উদ্ধারের ইহাই অব্যর্থ পলিসি বলিয়া সেকালে জ্ঞান ছিল। কিন্তু কলেজের শিক্ষাদীক্ষার ফলে অতুলেশ্বরের ভিন্নরূপ মেজাজ হইয়া উঠিল, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট দেখা করিতে আসিলে বা তিনি কাহারও নিকট গমন করিলে কথনো সেলাম করিতেন না। কিন্তু যেখানে কর্ম্মেশ্বর করেন সেলাম—সেখানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কেবল সেকহ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলে দেখায় নিতান্ত অদ্ভুত, সেইজন্য, কর্ম্মেশ্বরের নিকটে কোন ইংরাজ আসিলে তিনি সেখানে অনুপস্থিত থাকিতেন। তাহাতে কর্ম্মেশ্বর অসন্তুষ্ট

হইতেন। একদিন কিন্তু অতুলেশ্বর ধরা পড়িলেন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন—কর্ম্মেশ্বর দুই একজন ইংরাজের সহিত বসিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। কুমার আসিতেই তিনি পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। কিন্তু অতুল ত কই কাহাকেও সেলাম করিল না! হাস্যমুখে সকলকে হাত বাড়াইয়া দিল! কর্ম্মেশ্বর মনে মনে প্রমাদ গণিলেন,—একদিন যে এ শিক্ষার ফলভোগ করিতে হইবে তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ রহিল না। অতুলেশ্বর যে-কয়দিন বাড়ী রহিলেন পুনঃ পুনঃ নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন। সে কয়দিন ভাবনায় চিন্তায় মদের গ্রাস পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে উঠিল না—সভা নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল,—মোসাহেবগণ সুখে নিদ্রা দিয়া বাঁচিল। কর্ম্মেশ্বরের উপদেশের ফল যে নিতান্তই বিফলে পরিণত হইয়াছে,—অচিরাৎ রাজা একদিন বুঝিতে পারিলেন। ইলবার্ট বিলের সময় বালক অতুলেশ্বর প্রসাদপুরে এক প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করিয়া স্বয়ং হইলেন তাহার প্রেসিডেণ্ট। ইহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া কর্ম্মেশ্বরের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়া গেলেন কেজানে, রাজ্যে ঘোষিত হইল—অতুলেশ্বর এখন নাবালক—তাঁহার কোন কার্য্যকলাপ রাজার অনুমোদিত নহে। কুমার অতুলেশ্বরের কোন কার্য্যে প্রজাগণ যেন যোগদান না করে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অতুলেশ্বর ব্যায়াম-সমিতি প্রভৃতি দেশহিতকর নানা সভা সমিতি স্থাপন সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। কুমার মর্ম্মপীড়িত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি নানারূপ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন—কিন্তু নিজের রাজ্যে তিনি নগণ্য পুরুষ হইয়া রহিলেন। কার্য্যতঃ কিছু করিতে না পারিলেও গানে কবিতায় তাঁহার দেশানুরাগ প্রকাশিত হইতে লাগিল।—

কর্ম্মেশ্বরের মৃত্যু হইল—জ্যোতির্ম্ময়ী জন্মিবার দুই একমাস মাত্র পূর্ব্বে। অতুলেশ্বর যখন রাজা হইলেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। তাহার পর রাজার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার জীবনের গতি কোন্ দিকে ফিরিয়াছে তাহা পাঠক অবগত আছেন।

* * * * *

প্রাসাদসংলগ্ন নবনির্ম্মিত গৃহে বসিয়া রাজা অতুলেশ্বর লেখাপড়া করেন। গৃহে জানালা দরজা অনেকগুলি, দক্ষিণের জানালা হইতে শীতকালে ধলেশ্বরী রজত-পাতের মত নয়নে প্রতিভাত হয়,—বর্ষাকালে ইহাই বিশাল আকার ধারণ করিয়া তেজস্বিনী স্রোতস্বিনী মূর্ত্তিতে রাজবাটীর অনতিদূরে বহিয়া যায়। গৃহের সম্মুখেই মুক্তছাদ—সকালে সন্ধ্যায় রাজা এইখানে বসিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করেন—জ্যোতির্ম্ময়ী সময় পাইলেই পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। আসিবার সময় বাগান হইতে তাঁহার জন্য কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনে। রাজা প্রভাতে অরুণ-রাগ-রঞ্জিত আকাশে নবোদিত সূর্য্যের শোভা দেখিয়া তন্ময়ভাবে স্বরচিত গানে ঈশ্বর-বন্দনা

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তান ধরে। বৈকালিক বায়ু সেবনের পরেও প্রশান্ত রজনীতে পিতাপুত্রীতে এইখানে আসিয়া বসেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইলে রাজা কন্যাকে সেতার বাজাইতে বলেন; কখনো কখনো তাহার হাত হইতে সেতারটা টানিয়া লইয়া নিজেই বাজাইতে থাকেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর সেতার শিক্ষা হইয়াছে তাহার পিতারই নিকটে। মাঝে মাঝে রাজা যখন কন্যার সংস্কৃত বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করেন, তখনই জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বিপদ গণে। বিদ্যাশিক্ষায় সে যে আশানুরূপ মনোযোগ দিতে পারিতেছে না—ইহা সে নিজে বেশ বোঝে।—রাজা কিন্তু পরীক্ষায় অসন্তুষ্টির কোন কারণ পান না। প্রথম প্রথম জ্যোতির্ম্ময়ী পণ্ডিতের কাছে যখন দেশ-পীড়নের কথা শুনিত তখন পিতার নিকট সে কথা তুলিয়া তাহার সত্যমিথ্যা সে যাচাই করিয়া লইতে চাহিত। রাজা কিন্তু এ সকল কথায় তাহাকে প্রশ্রয় দিতেন না—প্রায়ই রাগ করিয়া বলিতেন "এ-সব খবর তোমাকে কে দেয়? খবরের কাগজ পড় বুঝি? অমি বারণ করে দেব—বাড়ী ভিতরে যেন খবরের কাগজ না যায়। বেশ জেনো খবরের কাগজের অনেক কথাই অতিরঞ্জিত, তোমার কোমল মনের উপর ওসব খবরে অনর্থক আঘাত দিচ্ছে।" জ্যোতির্ম্ময়ীর মত বুদ্ধিমতী বালিকার নিকট পিতার মনের ভাব অপ্রচ্ছন্ন রহিল না,—তিনি যে কেন এসব কথা কন্যাকে জানিতে দিতে চান না—তাহার সে বেশ একরকম অর্থ করিয়া লইল। পণ্ডিত মহাশয় যে তাহার গেজেট—এ কথা কিন্তু একেবারেই পিতাকে জানাইল না, বুঝিল তাহা হইলে তাঁহার কাজটি থাকিবে না। জ্যোতির্ম্ময়ী এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সাবধানে পিতার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল—এই এক বিষয়ে তাহার মনের ভাব পিতার নিকট অপ্রকাশিত রাখিল, ভাবিল যদি বিধাতা দিন দেন তখন পিতাকেও তাহার পক্ষ করিয়া লইবে।—

রাজা আপাততঃ উল্লিখিত ঘরে টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কবিতার বই একখানা খোলা কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই; গৃহদেয়ালে টাঙ্গান রাজপরিবারের বহু তৈলচিত্রের মধ্যে একখানির দিকে তিনি তন্ময়ভাবে চাহিয়াছিলেন। চিত্র খানি তাঁহার প্রমাতামহী যোগমায়া দেবীর বাল্যকালের অশ্বারূঢ়া মূর্ত্তি। রাণী যোগমায়ার পিতা সোমেশ্বর রায়ের অঙ্কিত ছোট পেনসিল-স্কেচ হইতে পরে ইহা একখানি বড় তৈল চিত্রে পরিণত হইয়াছে। এ-চিত্রে বালিকা যোগমায়া যোদ্ধৃপুরুষের সাজে সজ্জিত। তাঁহার মস্তকে শিরস্ত্রাণ, বক্ষে ঢাল, হস্তে বর্শা এবং কটিদেশে তরবারী বিলম্বিত। এই সাজে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। রাণী যোগমায়া দেবীর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য রাজ্য মধ্যে প্রচলিত। তাহার মধ্যে একটি এই যে, একসময় রাজ্যে বর্গি আক্রমণের বড় ভয় হইয়াছিল। তখন রাজজামাতা—রাণীর স্বামী দেশে ছিলেন না। দেওয়ান কোতোয়ালের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে বালক পুত্রদুইটির সহিত রাণীকে অন্যত্র কোথাও পাঠাইয়া দিয়া পণদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারা বর্গিকে বিদায় দিবেন। কিন্তু রাণী

এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং সৈন্যবাহিনীর নায়করূপে অশ্বারোহণ করিলেন। সৈন্য-গণের মধ্যে তখন প্রবল উৎসাহ জাগিয়া উঠিল। স্বয়ং মহিষমর্দ্দিনী যুদ্ধে আগত এই বিবেচনা করিয়া ভীত বর্গীদল রাণীমূর্ত্তিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া পলায়নপর হইল।

যোগমায়ার এই অশ্বারূঢ়া মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আজ রাজা ভাবিতেছিলেন এই তেজস্বিনী রাণীর বংশধরগণ এখন কিরূপ হীনবল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এখন রাজভবনে প্রহরীর হস্তেই বন্দুক তলোয়ার শোভা পায়! শীকারের সময় ছাড়া সৈন্য বেশে অস্ত্র ধরিবার অধিকার পর্য্যন্ত তাঁহাদের এখন নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীকে তিনি যাহাই বোঝান, নিজের মনে এ হীনতা তিনি খুবই অনুভব করেন। কিন্তু ইহা ভাবিয়া তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মাত্র—উষ্ণ শোণিত পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর চঞ্চল হইয়া ওঠেনা, মরিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মায় না।

একসময় কন্যার ন্যায় অত্যাচার-পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, সে তেজ সে উত্তেজনা তাঁহার স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া রাণী যোগমায়া দেবীর ছবিখানি রাজা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখনই তিনি এ ছবি দেখেন তাঁহার মনে হয় এ যেন জ্যোতির্ম্ময়ীরই প্রতিকৃতি। পুরুষ-বেশ ধারণ করিলে বুঝি বা তাহাকে ঠিক এই রকমই দেখাইবে। একখানি ছবি তুলিয়া লন। যোগমায়া দেবীর সেই বসন ভূষণ শিরস্ত্রাণ এখনও মাতার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে তাহাও তিনি জানেন। তবে এ প্রস্তাবে মাতা পুত্রে যে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিবে—সেই কল্পনাতেই তিনি এ ইচ্ছাটাকে মনে মনেই চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাতে বাধা পড়িল; দ্বারস্থ হরকরা গৃহপ্রবেশ করিয়া রাজাকে জানাইল যে "গৃহকর্ম্মচারী জ্ঞানবাবু জরুরি সংবাদ দিতে আসিয়াছেন।"

রাজাদেশে জ্ঞানবাবু সমীপস্থ হইয়া কহিলেন—"ধর্ম্মাবতার, মহারাণীর অনন্ত-ব্রতের ভেট ভট্টপল্লীতে পৌঁছিয়া দিয়া পুরোহিত ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

"এ সংবাদ আমাকে দিতেছ কেন? মহারাণীকে গিয়া বল।"

"পুরোহিত জখম হইয়া আসিয়াছেন?"

"জখম! কেন? কে করিল?"

"ভুল ক্রমে তিনি মেমসাহেবদের ক্যাবিনে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন—তাই—"

"তাই—কি? মেমসাহেবরা মারিয়াছে নাকি?"

রাজা অধীর হইয়া ব্যঙ্গের ভাবে এই প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে জ্ঞানবাবু বলিলেন "সত্যই মেমসাহেবরা তাঁহাকে মারিয়াছেন—কুকুরের শিকল দিয়া মারিয়া ঠাকুরকে রক্তারক্তি করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহার অবস্থা বড় খারাপ।"

ক্রোধে রাজার শোণিত সর্ব্বাঙ্গে যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তিনি আরক্ত

"আমরা তাঁহাকে রাজবাড়ীর উঠানে আনিয়া ফেলিয়াছি।"

রাজা দ্রুতপদে অবতীর্ণ হইলেন। উঠানে আসিয়া দেখিলেন,—বৃদ্ধ পুরোহিতের আহত মস্তক কোলে রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে বীজন করিতেছে—সম্মুখে বসিয়া চিকিৎসক আহত স্থানে পটী বাঁধিতেছেন—আর রাজবাড়ীর লোকেরা উঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং জ্যোতির্ম্ময়ীর আদেশে ফরমাস খাটিতেছে। রাজা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই জ্যোতির্ম্ময়ী নত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল—তাহার যত্নরুদ্ধ অশ্রুজল আর বাঁধ মানিল না, আরক্ত নয়ন হইতে ক্রুদ্ধ করুণার ধারা উথলিয়া উঠিয়া তাহার গণ্ড বাহিয়া পুরোহিতের মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। সেই তেজস্বিনী নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রাজার পুনরায় মনে হইল, যোগমায়ার আত্মাই নবশরীর ধারণ করিয়া বুঝি জ্যোতির্ম্ময়ীতে পুনরাবির্ভূত হইয়াছে!

এই সময় ভিড় ঠেলিয়া পণ্ডিতমহাশয় জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"বন্দে মাতরং!"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বিদায়ের পর

(Alice Meynell)

বলেছি বিদায় বাণী হ'ল বহুদিন,
নিবেদিত তুমি সে আমার,
শুধু তব নাম-মন্ত্র মর্ম্ম মাঝে লীন
অন্তরের আনন্দ অপার!
কোন্ ধর্ম্ম ধরি আমি উঠিব আবার
তোমারে রাখিয়া দ্বীপান্তরে?
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তুমি যে আমার,
স্বর্গের সোপান স্তরে স্তরে!
প্রতি তীর্থ পথ দ্বারে তুমি যে প্রহরা,
অধিষ্ঠিত প্রত্যেক মন্দিরে,
আমার আরতি পূজা ধ্যান চিত্ত ভরি
জাগে শুধু তোমারেই ঘিরে!

ক্লান্তি ত্যজি এক পদ হ'লে অগ্রসর
তোমারেই হেরি আরো কাছে,
সম্মুখ যাত্রার পথে, ভরি চরাচর
তোমারি করুণা জাগিয়াছে!
কেমনে সরাব দূরে, কিসাধ্য আমার
তোমারে করিতে বিসর্জ্জন?
পূর্ণ করি দিবা রাত্রি আলোক আঁধার
নিয়মিত করিছ জীবন!
প্রাণের কামনা আশা সম্পদ শোভার
পরিপূর্ণ মিলিত ত্রিধারা,
সব ধায় তোমাপানে আজি একাকার
অবারিত জাহ্নবীর পারা!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

স্বরলিপি

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে।
সুখ বা দুঃখ দিতে কে আছে ধরণীতে,
একেলা পড়ে আছি মরু স্থলে।
(১) আমিও কোন্ ভুলে মালিকা গাঁথি ফুলে,
পরাতে মধুরাতে কাহার গলে,—
আমিও রচি গান ললিত নব তান
নিভৃতে গায়ি মরি কিসের ছলে।
(২) আমিও কি আশায় বিজনে সাজি হায়,
বাসনা ব্যথা বহি মরম তলে,
আমিও কাঁদি হাসি, কাহারে ভালবাসি
মোরে কে মনে করে আপনা ব'লে॥

রচনা—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী   স্বরলিপি ও সুর—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

২ ৩ ০ ১
II র্সা র্সা। ন্র্সা –া –া। ণ্ধা ণা। ধ্পক্ষা পা –া I
আ মা রো ০ ০ আঁ খি কে০ ন ০

২ ৩ ০ ১
I রা –গা। –মা –পা –া। মা মগমা। রা সন্া –সা II
ভা ০ ০ ০ ০ সে গো০০ জ লে০ ০

২ ৩ ০ ১
II সা রা। গা –পা –া। নর্ধা র্সা। র্সা র্সা –নধা I
সু খ বা০ ০ ০ দুঃ খ দি তে ০

২ ৩ ০ ১
I ধা না। র্সা –র্রা –া। র্সা ন্র্সা। ধা পক্ষা –পা I
কে আ ছে ০ ০ ধ র ণী তে০ ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা। পা –া –ধা। মা পা। মা গা –মরা I
এ কে লা ০ ০ প ড়ে আ ছি ০০

২ ৩ ০ ১
I রা গা। –মা –পা –া। গা –মা। রা সনা –সা II

২´ ৩ ০ ১
II সা সা । রা -া -া । রা -া । রা রা -া I
(১) আ মি ও ০ ০ কোন্ ০ ভু লে ০
(২) আ মি ও ০ ০ কি আ শায় ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I রা গা । মা -পা -া । গা গমা । রা সা -া I
(১) মা লি কা ০ ০ গাঁ থি ফু লে ০
(২) বি জ নে ০ ০ সা জি হায়্ ০ ০

২ ৩ ০ ১
I সা সা । রা -জ্ঞা -া । রা -সা । ণ্ধ্া -া পা I
(১) প রা তে ০ ০ ম ধু রা০ ০ তে
(২) ঝ স না ০ ০ ব্য থা ব০ হি ০

২´ ৩ ০ ১
I ধ্া সা । সা -া সা । রগা -মপা । -মগা -রা -া I
(১) কা হ র ০ গা লে০ ০০ ০০ ০০ ০
(২) ম র ম ০ ত লে০ ০০ ০০ ০০ ০০

২ ৩ ০ ১
I পা পা । নধা -না -র্সা । র্সা র্সা । র্রর্সা -া -নধা I
(১) আ মি ও০ ০ ০ র চি গান ০ ০
(২) আ মি ও০ ০ ০ কাঁ দি হা সি ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা না । র্সা -র্রা -া । র্সনা র্সা । ধা -পক্ষা -পা I
(১) ল লি ত ০ ০ ন০ ব তান্ ০০ ০
(২) কা হা রে ০ ০ ভা০ ল বা সি০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা । পা -া -ধা । মা পা । মা গমা -রা I
(১) নি ভৃ তে ০ ০ গা য়ি ম রি০ ০
(২) মো রে কে ০ ০ ম নে ক রে০ ০

২´ ৩ ০ ১
I রা গা । মা -পা পা । মগা -মা । -গরা -সনা -সা II
(১) কি সে র ০ ছ লে০ ০ ০০ ০০ ০

I সা রা । গা -া পা । ধনা -র্সর্রা, । -র্সনা -ধপা -ক্ষপা II
(২) আ প না ০ ব০ লে' ০০ ০০ ০০ ০০

চোখ ভরে দেখি আর

চোখ ভরে দেখি আর
বুক ভরে যায়
আলোর সোহাগে,
আমি জানিবার আগে
তৃণাঙ্কুর তোলে মাথা
কিশলয় খোলে পাতা,
ফোটে ফুল অরুণের রাঙা অনুরাগে!

চুপ করে শুনি আর, চুপে চুপে মনে
গানের জোয়ার,
হয়ে আসে আগুসার,
সাগরের পারে পারে
ধরার বুকের তারে
সে সুর বাজায়ে চাঁদ ফিরে অনিবার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মাসকাবারি

আধুনিক সাহিত্য কি অবনতিশীল?

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, আধুনিক আর্ট-সাহিত্য decadent অর্থাৎ অবনতিশীল। যুগ-ধারার যেমন অবসান হয়, তেম্নিতর যুগরূপভূয়িষ্ঠ আর্ট-সাহিত্যের ধারাও হৃতবেগ ও মন্দগতি হইয়া নানা পঙ্কিলতা ও আবিলতার আকর হয়। এখন একটা যুগান্ত উপস্থিত; আর্ট-সাহিত্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল ভাব ও রূপ, যে সকল রস ও তার বিগ্রহ উপচীয়মান হইয়াছে, তাদের বিম্ব-প্রতিবিম্ব-পরম্পরা রচিয়া রচিয়া আলোকের আদিতম উৎসকে, প্রেরণার গভীরতম প্রৈতিকে আর্ট হারাইয়া বসিয়াছে। তাই অনেকে বলেন যে, সকল যুগান্তের আর্ট-সাহিত্যের বিলীয়মান দশায় যে সকল লক্ষণা ফুটিয়া উঠে, এ যুগাবসানের প্রদোষ-সময়ে সেই সকল লক্ষণারই পরিচয় জাজ্বল্যমান। একটা অতি-সচেতনতা, অতি-বিশ্লেষ ও সর্ব্ব-বিষয়ে অসুস্থ ঔৎসুক্য, অতি-সূক্ষ্ম ভাব-বিলাস ও শিল্পের কুঁদানি, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতি—এই সকল লক্ষণ অবনতিশীল আর্টের পরিচায়ক।

এ যুগের আর্ট-সাহিত্যকে decadent বলিব কিনা, সেটা পরে বিবেচ্য; কিন্তু এখানে দেখা কর্ত্তব্য যে যুগান্তের আর্ট-সাহিত্য মাত্রই কি উপরি-উক্ত লক্ষণাক্রান্ত? দান্তের Divinia Comedia মহাকাব্যও ত এক decadent সাহিত্যের যুগান্তর্বর্ত্তী; অথচ তার মত স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালব্যাপী মানবাত্মার মহাঅভিযান পৃথিবীর আর কোন্ মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে? এই রূপরসগন্ধস্পর্শময় ঐন্দ্রিয় জগৎ যে আর একটা Super-world অতীন্দ্রিয় অদৃশ্য

জগতের দ্বারা পরিবৃত—দান্তের এই বিপুল অনুভূতিময় কাব্য মধ্যযুগীয় শতধা-বিচ্ছিন্ন, সংস্কারকুক্ষিগত, তমঃপ্রভাবাচ্ছন্ন মানুষকে মুক্তির কি দিব্যরূপই দেখাইল! একদিকে দান্তের এই দিব্য অধ্যাত্ম মুক্তির বার্তা; অন্যদিকে লুক্রেসিয়াসের নাস্তিকতা, প্রকৃতি-সর্ব্বস্বতা ও জড়বাদ—decadent বা বিলীয়মান সাহিত্যের সেই একটা পর্ব্বে দুই বিপরীত দিক্ হইতে দান্তে ও লুক্রেসিয়াস্ মানুষকে একটা মুক্তির আনন্দে একটা বিশ্বচেতনায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। অতএব, কেমন করিয়া বলি যে যুগান্তের সাহিত্যের লক্ষণ শুধু রোগ-লক্ষণ মাত্র, শুধু আত্ম-সর্ব্বস্বতা, শুধু শিল্পের কুঁদানি, শুধু আধ্যাত্মিক বিকার?

বরং মনে হয় যে, সূর্য্যাস্তের পরে যেমন সমস্ত আকাশ অপূর্ব্ব রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া উঠে, তেমনি বোধ হয় কোন বৃহৎ যুগের অবসান-কালে যুগান্তের আর্ট-সাহিত্য তার সর্ব্বোচ্চ মহিমায় প্রদীপ্ততম বিভাসে দীপ্যমান হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং decadent কথাটি বলা মাত্র মানুষের মনে যে একটা তাচ্ছীল্যের ভাব জাগিয়া ওঠে, তথাকথিত অবনতিশীল আর্ট-সাহিত্যের কোন পর্ব্বেই সে ভাবের উদয় হওয়ার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ডেকেডেণ্ট যুগে পাস্তোরাল সাহিত্য দেখা দিয়াছিল। তারও একটা সৌন্দর্য্য এই দিক্ দিয়া পাই যে মনে হয়, রেসিন, বোয়ালিয়ো, পোপ, ড্রাইডেন প্রভৃতি কৃত্রিম সাহিত্য-রচয়িতাবর্গ, আর ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী রুশো, গায়টে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি প্রভৃতি বন্ধনমুক্ত সাহিত্য-স্রষ্টার দল—এঁদের পরস্পরের মধ্যে পাস্তোরাল সাহিত্যই ছিল সেতুবন্ধনের মত। Return to Nature—প্রকৃতিতে ফিরিয়া চল—এই মহামন্ত্রের উদ্বোধন সম্ভাব্য হইত না, যদি পাস্তোরাল কাব্য-সাহিত্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যানুভব মানুষের মনকে সুধাসিক্ত না করিত।

ডেকেডেণ্ট সাহিত্যের পক্ষে অনেক কথা বলিবার আছে দেখা গেল। কিন্তু জর্জ্জ বার্ণাড শ এ যুগের আর্ট-সাহিত্যকে অবনতিশীল বলিতেই প্রস্তুত নহেন। "The sanity of art; An exposure of the current nonsense about artists being degenerate"—এই নামে বার্ণাড শয়ের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে। আর্ট-সমালোচক ম্যাক্স নর্দো এক সময়ে আধুনিক আর্টকে "অবনতিশীল" বলিয়াছিলেন বলিয়া বার্ণাড শ তাঁর মতের প্রতিবাদ উপলক্ষে ঐ পুস্তিকাটি রচনা করেন। বার্ণাড শ বলেন "at every new wave of energy in art the same alarm has been raised"—আর্টের শক্তির লীলায় কোন নূতন তরঙ্গ দেখা দিবামাত্র ঐ রকমের ভীতি-প্রদর্শনের চেষ্টা হইয়াছে যে, এ সব আর্ট অবনতিশীল।

Impressionism—একালের আর্ট-সাহিত্যের একটা বিশেষ ধারা। শিল্পরসিক আর্থার সাইমনস্ "The decadent movement in literature" শীর্ষক সম্প্রতি-প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তার এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন:—"The impressionist, in literature as in painting, would flash upon you in a new, sudden

way so exact an image of what you have just seen, just as you have seen it, that you may say, as a young American Sculptor, a pupil of Rodin, said to me on seeing for the first time a picture of Whistler's "Whistler seems to think his picture upon canvas—and there it is!" or you may find with Sainte Beuve, writing of Goncourt, "the soul of the landscape."—the soul of whatever corner of the visibie world has to be realised." অর্থাৎ সাহিত্যে অথবা চিত্রকলায় ইম্‌প্রেশনিষ্ট এমন একটা অভিনব ও আকস্মিক দিক হইতে এইমাত্র তুমি যাহা দেখিয়াছ এবং যেমনটি দেখিয়াছ তার প্রতিরূপের আলোকপাত করিবেন যে, হুইস্‌লারের ছবি প্রথম দেখিয়া রোঁদা-শিষ্য এক আমেরিক্যান্ মূর্ত্তিকার যে কথা আমায় বলিয়াছিল, তোমাকেও সেই কথাই বলিতে হইবে। সে বলিয়াছিলঃ—হুইস্‌লার যেন চিত্রপটের উপর তাঁর চিত্রটিকে ধ্যান করিয়াছেন—ব্যস্, অম্‌নি দেখ চিত্রখানি! গন্-কোর্ট সম্বন্ধে সাঁতব্যভও তাহাই বলিয়াছিলেন যে তাঁর ভূচিত্রে (landscape) ভূচিত্রের আত্মাকে পাওয়া যায়—দৃশ্যমান জগতের যে কোন কোন্‌টিই শিল্পীর উপলব্ধিগম্য, তার যেন আত্মস্বরূপটিকে পাওয়া যায়। এই যে দৃষ্টির ভিতরে দৃষ্টি, ছায়াভাসের ভিতরে ছায়াভাস, আলোকের অন্তর্ম্মনিহিত আলোক—এই বিকাশমান। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা আধুনিক আর্ট-সাহিত্যের একটিমাত্র ধারা। ইহা ভিন্ন—পার্ণেশিয়ানিজ্‌ম্, সিম্বলিজ্‌ম্, ইমাজিস্‌ম্, পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজ্‌ম্, ফিউচারিজ্‌ম প্রভৃতি আর্ট-সাহিত্যের অন্যান্য বিশিষ্ট রূপ ও ধারাও আছে। এবং এ সকলই ন্যূনাধিক পরিমাণে অবনতিশীল আর্টের রোগ-লক্ষণা-পর্য্যায়ের মধ্যেই পড়ে। আর্থার সাইমন্‌সও বলিয়াছেন যে, এ কালের এই সব সাহিত্য যতই সুন্দর ও অভিনব হউক না কেন, ইহা অভিনব সুন্দর এবং ঔৎসুক্যজনক রোগ ভিন্ন আর কিছুই নয় ("a new and beautiful and interesting disease"।)

বার্ণাড শ এই কথাটাই মানিতে নারাজ। তিনি বলেন ইম্প্রেশনিষ্ট চিত্রকলারীতি যখন প্রথম দেখা দিল, তখন লোকে তার রসগ্রহণে অসমর্থ হইয়া তার নিন্দা করিল বটে, কিন্তু কালক্রমে দু-চারজন কলারসিকের প্রশংসাবাণী শুনিতে শুনিতে তারাও অবশেষে বোল্ ফিরাইল। তখন দাঁড়াইল এই যে, নিতান্ত পোটো ছবিতে (daub) শিল্পী অক্ষমতাবশতঃ যে অঙ্গসমাবেশ ঘটাইতে অপারগ হইয়াছে, তার সঙ্গে আর ইম্প্রেশনিষ্টের তথাকথিত প্রমাণ-রহিত অঙ্গ-সমাবেশ-রহিত ছবিগুলার পার্থক্য সাধারণের বোধগম্য হইল না। কিন্তু এই অজ্ঞতামূলভ রসগ্রহণের বিকৃতির জন্য ইম্প্রেশনিষ্ট কোন মতেই দায়ী নন্। ঠিক্ তেম্‌নি "ইব্‌সেনিজ্‌ম্" প্রভৃতি যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত ও আয়ত্ত না হইবার দরুণ, তাদের সম্বন্ধে নানা ভীতিপূর্ণ সংস্কার ও বিরুদ্ধভাব

বার্ণাড শয়ের এই কথাগুলি আমার ত মনে হয় খুবই ঠিক। ম্যাক্সনর্দো লিখিয়াছেন যে, আধুনিক কাব্যে প্রতিধ্বনিপ্রিয়তা একটা রোগবিশেষ। সুইন্‌বার্ণ তার উদাহরণ। ছন্দকে বাজাইবার জন্য, ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিবার জন্য, শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনির আড়ম্বর আধুনিক কবিতার একটা রোগলক্ষণ। নর্দোর এই কথার প্রতিবাদে বার্ণাড শ লিখিয়াছেন যে স্বয়ং শেক্‌স্‌পিয়ারের অনেক গানে,—যেমন with hey, ho, the wind and the rain—গানটির অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে—এই ধ্বনিপ্রিয়তা দোষ দেখা যায়। ডি, জি, রসেটির Blessed damosel নামক কবিতার বিগ্রহরূপ যদি অবনতিশীল ও ক্ষিপ্ত (insane) আর্টের লক্ষণ হয়, তবে গ্যয়টে তাঁর Faustএর দ্বিতীয় খণ্ডে বিগ্রহের ছড়াছড়ি ও ছন্নলাপ সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক কবি হন্‌ কেমন করিয়া? বার্ণাড শয়ের এই জবাবেরও প্রত্যুত্তর দেওয়া শক্ত।

আসল কথা, ইংরাজিতে যেমন প্রবাদ-বচন আছে যে, give the dog a bad name and then hang it,—সেইরূপ 'কিছুনা কিছুনা' বলিতে বলিতেই আমরা কোন জিনিসকে বিকৃত করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি।

যে সব কারণে এ যুগের আর্টকে অবনতিশীল বলা হয়, সে সব কারণ প্রাচীন আর্টেও বিদ্যমান, ইহা বার্ণাড শ দেখাইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন আর্টে ঐ লক্ষণগুলিই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে নাই, বার্ণাড শয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। গ্যয়টে, শেক্‌স্‌পীয়ার প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ কবিদের মধ্যে আধুনিক আর্টের অনেক রূপের আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সে সব আভাস আভাসেই পরিসমাপ্ত, প্রাচীন কাব্যে তাদের বিকাশও নাই বিশিষ্টতাও নাই। এ যুগে সেই আভাসিত দিক্‌গুলি যদি একান্ত হইয়া আর সকল দিক্‌কে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তবেই কারো কারো মনে তাকে রোগ-লক্ষণ বা বিকার লক্ষণ অথবা অবনতি বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। যদিচ সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আগে এ কথাটাও ভাবা দরকার যে, ঐ লক্ষণগুলি অভিনব বলিয়াই কি এরূপ কঠিন বিচারযোগ্য হইতেছে, না সত্যই উহাদের মধ্যে বিকারধর্ম্ম সুপরিস্ফুট?

আমরা পূর্ব্ব মাসে বলিয়াছি যে, আর্টের অভিব্যক্তি শেষ হইয়া যায় নাই। হিগেল মনে করিয়াছিলেন যে রোমান্টিক আর্টেই আর্টের শেষ পরিণতি। কিন্তু তার পরে কত ধারায় আর্ট ধাবমান ও পূর্য্যমান, তাহা তো দেখাই যাইতেছে। আধুনিক আর্ট বিকাশমান কি বিলীয়মান তাহা বিচার করা যাইবে তখন, যখন কালের একটা পরিপ্রেক্ষণ (perspective) পাওয়া যাইবে। দীর্ঘকালের শেষে যখন কতকটা দূরে এই সব আর্ট-সাহিত্যকে ফেলিয়া দেখা সম্ভাবনীয় হইবে, তখনই আধুনিক আর্ট বিকাশমান কি বিলীয়মান তার বিচারও সম্ভাবনীয় হইবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

সচিত্র রামায়ণ। শ্রীযুক্ত ভবান রাও শ্রীনিবাস রাও ওরফে বালা সাহেব পণ্ডিত পান্ত, প্রতিনিধি, বি-এ, অন্ধ-অধিপতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও চিত্র সন্নিবেশিত। বোম্বাই, মাজগাঁও, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা, হ্যারিসন রোড, রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্সের পুস্তকালয়। মূল্য বারো টাকা। এ গ্রন্থখানি বাঙ্‌লায় এক অভিনব সামগ্রী। অন্ধ-অধিপতি রামায়ণের বিবিধ বিষয়ে বিবিধ চিত্র স্বহস্তে আঁকিয়া এ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। রামায়ণের ঘটনা ভারতবর্ষে হিন্দুর ঘরে কাহারো অবিদিত নয়—তাহারই মূল ঘটনাগুলির চিত্র এ্যালবামের ধরণে এ-পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। এ গ্রন্থে ষাটখানি ছবি আছে—সবগুলিই বেশ ভাল মোটা কাগজে ছাপা এবং বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। ছবির রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হনুমান প্রভৃতি নিতান্ত নির্জ্জীব নয়, তাহাদের মুখে-চোখে ভাব আছে; আর্ট-হিসাবে উৎকৃষ্ট না-হইলেও চলনসই। প্রত্যেক ছবির পর-পৃষ্ঠায় ছবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। য়ুরোপ হইলে এরূপ সর্ব্বজন-প্রিয় কাব্যের চিত্রাবলী এতদিনে বিস্তর বিক্রয় হইয়া যাইত। বাঙ্‌লাদেশেও রসজ্ঞ বাঙালীর অভাব নাই, তাই আমাদের আশা আছে, বাঙ্‌লাদেশের ঘরে-ঘরেও ফটো-এ্যালবামের মত এই রামায়ণের চিত্র-এ্যালবামখানি সযত্নে রক্ষিত হইবে—গৃহের শোভা ইহাতে বাড়িবে, তদ্ভিন্ন রামায়ণের ঘটনাবলীর ও পাত্র-পাত্রীর সহিত অল্পবয়স হইতেই ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত সহজ উপায়ে পরিচয়-লাভেরও সুযোগ ঘটিবে। বহিখানির বাঁধাই ছাপা প্রভৃতিও চমৎকার—বাক্সারি আকারের পেষ্টবোর্ডের বাক্সে সযত্নে রক্ষিত, অর্থাৎ ভিতর-বাহির দুইই লোভনীয়। তবে গ্রন্থের মূল্য এ-দেশের পক্ষে একটু বেশী হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ সিং। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মেটকাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। এখানি শিখ-গুরু গোবিন্দের জীবন-চরিত। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে শিখজাতির অভ্যুত্থানের বিচিত্র ইতিহাস গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবন-কথার সহিত বেশ সুশৃঙ্খল ধারায় বিবৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিক তথ্যগুলির মূল্যও যথেষ্ট আছে—কারণ লেখক গুরুমুখী ভাষা জানেন, এবং শিখজাতির প্রামাণ্য গ্রন্থাদি হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অসাধারণ। রচনার গুণে এই জীবন-চরিতখানি উপন্যাসের মতই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। পাতিয়ালার মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র সিং মাহিন্দার বাহাদুর জি, সি, আই, ই মহোদয় এ গ্রন্থ-প্রকাশে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তিনি প্রত্যেক বাঙালীরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। গ্রন্থে বহু শিখগুরুর চিত্র ও মানচিত্রাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—অর্থাৎ নানা দিক দিয়া গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস ও জীবন-চরিত-বিভাগে সম্পদ-স্বরূপ হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা-কাগজ-বাঁধাই ভাল।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅমূল্য কুমার দত্ত, আড়ংপাড়া খুলনা। কলিকাতা মেট-কাফ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা, বাঁধাই পাঁচ সিকা মাত্র। এখানি কবিতার গ্রন্থ। ভূমিকা-লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "পর পর প্রাণ-প্রতিম চারিটি পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিয়া কবি তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে এই মর্ম্মব্যথাগুলি গ্রথিত করিয়াছেন।" সুতরাং এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না—তবে অপর কবিতা-গুলিতে কিছু মাত্র বিশেষত্ব নাই। ভূমিকা-লেখকের গবেষণা-মিশ্রিত শ্লেষাত্মক টিপ্পনী পাঠ করিয়াও দুঃখের সহিত বলিতেছি, সেগুলিতে "প্রসাদ-গুণ" কিছুমাত্র দেখিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২০, সুকিয়া ষ্ট্রীট, ...



সচকিতা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

ভারতী

৪২শ বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩২৫　　[৮ম সংখ্যা

এলো শীত ঘিরে কুয়াসায়

এলো শীত ঘিরে কুয়াসায়
বরণের ব্যবসায়,
পড়ে গেল ছাই !
ধূসরের অধিকার,　　লাল নীল নাই আর
ম্লান মুখে ধরা কাঁদে তাই !
সবুজের বসবাস　　ছিল যেথা বারো মাস
আজ সেই দেব-দারু দীন,
খালি গায়ে হিমবায়ে কাঁপে সারাদিন !

ফুলবন আজিকে উজাড়,
ঝুমকো ফুলের ঝাড়
দোলেনা সোহাগে,
কামিনী সে অভিমানে　চলে গেছে কোন্‌খানে,
কাঞ্চন প্রবাসী তার আগে !
মাধবী, মালতী, বেলা, চলে গেছে ভেঙে মেলা,
উদাসিনী হয়েছে পারুল,
ফোটেনা তাম্বূল-রাগ দাড়িম্বের ফুল !

নেড়া গাছ, যেন ভাঙা খাঁচা
পরাণ পাখীটি কাঁচা
সবুজ পাখায়,
উড়ে গেছে কোন দেশ,　　কুলায়ের অবশেষ
পড়ে শুধু করে হায় হায় !
ডালপালা বাঁকাচোরা　শুকান বাকলে মোড়া'
ঝড়ে উড়ে চলে যাবে বলে',
দিন নাই, রাত নাই, অনিবার দোলে !

পলাশের অনল কোথায় ?
গোলাপের আল্‌তায়
ধুইল শিশিরে,
সোনার বরণ চাঁপা,　　পাতার তলায় চাপা
একেবারে মরে' গেল ফিরে !
বর্ণ-গন্ধে প্রাণ ভরা　　ললাটে চন্দন পরা
করবীরা নিয়েছে বিদায় !
"কুসুম ফুলের রং" আর না বিকায় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।

বাংলার ব্রত

(২)

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্য্যেরা যাঁদের দেখা পেলেন, তাঁদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্ত্য-ব্রত' বলে। এটা ঠিক যে আর্য্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব 'অন্ত্যব্রত'—ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ—নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়-ভরসা হাসি-কান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য্য এবং না-আর্য্য বা 'অন্ত্য-ব্রত'দের মধ্যে সবদিক দিয়ে, এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও, আদান-প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান-প্রদানের ইতিহাস; ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই; কেবল এই মেয়েলী ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষ অন্ত্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। পর পর স্তর পড়তে-পড়তে মাটির উপরের অংশ ক্রমে নীচে চলে যায়; তখন পুরোনো জিনিস বা পৃথিবীর পুরোনো জীব-জন্তুর সন্ধান নীচের তলায় গিয়ে জমা হয়। মানুষের ইতিহাসেও তাই। মানুষ যতই

এমন কতকগুলো জায়গা থাকে যার মধ্যে মানুষের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সঞ্চিত জিনিসগুলি ভাঁজের পর ভাঁজ পরে-পরে সাজানো থাকে;—আলমারিতে তার নিজের ব্যবহারের ছেলেবেলা থেকে বুড়ো-বয়সের পরনের কাপড়, খেলার টুকিটাকি, নানা খাতাপত্র আসবাবের মতো।

সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৌরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তারপর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতু স্তর; তারও তলায় অন্ত্য-ব্রতদের এই সব ব্রত—একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে।

এই সব অতি-পুরাতন ব্রত এখনো কেমন করে বাঙালীর ঘরে-ঘরে করা হয়, এর উত্তরে বলা চলে আমাদের সদর অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সঙ্গে-সঙ্গে তো বদলে যায়নি! সেটা কাল, তার পূর্ব্বে, এবং তার—তার—তারো পূর্ব্বে যা, আজও তা। অন্ততঃ বেশির ভাগ মেয়েলী কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনীর এবং ঠাকুরমাতে ও তাঁর ঠাকুরমাতে খুব তফাৎ নেই। শিবের বিয়ে যেভাবে হয়েছিল Bar-at-lawর বিয়েও ঠিক সেই-ভাবেই এখনো ঘটছে! শুধু আমাদের দেশে নয়, ইউরোপেও এমনি Roman Lawর মতো অনেক জিনিষই

কাজেই এই ব্রতগুলি মেয়েদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে এতকাল চলে আসা আশ্চর্য্য নয়। মানুষ মরে যায়, জাতিকে জাতি লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু তাদের ইচ্ছা এবং চেষ্টার প্রবাহ তাদের পরেও বর্ত্তমান থেকে কাজ করতে থাকে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীর এমন দুর্দ্দশা ক্রিশ্চিয়ান জাতিরা করলে যে তাদের পৃথিবীতে থাকবার জায়গাই রইল না! কিন্তু তাদের শিল্প, তাদের মন্দির-মঠ, ঘরবাড়ি কতক মাটির মধ্যে, কতক মাটির উপরে জঙ্গলে, কতক বা লোকস্মৃতির অন্তঃপুরে বেঁচে রইল,—যারা মারলে তাদেরই দিয়ে যারা মরল তাদের ইতিহাস বলবার জন্য! বাংলার এই ব্রতগুলিও তেমনি আমাদের মেয়েদের দিয়ে তখনকার অন্তব্রতচারিণীদের জীবন্ত বর্ণনা;—কখনো আলপনার শিল্পে, কখনো কবিতা নাটক ও সাহিত্য কলার মধ্যে দিয়ে, কখনো-বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে। এই ছবির উপরে কালে কালে যে-সব নানা-মুনির আঁচড়, নানা দিক থেকে নানা জঞ্জাল পড়েছে সেগুলিকে আস্তে আস্তে না সরিয়ে দেখলে আমরা কিছু যে দেখতে পাবো তাতো বোধ হয় না।

মেয়েদের মধ্যে ব্রতগুলি এখন যেভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকেই ব্রত-অনুষ্ঠানের আদর্শ বলে নিতে পারি কি না প্রথমে সেটা দেখা যাক; এবং সেটা যদি আদর্শ ব্রত না হয় তবে ব্রতের আদর্শটা পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাই কি না দেখি। মানুষের এবং সব জীবেরই বিচিত্র কামনা, চরিতার্থ হবার পূর্ব্বে, বিচিত্র চেষ্টায় আপনাকে ব্যক্ত করে। তৃষ্ণা জাগল, জলপান ক্রিয়াটি কল্লেম, তৃষ্ণার শান্তি হল। ক্ষুধা বা খাবার কামনা জাগল, আহার্য্য সংগ্রহ, রন্ধন-ব্যাপার পরিবেষণ ও ভোজন-ক্রিয়া করলেম, ক্ষুধার শান্তি হল। ধনের কামনা জাগল, কাজ করতে দেশ বিদেশ চল্লেম।—এইভাবে মানুষ আজীবন কামনা ও তার চরিতার্থতার নানা ক্রিয়া করে চলেছে। কি অনুষ্ঠান করলে যে কি হবে, তার কতক মানুষ আপনা-হতেই আবিষ্কার করে; কতক দেখে শিখে নেয়; কতক ঠেকে শিখে নেয়—এমনি। জীবনের কামনা যতক্ষণ না মরণে গিয়ে থাম্‌ছে ততক্ষণ, ধরতে গেলে, সমস্ত জীবজন্তুতে মিলে বিশ্বব্যাপী একটা ব্রত-অনুষ্ঠান করছে। জলের কামনা কচ্চি কিন্তু উঠে গিয়ে জলের ঘটিটা না ধরে, ঘরে বসে জলখাবার ভঙ্গীটা অনুষ্ঠান করছি, কিম্বা জলের কামনায় চলেছি উনুনের ধারে—এ হলে কামনা চরিতার্থ হলনা, কাজেই যে অনুষ্ঠান কল্লেম সেগুলো ভুল অনুষ্ঠান হল। ব্রতে জলের কামনা জলরূপে এবং পান-ক্রিয়া হয়ে ফোটা চাই। এবং যখন এটা হল তখনই কামনায় ক্রিয়া যোগ হয়ে ঠিক ফলটি পাওয়া গেল। মানুষের এই সহজ-বিবেচনার ছাঁচেই কতকটা তাদের আদিকালের ব্রতগুলি ঢালা হয়েছে দেখা যায়।

একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত-অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া; কিন্তু ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এক কাজ এক-উদ্দেশে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হল—একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান

হয়ে উঠছে। একের সঙ্গে অন্য দশ-জনে কেন যে মিলছে—কেন যে একের অনুকরণ দশে করছে—সেটা দেখবার বিষয় হলেও আমরা সে-সব জটিল প্রশ্নে এখন যাবো না। একজনকে দিয়ে নাচ চলে কিন্তু নাটক চলে না; তেমনি একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা চলে কিন্তু ব্রত-অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুইই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম; আর-একটি দশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাৎ। ব্রত যে কি ও ব্রত যে কেন তা এদেশের এবং অন্য দেশের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আমেরিকার 'হুইচল' জাতির মধ্যে বৃষ্টি কামনা করে একটি ব্রত ঃ—একটি মাটির চাকৃতি বা সরা; তার একপিঠে আল্পনা দিয়ে সূর্য্যের চারিদিকে গতিবিধি বোঝাতে ক্রুশের মত একটা চিহ্ন; সেই চিহ্নের মাঝে একটি গোল ফোঁটা—মধ্যদিনের সূর্য্যকে বুঝিয়ে; এরি চারিদিকে সরার কিনারায় সব পর্ব্বতের চূড়া, এবং চূড়াগুলির ধারে ধারে ধান-ক্ষেত বোঝাবার জন্যে লাল ও হলুদের সব বিন্দু; তারি ধারে বৃষ্টি বুঝিয়ে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা টান। সরার অন্যপিঠে লাল-নীল-হলদে রঙের বাণে ঘেরা চক্রাকার সূর্য্যমূর্ত্তির আল্পনা লিখে পূজা বাড়িতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আল্পনা দিয়েই ব্রত শেষ, হয়তো বা ছড়াও কিছু বলা হয়।

এটি বৃষ্টির পরে আত্মীয়-স্বজনের বিদেশ থেকে, সমুদ্রযাত্রা থেকে, জল-পথে স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায়। ভাদুলীর মূর্ত্তি—জোড়াছত্র মাথায় জোড়া-নৌকায় লিখে, চারিদিকে নদী সমুদ্র কাঁটাবন নানা হিংস্র জন্তু নৌকো ইত্যাদি আল্পনায় দিয়ে, এই ব্রত করা হয়। এক-একটি আল্পনার চিত্রে ফুল* ধ'রে, এবং সেই আল্পনা যে কামনার প্রতিচ্ছবি একটির পর একটি ছড়ায় সেই কামনাটি উচ্চারণ ক'রে—যেমন নদীর আল্পনায় ফুল ধরে বলা "নদী, নদী! কোথায় যাও? বাপ-ভায়ের বার্ত্তা দাও।" —এমনি প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন আল্পনাতে রকম-রকম ছড়া ব'লে ফুল ধরে ভাদুলীকে প্রণাম ক'রে ব্রত শেষ। যেমন এই ব্রতে, তেমনি অন্য অন্য ব্রতেও কখনো ফুল, কখনো সিঁদুরের ফোঁটা, এমনি নানা জিনিষ এক-একটি আল্পনার উপরে রেখে ছড়া-কাটা ও শেষে ব্রতকথা শোনা হচ্ছে এ দেশের ব্রত করা। ব্রতের ফুল ধরায় আর পূজার ফুল দেবতার চরণে দেওয়ায় একটু তফাৎ রয়েছে। ব্রতে ফুল ধরার অর্থ এ নয় যে নদীকে কি বাঘ মোষ ইত্যাদির চিত্রমূর্ত্তিকে ফুল দিয়ে উপাসনা; নদীর কামনা শেষ, বনের কামনা শেষ এইটে মনে রাখবার জন্যেই ফুলটা;—কতকটা হিসেবের খাতায় লাল-পেন্সিলের দাগ—গণনা ঠিক রাখতে। যার উপর ফুল পড়লো তিনি সাক্ষী রইলেন যে ব্রতী তার কামনা জানিয়েছে; যেমন বসুধারা ব্রতের ছড়াটিতে স্পষ্ট বলা হল—

"অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,

অষ্টবসু অষ্টতারা তোমরা হলে সাক্ষী,
আট দিকে আট ফুল আমরা রাখি ॥"

দুই দেশের দুটি ব্রতের মধ্যে একই জিনিষ কতকগুলি রয়েছে। কিছু কামনা করে দুটোই করা হচ্ছে। কামনার প্রতিচ্ছবি আল্পনায়; যেমন জল-পথে নিরাপদে আসার কামনা নদীর আল্পনায় ব্যক্ত হচ্ছে। এমনি কামনার প্রতিধ্বনিটি দিচ্ছে ছড়া; যেমন—"নদী নদী! কোথায় যাও? বাপ-ভায়ের বার্ত্তা দাও।" এই হল—জলযাত্রীর খবর যখন জলপথে ছাড়া বিনা-তারের সাহায্যে আকাশ দিয়ে আসবার সম্ভাবনা ছিল না। ব্রতের পর সকল ব্রতীরা মিলে ব্রতকথা শোনা। ব্রতের এ অংশটার সঙ্গে কামনার যোগাযোগ এবং অনুষ্ঠানেরও যোগাযোগ ততটা নেই। কেননা দেখি কোনো ব্রতে কথা আছে, কোনো ব্রতে নেই; এটা কতকটা ক্রিয়াকর্ম্ম শেষ করে গল্পগুজব করা—গ্রামের পাঁচজনে মিলে। ব্রতে এই সবই রয়েছে—কবিতা চিত্র উপাখ্যান গন্ত পন্ত এবং মণ্ডণ শিল্প! এর মধ্যে ছড়াগুলি সব একরকম নয়; কোথাও দেখবো সেগুলি নাটকের মত পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্ক ভেদে সাজানো। যদিও খুব ছোট কিন্তু এই সব ছড়াকে অভিনয় করার উদ্দেশেই যে গাঁথা হয়েছে সেটা বেশ বোঝা যায়। ব্রতগুলিকে সম্পূর্ণ-আকারে যখন দেখবো তখন পরিষ্কার বোঝা যাবে সেটা নাটক কি ছড়া। ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা নাট্যকলা নৃত্যকলা গীতকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্য্যন্ত পাচ্ছি।

আমাদের কাছে তুচ্ছ জিনিষ নয় এবং শিল্প ও আর আর সভ্যতার লক্ষণ যাদের মধ্যে পাওয়া শক্ত এমন কোনো বর্ব্বর জাতির অন্ধ-বিশ্বাসের নিদর্শন বলেও এগুলিকে ধরব না।

আর্য্যেরা যাঁদের অন্য-ব্রত অকর্ম্মা দস্যু দাস ইত্যাদি বলছেন, এই সব ব্রত এবং ভারতবর্ষে শিল্প কলার ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সেই সব অন্যব্রতদের সম্বন্ধে অন্য রকম সাক্ষ্য আমরা পাচ্ছি। যেমন বাস্তুবিদ্যা, ময়শাস্ত্র; এবং ময় ছিলেন দানব! আর্য্যেরা যখন ইন্দ্রকে হোম করে যুদ্ধে বিজয় কামনা করছেন, ততক্ষণ অন্য-ব্রতরা তাদের পুরী-সকল অস্ত্রশস্ত্রে পাষাণ-প্রাচীরে সুদৃঢ় করে তুলছে—ইন্দ্রকে খুসি করতে বসে না থেকে। এবং সে সময় তাদের মেয়েরা যে কি ব্রত করছে তারও কতকটা আভাষ 'রণে এয়ো' ব্রতের এই ছড়াটি থেকে আমরা পাচ্ছি:—"রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে প্রয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।" এ কামনা যাদের মেয়েরা করতে পারে তারা অন্যব্রত হলেও আর্য্যদের চেয়েও যে সভ্যতায় নীচে ছিল তাতো বলা যায় না। রণচণ্ডীর যে মূর্ত্তিখানি এই ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, মেয়েদের হৃদয়ের যে একটি সংযত সুশোভন আদর্শ আমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তাতে করে তাঁদের অন্যব্রত ছাড়া, অকর্ম্মা অমন্ত্র এসব উপাধি দেওয়া চলেনা।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের দিক দিয়েও আর্য্যজাতি এই সব অন্য-জাতির চেয়েও বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

স্বীকার বৈদিক আর্য্যদেরও মধ্যে অনেক দেরীতে ঘটেছে। তার পূর্ব্বে জলের এক দেবতা; আগুনের দেবতা; মেঘের দেবতা; বৃষ্টির দেবতা; এমন কি মণ্ডুক পর্য্যন্ত। অন্ত-ব্রতদের মধ্যেও এই সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখি। যেমন বেদের 'সূর্য্য' ইজিপ্তে 'রা' অথবা 'রাআ' মেক্সিকোতে 'রায়মী' বাংলায় 'রায়' বা 'রাঈ'। বেদের অনেক দেবতাকেই আমরা অন্ত-ব্রতদের মধ্যে খুঁজে পাবো। নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে, নানা সব ঘটনা, মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য-কামনায়, সৌভাগ্য-কামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে, কি আর্য্য কি অন্তব্রত সব দলেই,—এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের ব্রত-অনুষ্ঠানের আর-এক পরিচ্ছেদ আমরা পড়তে পাই। লোকে আর্য্যধর্ম্মের চরম এক-নিয়ন্তার নিষ্কাম উপাসনায় গিয়ে পৌঁছে হিন্দু-ধর্ম্মের নানা দেবদেবী আবার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেছে;—সেই প্রাচীন অবস্থা, সেই অন্তব্রতদের সমান অবস্থায় আর-বার ফিরে যাচ্ছে মনের গতি! কেবল এইটুকু তফাৎ যে, এখানে অন্তব্রতদের দেবতাকে এবং সেই-সেই দেবতার ব্রত-অনুষ্ঠানকে আর্য্যদের মতো সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে, তাদের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা চলেছে। হিন্দুধর্ম্মের ভাবটি,—সবাই নিজের নিজের ধর্ম্মাচরণ করতে থাকে এটা নয়, সবাই আসুক এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কবলে; এবং এরি জন্য শাস্ত্রের ছাঁচ সবটার উপরে বেড়া-জালের মতো দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকারেরাই এর সাক্ষী দিচ্ছেন; যেমন ব্যাসদেব বলছেন—"দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্রং, সগোত্রধর্ম্মং নহি সংত্যজেচ্চ।" অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র অবিরোধী; যে দেশ-ব্যবহার সেইটেই প্রথম পালনীয়; কিন্তু সগোত্র পরিত্যাগ করা উচিত নয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে স্ত্রীলোকদিগের হিন্দু-অনুষ্ঠেয় কার্য্য অর্থাৎ "যে যে কার্য্য তাহারা ধর্ম্মবোধে করিয়া আসিতেছে অথচ মুনিপ্রণীত কোন বচনপ্রমাণে যে সকল ব্যবহার ও ক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়না তাহা যোষিৎ ব্যবহার সিদ্ধা" বলে ধরেছেন।

পশ্চিম-দেশে 'হোলির' উৎসব একটি অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। মেড়া পোড়ানোর মতো একটা অনুষ্ঠান এখনো Bohemiaর গ্রামে গ্রামে চলছে। সেখানে এই উৎসবকে বলে—"Driving out the death"—"In Bohemia the children carry out a straw puppet and burn it. While they are burning it they sing— 'Now carry we death out of the village, the New Summer into the village,'" &c. কিম্বা "We have carried away death and brought back life".

এই যে পশ্চিম-দেশের হোলি-উৎসব

ধরার জন্যে মীমাংসা-দর্শনে হোলিকাধিকরণ বলে একটা অধ্যায় লিখতে হয়েছে। এবং এই অধ্যায়ে যে-সমস্ত হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের বা ব্যবহারের বেদাদি-শাস্ত্র-প্রমাণ পাওয়া যায়না সে-সমস্তই হোলিকাধিকরণে ন্যায় মূলক সিদ্ধ বলা হয়েছে। বিলাতের May pole আমাদের চড়ক; গ্রীসের Spring festival বসন্ত-উৎসব এদেশের হোরি; এবং চাঁচড় মেড়াপোড়ানো, শীতকে তাড়িয়ে বসন্তের আগমনের রূপক থেকে এসেছে। এই ঋতুর উৎসবের অনুষ্ঠানে কোথাও মেষ কোথাও ষাঁড়, কোথাও ভল্লুক এবং কোথাও বা মানুষ বলির প্রথা রয়েছে। এটিকে হিন্দুশাস্ত্রকার মেনে নিলেন এবং এর সঙ্গে সমস্ত লৌকিক ব্রতকে হিন্দুর বলে স্বীকার করেও নিলেন দেখছি; কিন্তু শুধু এইখানে শাস্ত্রকারদের কর্ম্ম শেষ হলনা; পুরানো এবং অশাস্ত্রীয় ব্রতগুলোকে রূপান্তর করে শাস্ত্রীয় বলে চালাবার চেষ্টাও হয়েছে দেখি। আবার নতুন নতুন ব্রত, নিজেদের মনগড়া, তাও সৃষ্টি হচ্ছে দেখা যায়। যেমন অক্ষয় তৃতীয়া, অঘোর চতুর্দ্দশী, ভূতচতুর্দ্দশী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, এমনি কতকগুলি ব্রত তিথি-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বিশেষ তিথিতে যদি কোনো পুণ্যকার্য্য করা যায় তবে তার দ্বারা মানুষের পুণ্য অর্জ্জন এবং সৌভাগ্য ঘটে— এই হল ব্রতগুলির মোট কথা। আর কতকগুলি ব্রত হিন্দুদের দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য। যেমন অনন্ত ব্রত ইত্যাদি। কতকগুলি গ্রাম্যদেবতার ব্রত,—পুত্র কামনা

এগুলি মেয়েরাই করে; যেমন অরণ্যষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, নিত্যষষ্ঠী, সুবচনী, শীতলা, বুড়োঠাকরুণ, ঘেঁটু, কুলাই, মুলাই ইত্যাদি।

এই সব গ্রাম্য-দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ কতকগুলি শাস্ত্রীয় দেবতা এবং তাঁদের ব্রত রয়েছে; যেমন কার্ত্তিকের ব্রত। ষষ্ঠীদেবী পুত্রদান করেন, কার্ত্তিকও তাই। তারপর কতকগুলি ব্রাহ্মণদের মন-গড়া ব্রত—যেমন দধিসংক্রান্তি, কলাছড়া, গুপ্তধন, ঘৃতসংক্রান্তি, দাড়িম্বসংক্রান্তি ধন-গছানো। এগুলি কেবল নৈবেদ্য আর দক্ষিণার লোভ থেকে পূজারীরা সৃষ্টি করেছে। কলাছড়ায় ব্রাহ্মণকে কলা দান; সন্দেশের ভিতর পয়সা দিয়ে গুপ্তধন; ঘৃত দাড়িম্ব এইসব জিনিষ বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ব্রাহ্মণকে দিলে ভালো হয়—এই ব্রত-গুলির মূল-কথাটা এ ছাড়া আর কিছুই নয়! তারপর, কতকগুলি ব্রত সম্পূর্ণ মেয়েদের সৃষ্টি; যেমন, আদর-সিংহাসন—স্বামীর আদর কামনা করে একটি স্বামীসোহাগিনীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আদর-আপ্যায়নে খুসি করা—এবং আরো অনেক অশাস্ত্রীয় ব্রত, ঋতুর উৎসব, এর মধ্যে আসছে। এই যেগুলি সম্পূর্ণ মেয়েদের ব্রত, এইগুলিই হল লৌকিক বা লোকপরম্পরায় পুরাকাল থেকে দেশে চলে আসছে। এর মধ্যে শাস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ দুয়েরই জায়গা নেই। যদিও এইসব ব্রত অনেক শাস্ত্রের মধ্যে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়েছে তবু এখনো অনেক-গুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা লৌকিক-ব্রতের স্থান কেমন করে দখল করতে চাচ্ছে, নতুন-নতুন ব্রত এবং

সেটাকে খুঁটিয়ে দেখতে হলে, আর-একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখতে হয়; সুতরাং দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে সেটা বোঝাবো।

আদর-সিংহাসন ব্রত—এটি সম্পূর্ণ মেয়েলী ব্রত ঃ—"মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এক স্বামী-সোহাগিনী সধবা স্ত্রীকে যত্ন পূর্ব্বক নিজগৃহে ডাকিয়া আনিয়া পিঁড়ালির দ্বারা বিচিত্র সিংহাসন রচনা করিয়া তদুপরি তাহাকে উপবেশন করাইবে, নাপিতাঙ্গনা দ্বারা হস্তপদের নখাদি ছেদন করাইয়া অলক্তক রাগে চরণদ্বয় রঞ্জিত করিয়া দিবে এবং তৈল হরিদ্রা ও কবরী বন্ধন করতঃ সীমন্তদেশ সিন্দুর-রাগে রঞ্জিত করিবে এবং পুষ্পমালা প্রদান পূর্ব্বক সুগন্ধ দ্রব্য গাত্রে লেপন করিবে, পরে মনোহর দ্রব্যজাত সমাদর পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিবে। এইরূপে সমস্ত বৈশাখ প্রতিদিবস এক এক জন অথবা এক জনকেই আদর অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা। বর্ষ-চতুষ্টয় পূর্ণ হইলে উদ্‌যাপন!" স্বামীর সোহাগ কামনা করে এই মানুষ-পূজা মেয়েদের মধ্যে খুব চলছে দেখে পূজারী-ব্রাহ্মণদের লোভ হল; অমনি তাঁরা এক ব্রত সৃষ্টি করলেন "ব্রাহ্মণাদর।" "মহাবিষুব সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ মাস প্রতিদিন এক এক অথবা একই ব্রাহ্মণকে নানা উপকরণে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে। চারিবৎসরে উদ্‌যাপন।" এমনি, মধুসংক্রান্তি মিষ্টসংক্রান্তি—নিজের কথা মিষ্ট হবে এবং শাশুড়ি-ননদের বাক্য-যন্ত্রণা সইতে হবে না এই কামনা করে মেয়েরা যেমন নিজেদের মধ্যে ব্রত করছে অমনি মধু আর মিষ্টান্নের চারিদিকে 'ব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীতসহ লড্ডুক দান কর'—বোলে।

তারপর, গ্রাম্যদেবতার পূজোগুলি; যেমন মনসা, শীতলা, সত্যপীর। এগুলিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছু সুবিধা করে নিলেন। মুসলমানদের পীরকে লোকে যেমন পূজো দিতে আরম্ভ, অমনি তাঁকে সত্যনারায়ণ বলে প্রচার করে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম্ম দখল বসালেন! কিন্তু বাংলায় সত্যনারাণের যে পাঁচালী তাতে পীরকে মুসলমানী পোষাকেই দেওয়া হয়েছে। কথা পর্য্যন্ত উর্দ্দু, যেমন—"জয় জয় সত্য-পীর সনাতন দস্তগীর" ইত্যাদি। এই মুসলমান পীরের উপাসনা ও সির্ণি ভট্টাচার্য্যদেরও ঘরে চলে এসেছে ও চলছে, কিন্তু এরি মধ্যে বাংলায় আজকাল ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা এই ব্রতে মুসলমানী অংশটাকে একেবারে চেপে দেবার চেষ্টায় রয়েছেন। "ব্রতমালা বিধানের" ভূমিকায় ভাটপাড়ার শ্রীবীরেশ নাথ শর্ম্মা লিখছেন—"সত্যনারায়ণের বাঙ্গলা পাঁচালী বহু পুরোহিতের অসম্মত বলিয়া ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহা সন্নিবেশিত করিলাম না—"! পীরের সির্ণি বা ভোগটা হচ্ছে সুজি, বাতাসা, হিন্দুয়ানীতে বাধে না এমন সব জিনিষ; এবং পায়েসের দলে সেটা প্রায় চলে গেছে। এখন, বাংলা পাঁচালী, যেটা থেকে মেয়েরা পর্য্যন্ত সহজে বুঝতে পারে যে পীর তিনি পীরই;—বিষ্ণুও নন্ সত্যনারায়ণও নন্, সেই পাঁচালীটাকে লোপ করে দিতে পারলেই সত্যনারায়ণের হিন্দুত্ব নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে।

আর-কতকগুলি ব্রত; যার নামটা রয়েছে

নূতন,—যে-ভাবে পেটেন্ট ওষুধের নকল হয়ে থাকে কতকটা সেইরূপে! কুক্কুটী ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোট-নাগপুরের পার্ব্বত্য জাতির এ ব্রতটি; কুক্কুটী হলেন তাদের দেবী; এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে, তেমনি কুক্কুটী-দেবীকেও এককালে লোকে পুজো দিতে আরম্ভ করেছিল। মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ এবং তেজস্বী বহু-সন্তানলাভ হচ্ছে কুক্কুটী ব্রতের ফল। আমাদের শাস্ত্র এটিকে যেমন করে গড়ে নিয়েছে তাতে ব্রতকথার সঙ্গে অনুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অনুষ্ঠানের যে সঙ্কল্প তার সঙ্গে ব্রতকথার যে কামনা তারও মিল নেই। সংস্কৃত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্প হল, যথা—আস্তে আদি ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য যাবজ্জীব-পর্য্যন্তম্ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পাষণ্ডধর্ম্মরাহিত্য পুত্রপৌত্র-ধনধান্তাতুলসর্ব্ব-সম্পত্তিপ্রাপ্তিপূর্ব্বক শিবলোকপ্রাপ্তিকামা যথাশক্তি যথাজ্ঞানং ভবিষ্যপুরাণোক্ত কুক্কুটী-ব্রতমহং করিষ্যে।" পাছে কুক্কুটী-ব্রত করে অহিন্দু-পুত্রসন্তান হয়, সেজন্ত আগেই সাবধান হওয়া হচ্ছে—"পাষণ্ডধর্ম্মরহিত পুত্র" যেন হয়। তার পর "শিবলোকপ্রাপ্তি।" সেখানে কুক্কুটের আদি-পুরুষ যে ময়ূরের ছানা, তর্কের বেলায় চাই কি, তাঁকে হাজির করা যেতে পারে! অনুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাবে আটঘাট বেঁধে পণ্ডিতেরা ব্রতকথাটিকে কাটা-ছাঁটা করতে বসলেন। ব্রতকথাগুলি হচ্ছে ব্রতটির উৎপত্তির ইতিহাস। সেটাকে ঠিক রাখলে তো ধরা

ভাষায় বলা চাই, কাজেই ব্রতীর কামনা ও ব্রতের ফলাফল সেখানে ঠিকঠাক বজায় রাখা দরকার। শাস্ত্রে এই সমস্তার যে ভাবে মীমাংসা কল্লেন তা এই:—ফলটি পরিষ্কার রইলো—মৃতবৎসা-দোষ-নিবারণ হয়, দীর্ঘ-জীবী পুত্র হয় এবং সুখে কালাতিপাত ও অন্তে শিবলোক। এ ক'টা বেশ সহজে মিলিয়ে দিয়ে পণ্ডিত ব্রতের উৎপত্তি নিয়ে পড়লেন। রাজা নহুষের রাণী চন্দ্রমুখী এবং পুরোহিতপত্নী মালিকা দেখলেন সরযু-তটে উর্ব্বশী, মেনকা এঁরা হাতে আটথী সুতোর আট-গাঁট দেওয়া ডোরা বেঁধে শিবপুজো কচ্ছেন। রাণীর প্রশ্নে অপ্সরাসকল উত্তর দিলেন তাঁরা কুক্কুটীব্রত কচ্ছেন। রাণী স্বচক্ষে দেখলেন শিবপুজো হচ্ছে কিন্তু শুনলেন যে সেটা কুক্কুটীব্রত। গল্পের বাঁধুনিতে মস্ত একটা ফাঁকি রয়ে গেল। তার পরে মালিকা আর চন্দ্রমুখী ব্রতের অনুষ্ঠান-প্রণালী জেনে নিলেন। এখানে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটাই দেওয়া হল। তার পর ব্রতের নামটা কেন যে কুক্কুটীব্রত হল তার একটা মীমাংসা পণ্ডিতেরা আবিষ্কার কল্লেন:—রাণী চন্দ্রমুখী ব্রত করতে ভুল্লেন এবং মালিকা ভুল্লে না। সেই ফলে চন্দ্রমুখী-সুন্দরী হলেন বানরী; এবং মালিকা হলেন কক্কুটী ব্রতের ফলে জাতিস্মরা কুক্কুটী। তার পর জন্মে জন্মে মালিকা ব্রত করে সুখে থাকেন, চন্দ্রমুখী দুঃখ পান; শেষে একদিন মালিকা দয়া করে চন্দ্রমুখীকে আবার ব্রত করতে শেখালেন। কুক্কুটী-জন্মেও মালিকা ব্রত করেছিলেন সেই জন্য ব্রতের নাম হল কুক্কুটী

ফাঁকি সেগুলো যে পণ্ডিতেরা ধরতে পারেনি তা নয়। ফস্কা-গেরোকে আবার গেরো দিয়ে তাঁরা কসে কুক্কুটীব্রতের সবটাকে ভবিষ্য-পুরাণের সঙ্গে বাঁধলেন; ব্রতকথা আরম্ভ হল—শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—বার বার পুত্রশোকে দেবকী রোদন কচ্চেন দেখে লোমশ মুনি তাঁকে এই কুক্কুটীব্রতকথা বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এ এক রকমের প্রক্রিয়া, যেখানে ব্রতের নাম হুবহু বজায় রেখে তার অনুষ্ঠান ও উৎপত্তির ইতিহাস একেবারে বদলে ফেলা। আর-একরকমের কারিগরি হচ্ছে নামটা পুরো নয় তো আধাআধি বদলে দেওয়া—অনুষ্ঠান অনেকটা বজায় রেখে। প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা এই রা'ল দুর্গা ব্রতটি। হরপার্ব্বতী পাশা খেলছিলেন; হঠাৎ শিব পাশা ফেলে বল্লেন—'কার জিৎ?' দুর্গাও বল্লেন—'কার জিৎ?' বড়ুর ব্রাহ্মণ ছিলেন পাশে, বলে উঠলেন—'মা'র জিৎ।' অমনি শিবের অভিশম্পাতে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি। দুর্গার দয়া হল। তিনি তাঁকে সূর্য্য-অর্ঘ দিয়ে রা'ল দুর্গার ব্রত করতে শিখিয়ে দিলেন। এখানে সূর্য্যও রইলেন, দুর্গাও রইলেন। সূর্য্যের প্রাচীন নাম রা' বা রা'ল বোঝালে এটি সূর্য্যপূজা; কিন্তু "রা'ল দুর্গা" বল্লে এটি দুর্গার ব্রত। এই ভাবে 'অথ ব্রতোৎপত্তি' বিবরণ লেখা হল দুই দেবতারই মান বজায় রেখে যেমন—

নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর।
ভক্তিবাহনে প্রভুদেব দিবাকর।
হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার।
যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার।
শুন সবে সর্ব্বলোক হয়ে হরষিত।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা সূর্য্যের চরিত।
(ইত্যাদি)

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি কি কি প্রক্রিয়ার ফল তার কতকটা আভাষ পাওয়া গেল। সব ব্রতগুলিকে সমগ্র ভাবে দেখার কাজ বড় সহজ নয়। প্রকাণ্ড একটা ব্রতপ্রকরণ না লিখলে শাস্ত্রপুরাণের জট ছাড়িয়ে আমাদের দেশের হিন্দুধর্ম্মের পুরাণের পূর্ব্বেকারও ব্রতগুলির নিখুঁৎ চেহারা বার করে আনা কঠিন। তবে ব্রতগুলি যে "আর্য্যগৃহের এবং আর্য্য-হৃদয়ের ছবি নয়" সেটা ঠিক। আর্য্যের চেয়ে বরং অনার্য্যের—অন্ত্য-ব্রতদের গৃহলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এই সব ব্রতের আল্‌পনায়, ছড়ায়, ব্রতকথায় সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনার্য্য-অংশ শাস্ত্রীয়-ব্রতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে এবং সেই অংশগুলোকে হিন্দুপুরাণ ও তন্ত্রমন্ত্রের আবরণে ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে কিন্তু সব-সময়ে সে চেষ্টা সফল হয় নি দেখি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলঙ্কী

এবার পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়ে দেখি, গাঁয়ের শিবতলার ঘাটে লোক একেবারে গিস্‌গিস্ করছে। শুনলুম, সেখানে নাকি কে-একজন সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গেড়ে বসেছে, আর তাকে দেখে গাঁয়ের যত-সব নিষ্কর্ম্মার ভক্তির সাগর একেবারে উথ্‌লে উঠেছে।

সাধু-সন্ন্যাসীর জন্যে আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। হাতের ঐ ত্রিশূল নুইয়ে সহরের ভিতরে তারা প্রণামী আদায় করে; আবার ঐ ত্রিশূলই উঁচিয়ে এবং খুঁচিয়ে সহরের বাইরে তারা নির্জ্জন পথের একলা-পথিকের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়! তাদের ঐ ছাইমাখা দেহ আর গেরুয়া-রঙের কাপড়, ও-সব হচ্ছে পুলিস ভোলাবার ছদ্মবেশ! গুণ্ডা-বদ্‌মায়েসকে দেখ্‌লেই চেনা যায়, তাই তাদের আমি ততটা ভয় করি না—যতটা ভয় করি এই ছদ্মবেশী সাধু-সন্ন্যাসীদের। …… কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর নামে কী মোহ আছে জানি না, তাই এ-দেশের সুধু মূর্খ বলে নয়,—পণ্ডিতরা পর্য্যন্ত সন্ন্যাসের এই জীবন্ত 'ক্যারিকেচার'গুলির পদতলে মাথা বিকিয়ে দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব!

আমার এক শিক্ষিত বন্ধু আছেন, তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-গুরুকে ভক্তি করেন দেবতার মত। গুরুকে এতটা ভক্তি করার কারণ জান্‌তে চাইলে তিনি সম্ভ্রমে উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লেন, "তুমি জান না হে, আমাদের গুরু হচ্ছেন অসাধারণ লোক। তিনি একাসনে বসে পাঁচবোতল মদ, দশ-ছিলিম গাঁজা, একটা আস্ত পাঁটা খেয়ে হাস্‌তে-হাস্‌তে হজম কর্‌তে পারেন!" আমি বল্লুম "এইজন্যে তুমি তাঁকে ভক্তি কর?" তিনি বল্লেন, "হ্যাঁ।"… … …

বিকালবেলায় কি কর্‌ব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম, যাই, একবার ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে শিবতলার ঘাটের সন্ন্যাসীটিকে দেখে আসি। সারাদিন লোকমুখে সন্ন্যাসীর যে-রকম গুণগান শুন্‌ছি, তাতে-করে' লোকটার মিথ্যা ভড়ং আর বাজে বুজরুকি ভেঙ্গে দেবার জন্যেও মনের মধ্য থেকে একটা দুর্দ্দম ইচ্ছা ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল!

শিবতলার ঘাটে গিয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। সেই জনতার মধ্যে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। বাঙ্‌লাদেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা আর মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা নারীজাতির কাছে একবিষয়ে সমান-ঋণী; —অন্তঃপুরের নির্ব্বিচার উদারতার গুণেই আজ-পর্য্যন্ত এঁরা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেঁচেবর্ত্তে আছেন!

চারপাশের পাঁচ-সাতখানা গ্রাম থেকে আজ এখানে লোক এসে জুটেছে—সেই শশব্যস্ত জনতার মধ্যে সন্ন্যাসী-ঠাকুরের ভস্মাবৃত দেহ ও লট্‌পটে জটাজুট যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, প্রথমে তা কিছুতেই আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌লুম না।… … …

অবশেষে যখন ভস্মাবৃত দেহ ও দীর্ঘ

জটাজুট,—সন্ন্যাসী-ক্লাবের এই অপরিহার্য্য ইউনিফর্ম্ দেখবার আশায় জলাঞ্জলি দান কর্‌লুম, তথন হঠাৎ দেখা গেল, বটতলার বাঁধানো রোয়াকের উপরে যে লোকটির পায়ের তলায় এতগুলো লোক মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলিয়ে মর্‌ছে, তার মাথায় জটাজুটের বহর বা গায়ে কাঠকয়লার ছাই—এ-সব কোন জ্বালা-জঞ্জাল নেই! পাশেই ত্রিশূল আর ভিক্ষার ঝুলি আছে কিনা দেখবার জন্যে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে পড়্‌লুম—কী আশ্চর্য্য, সেখানে সুধু একটা দামী চাম্‌ড়ার পেটমোটা ব্যাগ পড়ে হাঁস্‌ফাস্ কর্‌ছে!

ভেক্ নেই, ভিক্ষে মিল্‌ছে! কিন্তু একটু ভাব্‌তেই এই সন্ন্যাসীটির ব্যবসাবুদ্ধি যে কতটা ধারালো, তা পরিষ্কার বোঝা গেল। ভস্মাবৃত দেহ ও দীর্ঘ জটাজুট প্রভৃতির কাছে ক্রমাগত ঠকে-ঠকে লোকের ভক্তি ক্রমেই শ্রান্ত ও 'অবিশ্বাসী' হয়ে পড়েছে—অতএব এখন ভোল্ না-ফেরালে সন্ন্যাসের ব্যবসা আর ভালোরকম চলা শক্ত!

ইতিমধ্যে 'আতাই-কোলা'র ছোটতরফ এসে সন্ন্যাসীর সাম্‌নে দণ্ডবৎ হয়ে, ঝনাৎ করে' এক গিনি প্রণামী ছাড়্‌লেন। সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ স্বরে প্রতি-নমস্কার করে' বল্লেন, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন!" ……হুঁ, ঠাকুরটির ভদ্রতা আর ব্যবসা-বুদ্ধি দুইই দিব্যি টন্‌টনে দেখ্‌ছি! ইনি চালাকের মত প্রণাম ফিরিয়ে দেন, কিন্তু বোকার মত প্রণামী ফিরিয়ে দেন না!

একটু তফাতে বসে-বসে মজা দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। কত লোক এল, কত লোক কারুকে দুটো মিষ্টি কথায় তুষ্ট করেই বিদায় কর্‌লেন। অনেকে হাত দেখাতে এল, কিন্তু সন্ন্যাসী বল্লেন ও-সব গোণা-টোনা তাঁর আসে না। কেউ-কেউ বন্ধ্যা নারীর ছেলে হবার জন্যে ধর্ণা দিয়ে পড়্‌ল, সন্ন্যাসী এই বলে তাদের মুখবন্ধ করে' দিলেন যে, খোদার উপরে খোদ্‌কারী করা তাঁর ব্যবসা নয়!

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠ্‌ল। বটতলা থেকে ভক্তের দল ক্রমেই কম্‌তে লাগ্‌ল। আমি কিন্তু তখনো উঠ্‌লুম না—এই সন্ন্যাসীটি কি দরের লোক তা না জেনে আমার যেতে ইচ্ছা কর্‌ছিল না।

বটতলা যখন প্রায় জনশূন্য, সন্ন্যাসীর চোখ তখন আমার উপরে পড়্‌ল। খানিক-ক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে, সন্ন্যাসী হঠাৎ হেসে উঠে বল্লেন, "আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করেন না, তখন এখানে বসে মিছে সময় নষ্ট কর্‌ছেন কেন?"

আমি একেবারে হতভম্ব!

সন্ন্যাসী আবার হেসে বল্লেন, "আপনি পূজোর ছুটিতে সবে আজ কল্‌কাতা থেকে এখানে এসেছেন, এসেই আমাকে অবিশ্বাস কর্‌তে সুরু করেছেন? ছিঃ, মানুষ হয়ে মানুষকে এত সহজেই কি অবিশ্বাস কর্‌তে আছে ফণীবাবু?"

তাই ত, অবাক কর্‌লে যে! আমি এঁকে অবিশ্বাস করি, আমি কল্‌কাতায় থাকি, পুজোর ছুটিতে আজই দেশে ফিরেছি, আমার নাম ফণী, সন্ন্যাসী যে সমস্তই ঠিকঠাক্

সেখানে বসে ছিল, বিষম বিস্ময়ে তাদের চোখ যেন কোটরের ভিতর থেকে ঠিক্‌রে পড়বার মত হয়ে উঠল!

তবে কি এ সন্ন্যাসী খাঁটি লোক—সত্যিই কি এঁর দৈবশক্তি আছে?... ... ... হঠাৎ সন্ন্যাসীর সাম্‌নের থালায় একরাশ টাকার দিকে আমার নজর পড়ল—সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনটা ফের রুখে আর বেঁকে দাঁড়াল।

সন্ন্যাসী খরচোখে আমার হাব-ভাব নিরীক্ষণ কর্‌ছিলেন। যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই তেম্‌নি হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্‌লেন, "ফণীবাবু, আপনি ভাবচেন যে, লোকের কাছে প্রণামী আদায় করে' যে-লোকের দিন চলে, সে নিশ্চয়ই ভণ্ড, চোর, জোচ্চোর! কেমন, আমি ঠিক বলেছি কি না?"

সন্ন্যাসী কি অন্তর্যামী? আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করলুম।

—"ফণীবাবু, যান, বাড়ী গিয়ে আপনার ফাউন্‌টেন পেন দিয়ে, আপনি যে সবুজ কালিতে লেখেন, সেই কালিতে পকেটবুকে বড়-বড় করে' লিখে রাখুন-গে যে, মানুষকে ভালো করে' না-চিনে অবিশ্বাস করা মহাপাপ।"

আমি ফাউন্‌টেন পেনে সবুজ কালিতে লিখি, এটাও সত্য!

সন্ন্যাসী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "ফণী-বাবু, এ টাকা আমি নিজের পেট-ভরাবার জন্যে নিচ্চি না—এ টাকায় আমি দরিদ্র-নারায়ণের পূজা করব।... ... সন্ধ্যা হোলো, এখন বাড়ী যান। কাল বৈকালে আবার যদি আসেন ত, আমি খুসি হব। এখানে কাঙালী ভোজন হবে, আপনি তাতে আমার সাহায্য করবেন।"

আমি সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে একখানি পাঁচ টাকার নোট রেখে অনুতপ্ত স্বরে বল্লুম, "আপনার দরিদ্র-নারায়ণের পূজায় আমার এই সামান্য অংশ গ্রহণ করুন।"

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন মুখে বল্‌লেন, "আপনার মঙ্গল হোক্।"

... ...

খুব ঘটা করে' কাঙালী-ভোজন হয়ে গেল। স্রুধু পেট-ভরে খাওয়া নয়—সেই সঙ্গে প্রত্যেক কাঙালী এক-একখানি করে' নতুন কাপড় ও চাদরও পেয়ে, হাসিমুখে সন্ন্যাসীর নামে জয়ধ্বনি কর্‌তে-কর্‌তে বিদায় হ'ল।

কাঙালী ও দর্শকের দল যখন একে-একে চলে গেল, সন্ন্যাসী তখন আস্তে-আস্তে ঘাটের কিনারায় গিয়ে নদীমুখো হয়ে বসে পড়লেন।

পূর্ণিমার রাত্রি,—তরল জ্যোৎস্নার চিকণ রৌপ্য-রঙে তুলি ডুবিয়ে, চাঁদ তখন কালো মেঘের ধারে-ধারে ঝল্‌মলে আলোর পাড় এঁকে দিচ্ছিল।

সন্ন্যাসী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। আমি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে' শেষটা তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম;—এই সন্ন্যাসীটির মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত তলিয়ে দেখ্‌বো,—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছে!

গায়ের উপরে আমার ছায়া পড়তেই সন্ন্যাসী চম্‌কে উঠে মুখ তুল্‌লেন। আমার দিকে কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "আপনি এখনো যান-নি!"

—"না, আপনার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছে কর্ছি না।"

—"তাহলে বসুন।"

সন্ন্যাসীর পাশে ঘাটের পৈঠার উপরে বসে পড়লুম।

একটু চুপ করে' থেকে সন্ন্যাসী বল্লেন, "আপনার দেখ্‌চি আমার উপরে খুব বিশ্বাস হয়েচে! যারা যত সহজে অবিশ্বাস করে, তারা তত সহজে বিশ্বাসও করে!"

আমি মৃদুস্বরে বল্লুম, "আপনার অলৌকিক শক্তি দেখেও আপনাকে যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে—"

বাধা দিয়ে ক্ষুব্ধস্বরে সন্ন্যাসী বল্লেন, "অলৌকিক শক্তি দেখে সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস! তাহলে যাদুকরের মত মহাযোগী আর কে আছে ফণীবাবু?"

—"কিন্তু যাদুকররা যে ভেল্কী দেখায়, সেটা যে একটা লোকঠকানো ব্যাপার!"

—"আমিও অলৌকিক কিছু দেখাই-নি, যা দেখিয়েছি তা আপনাকে ঠকাবার জন্যেই দেখিয়েছি। একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাক্‌লে আপনিও আমার মত শক্তি দেখাতে পার্‌তেন!"

—"কিন্তু আপনি আমাকে দেখে যে-সব কথা বলেছেন, তা কি যে-সে লোক বল্‌তে পার্‌ত?"

—"সবাই পার্‌ত! আপনার চোখ-মুখের ভাব দেখে আমি বুঝেছিলুম, আপনি আমাকে সন্দেহ কর্‌ছেন।···আপনার বাঁ-হাতে উল্কীতে নামের তিনটি আদ্য অক্ষর আছে, এফ, এন, জি। এফ আর এন-এ সাধারণত ফণীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য নাম হয় না, সুতরাং আপনার নাম আন্দাজ করাও কিছু শক্ত নয়!...এই ছোট গ্রামটিতে আমি এসেছি আজ কুড়ি-পঁচিশদিন। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবাই আমাকে দেখ্‌তে এসেছে—সবাইকে আমি চিনি। কিন্তু আপনাকে আমি কাল বিকালে প্রথম দেখ্‌লুম, তা-থেকে বুঝলুম আপনি নূতন আগন্তুক। ... এখন পূজোর ছুটি পড়েছে, অতএব পুজোর ছুটিতেই আপনি এসেছেন; আপনার পায়ের চটিজুতো, মাথার চুল-ছাঁটা, গায়ের পাঞ্জাবী—সব কল্‌কাতার হাল-ফ্যাসানের বাবুর মত, কাজেই ধরে নিলুম আপনি আস্‌ছেন কল্‌কাতা থেকে।··· আপনার পাঞ্জাবীর বুক-পকেটের এককোণে দেখ্‌লুম, সবুজ কালির অস্পষ্ট দাগ। বুক-পকেটের ও-রকম জায়গায় ও-রকম কালির দাগ সহজে লাগে না—আপনি যদি ওখানে ফাউন্‌টেন পেন গুঁজে না-রাখেন। ... ... ফণীবাবু, আপনি কত সহজে ঠকে গেছেন, দেখ্‌ছেন ত? সন্ন্যাসীর কাছে অলৌকিক ব্যাপারের প্রত্যাশা কর্‌লে এম্‌নিভাবেই ঠক্‌তে হয়! আমরা—সন্ন্যাসীরা মানুষ মাত্র;—মানুষের মতই আমাদের দেখ্‌বেন।"

সন্ন্যাসী মুখ ফিরিয়ে নদীর ওপারের দিকে তাকালেন। সেখানে গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় দেদার আলোর ফুলঝুরি ঝরে পড়ছিল—আজ যেন জ্যোৎস্নার দেওয়ালি-উৎসব ভরপুর জমে উঠেছে!...সন্ন্যাসীর কথা শুনে, আমিও বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী আবার ধীরে ধীরে বল্লেন, "আমার ওপরে আপনার বোধহয় আর একটুও শ্রদ্ধা নেই?"

—"আপনি এমন কথা জিজ্ঞাসা কর্ছেন কেন?"

—"কারণ, আপনি এখন বুঝেছেন যে, আমি কোন অলৌকিক কাজ করতে পারি না!"

—"হ্যাঁ, এ-কথা সত্যি যে আমি আপনাকে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনি নিজেই যখন আমার সে ভ্রম ভেঙে দিলেন, তখন এটা বুঝতে পার্ছি, আপনিই যথার্থ সাধু—লোক-ঠকাতে আপনি সন্ন্যাস-ব্রত নেন-নি।"

সন্ন্যাসী শূন্য-দৃষ্টিতে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে খুব মৃদু স্বরে বল্লেন, "না, লোক-ঠকাতে সন্ন্যাস-ব্রত নিই-নি—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্তে!"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা অবরুদ্ধ হাহাকারের প্রতিধ্বনি ছিল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম।

সন্ন্যাসী যেন অৰ্দ্ধস্বগত ভাবে আবার বল্লেন, "কিন্তু আজও বুঝ্তে পারি না, আমি যা করেছি তা ন্যায় কি অন্যায়…… …… আমার অবস্থায় পড়্লে অন্য লোক কী কর্ত?……আমি তা জান্তে চাই!"

—সন্ন্যাসী ঘাড় হেঁট্ করে' কি-যেন ভাব্তে লাগ্লেন। বেশ বুঝ্লুম, তাঁর মন এখন বৰ্ত্তমান থেকে একেবারে অতীতে ফিরে গেছে!

আচম্কা মাথা তুলে তিনি জিজ্ঞাসা কর্লেন, "আপনি বল্তে পারেন?"

এই অসংলগ্ন প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে আমি বল্লুম, "আপনি কি বলছেন!"

—"আমি যা করেছি তা ন্যায় কি অন্যায়?"

—"কিন্তু আপনি কী করেছেন?"

সন্ন্যাসী ধীরে-ধীরে মুখ ফিরিয়ে, শান্ত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে থেকে, বল্লেন, "ও, আপনি আমার কথা কিছুই জানেন না,—না? আচ্ছা, আজ তবে আপনাকে আমার কথা বল্ব,—দেখি, এই দুঃখ-স্মৃতির কথা প্রকাশ করে' দিয়ে প্রাণে একটু শান্তি পাওয়া যায় কিনা!"

—এই বলেই সন্ন্যাসী হঠাৎ তাঁর কথা সুরু করে' দিলেন,—তিনি কে, কাদের কথা বল্ছেন সে-সব পরিচয়ের ধার দিয়েও গেলেন না!

… … … …

"কনকলতাকে সুধু আমি ভালোবাস্তুম না, তাকে আমি পূজা কর্তুম দেবীর মত। এই কথাটি আপনাকে মনে রাখতেই হবে… … …সুধু ভালোবাস্লে তার জন্যে আমি যা করেছি, হয়ত আমার দ্বারা তা সম্ভব হোতো না; কিন্তু সম্ভব যে হয়েছে তার আসল কারণ আমি তাকে পূজা কর্তুম, পূজা!

তার প্রতি আমার এই অন্ধ ভক্তির কথা, সে জান্ত। কিন্তু আমাকে সে কি চোখে দেখ্ত, আমি আগে তা জান্তে পারি-নি।……খালি এইটুকু বুঝ্তে পার্তুম, আমাকে সে ঘৃণা কর্ত না!

লেখা-পড়ার দিকে তার কি টান্ ছিল! তাকে পড়াতে বসে, কথাপ্রসঙ্গে আমি যখন তার কাছে পৃথিবীর নানা দেশের কথা, নানা জাতির কথা, নানা সাহিত্যের

কথা সরল ভাষায় বলে যেতুম, সে তখন কী আগ্রহভরে তার ডাগর চোখদুটি তুলে আমার দিকে চেয়ে থাকৃত! তার সে দৃষ্টি আমি এখনো ভুলি-নি!

দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল আমি তাকে পড়িয়েছিলুম! ছয়বৎসর আমার সাম্‌নে সে রোজই এসে দাঁড়িয়েছে· ...সেই ছয় বৎসরের দিকে আজও আমার সমগ্র জীবন একাগ্র হয়ে আছে! আমার চোখের সুমুখেই তার কিশোরী তনুলতায় যৌবনের প্রথম ফুল ফুটে উঠেছিল; কৈশোর ও যৌবনের মিলন-ক্ষণে তার চোখে-মুখে রূপ-মহিমার যে অপূর্ব্ব শিখা জ্বলতে দেখেছি, আজ-পর্য্যন্ত আর-কোথাও তার তুলনা পাই-নি।

তখন এক দীর্ঘ স্বপ্নের মধ্যে বাস কর্‌তুম। যখন যেখানে, যে কাজে থাক্‌তুম, কনকলতার স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করে' রাখ্‌ত। পৃথিবীর এত দৃশ্য, এত শোভা, এত লোকজন, আনন্দ-উল্লাসের ঢেউ, এ-সবই যেন মনে হ'ত তুচ্ছ, অকারণ, খাপ্‌ছাড়া, —স্রষ্টার সৃষ্টি যেন সার্থক হয়েছে একমাত্র ঐ কনকলতার জন্যেই!

... ...আপনি বোধহয় বুঝ্‌ছেন, যার অবস্থা এমন,—সে কখনো মনের ভাব লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। তখনো পর্য্যন্ত মুখ ফুটে যদিও আমি কনকলতার কাছে মনের একটি কথাও খুলে বলি-নি, কিন্তু তবু হয়ত আমার মুখে-চোখে, ভাবে-ভঙ্গিতে আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। কনকলতা বোধহয় বুঝ্‌তে পেরেছিল যে,

প্রতি ঠিক শিক্ষকের ভাবের মত নয়! কারণ, পড়্‌তে-পড়্‌তে হঠাৎ মাথা তুলে ইদানীং যখনি সে দেখ্‌ত, টেবিলের এক-কোণে বসে আমি নির্নিমেষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছি, তখনি সে আবার ঘাড় হেঁট করে' ফেল্‌ত, আর তার সারা মুখখানি —কোঁকড়া চুলে ভরা ছোট্ট কপাল-খানি থেকে সুডৌল চিবুকের তলাটি পর্য্যন্ত,—একেবারে লালে লাল হয়ে উঠত! এমন-কি, তার সঙ্গে আমার চোখোচোখি হ'লে, অনেকসময়ে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে গিয়ে আর বল্‌তে পার্‌ত না!... ...কনকলতার সঙ্গে আমার ত আর নূতন পরিচয় নয়, এর আগে সে আমাকে কতবার দেখেছে, আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে, প্রাণ খুলে কত কথাই না কয়েচে! এতদিন পরে আজ তবে তার এমন ভাব কেন? এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ কেন?... ...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছে! এ-বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই,—কারণ, এদিকে রমণীর অনুভূতি পুরুষের চেয়ে ঢের-বেশী সচেতন।

এখানে আমি অনেকটা সান্ত্বনা পেতুম। আমাকে সে কি ভাবে দেখে, তা জান্‌তুম না—খালি এইটুকু দেখ্‌তে পেতুম, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যখনি তার ঘরটিতে গিয়ে ঢুক্‌তুম, তখনি তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত:—আমি গেলে সে খুসি হয়, এই-টুকুই আমার যথা-লাভ!

এর বেশী আর-কিছুর আশাও আমার ছিল না। আমি আর সে যত-কাছাকাছিই

অসম্ভবের পাঁচিল দাঁড়িয়ে, তাকে আর আমাকে আজীবন আলাদা করে' রাখ্‌বেই রাখ্‌বে! কনকলতার সঙ্গে আমার বিবাহ যে অসম্ভব, তা আমি জান্‌তুম। সমাজের পাহারা এখানে বড় কড়া—কারণ, আমি হচ্ছি ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ!

……এইভাবে দিন যাচ্ছিল। কনকলতা কখনো আমার হবে না, এ-কথা জেনেও, অন্তত এই ভেবেও আমি সুখী ছিলুম যে, তাকে ত আমি রোজ দেখ্‌তে পাচ্ছি, তার মধুর বাণী, তার কোমল স্পর্শ থেকে ত আমি বঞ্চিত নই! কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র সুখের মেঘেও আচম্বিতে আগুন লাগ্‌বার উপক্রম হ'ল!

কনকলতার বাপ-মায়ের অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, তাঁদের মেয়ের বয়স অত্যন্ত বেশী হয়ে গেছে—এইবার তার আইবুড়ো নাম ঘোচানো দরকার। অতএব অবিলম্বে পাত্র-সন্ধানের ঘটা লেগে গেল।

নদীর ভাঙন-ধরা কূলের মত আমার মনের একদিকটা যেন ধ্বসে পড়্‌ল। বুঝ্‌লুম, বিবাহ হ'লে কনকলতাকে আর-কখনো চোখেও দেখ্‌তে পাব না! অথচ এ বিবাহে বাধা দি, এমন শক্তিও আমার নেই! কিন্তু, তবু—তবু—

দুর্ভাবনায় দু-রাত্রি আমি ঠায় জেগে-জেগে কাটিয়ে দিলুম।

হঠাৎ মোহিতকে মনে পড়্‌ল। এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত তাতে-আমাতে একসঙ্গে পড়েছিলুম। এখনো তার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়—তবে কালে-ভদ্রে, পথে-ঘাটে! মোহিত গৃহস্থের ছেলে, এম এ বি-এল পাশ দিয়ে আজকাল পুলিস-কোর্টে ওকালতি কর্‌ছে। দেখ্‌তেও ভালো, জাতেও কায়স্থ। আর, এখনো অবিবাহিত।

মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ দেবার জন্যে কোঁমর বেঁধে আমি ঘটকালি সুরু কর্‌লুম। পাত্রের গুণবর্ণনা শুনে কনকলতার বাপ খুসি হয়ে এককথার উপরে আর দু-কথা বল্‌লেন না! মোহিত প্রথমটা বিবাহে নারাজ হয়েছিল; কিন্তু বরপণের পরিমাণ শুনে তার উকিলী বুদ্ধি নিম-রাজি হয়ে পড়ল এবং স্বচক্ষে যেদিন সে মেয়েকে দেখ্‌লে, সেইদিনই একসঙ্গে মোহিতের চক্ষু, মত্‌ আর বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল!

আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত হলুম। ঠিক কর্‌লুম, মোহিতের সঙ্গে এখন দিনকতক খুব মেলা-মেশা করে' আমাদের আগেকার সম্বন্ধটা বন্ধুত্বে পরিণত কর্‌তে হবে। তাহ'লে বিবাহের পরেও কনকলতা আর আমার চোখের আড়াল হবে না! এই ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই মোহিতের সঙ্গে কনকলতার বিবাহ-ব্যাপারে আমি ঘটক সেজেছি! অন্য-কোথাও বিবাহ হ'লে কনকলতাকে আমি ত আর দেখ্‌তে পেতুম না!

আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, আমি কী ভ্রম করেছিলুম! কনকলতাকে চোখে দেখ্‌তে পাব—এই সামান্য দুর্ব্বলতায় আমি তখন একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তখন জান্‌তুম না যে, সেই দুর্ব্বলতার শাস্তি আমাকে চিরজীবন ধরে ভোগ কর্‌তে হবে।

কিন্তু এক ভ্রমের উপরে আমি আবার আর এক ভ্রম করে' বস্‌লুম। এই দ্বিতীয়

ভ্রমের যে শোচনীয় ফল হয়েছিল, জন্ম-জন্মান্তরেও আমি কি তা ভুলব!

… …অনেক চেষ্টা করে'ও, কনকলতার বিবাহের আগের দিনে আমি আর কিছুতেই আপনাকে সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। কখনো যা করি-নি, সেদিন আমি মনের ঝোঁকে তাই করে' ফেল্‌লুম। জানি না, সেদিন আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম কিনা!

বিবাহের আগের দিনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। কনকলতার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব জেনেও, তাকে ছাত্রীরূপে পেয়ে এতদিন আমি তবু কতকটা পরিতৃপ্ত ছিলুম; কিন্তু এ দুর্লভ অধিকার থেকে এখন আমি বঞ্চিত হ'তে চলেছি, এই দুশ্চিন্তা আমাকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ক্রমেই কাতর করে' তুললে।

মনের আবেগে সেদিন কনকলতাকে এক চিঠি লিখে ফেল্লুম।—

"কনকলতা,

কাল থেকে তুমি আর আমার ছাত্রী নও—আমার কাছ থেকে সমাজ তোমাকে কেড়ে নেবে। তোমার অভাব আমি জীবনে কখনো ভুল্‌তে পার্‌ব না। এতদিনের পরিচয় একদিনে ভোলা যায় না,—আর, আমি ভুল্‌তেও চাই না! কারণ তোমাকে ভুললে আমি কি নিয়ে বেঁচে থাক্‌ব,—আমার অন্ধকার জীবন-পথে তোমার স্মৃতিই যে এখন পূর্ণিমার চন্দ্রালোক!

কনক, তোমাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু আমার এ প্রেম তোমার দেহকে তোমার রূপযৌবনকে প্রার্থনা করে না—এ চায় সুধু তোমার স্মৃতিকে পূজা কর্‌তে। এইটুকু বুঝে আমার এই অভাগা প্রেমকে তুমি মার্জ্জনা কোরো।

তোমার বিবাহিত জীবন সুন্দর হোক্, সফল হোক্, সুখের হোক্, এই আমার শেষ-কামনা।"

চিঠি পড়ে কনকলতার মনের ভাব কি-রকম হয়েছিল, তা আমি জানি না।

কিন্তু এখন ভাবি, উপন্যাসের হতাশ ও নির্ব্বোধ প্রেমিকের মত এই হা-হুতাশে ভরা পত্রখানা, তখন আমি লিখেছিলুম কোন্ উদ্দেশ্যে? আসন্ন বিবাহ-লগ্নে আমি কি তাকে প্রকারান্তরে এই কথাই বল্‌তে চেয়েছিলুম যে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমিও আমাকে ভুলো না—স্বামীর সংসারে গিয়েও তুমি আমার প্রেমকে মনে রেখ'? … … …আমার অবস্থায় পড়্‌লে মানুষের মনে এম্‌নি চিন্তা আসাই স্বাভাবিক বটে! আজ এতদিন পরে যদিও ঠিক করে' কিছু বল্‌তে পারি না, তবু মনে হয়, আমার পত্র-লেখার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। আমি বোধ হয়, আর-কিছু না ভেবে-চিন্তেই, কনকলতাকে সুধু আমার মনের অবস্থাটা জানাতে চেয়েছিলুম। কেন না, আমার প্রতি কনকলতার মনের ভাব কি-রকম, আমি তা জান্‌তুম না—সুতরাং, বিবাহের পরেও সে যে আমাকে মনে রাখ্‌বে, এমন ভাব্‌বার কোন সঙ্গত কারণ আমার ছিল না।

ভক্ত সুধু আপন মনে দেবীকে পূজা করে'ই তুষ্ট থাক্‌তে পারে না। তার পূজা গোপন হ'লেও দেবীর কাছে যে তা গোপন নেই অন্তত এটা জানতে পারলেও ভক্তের

প্রাণে একটা শান্তি ও সান্ত্বনার সঞ্চার হয়। এইজন্যেই, পূজা নিন আর নাই নিন, ভক্ত তার পূজার কথা দেবীকে নিবেদন কর্‌তে চায়।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের কথা এখন থাক্‌। আমার তখনকার মনের ভাব যাই হোক্‌, কনকলতাকে আমি যে পত্র লিখেছিলুম, এইটেই হচ্ছে সব-চেয়ে সত্য আর বড় কথা। এবং এই পত্র-লেখা যে আমার পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য্য হয়েছিল, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। এর স্বপক্ষে আমার বল্‌বার কিছু নেই স্নধু এইটুকু ছাড়া—যৌবন হচ্ছে অদূরদর্শী এবং প্রেম হচ্ছে অন্ধ!

... ...

তারপর দু-বৎসর কেটে গেল। মোহিতের সঙ্গে এর-মধ্যে আমার মাথামাখি এতটা ঘনিয়ে উঠেছিল যে, তার বাড়ীতে আমার কাছে আর সদর-অন্দরের ভেদ ছিল না।

কিন্তু স্কুল থেকে মোহিতের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পরে, তার স্বভাব যে এতখানি বদ্‌লে গেছে, তা আমি জান্‌তুম না। স্কুলে মোহিত ছিল ঠিক ভ্যাড়ার মত শান্ত, আর খর্‌গোসের মত ভীরু। পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলে, আমরা—সহুরেরা তার ওপরে মুরুব্বিআনাও কর্‌তুম যৎপরোনাস্তি। সে মুরুব্বিআনার ঠ্যালা অনেকসময়ে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠ্‌লেও, সে ঘাড় হেঁট করে' মুখটি বুঁজে সব সয়ে থাকৃত। পরে দেখে-শিখে ক্রমে অনেকটা চালাক-চতুর হ'লেও, আমাদের সঙ্গে সে কোনদিনই সমান-সমান চল্‌তে সাহস করে-নি,—গুরুর যতটা প্রাপ্য, তার কাছ থেকে আমরা সম্ভ্রম পেতুম ঠিক ততখানি! তারপর সে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল; আমরাও দল-ছাড়া হয়ে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়্‌লুম, তা কেউ জানি না।

কলেজে ঢুকে মোহিত যখন দেখ্‌লে সেখানে সব চেহারাই তার অচেনা, তখন নিজের মুখ থেকে দীনতার মুখোস খুলে ফেল্‌তে একটুও দেরি কর্‌লে না। সে যে পাড়াগেঁয়ে ছেলে, চাল্‌চলনে কথায়-বার্ত্তায় কারুকেই তা জান্‌তে দিলে না।

পাড়াগেঁয়ে ছেলের পক্ষে সহরে আসা, মস্ত এক অগ্নিপরীক্ষা। সহুরে ছেলেরা তাদের পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে ঠাট্টা করে এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না—তাদের পরস্পরের ভিতরে অনেকটা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। ফলে, লাঞ্ছিত পল্লী-বালকরা আপনাদের 'পাড়াগেঁয়ে'. নাম ঘোচাবার জন্যে সহুরেদের অনুকরণ কর্‌তে শেখে। কিন্তু অনুকরণ কর্‌তে গিয়ে অনেক সময়েই তারা আসলকে ছাড়িয়ে যায়; এমন-কি, যেখানে সহুরে ছেলেরাও ভয় পায়, সেখানেও ভরসা দেখিয়ে তারা প্রতিপন্ন করে, তারা পাড়াগেঁয়ে ভূত নয়! সহরে এসে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা প্রায়ই যে চরিত্র হারিয়ে ফেলে, তার আসল কারণ এই।

মোহিতেরও সেই দশা হ'ল। কলেজে ঢুকে প্রথমে সে একটু-একটু করে' মদ খেতে শিখ্‌লে। লেখাপড়ায় ভালো হ'লেও অন্যদিকে তার পতনের পথ তৈরি হ'তে লাগ্‌ল।... ... তারপর সে পুলিস-কোর্টে ঢুক্‌ল। সকলেই জানেন, যাদের চরিত্রের তেমন জোর নেই, পুলিস-কোর্ট তাদের পক্ষে চুলোয় যাবার পথে মস্ত এক আস্তানা। এই পুলিস-কোর্টে

এসে মোহিত প্রথমে এক অভিনেত্রীকে মক্কেল রূপে লাভ করে।... ... ...তার পরের কথা না বল্‌লেও চলে।......মোহিতের জীবনে এখন প্রধান উপভোগ্য হচ্ছে, সুরা আর নারী।

সেই পাড়াগেঁয়ে মোহিত যে এখন এতটা সহুরে আর লায়েক হয়ে উঠেছে, এ খবর আমি ক্রমে-ক্রমে, নানান লোকের মুখ থেকে শুনে জান্‌তে পেরেছি।... ...মোহিত নিজে আমার সঙ্গে খোলাখুলি মিশলেও, তার চরিত্রের কালো দিকটা আমার কাছ থেকে চেপে রেখেছিল। কেন? বোধ-হয় সে এখনো আমাকে মনে-মনে ভয় বা মান্য করে! এটা খুবই স্বাভাবিক। এক-সময়ে কেউ যদি কারুর কাছে গোলামী করে' থাকে, তাহলে পরে সে স্বাধীন ও ধনী হ'লেও, পূর্ব্ব-প্রভুর সাম্‌নে গেলে, মাথাটা অন্তত একটু নীচু না-করে' থাকৃতে পারে না। ... ...মোহিতেরও হয়ত তাই হয়েছে। স্কুলের সেই বাল্য-জীবনের কথা সে আজও ভোলে-নি। তাই সে এখনো নিজেকে আমার সমকক্ষ বলে ভাব্‌তে সাহসী নয়।

কিন্তু মোহিতের চরিত্রের কথা যখন জান্‌তে পারলুম, তখন আমার মনটা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল। জগতে আমার সব-চেয়ে যে প্রিয়তম, তাকে আমিই মোহিতের হাতে সমর্পণ করেছি, আমার চোখে-চোখে থাকৃবে বলে। কনকলতার সঙ্গে মোহিত কেমন ব্যবহার করে? তার হাতে পড়ে' সে কি অসুখী হয়েছে?

চেষ্টা করে'ও জান্‌তে পারলুম না। যো নেই। মুখে দুঃখ-যাতনার কোন চিহ্ন থাকা ত দূরের কথা—তাকে যখনি দেখি মনে হয়, তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন হাসির উৎস উথ্‌লে উঠ্‌ছে। তার হাসি-খুসি এখন আগেকার চেয়ে ঢের-বেশী বেড়েছে—এমন-কি, অসম্ভব-রকম। কিন্তু এইটেই আমি অস্বাভাবিক মনে করি! কনকলতা আগে ত অমন কারণে-অকারণে, যখন-তখন অত হাসি হাস্‌ত না! স্বভাবতই তার স্বভাব ছিল ধীর, স্থির, গম্ভীর। তার ঐ স্থিরতাই আমার বেশী ভালো লাগ্‌ত। বয়স যত বাড়্‌তে থাকে, মানুষের ধীরতাও তত বেড়ে ওঠ্‌বারই কথা। কিন্তু তা না হয়ে কনকলতার এমন উল্টো ধরণ কেন? তার সে ধীরতা, সে গাম্ভীর্য্য কোথায় গেল? আগে যে মাঝে-মাঝে অল্প অল্প মৃদু-হাসি হাস্‌ত, এখন সে এত **উচ্চ স্বরে এত-বেশী হাসে কেন?**... ... এ প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর আমি খুঁজে পেলুম না। আমার মনটা ভারি দমে গেল। —মানুষের হাসিকে আমি বিশ্বাস করি না! জানি, সংসারের অনেক অবরুদ্ধ অশ্রু, অনেক গোপন হাহাকার, অনেক নীরব ক্রন্দন, ঐ-এক হাসির ধারার মধ্যেই ছাইচাপা আগুনের মত ঢাকা থাকে! এ হচ্ছে গর্ব্বিত মানবের স্বভাব। পৃথিবীকে সে আপনার দুর্ব্বলতা দেখায় না।—হ্যাঁ, **কনকলতার হাসি দেখে আমার ভয় হয়।**

পর্য্যবেক্ষণের শক্তিটা আমার চিরকালই আছে। লোকের সাজসজ্জা দেখে, তার

চার্টে কথাবার্ত্তা শুনে প্রায়ই আমি তার স্বভাবের কথাটা বলে দিতে পারি। বন্ধু-বান্ধবরা আমার এই শক্তি দেখে অনেক-সময়ে আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। অনেকে বল্‌তেন, ভালো ডিটেকটিভের যে-সব গুণ থাকা উচিত, আমার নাকি প্রচুর পরিমাণে তা আছে! কিন্তু যাক্ সে কথা।

—কনকলতার হাসি দেখে আর যে-ই ভুলুক, আমি ভুল্‌লুম না। আমার মনে একটা বিষম ধোঁকা লেগে গেল! সেই সন্দেহই আমাকে সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক করে' রাখ্‌লে!

কিছুদিন পরেই আমার সন্দেহ পরিণত হ'ল নিশ্চিত সত্যে।

সেদিন সকালবেলায় হাতে কোন কাজ না-থাকাতে, মোহিতের বাড়ীতে গেলুম। শুন্‌লুম মোহিত বেরিয়ে গিয়েছে আর কনকলতার নাকি অসুখ করেছে। অসুখটা কি জান্‌বার জন্যে বাড়ীর ভিতরে গেলুম। আমার গলা পেয়ে কনকলতা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—"তোমার কি অসুখ করেচে কনক?"

—"অসুখ? এমন বিশেষ-কিছু নয়, মাথাটা বড্ড ধরেচে।"—এই বলে কনকলতা একটুখানি হাস্‌লে—অত্যন্ত ম্লান একটু হাসি! মনে হ'চ্ছ, সে-যেন অভিনয়-শ্রান্ত নটের প্রাণপণ-চেষ্টার হাসি!

হঠাৎ কনকলতার কপালের উপরে আমার চোখ পড়ে গেল। তার কপালের এক জায়গা কেটে গিয়ে ফুলে ঢিপি হয়ে উঠেছে!

এঁ দেখে' আমার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠ্‌ল—মুখ দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেল—"তোমার কপালে ও কি!"

একটা চাপা কান্নার আবেগে কনক-লতার সর্ব্বাঙ্গ যেন থর্‌থরিয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল! কিন্তু তখনি সাম্‌লে নিয়ে সে আবার একটু হেসে বল্লে, "ও কিছু নয়—কাল আমার কপালটা জান্‌লায় ঠুকে গিয়ে-ছিল কিনা—"

—"কনক, তুমি সত্যিকথা বল্‌ছ না। তোমার কপাল যেন জান্‌লায় ঠুকে গিয়েছিল—কিন্তু তোমার গলায়, হাতে অত কাল্‌শিরের দাগ কেন?"

করুণ নয়নে আমার দিকে একবার তাকিয়েই সে মাথা নীচু কর্‌লে।

—"কনক, কে তোমায় মেরেছে, এমন পাষণ্ড কে আছে?"

কনকলতা মাথা তুলে আবার মৃদু-মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু সে বোধহয় নিজেই জান্‌তে পার্‌লে না যে, তার চোখ দিয়ে তখন টস্‌টস্ করে' জল ঝর্‌ছে!

—"কনক, মুখের হাসি আর ত তোমার চোখের জলকে সাম্‌লাতে পার্‌লে না! অনেকদিনই এ সন্দেহ করেছিলুম, আজ এতদিনে আমি বুঝতে পার্‌লুম, আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়!"

—দুহাতে আপনার মুখ ঢেকে দেয়ালের উপরে হেলে, বোবা পুতুলের মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি অনুতপ্ত স্বরে বল্লুম, "কে তোমাকে মেরেছে, তুমি না-বল্লেও আমি বুঝেছি।... ...আর এজন্যে আমিই দায়ী—তোমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছি আমিই।"

কনকলতা তখনো নির্ব্বাক।

—"তুমি জান-না কনক, তোমার দশা দেখে আমার বুকের ভেতরটা কী কর্‌ছে! ……কিন্তু মোহিতকে আমি ছাড়্‌ব না—তোমার গায়ে সে হাত তুলেছে!"

—সঙ্গেসঙ্গে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কে উপরে উঠ্‌ছে।

পলক না-পড়্‌তে কনকলতা চোখের জল মুছে ফেল্‌লে! বিদ্যুতের মত আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি সে বলে উঠ্‌ল, "ঐ উনি আস্‌চেন! দোহাই আপনার—ওঁকে কিছু বল্‌লে আমি আর বাঁচ্‌ব না!"

উপরে উঠে, আমাদের দুজনকে সেখানে একসঙ্গে দেখে, মোহিত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দুজনের দিকে বারবার সে তাকাতে লাগ্‌ল—বোধহয় ভাবছিল, কনকলতার মুখে তার কীর্ত্তি-কাহিনীর সমস্তটা আমি শুনেছি!

কনকলতা হাস্‌তে-হাস্‌তে সহজ স্বরে বল্লে, "তোমার কোর্টের বেলা হ'ল যে! যাও, যাও, তাড়াতাড়ি স্নান করে' এস!"

কনকলতার হাসিমুখ ও সহজ স্বর মোহিতের সব ধুক্‌ধুকুনি ঘুচিয়ে দিলে। আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, আমার দিকে ফিরে সে বল্লে, "কি হে, তুমি কতক্ষণ?"

—"এই খানিকক্ষণ। এত সকালে বেরিয়েছিলে যে!"

—"একটা বেআক্কেল মক্কেলের পাল্লায় পড়ে ভোর না হ'তেই আমাকে বেরুতে হয়েছিল।"

—"আচ্ছা, তোমার বেলা হচ্ছে, আজ এখন আসি"—অনেক কষ্টে শান্ত স্বাভাবিক স্বরে এই কথা বলে, তাড়াতাড়ি আমি বিদায় হলুম। আর বেশীক্ষণ থাক্‌লে হয়ত আমি মাথা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌তুম না—কনকলতার মত অভিনয়ে আমার দক্ষতা ছিল না!

… … … … … …

… … … … …

বাড়ীতে এলুম পাথরের মতন ভারি মন নিয়ে। স্বার্থপর আমি—নিজের ক্ষুদ্র তৃপ্তির জন্যে একটি সুন্দর জীবনকে অসার্থক করে' দিলুম!

কিন্তু মোহিতকে আমি একেবারেই চিন্‌তে পারি-নি—এমন অমানুষ সে! স্কুলে সে ভিজে বেড়াল হয়ে আমাদের গোলামের মত থাকৃত, আমরা তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আন্‌তুম না। তারপর সেই লোক যে ভিতরে-ভিতরে এ-হেন সয়তান হয়ে দাঁড়াতে পারে—কে এ-কথা ভেবেছিল? কনকলতার বিবাহের উদ্যোগে ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়িতে মোহিতের সঙ্গে আমি তার সম্বন্ধ করেছিলুম, মোহিতের বর্ত্তমান চরিত্র কেমন সে খোঁজ কিছুই নেওয়া হয়-নি। নিজের এই সাংঘাতিক ভ্রমের জন্যে অনুতাপে আজ আমার বুক ভেঙে যায় যায় হ'ল!

সেইদিন সন্ধ্যাতেই আর-এক অভাবিত ব্যাপার! কনকলতার কাছ থেকে এক পত্র পেলুম!

সে লিখেছে—

"প্রিয় মাষ্টারমশাই,

আজ আপনি স্বচক্ষে যা দেখে গেছেন—তারপরে আর কোন কথা লুকোনো চলে না। কারণ, এখনো লুকোচুরি কর্‌তে গেলে,

আপনি হয়ত এমন একটা-কিছু করে' ফেল্‌বেন, যার ফল ভালো হবে না।

আমার জীবন সুখের নয়,—আপনার কাছে এ-কথা আর লুকোনো মিছে। যখন কুমারী ছিলুম তখন বিবাহের যে স্বপ্ন আমার তখনকার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে' রেখেছিল, এখন সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে, একেবারে স্বপ্নেরি মতন!

সংসারে যে-দুটি দোষকে সকল নারীই সব-চেয়ে-বেশী ভয় করে, আমার স্বামীর—আপনার বন্ধুর ঠিক সেই দুটি দোষই পুরো-মাত্রায় আছে। তিনি মদ খান, আর এমন জায়গায় যান, যার নাম না-কর্‌লেও আপনি বুঝ্‌বেন। শুনেছি 'নারীর প্রাণে সবই সয়'। কিন্তু আজ-পর্য্যন্ত স্বামীর এ স্বভাব সর্ব্বংসহা নারী হয়েও আমি সয়ে উঠ্‌তে পারি-নি। তাই দু-চার কথা না-বলে থাক্‌তে পারি না। সেটা যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামী তা বোঝেন না। তাঁর যুক্তি 'পুরুষের কথায় মেয়ের থাক্‌বার দরকার কি?' তিনি আমাকে চুপ্‌ কর্‌তে বলেন, চুপ না-কর্‌লে আমাকে গালি দেন, আমাকে ধমক দেন, আমাকে —আর যা করেন, তার চিহ্ন আজ সকালে আপনি দেখেছেন।

এম্‌নি ভাবে আমার দিন যাচ্ছে। বাবা মা কিছু জানেন না—তাঁদের আমি জান্‌তে দিই-নি। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, আমার কষ্ট তাঁদের বুকে বাজের মত বাজ্‌বে। এ-সব কথা জান্‌লে তাঁরা স্নেহের বশে যা কর্‌বেন, তাতে আমার কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। সকল দিক

বাবা-মা একালের নব্যতন্ত্রের লোক—আমিও শিক্ষা পেয়েছি তাঁদেরি মতন। কিন্তু তাহ'লেও এ-কথা ভোলা শক্ত যে, আমি হিন্দুর মেয়ে। আপনি হয়ত ভাব্‌বেন, তবে আমি স্বামী-নিন্দা কর্‌ছি কেন? ওটা হয়ত একালের শিক্ষার দোষ! স্বামী-নিন্দা করি আর যাই-ই করি, স্বামী-ত্যাগ ত আর কর্‌তে পার্‌ব না!—যদিও সেটা পার্‌লে ভবিষ্যতে পরলোকে যত যন্ত্রণাই হোক্‌, আপাতত ইহলোকের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারি—তবু তা যখন সম্ভব নয় তখন মৌনব্রতই আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

অতএব আপনিও আমার কথা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমার স্বামী যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পান যে, আপনি সব জেনেছেন। স্বামীকে কিছু বলেও তাঁকে আর বদ্‌লানো যাবে না—তাঁর চরিত্র এখন সংশোধনের অতীত। আপনি কিছু বল্লে হিতে-বিপরীত হবে।

আর-এক কারণে আপনাকে নির্লিপ্ত থাক্‌তে বল্‌ছি। সঙ্কোচে আমার কলম থেমে যাচ্ছে, কিন্তু আমার নিজের মঙ্গলের জন্যে না-লিখেও আর অন্য উপায় নেই!

আমার স্বামী আপনাকে সন্দেহ করেন ... ... আমাকে সন্দেহ করেন!

এর কারণ জানি না। সুধু এইটুকু বুঝ্‌ছি যে, আপনি কিছু বল্‌তে গেলে তাঁর এই অন্যায়, কদর্য্য সন্দেহকে তিনি সত্য বলে মনে করবেন। ইতি

কনকলতার পত্র হাতে করে' আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম!

* * * * *

তারপর একসপ্তাহ কেটে গেল। এর-মধ্যে আমি কনকলতার আর-কোন খোঁজ-খবর নিই-নি, মোহিতের সঙ্গেও দেখা করি-নি। কী যন্ত্রণায়, কী দুশ্চিন্তায় এই সপ্তাহকাল কাটিয়েছি তা সুধু আমি জানি আর জানেন আমার ভগবান।

কনকলতার সেই পত্রের অক্ষরগুলো ঠিক জ্বলন্ত কয়লার মত আমার সমস্ত বুকখানা যেন দগ্ধে ছাই করে' দিচ্ছে! আমার চোখে এত অশ্রু নেই যে, সে আগুন নিবিয়ে ফেল্‌তে পারি!

মোহিত আমাকে আর কনকলতাকে সন্দেহ করে!

হ্যাঁ, কনকলতাকে আমি ভালোবাসি —পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের বিনিময়েও আমার এ প্রেম আমি ছাড়তে পার্‌ব না— এ প্রেম আমার জীবন-প্রদীপে উজ্জ্বল শিখার মত জ্বল্‌ছে, দিবারাত্র জ্বল্‌ছে!…… কিন্তু, ঈশ্বর সাক্ষী, আমার এ প্রেম নিষ্কলঙ্ক! বিবাহের পরে কনকলতার কাছে আমি কোনদিন মুহূর্ত্তের জন্যেও, ভাবে-ভঙ্গীতে কি ব্যবহারে-ইঙ্গিতে আমার প্রেমকে প্রকাশ করি-নি। আর কনকলতা? আজ পর্য্যন্ত জানি, তার মনে আমার প্রেমের ঠাঁইটুকুও নেই। একজন পরিচিত আত্মীয়ের মত আমাকে সে গ্রহণ করেছে মাত্র!

তবে, মোহিতের এই সন্দেহের কারণ কি? অনেক ভাব্‌লুম, কিন্তু কোনই কূল-কিনারা পেলুম না। খালি এইটুক বুঝলুম, মোহিতের বাড়ীতে আর আমার যাওয়া উচিত নয়।

এম্‌নি যখন মনের গতিক, তখন হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় মোহিতের বাড়ী থেকে এক দরোয়ান এসে হাজির। মোহিত আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে; বিশেষ দরকার, এখনি না-গেলে নয়। ব্যাপার কি?

ভাব্‌তে-ভাব্‌তে মোহিতের বাড়ীতে গেলুম। শুন্‌লুম, সে তিনতলায় ছাদের উপরে আছে।

ছাদে গিয়ে দেখলুম, এককোণে আল্‌সেতে হ্যালান দিয়ে মোহিত শীতলপাটির উপরে চুপচাপ বসে আছে। তার সাম্‌নে একটা বিলাতী মদের লেবেল-মারা বোতল, একটা কাঁচের গেলাস, আর-একখানা থালায় করে' কি-কতকগুলো খাবার।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমার সাম্‌নে এ-হেন ব্যাপার এই প্রথম। হঠাৎ মোহিত এতটা বেহায়া হয়ে উঠ্‌ল কেন?

তার সুমুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "মোহিত, তুমি আমায় ডেকেছ?"

মোহিত অত্যন্ত নীরস স্বরে বল্লে, "হ্যাঁ, বোসো ঐখানে।"

আস্তে-আস্তে বস্‌লুম। খানিকক্ষণ কেটে গেল। মোহিত আমার দিকে আর চেয়ে দেখ্‌লে না, কথাও কইলে না—খালি নিজের মনে থেকে-থেকে মদের গেলাসে ঢ্‌কঢ্‌ক্ করে' চুমুক মার্‌তে লাগ্‌ল।

শেষটা আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "মোহিত, তোমার মদ-খাওয়ার সাক্ষী হ'তে এখানে আসি-নি, আমার অন্য কাজ আছে!"

মোহিত অবহেলা-ভরে বল্লে, "বটে।

অন্ত কাজ আছে?—কি কাজ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাও?"

—"ধর, তাই।"

—"তাহলে নিরাশ হবে। সে আজ নেমন্তন্ন খেতে গেছে।"

—"তবে তুমি মদ খাও, আমি বাড়ী যাই। অকারণে বসে-বসে মদ-খাওয়া দেখ্‌তে আমার একটুও আগ্রহ নেই।"

আমি উঠ্‌তে যাচ্ছি, মোহিত সশব্দে গেলাসটা নামিয়ে রেখে কর্কশ স্বরে বলে' উঠ্‌ল, "বোসো বল্‌ছি, তোমার সঙ্গে আজ আমার বোঝাপড়া আছে!"

মোহিতের গলা শুনে অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। চাঁদের আলোয় দেখ্‌লুম, তার চোখদুটো হিংস্র পশুর মত জ্বল্‌ছে!

—"ত্থাখো, তুমি অনেকদিন আমার চোখে ধুলো দিয়ে এসেছ—আর তা হচ্ছে না।"

—"তুমি কি বল্‌ছ মোহিত!"

—"ও-সব ন্যাকামি রাখ, আমি ওকালতি করি—বদ্‌মাইস্ ঠেঙিয়ে খাই। বাঙ্‌লায় এত পাত্র থাক্‌তে যখনি তুমি যোগাড়যন্ত্র করে' আমার সঙ্গে তোমার ছাত্রীর বিয়ে দাও, তখন থেকেই আমি তোমাকে সন্দেহ করি—বুঝেছ?"

এই আচম্‌কা আক্রমণের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না, হতভম্ব হয়ে বসে রইলুম—কোন কথা কইতে পার্‌লুম না!

—"অন্য-কোন অচেনা জায়গায় বিয়ে

হয়ে যায়, সেই ভয়েই তোমার ছাত্রীটিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ,—হুঁঃ, এ আমি বিলক্ষণ বুঝেছি!"

ততক্ষণ আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে আমি বল্লুম, "মোহিত—"

হা হা করে' হেসে মোহিত বল্লে, "তুমি চোখ রাঙাচ্ছ কাকে হে? আমাকে তুমি এখনো সেই পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে কর নাকি?"

—"মোহিত, এমন পাপ-মন নিয়ে তবে তুমি আমার কথায় বিয়ে কর্‌লে কেন?"

—"টাকার লোভে আর রূপের মোহে। এ ফাঁদে জেনে-শুনেও সবাই পা দেয়—"

—"থামো, থামো—"

—"আমি যীশুখৃষ্ট কি বুদ্ধদেব নই, সুতরাং সয়তানের প্রলোভনে সহজেই ভুলেছি।"

—"এ মিথ্যেকথা মোহিত, এ মিথ্যে-কথা!"

—"বটে! এ চিঠিখানাও কি মিথ্যে? ত্থাখো, চাঁদের আলোয় তোমার জিনিষকে তুমি বোধহয় চিন্‌তে পার্‌বে!"—এই বলে মোহিত আমার দিকে একখানা কাগজ এগিয়ে ধর্‌লে।

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে কাগজখানার উপরে চোখ পড়্‌তেই চিন্‌লুম, সে আমারি চিঠি—বিয়ের আগের দিনে কনকলতাকে যে চিঠি লিখেছিলুম!

বল্‌বার কিছু না-পেয়ে চোরের মত আমি মাথা হেঁট কর্‌লুম।

—"কি, চুপ করে' রইলে যে? এ চিঠিও

রুদ্ধকণ্ঠে কাতরস্বরে আমি বল্লুম, "হ্যাঁ, এ আমারি চিঠি মোহিত!"

—"এখন পথে এস বাবা, পথে এস!"

—"মোহিত, আমি মান্‌ছি, আমারি সব দোষ। কিন্তু কনকলতাকে এর জন্যে তুমি দায়ী কোরো না। ভগবানের নাম নিয়ে বল্‌ছি, সে নির্দ্দোষ।"

—"হ্যাঁ, সে সীতা-সাবিত্রী! তা নইলে পরপুরুষের একখানা প্রেমপত্র নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখে দেয়!... ...এ-সব কথা বোঝাচ্ছ কাকে? কনক যদি খাঁটি হ'ত, তাহলে এ চিঠি পেয়েই সে হয় ঘৃণায় তখনি ছিঁড়ে ফেলে দিত, নয় তার বাপ-মাকে গিয়ে দেখাতো,—তারপর দূর করে' তোমাকে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু তার কিছুই সে করে-নি, উল্টে চিঠিখানা এতদিন ধরে হীরে-মাণিকের মত যত্ন করে' বাক্সে তুলে রেখেছে আর তোমার সঙ্গে সমান হাসিমুখে মেলামেশা করে' এসেছে! এই চিঠির সঙ্গে তার বাক্সে আর কি পেয়েছি জান? তোমার ফটো!"

হায় মানুষের প্রাণ! এই ভয়ানক সময়েও আমার সকল ভয় লজ্জা অপমান ভুলে আনন্দের আবেগে আমি আকুল-ব্যাকুল হয়ে গেলুম! মোহিতের কথায় আজ আমি এই প্রথম জান্‌তে পার্‌লুম, **কনক আমায় ভালোবাসে—কনক আমায় ভালোবাসে!** বিপদের মধ্য দিয়ে এই অমূল্য বার্ত্তা এসে, সুখের আবেশে আমাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিলে!

কিন্তু সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নের মধ্য থেকে মোহিতের ক্রোধকম্পিত স্বর আচম্বিতে আমাকে সচকিত করে' তুল্লে,—"চুপ করে' ভাব্‌ছ কি? তোমরা আর আমাকে ভোলাতে পার্‌বে না—বুঝেছ? দৈব আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে—তা-নইলে কনক নেমন্তন্নে যাবার সময়ে ভুলে বাক্সটা খুলে রেখে যাবে কেন?... ...হ্যাঁ, তোমাদের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যত কথা থাকৃতে পারে, সব আমি একে-একে ভেবে দেখেছি। ভেবোনা মদ খেয়ে আমি মাতাল হয়েছি—না, আমার মাথা যতদূর ঠাণ্ডা থাক্‌বার তা আছে। নইলে আমার সাম্‌নে বসে এতক্ষণ তুমি বেঁচে থাক্‌তে না"—বল্‌তে বল্‌তে মোহিতের চোখদুটো আবার দপ্‌দপ্‌ করে' উঠ্‌ল!

হঠাৎ নীচের রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হ'ল—শব্দটা মোহিতের বাড়ীর সাম্‌নে এসেই থাম্‌ল।

মোহিতও কাণ পেতে শুন্‌ছিল। অট্টহাস্য করে' সে বলে উঠ্‌ল, "ঐ তোমার ছাত্রী ফিরে এল! এতক্ষণ তারি অপেক্ষায় ছিলুম!"

ভয়ে শিউরে উঠে আমি বল্লুম, "মোহিত, মোহিত, তুমি কি কর্‌তে চাও?"

উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করে' সে বল্লে, "এখনি দেখ্‌তেই পাবে!"

—"তুমি—তুমি কনককে কি মার্‌বে?"

—"শুধু মার্‌ব না, আমার বাড়ী থেকে এখনি তাকে দূর করে' তাড়িয়ে দেব—সেইসঙ্গে তোমাকেও!"

—"কথা শোনো মোহিত, কথা শোনো! কনকের সর্ব্বনাশ কোরো না, কোরো না!

মনের সঙ্গে যুঝে সে আপনি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তবু আমাকে তার মন জানতে দেয়-নি—তুমি না-বল্লে আমি আজ যা জেনেছি কখনোই তা জানতে পারতুম না! তার এ আত্মসংযমকে তুমি ব্যর্থ করে' দিও না—তাঁকে মেরে-ধরে' কলঙ্কিনী বলে তাড়িয়ে দিয়ে সমাজে তাকে পতিত কোরো না—তার—তার—"

—"তোমার সয়তানী রাখো! এই আমি চল্লুম!"

—"তার চেয়ে আমাকে মারো, আমাকে অপমান কর—আমাকে তাড়িয়ে দাও, যা-ইচ্ছে কর, আর আমি তোমার পথে এসে দাঁড়াব না,—মোহিত, মোহিত!"

কিন্তু নিষ্ঠুর মোহিত আমার কাকুতিতে কর্ণপাতও করলে না, বিকট স্বরে একটা উচ্চ হাস্য করে' তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'ল!

পর-পলকে আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ল, রাজপথে কৌতূহলী জনতার মাঝ-খানে,—বিতাড়িত, প্রহারে-জর্জ্জরিত পদদলিত কনকের রক্তরাঙা, লাঞ্ছিত, আর্ত্ত মুখ!

একলাফে আমি মোহিতের সুমুখে গিয়ে পড়লুম এবং দু-হাতে তার হাত চেপে ধরে বল্লুম, "খবর্দ্দার! এখান থেকে তুমি এক পাও নড়্‌তে পারবে না!"

মোহিত এক-হ্যাঁচ্‌কায় আমার হাত ছাড়িয়ে পিছু হঠে যেতে গেল—এবং পর-মুহূর্ত্তেই প্রাচীরহীন ছাদের আল্‌সেতে পা-লেগে, টাল্ সাম্‌লাতে না-পেরে তার দেহটা একেবারে রাস্তার দিকে ঘুরে পড়্‌ল,—কিন্তু তাড়াতাড়ি ছাদের কার্ণিশটা ধরে ফেলে সে শূন্যে ঝুলতে লাগল।

চোখের নিমেষে এই ঘটনা ঘটে গেল!

মোহিত কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ধর—ধর—বাঁচাও, পড়ে গেলুম—গেলুম—"

স্থির-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে, বুকের উপরে দু-হাত বেঁধে, কঠিন পাষাণের মত অটল হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। তাকে আমি অনায়াসেই বাঁচাতে পারতুম—কিন্তু সে বাঁচ্‌লে আমার কনক মর্‌বে। প্রাণের ভিতরে কাণ পেতে আমি বিবেকের আদেশ শুনতে পেলুম—কিন্তু আমার দেহ তখন এক অভাগী নারীর মুখ চেয়ে তেম্‌নি আড়ষ্ট হয়েই রইল!

মোহিত ছাদে ওঠ্‌বার জন্যে প্রাণপণে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে-করতে পাথর-গলানো স্বরে বল্‌লে,—"ফণী, এস ভাই! আমার হাত-দুটো ধর—"

আমার ভয় হ'তে লাগ্‌ল, পাছে তার করুণ মিনতি শুনে আমার প্রাণে শেষটা দয়ার সঞ্চার হয়!

মোহিত তার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে' আর-একবার উপরে ওঠবার চেষ্টা করলে—কিন্তু তার দেহের ভার সইতে না-পেরে কার্ণিশের খানিকটা হঠাৎ হুড়্‌মুড়্ করে' ভেঙে গেল—সঙ্গে-সঙ্গে মোহিতকে আর দেখ্‌তে পেলুম না,—কেবল শুনলুম এক আকাশ-ফাটানো শেষ-আর্ত্তনাদ, আর রাস্তা থেকে অনেক লোকের চীৎকার!

... ...পরলোকে মোহিতের অতৃপ্ত প্রতিহিংসা আমার জন্যে অপেক্ষা করে' আছে কিনা, জানি-না—কিন্তু ইহলোকে তাকে আর-কখনো দেখ্‌তে পাই-নি।

কনকলতা এখন কোথায়, তাও জানিনা,

—বিধবার শুভ্রবেশে তাকে দেখ্‌বার আগেই আমি দেশত্যাগী হয়েছিলুম।

হাতে নর-রক্ত মেখে সংসার ছেড়ে বেরিয়েছি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্যে। আমার এ হত্যাকারীর হাত আর কি জীবনে শুভ্র হবে?"

... ...

সন্ন্যাসী আমার দিকে আর দৃষ্টিপাত না-করেই চকিতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়ে, যেখানে ধূ-ধূ ময়দানের প্রদীপ্ত জ্যোৎস্নার উপরে, একটি নিঃসঙ্গ বটের নিস্পন্দ ছায়ায় জমাট অন্ধকার স্তম্ভিত হয়ে ছিল, তারই ভিতরে অলৌকিক ছায়া-মূর্ত্তির মত মিলিয়ে গেলেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক (১)

জীব যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে, তখন কিছু মূলধন লইয়া আসে। সেই মূলধন তাহার বংশানুক্রমিক গুণ—পিতৃ-পিতামহাদি পরম্পরায় প্রাপ্ত কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক গুণ। এই মূলধনের উপর নির্ভর করিয়াই সে জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিন্তু কেবল মাত্র এই মূলধনই জীবন-যুদ্ধে টিঁকিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। যেরূপ অবস্থার মধ্যে সে জীবন যাপন করে, তাহাও তাহার দেহ ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এমন কি অনেক দৈহিক ও মানসিক গুণ বাহ্য অবস্থার সংস্পর্শেই তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে।

এই সকল বাহ্য অবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, পারিপার্শ্বিক। ইহাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে (১) প্রাকৃতিক ও (২) সামাজিক। যে আবহাওয়া প্রভৃতির মধ্যে জীব বর্দ্ধিত হয় তাহাই হইল তাহার প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক (physical environment)। ইহা যে জীবের দেহ ও মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই, আর শুধু একটি ব্যক্তিতেই এই প্রভাব আবদ্ধ নহে। জাতির উপরেও এই প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অল্প নয়। এমন কি প্রাচীন সমাজতত্ত্ববিদেরা এইটাকেই জাতির সভ্যতা-গঠনের প্রধান উপাদান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। আর একটী পারিপার্শ্বিক হইল, সমাজ। ধরিতে গেলে এটী কেবল মানুষেরই বিশেষত্ব। মানুষই সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে। আর এই সমাজ যে মানুষের উপর কি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সমাজ তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, বিধি-নিয়ম, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি লইয়া মানুষকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। জন্ম হইতে

---

(১) পারিপার্শ্বিক = Environment ; বংশানুক্রম = Heredity.

মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহারই সঙ্গে তাহাকে কারবার করিতে হয়; ইহারই নির্দ্দিষ্ট পথ-অনুসারে তাহাকে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। মানুষের পক্ষে এই সমাজই প্রধান পারিপার্শ্বিক। আজ আমরা এই প্রবন্ধে যে পারিপার্শ্বিকের কথা বলিব, তাহা প্রধানতঃ সমাজকে লক্ষ্য করিয়াই।

বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক—ইহাদের কোন্‌টী মানুষের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে;—মানুষের যে দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী তাহাদের কতটা বংশানুক্রমে প্রাপ্ত আর কতটাই বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ফুটিয়া উঠে, দেখা যাক। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের অবশ্য বিভিন্ন মত।

কেহ কেহ বলেন, বংশানুক্রমের প্রভাবই মানুষের উপর বেশী কাজ করে; এমন কি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় সে প্রভাবের মাত্রা প্রায় দশগুণ বেশী। মানুষের যাহা কিছু দৈহিক বা মানসিক গুণ সে সকলই সে এই বংশানুক্রমের ফলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিকের প্রভাব সেই সকল গুণকে ফুটাইয়া তোলে মাত্র। পারিপার্শ্বিক নূতন বিশেষ-কিছুই দিতে পারে না। যাহা বংশানুক্রমে মানুষ প্রাপ্ত হয় নাই, এমন কোন আজগুবি গুণ পারিপার্শ্বিকের হাজার চেষ্টাতেও তাহার মধ্যে ফুটিতে পারে না। এই জন্ত ইঁহারা বলেন, সমাজ-সংস্কার ও জাতি-গঠন করিতে হইলে এই বংশানুক্রমের ধারাকে বিশুদ্ধ করা উচিত। ভাল মানুষ তৈয়ার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই ভাল পিতা-মাতা; নহিলে পারিপার্শ্বিকের হাজার সংস্কার করিলেও বিশেষ ফল লাভ হইবে না। ক্ষেত্র ভাল না হইলে তাহাতে নানা প্রকার সার দিয়াও ভাল শস্য উৎপন্ন করা যায় না। কিন্তু আধুনিক যুগের সংস্কারকেরা এই পারিপার্শ্বিক লইয়াই বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহাদের সকল চেষ্টা এই পারিপার্শ্বিককেই ভাল করিবার দিকে। শিক্ষা এবং নানারূপ আচার, নিয়ম, প্রথা প্রভৃতির সংস্কার তাঁহারা যাহা করেন, তাহা এই মতের বশবর্ত্তী হইয়াই; কাজেই এদিকে তাঁহাদের সকল চেষ্টা পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। এই চেষ্টার কতকটা ক্ষেত্র-সংস্কারের দিকে লাগাইলে বোধ হয় প্রচুর ফল পাওয়া যাইত।

এই সব কথা যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মতের বলে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে যত খানি নগণ্য ধর হইয়াছে, অনেক পণ্ডিতের মতে তাহা ততটা নগণ্য নহে। সত্য বটে, নিম্নতর জীবের মধ্যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের বিশেষ কিছু মূল্য নাই; ইহারা বংশানুক্রমে যাহা লাভ করে তাহাই এক প্রকার সার-সর্ব্বস্ব। তাহাকেই আমরা তাহাদের সংস্কার বা সহজ বৃত্তি (Instinct) বলিয়া থাকি। এই সহজ বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই উহাদের জীবন চালিত হইয়া থাকে, প্রকৃতি যেন অনুগ্রহ করিয়াই উহাদের যাহা-যাহা দরকার, সেই সকল বৃত্তিগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া ঠিক করিয়া দেয়। কিন্তু উহাদের ক্ষমতা ঐ সকল সহজ বৃত্তিতেই সীমাবদ্ধ। ইহার অতিরিক্ত নূতন কিছুই উহারা করিতে পারে না।

ইহার অনুরূপ এই সকল সহজ বৃত্তিকে চালাইবার পক্ষে উপযোগী। কাজেই জীব যত বেশী নিম্নস্তরের হইবে, এই সীমাবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট সহজ বৃত্তির পরিমাণ তাহার মধ্যে ততই বেশী। উচ্চস্তরের জীবে এই সহজ-বৃত্তির ক্রিয়া ক্রমশঃ শিথিলতর হইতে দেখা যায়।

সর্ব্বোচ্চ জীব মানুষের মধ্যে এই সহজ বৃত্তির ক্রিয়া সবচেয়ে কম। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে এ দিকে বঞ্চিত করিলেও অন্য দিকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন। নূতন নূতন বিষয় শিখিবার ও নূতন নূতন অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিবার ক্ষমতা তাহার অপরিসীম; তাহার স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কোষগুলির গঠনও সেই রূপ প্রবল পরিবর্ত্তনশীল। কঠোর প্রকৃতি তাহাকে একদিকে যেমন প্রায় সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় সংসারে পাঠাইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনই জীবন-যুদ্ধে ক্রমশঃ নিজেকে শক্তিশালী করিবার উপায়ও তাহার ঠিক করিয়া দেয়। এই উপায় তাহার শিক্ষাপ্রবণতা।

এই শিক্ষা-প্রবণতার ভিতর দিয়াই সমাজ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সমাজের প্রচলিত আদর্শ আচার-অনুষ্ঠান বিধি-নিয়ম, প্রথা সংস্কার—এককথায় তাহার বহুকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার—মানব-শিশুকে ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লইতে হয়। পিতামাতা, পরিবার-পরিজন, স্কুল-কলেজ, শিক্ষক-অধ্যাপক—সকলেই তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহার বংশানুক্রম তাহাকে যদি এই সকল বিষয় শিখিবার যোগ্য করিয়া দিয়া থাকে, তবেই সে সমাজের এই সকল শিক্ষাকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া, আরও দশ-জনের মত বাড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। আর বংশানুক্রম যদি তাহাকে সমাজের এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা না দেয়, তবেই তাহার বিপদ। সমাজ তখন আপনার "অযোগ্য দমন"—(suppression of the unfit)—এই নীতি অবলম্বন করিয়া সেই অসামাজিক জীবকে বিতাড়িত বা ধ্বংশ করিবার চেষ্টা পায়। প্রতিনিয়তই সমাজে এই অযোগ্য-দমন-নীতির ক্রিয়া চলিতেছে। জেল, পুলিস, আদালত, বিচারক প্রভৃতি সকলই এই অযোগ্য-দমন নীতিরই সাজসরঞ্জাম।

এই অযোগ্য-দমন নীতির অনুরূপ কার্য্য প্রকৃতির মধ্যেও যে না চলিতেছে, এমন নয়। কিন্তু প্রকৃতি অন্য উপায়ে এই কার্য্য সাধন করে—জীব-বিজ্ঞানে সে উপায়ের নাম, survival of the fittest—যোগ্য-তমের উদ্বর্ত্তন। প্রকৃতি সেখানে যোগ্য-তমকে আদর করিয়া বাঁচাইয়া রাখে; আর অযোগ্য অবহেলার ফলে নিজের অক্ষমতার ভারে জীবন-যুদ্ধে পিছাইয়া পড়ে। সমাজ সাধারণতঃ যোগ্যতমকে আদর করে না—অযোগ্যকে দমন করিয়াই সে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং বাহ্যতঃ প্রকৃতি ও সমাজের উপায় ভিন্ন রকমের হইলেও উদ্দেশ্য উভয়ের একই—যোগ্যকে রক্ষা এবং অযোগ্যকে দমন।

সুতরাং দেখা গেল পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

বংশানুক্রম অপেক্ষা কম নহে—বরং এক হিসাবে বেশী। বংশানুক্রম মাল-মসলা যোগাইয়া থাকে বটে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক তাহাকে ইচ্ছামত বস্তুতে গড়িয়া তুলে। প্রকৃতি কাঠামো খাড়া করে—আর সমাজ তুলি দিয়া রঙ ফলাইয়া তাহাকে ইচ্ছামত রূপ দান করে। ফলতঃ বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক ইহাদের কার্য্য মোটেই বিপরীত-মুখী বা পৃথক নহে। ইহারা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-রূপে সংসৃষ্ট, ধরিতে গেলে উভয়েই একযোগে মানুষের দেহ ও মনকে অহরহ নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। একদিকে বংশানুক্রম যেমন পারিপার্শ্বিকের জন্য উপাদান যোগাইয়া থাকে—অন্যদিকে পারিপার্শ্বিকও তেমনই বংশানুক্রমের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। সমাজ তাহার বিবাহ-বিধির মধ্য দিয়া কি করিয়া বংশানুক্রমকে নিয়মিত করে, তাহা অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। হিন্দু সমাজ তাহার বিবাহ-বিধির দ্বারা যেরূপে বংশানুক্রমকে নিয়মিত করে, মুসলমান সমাজ তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবাহ-বিধির দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে বংশানুক্রমকে চালিত করিয়া থাকে।

আর এক দিয়া কথাটার আলোচনা করা যাক। এই যে বংশানুক্রমিক গুণাবলী, তাহা কি মানুষের মধ্যে আবহমান কাল একই ভাবে আছে, না ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছে? বৈদিক যুগের মানব-শিশু যে সকল বংশানুক্রমিক গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এখনকার মানবশিশুও কি ঠিক তাহাদের বংশানুক্রমিক গুণাবলীর বৈচিত্র্য ও সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী? সহজ বুদ্ধির আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে আধুনিক শিশুর বংশানুক্রমিক গুণের বৈচিত্র্য, জটিলতা ও সংখ্যা প্রাচীনকালের তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক বেশী এবং বিস্তীর্ণ। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কিরূপে বংশানুক্রমিক গুণাবলীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়িয়া গেল?

বংশানুক্রমিক গুণাবলীর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য যে পূর্ব্ব হইতে মানবশিশুর মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে প্রায় কোন পণ্ডিতেরই মত-ভেদ নাই। কিন্তু কিরূপে এই সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়িতেছে, ইহা লইয়াই তর্ক। স্পেন্‌সার ও তাঁহার শিষ্যেরা বলেন যে বংশানুক্রমিক গুণ মোটেই একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তু নহে। ইহা ক্রম-বিবর্দ্ধন-শীল, প্রতিপুরুষেই বাড়িয়া চলিয়াছে; আর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবই এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ। মানুষ কতকগুলি গুণ বংশানুক্রমের ফলে পিতামাতা ও পূর্ব্বপুরুষ হইতে লাভ করে; আর কতকগুলি সে পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে নিজে হইতে উপার্জ্জন করে। এই উপার্জ্জিত গুণগুলি (acquired characters) আবার জীবদেহে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া বংশানুক্রমিক হইয়া যায়। অর্থাৎ পরবর্ত্তী পুরুষেরা পূর্ব্বপুরুষের সেই স্বোপার্জ্জিত গুণগুলি বংশানুক্রমের ফলে নিজেরা লাভ করে। এইরূপে আজ যাহা স্বোপার্জ্জিত, ভবিষ্যতে তাহাই বংশানুক্রমে গিয়া দাঁড়ায়। উপরি-লিখিত জটিল প্রণালীতে

এবং মানুষ বহুগুণযুক্ত হইয়া জটিলতর সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে।

আধুনিক কালের ডিভ্রিজ, বিসমান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদেরা কিন্তু উক্ত মত স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন, স্বোপার্জ্জিত গুণ (acquired characters) কখনই ওরূপে বংশানুক্রমিক হইতে পারে না। সমস্ত বংশানুক্রমিক গুণই germplasm বা প্রাণ-বস্তুর মধ্য দিয়া সংক্রামিত হয়। Germinal variation বা প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন হইতেই নূতন গুণের সৃষ্টি হয়—আর তাহাই বংশানুক্রমের ফলে পরবর্ত্তী পুরুষে সংক্রামিত হয়। এই germinal variation বা প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ ধীরে ধীরে বহুকাল ধরিয়া হয় না। ধরিতে গেলে হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন (mutation) ঘটিয়া থাকে। ডিভ্রিজ নানা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

তবে কি ইঁহাদের মতে স্বোপার্জ্জিত গুণ ও পারিপার্শ্বিকের কোন মূল্য নাই? ইহার উত্তরে এই সব পণ্ডিতেরা বলেন যে স্বোপার্জ্জিতগুণ যদিও বংশানুক্রমিক হইতে পারে না, তবুও মানবশিশুর উপর ইহার প্রভাব অসাধারণ। জীবের চারিদিক যেমন বায়ুমণ্ডল ঘিরিয়া রাখিয়াছে—পারিপার্শ্বিক সমাজ তেমনই এই সকল স্বোপার্জ্জিত গুণাবলী লইয়া মানবশিশুকে চারিদিক দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে। মানবশিশু প্রাকৃতিক গঠন-অনুসারে বড়ই পরিবর্ত্তন-প্রবণ (plastic)। আর সেই শক্তিবলে সে চারিপার্শ্বের স্বোপার্জ্জিত গুণগুলি অনায়াসেই আত্মসাৎ করিয়া লয়। এক হিসাবে এই স্বোপার্জ্জিত গুণগুলি সমাজস্থ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। সকলেরই এইগুলি লাভ করিবার অধিকার ও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এগুলি বংশানুক্রমিক নহে।

আপাত দৃষ্টিতে এই দুই মতে বিরোধ দেখা গেলেও, বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, উভয়ের মধ্যে ততবেশী প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিছুকাল ধরিয়া এই বিষয়ে নানা পরীক্ষা করিয়া বিসমানের শিষ্যগণ যে সকল স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, সেইগুলি অনুধাবন করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

(১) পারিপার্শ্বিক ও তদনুসঙ্গী কর্ম্মের পরিবর্ত্তন, প্রাণবস্তুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের (germinal variation) উত্তেজক কারণ হইতে পারে।

(২) পারিপার্শ্বিকের সংঘর্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সকল পরিবর্ত্তন হয়—তাহা গৌণরূপে প্রাণকোষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

(৩) পারিপার্শ্বিকের অবিশ্রাম আঘাতে দেহের যন্ত্র ও কোষগুলির উপর একটা সংস্কারের দাগ পড়ে এবং তাহার ফলে কোন কোন স্বোপার্জ্জিত গুণ অধিকার করা জীবের পক্ষে খুব সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারে।

(৪) মাতার সঙ্গে শিশুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আর সেই কারণে মাতার স্বোপার্জ্জিত গুণ শিশুর উপর অত্যন্ত বেশী মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

উপরিলিখিত কথাগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে পূর্ব্ববর্ণিত দুই মতের মধ্যে মূলে বিশেষ প্রভেদ নাই। অন্ততঃ একথা বলিতে বোধ হয় বাধা নাই যে বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক দুইটী পরস্পর বিপরীতমুখী শক্তি নহে; ইহারা পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে ও এক যোগে মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। *

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি

(৯)

সন্ধ্যাকাল, আকাশ-প্রান্তে ভাসমান, চতুর্থীর চন্দ্রকলা ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে, প্রতিবিম্বিত হইয়া মৃদু তরঙ্গে তরঙ্গে সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি-অবসরে রস্থনচৌকি-ধ্বনিত সান্ধ্য রাগিণী আকাশে বাতাসে ম্লান-মধুর তান তুলিতেছিল;--রাজা এ সময়ে প্রায়ই মুক্তছাদে আসিয়া বসেন, আজ ঘরের মধ্যে, টেবিলের নিকটে, দীপালোকের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখিতেছিলেন;—এই সময় জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া দাঁড়াইল। সদ্যোলিখিত ছত্রগুলির দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বলিল—"বাবা কবিতা লিখছ?" •রাজা হাতের কলমটা রৌপ্য কলমদানীতে রাখিয়া বলিলেন—"বস্ রাণি,—তোর patient কেমন আছেন?"

জ্যোতির্ম্ময়ী একখানা ছোট চৌকি রাজার চৌকির নিকট টানিয়া পিতার পাশ ঘেঁসিয়া বসিয়া কহিল, "তিনি ভালই আছেন। দু-একদিনের মধ্যেই বেশ আরাম হয়ে উঠবেন,—কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটাকে যে ভুলতে চাই রাণি।"

"দু-একটা কথা আমার কিন্তু বলার ছিল বাবা। থাক তবে পরেই বলব। কি লিখছ বাবা,- পড়না?"

"শুনবি?—বেশ শোন্,—সে ভাল কথা।"

রাজা সুস্পষ্ট কণ্ঠে আবেগভরে পড়িতে লাগিলেন;—

বল্ ভাই বল্ কেন পেয়েছিল বল?
দলিতে ছলিতে কিরে অভাগা দুর্ব্বল?
তোদের স্বার্থের মুখে বলিদান যেতে সুখে—
নিরীহ পরাণগুলি সৃজিত কি ধরাতল?
ধাতার প্রসাদ মধু তোমাদেরি তরে শুধু,
তাহাদের ভাগ্যে যত বজ্র আর হলাহল?

---

* এই প্রবন্ধ-রচনায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি:—

(১) Baldwin—Social and Ethical Interpretation.

(২) Thomson—Heredity.

(৩) Karl Pearson—Science of National Eugenics.

তা নয়রে মহাবলি, এ শুধু বিবেকে দলি
বাড়াইছ আপনার প্রতিশোধ কর্ম্মফল!
হরি নন সয়তান, কৃপাময় ন্যায়বান,—
এ শক্তি পেয়েছ দান,-বারিতে অন্যায় ছল।
তাহে যদি কর হেলা,আসিবে তোমারো পালা
সুখ মোহে দুঃখতাপ বাড়াইছ এ কেবল?
সাধিতে শক্তির কাজ, বাসনা যদি হে আজ
বিনাশি দুর্ব্বল-দুঃখ আন পুণ্য সুমঙ্গল।

পড়া শেষ হইলে নীরব-জিজ্ঞাসায় রাজা কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন—কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য সময়ের ন্যায় আবেগভরে মনোভাব প্রকাশ করিলনা, দুই ফোঁটা অশ্রু ধীরে ধীরে তাহার নয়নে সঞ্চিত হইয়া উঠিল, আনত দৃষ্টিতে তাহা নেত্রচ্যুত করিয়া কহিল—"এখন কিছু বলবনা ভেবে-ছিলুম, কিন্তু না বলে থাকতে পারছিনে; এখনো কি কাজ করার সময় হয়নি বাবা? কবিতাতেই মনের আকুলতা প্রকাশ করে ক্ষান্ত থাকবে?"

যে বেদনায় তাঁহার কবিতার ছত্রগুলি রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বেদনার জ্বালা স্বরে প্রকাশিত করিয়া অতুলেশ্বর কহিলেন—"একান্ত নিরুপায় রাণি, নিতান্ত শক্তিহীন! আমাদের এই নিষ্ফল ক্রন্দন একদিন কারো মনে, কারো তেজে সফলতা লাভ করবে,—এইরূপ আশাকরি;—কিন্তু—"

"বাবা,—তুমিও একথা বলছ?"

"সত্য কথা যে রাণি। সবল চিরদিনই দুর্ব্বলকে পীড়ন ক'রে আসছে,—করবেও। এ শক্তিকে রোধ করা যেরূপ শক্তির কাজ সে সামর্থ্য আমার আছে কি রাণি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—"একথা আমি মানিনা। দুর্ব্বল-পীড়ন যে সবলের স্বভাব তা কখনই নয়। কারো কারো পক্ষে একথা ঠিক হতে পারে কিন্তু সাধারণ নিয়ম বিপরীত বলেই মনে হয়। নইলে পৃথিবীতে ত দুর্ব্বল তিষ্ঠোতেই পারত না। আর ইংরাজ জাতের পক্ষে যে একথা খাটেনা তাঁদের শাসন-নীতিই তার স্পষ্ট প্রমাণ। আমরা যে আজ এ ভাবে ভাবতে শিখেছি তাওত ইংরাজি শিক্ষার ফল। আজ ব্রাহ্মণের সহিত ধোবা নাপিতও এক বিদ্যালয়ে এক আসনে বসে শিক্ষালাভ করছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে সমভাবে বেদপাঠের অধিকারী; কায়স্থ রমেশ দত্ত আজ বেদ অনুবাদ ক'রে ব্রাহ্মণের মুখ হেঁট করেছেন, যদিও আমি মনে করি উজ্জ্বল করেছেন।"

"ইংরাজের গুণের পক্ষপাতী তোর চেয়ে আমি কম নইরে—তবে—"

—"তবে উদার ইংরাজজাতও সময় সময় দুর্ব্বল-পীড়ন করে কেন? এ প্রশ্ন যখনি আমার মনে উদয় হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরটাও শুনতে পাই।"

রাজা কোন কথা কহিলেন না, নীরব কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; বালিকা বলিল—"অবশ্য কোন জাতের মধ্যে সকলেই মহৎপ্রাণ হয় না—কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়ে, এই পীড়নের আসল অর্থ হচ্ছে,—যেখানে নিষ্পেষণে অপমান বোধ নেই, যেখানে অবমাননাই শিরোভূষণ রূপে বৃত হয়, সেখানে দুর্ব্বল-রক্ষার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বল-পীড়নেই সবল প্রকৃতি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; কিছু পরে কন্যা কথা কহিল—"দেখ বাবা সেদিন আমার হরিরাম, কেশব পাঁড়ের পা ধুইয়ে সেই মঙ্গলাজল এক চুমুকে পান করে যেন ধন্য হয়ে গেল, আর পাঁড়েও তাকে এই পুণ্যদান ক'রে আপনার ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে গর্ব্বস্ফীত হয়ে উঠলো। দেখে আমার যে কি দুঃখ হোল বলতে পারিনে। কিছুদিন পরে ইংরাজ-হস্তে পীড়নের ফলও এই রকম দাঁড়াবে। আমি—আর দেখতে পারিনে বাবা!"

"কি করব বল?"

"কিছু ক'রনা তুমি,—তুমি শুধু আমার সহায় হও। বাবা রাজ্যের যত বিদ্যালয় আছে, আমি তাতে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে চাই—অনুমতি দাও তুমি—"

রাজা কন্যার ভাষায় একটু বিস্মিত হইলেন; "আমি ব্যবস্থা করতে চাই।" বলিতে ত পারিত—"তুমি ব্যবস্থা কর।"

নিজের মনের অজ্ঞাতসারে—রাজা যোগমায়া দেবীর ছবিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কন্যার মস্তকে সাদরচুম্বন করিয়া কহিলেন—"রাণীর আজ্ঞা কি অবহেলা করা যায়—হবে হবে"।

জ্যোতির্ম্ময়ীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি ছোট মেয়ের মত পিতাকে বাহু-বেষ্টনে বাঁধিয়া বলিল—"না বাবা—'হবে' বল্লে আর চলবে না। ভবিষ্যৎকে এখন বর্ত্তমানে আগিয়ে নিতে হবে। আমি পণ্ডিত মহাশয়কে তোমার নাম করে হুকুম দিয়েছি—আমাদের পিছনের বড় আমবাগানে কাল থেকে ছেলেরা যেন প্রত্যহ ব্যায়াম শিখতে আসে। আজ থেকে ছমাসের মধ্যে তুমি তাদের পরীক্ষা নিতে চাও—এইরূপ জানিয়ে দিয়েছি।"

রাজা বলিলেন—"রাণি তুই যে রাজারও রাজা হলি?"

"না বাবা আমি রাজার সেনাপতি; আমার ইচ্ছা করে রাণী যোগমায়ার মত আমি দেশ রক্ষা করি।"

এবার উভয়ে নীরব প্রশংসায় যোগমায়ার তৈল চিত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিলেন।

রাজা মনে মনে জ্যোতির্ম্ময়ীর তেজস্বিতায় গর্ব্ব অনুভব করিলেন, কন্যার ইচ্ছা ও উদ্যমের প্রশংসা করিলেন, তাহার প্রস্তাব সর্ব্বহৃদয়ে অনুমোদন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে ভাবিতে হইল -এরূপ কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের অসন্তোষের কোন কারণ ঘটিতে পারে কি না।

এ দেশের জমিদার ও রাজাদিগের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহাদের কার্য্যক্ষমতার পরিসর যে কত কম, তাহা তিনি বাল্যকালে প্রতিপদে ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন; বিদেশী রাজা যে ভারতবাসীর গূঢ় স্বভাবের এবং অন্তর্নিহিত ভাবের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কত অক্ষম, তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলেন! অধিকাংশ স্থলে শূন্যে আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া তাঁহারা বিদ্রোহিতার ভয় পান। একজন স্বল্পবুদ্ধি ভারতবাসীও তাহার হাস্যকারিতা বুঝিতে পারে। কিন্তু ইংরাজের ন্যায় বুদ্ধিমান জাতিও—(সম্ভবত নিজের দেশের তুলনায়) তাহাতে

বিদ্রোহের আভাস প্রত্যক্ষ করিয়া এমন ভীত চঞ্চল হইয়া উঠেন যে, তখন রাজ-ভক্তি ও রাজবিদ্বেষের মধ্যে রেখা টানাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে—এবং ইহার অনিবার্য্য ফলভোগ করিতে হয় বেচারা প্রজাদের। এইরূপ অভিজ্ঞতার ফলে রাজার দেশহিতকর কার্য্যোদ্যম একেবারে বিনষ্ট হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কন্‌গ্রেসের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন; কিন্তু ইদানীং তাহাতেও তাঁহার উৎসাহের অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থ-দান করিতেন বটে, কিন্তু কার্য্যত ইহা হইতেও একরূপ দূরে দূরে থাকিতেন। সংবাদ-পত্রও তিনি ভাল করিয়া পড়িতেন না; বিশেষতঃ দেশের লোকের প্রতি পীড়ন সংবাদ সমস্তই বাদ দিয়া যাইতেন। যাহার প্রতিকার তাঁহার দ্বারা সম্ভব নহে, এইরূপ বিষয়ে আপনাকে নিদ্রিত রাখিবেন—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু পারিলেন কই? দৈব—কন্যারূপে তাঁহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া তুলিল।

তাঁহার মনের এইরূপ নিভৃত আলোড়ন বৃত্তান্ত কন্যাকে তিনি কিছুই জানিতে দিলেন না; সমস্ত রাত্রি চিন্তার পর প্রাতঃকালে ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিবার অগ্রে তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি রাজার যে কিরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহা পাঠক অবগত আছেন। কিন্তু কেবল রাজপরিবার নহে রাজ্যের সকল লোকেই তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ। ক্লাউডেন সাহেবের নামের সহিত ইহারা নানা রকম টাইটেল যোগ করিয়াছিল যেমন দয়াল, ভারতবন্ধু, ন্যায়-অবতার—ইত্যাদি। কিন্তু ইহার কোন টাতেই যখন তাহাদের মনের আশ মিটিল না—তখন ইহার নাম দিল, হিন্দু ক্লাউডেন সাহেব। এ নাম দিবার কারণও ছিল,—কোন পর্ব্বোপলক্ষে ইহারাও জুতাহীন পদে শ্যামসুন্দরের মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া রাজার সহিত একত্রে আরতি দর্শন করিতেন। সকলে যখন প্রণাম করিত, ইঁহারাও হাঁটু গাড়িয়া নতমুখে বসিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহাদের এই ব্যবহার লোকের চক্ষে এতই অস্বাভাবিক ও বিস্ময়জনক বোধ হইয়াছিল যে তাহারা ইঁহাদের সারল্যে বিশ্বাস করিতে পারিতনা। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গোয়েন্দা-নিয়োজিত হইয়া ইঁহারা রাজার কার্য্য-কলাপ ও মনোভাব বন্ধুতাসূত্রে অবগত হইয়া পরে অনর্থ উৎপাদন করিবেন—এইরূপই অনেকে সন্দেহ করিত। কিন্তু সত্যের জয় পড়িয়াই আছে! কিছুদিন পরে সকলেই নিজ নিজ অমূলক সন্দেহে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

রাজার মুখে পুরোহিতের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি সাতিশয় লজ্জিত এবং মর্ম্মপীড়িত হইলেন।

(১০)

কোন স্বাধীন জাতিভুক্ত মহদন্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে দুর্ব্বল-রক্ষা এমনি স্বভাব-সিদ্ধ যে ইহার অন্যথা দেখিলে আত্মপর নির্ব্বিভেদে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে। অধিকন্তু এইরূপ নিষ্ঠুর ঘটনা

কোন আত্মীয়কৃত হইলে এই আঘাত ব্যথার উপর লজ্জার জ্বালা তাঁহাকে দাহন করিতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকের আহত ন্যায়-বুদ্ধিতে প্রতিকার-চেষ্টা একবার জাগিয়া উঠিলে শত নির্য্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপ ভীমবলে তাহা কার্য্য করিতে সক্ষম—তাহার দৃষ্টান্ত, হিউম রিপন প্রভৃতি মহা-প্রাণগণ। এরূপ কার্য্যকরী ত্যাগক্ষমতা দুর্ব্বল পরাধীন জাতির পক্ষে সম্ভবপর নহে।

মিসেস্ ক্লাউডেন বলিলেন "এ রকম এক একটা নিষ্ঠুর ঘটনা দেখে মনে করবেন না যে, আমাদের জাতটাই এত ভীষণ! একটা কথা বলব রাজা, আমাদের স্বভাব বিকৃতির জন্য আপনারাই কিন্তু অনেক পরিমাণে দায়ী।" রাজা হাসিলেন,—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা মনে পড়িল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—

"আমি যখন সুলতানপুরে ছিলুম তখন রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণে গিয়ে একবার বড় লজ্জায় পড়তে হয়েছিল। ঘরের মধ্যে দুখানি রাজসিংহাসন রাখা হয়েছিল আমাদের তাতে বসতে বলে রাজা রইলেন দাঁড়িয়ে; আমি নিজে না ব'সে তারি এক খানাতে আমার স্ত্রীর পাশে রাজাকে বসিয়ে দিলুম।—"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ পত্নী হাসিয়া বলিলেন—"বেচারার চেহারাখানা যদি তখন দেখতেন রাজা!—সে চেহারা আমি কখনো ভুলতে পারবনা। আমার স্বামী থাকবেন দাঁড়িয়ে আর তিনি কিনা বসবেন—রাজতক্তে, এমন বে-আদপী তাঁর কাছ থেকে ত প্রত্যাশা করা যায় না; তিনি কাতর ভাবে তখনি উঠে পড়লেন।"

রাজা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"মাপ করবেন মিসেস্ ক্লাউডেন, অতিথিকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসাটা আমরা সত্যই বেআদপী মনে করি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী বলিলেন—"আমরাও অতিথিকে দাঁড় করিয়ে নিজে বসিনে। তবে মর্য্যাদা-দান-ছলে নিজের অমর্য্যাদা করে অতিথিকে অস্বচ্ছন্দ করে তুলিনে।"

রাজা বলিলেন—"চৌকিতে বসতে ত আমরা অভ্যস্থ নই মিসেস্ ক্লাউডেন। ও সব ফ্যাসান আধুনিক ইংরাজি অনুকরণ। আমরা গালচের উপরেই ঘরে সদা সর্ব্বদা বসি। আপনারা আমাদের রীতিনীতি জানেন না বলেই রাজার ব্যবহার অদ্ভুত ভেবেছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—"আপনাদের রীতি নীতি সব বুঝিনে বলে অনেক সময় ভুল ধারণা জন্মায় সন্দেহ নেই; কিন্তু বড় বড় হরফে আঁকা সুস্পষ্ট স্তুতিবাদগুলোকেও যদি রীতিনীতির দোহাই দিয়ে ভুল বুঝতে পারতুম—তাহলে খুসীই হতুম রাজা।"

রাজা এবার হাসিয়া বলিলেন—"আপ-নারা হলেন আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা, একটু আধটু স্তুতিবাদ করতে হয় বৈকি। রাজা আছেন আমাদের বিদেশে লুকিয়ে, তাঁর ত দর্শন পাইনে; আপনাদেরই রাজাসনে বসিয়ে আমরা ভক্তি প্রকাশ করি। আপনারাও যেমন আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করতে পারেন না আমরাও তেমনি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে আমাদের কোন ব্যবহারে আপনারা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবেন; কাজেই কোন কোন সময় অদ্ভুত ব্যাপারও যে একটা না হয়ে পড়ে তা নয়।"

ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী বলিলেন—"বেশ, তাহলে অন্য দিকটাও দেখুন। ক্রমাগত দুহাতে সেলাম পাওয়া অভ্যাস হয়ে গেলে একদিন এক হাতের সেলামে কি মন ওঠে? তখন তার অন্যরূপ অর্থ করাই আমাদের পক্ষেও স্বাভাবিক নয় কি? প্রথম থেকে উভয় পক্ষ যদি যথাযথ ভাবে চলে ত আর কোনরূপ অনর্থের কারণ ঘটেনা।"

রাজা বলিলেন—"সাহস পাই কই মিসেস্ ক্লাউডেন? সকলেই ত আর ক্লাউডেন সাহেব বা তাঁর মেম নন; সেলাম না করলে যখন পিঠে লগুড়াঘাত পড়বে জানি তখন পিঠ বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাসিলেন; তাঁহার পত্নী বলিলেন—"আমি হলে কিন্তু এ বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে এমন তেজে চলি যাতে লগুড়াঘাত পিঠে পড়তে অবসর না পায়। জানেন ত রাজা, একটা তেজী বেড়াল কি কুকুর দেখলে সশস্ত্র মানুষও পিছিয়ে দাঁড়ায়।"

"কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য—তারপর এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের শাস্তি হাতে হাতেই তার লাভ হয়। আপনারা স্বাধীন জীব, আপনাদের মুখে তেজের কথা শোভা পায়—কিন্তু অকারণে যারা নিষ্পেষিত, রাঙা মেঘ দেখলেও তাদের মনে আগুনের আশঙ্কা জাগে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী কহিলেন, "কিন্তু এরূপ ভয়কে বিসর্জ্জন না দিলে ত কোন জাতির মঙ্গল নেই।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন—"আপনিই তাহলে দেখছি জ্যোতির্ম্ময়ীর গুরু। এইরূপ ভাবের কথা আজকাল তার মুখে ত ক্রমাগতই শুনি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর নামে ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীর মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; আবেগভরে বলিলেন—"What a darling girl she is!"

রাজা কহিলেন, "Daring too! এর মধ্যে সে এক কাণ্ড করে বসেছে,—প্রসাদপুরের যত স্কুলে ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের হুকুম দিয়েছে"। শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি একই সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"ভালই ত করেছে।"

"কিন্তু বহুপূর্ব্বে আমার শ্মশ্রুহীন অবস্থায় আমিও এই রকম কাজ একবার করতে গিয়েছিলুম, তাতে কমিশনার সাহেব তখন বাধা দেন।"

মেমসাহেব এই কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"Nonsense!" সাহেব কিন্তু ধীর ভাবেই বলিলেন—"বোধ হয় কমিশনার সাহেব কোনরূপ ভুল বুঝেছিলেন—তিনি কি স্পষ্ট করে নিষেধ করেছিলেন?"

"জানিনা। তবে ততদূর ত সব সময় আবশ্যক হয় না। অনেক সময় ইঙ্গিতে মন বুঝে আমরা কাজ করতে বাধ্য হই। আমার কাকা মহাশয় অন্ততঃ কমিশনারের সেইরূপ অভিপ্রায় বুঝেছিলেন।"

"কিন্তু ইঙ্গিতে বুঝতে হলে অনেক সময়ই ভুল বোঝার সম্ভাবনা। আপনারাই তাঁকে তাহলে খুব সম্ভব ভুল বুঝে থাকবেন। নইলে ব্যায়াম চর্চ্চায় ত কোনই দোষ নেই। আমার বরঞ্চ মনে হয় জর্ম্মণ দেশের মত সকল দেশেই লোক শিক্ষা আর ব্যায়াম চর্চ্চা compulsory হওয়া

উচিত। আমরা এদেশের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত হয়েছি—এতে বাধা দিলে আমরা নরকগামী হব। আমি এই ব্যায়াম সমিতির প্রেসিডেণ্ট হতে চাই।”

কৃতজ্ঞতায় রাজার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কিরূপ বাক্যে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, বুঝিতে পারিলেন না। কিছু পরে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন —“যদি সকলেই আপনাদের মত সদাশয় লোক হতেন ত ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য হয়ে উঠতো। কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই আপনি দেখতে পাবেন যে আপনাদের মধ্যে এমন লোকও অনেকে আছেন যাঁরা আমাদের পশুতুল্য ভেবে পশুতুল্যই নিস্তেজ ক’রে রাখতে চান।”

ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি অধোমুখ হইয়া রহিলেন; সহসা এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না; রাজা আবার বলিলেন --“আমরা ত অকৃতজ্ঞ জাত নই;—আর সত্যসত্য অসভ্য জাতও নই। এ দেশের ছোটলোক আর আপনাদের দেশের ছোট লোকদের সঙ্গে তুলনা করলে এ কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। অথচ মানুষের কাছে মানুষ যেটুকু ভদ্রতা প্রত্যাশা করতে পারে ততটুকু ভদ্র ব্যবহার আমাদের দিতে তাঁরা সৌজন্যের অপব্যয় জ্ঞান করেন। রেলগাড়ীর এক কম্পার্ট-মেণ্টে কোন ভারতবাসী নিগারকে তাঁরা বরদাস্তই করতে পারেন না। পশুদের কষ্টনিবারণী আইন কার্য্যকরী কিন্তু আমাদের দেশের লোক সবল বুটের আঘাতে যখন মরে তখন অপরাধটা তার প্লীহারই উপর গিয়ে পড়ে। এবং এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করে, কি উচ্চ বাচ্য করে, রাজ-আইনে সেই দণ্ডনীয়। অতএব নীরবে সইতে পার ত মঙ্গল, নইলে উচ্ছন্ন যাও।”

মনের আবেগে রাজা আজ মুক্তকণ্ঠ। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দুঃখিত ভাবে বলিলেন— “সকল জাতের মধ্যেই ভাল মন্দ লোক আছে রাজা।”

“তা ঠিক! আসলে আমাদের দুঃখ সেজন্য নয়---গভর্ণমেণ্টের আচরণে যে বিমাতার ভাব প্রকাশ পায়—সেইটেই আমাদের প্রকৃত কষ্টের কারণ। দেখুন একজন অধম ফিরিঙ্গিরও যেসব রাজনৈতিক অধিকার আছে, কি অপরাধে যে আমরা তাতেও বঞ্চিত তা ত বুঝতে পারিনে। এই অবিচারেই আমরা মর্ম্মাহত।”

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—“তবুও নিরাশ হবেন না, কেবল এ দেশে ব’লে নয়—আমাদের দেশেও গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কোন অধিকার আদায় করতে অনেক কষ্ট পেতে হয়। এই দেখুন এত চেষ্টাতেও আইরিসরা কি এখনো হোমরুল আদায় করতে পেরেছে? আর সাফ্রিজিষ্ট দল ত আমাদের দেশেরই মেয়ে, ভোট অধিকার পাবার জন্য তারা কি চেষ্টাই না করছে—তবু ত গভর্ণমেণ্ট অটল। সকলে যেমন কালের মুখ চেয়ে রয়েছে—আপনাদেরও সেইরূপ থাকতে হবে। যদি যোগ্যতা দেখাতে পারেন—একদিন কৃতকার্য্য হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসীম অধ্যবসায় সহকারে প্রস্তুত হতে থাকুন।”

এই সময় চাপরাশি আসিয়া একখানা

কাগজ ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিল, তিনি রাজার সম্মতি লইয়া লেফাফা ছিঁড়িয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

(১১)

রাজা এই সুযোগে বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু মেম সাহেবের অনুরোধে আবার তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটকে একাকী রাখিয়া উঁহারা দুইজনে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

মেমসাহেব বলিলেন—“আমার একটা কথা অনেকবার মনে হয়েছে—বলব রাজা? কিছু মনে করবেন না। রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আপনারা পরমুখপ্রত্যাশী কিন্তু যে সব বিষয়ের উন্নতি আপনাদের নিজের হাতে—তাতে ত আপনাদের সমবেত চেষ্টা দেখিনে? আপনাদের ঘরে স্ত্রীজাতি যখন শক্তিময়ী হয়ে উঠবে, লোকশিক্ষায় সমাজ যখন প্রবল হয়ে উঠবে তখনই কি আপনাদের জাতীয় যোগ্যতা প্রকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে না?”

রাজা কহিলেন—

“সকল দেশেই রাজনীতির চেয়ে সমাজ নীতির সংস্কার কঠিন তাত বোঝেন? বিশেষ আমাদের সমাজ বহুদিনের সভ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ফল। বাইরের লোকে বুঝতে পারেনা—কিন্তু আমাদের পক্ষে সমাজনীতির কঠিন বেড়া ভাঙ্গা একরূপ দুঃসাধ্য সাধন।”

“তাই ত দেখছি। আপনাদের সমাজের মুখপত্র ব্রাহ্মণসভা ত বিলাত-যাত্রার পর্য্যন্ত বিরোধী! হাস্যকর!”

“এটা হাস্যকর হলেও সমাজনীতি ভাঙ্গতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যে অনেক ভাল জিনিষও হারাতে হয়, এটা ঠিক।”

“উপায় নেই। কাঁটাগাছ বাছতে গেলে অনেক সময় দুচারটা ভাল গাছও নষ্ট করতে হয়।”

“আসল কথা রাজনৈতিক অধিকার অভাবে দেশের লোকে যেরূপ সমভাবে ক্লেশ অনুভব করে—যখন কোন সমাজ-নীতি সকলের পক্ষে সেইরূপ কষ্টকর হবে, তখনই তার সংস্কারে সমবেত চেষ্টা অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া এ দেশে লোক শিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষা যে আদৌ নেই সেটাও নিতান্ত ভুল। এদেশে উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে অর্থের দিক ছাড়া অন্য বিষয়ে খুব যে একটা পার্থক্য আছে তা নয়। বরঞ্চ ধর্ম্মের ভাব চাষাভুষা এবং স্ত্রীজাতির মনে যত প্রবল উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ততটা নেই। তার কারণ কথকতা পুরাণ-পাঠ প্রভৃতি যে সব উপায়ে এ দেশে লোক শিক্ষা হয়—তা এখন সাধারণ গ্রাম্যলোক এবং স্ত্রীজাতির মধ্যেই আবদ্ধ। ইংরাজি শিক্ষানবীশ পুরুষদের মধ্যে তার চর্চ্চার অবসর কোথা!”

“সবদেশেই স্ত্রীলোকদের ধর্ম্মের ভাব বেশী—”

ক্লাউডেন সাহেব এই সময় দেখা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অর্থাৎ গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতা! পাদ্রি ও পুরোহিতরা যে এজন্য তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ—তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।”

সকলেই হাসিলেন; তিনি রাজার পাশের একখানা আরামচৌকি দখল করিয়া লইয়া

একটা চুরুট রাজার হাতের কাছে ধরিলেন। রাজা ধন্যবাদ দানে তাহা লইতে অসম্মত হইলে নিজেই তাহা ধরাইয়া ধূমপান আরম্ভ করিলেন। রাজা ক্লাউডেনের কথার উত্তরে কহিলেন, "এস্থলে আমিও আপনার সহিত একমত। আমাদের মেয়েরা দেশের পুরাতন আচারগুলি যত্নে রক্ষা করেন ব'লেই এখনো সেগুলি টি'কে আছে।"

"আপনি সেটা কি ভাল মনে করেন না?"

"মন্দ মনে করিনে, যদি পুরাতন মর্য্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যেই সে সব অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আচারগুলিকেই ধর্ম্ম বলে গ্রহণ করলে দোষ হয়ে পড়ে বই কি।"

"তবেই ত আপনি স্বীকার করছেন—যেরূপ শিক্ষায় একটা বিচার-ক্ষমতা জন্মে আপনাদের মেয়েদের মধ্যে সেরূপ শিক্ষার প্রচার আবশ্যক।"

ক্লাউডেন সাহেব এতক্ষণ চুপ করিয়া ধূমপানে মগ্ন ছিলেন, চুরুটটা হাতে লইয়া তাহার ছাই ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিলেন "রাজার মুখ দিয়ে একথা স্বীকার করাবার কি দরকার আছে ডিয়ার?"

মিসেস্ ক্লাউডেন বলিলেন,—"আমি একথাটা ঠিক রাজাকে বলছি নে, দেশের লোকের উদ্দেশে বলাই আমার অভিপ্রায়।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন—"দেশের লোক এ কথার কি উত্তর দেবে জানিনে, তবে—স্ত্রীজাতির মনের প্রসারতা না বাড়লে দেশের মঙ্গল নেই; এটা আমি মনে করি বই কি। অতীতের তুলনায় আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষা দীক্ষা অবস্থা যে-হীন হয়ে পড়েছে, চোখ চাইলেই ত তা দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্ত্রীশিক্ষার দিকে লোকের লক্ষ্যও পড়েছে। দেখুন না দেশের কত মেয়ে বি-এ এম্-এ পরীক্ষাও দিচ্ছেন,—আর অনেক সুশিক্ষিতা মহিলা দেশের জন্য কাজও করছেন।"

"কিন্তু আপনাদের সমাজ প্রকৃতভাবে তাঁদের স্বদলভুক্ত জ্ঞান করে কি? তাঁরা হলেন একটা show! দরকার-মত অন্য-জাতির চোখের সামনে ধরে গর্ব্ব করার বস্তু। তাই নয় কি? দেখুন, আমি কলকাতায় গিয়ে দুচারটি ধনীঘরের পরদানসীন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেছিলুম। তাদের স্বামীরা কন্‌গ্রেসের লোক আর সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেও কাগজ-পত্রে তাঁদের বক্তৃতা পড়েছি। কিন্তু মেয়েদের ব্যবহার দেখে আমাকে ভারী নিরাশ হতে হয়েছিল।"

রাজা তাঁহার প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিলেন—তিনি কহিলেন—"একটি বাড়ীতে আমি কিরূপ অপ্রস্তুত হয়েছিলুম শুনবেন? তাঁরা থালা পূরে আমাকে নানারূপ মেঠাই খেতে দিয়েছিলেন। আমার কাছেই একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়েছিল; কি কুবুদ্ধি হোল আমার, প্লেট থেকে তার হাতে একটি মেঠাই দিলুম। অমনি গিন্নি ঠাকরুণ চড়াসুরে বলে উঠলেন, "করলেন কি মেমসাহেব! ও সব ত খায় না!—ফেলেদে ফেলেদে—রাক্ষসী অসুখ করবে; ততক্ষণ মেয়েটি দিব্য করে মেঠাইটির অর্দ্ধেক গালে পুরে দিয়েছে। বৌরা ঘোমটার মধ্যে থেকে চোখ টেপাটেপি করতে লাগলেন, একটা দাসী এসে বকতে বকতে তাকে টেনে নিয়ে গেল; বেচারী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল, আমার আর অপ্রস্তুতের সীমা রইল না।"

রাজা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "মানুষে মানুষকে স্পর্শ করলে আচারভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়—আমাদের মনের এই যে সঙ্কীর্ণতা এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা আমার শোচনীয় বলে মনে হয়। তাছাড়া মেয়ে-পুরুষের মধ্যে এতে যেরূপ বর্ণ-বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে সেটাও বড় অদ্ভুত! কিন্তু আমার বিশ্বাস বেশীদিন এরকম থাকবে না।"

"শিক্ষায় কালে এসব নিশ্চয়ই চলে যাবে। কিন্তু আমি অনেক পুরুষের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি—এখনো স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা তাঁরা ঠিক উপলব্ধি করেন না। অনেকে ভাবেন—শিক্ষায় নারীস্বভাব বিকৃত হয়ে যায়। তাদের প্রাণে আর তেমন স্নেহ-মমতা থাকে না। কেউ কেউ আমার মুখের উপরেই বলেছেন, ভারত-রমণীর মত আমরা ভালবাসতে পারিনে, ত্যাগ স্বীকার করতে জানি নে, ইত্যাদি।"

ক্লাউডেন সাহেবের চুরুটটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি সেটা বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন "ঠিকই ত বলেছে। আমি যদি আজ মরি—তুমি কাল নিশ্চয়ই আর একটা বিয়ে করে বসবে।"

পত্নী উত্তর করিলেন "আর তুমি! fair exchange, no robbery."

"আমি! By Jove! কক্ষণো না। আমি তোমার ছবির সামনে kneel down করে থাকব, দেখে নিও।"

রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দেখুন Mrs. Clowden, আমাদের কোন মেয়ে আপনাদের এইরূপ রসিকতা শুনলে shocked হোত?"

সাহেব বলিলেন, "Good souls! তোমরা যদি তাদের মত হতে, তাহলে কোন স্বামী মরতে ভয় পেত না!"

মেমসাহেব বলিলেন—"রাজা, ওর কথা শুনবেন না, আমরাও good souls, আচ্ছা ভাবুন দেখি রাজা, সমাজ আইনে ভারতরমণী নিগড়-বাঁধা; ইচ্ছাতে হোক অনিচ্ছাতে হোক, নিষ্ঠুর পশু স্বামীরও পদসেবা করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। কিন্তু আমরা স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করতে পারি—আমাদের ডাইভোর্স আছে—একাধিকবার বিবাহ আমাদের মধ্যে দুষ্য নয়—এ সত্ত্বেও আমাদের মেয়েরা স্বামীর জন্য কত সহ্য করে? আপনারা উপন্যাসে স্ত্রীলোকের ত্যাগস্বীকারের বিষয় যা পড়েন তা একটুও বাড়ানো কথা নয়। মহারাণী (আপনার মা) শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, সব ছেলে-মেয়েগুলিকে বিলাত পাঠিয়ে আমি একলা আছি। কিন্তু তাদের মঙ্গল ভেবেই আমরা সে কষ্ট সহ্য করি। স্ত্রীজাতির মধ্যে কষ্ট-স্বীকার আত্ম-বিসর্জ্জন স্বাভাবিক, নইলে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা হয় না। শিক্ষাতে এ ভাব বাড়ে, কিন্তু কমে না।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"Bravo! কিন্তু কোন পাদ্রি থাকলে তোমাকে contradict করতো,—আদমের অধঃপতন হয়েছিল কেন, বল দেখি?"

"এই দেখুন রাজা—সেই আদিকাল থেকেই মেয়েরা সহ্য করে আসছে। নিজের দোষে স্বর্গচ্যুত হলেন আদম—দোষ পড়ল বেচারী ইভের ঘাড়ে।"

রাজা বলিলেন—"আমি ইভ হ'লে আদম জাতীয় জীবের ত্রিসীমা মাড়াতুম না।"

"তাতে ত আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। দোষের ভাগ নিজে নিয়ে গুণগুলি ফুটিয়ে আপনাদের উজ্জ্বল করে তোলাই ত আমাদের জীবনের কাজ।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"বড় বেশী রকম আত্মপ্রশংসা করছ, challenge করতে হোল দেখছি।"

রাজা বলিলেন—"না Mr. Clowden আত্ম-প্রশংসা এ নয়; মেয়েদের আদর্শ যা হওয়া উচিত তাই ইনি বলছেন; অন্ততঃ আমরা যে রকমটা চাই।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন—"Very sorry for you রাজা। আমি কিন্তু কিছুতেই মেয়েদের স্কার্ট ধরে চলতে রাজি নাই।"

মিসেস্ ক্লাউডেন এ কথায় আর কোন কথা না কহিয়া রাজাকে বলিলেন—"দেখুন রাজা, এদেশে এসে আমার সর্ব্বপ্রথমেই কি অভাব মনে জেগেছিল, জানেন?"

"না ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"নারীবর্জ্জিত নিমন্ত্রণ আর নারীবর্জ্জিত সভাসমিতি। কোন দেশমঙ্গল কার্য্যে মেয়েদের সহযোগিতা না থাকলে সে কাজ কি সফল হতে পারে!" রাজা নীরবে তাঁহার সুগঠিত গুম্ফযুগের অগ্রভাগ-কুঞ্চনে -মনোনিবেশ করিলেন। মেমসাহেব বলিলেন "শিক্ষাতে মেয়েদের হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না, তাদের কার্য্য-পরিসর দৃষ্টি-পরিসর কেবল বাড়ে, তাদের স্নেহ-মমতা ঘরের সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ছোটে। তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী আমার এই কথারই দৃষ্টান্ত।"

ক্লাউডেন সাহেব বলিলেন,—"না dear, তোমার সঙ্গে আমি এক-মত হতে পারচিনে। জ্যোতির্ম্ময়ী কেবল শিক্ষার ফল নয়, অন্য অনেক মেয়েকে তুমি ঐ রকম করে শেখাও, সে ত জ্যোতির্ম্ময়ী হতে পারবে না। genius কি সকলেই?"

"কিন্তু শিক্ষাতে geniusও ফুটে ওঠে। রত্নেরও জহুরীর হাতে মার্জ্জিত হওয়া দরকার।"

রাজা বলিলেন—"তা ঠিক! এই ভারত-ভূমিই ত সীতা, সাবিত্রী, খনা, লীলাবতীর দেশ। শিক্ষার প্রভাবে একদিন আবার ভারতবর্ষ নারী-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আমার মনে প্রবল।"

"আর কে বলতে পারে নারীজাতির দ্বারাই ভারতের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হবে না?"

এইরূপ কথাবর্ত্তার পর রাজা হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিবামাত্র কন্যা তাঁহার হাতে তাহার ব্যায়াম-সমিতির একখানি নিয়মাবলী আনিয়া দিল। তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মসূত্র লিখিত ছিল—

১। ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে।

২। ভারত-সম্রাটের শুভ কামনা করিবে।

৩। দেশমঙ্গলে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করিবে।

৪। নারী-সম্মান রক্ষা করিবে; এবং দুর্ব্বলের সহায় হইবে। স্বদেশী বিদেশী নির্ব্বিচারে অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করিবে।

৫। শরীর-মনের তেজ-বৃদ্ধিকর ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে।

৬। মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

৭। অযথা বল প্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না; কিন্তু অপমানিত হইলে নত মুখে তাহা সহ্য করিবে না।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারতের গ্রাম

(ফরাসী হইতে)

দেশের মাটী বড় বড় ভূস্বামীরই হউক, বা কোন বিশেষ-অধিকার-বিশিষ্ট জাতেরই হউক, কিংবা নিজেদেরই হউক, চাষা ও কারিগরেরা গ্রামেই দল বাঁধিয়া অবস্থিতি করে এবং সমস্ত ভারতে গ্রামরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি একই রকমের। গ্রামের বাহ্য আকারেও অল্পই বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটা আঁকা-বাঁকা রাস্তা কতকগুলি ছোট রাস্তাকে কাটিয়া চলিয়াছে। চৌকোণা অঙ্গনের মধ্যে একটা এজমালি গৃহ, অনেক সময় মাটীর কিংবা কাঠের দ্বারপ্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূলধরণের দেবালয়। উঠানের মধ্যে খড়ে ছাওয়া মাটীর ঘর; সেইখানে গো-মহিষাদি পশুরা আবদ্ধ থাকে। সমৃদ্ধ পল্লীতে, খাপ্‌রার ছাদ, দেয়াল চুণ-কাম-করা: গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর উত্তাপে, এই শাদা ও লাল বাড়ীগুলা যেন একটা আনন্দের ভাব ধারণ করে।

* *
*

প্রত্যেক গ্রামে, পরিবারগুলি বিভিন্ন জাতে বিভক্ত; প্রত্যেকে নিজের ব্যবসায় চালাইতেছে: কৃষক, পশুপালক, কারিগর, ছোট ব্যবসাদার, নীচকর্ম্মে নিযুক্ত লোক। কোন পরিবারের অন্তর্ধানে সমস্ত গ্রামটারই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়।

সকল গ্রামেই এক একজন কুলক্রমাগত প্রধান থাকে। যে গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই-ই থাকে, সেখানে ঐ দুই ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত দুইজন প্রধান দৃষ্ট হয়। গ্রামস্থ প্রধানের অধীনে, একটা পঞ্চায়ৎ থাকে। পঞ্চায়ৎ নিছক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, এবং অতি পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। (১)

* *
*

পঞ্চায়তের অধীনে ১২ জন কর্ম্মচারী। একজন জরিপ জমাবন্দী করে। আর একজন ধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল গণনা করে, পঞ্জিকা তৈয়ারী করে, কখন কখন পাঠশালায় গুরু-

---

(১) ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে এই প্রধানদের ভিন্ন ভিন্ন নাম; উত্তরাঞ্চলে, "মুকদ্দম" ও "লম্বর্দার (এই "লম্বরদার" শব্দটার ব্যুৎপত্তি অর্দ্ধ ইংরেজি ও অর্দ্ধ ফার্সি।); মধ্যদেশে, "পাটেল," "মণ্ডল," "দেশাই," "দেশমুখ" ইত্যাদি। দাক্ষিণাত্যে "পাটেল" নামই বিশেষরূপে প্রচলিত। যে গ্রামের স্বত্বাধিকারী কোন বিশেষ জাত, সেখানকার প্রধানকে জাতিদার বলা হয়; লম্বরদারও বলা হয়। গ্রামের মুন্‌সি (secretary) গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করেন। সেই জমাবন্দি করে:—পাটোয়ারী, মজুমদার বা তলাটি। ধর্ম্মযাজক:—সংস্কৃতে পুরোহিত, গুজরাটিতে "গোর" অর্থাৎ গুরু। নাপিত:—নাই বা হাজাম (হাজাম শব্দটা আরবী)। কুমোর, ছুতোর, কামার,, ধোবা, ভিস্তী বা পখালী। দর্জ্জি, মুচী, চৌকিদার, রাখেরাড় বা পাহারী ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দই হিন্দী।

মহাশয়েরও কাজ করে। আর কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কাজে নিযুক্ত; যথা —নাপিত, কুমোর, ছুতোর, কামার, বাসন-মাজুনী, ভারী, দর্জি, খড়ম-কার, চৌকিদার। তাছাড়া বড় বড় গ্রামে, গুরুমহাশয়, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, তাঁতি, রজক ইত্যাদি। ইহাদের নীচে অস্পৃশ্য জাত; সমস্ত ঘৃণিত কাজের ভার উহাদের উপর; চর্ম্মশোধক, ঝুড়ী-কার, মেথর; এই সকল জাতের লোকেরা মাংস খাইতে পারে, এমন কি গোমাংসও খাইতে পারে, সুরাপানও করিতে পারে। ইহাদের অবস্থা অন্য গ্রাম্যলোক হইতে খারাপ নহে। বস্তুত, ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থেই উহারা নীচ বলিয়া খ্যাত। উহাদের নিজ জাতের মধ্যে উহারা অন্য হিন্দুদের মতই সগৌরবে অবস্থিতি করে। উহাদের জাত-ব্যবসায় উহাদের একচেটিয়া ও বিলক্ষণ লভ্যজনক।

* *
*

ভারতের কৃষক শান্তিপ্রিয়, মৃদুস্বভাব, মিতভোজী, দানশীল; যে সকল জাতের লোককে আহ্বান করা নিষিদ্ধ নহে, তাহাদের সম্বন্ধে বেশ আতিথেয়। কিন্তু সে চরিত্রবলহীন, দৈহিক দৌর্ব্বল্যবশত কোন বড় কাজে হাত দিতে পারে না। তাহার মনের গতি বাঁধা নিয়মের বশবর্ত্তী; তার বাপ-দাদা যে সব ভুল করিয়াছে, সে ঠিক তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। কাস্তে, কোদাল, লাঙ্গল,—সমস্ত হাতিয়ার গ্রামেই গঠিত হয় এবং সেই সকল হাতিয়ার আদিম-কালের মতো অত্যন্ত সাদাসিধা। গো-

ধরণের। উহারা মাটী বেশী খুঁড়িয়া তোলে না; কেবল জমির উপর আঁচড় কাটিবার মতো লঘুভাবে লাঙ্গল চালায়।

চিরদিন শিশুর মতো অবস্থিত ভারতের চাষা ব্যয়-সংযম করিতে পারে না; তাহার হাল্‌কা মন, তাহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি নাই। বিবাহে, শ্রাদ্ধে উহারা ব্যয়ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মোৎসব অসংখ্য। দীনতম কুটীরেও এই সকল উৎসব ব্যয়বাহুল্যসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রোগে আক্রান্ত হইলে, কিম্বা খারাপ ফসল হইলে অমনি চাষা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। চাষাকে নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে হয়। কোথায় টাকা ধার পাইবে? ব্যাঙ্ক নাই; বড় জমিদার খুবই কম। উহাদের নিকট যাইতে সাহস হয় না; তবে কাহার কাছে টাকা চাহিবে?—এক মহাজন আছে—সুতরাং সুদখোর মহাজন ছাড়া তার গত্যন্তর নাই।

সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলে এক ধাঁচের কুসীদ-জীবী আছে। প্রায়ই তাহাদের বর্ণনা পাঠ করা যায়। তাহারা মারোয়াড়ী (মারোয়াড়ের অধিবাসী)।

বাপমায়ের আদর-আসকারা পাইয়া শৈশবে উহারা খুব দুরন্ত হইয়া উঠে। আট বৎসর বয়সে কোন নগর বা গ্রামে উহাদিগকে মারোয়াড়ীর ঘরে শিক্ষানবীসী কাজে পাঠান হয়। যথোচিত আহারাভাবে উহাদের শরীর পুষ্ট হয় না; উহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারও করা হইয়া থাকে। উহারা প্রথমে কিছুই পায় না, তাহার পর প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু পয়সা পায়। তাহার পর, মাসে মাসে

অংশী হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় বড় বড় কেন্দ্রস্থল হইতে দূরে গিয়া কোন গ্রামে নিজের হিসাবে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে : লবণ, তৈল, শস্য, খাদ্যসামগ্রী খুজ্‌রা বিক্রয় করে। সহরে মালপত্র স্বল্পমূল্যে পাইকেরী হিসাবে থোকে খরিদ করিয়া তাহাই আবার খুজ্‌রা হিসাবে ধারে বিক্রয় করে; অনেক সময় ওজনেও ঠকায়। গহনা-পত্র ঘরকন্নার সামগ্রী কাপড়-চোপড় বন্ধক রাখিয়া অধিক সুদে টাকা ধার দেয়। তাহার খাতক সর্ব্বস্বান্ত হইলে, ধারের টাকা তাহার নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য হেন উপায় নাই, যাহা উহারা অবলম্বন করে না। বাঁধা রাখা জমি, গৃহের আসবাবপত্র বিক্রয় করে, ওয়ারেণ্ট জারী করিয়া গ্রেফ্‌তার করে, দেনদারের মা, বোন, মেয়েকে দাসী করিয়া রাখে, কারখানায় মজুরনী করিয়া খাটায়, বেশ্যাগৃহে পাঠাইয়া দেয়।

অনেক প্রদেশে, গবর্ণমেণ্ট সুদখোরের হাত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বাস্তু-ভিটা যাহাতে হস্তান্তর না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রক্ষা করা দূরে থাক্ সেই সকল উপায়ে, আমার মনে হয়, তাহাদের অবস্থা আরো খারাপ হইয়াছে। চাষার জমি ছাড়া আর কিছুই নাই; মহাজন পীড়াপীড়ি করিলে, ঋণমুক্ত হইবার জন্য সে তাহার সমস্ত জমি কিংবা তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিতে পারে; কিন্তু এক্ষণে এই ক্ষমতা তাহাকে আর দেওয়া হয় না। কতদিনে না জানি ভারতের চাষা অনেকে মিলিয়া এক জোটে চাষবাস করিতে শিখিবে, কৃষি-বেঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে! তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায়, শিক্ষাই একমাত্র উদ্ধারের উপায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজা রামমোহনের স্বরূপ *

রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট মানস-জগতের মধ্যে এত বিচিত্র দেশ এবং মহাদেশ আছে যে, তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় লইতে গেলে সেই এক-একটা খণ্ড দেশেরই ব্যাপ্তি ও জটিলতা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

যেমন, রাজাকে যদি শুধু হিন্দুশাস্ত্রের মীমাংসাকার ও সমন্বয়কার হিসাবেই দেখিতে যাই, তবে বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত হিন্দুর তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনার মূলধারা ও উপধারা-গুলির দুর্গম পথ তাঁর সঙ্গে পার হইতে হইবে—লিভিংষ্টোনের নীলনদের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কারের চেয়ে সে যে ঢের বিস্ময়কর আবিষ্কার! এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম-সাধনার মান-চিত্রখানি রাজার হাতে যখন প্রস্তুত হইল,

* রাজা রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে পঠিত।

তখন সেই সমগ্রের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন অথচ চিরনবীন কোন্ স্বরূপটিকে তিনি নিজে দর্শন করিয়াছিলেন এবং আমাদের দৃষ্টিগম্য করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। তাঁর মানস জগতের মধ্যে এই একটা বিরাট মহাদেশ।

আবার রাজাকে যদি খৃষ্টান শাস্ত্রের বা মুসলমান শাস্ত্রের মীমাংসাকার রূপে দেখিবার চেষ্টা করি, তবে অপর অপর গহন-জটিল মহাদেশের মধ্যে উপনীত হই।

আবার ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়িয়া যদি বিধিশাস্ত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও লোকাচারের দিক্ হইতে তাঁর কীর্ত্তির আলোচনা করি, তবে কি ব্যবহার-বিজ্ঞানবিৎ (Jurist) হিসাবে কি সমাজতাত্ত্বিক (Sociologist) হিসাবে কি রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞ (Political thinker) হিসাবে তাঁর অদ্ভুত মনীষা তাঁর অলোক-সামান্য ভবিষ্যদ্দর্শিতা এক অজ্ঞাত-বিরাট জগতের অরণ্য-পর্ব্বত-নদী ক্ষেত্রবিচিত্র নব নব দেশের মত আমাদিগকে কেবলি বিস্ময়ে অভিভূত করিতে থাকে।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এই যুগ-গুরুর যিনি যোগ্য শিষ্য, রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁর এক রচনায় লিখিয়াছেন :—"His name was Legion. Hindoo Pandit, Zabardasht Moulvi, Christian Padre, the Rishi of a new man-wantara or yuga, the Imam or Mahdi of a new tradition, the prophet or Nabi of a Newer Dispensation—by what name shall I call this man ?"

বাস্তবিক এই Legion বা ব্যূহই তাঁর যোগ্য নাম। রাজা রামমোহন রায় এক-মানুষ নন্, তিনি ব্যূহ-মানুষ।

যাঁরা আজ এই সভার আয়োজন করিয়াছেন তাঁদের ইচ্ছা যে, আজিকার এই জাতীয় উৎসবের দিনে, এই সভাকে যে সকল মনীষী অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁরা শ্রোতৃবৃন্দকে এই জাতির এযুগে যিনি উদ্বোধক, প্রবর্ত্তক ও চালক তাঁর বিরাট মানস-জগতের এক একটি মহাদেশে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন। আমি সে কাজের পক্ষে অযোগ্য ; আমার উপর সে ভার নাই। আমি শুধু ভাবিতেছি যে, এই যে বিরাট ব্যূহরূপী মানুষ—আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ যাঁর নাম দিয়াছেন Legion—তিনি আমাদের মত অসংখ্য অযোগ্য অকৃতী সাধারণ মানুষদের কি একেবারেই নাগালের বাহিরে ?

গীতায় আছে যে, যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁর অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং ভয়ানক বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন ভীত হইয়া তাঁকে তাঁর পূর্ব্বপরিচিত মানুষরূপেই দেখিবার ইচ্ছা করিলেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রসন্ন হইয়া আবার সেই রূপ ধারণ করিলেন তখন অর্জ্জুন সংবৃত্ত, সচেতা ও প্রকৃতিস্থ হইলেন।

আমার মনে হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের ঐ বিরাট বিশ্বরূপ তাঁর মানুষ-রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সাধারণ মানুষ তাঁকে কোন্ দিক্ দিয়া ধরিব ভাবিয়া না পাইয়া তাঁর সম্বন্ধে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে

ততটা উচ্ছ্বসিত হইনা। অথচ জগতে কোন মহাপুরুষই জনগণের শুধু বিস্ময়ের পাত্র নন, প্রীতির আস্পদ এবং ভক্তির ও পূজার বস্তুও বটে।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্যূহ-মানুষটির ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁর নিভৃত মর্ম্মস্থানে যদি যাইবার চেষ্টা করি, তবে দেখিব সেই ব্যূহের কেন্দ্রে একটি সুধার উৎস নিয়ত উৎসারিত। সে সুধা কিসের সুধা? বিশ্ব-মানবপ্রীতির অক্ষয় অফুরন্ত অপরাজিত সুধা। রাজা রামমোহনের সকল কর্ম্ম, সকল ভাব, সকল সন্ধান, সকল শাস্ত্রমীমাংসা ও বিধিমীমাংসার মূলে এই বিশ্বমানব-প্রীতি। এ প্রীতি দেশকালে বদ্ধ নয়, জাতিবিশেষে বদ্ধ নয়, ইহা দেশ-কাল-জাতির সকল সীমা অতিক্রম করিয়া নিখিল বিশ্বমানবে পরিব্যাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

সেই বিশ্বমানব-প্রীতি তাঁর জীবনে অত্যন্ত সত্য বস্তু ছিল বলিয়াই তিনি যে শুধু হিন্দু ধর্ম্মকে নানাপ্রকার লোকাচারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুর মুক্তির রাস্তা খুলিয়া দিলেন তাহা নহে, মুসলমান ধর্ম্মকেও তার সরিয়ৎ বা বিধিনিষেধ-কাণ্ড এবং খৃষ্টান ধর্ম্মকেও তার বহুবিধ আচার ও সংস্কারের নিগড় হইতে উদ্ধার করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টানকেও তাদের নিজ নিজ ধর্ম্মের পথে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। হিন্দুর শাস্ত্রালোচনায় যেমন তিনি হিন্দুর সঙ্গে একাত্ম, মুসলমান শাস্ত্রালোচনায় তেমনি তিনি মুসলমানের সঙ্গে একাত্ম, এবং খৃষ্টান শাস্ত্রালোচনায় তেম্‌নি আবার খৃষ্টানের সঙ্গেও অভিন্নাত্ম। মানুষকে তার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে হইবে—এই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র; তা সে মানুষ যে দেশের যে জাতিরই মানুষ হউক্‌না কেন। তাঁর জীবনচরিতে পড়িয়াছি যে, বন্ধু অথবা ভক্তশিষ্য কাহাকেও উচ্ছ্বসিত আবেগে যখন তিনি বলিতেন, "Brother, our religion is universal" তখন তাঁর চোখ দিয়া জল পড়িত। এই বিশ্বমানবপ্রীতিতেই সেই মহাজ্ঞানীর ভক্তিসাধনা চরিতার্থ হইত। যেখানে, যেদেশে, যে জাতির মধ্যেই মানুষ ধর্ম্ম বা সমাজে অজ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন, সেইখানে সেই মানুষের মোহপাশ ছিন্ন করিতে রাম-মোহন বীরের ন্যায় অগ্রগামী; যেখানে স্ত্রীলোক নিগৃহীত, সেখানে তার উদ্ধার-সাধনে তাঁর প্রাণপণ প্রযত্ন; যেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল, সেখানেও তার পরাভবে তিনি ম্রিয়মাণ, তার জয়-বার্ত্তায় তিনি আনন্দিত।

কোন সময়ে ভারতবর্ষকে ক্যানাডা প্রভৃতি কলোনির মত self-government বা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারী হইতেই হইবে, রাজা রামমোহন রায় ইংরাজ শাসনের সেই প্রারম্ভকালেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি যখন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখন সুপ্রিমকোর্ট ও ভারতেশ্বরের নিকট তাঁর আবেদন-পত্র হইতেই দেখি যে, রাষ্ট্রীয় অধিকারে ভারত-বাসীকে পদদলিত ও নিষ্পেষিত, হৃতমান ও বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে তিনি কি অগ্নিময় বাণীই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরকে তিনি লিখিতেছেন, "They appeal to

you by the honour of that great nation which under your royal auspices has obtained the glorious title of Liberator of Europe, not to permit the possibility of millions of your subjects being wantonly trampled on and oppressed." গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে license না পাইলে এদেশে কোন সংবাদপত্রাদি বাহির হইতে পারিবেনা, প্রধানত এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যদি ঐরূপ উক্তি বাহির হইতে পারে, তবে আজ রাজা রামমোহন জীবিত থাকিলে এখনকার প্রেসঅ্যাক্‌ট সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিধান সম্বন্ধে কি বলিতেন এবং কি করিতেন, তাহা আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন্!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শুধু স্বজাতি-প্রীতিতেই সেই মহান্ আত্মার প্রীতির পর্য্যবসান নয়, সকল মানবের ভাগ্যসূত্রের সঙ্গে তাঁহার চিত্তকে তিনি জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কোথায় স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, তাতে তাঁর এতই আনন্দ যে তিনি ঘটা করিয়া টাউনহলে এক ভোজ দিয়া বসিলেন। আবার নেপ্‌ল্‌সে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে এবং সে সংগ্রামে নেপ্‌ল্‌সের লোকদের পরাভব ঘটিয়াছে, এই সংবাদে তিনি এম্‌নি ম্রিয়মাণ হইলেন যে, সেদিন মিঃ বক্‌ল্যাণ্ড নামক ইংরাজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই যাইতে পারিলেন না। তাঁকে চিঠি লিখিলেন —"এক দুর্ঘটনার সংবাদে আমার মন এমনি বিচলিত হইয়াছে যে, আপনার সহিত আমি দেখা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতেছে যে, সকল ইউরোপীয় ও এশিয়ার জাতিরা স্বাধীন হইল, এ দৃশ্য আমার জীবিতকালে আমি দেখিয়া যাইতে পারিবনা।" কিন্তু "Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be ultimately successful!" ইংলণ্ড যাইবার পথে নেটালে এক ফরাশী জাহাজে স্বাধীনতার নিশান উড়িতেছে শুনিয়া সেই নিশানকে অভিবাদন করিতে গিয়া হঠাৎ পড়িয়া চিরজীবনের মত তাঁর পা ভাঙিয়াছিল। সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি পুনঃপুনঃ আবেগের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "Glory, glory, glory to France!" মানুষের স্বাধীনতার জন্য এমন passion এমন একান্ত আবেগ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে, কে কবে কোথায় শুনিয়াছে!

বন্ধুগণ, রাজা রামমোহন রায়ের সকল পাণ্ডিত্য, সকল মনীষা, সকল ধ্যান, সকল চেষ্টার মূলে—অন্তরতম প্রদেশে—এই বিশ্বমানবপ্রীতি উৎসস্বরূপ রহিয়াছে। এই তাঁর যোগ, এই তাঁর ভোগ, এই তাঁর পরমধ্যান, এইখানেই তাঁর পরম রসাস্বাদ। আমরা আজকাল নরনারায়ণের পূজার মহিমা কীর্ত্তন করি; সকল নরের মধ্যে সেই বিশ্বনরকে সেই পরম এককে এ যুগে কে এমন সুনিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ করিয়া সেই আনন্দের বেগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সেই নর ও নারীর সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া তার স্বরূপে তাকে উদ্‌ঘাটিত-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

সমস্ত জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে? শুধু ধর্ম্মে নয়, শুধু সমাজে নয়,—শিক্ষাদীক্ষা বিধিবিধান এবং রাষ্ট্রতন্ত্রের ক্ষেত্রেও—সকল মানুষের মুক্তির জন্ম যে মহাপুরুষ তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জলের আল্পনা

আঠারো

জগদীশপুরে ট্রেন হইতে নামিয়া জয়ন্ত একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিল। ষ্টেশন হইতে তাহাদের বাড়ী অনেকখানি তফাতে। অন্য-অন্য বারে অন্নপূর্ণা তাহার জন্ম ষ্টেশনে বাড়ীর পাল্‌কি পাঠাইয়া দিতেন,—'গরুর গাড়ী যে বড় শক্ত, জয়ন্তের নরম গায়ে সে ব্যথা সহিবে না!'—এবারে অন্নপূর্ণা নাই—কে আর পাল্‌কি পাঠাইবে? দেশে আসিয়া অন্নপূর্ণার অভাব জয়ন্ত এই প্রথম অনুভব করিল!

মেঠো মেটে পথখানি মস্ত-বড় একটা অচৈতন্ত অজগরের মত, এঁাকিয়া-বাঁকিয়া দূরের সবুজ বনের ভিতরে হারাইয়া গিয়াছে।—দু-ধারে শস্যভরা ক্ষেত, সর্ব্বাঙ্গে ফিকে-হলুদী রোদ মাখিয়া বর্ণবৈচিত্রে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। গরুর গাড়ীখানা আস্তে আস্তে ঢিমাইয়া-ঢিমাইয়া চলিতে সুরু করিল; জয়ন্ত গাড়ীর ছইয়ের ভিতরে গিয়া শুইয়া পড়িল, ভজহরি পায়ের তলায় বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।... ...

পশ্চিমের রক্ত-সাগরে শেষ-ডুব দিবার আগে, সূর্য্য যখন ধরণীর শ্যামল মুখের পানে অন্তিম দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, গাড়ী তখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। জয়ন্ত ধীরে-ধীরে ছইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ঐ দূরে তাহাদের বাড়ী দেখা যাইতেছে! আগে-আগে জয়ন্ত যখন দেশে ফিরিত, তখন দূর হইতে এই বাড়ীখানি প্রথম চোখে পড়িলেই তাহার মনটা উল্লাসে যেন উচ্চকিত হইয়া উঠিত। আজ কিন্তু বাড়ী দেখিয়া তাহার প্রাণটা হুহু করিতে লাগিল; তাহার আজন্মের স্নেহনীড় এবং শৈশব-স্মৃতির মহাতীর্থ ঐ বাড়ীখানি আগে যেন জীবনে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল—আর আজ সে মৃত্যুর মত স্তব্ধ, শ্মশানের মত নিরানন্দ!

গাড়ী ক্রমে বাড়ীর কাছে আসিল। হঠাৎ জয়ন্ত দেখিল, বাড়ীর একটা জান্‌লায় পটের ছবির মত একটি স্থির মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া, তাহাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। জয়ন্ত চিনিল, সে গৌরী!

ধীরে-ধীরে তাহার মুখ বুকের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল,—গভীর লজ্জায় তাহার দেহ মন কেমন-যেন এলাইয়া আসিল।

বাড়ীর সুমুখে আসিয়া গরুরগাড়ী থামিল।

চোখ তুলিয়া জয়ন্ত দেখিল, জান্‌লা হইতে গৌরী কখন্ সরিয়া গিয়াছে।

চারিদিক নীরব শোকে ভরা; কোথাও দাস-দাসী লোকজনের সাড়াশব্দ নাই,—দেউড়ীতে দল পাকাইয়া দরোয়ানেরা বসিয়া থাকিত, আজ তাহাদেরও কাহাকেও দেখা যাইতেছে না ও বাড়ীর উপরের-নীচের বেশীর ভাগ জান্‌লা-দরজাই খোলা নাই,—বৃহৎ সদর দরজাটাও ভিতর হইতে বন্ধ;—হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, এ দরজা যেন কতকাল ধরিয়া এম্‌নিই বন্ধ আছে!

এই অস্বাভাবিক নির্জ্জনতার ও জীবন-হীনতার মাঝখানে, বাড়ীখানাকে দেখাইতেছে ঠিক যেন পোড়ো ভুতুড়ে বাড়ীর মত!

ভজহরি সবিস্ময়ে ক্যাল্‌ক্যাল্ করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

জয়ন্ত সদর দরজায় করাঘাত করিল—একবার, দুইবার, তিনবার। সে শব্দ চারিদিকের একান্ত স্তব্ধতার নিরবচ্ছিন্ন সুর ছিঁড়িয়া দিল,—কিন্তু দরজাও খুলিল না, কারুর সাড়াও মিলিল না।

পাশের আম-কাঁঠালের বাগান হইতে, একটা ঘুঘু সুধু শেষ-বেলায় করুণ বিলাপের স্বরে দু-একবার ডাকিয়া, আবার যেন কি ভয় পাইয়া থামিয়া পড়িল।

ভজহরি বন্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "এ কি ব্যাপার! এরা কেউ বাড়ী নেই নাকি?"

—"আমি পথ থেকে দেখেছি ওপরে গৌরী দাঁড়িয়েছিল।"

—"তবে?"

—"কিছুই ত বুঝছি না।"

এমনসময় বাড়ীর ওদিক্‌কার বাগানের পথে খক্‌খক্ কাশি ও ঠক্‌ঠক্ লাঠির শব্দ উঠিল।

—"এই যে! পেন্নাম হই দেওয়ান-মশাই, পেন্নাম হই!"

কালিশঙ্কর ধীরেধীরে আগাইয়া আসিলেন। বিষণ্ণমুখে ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন, "জয়, আর কি দেখতে এলে ভাই, সব শেষ হয়ে গেছে!"

জয়ন্ত সজলনয়নে কালিশঙ্করের দিকে চাহিল। বুকের মাঝে মা-হারানোর ব্যথা নূতন করিয়া আবার উথলিয়া উঠিতেছিল, কোনক্রমে আবেগ সামলাইয়া সে বলিল, "কালিদাদা, আমাকে একটা খবরও দিতে নেই—যাবার আগে মাকে একবার প্রাণ-ভরে' শেষ-দেখা দেখে নিতুম!"

—"কি কর্‌ব ভাই, কে জানে এত-হঠাৎ এমন হবে—দুর্দ্দৈব আর কাকে বলে! জানই ত, অনেকদিন থেকেই মার বুকের ব্যারাম ছিল, সেই অসুখেই শেষটা তাঁর কাল হ'ল।... ...আর, খবর দিতে বল্‌ছ, কিন্তু—" বলিতে-বলিতে কালিশঙ্কর থামিয়া পড়িয়া, অধোবদনে খক্‌খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন।

—"থাম্‌লে কেন কালি-দাদা, কি বল্‌ছিলে বল না!"

—"বল্‌ব? শুন্‌লে তুমি কষ্ট পাবে কিন্তু না বলেও ত উপায় নেই ভাই!"

কালিশঙ্করের ধরণ-ধারণ দেখিয়া জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কালি-দাদা, আমার কাছে তুমি অত কিন্তু হোচ্ছ কেন?"

—"তোমাকে খবর দিয়ে ডেকে

আন্‌লে মা রাগ কর্‌তেন। মরবার আগে গৌরী-দিদিকে তিনি হুকুম দিয়ে গেছেন, 'যার জন্যে আমার সত্যভঙ্গ হয়েছে এ বাড়ীতে সে যেন আর কখনো ঢুক্‌তে না পায়'! —লজ্জা-সঙ্কোচে অস্পষ্ট স্বরে, কালিশঙ্কর তাড়াতাড়ি কথাগুলো কোনরকমে বলিয়া ফেলিলেন এবং এই কঠিন ও অপ্রিয় কর্ত্তব্যটা শেষ করিয়া মাটির দিকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জয়ন্তের মুখের উপরে তাহার অন্তর্গূঢ় ব্যথা-বেদনার ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খুব নীচু গলায় সে বলিল, "তাই বুঝি দর্‌জা বন্ধ ?"

কালিশঙ্কর কোন জবাব দিতে পারিলেন না,—সুধু অপ্রতিভ ভাবে খক্‌খক্ করিয়া কাশিতে লাগিলেন।

—"তাহলে গৌরী আমাকে এ বাড়ীতে আর ঢুক্‌তে দেবে না ?"

কালিশঙ্কর হতাশমুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ভজহরি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—এতক্ষণে তার মুখে কথা ফুটিল। উত্তেজিত স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "কী, আমার খোকন তার নিজের বাড়ীতে ঢুক্‌তে পাবে না!"

কালিশঙ্কর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "এ বাড়ী মা গৌরীদিদিকে দান করে' গেছেন ভজহরি!"

ভজহরির চোখে একটা দুরন্ত ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুম্‌কী দিয়া বলিল, "কী! কি বল্‌লেন ? তাহলে খোকন তার বিষয় থেকে অবিশ্যিই বঞ্চিত হয়েছে ?"

তাহার সেই অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া, দুই পা পিছু হঠিয়া কালিশঙ্কর বলিলেন, "না, না, বিষয়ের অর্দ্ধেক অংশ জয়ন্তর!"

—"না, কখনি না—মা-ঠাক্‌রোন ত তেমন লোক ছিলেন না—এ-সব চক্রান্ত, আমার খোকনকে ঠকাবার ফিকির!"

—"জয়কে কে ঠকাচ্ছে ভজহরি ? আমি, না, গৌরীদিদি ?"—বলিয়া কালিশঙ্কর একটু ম্লান হাস্য করিলেন।

মাথানাড়া দিয়া মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলগুলোকে এদিকে-ওদিকে দোলাইয়া ভজহরি বলিল, "ও-সব কতা আমি জানি না, জান্‌তে চাইও না!"

—"জয়ের ওপরে আমার কি দরদ নেই ভজহরি ? আমি যে ওকে কোলে-পিঠে করেছি!"

—"কৈ আর দরদ আছে! ব্যাচারা মা হারিয়ে এতখানি পথ না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে ছুটে এল, আর তোমরা কিনা ওকে ধুলো পায়েই ভিখিরীর মত তাড়িয়ে দিতে চাও ? দরদ থাক্‌লে এমন কতা মুখে আন্‌তে পার্‌তে!"

—"কি করব ভজহরি, এযে মা'র হুকুম!"

—"মরণকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়—নইলে মা-ঠাক্‌রোণ কখনো এমন হুকুম দিতে পার্‌তেন না। তাঁকে কি আমি জানি না ? খোকন যে তাঁর বুকের নিধি ছিল গো!"

কালিশঙ্কর নিরুত্তর হইয়া কাশিতে লাগিলেন।

ভজহরি কাঁধের গামছা কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "খোকনকে নিয়ে আমি এ বাড়ীতে ঢুকবই,—তোমরা কে আমাকে রুকতে পার, দেখি! ভজা বুড়ো হ'লেও এখনো লাটি ধরে দাঁড়াতে পারে—আর এই হাতে সে অমন ডু-দশ-শো লোকের মাতা পাকা বেলের মত ফটাফট্ ফাটিয়েচে"—বলিয়া আপনার মাংসপেশী-ভরা হাত-দুখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সাম্নের দিকে বাড়াইয়া দিল!

কালিশঙ্কর অসহায়ের মত ভজহরির সুমুখ থেকে সরিয়া জয়ন্তের পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন—ভজহরির এমন ভয়ানক চেহারা তিনি আর-কখনো দেখেন নাই।

জয়ন্ত এতক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অস্তমান সূর্য্যের দিকে অর্দ্ধমুদিত দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল। ভজহরির চীৎকারে মুখ ফিরাইয়া ব্যথাভরা শান্ত স্বরে বলিল, "ভজা, চল্, ফের গাড়ীতে গিয়ে উঠি চল্!"

—"সে কি খোকন, তাকি হয়! কিচ্ছু ভাবিস-নে, বাড়ীতে আমরা ঢুকবই—কেউ আট্কাতে পার্বে না!"

—"না রে ভজা, না! মা যে আমার ওপরে অভিমান করে' হুকুম দিয়ে গেছেন, —তাঁর এ শেষ হুকুম কি আমি ঠেল্তে পারি? নে, চল্!"

—"না খোকন!"

রুষ্ট তীক্ষ্ণ স্বরে জয়ন্ত বলিল, "ভজা!"

ভজহরি তার খোকনের তীব্র দৃষ্টির সাম্নে একেবারে জড়োসড়ো হইয়া পড়িল; আর দ্বিতীয় কথাটি না-কহিয়া কেঁচোর মত সুড়্সুড়্ করিয়া সে আবার গাড়ীর উপরে গিয়া উঠিয়া বসিল।

জয়ন্ত ফিরিয়া সহজ স্বরে বলিল, "কালিদাদা, তবে আসি ভাই! গৌরীকে বোলো তার ওপরে আমি একটুও রাগ করি-নি। তোমরা রইলে, দেখো, তার যেন কষ্ট না হয়!"

কালিশঙ্করের দুইচোখ জলে ভরিয়া উঠিল। জয়ন্তের একখানা হাত আপনার বুকের উপরে টানিয়া চাপিয়া ধরিয়া অবরুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, "জয়, জয়, আমাকে যেন দোষী কোরো না ভাই! আমি তোমাদের খেয়েই মানুষ,—কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝছ ত?"

—"কালিদাদা, আমাকে কিছু বোঝাতে হবে না, আমি কারুর ওপরে রাগ করিনি—রাগ কর্বার অধিকার আমার নেই—এ আমারি কপালের দোষ! তবে, মনে এই বড় খেদ রয়ে গেল যে, মার শেষ কাজটাও আমি নিজের হাতে কর্তে পার্লুম না।"—আক্ষেপভরে এই কথাগুলি বলিয়া জয়ন্ত ধীরেধীরে আবার গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

কালিশঙ্কর লাঠির উপরে ভর্ দিয়া অভিভূত প্রাণে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গরুর ল্যাজ্ মলিয়া গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া দিল। সে নিদারুণ বিদায়-দৃশ্য কালিশঙ্করের আর সহ্য হইল না—তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গলা খক্খক্ ও লাঠি ঠক্ঠক্ করিতে-করিতে তিনি আবার বাগানের পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। এবং যাইতে-যাইতে কোঁচার খুঁটে বারংবার আপনার চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া জয়ন্ত তাহার শৈশবের

সোনার স্বপনে জড়ানো, বুকভরা স্নেহপ্রেমের রসে জীয়ানো সেই বাস্তুভিটার দিকে, নিষ্পলক দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া মৌন মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার সকল সম্বন্ধ আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—জন্মের মত, জন্মের মত!

গাড়ী যখন খানিক তফাতে গিয়া পড়িয়াছে, জয়ন্তের আবার মনে হইল, গৌরীর ঘরের জান্‌লায় যেন একটি শ্বেত-বসনা মূর্ত্তি ছবির মত তেম্‌নি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে জয়ন্ত এবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল না,—কিন্তু তাহার বেদনাভরা ব্যর্থবাসনার সজলদৃষ্টি যেন আপনার প্রাণের মাঝখানে অনুভব করিল।

তাহার বাড়ীখানি দেখিতে-দেখিতে ক্রমেই স্পষ্টতর সন্ধ্যার তিমিরাঞ্চলে অস্পষ্ট হইয়া আসিল; ঠিক পথের বাঁকের উপরে অন্ধকারের নীড়ের মত একটা মস্ত বাঁশঝাড়, আলোকহীন নিষ্প্রভ আকাশের দিকে তাহার শতশত কঙ্কালসার হাতগুলো বাড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ী মোড় ফিরিতেই জয়ন্তের বসতবাড়ীখানা তাহার আড়ালে হারাইয়া গেল।

জয়ন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভজহরির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

ভজহরি ধরা-ধরা গলায় বলিল, "একি কর্‌লি খোকন! নিজের ভিটে ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে পরের মত কোতায় চল্‌লি?"

জয়ন্ত চোখ মুদিয়া শ্রান্ত স্বরে বলিল, "এ মায়ের আদেশ, এর ওপরে আর কথা কোস্‌-নে ভজা।"

চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ যখন মুখ রাঙা করিয়া বনের কালো-কালো পাতার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, গাড়ীখানা তখন একটা তেমাথায় আসিয়া পড়িল।

জয়ন্ত হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ভজা, এ পথে শ্মশানে যাওয়া যায়, না?"

বসিয়া-বসিয়া ভজহরি ঢুলিতেছিল,—জয়ন্তের স্বরে সচমকে মুখ তুলিয়া চোখ কচ্‌লাইয়া বলিল, "অ্যাঁ,—কি বল্‌চিস্‌?"

—"ঐটে ত শ্মশানের পথ?"

—"হুঁ।"

জয়ন্ত গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া পড়িয়া বলিল, "ভজা, তোরা এইখানে একটু দাঁড়া—আমি এখনি আস্‌ছি।"

দুই চক্ষু বিস্তারিত করিয়া ভজহরি বলিল, "সে কি রে! তুই কোতা যাবি?"

—"শ্মশানে।"

ভজহরি আঁকুপাঁকু করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই রাত্তিরে, এই অন্ধকারে শ্মশানে? এ্যাঁ—বলিস্‌ কিরে, ক্ষেপলি নাকি?"

—"না ভজা, আমি যাবই! এ পৃথিবীতে মা যেখানে জন্মের মত শেষ শোয়া শুয়েছেন, দেশ থেকে বিদায় হবার আগে সে ঠাঁইটা একবার চোখেও দেখে যাই।"—জয়ন্ত হন্‌হন্‌ করিয়া শ্মশানের দিকে চলিয়া গেল।

ভজহরি তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া ও একগাছা লাঠি লইয়া জয়ন্তের পিছনে পিছনে উঠিতে-পড়িতে ছুটিল।

নদীর ধারে থম্‌থমে নিস্তব্ধতার মধ্যে, অস্ফুট চন্দ্রালোকে বড়বড় অশথ্‌-বটের তলায়, খানিক কালো খানিক আলো মাখিয়া

উঁচু-নিচু ঢিপি-ভরা এবড়ো-খেবড়ো শ্মশান-ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মাঝে-মাঝে গাছের মাথায়-মাথায় ধাক্কা মারিয়া, অশরীরি প্রেতের মত অশান্ত বাতাস গোঁ-গোঁ করিয়া উঠিতেছে, আর বটের দীর্ঘ ঝোলা-ঝোলা জটগুলো যেন কাহাদের শীর্ণ অঙ্গুলির মত বাঁকিয়া-বাঁকিয়া যাইতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকা-গুলো চেরা গলায় অশ্রান্ত স্বরে ডাকিতেছে আর ডাকিতেছে,—সে-যেন প্রেতলোকের নরক-যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ!

ভজহরির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, ভয়ে-ভয়ে সে বলিল, "রাম, রাম, রাম!"

গভীর নিশীথে মড়াদের এই হাড়ের বিছানায় হঠাৎ জ্যান্ত মানুষের পদক্ষেপে কাদের যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল—কারা যেন আশপাশ আনাচ-কানাচ হইতে ঢুদ্দ্ড় করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল—সেই শব্দে ভজ-হরি অত্যন্ত আতঙ্কে আৎকাইয়া উঠিল!

—"ভজা, ও কিছু নয় রে, আমাদের দেখে শেয়ালগুলো পালিয়ে গেল!"

ভজহরির গলায় একটা ঘড়্ঘড় শব্দ উঠিল মাত্র—সে কোন জবাব দিতে পারিল না।

—"ভজা, আলোটা একটু তুলে ধর্!"

ভজহরি কাঁপিতে-কাঁপিতে লণ্ঠনটা কোন-মতে মাথার উপরে তুলিয়া ধরিল।

সেই আলোতে এদিক-ওদিক চাহিয়া জয়ন্ত দেখিল, কাছেই একটা সদ্য-জ্বালানো ভস্মভরা চিতা! এইখানেই অন্নপূর্ণার নশ্বর দেহ শেষ অগ্নিশয্যায় শয়ন করিয়াছিল।

জয়ন্ত আস্তে-আস্তে সেই নির্ব্বাপিত চিতার পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। চিতার ভস্মরাশির মধ্যে তখনো টুক্রো-টুক্রো কতগুলো হাড় দেখা যাইতেছে—তাহার সেই স্নেহময়ী করুণারূপিনী জননীর কোমল ফুলের মত দেহের ইহাই শেষ চিহ্ন!

জয়ন্ত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো, ওমা! ইহলোকে আমার ওপরে অভিমান করে' তুমি চলে গেলে, পরলোক থেকে এখন আমাকে ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর!" এই বলিয়া চিতার মধ্যে বিহ্বল পাগলের মত উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল—অজস্র অশ্রুজলে শ্মশানশয়নের অস্থি-ভস্ম সিক্ত করিয়া তুলিল।

ভজহরির চোখ একেবারে কপালে উঠিয়া গেল। সমস্ত ভয়-ভাবনা ভুলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তকে চিতা হইতে টানিয়া তুলিয়া বলিল, "ষাঠ্, ষাঠ্ চিলুতে শুয়ে এমন সোনার দেহের অকল্যেণ করা! তুই যদি এমন করিস্ খোকন, আমি তাহলে মাথা খুঁড়ে মর্ব! চল্, এই রাত্তিরেই এখন নদীতে চল্, শ্মশান ছুঁলে নাইতে হয়!"

উনিশ

কলিকাতায় ফিরিয়া জয়ন্ত শুনিল, জগৎবাবু ইন্দুকে লইয়া দেওঘরে চলিয়া গিয়াছেন!

তাহার মাতৃশোকের উপরে এ আঘাত বড় নিদারুণ বাজিল। জগৎবাবু চলিয়া গিয়াছেন! সে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতেও পারিল না!

না-বলিয়া মা গেলেন, গৌরীও আশ্রয় দিল না, দেশে তাহার ঠাঁই নাই—এ-হেন

দুঃসময়ে জয়ন্ত যাহার কাছ হইতে একটু-খানি শান্তির প্রত্যাশা করিতেছিল, তাহাকেও দেখিতে না-পাইয়া তাহার উদাসী প্রাণমন একেবারে হ্যাতাইয়া পড়িল।

ইন্দুর উপরে তাহার রাগ হইল, ঘৃণা হইল, অভিমান হইল!—যাহার জন্যে সে আজ সর্ব্বস্বহারা, সেও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না! একদিনের মিথ্যা কলঙ্কে এতদিনের ভালোবাসা যে ভুলিতে পারে, সে নিশ্চয়ই তাহাকে কখনো ভালোবাসে নাই;—ইন্দুর প্রেম কপট প্রেম—এ প্রেমে প্রাণপণে নির্ভর করা তাহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে; পরকে সে আপন করিতে ত পারিলই না—মাঝখান থেকে সুধু আপন-জনকেই পর করিল!

আজ কয়দিন ধরিয়া জয়ন্তের হৃদয় এম্‌নি-সব কথা ভাবিয়া রাগে-দুঃখে-অভিমানে তোল্‌পাড় হইয়া উঠিতেছে আর দিনে দশবার সে এই-বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে, ইন্দুকে সে ভুলিবে, ভুলিবে—ইন্দুকে সে ভুলিবেই!... ... ...জয়ন্ত একবারও ভাবিয়া দেখিল না যে, ইন্দু হয়ত এখনো তাহাকে ভালোবাসে, ইন্দু হয়ত তাহার পিতার ইচ্ছাতেই দেশত্যাগে বাধ্য হইয়াছে!

বাস্তবিক, প্রেম এম্‌নি পল্‌কা, একটুতেই এম্‌নি বাঁকিয়া পড়ে,—প্রেমিকের মনো-জগতে এম্‌নি "ক্ষণেকে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ!"

আজ সকালে জয়ন্ত যখন অস্কার ওয়াইল্ডের কাব্যরসের ভিতরে আপনার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিহিত করিবার ব্যর্থ

দরদ-ভরা কণ্ঠে বলিল, "আহা, পথে একটা ভিখিরী পড়ে আচে দেকে এলুম, তার ওপরে 'মার কৃপা' হয়েচে খোকন!"

বই হইতে চোখ তুলিয়া জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "বসন্ত হয়েছে! কোথায়?"

—"এই আমাদের বাসার দুচারখানা বাড়ীর পরেই! ব্যাচারী একজনদের রোয়াকে উঠে শুয়েছিল, তা তারা তাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে! সে এখন পথে পড়ে'-পড়ে' চেঁচিয়ে কেঁদে মর্‌চে—দেকে আমার বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু দুঃখু করে' কি আর কর্‌ব বল্ খোকন—এ-সবই গ্যালোজম্মের কম্মফল! কার কপালে কি আচে, কে বল্‌তে পারে—হরি হে, তোমার মহিমে বোজা ভার!"—বলিয়া ভজহরি উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অদৃশ্য হরির উদ্দেশ্যে একটি দৃশ্যমান প্রণাম করিল।

জয়ন্ত বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিতে-দিতে বলিল, "ভজা, আমার সঙ্গে আয়!"

—"কোতায় খোকন?"

—"আয়, দুজনে মিলে ধরাধরি করে' সে বেচারীকে একখানা গাড়ীতে তুলে হাঁস্‌পাতালে দিয়ে আসি!"

ভজহরির মুখ শুকাইয়া আম্‌সী হইয়া গেল। হাঁউমাউ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই তাকে ছুঁবি কিরে!"

—"চোখের সাম্‌নে একটা মানুষ পথের ওপরে পড়ে ছট্‌ফটিয়ে মর্‌বে, আর আমরা হাত-গুটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তাই দেখ্‌ব?

ছিঃ ভজা, তোর মুখেও এমন কথা শুনতে হোলো!"

ভজহরি বোকা বনিয়া লজ্জিত মুখে মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে জয়ন্তের পিছনে-পিছনে চলিল,—সে খোকনকে বুঝাইতে পারিল না—তাহার আসল ভয় ও ব্যথা কোন্‌খানে!

* * * * *

এই ঘটনার দুদিন পরে সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত বাসায় ফিরিয়া বলিল, "ভজা, আমার জ্বর হয়েছে, গলায় আর কোমরে ভারি ব্যথা!"

সেই রোগী ভিখারীকে ছোঁয়া-ঘাঁটার পর হইতেই ভজহরির মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল,—জয়ন্তের জ্বর ও গায়ে ব্যথা হইয়াছে শুনিয়াই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল!

তাড়াতাড়ি জয়ন্তের কপালে হাত রাখিয়া সে বলিল, "তাইত রে, তোর গা যে আগুন!"

জয়ন্তকে ধরিয়া তখনি সে বিছানায় শুয়াইয়া দিল। ঘরের সমস্ত জান্‌লা বন্ধ করিয়া রোগীর শিয়রে আসিয়া বসিল। কাতর স্বরে বলিল, "খোকন, তখুনি মানা করেছিলুম, গোঁয়ারতুমি করে' ভিখিরীটাকে ক্যানো ছুঁলি বল্ দেকি!"

জয়ন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এতদিন ধরে নিজের স্বার্থেই প্রাণকে খাটিয়ে দেখলুম ত, কিন্তু কি করতে পারলুম ভজা! আর আজ একদিন পরের উপকারে প্রাণকে খাটাতে গিয়ে যদি নিজের প্রাণের ভয় করি, তবে তেমন দুর্ব্বল প্রাণে দরকার কি বল্ ত?"

ভজহরি মহা চটিয়া বলিল, "অত আর বক্‌বক্ করতে হবে না, চুপচাপ শুয়ে থাক্! ক্যাতাব পড়ে তোর জ্ঞান হয়েচে না ঘোড়ার ডিম হয়েচে—হয়েচিস্ খালি কতার ভট্‌চায্!"

জয়ন্ত সেই স্নেহের ভর্ৎসনায় একটু-খানি হাসিয়া পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল।

ভজহরি তাহার কপালে কয়েকটি পয়সা ছুঁয়াইয়া দেবতার কাছে মানত্ করিয়া তুলিয়া রাখিল।

শেষরাত্রে জয়ন্তের জ্বর আরো বাড়িয়া উঠিল—জ্বরের ঘোরে সে যা তা ভুল বকিতে সুরু করিল।

ভয়ে ভাবনায় আকুল হইয়া ভজহরি সারা রাত ঠায় জাগিয়া বসিয়া রহিল এবং দুইহাত যোড় করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বারংবার বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, তুমি প্রাণ চাও ত আমার প্রাণ নাও, আমি মরি তায় ক্ষেতি নেই, খোকন আমার সেরে উঠুক্!"

কুড়ি

সকাল বেলায় অবনী সবে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়াছে, অম্‌নি বাহির হইতে হেঁড়ে গলায় ডাক্ আসিল, "অবনী, বাড়ী আছ হে?"

—"কে, স্বর্ণ নাকি? আরে এস, এস, বাড়ীর ভেতরে এস।"

মিনিট-খানিক পরেই স্বর্ণেন্দু জুতো মস্‌মস্ করিতে-করিতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল।

অবনী চাকরকে আর-এক পেয়ালা চা

আনিতে হুকুম দিয়া স্বর্ণেন্দুকে বলিল, "হাঁহে, এ ক-দিন ভোজবাজির মত হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলে বলত ? একেবারে এ-মুখো হও-নি বড় যে ?"

স্বর্ণেন্দু একসঙ্গে চোখ-মুখ-নাখ কুঁচ্‌কাইয়া কহিল, "আরে রাম রাম, সে কথা আর বল কেন ? তোমাদের ঐ জয়ন্ত ছোঁড়াটা যে শুক্‌নো বাঁশের মত এমন নীরস, তা কি ছাই আগে জান্‌তুম ? সে শাসিয়ে এসেছে, আমাকে ধর্‌তে পার্‌লে দেখে নেবে—অর্থাৎ, আমাকে যত-খুসি ঘুষি-চড় মার্‌তে একটুও কসুর কর্‌বে না ! জানই ত, গায়ের জোরের জন্যে আমি কখনই বিখ্যাত নই—সুতরাং মুষ্টি-বৃষ্টি থেকে আত্ম-রক্ষা করতে হ'লে অদৃশ্য হওয়া ছাড়া আমার পক্ষে গতিরন্যথা ! তাই এ-পাড়ায় আসি-নে আর ! এতদিনে বোধহয় তার রাগ পড়ে গেছে—কি বল ?"

—অবনীর চোখদুটোর ভাব এমনধারা হইয়া গেল, যে, তার সঙ্গে অনায়াসে খুব বড়বড় ছানাবড়ার তুলনা করা যাইতে পারে ! আশ্চর্য্য স্বরে সে বলিয়া উঠিল—"জয়ন্ত তোমাকে মার্‌বে বলেছে ! কেন হে ?"

—"সে কথা পরে হবে-অখন, আগে ওদিক্‌কার, অর্থাৎ জগৎবাবুর খবর কি বল দেখি শুনি ! জয়ন্ত এখনো সেখানে যাওয়া-আসা করে নাকি ?"

—"হঠাৎ তুমি এটা জান্‌তে চাইছ কেন ?"

—"কারণ আছে, বল না।"

—"দেখ স্বর্ণ, ব্যাপারটা যে কি, স্পষ্ট সব শুনি-নি—তলিয়েও বুঝি নি। তবে জগৎবাবু একদিন ভয়ানক ক্ষাপ্পা হয়ে একঘর লোকের সুমুখেই জয়ন্তকে যাচ্ছে-তাই অপমান করে' একরকম তাড়িয়েই দিয়েছেন। তাঁর কথাবার্ত্তায় বুঝলুম, জয়ন্তের চরিত্র নাকি ভালো নয়।"—এই বলিয়া অবনী সেদিনকার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, টেবিলের উপরে পা-দুটো তুলিয়া দিয়া স্বর্ণেন্দু দু-পাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে-হাসিতে সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে লাগিল। তাহার তন্ময় মুখ দেখিয়া বোধ হয়, জয়ন্তের দুর্দ্দশার কাহিনীটা তাহার কাণে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতের মত মধুবৃষ্টি করিতেছে।

অবনী চায়ের পেয়ালাটি শেষ-চুমুকে নিঃশেষ করিয়া একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, রুমালে মুখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেদিন জয়ন্তের মুখ দেখে আমার ভাই প্রথমটা একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তুমি ত জানই, আমি সকলকেই ক্ষমা কর্‌তে পারি—কেবল চরিত্রহীনকে নয়। জয়ন্ত যে ভেতরে-ভেতরে এমন ডুবে-ডুবে জল খায় আমি তা কখনো কল্পনাও করি-নি।"

ঠোঁট টিপিয়া একটু রহস্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "দুর্নীতি দুর্নীতি করে' আঁৎকে ওঠা, তোমার চিরকেলে পাগ্‌লামী। ঐজন্যেই তোমার সঙ্গে আমার সব-জায়গায় বনে না !"

অবনী বিরক্ত স্বরে বলিল, "না-বনে না বনবে ! ওটা আমার পাগলামী নয়—ওটা আমার প্রিন্সিপ্‌ল্।"

—"যাক্, বাজে তর্ক নিয়ে খাম্‌কা মাথা গরম কর্‌তে চাই না।"

—"হ্যাঁ, তাই ভালো। তোমার মত্ আমার মত্ দুটি সরল রেখার মত; যতই টানাটানি কর্‌বে ততই বেড়ে যাবে, কিন্তু মিল্‌বে না কিছুতেই।"

—"তাহলে ও অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করে' লাভ নেই। আচ্ছা, জয়ন্ত সেদিন নিজের পক্ষ-সমর্থন করে' কিছু বলে-নি?"

—"বল্‌লে, সে নির্দ্দোষ। আরো কি-সব বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু জগৎবাবু তাকে আর-কিছু বল্‌তে অবকাশ দিলেন না।"

—"তবে আর কি, তোমার ইন্দুলেখা-লাভের পথ এবারে নিষ্কণ্টক হ'ল!"

অবনী একটুও আনন্দের ভাব না দেখাইয়া, কেমন হতাশ স্বরে বলিল,—"কিছুমাত্র হয়-নি! ইন্দুলেখার মন খারাপ বলে জগৎবাবু তাকে নিয়ে দেওঘরে চলে গেছেন। যাবার আগে আমি আর-একবার বিবাহের কথা তুলেছিলুম, কিন্তু জগৎবাবু স্পষ্টই জবাব দিলেন, ইন্দুলেখা আমাকে পছন্দ করে না। দেখ দেখি স্বর্ণ, আমাকে ইন্দুর পছন্দ হোলো না—তার পছন্দ হোলো কিনা ঐ দুশ্চরিত্র জয়ন্তকে! স্ত্রীলোকের মর্ম্ম বোঝা ভার!"

স্বর্ণেন্দু টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলিয়া লইয়া তার পিছনদিক দিয়া কাণ খুঁটিতে-খুঁটিতে, পরম আরামে চোখদুটি স্তিমিত করিয়া বলিল, "তাহলে জয়ন্তের সঙ্গে ইন্দুলেখার বিবাহ না হ'লেও তোমার আশা-ভরসা একেবারে ফর্‌সা?"

মিছে ভেবে মর্‌তে প্রস্তুত নই। যা অসম্ভব—তা অসম্ভব।"

—"তা যদি হয় তবে আমার আর কোন হাত নেই। জয়ন্ত তোমার পথের কাঁটা হয়েছিল, আমি অনেক ফন্দি এঁটে তাকে সরিয়ে দিলুম। কিন্তু ফন্দি এঁটে তোমার ইন্দুর মন-ফেরানো ত আর আমার দ্বারা হয়ে উঠ্‌বে না!—স্ত্রীলোকের প্রেম হচ্ছে দামোদরের বন্যার মত;—বুঝেছ অবনী, সে একবার বাঁধ ভাঙ্‌লে সুপথ-কুপথ কিছুই বাছে না—যেদিকে চলেছে সেদিক থেকে আর কোনমতেই ফেরে না! আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে জয়ন্তকে আমি বিদায় করেছি বটে, কিন্তু ইন্দুর মন থেকে সে এখনো বিদায় হয়-নি!"

বোকার মত হাঁ-করিয়া স্বর্ণেন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবনী বিস্মিত স্বরে বলিল, "কী পাগলের মত বক্‌ছ!"

—"অর্থাৎ, আমিই কৌশল করে' জগৎবাবুকে চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছি যে, জয়ন্ত লোকটা বাইরে সাধু, কিন্তু ভিতরে ভণ্ড!"

চেয়ারখানা টানিয়া স্বর্ণেন্দুর কাছ-ঘেঁষিয়া বসিয়া অবনী কৌতূহলের সহিত বলিল, "আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি!"

স্বর্ণেন্দু খানিক ইতস্তত করিয়া বলিল, "তুমি যে-রকম নীতিবাগীশ, তাতে সব কথা তোমাকে খুলে বল্‌তে আমার ভরসা হচ্ছে না। উল্টে হয়ত শেষটা আমাকেই দুষে বস্‌বে!"

অবনী বুঝিল, জয়ন্তের বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু কি-একটা ষড়যন্ত্র করিয়াছে। বর্দ্ধিত

লুকোচুরি আমার ভালো লাগছে না ভাই। স্পষ্ট করে' সব খুলে বল।"

বলিবার জন্য স্বর্ণেন্দুরও পেট ফাঁপিয়া উঠিতেছিল; আসল কথা ঢাকিয়া রাখিলে সেযে কতবড় একজন সেয়ানা বুদ্ধিমন্ত লোক সেটাও যে ঢাকা থাকিয়া যায়! অতএব সে আর-কোন ইতস্তত না-করিয়া সেদিনকার সমস্ত ঘটনা গড়্গড়্ করিয়া বলিয়া গেল।

অবনীর মুখ শুনিতে-শুনিতে ক্রমেই গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া সে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া, স্তম্ভিতের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর অত্যন্ত ঝাঁঝালো স্বরে বলিল, "স্বর্ণ, এ কাজটা গর্হিত হয়েছে। এতে তোমার বুদ্ধির চেয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশী করে' পাওয়া যাচ্ছে! কেননা, তুমি কি ভাব্ছ জয়ন্ত এতবড় মিথ্যে অপবাদটা মুখ বুঁজে মাথা পেতে নেবে? সে যখন তোমার নাম করে' আসল ব্যাপারটা জগৎবাবুর কাছে খুলে বল্‌বে,—তখন?"

—"স্পষ্টই বল্‌ব, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনা। এমন-কি হুস্‌না-বাইকেও যদি আন্‌তে হয়, চাইকি তাও আন্‌ব। তাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি। বাইজী এসে সাফ্ বল্‌বে, জয়ন্ত হামেসাই তার বাড়ীতে গিয়ে মদটদ্ খায়, গান-বাজ্‌না শোনে। আরো বল্‌বে, সে আমাকে কখনো চক্ষেও দেখে-নি।"

অবনী একেবারে থ হইয়া গেল। তারপর চোখ পাকাইয়া বলিল, "উঃ, এমন ভয়ানক মিথ্যাকথা সাজাতে তোমার বুক একটুও কাঁপ্‌বে না?"

স্বর্ণেন্দু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মিথ্যাকে তোমরা যতটা ভয়ানক বলে কল্পনা কর, মিথ্যার আসল রূপ ততটা ভয়ানক নয় হে! সত্য ত পঙ্গু, দুর্ব্বল,—জগতে মিথ্যার মত কার্য্যকর আর কি আছে?"

স্বর্ণেন্দুর একখানা হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া অবনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "থামো, থামো! তোমার এ সয়তানী দার্শনিকতার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। জয়ন্তকে আমরা ভালো না-বাস্‌লেও অকারণে তার ওপরে এমন অপবাদ দেওয়াতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। যদি আসল ব্যাপারটা কোনগতিকে জাহির হয়ে যায়, তাহলে তোমার সঙ্গে আমাকেও জড়িয়ে পড়্‌তে হবে। তখন সমাজে আমি যে আর মুখ দেখাতে পার্‌ব না!"

স্বর্ণেন্দু ব্যাজার হইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "এইজন্যেই তোমাকে ত আমি কিছু বল্‌তে চাইছিলুম না। জয়ন্ত আমাদের কি-রকম ঘৃণা আর তুচ্ছ-তাচ্ছল্য কর্‌ত, সে-সব এরি-মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?"

অবনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জয়ন্ত হয়ত তোমাকেই ঘৃণা কর্‌ত। আমার সঙ্গে তার মতে মিল্‌ত না,—এই পর্য্যন্ত।"

স্বর্ণেন্দু ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "আর ইন্দু-লেখাকে বিবাহ করে' সে তোমার মুখের গ্রাস যে কেড়ে নিতে চেয়েছিল, সেটাও বুঝি কিছু নয়? অবনী, তোমার সেদিনকার রাগ আমি এখনো ভুলি-নি, বুঝ্‌লে?"

—"এইটুকুর জন্যে একজন সৎলোককে মিথ্যে কথা কয়ে অসৎ বলে প্রতিপন্ন করতে

হবে! তোমার মত আমি এখনো ততটা পাষণ্ড হ'তে পারি-নি!"

—"সৎ আর অসৎ একটা কথার কথা! যারা সৎ, তারা কখনো অসৎ হবার অবকাশ পায়-নি বলেই সৎ!"

—"যাই বল আর যাই কর, এ-ব্যাপারে আমি নেই। পিছল পথে চলে শেষটা যদি আছাড় খাই, তখন আমাকে তুল্‌বে কে? ... ... উঁহুঃ, এ ব্যাপারে আমি নেই!"

—"তা না থাকো, না থাক্‌বে! কিন্তু তোমার মুখটা অন্তত বন্ধ রেখ।"

—"যখন সব শুনেছি তখন আমি মুখও বন্ধ রাখ্‌তে পার্‌ব না। শেষটা তোমার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়ি, আর জয়ন্ত-বেচারীর ঘাড়ে যে কলঙ্কের বোঝা চেপেছে সেইটে আমার ঘাড়েই এসে চাপুক্ আর কি! না স্বর্ণ, সে-সব হচ্ছে না—"

বিষম রাগে স্বর্ণেন্দুর কটা মুখখানা লাল হইয়া উঠিল—চোখদুটো ভাঁটার মত ঘুরিতে লাগিল। ঠোঁট্ কামড়াইয়া টেবিলের উপরে দুম্-করিয়া একটা ঘুসি মারিয়া সে চ্যাঁচাইয়া বলিল, "তুমি এমন কাপুরুষ? ধিক্!"

অবনী তাহার রাগ দেখিয়া ভ্রুক্ষেপও করিল না; দৃঢ়স্বরে বলিল, "দুর্নীতি আর দুর্নামের সুমুখে আমি চিরকালই এম্‌নি কাপুরুষ থাক্‌ব! ইন্দুলেখার সঙ্গে যাতে আমার বিবাহ হয়, তুমি সেইজন্যে সাহায্য কর্‌বে বলে ভরসা দিয়েছিলে! এরই নাম তোমার সাহায্য করা? কী ভয়ানক! তোমার মত বন্ধুর হাত থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন!"

স্বর্ণেন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টিট্‌কারি দিয়া বলিল, "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!"

—"স্বর্ণ, তুমি যদি চুরি করেই থাক, সে আমার জন্যে কর-নি! তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি, জয়ন্তের ওপরে তোমার রাগ আছে বলেই তুমি এ-কার্য্য করেছ! যাক্—এইবেলা কিছুদিনের জন্যে কল্‌কাতা থেকে মানে-মানে সরে পড়! আমি সব কথা শীঘ্রই প্রকাশ করে' দেব—নইলে আমাকে গুরুতর পাপে পাপী হ'তে হবে!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ণ-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ

(Spectroscopy)

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই অগষ্ট তারিখে যে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহা বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন তথ্য প্রচার করে। ঐ দিনে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস হয়, এবং শুধু ভারতবর্ষ হইতেই তাহা দেখা গিয়াছিল। এখানে বলিয়া রাখি যে পৃথিবীর কোন এক স্থান হইতে যদি পূর্ণ গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতেই যে পূর্ণগ্রহণ দেখা যাইবে, এমন নয়। সেইজন্য ঘটনা-স্থলটী (ভারতবর্ষ) বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

যতদিন বিজ্ঞানের আদর থাকিবে, যতদিন বিদ্যার গৌরব থাকিবে, ততদিন উক্ত সূর্য্য-গ্রহণ জগতের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে।, এই ঘটনা হইতে বিজ্ঞানের একটা নূতন দিক খুলিয়া গেল। বর্ণ-বিশ্লেষণ (Spectrum analysis) জন্মলাভ করিল। বর্ণ-বিশ্লেষণ হইতে জগতের যে কতখানি লাভ হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকদের কাহারো অবিদিত নহে। আমার মনে হয়, উক্ত সূর্য্যগ্রহণ-দিবসে বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী প্রথম কাজে লাগানো হইল; সেই সঙ্গে কত মৌলিক তথ্যও প্রচারিত হইল। আলোক-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রে (spectroscopy) নেত্র সংলগ্ন রাখিয়া তথ্যান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ধনীগণ তাঁহাদের সহায়তা কল্পে মুক্ত-হস্ত হইলেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন; এবং সেই সকল যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য-নূতন তথ্যের আবিষ্কারে জগৎ মুগ্ধ হইল, নব-নব সত্য লাভ করিতে লাগিল।

পূর্ণগ্রহণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নহে। কখনো কোথাও 'কালে-ভদ্রে' ঘটে। সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণকালে (total eclipse) রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র সাহায্যে যে সকল মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, কেবলমাত্র দূর-বীক্ষণ সাহায্যে সে গুলির সন্ধান অসম্ভব। পূর্ণগ্রহণকালীন দৃগ্‌বিষয়গুলির গুণ ও ধর্ম্ম কেবলমাত্র রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র সাহায্যেই সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা সম্ভব। ১৮৬৮ সালের পূর্ণগ্রহণ-প্রসূত ফলাফল অতি চমকপ্রদ। পরবৎসরে ৭ই অগষ্ট তারিখে উত্তর আমেরিকা হইতে আবার সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে আবার বৈজ্ঞানিকগণ রশ্মিনির্ব্বাচণ যন্ত্র (Spectroscope) ব্যবহার করেন। এবার-কার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলও বিশেষ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমেরিকায় লিপিবদ্ধ পরীক্ষা-ফলের সহিত ১৮৬৮ সালের ভারতে লিপিবদ্ধ ফলাফলের কোথাও প্রভেদ নাই। উভয় গ্রহণেরই ফল রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রের উপর একইরূপ। উভয় গ্রহণের ফলাফল ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞান-পরিষদে বিচারার্থে প্রেরিত হয়। বিচারে বর্ণ-বিশ্লে-ষণের (Spectrum analysis) জয়-জয়কার পড়িয়া যায়। উপাদান-নিরূপণে বর্ণ-বিশ্লেষণ যে একটি সূক্ষ্ম প্রণালী - ইহাতে বৈজ্ঞানিক দিগের আর কোন সন্দেহ নাই। কাজেই উন্নত সমাজে একটা নূতন সাড়া পড়িল। সকলে এই অভিনব বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীতে বস্তুর উপাদান-নিরূপণে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য প্রচারিত হইল। বহু যোজন দূরে অবস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির উপাদান নির্ণীত হইতে লাগিল।

এমন চমৎকার বর্ণ বিশ্লেষণ-প্রণালীর একটা বিস্তারিত বিবরণ বাংলা ভাষায় নাই। একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে (prism) সূর্য্য-রশ্মি লাগিয়া অতি সুন্দর সাতরঙা ছবির সৃষ্টি করে; সেই সাতরঙা ছবির নাম বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum)। সূর্য্য বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-নিঃসৃত আলোক 'সাদা চোখে' এক-জাতীয় বলিয়াই মনে হয়।

যতদিন বিজ্ঞানের আদর থাকিবে, যতদিন বিদ্যার গৌরব থাকিবে, ততদিন উক্ত সূর্য্য-গ্রহণ জগতের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত থাকিবে! এই ঘটনা হইতে বিজ্ঞানের একটা নূতন দিক খুলিয়া গেল। বর্ণ-বিশ্লেষণ (Spectrum analysis) জন্মলাভ করিল। বর্ণ-বিশ্লেষণ হইতে জগতের যে কতখানি লাভ হইয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিকদের কাহারো অবিদিত নহে। আমার মনে হয়, উক্ত সূর্য্যগ্রহণ-দিবসে বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী প্রথম কাজে লাগানো হইল; সেই সঙ্গে কত মৌলিক তথ্যও প্রচারিত হইল। আলোক-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রে (spectroscopy) নেত্র সংলগ্ন রাখিয়া তথ্যান্বেষণ করিতে লাগিলেন। ধনীগণ তাঁহাদের সহায়তা কল্পে মুক্ত-হস্ত হইলেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানাগারে রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন; এবং সেই সকল যন্ত্রের সাহায্যে নিত্য-নূতন তথ্যের আবিষ্কারে জগৎ মুগ্ধ হইল, নব-নব সত্য লাভ করিতে লাগিল।

পূর্ণগ্রহণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নহে। কখনো কোথাও 'কালে-ভদ্রে' ঘটে। সূর্য্যের পূর্ণগ্রহণকালে (total eclipse) রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্র সাহায্যে যে সকল মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, কেবলমাত্র দূর-বীক্ষণ সাহায্যে সে গুলির সন্ধান অসম্ভব। পূর্ণগ্রহণকালীন দৃগ্‌বিষয়গুলির গুণ ও ধর্ম্ম কেবলমাত্র রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্র সাহায্যেই সম্যক্‌রূপে আলোচনা করা সম্ভব। ১৮৬৮ চমকপ্রদ। পরবৎসরে ৭ই অগষ্ট তারিখে উত্তর আমেরিকা হইতে আবার সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে আবার বৈজ্ঞানিকগণ রশ্মিনির্ব্বাচণ যন্ত্র (Spectroscope) ব্যবহার করেন। এবার-কার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলও বিশেষ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমেরিকায় লিপিবদ্ধ পরীক্ষা-ফলের সহিত ১৮৬৮ সালের ভারতে লিপিবদ্ধ ফলাফলের কোথাও প্রভেদ নাই। উভয় গ্রহণেরই ফল রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্রের উপর একইরূপ। উভয় গ্রহণের ফলাফল ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞান-পরিষদে বিচারার্থে প্রেরিত হয়। বিচারে বর্ণ-বিশ্লে-ষণের (Spectrum analysis) জয়-জয়কার পড়িয়া যায়। উপাদান-নিরূপণে বর্ণ-বিশ্লেষণ যে একটি সূক্ষ্ম প্রণালী - ইহাতে বৈজ্ঞানিক দিগের আর কোন সন্দেহ নাই। কাজেই উন্নত সমাজে একটা নূতন সাড়া পড়িল। সকলে এই অভিনব বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীতে বস্তুর উপাদান-নিরূপণে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য প্রচারিত হইল। বহু যোজন দূরে অবস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতির উপাদান নির্ণীত হইতে লাগিল।

এমন চমৎকার বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীর একটা বিস্তারিত বিবরণ বাংলা ভাষায় নাই। একটি ত্রিশিরা কাচের মধ্যে (prism) সূর্য্য-রশ্মি লাগিয়া অতি সুন্দর সাতরঙা ছবির সৃষ্টি করে; সেই সাতরঙা ছবির নাম বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum)। সূর্য্য বা অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-নিঃসৃত আলোক 'সাদা

সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের আলোক 'আসল আলো' বলিয়াই বিজ্ঞান-জগতে প্রসিদ্ধ; এবং প্রদীপ, বাতি, বিজলীবাতি (electric light) ইত্যাদি 'নকল আলো' বলিয়া পরিচিত। আসল আলো ও নকল আলোর বিভিন্নতা 'সাদাচোখে' ধরিতেই পারা যায় না। একটি উজ্জ্বল, অপরটি উজ্জ্বলতর; একটি লাল, অপরটি নীল,—এইরূপে তাহাদের মধ্যে 'সাদা চোখে' মাত্রা ও বর্ণবোধ ব্যতীত আর কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ত্রিশিরা (prism) কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে উক্ত আলোগুলি অন্য রূপে দেখা দেয়। সেগুলি অতি সুন্দর রঙিন ছবির আকার ধারণ করে। এই ছবির (বর্ণ-পুচ্ছের) আকার-প্রকার, গঠন উপাদান আলোকপ্রদ দ্রব্য-বিশেষের উপর নির্ভর করে। এক এক রকম পদার্থের এক এক রকম বর্ণ-পুচ্ছ। একের 'বর্ণ-পুচ্ছ অপরের বর্ণ-পুচ্ছের সহিত মেলে না; একের ছবি অপর ছবির অনুরূপ নয়। তাহা হইলেই দেখি, প্রত্যেক দ্রব্য গ্যাসে পরিণত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইলে এবং সেই জ্যোতি ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক দ্রব্যের এক একটি বিশিষ্ট রঙিন ছবি বা বর্ণ-পুচ্ছ (Spectrum) আছে। এই বর্ণ-পুচ্ছ-পর্য্যবেক্ষণে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। আশ্চর্য্য ব্যাপার! সাদা আলো ত্রিশিরা কাচের মধ্যে গিয়া মনভুলানো রঙিন ছবিতে পরিণত হইল! যেমন-তেমন রঙিন নয়, সে এক বিচিত্র লীলায় লীলায়িত অপরূপ রঙিন! এক একটি জিনিষের এক এক রকম রঙিন ছবি। জিনিষ চিনিবার এ কি কম সুবিধা! এমন চমৎকার উপায় আজ পর্য্যন্ত আর বাহির হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum) যদি কাগজে চিত্রিত করিয়া রাখা যায় এবং যদি কোন অজ্ঞাত বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের সহিত জ্ঞাত বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, যে ঐ জ্ঞাত বস্তুটি অজ্ঞাত বস্তুর উপাদান-স্বরূপে তাহাতে বর্ত্তমান। ইহাকেই বলে, বর্ণ-বিশ্লেষণ প্রণালী। ইহাদ্বারা এইরূপে পদার্থের উপাদান স্থির হয়। রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্‌গণও পদার্থের উপাদান নির্ণয় করেন বটে, কিন্তু সে অন্য উপায়ে—তাঁহাদের ফ্লাস্ক চাই, বকযন্ত্র (retort) চাই, টেষ্ট টিউব চাই, re-agent চাই, precipitate চাই, তবে তাঁহারা আসরে নামিবেন; জিনিষটাকে ভাঙিবেন, চুরিবেন। কত বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণের পর তবে সেটীর উপাদান নির্ণীত হইবে। আর পদার্থ-বিদ্‌গণ অজ্ঞাত বস্তুটিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া লইয়া সেই জ্যোতি ত্রিশিরা কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া শুধু বর্ণ-পুচ্ছ-দৃষ্টেই তাহার উপাদান সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এইখানেই উভয়ের পার্থক্য। তাই বলিয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ-প্রণালী উড়াইয়া দিবার বস্তু নয়। যে রাসায়নিক প্রণালী এতকাল বস্তুবিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যে প্রণালী এযাবৎকাল বস্তু-বিশ্লেষণে ও সংশ্লেষণে সকল নিপুণ হস্তে কত কত সূক্ষ্ম মৌলিক তথ্যের আবিষ্কার

করিয়াছে, তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা নির্ব্বোধের কাজ। ইহার রাজ্যও বহুদূর-ব্যাপী। ইহার শিষ্য-সংখ্যাও অল্প নহে।

বর্ণ-বিশ্লেষণ বস্তুকে বিশ্লেষ করিতে পারে না এবং বস্তুদ্বয়-মধ্যে সংশ্লেষণ-সাধনেও অক্ষম। ইহা অজ্ঞাত বিরাট রাজ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়া উপাদানের সন্ধান আনিয়া দেয় মাত্র। তার পর রসায়ণবিদ্ তাঁহার সৈন্য-সামন্ত লইয়া নূতন রাজ্য-স্থাপনে অগ্রসর হন। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে বিরাট রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ঈপ্সিত অমূল্য রত্নগুলি তিনি আহরণ করেন। বর্ণ-বিশ্লেষণকে কত সতর্কতার সহিত কত সূক্ষ্মভাবে কাজ করিতে হইয়াছে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যখন রাসায়নিকের নিক্তি, পদার্থ-বিদের অনুবীক্ষণ পদার্থের নূতন উপাদান-নির্দ্ধারণে অপারগ হইয়া বিমর্ষচিত্তে করতল-লগ্ন কপোলে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়ে, তখন রঙিনবসনা বর্ণ-বিশ্লেষণ-সুন্দরী স্মিত মুখে আসিয়া নব উপাদানের অমোঘ সন্ধান-দানে তাহার বিমর্ষচিত্তে হর্ষোৎপাদন করিয়া দুর্ব্বল চিত্তকে শত হস্তীর বলে বলীয়ান করিয়া আবার কর্ম্মে নিযুক্ত করে।

এক কাচ্চা লবণকে ১৬,০০০ সমভাগে ভাগ করা যাক্; ইহার এক ভাগকে মোটামুটি এক মিলিগ্রাম বলিব। রসায়নবিদ্ তাঁহার অতি-সূক্ষ্ম নিক্তির সাহায্যে অতিকষ্টে এক মিলিগ্রামের ওজন স্থির করিতে পারেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞাপনে তিনি অক্ষম। সুধু তাহাই নয়। লবণ সোডিয়ম্ ও ক্লোরিনে গঠিত। সুতরাং এক মিলিগ্রাম লবণের মধ্যেও সোডিয়ম ও ক্লোরিন আছে। এক মিলিগ্রাম লবণের মধ্যে যে সোডিয়ম আছে, কোনো রাসায়নিক উপায়ে তাহা ধরিবার ক্ষমতা রসায়ন-বিদের নাই। তাঁহার বল-বুদ্ধি সব এইখানেই শেষ। এখন দেখা যাক্, পদার্থবিদ্ কি করেন। সেই এক মিলিগ্রাম লবণকে তিন লক্ষ সমভাগে তিনি ভাগ করেন। এক-একভাগে একটি অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কণা পড়িল। এই ক্ষুদ্র কণার মধ্যে যে সোডিয়ম আছে, বর্ণ-বিশ্লেষণ-সাহায্যে পদার্থবিদ্ সেই সোডিয়মের অস্তিত্ব বাহির করিয়া দিবেন।

পদার্থের উপাদান-নিরূপণে রাসায়নিক প্রণালীকে স্থূল ও বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীকে সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে। এত সূক্ষ্ম প্রণালীর উদ্ভবে বুধগণের মনে হইয়াছিল বুঝি বা নূতন মূল পদার্থের আবিষ্কার হইবে। যে সকল মূল পদার্থ জগতে বিরলভাবে ছড়ানো আছে, অথবা যে-সকল মূল পদার্থের বস্তুগত বিশিষ্টতা ও কোন জ্ঞাত দ্রব্যের বিশিষ্টতার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, সে সকল মূল পদার্থ রাসায়নিক প্রণালীর স্থূলতা হেতু এতদিন আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বর্ণ-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা হেতু সেই সকল মূল পদার্থের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। ফলে তাহাই ঘটিল। অনুমান সত্যে পরিণত হইল। নূতন মূল পদার্থের সন্ধান মিলিল।

হিডেল্‌বার্গ কলেজের অধ্যাপকদ্বয় বুন্‌সেন্ ও কির্‌চফ (Bunsen, Kirchhoff) বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালীর জন্মদাতা। উক্ত পণ্ডিত-দ্বয়ের দ্বারাই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এতৎ-

প্রচলনের সূত্রপাত হয়। তাঁহাদের অভিনব রশ্মি-নির্ব্বাচন-যন্ত্রের সাহায্যে(Spectroscope) বিজ্ঞানাগারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহারা বর্ণ-বিশ্লেষণ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইল। দুইটী নূতন ধাতুর আবিষ্কার হইল। এই আবিষ্কারে তাঁহারা মর জগতে অমরত্ব লাভ করিলেন। এই নূতন আবিষ্কৃত ধাতুদ্বয়ের নাম কেসিয়াম্ ও রুবিডিয়াম্ (Caesium and Rubidium)। কিছুকাল পরে এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-দ্বারাই থেলিয়াম ও ইন্‌ডিয়াম্ নামক (Thalium and Indium) আর দুইটী ধাতু আবিষ্কৃত হয়।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নক্ষেত্রে বর্ণ-বিশ্লেষণ অদ্ভুত লীলা দেখাইয়াছে বটে। কিন্তু জ্যোতিষে ইহার কার্য্য আরও অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-বিধিবলে (Newton's Law of gravitation) শূন্যস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি, আবর্ত্তন-পথ পরস্পরের দূরত্ব স্থির করিতে পারা যায়; এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক ঘটনা—জোয়ার-ভাঁটা ও গ্রহণ-কাল—নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। সেই মাধ্যাকর্ষণই আবার মানবকে পৃথিবীর সহিত অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কাজেই পৃথিবী ছাড়িয়া মানুষের শূন্যে উঠিবার শক্তি নাই। তবে কাহার সাহায্যে বহু যোজন অন্তরে অবস্থিত গ্রহ নক্ষত্রের সংবাদ মানুষ সংগ্রহ করিবে? কোন্ এরোপ্লেনে চড়িয়া মানুষ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর খোঁজ-খবর লইবে? আলো এ দৌত্যকার্য্য সাধন করে। আলোর পুষ্পক রথে চড়িয়া মানুষ এ বিশ্বজগতের সংবাদ সংগ্রহ করে। আলোক-পরী উড়িয়া আসিয়া গ্রহ-উপগ্রহের অস্তিত্ব, গঠন-উপাদান ও আকার-প্রকারের পরিচয় দেয়! গ্রহ-উপগ্রহ-নিঃসৃত আলোকের বর্ণ-বিশ্লেষণই শত-যোজনে স্থিত গ্রহ উপগ্রহে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। মানব এই বর্ণ-বিশ্লেষণ-সোপান বহিয়াই তারকাবলীর রাসায়নিক গঠন ও বাহ্যিক আকার-প্রকারের পরিচয় পায়। বর্ণ-বিশ্লেষণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে কেবলমাত্র দূরবীক্ষণের সাহায্যেই তারকাবলীর পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা হইত। কিন্তু এই চেষ্টাপ্রসূত ফল আশানুরূপ হয় নাই। কেবলমাত্র তাহাদের আকার, আকারের পরিমাণ ও বর্ণ-নির্ব্বাচন ব্যতীত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং দূরবীক্ষণ-প্রণালী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর পূর্ণ তথ্য-নিরূপণে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল।

১৮৫৯ সালে বর্ণ-বিশ্লেষণকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি-কল্পে আহ্বান করা হইয়াছে! বাণী-সঙ্গিনী, রঙিন-বসনা বর্ণবিশ্লেষণ-সুন্দরী সুধীবৃন্দের প্রাণের আহ্বানে প্রীত হইয়া আসরে নামিয়া স্মিত মুখে জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কি মহৎ উন্নতি-সাধনে বুধবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা শত মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ত্রিশিরা কচের সাহায্যে (prism) সূর্য্য-রশ্মির মূল উপাদানগুলি বিশ্লেষ করিতে পারা যায়। পার্থিব জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের বর্ণ-বিশ্লেষণের * ন্যায় সূর্য্যরশ্মিরও বর্ণ-

* বর্ণ-বিশ্লেষণের পরিবর্ত্তে, জ্যোতি-বিশ্লেষণ বা রশ্মি-বিশ্লেষণ, কোন্ শব্দটি অধিকতর অর্থ-বোধক,

বিশ্লেষণ সম্ভব। সুধু সূর্য্যরশ্মি কেন, গ্রহ-উপগ্রহ-নিঃসৃত রশ্মি, অচঞ্চল তারকা-রশ্মি (fixed stars), ধুমকেতু-রশ্মি, নেবুলী হইতে প্রবাহিত রশ্মিরও বর্ণ-বিশ্লেষণ সম্ভব। যাবতীয় পার্থিব মূল পদার্থের বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী-লব্ধ বর্ণ-পুচ্ছ (spectrum) আমাদের বেশ পরিচিত। ধরা যাক্ সূর্য্যরশ্মি-প্রসূত বর্ণ-পুচ্ছ অঙ্কিত করা হইল। ইহার সহিত পার্থিব বস্তুর বর্ণ-পুচ্ছের তুলনায় যদি জানিতে পারা যায় যে কতকগুলি পার্থিব মূল পদার্থের বর্ণ-পুচ্ছের সহিত সূর্য্যরশ্মি-প্রসূত বর্ণ-পুচ্ছের সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিব যে ঐ-সকল মূল পদার্থ সূর্য্যের মধ্যেও অবস্থিত। এইরূপে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাদান অভ্রান্তরূপে স্থির হইয়াছে। বর্ণ-বিশ্লেষণ-প্রণালী সাধারণতঃ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় ও তাহার উপকারিতা কি—সেটী এখানে মোটামুটি ভাবে বলা হইল। প্রত্যেক পদার্থের বস্তুগত বর্ণ-পুচ্ছ প্রস্তুত করাই প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপান-নির্ম্মাণের জন্য পদার্থটিকে আলোকময় করিয়া লইতে হইবে। সুধু যেমন-তেমন আলোকময় করিলে চলিবে না—এমন করিয়া আলোকময় করিতে হইবে যেন তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে আলোক নিঃসৃত হইয়া বর্ণ-পুচ্ছ গঠিত সমর্থ হয়। কালো জিনিষ বর্ণ-বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যদি কালো জিনিষকে বর্ণ-বিশ্লেষণে ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহাকে প্রথমে জ্যোতির্ম্ময় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর তাহার জ্যোতি বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণ-পুচ্ছ-প্রণয়নে সহজেই সক্ষম হইব। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, বর্ণ-পুচ্ছ-প্রণয়নের বিস্তারিত বিবরণ জানিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বস্তুকে কি প্রকারে আলোকময় করা যাইতে পারে, সে-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। বারান্তরে তাহার বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

নেপালের কথা *

সমর-ক্ষেত্রে নেপালী বীরের সাহস ও নির্ভীকতা জগৎ-বিখ্যাত। নেপালী হিন্দু, আমরাও হিন্দু—কাজেই নেপালীর বীরত্বের গর্ব্ব আমরাও মুখে করিয়া থাকি। ঘরের বড় বেশী দূরে নহে—অথচ নেপালের বৃত্তান্ত আমরা কয়জনে জানি? টডের কল্যাণে রাজপুতানার অলি-গলির বার্ত্তা আমাদের নেহাৎ অবিদিত নয়। টডের রাজস্থান-অবলম্বনে নাট্যকার নাট্য-রচনা করিতেছেন, কবি কাব্য লিখিতেছেন, চরিত-কার কীর্ত্তি-

---

* নেপালী ছবি। শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচড়া বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীকুমারদের

কাহিনী লিপি-বদ্ধ করিতেছেন, চিত্রকর ছবি আঁকিতেছেন, কিন্তু নেপালের কথা, কৈ, কাহারো মুখে বড়-একটা ত শুনা যায় না!

"নেপালী ছত্রির" গ্রন্থকার বহু সন্ধানে নেপালের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে আজ তাহা উপহার দিয়াছেন। তাঁহার এ উপহার বাঙালী সাদরে গ্রহণ করিবে; তাঁহার এ উপহারের জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

নেপালের ইতিহাস কি কেবলই কাটাকাটি, মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লবের লোমহর্ষণ কাহিনীতে পরিপূর্ণ? না। নেপালের তরাই প্রচুর নর-রক্তে রাঙা, সন্দেহ নাই, তবু তাহারই মধ্য দিয়া এই অসম-সাহসিক নির্ভীক জাতির অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম, অসাধারণ রাজভক্তি, অসীম ধর্ম্মনিষ্ঠা ও রাজনীতিজ্ঞতা এমনই মহিমায় উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া আছে যে তাহা দেখিয়া শ্রদ্ধায় শির নত হয়। দেশের দারুণ বিগ্রহ-বিপ্লবের ফাঁক দিয়া নেপালী জাতির যে সভ্যতার আদর্শ আমাদের চোখে পড়ে, তাহা দেখিয়া প্রকৃতই বলিতে হয়, There is a civilisation without furniture.



পৃথ্বীনারায়ণ

মুসলমান চিতোর অধিকার করিলে চিতোর-রাজবংশীয় অযুত-রাম নগর ত্যাগ করেন; তাঁহার দুই পুত্র খাঞ্চা ও মিঞ্চা হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। ইংরাজী ১৪৯৫ খৃঃঅব্দে ভীরকোট এলাকায় খিলম নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়া তাঁহারা আবাদের কাজে প্রবৃত্ত হন; ক্রমে তাঁহাদেরই একজন নয়া-কোটের ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন। এই বংশেরই দ্রব্যসাহ নামে একজন গোর্খা নগর অধিকার করিয়া গুর্খা রাজ্যের পত্তন করেন (১৫৫৯ খৃঃঅব্দ)। ইঁহারই বংশে অযুতরামের

৩৭তম পুরুষ পৃথ্বীনারায়ণের বীরত্বে বর্ত্তমান নেপাল-রাজ্যের একচ্ছত্রী-করণ সম্পন্ন হয়।

১৭৪২ খৃঃঅব্দে বারো বৎসর বয়সে পৃথ্বীনারায়ণ গোর্খা রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই পৃথ্বীনারায়ণই পরে সমগ্র নেপাল রাজ্য অধিকার করেন। কাঠমাণ্ডুতে পৃথ্বীনারায়ণের রাজধানী স্থাপিত হয়। (১৭৬৮ খৃঃঅব্দ)। নেপালের প্রাচীন রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে পৃথ্বীনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করে।

'কাষ্ঠমণ্ডপ' হইতে কাঠমাণ্ডুর নাম-করণ হইয়াছে। কাঠমাণ্ডু, ভাটগাঁও ও কীর্ত্তিপুর এই তিনটি ছিল নেপালের প্রধান নগর। ইহারই উত্তর-পশ্চিম দিকে পর্ব্বত-শ্রেণীর অন্তরালে গোরক্ষ-নাথের মন্দির; এবং তাহা হইতেই নগরের নাম হইয়াছে গোর্খা। এই গোর্খা নগর হইতেই গুর্খা নামের উৎপত্তি; "ছত্রি" শব্দ "ক্ষত্রিয়ের" অপভ্রংশ মাত্র।

পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহপ্রতাপ সা (১৭৭১—১৭৭৫ খৃঃঅব্দ) রাজা হন; পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে রণবাহাদুর সা (১৭৭৮—১৮০৪ খৃঃঅব্দ) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সিংহাসন-অধিরোহণের সময় রণবাহাদুর নাবালক ছিলেন; তাঁহার পিতৃব্য বাহাদুর-সা রাজ্য-পরিচালনা করিতেন। বাহাদুর-সাই নেপালের প্রথম রাজমন্ত্রী। বাহাদুর-সা পৃথ্বীনারায়ণের পুত্র। ইঁহারই চেষ্টায় কাশ্মীরের প্রান্ত হইতে শিকিম পর্য্যন্ত নেপাল রাজ্য বিস্তার লাভ করে।

রণবাহাদুরের মাতা রাজেন্দ্রলক্ষ্মী বাহাদুর-সার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; বাহাদুর-সার শক্তি ও জনপ্রিয়তায় রাজেন্দ্রলক্ষ্মীর মনে সর্ব্বদাই অশান্তি ছিল। তাঁহারই চক্রান্তে বাহাদুর সা দুইবার নির্ব্বাসিত হন্ এবং পরে ১৭৯৫ খৃঃঅব্দে রণবাহাদুর ছুতা তুলিলেন, বাহাদুর সা রাজ্যের জরিপ করাইয়া রাজস্বের যে ব্যবস্থা করাইয়াছেন, তাহা লাভ-জনক ও সঙ্গত হইলেও ভূমি-জরিপের দ্বারা তিনি ধরিত্রীর অপমান করিয়াছেন, অতএব এ মহাপাতকের শাস্তি, প্রাণদণ্ড! কাজেই বাহাদুর সা নিহত হইলেন।

এমন খামখেয়ালী রাজার ভবিষ্যৎ ভাল হইতেই পারে না। তাই আমরাও দেখি, রণবাহাদুর সার রাজত্ব নানা অত্যাচার ও নিষ্ঠুর অপকর্ম্মে পরিপূর্ণ। তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া দেশের লোক শেষে তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার চারি-বৎসর বয়স্ক পুত্র গির্ব্বানযুধকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। গির্ব্বান ১৮০৭ খ্রীঃঅব্দে ভীমসেন থাপাকে রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা এবং প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতেই নেপালের রাজ-কার্য্য প্রকৃত পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর হস্তগত হয় এবং এই রাজমন্ত্রীই ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়ার ন্যায় নেপাল রাজ্যে সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠেন। এই গির্ব্বানযুধের রাজত্ব-কালেই ইংরাজের সহিত নেপালের যুদ্ধ হয়। দুরদর্শী ভীমসেন থাপা এ যুদ্ধের প্রতিকূলেই মত দিয়াছিলেন; কিন্তু সৈন্যগণ এবং সাধারণ প্রজা তখন এমনই রণোন্মত্ত যে ভীমসেনের কথা তাহারা গ্রাহ্যই করিল না। ভীমসেনের কৌশলেই যুদ্ধ শেষ ও সিগৌলিতে ইংরাজের সহিত গুর্খার সন্ধি স্থাপিত হয়।

গির্ব্বানযুধের মৃত্যুর পর (১৮১৭ খ্রীঃ-অব্দ) তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র বিক্রম সা রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং ভীমসেন থাপা ও রাজার বিমাতা মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী একযোগে রাজ্য-পরিচালনা করেন। ইহার পূর্ব্বে রাজবাড়ী ষড়যন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাণী সপত্নী-পুত্রকে হত্যা করাইতেছে, মন্ত্রী সেনাপতিকে হঠাইতেছে, এমন কি রাণী রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার জন্যও ফন্দী আঁটিতেছে, এমনই কদর্য্য ব্যাপার; মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ও ভীমসেনের পরিচালনা-কৌশলে রাজবাড়ী হইতে ষড়যন্ত্রের মূল ছাঁটিয়া দেওয়া হইল;—কোথাও এতটুকু গোপন অভিসন্ধি না চলে, সে বিষয়ে ভিতরে-বাহিরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন, মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী ও মন্ত্রী ভীমসেন। বিশৃঙ্খল রাজ্যে শৃঙ্খলা আসিল; রাজ্যও শাসন-ব্যবস্থায় শ্রীসম্পন্ন হইল। কিন্তু ১৮ ২ খৃঃঅব্দে মহারাণীর মৃত্যু হইলে অন্দরে আবার সেই পুরাতন অনল জ্বলিয়া উঠিল। ভীমসেনের ভ্রাতা রণবীর সিং ভীমসেনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া-ভাঙ্গাইয়া তরুণ রাজা রাজেন্দ্র বিক্রমের কাণভারি করিতে লাগিলেন;



ভীমসেন থাপা

মানুষের মন, কান-ভাঙ্গানিতে কয়দিন ঠিক থাকে? তরুণ রাজা শেষে নানাভাবে ভীমসেনকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন! ভীমসেনের ব্যবস্থাদি উল্টাইয়া দিয়া, তাঁহার নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইয়াও ক্ষান্ত হইলেন না; শেষে মহারাণীর একবৎসর-বয়স্ক একটি পুত্র রোগে মারা গেলে রাজা অভিযোগ তুলিলেন, ভীমসেন থাপাই শিশুকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়াছেন। যেখানে প্রবল ষড়যন্ত্র, সাক্ষ্য প্রমাণের সেখানে অভাব হয় না। এক্ষেত্রে জাল দলিল-পত্রের সাহায্যে সাক্ষ্য-প্রমাণও খাড়া করা হইল এবং বিশ্বাসী

রাজভক্ত বৃদ্ধ মন্ত্রীকে দারুণ ষড়যন্ত্রের ফলে বিশ্বাসঘাতকের কালো কালি গায়ে মাখিয়া কারাগারে বন্দী হইতে হইল! ক্ষোভে অপমানে ভীমসেন থাপা কারাগারেই আত্ম-হত্যা করেন। বর্ব্বর রাজাদেশ তাঁহার মৃতদেহকে রাজপথে ফেলিয়া দিল, হিন্দুর শেষ সম্মান হইতেও বঞ্চিত করিল; এমন কি, সে মৃত-দেহ অবধি কাহাকেও দাহ করিতে দেওয়া হইল না।

যতই শক্তিধর হোক, একটানা অত্যাচার বেশীদিন কখনোই সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারে না। ফলে দাঁড়াইল এই, রাজ-হস্ত হইতে সকল ক্ষমতা অচিরে মন্ত্রীহস্তে আসিয়া পৌঁছিল। মন্ত্রিত্বের পদ লইয়াই এখন যাহা-কিছু মারামারি, কাটাকাটি ও ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, মহারাজাধিরাজ নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত মহিমায় মূক বিগ্রহমূর্ত্তির ন্যায় সিংহাসন অধিকার করিয়া শুধু বসিয়া রহিলেন।

ভীমসেনের মৃত্যুর পর রাজ-নিগ্রহ আবার সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল। প্রথম মহারাণীর মৃত্যু ঘটিলে প্রজারা রব তুলিল, নিষ্ঠুর মহারাজই বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। মহারাজ রেসিডেণ্টকে গিয়া বলিলেন—এই মিথ্যা রব যে তুলিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া আনা হোক্—তাহার গায়ের চামড়া তুলিয়া তাহাতে লবণ ও তৈল ঘসা চাই। এ বর্ব্বর প্রস্তাবে কেহ কর্ণপাত করে নাই বটে, কিন্তু ফল ফলিল।

উত্যক্ত প্রজার দল ও সৈন্যগণ তখন দরবারে এক দরখাস্ত দাখিল করিল—ইহাই নেপালের Petition of Rights (৭।১২।১৮৪২)। দরবারকে সে দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে হইল এবং কনিষ্ঠা মহারাণী লক্ষ্মী দেবীর হস্তে রাজ্য-চালনার ভার পড়িল।

লক্ষ্মীদেবীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ফতেজঙ্গ নামে মাত্র মন্ত্রী হইলেন; কাজ চালাইতে লাগিল, মহারাণীর প্রিয়পাত্র প্রধান সেনাপতি গগন সিং। গগন সিংয়ের সহিত মহারাণীর ঘনিষ্ঠতা ক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল; শেষে এমন হইল যে এই ব্যাপারের কদর্য্য আলোচনা মহারাজের কাণে আসিয়া আঘাত করিল। ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে লাল ঝা নামক একব্যক্তি পূজা-রত গগন সিংকে জানালার ফাঁক দিয়া গুলি করিয়া মারিল (১৪।৯।১৮৪৬)। ওদিকে গগন সিংয়ের হত্যার কথা শুনিয়া মহারাণী লক্ষ্মীদেবী প্রতিহিংসা-গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সমস্ত সর্দ্দার ও কর্ম্মচারী-দিগকে ডাকাইয়া আনিলেন; এবং যাহাদের তিনি এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ করিলেন, তাঁহাদের সকলকেই হত্যা করিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বিনা-বিচারে দণ্ড দিতে সম্মত হইলেন না—তখন ক্রোধোন্মত্ত লক্ষ্মী-দেবী সম্মুখে-দণ্ডায়মান সেনাপতি বীর-কিশোরের বক্ষে মুক্ত তরবারি বসাইয়া দিলেন। চকিতে বিষম বিপ্লব বাধিয়া গেল; ফতেজঙ্গ নিহত এবং জেনারেল অভিরাম আহত হইলেন। মহারাণী উপর-তলায় গিয়া আদেশ দিলেন, "আমার শত্রুদিগকে নির্ম্মূল কর।" তখন ভীষণ হত্যা-ক্রিয়া চলিল, চক্ষের নিমেষে মৃতদেহে স্তূপ জমিয়া উঠিল। একত্রিশ জন প্রধান এবং কুড়িজন মধ্যবিদ্ সর্দ্দার এই বিপ্লবে প্রাণ হারাইল।



নেপালের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী

ফতেজঙ্গ নিহত হইলে অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ, জঙ্গ বাহাদুর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তারপর রাজা ও রাণীতে বচসা বাধিল। লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "আমার বড় ছেলেকে সিংহাসন দাও, নহিলে আরো ভীষণ রক্তারক্তি ঘটিবে।" মহারাণীকে অটল দেখিয়া মহারাজ রাগ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পাটন নগরের দিকে চলিয়া গেলেন। মহারাণী তখন জঙ্গবাহাদুরের নিকট যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রমকে হত্যা করাইয়া আপনার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু জঙ্গবাহাদুর তাহাতে সম্মত হইলেন না। যুবরাজ সুরেন্দ্রবিক্রম পূর্ব্বেই রাণীর আদেশে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; জঙ্গবাহাদুর এখন কারারুদ্ধ যুবরাজকে গোপন-হত্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের দুই ভ্রাতাকে তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে প্রত্যহ তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেন। মহারাণী দেখিলেন, জঙ্গবাহাদুরকে কৌশলে তিনি বাগাইতে পারিবেন না, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন—বীরধ্বজ বাশনিয়াৎ নামক এক ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, যুবরাজকে, মহারাজকে, এবং জঙ্গবাহাদুরকে কৌশলে

একই ঘরে একই সময়ে কোনমতে আনাইয়া সকলকে হত্যা কর। গগনসিংয়ের পুত্র উজীর সিংহ এবং বিজলীরাজ নামে এক পণ্ডিত এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। নেপালের সৌভাগ্যক্রমে বিজলীরাজের চোখ ফুটিল। তিনি বুঝিলেন, এত বড় হত্যা-কাণ্ডে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি, অথচ ওদিকে লক্ষ্মীদেবীর পুত্রের রাজ্যলাভে শুধু ব্যক্তিগত লাভ ও সুখ। তখন তিনি জঙ্গবাহাদুরকে রাণীর অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। জঙ্গবাহাদুর সতর্ক হইলেন। বীরধ্বজ রাণীর আদেশ জানাইয়া জঙ্গবাহাদুরকে ডাকিতে আসিলে তিনি বলিলেন, কার্য্যতঃ যখন বীরধ্বজই মন্ত্রিত্ব চালাইতেছেন, তখন আর এমন অবস্থায় জঙ্গবাহাদুরের সহিত মহারাণীর কোনো পরামর্শই চলিতে পারে না। জঙ্গবাহাদুরের জেরায় বীরধ্বজ ভড়কাইয়া গেল প্রমাদ গণিয়া ভীত হইল। তখন জঙ্গবাহাদুরের ইঙ্গিতে কাপ্তেন রাণা মীর তাহাকে নিহত করিল। রাজাকে এ ষড়যন্ত্রের কথা অচিরে বলা হইল। শুনিয়া জঙ্গবাহাদুরের হাতে রাজা সকল দিক রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। জঙ্গবাহাদুর অমনি সশস্ত্র সৈন্যদল লইয়া রাজবাটী অবরোধ করিলেন—চক্রান্ত-কারীরা নিহত হইলে জঙ্গ-বাহাদুর মহারাণীকে জানাইলেন, যুবরাজের প্রতি হৃদয়ে যখন তিনি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতেছেন, তখন নেপালে আর তাঁহার থাকা হইতে পারে না। মহারাণী নিরুপায় চিত্তে তীর্থ-দর্শনের ছুতা ধরিয়া নেপাল পরিত্যাগ করিলেন—যাইবার সময় অব্যবস্থিত-চিত্ত মহারাজকেও সঙ্গে লইতে



জঙ্গবাহাদুর

ছাড়িলেন না। জঙ্গবাহাদুরের সুকৌশলে এক ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের হাত হইতে নেপাল রক্ষা পাইল।

জঙ্গবাহাদুর অবশ্য বিতাড়িতা লক্ষ্মী-দেবীর ও তাঁহার দুই পুত্রের ভরণপোষণের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন।

জঙ্গবাহাদুরের রাজ্য-পরিচালনা-কালে ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। জঙ্গবাহাদুর ইংরাজের সাহায্যের জন্য বিস্তর গুর্খাসৈন্য প্রেরণ করেন।

গুর্খাসৈন্য আজিমগড় ও জৌনপুর রক্ষায় নিযুক্ত হয়। আজিমগড়ের নিকট একদল

বিদ্রোহীকে গুর্খাসৈন্য একদিনে পাঁচ মাইল কুচ করিয়া গিয়া আক্রমণ করে, এবং দশমিনিটের মধ্যে আজিমগড় ও জৌনপুর বিদ্রোহ-মুক্ত হয়। তার পর লক্ষ্ণৌ-রক্ষাও গুর্খা সৈন্যের সাহায্যে সংসাধিত হয়। চান্দা ও সোহামপুরের বিদ্রোহীদলও গুর্খা-সৈন্যের হাতে পরাভব স্বীকার করে। তারপর গুর্খাসৈন্যই গোরখপুর, ফাইজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দমন করে। গুর্খাসৈন্য এ সকল যুদ্ধেই 'কুক্‌রি'মাত্র ভরসা করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। এই যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন, জঙ্গ বাহাদুর স্বয়ং। বিদ্রোহ দমনের পর তিনি ইংরাজের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীঃঅব্দে বহু ভারতীয় তীর্থপর্য্যাটনান্তে দেশে প্রত্যাগমন করেন।

লাহোরের রাণী বন্দিনী চান্দা কুয়র ছদ্মবেশে ইংরাজের কেল্লা ছাড়িয়া একেবারে নেপালে আসিয়া আশ্রয় লন। জঙ্গবাহাদুর তাঁহার পরিচয় জানিয়াও তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এ-সংবাদ পাইয়া রাণীকে চাহিয়া পাঠাইলেন—জঙ্গ-বাহাদুর বন্ধুত্বের খাতিরেও আশ্রিতা রমণীকে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিলেন না। জঙ্গবাহাদুর রাণীর বাসের জন্য নিজেরই একখানি বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া দেন এবং দুইজন বিশ্বাসী গুর্খা রমণীকে পাহারায় রাখেন, ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাণীর সহিত যাহাতে কাহারো কোনরূপ পত্র-ব্যবহার না চলে, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার জন্য। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এ বন্দোবস্তে প্রীত হইলেন। জঙ্গবাহাদুর দরবার হইতে রাণীর জন্য বরাদ্দ করিলেন মাসিক আটশত টাকা ভাতা এবং প্রত্যহ চাল, ডাল প্রভৃতির সিধা।

জঙ্গবাহাদুর ১৮৫০ খৃঃঅব্দে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। সঙ্গে গিয়াছিল নয়জন গুর্খা অফিসার, একজন জ্যোতিষী বা কবি, এক-জন চিকিৎসক, একজন নেওয়ার জাতীয় চিত্রশিল্পী, একজন সুবাদার ও চারিজন সূপকার। জাতিচ্যুত হইবার কথা উঠিলে জঙ্গবাহাদুর বলিয়াছিলেন,দৌত্য-কার্য্যের জন্য চীনে ত গুর্খাকে নিত্যই যাইতে হয়; সেখান হইতে ফিরিবার সময় গুর্খা কর্ম্মচারীরা চিরদিন যেমন কাশীতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসে, ইংলণ্ডে গেলেও সেই ব্যবস্থা অনুসৃত হইবে।

১৮৫৬ খৃঃঅব্দে নানারূপে উত্যক্ত হইয়া জঙ্গবাহাদুর সহসা পদত্যাগ করেন। রাজ-গুরু বিজয়গুরু-প্রমুখ সম্ভ্রান্ত নেপালী সর্দ্দারেরা তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের জন্য বিস্তর অনুরোধ করেন। রাজগুরু রাজমুকুট অবধি তাঁহাকে ধারণ করিতে বলেন,কিন্তু জঙ্গবাহাদুর হাসিমুখে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, ওসব কিছুই তিনি করিবেন না; তবে শরীর সুস্থ হইলে রাজকার্য্য-পরিদর্শন করিবেন।

তাহার পর হইতে জঙ্গ বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত নীতির আদর্শেই নেপালরাজ্য পরিচালিত হইতেছে। তিনি একাধারে অসা-ধারণ রাজনীতিকুশল ও যোদ্ধা ছিলেন। নেপালের ইতিহাসে জঙ্গ বাহাদুরের নাম চির-দিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধী সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ রাজপুরুষ, শুধু নেপালে কেন, সমগ্র জগতে খুব অল্পই জন্মিয়াছিলেন।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি হইতে নেপাল-ইতি-হাসের কঙ্কালমাত্র আমরা সঙ্কলন করিলাম।

এই যুদ্ধ-বিপ্লবের কাহিনীর সহিত নেপালীর বিশেষত্ব, গৌরব, এবং মহত্ত্বের পরিচয়ও এ গ্রন্থে যথেষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। নেপালীর ধর্ম্মপ্রবণতা এবং সরলতার কাহিনীও বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক এবং তাহাতে নাটকীয় উপাদানও প্রচুর। এক জঙ্গ বাহাদুরের আদর্শ চরিত্র লইয়াই তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য, রাজনীতি-কুশলতা লইয়া কত নাটক, কত কাব্য, কত উপন্যাসের সৃষ্টি হইতে পারে! এবং লিখিত হইলে সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাহা অমূল্য সামগ্রীই হইবে! এ-দেশের কয়জন খবর রাখেন, হিমালয়েরই এক নিভৃত প্রান্তে এমন অসাধারণ মনুষ্যত্ব, অপূর্ব্ব ধী, অদম্য শক্তি ও বিরাট মহত্ত্বে অলৌকিক মহিমায় বিকশিত হইয়াছিল!—পাশ্চাত্য জগতেও এমন চরিত্র কয়টা দেখা যায়? অথচ আমাদের অনেকের ধারণা নেপালে শুধু বর্ব্বর পশুবলে বলীয়ান দুর্দ্ধর্ষ গোঁয়ার গুর্খারই বাস, মনুষ্যত্বের সেখানে একান্ত অভাব।

গ্রন্থকার বিপুল অধ্যবসায়ে বাঙালীর কাণে নেপালের যে অপরূপ বার্ত্তা শুনাইয়াছেন, বাঙালী তাহা শুনিয়া কৃতার্থ হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের রচনা ভালই,—ইতিহাসের কাহিনীটি সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত—এবং অবাধ গতিতে সুদূর অতীত যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল অবধি সে ধারা অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গীতে বহিয়া আসিয়াছে।

গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের দুইটি অনুরোধ আছে,—দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা ও কাগজ যেন চারুতর করা হয়, কারণ এ গ্রন্থ অবহেলার বস্তু নহে। আমাদের দ্বিতীয় অনুরোধ, নেপালের রাজা রাজড়ার কাহিনী ইহাতে পর্য্যাপ্ত আছে, সেই সঙ্গে প্রজাপুঞ্জের ঘরের কথা, তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনী আরো প্রচুরভাবে সংগ্রহ করিয়া দিলে শুধু যে আমাদের কৌতূহলই চরিতার্থ হইবে, তাহা নহে, গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

বলগো সখি বল আমায়,
আমি যাব কিনা জলে এ বেলায়?
আমি যাব কিনা, আমি যাব কিনা,
আমি যাব কিনা, যাব এ বেলায়?
সে কি এ বিজন পথে একেলা চলে?
বাঁশী নিয়ে বসে গিয়ে কদম্ব-তলে?
কি হবে তবে কি হবে!
হেসে যদি মোর পানে চায়?

কথনো ত চোখে চোখে তারে দেখিনি,
কথনোত মুখে মুখে কিছু কহিনি;
কি করে তবে কি ক'রে, কোন্ ছলনায়?
পশিয়া হৃদয়-পুরে বাঁশীর সুরে,
আমার গোপন কথা সবারে শুনায়!
সখি লাজে মরি, আমি লাজে মরি,
মরি জ্বলি লাজ বেদনায়॥

কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

II { গা মা পা । ধা ধা ণা I পধা –ণর্সা –ণধা । –পা মগা মা I
বল্ গো স খি বল্ আ মায়্ ০০ ০০ ০ আ০ মি

I পা র্সা ণা । ধা পা গমা I –পধা –পমা –গরা । –া গা মা I
যা ব কি না জ লে০ ০০ ০০ ০০ ০ এ বে

I পা –া –া । (–া –া –া) } । –া মগা মা I পা র্সা না ।
লায় ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মি যা ব কি

। র্সা –া র্সর্রা I ণা র্রা র্সা । ধণর্সা –ণধপা মগমা I
না ০ আমি যা ব কি না০০ ০০০ আমি

I পা র্সা ণা । ধা পা গমা I –পধা –পমা –গরা । –া গা মা ।
যা ব কি না যা ব০ ০০ ০০ ০০ ০ এ বে

I পা –া –া । –া –া –া II
লায়্ ০ ০ ০ ০ ০

II { –া –া গা । মা ধা ধা I ধা ধণা –র্সণা । পা ধা –া ।
০ ০ সে কি এ বি জ ন০ ০০ প থে ০

I –া –া না । র্সা র্রা না I র্সা –া –া । –া –া –া I –া –া র্সা ।
০ ০ এ কে লা চ লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বাঁ

। র্গা র্গা র্মা I র্রা র্রা র্সনা । র্সা –া –া । –া –া না
শী নি য়ে ব সে গি০ য়ে ০ ০ ০ ০ ক

। র্সা নর্সর্রা র্সা I ধণা –র্রর্সা –ণধা । –পমা –গমা –া } I
দ ম্ব০০ ত লে০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

I ধা ধা পা । –া –া পা I গমা –পধা –পমগা । –া গা মা I পা –া –া ।
কি হ বে ০ ০ ত বে০ ০০ ০০০ ০ কি হ বে ০ ০

১ ০ ১´ ০
| নর্সা -র্র্সা -ণধা | -পা -া -া I গা মা ধা | ধা -া -া
চায় ০০ ০০ ০ ০ ০ হে সে য দি ০ ০

১´ ০ ১ ০
I ধা -া -া | | ধা -া ণা I পধা ণর্সা ণধা | পা মগা মা |
মোর্ ০ ০ পা ০ নে চায়্ ০০ ০০ ০ আ০ মি

১´ ০ ১´ ০
I পা র্সা ণা | ধা পা -া I গমা -পধা -পমগরা | -া গা মা |
যা ব কি না জ ০ লে০ ০০ ০০০০ ০ এ বে

১´ ০
| পা -া -া | -া -া -া II
লায়্ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১ ০
II { মা মা মা | মগা -া -া | মা মা পা | পা -া -া |
কা খ নো তো০ ০ ০ চো খে চো খে ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
| -া -া মগা | মা ধা পধণা | ধা -া -া | -া -া -া | ণা ণা ণা | ধা -র্সণা -া
০ ০ তা০ রে দে খি০০ নি ০ ০ ০ ০ ০ ক খ নো ত ০ ০

১´ ০ ১´ ০
| ধা ণা ধা | পা -া -া | -া -া গা | মা পা মগা |
মু খে মু খে ০ ০ ০ ০ কি ছু ক হি০

১´ ০ ১´ ০
| মা -া -া | -া -া -া } | ধা ধা পা | -া -া পা | গমা -পধা -পমগরা |
নি ০ ০ ০ ০ ০ কি ক রে ০ ০ ত বে০ ০০ ০০০০

১´ ০ ১´ ০
| গা মা মা | পা -া -া | -া -া -া | মগা -া -মা | পা -া ধা |
০ কি কো রে ০ ০ ০ ০ ০ কোন্ ০ ০ ছ ০ ল

১´ ১´ ০ ১
| পধা -ণর্সা -ণধা | পা -া -া | না -া -া | নধা -া না | র্সা -া -া |
নায় ০০ ০০ ০ ০ ০ কোন্ ০ ০ ছ০ ০ ল নায় ০ ০

০ ১ ০ ১´ ০ ১´
| -া -া -া | -া -া গা | মা ধা ধা | ধা ধণা -র্সণধা | পা ধা -া | -া -া না |
০ ০ ০ ০ ০ প শি য়া হৃ দ য়০ ০০০ পু রে ০ ০ ০ বাঁ

০ ১´ ০ ১´ ০
| র্সা র্রা না | র্সা -া -া | -া -া -া | -া -া র্সা | র্গা র্গা র্গা |
শী র স্ব রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র গো

। র্মা –গর্মর্পর্মা –গর্রর্সা । না র্সা –া । –া –া না । র্সা নর্সর্রা র্সা । ধণা –র্সণা –ধপা ।
প ন০০০ ০০০ ক থা ০ ০ ০ স বা রে০০ শু নায় ০০০ ০০

। –া মগা মা । পা র্সা না । র্সা র্সা র্সা । ণা র্রা র্সা । ধণা –র্সণা –ধপা ।
০ স০ খি লা জে ম রি আ মি লা জে ম রি০ ০০ ০০

। –া –া মগমা । পা র্সা ণা । ধা পা –া । গমা –পমা –গরা । –া গা মা ।
০ ০ ০০০ ম রি জ্ব লি লা ০ জ০ ০০ ০০ ০ বে দ

। পা –া –া । –া –া –া II
নায় ০ ০ ০ ০ ০

মাসকাবারি

যুদ্ধ শেষ

ইউরোপের কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যখন সুরু হয়, তখন প্রথম শোনা গিয়াছিল যে এ যুদ্ধ প্যান্-স্লাভিজ্‌মের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ-অষ্ট্রীয়ার আত্মরক্ষার যুদ্ধ। রাশিয়া স্লাভ-শক্তিকে বূ্যহবদ্ধ করিয়া জার্ম্মাণ-অষ্ট্রীয়াকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই শক্তিকে প্রতিহত করার চেষ্টা ভিন্ন তাদের অন্য পন্থা ছিল না।

নির্দ্বন্দ্ব বেল্‌জিয়ামের "নিউট্রালিটি" ভঙ্গ করার অপরাধে ইংরাজ যখন যুদ্ধে যোগ দিলেন, তখন স্লাভের বললাভের চেষ্টা-ব্যাপারটা কোথায় অন্তর্ধান করিল। তখন যুদ্ধের প্রধান পক্ষ হইলেন ইংরাজ ও জার্ম্মাণ। ইংরাজের রাজ্য-সাম্রাজ্য-বাণিজ্য বিশ্ব জুড়িয়া ব্যাপ্ত; জর্ম্মাণী সেই বিশ্বশক্তি লাভের জন্য লুব্ধ—ইংরাজ সে পথের অন্তরায়—অতএব যুদ্ধ।

গত চার বৎসরের ঘটনা সকলেরি জানা। ঘটনার চেয়ে জনরবের রটনা মারাত্মক। একদা শোনা গেল ভারতবর্ষের সীমান্তে জর্ম্মাণ-তুর্ক হাজির। রাজপুরুষেরা চঞ্চল। আমরা রামে মারিলেও মরি রাবণে মারিলেও মরি—তবু আমাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই খবরটাতে খুসি ছিলেন। শুনিয়াছি অনেক কেরাণী জর্ম্মাণ ভাষায় বোল্ দুরস্ত করার চেষ্টায় ছিলেন। পরাজিত জাতির পক্ষে প্রজাতন্ত্রের চেয়ে প্রভুতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতই স্বাভাবিক কিনা।

এদিকে 'মেড্-ইন্-জর্ম্মাণী' ছাপমারা মালের জায়গায় বাজারে 'মেড্-ইন্-জাপান' ছাপমারা মালের আমদানি হইল। স্বদেশের প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া আমরা কংগ্রেসের

দলাদলির নেশা ও গালাগালির খেউড় জমানো ছাড়া দেশীয় শিল্প চালাইবার কোন চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিপ্লব। সেখানকার "বলসেবিক" দল প্রজার বলকেই প্রবল করিয়া জারের প্রভু-তন্ত্র এবং ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া বসিল। জর্ম্মাণ প্রভুতান্ত্রিকেরা আপাতঃ বলী হইলেও তারা দাস এবং দাসেরা চিরকালই দুর্ব্বল। জর্ম্মাণ কাইজার, জর্ম্মাণ রণবাহিনীর দ্বারা অর্দ্ধেক ইউরোপ জিতিয়া লইলেও তাঁর রাষ্ট্রতন্ত্রের ভিত্তিই যে দুর্ব্বল ও শিথিল, সে কথাটা ভুলিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি রাশিয়ার স্লাভ-শক্তি-কেই বিভীষিকা গণ্য করিয়াছিলেন; সুতরাং রাশিয়ার এই বিপ্লবে তিনি খুসিই ছিলেন, কেননা অতবড় শক্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাওয়াতে কাইজার আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া-ছিলেন।

তারপর, এই বৎসরের গোড়ায় যখন ফ্রান্স-ইংলণ্ড সেই সমগ্র জর্ম্মাণ-বাহিনীর প্রচণ্ড অভিঘাতে হঠিতে হঠিতে একেবারে প্যারিসের দরজায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল এবং যুদ্ধ-জয়ের আশা যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, তখন কে জানিত যে সহসা কয়েক মাসের মধ্যেই সেই প্রবল জর্ম্মাণশক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া প্রতিপক্ষ মিত্র-শক্তির কাছেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে? কাইজার তাঁর সিংহাসন ছাড়িবেন? অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী ভাগ হইয়া যাইবে? দুনিয়ার সব বাদশাগিরি ঘুচিয়া যাইবে?

প্রভুতন্ত্রকে ভিতরে ভিতরে জীর্ণ করিয়া আনিয়াছিল, সে খবর ত গোড়ায় প্রকাশ পায় নাই।

অবশ্য আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে মিত্রপক্ষ বলশালী হইয়াছিল, এটা সত্য। মার্শাল ফোসের অপূর্ব্ব রণচাতুর্য্যে জর্ম্মাণী যে প্যারিসের প্রান্ত হইতে তাড়া খাইয়া ক্রমশ হটিয়া পড়ে, এও সত্য। কিন্তু সক-লের চেয়ে বড় সত্য, জর্ম্মাণীর মধ্যেই অন্ত-বিপ্লব চলিতেছিল—নহিলে এত শীঘ্র যুদ্ধের শেষ হইতেই পারিত না।

প্রভুতন্ত্র ইউরোপ হইতে চির-বিদায় লইল। সর্ব্বত্র যথার্থ আত্মক্রীড় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই জন্যই বুঝি বিধাতা এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া-ছিলেন! আমরাও ইতিহাস-বিধাতার প্রলয়-লীলার ভিতর দিয়া নূতন সৃষ্টির অপূর্ব্ব ছবি দেখিবার সুযোগ পাইলাম।

"উঠেচে আদেশ
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

ভারতের স্থান

যুদ্ধের পরে ভারতের অবস্থা কি হইবে? রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন্ "League of Nations" জাতি-সংঘের কথা বলিয়াছেন; ইংলণ্ড বলিতেছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সকলেই স্বারাজ্যের অধিকারী হইবে। ভারতবর্ষে রিফরম্ স্কীমের যে খসড়া পৌছিয়াছে, তাহাতে আমাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে কিনা এবিষয়ে অনেকেই সন্দিহান। তার উপর যদি বা সেটা বর হয়, তবে

ব্যবস্থাটাও আছে। অতএব লিগ্ অব্ নেশন্সের মধ্যে ভারতের স্থান হইবে কিনা, ইহা লইয়া এদেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত চিন্তাকুল।

আমাদের মনে হয় ভারতবর্ষ যদি সত্যই নেশন হইত, তবে এ সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকিতনা। রাষ্ট্রক্ষেত্রে দুটো অধিকার পাইলেই কোন জাতি নেশন্-পদ-বাচ্য হয় না। নেশনের একটা আত্মাও থাকা চাই, একটা দেহও থাকা চাই। আমাদের নেশন্-সত্তার আত্মা-পদার্থটি যে কি, তাহা এ পর্য্যন্ত অনেক গুণী-জ্ঞানী চিন্তা করিয়া ঠাহর পাইলেন বলিয়া মনে হয় না। শোনা যায়, আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। যদি তাহা হইতাম, তবে দুটো পার্থিব অধিকার দুটো বিষয়-সম্পৎ পাইবার জন্য আমাদের এমন একান্ত লোলুপতা কেন? তবে যে পশ্চিমকে আমরা materialist বা বিষয়ী বলিয়া নিন্দা করি, তার সেই বৈষয়িকতা আয়ত্ত করিতে আমাদের এমন প্রাণপণ প্রয়াস কেন?

তারপর, আত্মবস্তু স্থির হইলে তবে দেহ মেলে। আমাদের আত্মবস্তুই যখন এক নয়, বহু—তখন দেহটাও এক নয়, বহু খণ্ডেই খণ্ডিত।

ইউরোপের জাতিদের সঙ্গে যখন আমরা আমাদের মনে মনে তুলনা করি, তখন রাষ্ট্রক্ষেত্রের অধিকার-অনধিকারের কথা-টাকেই মনের সামনে রাখি। এটা ভুলি যে ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে "a great subjective life and centuries of dream preceded a great objective manifestation of power and wealth" (A. E.)—অর্থাৎ ইউরোপের জাতিদের শক্তি ও ধনের যে বাহ্যবিকাশ তাহা অনেক দিনকার বৃহৎ আন্তর জীবন, বহু শতাব্দীর বহু স্বপ্নের দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। সেই বৃহৎ আন্তর জীবনের লক্ষণগুলি আমাদের মধ্যে কোথায়? অন্যান্য দেশে বড় বড় ভাবুক, দার্শনিক, কবি ও বৈজ্ঞানিকদের যে সব আদর্শ, যে সব ভাবনা-কল্পনা রাষ্ট্রতত্ত্বকে গড়িয়া তোলে ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের সব কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে—এদেশে ভাবের সঙ্গে কাজের সে শুভ পরিণয় ঘটিয়াছে কি? আমাদের দেশের যদি কোন একটা ইতিহাস থাকে, যদি কোন ঐতিহাসিক সাধনা থাকে তবে তার বিশেষত্ব কি, সেটা আমাদের ঐতি-হাসিক—দার্শনিকদের আলোচ্য। কিন্তু সে আলোচনা যদি বা কিছু কিছু ঘটিয়া থাকে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁরা শফরী-বৃত্তি করিতে-ছেন, তাঁরা কি তার কিছুমাত্র খবর রাখেন? "The better minds in every race, eliminating passion and prejudice, by the exercise of the imaginative reason have revealed to their countrymen ideals which they recognised were implicit in national character." (A. E.'র National Being হইতে উদ্ধৃত)। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির মধ্যে যাঁরা মননশীল, তাঁরা সকল অন্ধ প্রবৃত্তি ও সংস্কারকে দূর করিয়া কল্পনা-প্রদীপ্ত যুক্তির সাহায্যে তাঁদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে যে সকল আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, সেইগুলি তাঁদের দেশবাসিদের

গোচর করিয়া থাকেন। আমাদের জাতির মধ্যে রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যাঁরা এই জাতীয় আদর্শের সন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন, দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে তাঁদের সে আবিষ্কার এতটুকুও স্পর্শ করে নাই। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীর দল ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড গড়িবার চেষ্টা করেন—রাষ্ট্রক্ষেত্রে; এবং তাঁরাই আবার ভারতবর্ষকে সমাজের ক্ষেত্রে সংস্কারের হাজার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত রাখিবার জন্য প্রয়াসী হন্। এই সকল অন্তঃসারশূন্য আন্দোলন এদেশকে প্রকৃত নেশন্ হইয়া উঠিতে দিবেনা। দেশের আত্মবোধ হয় নাই; দেশের দেহও তাই গড়িতেছেনা। এই আত্মবোধের বোধনের জন্য দেশের এখন সবচেয়ে দরকার অনেকগুলি যথার্থ চিন্তাশীল, মনীষী ব্যক্তি। তাঁরা দেশের শাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজ, অর্থ, সামর্থ্য, ধর্ম্ম, দর্শন—জ্ঞানের সকল বিভাগে—দেশের মনকে জাগাইয়া তুলিবেন। তখন দেশের স্বরূপ-পরিচয় পাইব; তারপর রূপ আপনি গড়িবে—মণ্টেগুকে তার জন্য বায়না দিতে হইবেনা।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

স্মৃতির সৌরভ। শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত। কলিকাতা, ২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে মুদ্রিত, প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মুল্য দেড়টাকা। এখানি উপন্যাস; প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক জর্জ্জ এলিয়ট প্রণীত Scenes of Clerical Life—উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। এই উপন্যাসখানি প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল; এখন স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এই উপন্যাসের উপাখ্যানে মানুষের সুখ-দুঃখের যে খেলা দেখিতে পাই, তাহা বিশ্বমানবের সুখ-দুঃখ; তাহা শাশ্বত সত্য, কাজেই তাহা সকলের উপভোগের সামগ্রী। অনুবাদের ভাষা মন্দ নয়,চলনসই। পাত্রপাত্রী বিদেশীয়; কিন্তু তাহাদের সুখ-দুঃখ আমাদের প্রাণে বেশ দাগ টানিয়া যায়। ইহা পাঠ করিয়া বাঙলার অনেক ধুরন্ধর ঔপন্যাসিক যদি বুঝিবার চেষ্টা করেন, উপন্যাসের স্বরূপ কি, তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় কিসে, তাহা হইলে এ সব অনুবাদেরও একটা সার্থকতা থাকে। বহিখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

আলেখ্য। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ভবানীপুর, ৩৩ নং গিরিশ মুখার্জ্জি রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ভবানীপুর, ইন্দুপ্রভা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মুল্য ছয় আনা। এখানি সন্দর্ভ-পুস্তক। প্রবন্ধগুলি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের। আলোচনাটুকু কথোপকথনচ্ছলে গ্রথিত; তাহাতে আর যাই হোক, গ্রন্থখানি একেবারে আড়ষ্ট হয় নাই। লেখক 'স্ত্রী-স্বাধীনতা', 'স্ত্রী-শিক্ষা', 'পণপ্রথা' 'গৃহবিচ্ছেদ' প্রভৃতি সামাজিক সন্দর্ভ এবং 'জ্ঞান ও ধর্ম্ম' 'মানব-জীবনে ভগবানের সাড়া' ও 'মায়া'—এই তিনটি আধ্যাত্মিক আলোচনা সংগৃহীত হইয়াছে। সামাজিক সন্দর্ভগুলিতে নূতন কথা বিশেষ-কিছু নাই, সেই পুরাতন মামুলি কাহনিই ঘাঁটা হইয়াছে। লেখকের যুক্তিও তেমন নিপুণ হয়। আধ্যাত্মিক সন্দর্ভগুলি ফাঁপা উচ্ছ্বাস মাত্র।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত।



চন্দ্রমুখী

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ অঙ্কিত।

জলের-আল্পনা

একুশ

ঠিক তেলে-বেগুনের মত জ্বলিয়া স্বর্ণেন্দু যখন চলিয়া গেল, অবনী বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল :—

'তাইত বলি, জয়ন্তের মত লোক কখনো অমন কুস্থানে যেতে পারে? সে মাঝে-মাঝে যে-সব গান গায়, সেগুলোর কোন-কোনটা নীতির দিক্ দিয়ে খুব ভালো হয় না বটে, কিন্তু তাতে-এতে যে ঢের তফাৎ! ... ... সেদিন তার অপমানে আমি যে সত্যি-সত্যিই খুব-বেশী দুঃখিত হয়েছিলুম, তা নয়; কিন্তু আজ তার কথা ভেবে আমার প্রাণটা কেমন কাতর হয়ে উঠ্ছে! ... ... স্বর্ণেন্দু আমারি বন্ধু; জয়ন্ত হয়ত মনে-মনে ঠাউরেছে, জগৎবাবুর বাড়ী থেকে তাকে সরাবার ফিকিরে বন্ধুর সাহায্যে আমিই এই ষড়যন্ত্রটা পাকিয়ে তুলেছি! সে কখনো চুপ করে' থাক্বে না, জগৎবাবুকে একদিন-না-একদিন সব কথা খুলে বল্বেই! জগৎবাবুও নিশ্চয় আমাকেই সন্দেহ করবেন! ... ... তাইত, আচ্ছা মুস্কিলেই পড়া গেল যাহোক,—এখন উপায়? যদি আমি আগে-থাক্তেই জগৎবাবুর কাছে সমস্ত প্রকাশ করে' না দি, তাহলে শেষটা দেখ্ছি আমাকেই এই কুৎসিত অপযশের ভাগী হ'তে হবে! ... ...

'জগৎবাবুর বাড়ীতে জয়ন্তের মান বাড়ুক্ বা কমুক্, তাতে আমার সুবিধে-অসুবিধে কি? ইন্দুলেখাকে আমি ত অ্যাম্নেও পাব না, অম্নেও পাব না—সে ত আমাকে চায় না! জানি না, আমার ওপরে ইন্দুর এই বিষদৃষ্টি কেন? ... ... বেশ দেখা যাচ্ছে, দুনিয়ায় পালকের চেয়ে হাল্কা হচ্ছে,

ধুলো; ধুলোর চেয়ে হাল্‌কা, বাতাস; বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা, নারী; আর নারীর চেয়ে হাল্‌কা কি?—কিছু না!'

অবনী বসিয়া-বসিয়া এম্‌নি নানান কথা ভাবিতেছে—হঠাৎ বাহির হইতে কে ডাকিল, "বাবু ঘরে আছেন,—বাবু?"

অবনী সাড়া দিতে-না-দিতেই ভজহরি ঝোড়ো কাকের মতন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

অবনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তুমি জয়ন্তবাবুর চাকর না?"

ভজহরি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল, "হ্যাঁ বাবু, হ্যাঁ! আমার খোকনকে বাঁচান!"

—"কে?"

—"আমাদের খোকন গো, আমাদের বাবু!"

—"জয়ন্তবাবু? কেন, তাঁর কি হয়েছে!"

—"জ্বর হয়েচে—কাল শেষ-রাত থেকে ভুল বক্‌চে!"

—"জ্বর হয়েচে ত অত ভাব্‌না কিসের?"

—"কে জানে এ কী জ্বর! বল্‌লুম ভিখিরীটাকে ছুঁস্‌নে—তা সে ত শুন্‌লে না!"

—"তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নি! ভিখিরীর কথা আবার কি বল্‌ছ?"

ভজহরি তখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে কখনো বুক চাপ্‌ড়াইয়া, কখনো কপালে করাঘাত করিয়া কোনরকমে সব কথা খুলিয়া বলিল।

অবনীর তখন মনে পড়িল, সেদিন বাড়ী আসিবার সময়ে সেও জয়ন্তের বাড়ীর কাছে একটা বসন্ত-রোগী ভিখারীকে রাস্তায় পড়িয়া-পড়িয়া কাত্‌রাইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু আর-পাঁচজনের মত সেও ভয়ে তাহার কাছে না-ঘেঁষিয়াই চট্‌পট্ চলিয়া আসিয়াছিল।... ...জয়ন্ত নিশ্চয় সেই ভিখারীটাকেই পথ হইতে তুলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া গিয়াছে!... ... এইখানে জয়ন্তের নির্ভীক উদারতার সঙ্গে আপনার ভীরু অক্ষমতার কথা ভাবিয়া অবনী মনে-মনে লজ্জিত হইল। জয়ন্তকে ভালোবাসিত না বলিয়া সে তাহার ভিতরকার সাঁচ্চা মনটিকে এতদিন দেখিতে পায় নাই; আজ জয়ন্তের আসল পরিচয় পাইয়া অবনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল—তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা অন্ধকারের ঠুলি আচম্বিতে খসিয়া পড়িল!

ভজহরি ব্যাকুলভাবে বলিল, "খোকনের পেচনে শনি লেগেচে গো! আজ ক-দিন হোলো সে তার মাকে হারিয়েচে—"

—"জয়ন্তবাবুর মা মারা গেছেন!"

—"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! তার ওপরে এই ব্যাপার! তার একন আপন বল্‌তে আর কেউ নেই! তাই আপনার কাচে ছুটে এলুম—আপনি খোকনের বন্ধু, এ-পাড়ায় আর কার কাচে যাব বলুন বাবু? আমি মুক্যু-সুক্যু মানুষ, কোতায় ভালো ডাক্তার পাওয়া যায়, কি কর্‌তে হয় কিচুই জানি-না যে! আর দেরি কর্‌বেন না,—তাকে আমি অ্যাকলা ফেলে এসেচি!"

জয়ন্তের অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া অবনীর প্রাণটা কেমন আপনা-আপনি ভিজিয়া আসিল! যদিও জয়ন্ত তাহার বন্ধু নয়, তবু এমন অসময়ে তাহাকে সাহায্য করা যে শত্রু-মিত্র সকলেরই কর্ত্তব্য, এটা বুঝিয়া অবনী বলিল, "আচ্ছা, তুমি তোমার

বাবুর কাছে যাও—আমি একেবারে ডাক্তার নিয়ে পরে যাচ্ছি।"

ভজহরি ধড়ে যেন কতকটা প্রাণ পাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

... ...

... ...

ডাক্তার জয়ন্তকে দেখিয়া বলিয়া গেলেন, রোগীর গায়ে বোধহয় বসন্ত ফুটিবে। এত-বেশী জ্বর, ভুল-বকা, গলায় ও কোমরে ব্যথা, এ-সব বসন্তেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ!

অবনী ভারি ভাবনায় পড়িয়া গেল। যদি জয়ন্তের কিছু হয়, তবে সে দায়িত্ব কে ঘাড়ে করিয়া লইবে?

ভজহরিকে ডাকিয়া সে বলিল, "ভজহরি, তোমার বাবুর বাড়ীতে কি এমন কেউ নেই, যিনি এখানে এসে সেবা-শুশ্রূষা কর্‌তে পারেন?"

—"হ্যাঁ, গৌরীদিদি আচে।"

—"তিনি তোমার বাবুর কে?"

—"খোকনের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কতা ছিল। গৌরীদিদি খোকনদের বাড়ীতেই মানুষ হয়েচে গো বাবু!"

—"জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আর-কারুর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল বুঝি? কৈ, তা ত জানতুম না!"

ভজহরি খুব সংক্ষেপে জয়ন্তের বাড়ীর কথা বলিল। জয়ন্ত যে দেশে গিয়া পথ হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাও গোপন রাখিল না। যাহাকে একবার আপন মনে করিত, তাহার কাছে কিছুই ঢাকিয়া রাখিতে পারিত না,—এটা ছিল ভজহরির মস্ত

খোকনকে দেখিতেছে-শুনিতেছে, তাইতেই ভজহরি একেবারে গলিয়া গিয়া তাহাকে পরম আপনজন বলিয়া ধরিয়া লইল!

ভিতরে-ভিতরে এত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, অবনী তা জানিত না। জয়ন্তের অসহায়তা তাহার চোখে আরো করুণ হইয়া জাগিয়া উঠিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষটা বলিল, "ভজহরি, তাহলে তোমার দেশে খবর পাঠালে কেউ কি আস্‌বে না?"

ভজহরি হতাশভাবে মাথা নাড়িল।

অবনী বলিল, "আচ্ছা, তবু খবর ত পাঠানো যাক্‌, তারপর যা-হয় দেখা যাবে। তোমাদের বাসার সাম্‌নের জগৎবাবুকে জান ত?"

—"জানি বৈকি! এই বিপদের সময়ে তিনিও যদি একানে থাক্‌তেন বাবু, তাহলে অনেকটা সুরাহা হ'ত।"

—"হ্যাঁ। তাঁকেও একটা খবর দি। তিনি এলেও আস্‌তে পারেন।"

অবনী তখনি টেলিগ্রাম করিতে চলিয়া গেল।

বাইশ

জ্বরের মাঝখানে জয়ন্তের হঠাৎ একটু সাড় হইল।

সে তাহার কপালের উপরে কাহার দুখানি পদ্মের মতন নরম করপুটের স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিল। এ হাত ত ভজহরির নয়!... ...জয়ন্ত চোখ মেলিতে গেল, পারিল না। তাহার চোখে ভারি বেদনা।

তাহার সারা দেহেও তখন গরম সূঁচের

বিঁধিতেছে,—সে যন্ত্রণা অসহ্য! জয়ন্ত ক্ষীণ কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে, ইন্দু?"

ভজহরি পাশেই বসিয়াছিল; সে বলিয়া উঠিল, "আ আমার পোড়াকপাল! তোমার ইন্দু কোতায়—ওযে গৌরীদিদি! জগৎ-বাবুকে তার করা হয়েছিল, তা তিনি বলে পাঠিয়েচেন, একন আস্‌তে পারবেন না! কিন্তু গৌরীদিদি খপর পেয়েই ছুটে এয়েচে! আপন লোক না-হ'লে কি দরদ হয়,—কি বলেন দেওয়ান-মশাই!"

জয়ন্তের কানে কালিশঙ্করের খক্‌খক্‌ কাশির আওয়াজ গেল। বিস্মিত অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "গৌরী—গৌরী! গৌরী এসেছে—" বলিতে-বলিতে সে আবার নীরব হইয়া পড়িল।

গৌরী জয়ন্তের মাথার উপরে দুখানি থর্‌থরে হাত রাখিয়া চুপ-করিয়া বসিয়া রহিল।

জয়ন্তের সমস্ত দেহে তখন ভীষণ রোগের মারাত্মক চিহ্ন দেখা দিয়াছে,—সেইদিকে চাহিয়া বিহ্বল স্বরে ভজহরি বলিল, "আমার খোকনের যদি কিছু হয়, তাহলে আমি আত্মঘাতী হব। হে মা শীতলা—"

গৌরী দুই ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া ভজহরিকে চুপ করিতে বলিল।

ভজহরি খানিকক্ষণ জয়ন্তের দিকে তাকাইয়া কোন-রকমে মুখ বন্ধ করিয়া রহিল; তারপর আবার বলিল, "আচ্ছা দেওয়ান-মশাই, ডাক্তার-সায়েব কি সত্যি-সত্যিই বলে গেলেন যে, খোকনের চোকের ভেতরেও মার অনুগ্রহ হয়েচে? না, এ

গৌরী তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কী সব কথা বল্‌ছ ভজহরি! যাও, তুমি এখান থেকে চলে যাও!"

ভজহরি কাঁচুমাচু মুখে হাত যোড় করিয়া বলিল, "এবারটা আমায় মাপ কর দিদি!"

—"আচ্ছা, ফের্ কথা কইলে তুমি এখানে আর থাক্‌তে পাবে না!"

ভজহরি দুইহাঁটুর ভিতরে মুখ গুঁজিয়া, লুকাইয়া-লুকাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

সারা দিন গেল। বিছানার উপরে কলাপাতে শুইয়া জয়ন্ত সমস্ত ক্ষণটা খালি ছট্‌ফট্‌-ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে—এ-পাশ ও-পাশ ফিরিয়া, চিৎ হইয়া, উপুড় হইয়া, কোন-রকমে কিছুতেই সে একটুও স্বোয়াস্তি পাইতেছে না—তাহার ক্রমাগত মনে হইতেছে সে যেন হাজার-হাজার ধারালো বর্শার উপরে শুইয়া আছে! ঠোঁটে ঠোঁট্‌ চাপিয়া সে এই মর্ম্মভেদী যাতনা চাপিয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না—তাহার দেহের শত-শত ক্ষতের মুখ দিয়া ভিতরের হাহাকার যেন বাহিরে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে!

বিকৃত মুখে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বারংবার সে বলিয়া উঠিতেছে, "আর পারি না—আর পারি না, মলে যে বাঁচি—এর-চেয়ে মরা ভালো গো, মরা ভালো!"

কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ভজহরির চোখ যেন কানা হইয়া গেল—বৃদ্ধের জীর্ণ বক্ষের মধ্যে এত অশ্রুও ছিল!

গৌরী কিন্তু পাষাণ-প্রতিমার মত অটল হইয়াই আছে। তার প্রাণের ভিতরকার

তাহার চোখের প্রান্তে এতটুকু অশ্রু, তাহার প্রশান্ত মুখে এতটুকু অশান্তির লক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। রোগীর ঔষধ-পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা—যখন যেটির দরকার,—কলের কাঁটার মত গৌরী তা করিয়া যাইতেছে— একটি কথাও না-কহিয়া!

সন্ধ্যার সময় জয়ন্ত কতক-চেতন কতক-অচেতনের মত শুইয়া ছিল; হঠাৎ সে জড়িত স্বরে আস্তে-আস্তে যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "ইন্দু,—ইন্দু, তুমি এলে না—তুমি আমাকে এমন করে' দাগা দিলে!" জয়ন্তের মুদিত চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রোগের এই নরক-যাতনার মধ্যেও ইন্দুর স্মৃতি জয়ন্ত ভুলিতে পারে নাই! গৌরীর প্রাণের কোন্ কোণে যে গভীর ব্যথা তুষানলের মত প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, জয়ন্তের এই কথায় তাহা যেন জ্বলজ্বলে হইয়া উঠিল!—পাছে ভজহরি তাহার মুখ দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া বলিল, "আলোটা বড় বাড়িয়ে দিয়েছ ভজহরি, ওটা কমিয়ে দিয়ে আসি!" ... ... কিন্তু আলোর শিখা না-কমাইয়া গৌরী যে আরো-বেশী বাড়াইয়া ফেলিল, দুঃখ-কাতর ভজহরি অতটা খেয়াল করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে অবনী আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল। গৌরীকে দেখিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া গেল—গৌরীও লজ্জিত হইয়া ভিতর হইতে সরিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

অবনী জিজ্ঞাসা করিল, "ভজহরি, তোমার বাবু এখন কেমন আছেন?"

তাহার স্বর বোধহয় জয়ন্তের কানে গেল—সে চম্‌কাইয়া উঠিল। সেটা অবনীর চোখ এড়াইল না।

তেইশ

জগৎবাবু ভাবিয়াছিলেন, দেওঘরে আসিলে ইন্দুলেখা, জয়ন্তের অভাব শীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছেন, ইন্দুলেখা যেমন ছিল তেমনটি আর হইল না—বরং দিন-কে-দিন যেন আরো-বেশী মন-মরা হইয়া পড়িতেছে।

ইন্দু এখন সকলসময়েই অন্যমনস্ক থাকে, ঘরের ভিতর হইতে সহজে বাহিরে আসিতে চায় না, অকারণে চটিয়া চাকর-বাকরদের ধমক দেয়। আর এই ইন্দুই দুদিন আগে ছিল বিদ্যুতের মত চঞ্চল, তার হাসির কলরোল ছিল ঝরণার মত অবিরল! এখন তাহার চোখের কোলে কালির দাগ ক্রমেই ঘন হইয়া উঠিতেছে, তাহার কপোলের উপর হইতে গোলাপী আভাটুকু ক্রমেই মিলাইয়া আসিতেছে, তাহার নধর দেহখানি ক্রমেই শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

কী যে করিবেন, জগৎবাবু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন ইন্দুকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মা, দিন-কে-দিন তুই এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্ কেন বল্ ত!"

ইন্দু লোক-দেখানো শুক্‌নো হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কি দেখ্‌তে কি দেখ্‌চ, তোমার চশ্‌মার নম্বর বদ্‌লানোর দরকার হয়েচে।"

—"তোর কি এখানটা ভালো লাগ্‌চে না ?"

—"খুব ভালো লাগ্‌চে।"

—"তবে ?"

—"তবে—কি, বাবা ?"

—"তবে তুই অমন মন্‌-মরা হয়ে থাকিস্‌ কেন ?"

—"বাবা, তুমি খালি খালি ভারি এক-কথা কও, যাও,—আর আমি তোমার কথার জবাব দেব না !"

ইন্দুর কপালের উপরকার এলমেল কতকগুলো চুল গোছাইয়া দিতে-দিতে জগৎবাবু বলিলেন, "মা ইন্দু, আমার কাছে লুকোস্‌-নে, সত্যি করে' বল্‌ দেখি বাছা, তুই কি এখনো জয়ন্তকে বিবাহ করতে চাস্‌ ?"

ইন্দু চলিয়া যাইতে-যাইতে নির্ব্বাক ভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিয়া গেল, না।

তারপরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া, অকারণে অত্যন্ত জোরে দুম্‌-করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিল !

… … … …

এর-মধ্যে জগৎবাবু হঠাৎ একদিন অবনীর কাছ হইতে একখানা টেলিগ্রাম পাইলেন :—"জয়ন্তের অত্যন্ত জ্বর ; বসন্ত হবার সম্ভাবনা ; আপনি কল্‌কাতায় এলে ভালো হয় ; রোগীকে দেখ্‌বার লোক নেই।"

টেলিগ্রাম পাইয়া জগৎবাবুর মন প্রথমটা একটু নরম হইয়াছিল—কারণ, জয়ন্তকে- … বাসিতেন। কিন্তু তারপরেই তাঁহার মনে পড়িল জয়ন্তের চরিত্রের কথা ! বুঝিলেন, এখন কলিকাতায় গেলে চলিবে না। জয়ন্তের সঙ্গে তিনি যখন কিছুতেই ইন্দুর বিবাহ দিতে পারিবেন না, তখন এ-দুজনের মধ্যে যাহাতে আর-না দেখাসাক্ষাৎ হয়, এখন তাঁহার তাহাই করা কর্ত্তব্য—তিনি পিতা, আগে তাঁহাকে আপন মেয়ের শুভাশুভ দেখিতে হইবে ত !… …আর, জয়ন্ত এখনো তাঁহার উপরে নির্ভর করিতেছে কেন ? সে ধনীর ছেলে, দেশে তার আত্মীয়-স্বজন সব আছে,—ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরিয়া যাক্‌ না ! তিনি পর, তাঁহাকে লইয়া এত টানাটানি কেন ? সে কি ভাবিয়াছে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন ? না, অসম্ভব !

সুতরাং উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম করিলেন —"জয়ন্ত দেশে নিজের বাড়ীতে ফিরে যাক্‌ ; এখন আমার যাওয়া চল্‌বে না।"

অবনীর টেলিগ্রামখানি জগৎবাবু ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ; পাছে ইন্দুর মন চঞ্চল হয়, সেই ভয়ে তাহাকেও কিছু বলিলেন না।

জগৎবাবু এত সন্তর্পণে আট-ঘাট বাঁধিয়া চলিয়াও ইন্দুর মনকে কিছুতেই ভালো করিতে পারিলেন না। অবশেষে, এমন চমৎকার জল-হাওয়াতেও ইন্দুর রোজ ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর হইতে লাগিল। এই-সব দেখিয়া-শুনিয়া জগৎবাবু বিদেশবাসের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইন্দু হঠাৎ গোঁ ধরিয়া বাঁকিয়া বসিল, সে কোনমনেই

ইন্দু তাঁহার মেয়ে, তাঁহার কোলেই সে মানুষ, তাহার চরিত্রের সমস্তই তিনি বুঝিতেন; তবু আজ তাঁহার কাছে এই তরুণী মেয়ের মনটি একটা বিষম হেঁয়ালির মত খাপছাড়া ঠেকিল।

আশ্চর্য্য হইয়া তিনি বলিলেন, "কল্‌কাতায় যাবি-নি কি রে?"

ইন্দু দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, আমি এখানেই থাক্‌ব!"

—"এখানকার জল-হাওয়া তোর যে সহ্য হচ্ছে না!"

—"এখানকার জল-হাওয়া যদি আমার সহ্য না-হয়, তবে কল্‌কাতার ধূলো আর ধোঁয়া আরো অসহ্য হবে!"

—"কিন্তু—"

—"যতই 'কিন্তু' বল আর যতই ঘাড় নাড়ো বাবা, আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়্‌ব না, কিছুতেই না! দেখ দেখি—" এই বলিয়া ইন্দু ঘরের জান্‌লাটা খুলিয়া দিল। তারপর বাহিরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "দেখ দেখি বাবা, এখানে কেমন নীল আকাশ, কেমন ছবির মতন পাহাড়, কেমন খোলা মাঠ, সবুজ বন, ঢেউ-খেলানো নদী! এ দেখ্‌লে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! এ-সব ছেড়ে কল্‌কাতায় আমি যেতে চাই না। আস্‌বার সময়ে তুমি আমাকে জোর করে' নিয়ে এসেছ, এখন যাবার সময়ে তুমি যতই জোর কর, আমি এখন যাচ্ছি না বাবা!"—এই বলিয়া ইন্দু খুব হাসিতে লাগিল।

ইন্দুর হাসি দেখিয়া জগৎবাবু অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু জগৎবাবু যেই অদৃশ্য হইলেন, ইন্দুর মুখের ভাব অম্‌নি ধীরেধীরে বদ্‌লাইয়া গেল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে উদাস ভাবে বিছানায় গিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে নিপুণ অভিনেত্রীর মত পিতাকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এখন বাহিরের অভিনয়ে আপনার ভিতরের মনকে সে কিছুতেই বোঝ্‌ মানাইতে পারিল না।

এইভাবে আরো-কিছুদিন কাটিয়া গেল।

সেদিন দুপুরে কি-একটা কারণে জগৎবাবু যখন প্রিয়ভৃত্য মাণিকচাঁদকে উচ্চৈস্বরে ধমক্‌ দিয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং মাণিক যখন সে ধমক্‌ একটুও আমোলে না-আনিয়া হাতের আড়ালে নীরবে হাস্য করিতেছে, তখন ডাকপিয়ন আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল।

জগৎবাবু ধমক্‌টা আপাতত বন্ধ রাখিয়া পত্রখানা খুলিলেন। পত্রখানা অবনীর। সে লিখিয়াছে:—

"শ্রদ্ধাস্পদ জগৎবাবু,

জয়ন্তের অসুখের জন্যে এত ব্যস্ত ছিলুম যে, আপনাদের কোন খবর নিতে পারি-নি। সেজন্যে কিছু মনে কর্‌বেন না।

আমার টেলিগ্রামের আপনি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা-থেকে বুঝেছি এখনো আপনি জয়ন্তের উপরে বিরূপ হয়ে আছেন। কিন্তু আমার এই চিঠিখানি পড়্‌লেই বুঝ্‌বেন যে, জয়ন্তের উপরে রাগ করে' তার প্রতি আপনি কতটা নিষ্ঠুর অবিচার করেছেন!

আপনি জানেন না, জয়ন্ত কী হতভাগ্য! আপনি এখান থেকে চলে যাবার পর ক্রমাগত

দুঃখ-শোকের আঘাতে সে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। তার মা মারা গেছেন, পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ থেকে,,—আপনার কন্যাকে ভালোবেসে বঞ্চিত হয়েছে, দেশের ভদ্রাসনে তার আর মাথা রাখ্‌বার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু এত নির্য্যাতনের পরেও সে শান্তি পেলে না—আরো-এক ভীষণ দুঃখ এসে তাকে জীবন্মৃত করে' দিয়ে গেছে। রাস্তায় বসন্তরোগে মৃতপ্রায় একটা ভিখারীকে বাঁচাতে গিয়ে, সে আপনিই ঐ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল—এ-যাত্রায় কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও এ-জীবনে পৃথিবীকে সে আর দেখ্‌তে পাবে না,—তাকে অন্ধ হয়ে থাকতে হবে!"

এই-পর্য্যন্ত পড়িয়াই জগৎবাবু আঁৎকাইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার হাত হইতে খসিয়া চিঠিখানা মাটির উপরে গিয়া পড়িল। আপনা-আপনি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "কি ভয়ানক—কি ভয়ানক! অন্ধ? ... ... জয়ন্ত অন্ধ?"—তাঁহার বুকটা শিহরিয়া উঠিল!

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত মুখে তিনি আবার বসিয়া পড়িলেন এবং পত্রখানা মেঝে হইতে কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় পড়িতে লাগিলেন :—

"আপনাকে আর-একটি বিশেষ সংবাদ দিচ্ছি। আপনি সেদিন দুশ্চরিত্র বলে জয়ন্তকে যে অপমান করেছিলেন, সেটা আপনার পক্ষে সুবিচার হয়-নি; কারণ, সে নির্দ্দোষ। একজন ভালো গায়কের গান শুনিয়ে আন্‌বে, এই অছিলায় ভুলিয়ে জয়ন্তকে, আমাদেরই স্বর্ণেন্দু কুস্থানে নিয়ে যায়। জয়ন্ত সরল মনেই স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে গিয়েছিল,—সে যে কোন গায়িকার বাড়ীতে যাচ্ছে, ঘুণাক্ষরেও এমন সন্দেহ করতে পারে-নি। তারপর যখন সে আসল ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পারে তখন সুবিধা পাবা-মাত্রই সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসে। জয়ন্তের উপর স্বর্ণেন্দু অত্যন্ত চটা; তাইতেই সে এ-হেন ষড়যন্ত্র করে' মনের ঝাল ঝেড়েছে। আমি আসল সত্যটা জান্‌তে পেরেছি স্বর্ণেন্দুর নিজের মুখ থেকেই; সুতরাং জয়ন্ত যে নিরপরাধ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অনেকসময়ে চাক্ষুষ প্রমাণও যে যথেষ্ট প্রমাণ নয়, এ-থেকে আপনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাবেন।

"এত দুঃখ-শোক অপমান-নির্য্যাতনেও, ভীষণ রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও জয়ন্ত আপনার কন্যাকে ভুল্‌তে পারে-নি—এমন-কি, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকৃতে-বকৃতেও সে খালি 'ইন্দু ইন্দু' করে' কাত্‌রে উঠেছে! তার প্রেম যে এত গভীর, আমি তা জান্‌তুম না। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনার টেলিগ্রামের উত্তর তার কানে গিয়েছে। বিছানায় পড়ে রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে-কর্‌তেও সে বারংবার বলেছে, "আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা শুনেও ইন্দু এল না!" আপনার উত্তরটা বোধহয় অসুখের চেয়েও নিদারুণ হয়ে তার প্রাণে গিয়ে বেজেছে।

জগৎবাবু, আপনার যা কর্ত্তব্য আপনি তা বিবেচনা করুন। আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনায়। নমস্কার। ইতি

স্নেহপ্রার্থী

অবনী।"

পত্রপাঠ যখন সাঙ্গ হইল, জগৎবাবুর বুকের স্পন্দন তখন যেন থামিয়া গেল! পাষাণীভূতের মত নিশ্চল হইয়া বহুক্ষণ তিনি বসিয়া রহিলেন;—তারপর রুদ্ধ যন্ত্রণার আবেগে দুইহাতে কপালের দু-পাশ চাপিয়া ধরিয়া সাম্‌নের টেবিলের উপরে মাথা রাখিলেন—তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি এমন ভাবে আর-কখনো আহত হয় নাই! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, জয়ন্তের সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য তিনিই দায়ী—একমাত্র তিনিই দায়ী! কোনমতেই আত্মসংবরণ করিতে না-পারিয়া শেষকালে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! তুমি আমাকে ক্ষমা কর,—আমি নরাধম—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—সুধু, তুমি আমাকে ক্ষমা কর!"

পাশের ঘরে জানলার ধারে বসিয়া ইন্দু তখন উদাস চোখে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়া অবধি, তাহার দুঃখ-দীর্ণ চিত্তের কাছে এখন সুধু একমাত্র সান্ত্বনা, ধরণীর এই শ্যামল মুখ। ... ... খানিক দূরে দুধারের আকের আর অড়রের ক্ষেতের মাঝখানে, শুক্‌নো নদীর সাদা বালির বাঁকা রেখাটি যেন নিঝুম দুপুরের ভরা-রোদে গা-এলাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মাঝে মাঝে পায়ের তলায় চলন্ত ছায়া ফেলিয়া, চাষার মেয়েরা বালি খুঁড়িয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে; তীরের এদিকে-ওদিকে ছোট ছোট দল বাঁধিয়া কতকগুলো গরু, মোষ ও ভেড়া চরিতেছে; কোথাও-বা উঁচু-নিচু পাথরের ঢিপির উপরে দু-চারটে বক ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে যেন ছবিতে আঁকা। অনেক দূরে আকাশ-পৃথিবীর সীমারেখা আড়াল করিয়া, পাষাণে-পরিণত মস্ত-একটা স্থির-মেঘের মত কালো পাহাড় হুম্‌ড়ি খাইয়া আছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে আলোক-ছায়ার বিচিত্র পরিবর্ত্তন! ... ... এম্‌নি-সব নানান দৃশ্যের মাঝে ইন্দুর দৃষ্টি লক্ষ্যহীনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এমনসময় হঠাৎ তার কাণে পিতার অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর আসিয়া ঢুকিল। সচমকে, বিস্মিত ভাবে সে বলিয়া উঠিল—"বাবা, তুমি কি বল্‌ছ?"

যাতনায় অস্বাভাবিক কণ্ঠে জগৎবাবু ডাকিলেন, "ইন্দু—ইন্দু!"

ইন্দু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল; কিন্তু পিতার মুখ দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল!

জগৎবাবু টেবিলের উপরে পত্রখানার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন,—মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না।

পত্র পড়িতে-পড়িতে ইন্দুর মুখের সমস্ত রক্ত যেন জল হইয়া গেল—তারপর চিঠি-পড়া শেষ-হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে মাটির উপরে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িল। ... ...

জগৎবাবু তাহাকে যখন কোলে করিয়া তুলিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিলেন, ইন্দু তখন অনেকটা সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছে।

আস্তেআস্তে বিছানা হইতে নামিয়া, সে রুদ্ধ—তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল, "বাবা!"

জগৎবাবু মুখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—"বাবা, অবনীবাবুর টেলিগ্রামের কথা ত তুমি আমাকে বল নি?"

জগৎবাবু আজ তাঁহার নিজের মেয়ের সুমুখেই দোষীর মত মাথা হেঁট্ করিলেন।

—"বুঝেছি বাবা, পাছে আমার ভাব্না বাড়ে, সেই ভয়েই টেলিগ্রামখানা তুমি আমাকে দেখাও-নি! কিন্তু আজ্কের চেয়েও কি সেদিনকার ভাব্না বেশী গুরুতর হ'ত বাবা? এখন যে চিরজীবন ভাব্তে হবে!"

জগৎবাবু নিরুত্তর।

—"নাও বাবা, জিনিষপত্তর্ সব বাঁধ্তে হুকুম দাও,—আমরা আজ্কেই কল্কাতায় ফির্ব।"

চব্বিশ

—"গৌরী!"

—"বল।"

—"তুমি কি এখনো বসে আছ?"

—"হ্যাঁ।"

—"না, আর তোমাকে জেগে থাক্তে হবে না গৌরী! আমি ভালো আছি। যমের মুখ থেকে যে খসে পড়েছে, তার জন্যে আর ভয় কি?"

—"অমন কথা বোলোনা গো, আমার বড় কষ্ট হয়।"

—"যারা আমাকে ভালোবাসে তাদের কষ্ট দেওয়াই আমার স্বভাব। দেখ্‌চ-না, মাকে এত কষ্ট দিলুম যে, তিনি এ পৃথিবীতে কিছুতেই আর টিক্‌তে পার্‌লেন না! আজ মা ত নেই, খালি তুমি আছ। এখন তোমাকে কষ্ট দেব-না ত আর কাকে দেব বল?"

—"তুমি ঘুমোও গো, ঘুমোও! দেখ্‌ছ না, রাত যে অনেক হ'ল।"

—"রাত হ'ল কি দিন হ'ল সে খোঁজ তারা রাখুক্—দিন-রাত যাদের জন্যে। জাননা, অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন!"—

—জয়ন্ত পাগলের মত কঠোর হাস্য করিল। সে হাস্য গৌরীর বুকের হাড়গুলোর উপরে ধাক্কা মারিয়া যেন বজ্রের মত ধ্বনিয়া উঠিল! দু-হাতে ভর্ দিয়া আস্তে-আস্তে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া জয়ন্ত উর্দ্ধমুখে বলিল, "গৌরী, পৃথিবীতে কি এখনো চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, আলো জাগে? এখনো কি আকাশ তেম্‌নি নীল, গাছ তেম্‌নি সবুজ, ফুল তেম্‌নি রাঙা? আমার কাছে কিন্তু সব মুছে গেছে—একেবারে, একেবারে! আমার মনের ভিতরে যে মস্ত জগৎ ধূ-ধূ কর্‌ছে, সেখানে আর চাঁদ হাসে না, সূর্য্য ওঠে না, রং ফোটে না—সেখানে এখন সুধু একজন বাসিন্দা আছে, দিন-রাত সে সুধু অবিরাম স্তব্ধতার ধ্যান কর্‌ছে—তার নাম, অন্ধকার! তাকে তোমরা জান—কিন্তু আমার মত স্পষ্ট করে' তাকে তোমরা কেউ দেখ-নি, কেউ দেখ-নি!"—জয়ন্তের স্বরে কী গভীর ক্রন্দনের সুর!

গৌরী আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি থামো!"

জয়ন্ত আবার বিছানায় এলাইয়া পড়িল। প্রাণের আবেগ তাহার দেহ ভাঙিয়া যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "গৌরী, মার অভিশাপে আজ আমি এমন হতভাগ্য!"

—"মা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন! এমন কথা মুখেও এন না!"

—"দেখ্‌ছ, আমার কি পাপ মন! নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আবার মাকে দুষ্‌ছি! তাঁর অভিমানকে অভিশাপ মনে করছি! বাইরের চোখের সঙ্গেসঙ্গে আমার মনের চোখও অন্ধ হ'ল নাকি?"

গৌরী নিসাড় হইয়া রহিল। জয়ন্তও নীরবে আনমনে কি ভাবিতে লাগিল।

থানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে এখন আর কেউ আছে?"

—"না।"

—"আচ্ছা, তাহলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।... ...তুমি কি এখনো আমাকে ভালোবাস?"

গৌরী স্তব্ধ।...অন্ধ জয়ন্ত দেখিতে পাইল না গৌরী কেমন-করিয়া তাহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে,—তাহার দৃষ্টি কী মমতা-ভরা!

—"এই অন্ধ, রোগের ক্ষতে কুৎসিত, অকৃতজ্ঞ জয়ন্তকে এখন এ-দুনিয়ায় কেউ ভালোবাস্‌বে না গৌরী, কেউ ভালোবাস্‌বে না। বোধহয়, তুমিও না।"

গৌরী জোর-করিয়া কথা কহিল। ব্যথাভরা স্বরে বলিল, "অন্ধ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা কর্‌ব? ... ...আমি?"

জয়ন্তের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! দুই হাতের দুই মুঠোর মধ্যে বিছানার চাদর চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "তাহলে তুমি এখনো আমাকে ভালোবাসো! বেস না গৌরী, আমায় ভালো বেসনা! তোমার ভালোবাসা আমি তোমাকে কি-করে' ফিরিয়ে দেব? আমি ত তোমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌ব না! তোমাকে স্নেহ কর্‌তে পারি বোনের মত—কিন্তু আমার প্রাণে তুমি আর-কিছু খুঁজে পাবে না। তোমার সঙ্গে আমি কপটতা কর্‌তে চাই না। এ মন যাকে সমস্ত সমর্পণ কর্‌তে চেয়েছিল, অসময়ে সে আমাকে ত্যাগ করেছে। তাকে যেমন ভালোবেসেছিলুম, তেমন ভালোবাসা আর ত আমি তোমাকে দিতে পার্‌ব না! গৌরী, আমার এই নিষ্ঠুর সত্যকথায় তুমি রাগ কোরো না! বল, এ-কথার পরেও তুমি কি আমাকে ত্যাগ কর্‌বে না?"

কোনক্রমে কান্না চাপিয়া লজ্জার বাঁধ ভাঙিয়া গৌরী বলিল, "তুমি আমাকে ঘৃণা কর—কিন্তু আমি সুধু তোমার ঐ পা-দুটি পূজো কর্‌তে চাই—সে অনুগ্রহ থেকে আমাকে আর বঞ্চিত কোরো না!"

জয়ন্তের সাম্‌নে গৌরী কখনো তাহার মনের কথা এমন-করিয়া আর বলে নাই—বলিতে পারে নাই! প্রাণের দায়ে ভীরুও নির্ভীক হইয়া উঠে!

জয়ন্ত ধীরে-ধীরে বলিল, "গৌরী, আমি তোমার সঙ্গে যে নির্দ্দয় ব্যবহার করেছি, সে-সব ভুলে করুণাময়ী দেবীর মত তুমি আমার এই রোগশয্যার শিয়রে বসে এসে আছ—দিন-রাত্রি আহার-নিদ্রা ভুলে। তোমার সেবা-শুশ্রূষা না-পেলে এ-পৃথিবী থেকে নিষ্ঠুর জয়ন্তের নাম এতদিনে মুছে যেত। যে প্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ, সে প্রাণের উপরে এখন তোমারি অধিকার। এ অধিকার থেকে তোমাকে আমি বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু ভেবে দেখ গৌরী,—আমি অন্ধ, কুৎসিত,

জীবন্মৃত। আমার এ-দেহ এখন পাথরের মত, এতে আর একবিন্দুও প্রেম নেই। দুর্ব্বহ একটা বোঝার মত, তুমি কি সারা-জীবন আমাকে ঘাড়ে করে' বইতে পার্‌বে ?" —এই-বলিয়া জয়ন্ত গৌরীর একখানি হাত লইয়া আপনার বুকের কাছে টানিয়া আনিল।

গৌরীর হাত জয়ন্তের মুষ্টির মধ্যে কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা ফুটিল না।

—"গৌরী, তোমার রূপ আছে গুণ আছে অর্থ আছে। ইচ্ছে কর্‌লে তুমি রাজার রাণী হ'তে পার। তবে কেন তোমার জীবনকে ব্যর্থ কর্‌তে চাও ? দেখ, এখনো ভেবে দেখ, যে ভুল তুমি কর্‌তে চাইছ—সে ভুল একবার কর্‌লে জীবনে আর শোধ্‌রাতে পার্‌বে না—"

জয়ন্তের কথায় গৌরীর দেহ কেমন-একটা বিহ্বলতার আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; তাহার গোপন প্রাণের মধ্যে যে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা এতদিন শৈল-কন্দরে বন্দী নির্ঝর-স্রোতের মত আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছিল,—আজ যেন সে বাহিরে আসিবার রন্ধ্র খুঁজিয়া পাইল। আজ আর সে আপনাকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না,—আচম্বিতে জয়ন্তের কোলের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বাসরুদ্ধ অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওগো, থাক্—থাক্, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না! এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি—এই ভুল যেন আমি জন্মে-জন্মে করি!"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর গাঢ়, কোমল স্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভেবেছিলুম আমার এ ব্যর্থ জীবনটা নির্জ্জল, নির্জ্জন, মরুভূমির মত সংসারের বাইরে পড়ে চিরকাল হা-হা করে' মর্‌বে; কিন্তু তার মাঝখানে তুমি যখন নদীর একটি স্নিগ্ধ ধারার মত কোন নিষেধ না-মেনে বয়ে আস্‌তে চাইছ, তখন এস গৌরী, তোমাকে বাধা দেবার শক্তি আর আমার নেই! দেখ, যদি এ মরু-প্রাণ তোমার প্রেমের রসে আবার একটু সরস হয়, এর জ্বলন্ত তৃষা তোমার স্পর্শে আবার যদি শান্ত হয়!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হিন্দুদিগের মস্তকাবরণের পুরাতত্ত্ব

হিন্দু বাঙ্গালীর বর্ত্তমানে জাতীয় মস্তকা-বরণের ব্যবহার না দেখিয়া অনেকেরই মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদিগের জাতীয় কোন মস্তকাবরণ ছিল না। এই ধারণাটী যে ইতিহাসের প্রমাণে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা আমাদের আলোচনা দ্বারাই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মস্তকাবরণের প্রথম উদ্দেশ্য মস্তককে শীতাতপের প্রভাব হইতে রক্ষা করা। মনুষ্য কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বে যে, স্বাভাবিক উপায়ে মস্তক-আবরণের চেষ্টা

পাইবে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। প্রথমাবস্থায় মস্তকের কেশচ্ছেদন কখনও সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তৎকালে মস্তকের কেশ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়া যে জটারূপে পরিণত হইত, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই জটিল কেশ মস্তকে বদ্ধ হইয়াই প্রথম শীতাতপ নিবারণ করিত। শিব ও দুর্গা উভয়েরই যে আমরা "জটাজূটের" উল্লেখ প্রাপ্ত হই, তাহাতেই আমরা মানুষের উল্লিখিত আদিম অবস্থা প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

ক্রমে কেশের পরিপাট্য বিধানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কেশ সকল মস্তকে সংযত হইয়াই মস্তকাবরণের কার্য্য করিতে লাগিল। এই সংযত কেশের কার্য্য অধিকরূপে সম্পাদন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তকের শোভা সংবর্দ্ধনের জন্যই শিরোভূষণের কল্পনাও রচনা হয়। শিরোভূষণের কয়েকটী নামের আলোচনা হইতেই পুরাতত্ত্বের এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। শিরোভূষণের নাম 'কিরীট' ও 'মুকুট'। 'মৌলি' শব্দ অমরকোষে এইরূপে 'কিরীট' ও 'সংযত কেশ' উভয়ার্থ-বাচী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে :—"চূড়া কিরীটং কেশাশ্চ সংযতা মৌলয়স্ত্রয়ঃ ॥" 'মুকুট' শব্দও মৌলী বা সংযত কেশের অর্থই প্রকাশ করে। 'চূড়া' শব্দ মুকুটাদির অগ্রভাগ যেমন বুঝায়, তেমনই শিখা বা কেশগুচ্ছকেও বুঝায় যথাঃ—"শিখাচূড়া কেশপাশী" ইত্যমরঃ।

ইহা হইতে মস্তকের উপর শিখাকারে বদ্ধ কেশরাশির অনুকরণেই যে মুকুট বা কিরীটের কল্পনা হইয়াছে, তাহাই অনুমিত হয়।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক বোধ হয় যে, 'চূড়া' শব্দের রূপান্তরেই সাধারণ প্রচলিত 'চুল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। চুলশব্দ কেশের বাচক হইলেও কেশ যে আদিকালে চূড়াকারে বদ্ধ হইত, তাহাই ইহার মূল চূড়া শব্দের সহিত যোগ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

'কিরীট' ও 'মুকুট' বিশেষ শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়াই বোধ হয়। সচরাচর যে মস্তকাবরণের ব্যবহার হইত, তাহা অন্য প্রকারের ছিল। ইহার নাম ছিল "উষ্ণীষ"। ইহার পর্য্যায় শব্দ সকল অভিধানে এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে 'বেষ্টন, বেষ্টক, শিরোবেষ্ট, চেলোণ্ডুক।' শব্দকল্পদ্রুমে "পাগড়ী" ইতিভাষাঃ বলিয়া ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'শিরোবেষ্ট' শব্দের দ্বারা পাকে পাকে মস্তক বেষ্টন করিয়া যে বস্ত্র বদ্ধ হইত তাহাই যে 'উষ্ণীষ' বলিয়া কথিত হইত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উষ্ণীষ যে কিরীট হইতে পৃথক্‌রূপ মস্তকাবরণ, অমরকোষে ইহার যে নানা অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই জানিতে পারা যায়, যথা :—

"উষ্ণীষঃ শিরোবেষ্টে কিরীটাদ্যোঃ ॥" "উষ্ণীষ' শব্দের শিরোবেষ্ট ও কিরীট এই দুই অর্থ।"

উষ্ণীষ শব্দ কিরীটেরও বাচক হওয়াতে উষ্ণীষ বা পাগড়িই যে প্রচলিত মস্তকাবরণ ছিল এবং কিরীট উহারই অনুকরণে বিশেষ শিরোভূষণরূপে কল্পিত হইয়াছিল, এই তথ্যই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

উষ্ণীষ যে বৈদিক কালের ঋষিদিগেরই মস্তকাবরণ ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়। "লোহিতোষ্ণীষা ঋত্বিজশ্চরন্তি"

অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটী অতীব সুপরিজ্ঞাত দৃষ্টান্ত। ইহাতে লোহিতোষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক ঋত্বিক্ যে যজ্ঞ-ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তমান হইত, তাহাই জানিতে পারা যাইতেছে। বর্ত্তমান বৈদিক কার্য্যে সেই পূর্ব্বনিয়মের অনুবর্ত্তনেই উষ্ণীষের জন্য রক্তবর্ণ বস্ত্রের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথানিয়মে উষ্ণীষ রচনা না হইলেও পুরোহিত সেই রক্তবস্ত্র দ্বারা মস্তক বেষ্টন করিয়াই ক্রিয়া করিয়া থাকেন। এইরূপে বিলুপ্ত প্রথার নিদর্শন আমাদের দেবকার্য্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উষ্ণীষ ধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক প্রমাণ ব্যতীত পৌরাণিক বহুল প্রমাণই পাওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম প্রবেশেই আমরা উষ্ণীষ-ধারণের উল্লেখ প্রাপ্ত হই, যথা :—

"চীর্ণব্রতোঽথ যুক্তাত্মা সশক্তঃ স্নাতুমর্হতি ॥
বৈণবীং ধারয়েদ্ যষ্টিমন্তর্ব্বাসস্তথোত্তরম্ ॥
যজ্ঞোপবীত দ্বিতয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥
ছত্রঞ্চোষ্ণীষমমলম্ পাদুকেচাপ্যুপানহৌ।
রৌক্মেচকুণ্ডলে ধার্য্যে ন্যুপ্তকেশনখঃ শুচিঃ ॥"

কূর্ম্মপুরাণে উপরিভাগে ১৫শ অধ্যায়ঃ।

"আচরিতব্রত, বিশুদ্ধচেতাঃ, শক্তিমান্ ব্যক্তিই সমাবর্ত্তন স্নানের অধিকারী। স্নাতক, বংশযষ্টি, অন্তর্ব্বাস, উত্তরীয়-বস্ত্র, যজ্ঞোপবীতদ্বয় ও জলসহিত কমণ্ডলু, এই সকল ধারণ করিবে। নখ কেশ কর্ত্তন করিয়া, শুচি হইয়া ছত্র, নির্ম্মল উষ্ণীষ, চর্ম্ম-পাদুকা, কাষ্ঠ-পাদুকা স্বর্ণকুণ্ডল ধারণ করিবে।"

এস্থলে সমাবর্ত্তনের পর উষ্ণীষ ধারণের করা হইত না ইহাই প্রতিপন্ন হয়। মনুতে ব্রহ্মচারীর ছত্রাদি বর্জ্জনের বিধি দেখা যায়, যথা :—

"অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষোরুপাণচ্ছত্র ধারণম্ ॥"

"গাত্রে তৈলমর্দ্দন, চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান, ছত্র ও পাদুকা ধারণ ব্রহ্মচারী পরিত্যাগ করিবে।" ছত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণীষও বর্জ্জিত হইত বলিয়াই বোধ হয়, তাহাতেই সমাবর্ত্তনের পর ছত্রাদির সহিতই উষ্ণীষ-ধারণও উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরে পুরাণের সমাবর্ত্তন বর্ণনায় কেশ কর্ত্তনের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মচারী যে দীর্ঘ কেশ ধারণ করিত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এই দীর্ঘ কেশের দ্বারাই উষ্ণীষের কার্য্য হইত বলিয়াই তখন উষ্ণীষের কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া বোধ হয়।

গৃহিদ্বিজের নিত্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে এই প্রকারে উষ্ণীষ ধারণের বিধান দৃষ্ট হয় :—

যজ্ঞোপবীত দ্বিতয়ং সোত্তরীয়ঞ্চ ধারয়েৎ ॥
সুবর্ণকুণ্ডলে চৈব ধৌতবস্ত্রদ্বয়ংতথা ॥
অনুলেপন লিপ্তাঙ্গঃ কৃত্তকেশনখঃ শুচিঃ ॥
ধারয়েদ্বৈণবং দণ্ডং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম ॥
উষ্ণীষমমলংছত্রং পাদুকে চাপ্যুপানহৌ ॥
ধারয়েৎ পুষ্পমাল্যেচ সুগন্ধে প্রিয়দর্শনঃ ॥
নিত্যমধ্যায়শীলঞ্চ যথাচারং সমাচরেৎ ॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ ২৪শ অধ্যায়।

"দ্বিজগণ, উত্তরীয়সহ যজ্ঞোপবীতদ্বয়, সুবর্ণময় কুণ্ডল-যুগল, বৈণবদণ্ড, সজল কমণ্ডলু, উষ্ণীষ, নির্ম্মল ছত্র, পাদুকাযুগল ও উপানৎ-যুগল এবং সুগন্ধ পুষ্পমাল্য ধারণ করিবে। সতত পবিত্র থাকিবে, কেশ ও নখ ছেদন

চন্দনাদি লেপন এবং যথাবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।”

গৃহীর সাধারণ জীবন-ব্যাপারের মধ্যে উষ্ণীষ-ধারণ এই প্রকারে অন্তর্ভূত হইয়াছে :—

“ধারয়েদ্বৈণবীং যষ্টিমন্তর্ব্বাসস্তথোত্তরম্।
যজ্ঞোপবীতদ্বিতয়ং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম॥
ছত্রঞ্চোষ্ণীষমমলং পাদুকে বাপ্যুপানহৌ।
রৌক্মেচ কুণ্ডলে নিত্যং কৃত্তকেশনখঃ শুচিঃ॥
“শুক্লাম্বরধরো নিত্যং সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ।
নজীর্ণমলবদ্বাসা ভবেদ্বৈ বিভবে সতি॥”

সৌরপুরাণ ১৭শ অধ্যায়।

“গৃহী বেণুযষ্টি, অন্তর্বাস, বস্ত্র, উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত দ্বিতীয়, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, ছত্র, নির্ম্মল উষ্ণীষ এবং পাদুকাযুগল অথবা উপানৎ যুগল আর সুবর্ণকুণ্ডলদ্বয় নিত্য ধারণ করিবে। ছিন্নকেশ, ছিন্ন নখ, শুচি, শুক্লবস্ত্রধারী, সুগন্ধ ও প্রিয়দর্শন হইবে। বিভব থাকিলে, জীর্ণ বা মলিনবস্ত্র পরিবে না।”

আহারের সময় শিরোবেষ্টন ও উপানৎ পরিত্যাগের বিষয় পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

“যদ্ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিত শিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যোভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বংবিদ্যাত্তদাসুরম্॥”

কূর্ম্মপুরাণে উপরিভাগে ২১শ অধ্যায়ঃ।

“বেষ্টিতশির হইয়া, বিদিঙমুখ হইয়া (অগ্ন্যাদিকোণে মুখ ফিরাইয়া) কিংবা চর্ম্ম-পাদুকা পরিধান করিয়া ভোজন করিলে সেই ভোজন অসুরের তৃপ্তিকর হয় জানিবে।”

এ-সম্বন্ধে মনুসংহিতায়ও তুল্যরূপ ব্যবস্থাই

“যদ্বেষ্টিত শিরাভুঙ্‌ক্তে যদ্ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে তদ্বৈরক্ষাংসিভুঞ্জতে॥”

৩য় অধ্যায়।

ইহা হইতে ভোজনকালে ব্যতীত অন্য সময়ে যে উষ্ণীষ-ধারণের নিয়ম ছিল তাহা স্বতঃই উপপন্ন হয়।

উষ্ণীষ ব্যতীত অন্য প্রকারের মস্তকা-বরণের প্রমাণও আমরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হই। এই আবরণের নাম “শিরস্ত্রাণ”।

উষ্ণীষ যেমন পাগড়ীর ন্যায় আবরণ, ইহা তেমনই টুপির ন্যায় আবরণ। শিরস্ত্রাণ বিশেষরূপে যুদ্ধাস্ত্ররূপেই আমাদের নিকট পরিচিত। ইহার নাম হইতেই শিরঃ বা মস্তকের রক্ষাই যে ইহার কার্য্য, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। অমরকোষ অভিধানে শিরস্ত্র শব্দ যুদ্ধোপকরণবাচী শব্দ সকলের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যথা :—

“অথ শীর্ষকম্।
শীর্ষণ্যঞ্চ শিরস্ত্রে॥”

“শীর্ষণ্য” শব্দ যেমন শিরস্ত্রাণের বাচক, তেমনই ইহা নির্ম্মল কেশেরও বাচক, যথা :—

“শীর্ষণ্য শিরস্যৌ বিশদেকচে॥” ইত্যমরঃ।

এই প্রকারে “শিরস্ত্র” বা টুপিরূপ মস্তকাবরণের সহিতও মূলে চুলেরই যোগ দেখা যাইতেছে।

একই ‘শীর্ষণ্য’ শব্দ নির্ম্মল চুল ও টুপির বাচক হওয়ায় টুপি যে বিলাসোপকরণরূপেই নির্ম্মল চুলের উপর ব্যবহৃত হইত, তাহারই যেন আভাস পাওয়া যায়।

বৈদিক ও পৌরাণিককালে যেমন উষ্ণীষ

ধারণের সাধারণ রীতি দেখা যায়, তান্ত্রিক-কালে তেমনই শিখাধারণের সাধারণ রীতি দেখা যায়। তাহাতেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে বৈদিক ক্রিয়ার ন্যায় উষ্ণীষের কোন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না; তাহাতে তৎপরিবর্ত্তে শিখা বন্ধনেরই বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয়। তান্ত্রিক দীক্ষায় শিখাধারণ বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিখাধারণ যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। শিখাদ্বারা উষ্ণীষ এই প্রকারে স্থানচ্যুত হইয়াই ক্রমে ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দু যদি কোন মস্তকাবরণ নিজের জাতীয় মস্তকাবরণ বলিয়া দাবী করিতে চায়, তবে প্রাচীন উষ্ণীষকেই নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

চোখের দেখা

ঘাটের পথে বটের ছায়া তলে
একটু দাঁড়ায় অন্য মনের ছলে,
একটু আঁধার একটু আলোর মেলা—
যুঁইটি ফোটার বেলা,
ভুরুর কোণা সুরু কোথায় নজর নাহি চলে,
হয় না ঠাহর চুলের ছায়া তলে।

ঠোঁটের রাঙা—চোখের হাসি কালো—
নিশীথ-সাগর-সাঁতার-দেওয়া
বাঁকা চাঁদের আলো—
চাই না আমার চাই না অধিক আর,
ওই টুকুতেও নেই যে অধিকার!
ভিক্ষা বলে' যেটুকু পাই ভালো—
ঠোঁটের ঈষৎ রাঙা হাসি, চোখের হাসি কালো।

গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁঝে
প্রাণের ভিতর সোনার সারং বাজে।
পিছন হ'তে কেমন জানি কেন
যবের ক্ষেতে বাতাস বারেক নিঃশ্বসিল যেন,
ফুলল হবে আকাশ তবু অস্তমেঘের ভাঁজে,
গাঁয়ের পথে ফিরব যখন সাঁঝে।

একলা কাটে জ্যোস্না আমার শূন্য আঙিনাতে,
ঝাঁ-ঝাঁ করে বিজন রাতি ঝিঁঝিঁ যখন মাতে।
যতেক স্বপন বকের পাখার মত
চোখের আগে ভিড় করে সব কত,—
টাট্‌কা-টানা একটি ছবি ফুটবে সবার সাথে,
ফুট্‌ফুটে মোর জ্যোৎস্না-আঙিনাতে!

এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো,
যেখান-সেখান ঘুরে বেড়ায়—
কাঁচপোকাটি ধোরো;
মেরে রেখো কোটোয় তুলে,
গোলাপ যখন পর্‌বে চুলে
টিপ্‌ করে' সই কপালটিতে পোরো;
এম্‌নি করে' মনটি চুরি কোরো।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

প্রতিভার লক্ষণ

প্রতিভা জিনিষটা নাকি অনেক রোগের মতই বংশগত,—গ্যাল্টন, রিবট প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই মত-বাদী। কিন্তু এই নিয়ে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। দুই পক্ষেরই যুক্তি এবং প্রমাণ দেখলে কোন-একটা স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছানো মুস্কিল,—মনে হয় যেন দুই দলই ঠিক কথা বলছেন।

বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, সঙ্গীত-প্রতিভা প্রায়ই বংশানুক্রমিক। প্যালেসট্রীনা, বেন্দা, ডুসেক, হিলার, একহরন,—এঁরা সকলেই নামজাদা গাইয়ে-বাজিয়ের ছেলে ছিলেন; বিথোভেনের বাপ ও ঠাকুরদাদা দুজনেই সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন; এই প্রসঙ্গে প্রুশিয়ার বিখ্যাত Bach পরিবারেরও নাম করা যেতে পারে। এই পরিবারে যথাক্রমে আটপুরুষ ধরে সঙ্গীত-প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছিল; Viet Bach নামে একজন রুটিওয়ালা এই পরিবারের আদিপুরুষ, সে রুটি সেঁকত আর সময় পেলে মাঝে মাঝে বেহালা বাজাত। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই পরিবার থেকে যে কত গাইয়ে-বাজিয়ে লোক বেরিয়েছিলেন, তার হিসাব করা যায় না। কবিদের ভিতরও আমরা দেখতে পাই, ম্যান্জোনি, ল্যুকান, ট্যাসো, এরিষ্টো, কনসিল্লা, র‍্যাফাইন, সোফোক্লস্, কোলরিজ, ডুমা, ও দোদে প্রভৃতির প্রতিভা ঊর্দ্ধতন পুরুষ থেকে নেমেছিল। প্রাকৃত বিজ্ঞানে,—পিলিনিস্, ডারউইন, ডি ক্যানডোল, হুকার, হর্শেল, জুস্যো, Sassure, জিওফ্রে, সেণ্ট হিলেয়ার প্রভৃতি, দর্শনশাস্ত্রে স্ক্যালিজার্, Voissus, ফিচার, হুম্বোল্ট, শ্লেলজেল, গ্রাম প্রভৃতির এবং রাজনীতিতে—পিটস্, ফক্স, ক্যানিং, ওয়ালপোল, পিল, ডিসরেলী প্রভৃতি সকলেরই প্রতিভা বংশগত।

সিসেরো, কনডরসেট, কুভিয়ার, বাফোঁন, গেটে, সিডনি স্মিথ, কাউপার, নেপোলিয়ান, ক্রময়েল, চ্যাটারব্রিয়াণ্ড, স্কট, বায়রণ, লামারটিন, সেণ্ট অগষ্টিন, গ্রে, সুইফ্‌ট্, ফন্টেনেল, ম্যানজোনি, ক্যাণ্ট, ওয়েলিংটন ও ফস্কলো প্রভৃতির প্রতিভা তাঁদের মায়ের দিক থেকে এসেছিল; আর বেকন, র‍্যাফেল, ওয়েবার, সিলার, মিলটন, এলবার্টি, ট্যাসো প্রভৃতি, আপন আপন পিতৃ-প্রতিভার অধিকারী হয়েছিলেন। এই-সব প্রমাণ দেখলেও, একটা কথা মনে হয় যে, কেবল জনকয়েক প্রতিভাবানের পিতৃ-মাতৃ কুলের কেউ কেউ ছাড়া—ধরতে গেলে আর সকলে এমন-কিছু বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি।

আর এক দিক দিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ করেন নি; আবার যাঁরা বিবাহ করেছেন তাঁরাও নিঃসন্তান অবস্থায়ই মারা গিয়েছেন। বেকন একজায়গায় দুঃখ করেছেন "The noblest works and foundations have proceeded from childless men" ইংলণ্ডের বেশীভাগ

কবিরই বংশলোপ হয়ে গিয়েছে,—সেখানকার সেকস্‌পীয়ার, বেন-জনসন, মিলটন, অটওয়ে, ড্রাইডেন, রো, এডিসন, পোপ, সুইফ্‌ট্‌, গে, জনসন, গোল্ডস্মিথ, কাউপার, হব্‌স্‌, ক্যামডেন প্রভৃতির বংশের কেহই আর বর্ত্তমান নাই।

মাইকেল এঞ্জিলো, কাণ্ট, নিউটন, পিট, ফক্‌স, ফনটেনেল, বিথোভেন, গ্যাসেণ্ডি, গ্যালিলিও, লক, গ্রে, হিউম, গিবন, মেকলে, ল্যাম্ব, লেনার্ডো ডা ভিন্সি, কোপারনিকাস, ভলটেয়ার, ফ্লবেয়ার, ফস্‌কোলো, ও ম্যাজিনি প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যেও অনেকেই বিবাহই করেন নি!

অনেক সময়ে আবার দেখা গিয়েছে যে, এঁদের বিবাহিত জীবন মোটেই সুখকর হয়নি। সেকস্‌পীয়র, দান্তে, মারজোলো, বায়রণ, কোলরিজ, এডিসন, ল্যাণ্ডর, কারলাইল, কমটে, হেডন, মিলটন, ডিকেন্স প্রভৃতির দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত কষ্টে অতিবাহিত হয়েছিল।

প্রতিভাশালী লোকদের মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, এঁরা যেমন বাপ-মার প্রতিভা নিজেদের মধ্যে পেয়ে থাকেন, তেম্‌নি অনেক স্থলে তাঁরা নিজেরাই আবার পাগল, অথবা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত সন্তানের জন্মদাতা হন। অনেকে বলেন যে, প্রতিভা জিনিষটি বংশের ভিতর দিয়ে নামতে নামতে ক্রমেই ক্ষীণবল হয়ে পড়ে, শেষে একটা কদর্য্য মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন প্রতিভাবানের

থাক্‌ঃ—সিপিও আফ্রিকেনাসের ছেলে একেবারে নিরেট মূর্খ ছিল; সিসেরোর ছেলে ভয়ানক মাতাল ছিল; লুথারের ছেলে অতিশয় অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল; উলিয়াম পেন, থেমিষ্টক্‌ল, এরিষ্টাইড, পেরিক্‌ল্‌স্‌, থুসিডাইড প্রভৃতি আপন আপন সন্তানের জন্য অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। কারডানের দুই ছেলে, কিন্তু দুটিই ছিল অবতার-বিশেষ; একটি বিষ খাইয়ে লোক-মারার দরুণ ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছিল, আর-একটি চুরি জুচ্চুরি প্রভৃতি নানা গুণের জন্যে বার ছয়েক শ্রীঘর-বাসের পরও সায়েস্তা হয়নি। প্রেত্রার্কের ছেলে ছিল অত্যন্ত অলস ও ভয়ানক বদমাইস। রেম্‌ব্রাণ্ড তাঁর ছেলে টিটাসকে অঙ্কন-বিদ্যা শেখাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিশেষ-কিছু সুবিধা করে উঠতে পারেন-নি।

ওয়ালটার স্কটের পুত্র, পিতার সাহিত্য-সেবার জন্যে মনে মনে বিশেষ লজ্জিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই গর্ব্ব করে বল্‌তেন, "সৌভাগ্যের বিষয় আমি বাবার একখানি বইও পড়িনি।" মোজার্টের ছেলেকে কোন সভায় একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "সঙ্গীতে আপনার কেমন অনুরাগ?" এই কথা শুনে সে পকেট থেকে একমুঠো টাকা বার করে টেবিলের উপর ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে বল্লে, "দুনিয়ায় এই আওয়াজ ছাড়া আর কোন যন্ত্রের বাজনা আমার কাণে বিষ ঢেলে দেয়।"

বংশগত প্রতিভার বিরুদ্ধমতবাদীরা বলেন, প্রতিভাশালীরা একদিকে যেমন

জন্ম দিয়ে থাকেন, তেমনি তাঁরা নিজেরাই আবার অনেক সময় ঐ সব গুণ-বিশিষ্ট বাপ-মায়ের সন্তান হন। এই সমস্যায় পড়েই বোধ হয় La Bruyère বলেছেন "These men have neither ancestors nor decendants they themselves form their entire posterity." সোফোক্লসের পিতা একটি দুরন্ত মাতাল ছিলেন। পিটার দি গ্রেটের বাবাও অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত এবং দুর্বৃত্ত মাতাল ছিলেন। প্রতিভাবানদের জন্মদাতাদের সম্বন্ধে এ-রকম আরো অনেক প্রমাণ খাড়া করা যেতে পারে।

ডি কাণ্ডল এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, জারজ সন্তানদের মধ্যেও অনেক প্রতিভাবান পুরুষ দেখা গিয়েছে। ইরেজ্‌মাস গর্ব্ব করে বলতেন, "I am not the fruit of a conjugal duty." আইজাক ডিসরেলী তাঁর Memoirs of Toland নামক পুস্তকে এক জায়গায় বলেছেন, জারজদের বুদ্ধি প্রায়ই সাধারণ শ্রেণীর চেয়ে একটু বেশী সাফ হয়ে থাকে, —থেমিষ্টকেল্‌স, চার্লস মারটেল, উইলিয়াম দি কঙ্কারার, ডিউক অব্‌ বারউইক, লেনার্ডো ডা ভিন্সি, বোকাসিও, এ, ডুমা, কারডান, ডা'লেম্‌বার্ট, স্যাভেজ, প্রায়ার, ভি গিয়ারডিন, লা হার্প, আলেকজন্দর, ফার্নে প্রভৃতি ব্যক্তিই তার জলন্ত প্রমাণ।

প্রতিভা যেমন সব সময়ে বংশানুক্রমিক হয় না, তেমনি পাগলামী রোগটাও যে সব সময়ে বংশানুক্রমিক হয় সে কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে গড়পড়তা হিসাব করতে গেলে প্রতিভার চেয়ে পাগলামীর হিসাবটাই বেশী দাঁড়িয়ে যায়। পাগলামীর মতন বদমাইসী এবং মদের উপর অত্যন্ত ঝোঁক্ প্রায়ই বংশের ভিতর দিয়ে নেমে থাকে। এক্ষেত্রে বিলাতের বিখ্যাত জুক্‌স্-পরিবারের নাম করা যেতে পারে। ম্যাক্স জুক্‌স্ নামে একজন মাতাল থেকে এদের বংশের উৎপত্তি হয়, পঁচাত্তর বৎসর ধরে এই পরিবার ২০০ চোর ও খুনে, ২৮০ জন রুগ্ন (অন্ধ, বুদ্ধিহীন, যক্ষারোগী), এবং ৯০টি বেশ্যা সরবরাহ করে এসেছে। এদের সায়েস্তা করবার জন্যে সরকারকে প্রায় তিনকোটী টাকার উপর খরচা করতে হয়েছিল।

আগের প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রতিভাবানদের মধ্যে অনেকের খুব ছেলে-বেলাতেই প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। দান্তে নয় বছর বয়স থেকে বিয়াত্রিচের উপর প্রেমের কবিতা লিখতে সুরু করেছিলেন। ট্যাসো দশ বছর বয়সে প্রথম কবিতা লেখেন। প্যাস্‌ক্যাল, কম্‌টে, ফারনিয়ার, জোনাথান, এডওয়ার্ডস, Niebuhr, মাইকেল এঞ্জিলো, গ্যাসেন্ডি, Boussuet, ভলটেয়ার প্রভৃতির প্রতিভা সাত থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই বিকশিত হয়েছিল। পিকো ডিলা মিরাণ্ডোলা ছেলে-বয়সে লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, চালডিয়ান ও আরব্য ভাষা শিখেছিলেন। গেটের যখন দশ বছর বয়স তখন তিনি একটা ছোট গল্প লিখে সাতটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তর্জ্জমা করে দেখিয়েছিলেন। Wieland সাত বছর বয়সে লাটিন বেশ

ভালরকম দখলে এনেছিলেন। Kotzebue সাত বছর বয়সে প্রহসন রচনা করতে চেষ্টা করেন এবং আঠার বছর বয়সের সময় তাঁর প্রথম বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়। সিলারের যুগান্তকারী Raüber যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ। পোপের বিখ্যাত কবিতা Ode to Solitude বার বছর বয়সের সময় রচিত হয় এবং ষোল বছর বয়সের সময় তিনি Pastoral নামক কবিতাটি রচনা করেন। মেয়ারবীয়র পাঁচ বছর থেকেই পিয়ানো বাজাতে আরম্ভ করেন। ক্লড যোসেফ ভার্নে চার বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকতে সুরু করেন এবং কুড়ি বছর বয়স হবার আগেই তিনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর হয়ে উঠেছিলেন। ওয়েটনের যখন পাঁচ বছর মাত্র বয়স, তখনই তিনি লাটিন, গ্রীক, এবং হিব্রু ভাষায় লিখতে পারতেন, দশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি চালডিয়ান, সীরিয়ক এবং আরব্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। র‍্যাফেল চোদ্দ বছর বয়সেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, Restif de la Bretonna এগার বছর বয়স থেকেই মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে শিখেছিলেন এবং চোদ্দ বছর বয়সের সময় তিনি একটি কবিতা লিখে তাঁর প্রথম বার জন উপপত্নীর নামে উৎসর্গ করেন।

পাগলা-গারদের অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, খুব ছেলে-বেলাতে যাদের প্রতিভা স্ফুরিত হয় একটু বয়স হতেই তাদের মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে, আর পাগলদের ছেলে-পিলেদের ভিতরও এ-রকম অকালপক্কতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

প্রতিভাবানদের মধ্যে ভবঘুরে হয়ে বেড়ানোর একটা বিশেষ বাতিক লক্ষ্য করা যায়;—বিনা কাজে, বিনা উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে অনেকে কত সময়ে কত যে বিপদে পড়েন, তার ঠিক নেই। কেন এবং কিসের ঝোঁকে যে তাঁদের এমন বাতিকে ধরে, তার কোন বিশেষ কারণ তাঁরা নিজেরাই জানেন না! চিকিৎসকেরা বলেন, মাথা-খারাপের এও একটা বিশেষ লক্ষণ। হাইন, এ্যালফেরি, বায়রণ, গিয়োরডনো ব্রুনো, লিওপার্ডি, ট্যাসো, গোল্ডস্মিথ, ষ্টার্ণ, গটিয়ার, মুসে, লেনো প্রভৃতি সকলেরই এইরকম খামকা ঘুরে বেড়ানোর বদ্-অভ্যাস ছিল।

হোল্ডারিন প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে এমনি লক্ষ্মীছাড়ার মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, প্রেত্রার্ক, প্যাইসিল্যো, Lovoisier, সেলিনি, Cervantes,—এঁরা এই বদ-অভ্যাসের দরুণ কত সময় কত যে ফ্যাঁসাদে পড়েছিলেন, তবুও তাঁদের খেয়াল ছোটে-নি। মেয়ারবিয়র প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে লক্ষ্যহীনের মত ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দেশ-ভ্রমণের সময় তিনি রেলগাড়ীতে বসে বসে গীতি-নাট্য লিখতেন। ওয়াগ্নার রীগা থেকে হেঁটে প্যারিতে গিয়েছিলেন।

প্রতিভার দরবারে স্ত্রীলোকের আসন খুবই অল্প,—একেবারে নেই বল্‌লেও অত্যুক্তি

এই সত্য প্রচার করায় বিশেষ ভয় আছে। তবে একমাত্র ভরসা যে কথাটা আমাদের নিজেদের বানানো নয়। একটা ব্যাপার বহুকাল থেকে লক্ষ্য করে আসা হচ্ছে, যে সব দেশে হাজার হাজার মেয়ে গান শেখে অথবা গান-বাজনার বিশেষ চর্চ্চা করে থাকে, তাদের মধ্যে একজনও ভাল গান রচনা করতে পারে না। আমেরিকায়, যেখানকার মেয়েরা বিশেষ রকম উন্নতিশীল বলে জগতের মধ্যে পরিচিত, সেখানকার ছয়শত স্ত্রী-চিকিৎসকের মধ্যে একজনও তেমন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। শুধু আমেরিকায় কেন, রুষিয়ার কয়েকজন মাত্র স্ত্রী-চিকিৎসক ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জায়গার কোন স্ত্রীলোকই এই বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলে শোনা যায় নি। অবশ্য মেয়েদের মধ্যে মেরি সোমারভিল, জর্জ ইলিয়ট, জর্জ স্যাণ্ড, ড্যানিয়েল ষ্টার্ণ, মেরিনি, স্যাফো, মিসেস্ ব্রাউনিং প্রভৃতি কয়েকজনকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এঁদের সকলের প্রতিভা একত্র করলেও এক মাইকেল এঞ্জিলো, এক নিউটন অথবা এক বালজাকের প্রতিভার সম্মুখে হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। মিলের মতন লোক, যিনি স্ত্রীলোকদের দিকে অতিরিক্ত পক্ষপাতী না হয়ে কখনো কোন বিচার করতে পারেন-নি, তিনিও বলেছেন—"স্ত্রীলোকদের মধ্যে মৌলিকতার অত্যন্ত অভাব; আসল কথা তাঁরা বড় বেশী-রকমের রক্ষনশীল।"

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপমান যন্ত্রের মতন, পাগলাদের খেয়ালও বাড়ে কমে। অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, প্রতিভাধরদের জীবনের উপরেও ঋতু-পরিবর্ত্তনের প্রভাব বিশেষ রকমে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদী মেইন ডি বিরান একজায়গায় বলেছেন—গুমোট্ পড়লেই আমার মন একেবারে দমে যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি যেন উবে যেতে থাকে, অনেক চেষ্টা করেও মনটাকে কোন কাজে লাগাতে পারিনা; এমন কি, কর্ত্তব্য কাজগুলোতে পর্য্যন্ত যেন বিরক্তি ধরে, কিন্তু আকাশ আবার পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের ফুর্ত্তি ফের ফিরে আসে, কাজে মন লাগে।" দেখা গিয়েছে যে, প্রতিভাবানদের অনেকে শীতকে ভারি ডরাতেন। নেপোলিয়ানের মত অমন যে দিগ্বিজয়ী বীর, যিনি বড় বড় লড়াই হেসে-খেলে ফতে করে এসেছিলেন, তিনিও জুলাই মাস পর্য্যন্ত ঘরে দিনরাত আগুন জ্বালিয়ে রাখতেন। ভলটেয়ার ও বাফোঁ বছরের কোন সময়েই ঘরের আগুন নিবিয়ে শুতে পারতেন না। বায়রণ বলতেন ঠাণ্ডাকে আমি যমের মত ভয় করি। স্প্যালাজোনি, লিওপার্ডি, গুইষ্টি, Pajsiello, Varillas, Mèny, আরনড্ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত শীতভীত ছিলেন।

গিয়োরডিনি রোদে না বসলে লিখতেই পারতেন না। যখন রোদ না থাকত তখন ঘরে দশ-বারটা লণ্ঠন জ্বেলে, আর-একটা বড়গোছের আগুন করে তার সাম্নে বসে তবে লিখতেন। নভেম্বর মাসে ফস্কলো এক জায়গায় লিখেছেন—"এখন

আমি সর্ব্বদাই আগুনের সামনে বসে থাকি, বন্ধুবান্ধবেরা ঠাট্টা করে—কিন্তু কি কর্ব্ব, আগুন ছেড়ে আমি উঠতে পারিনা, যদিও আগুনের সামনে বসে বসে আমার চোখ দুটো ফুলে উঠেছে।" মিলটন তাঁর কয়েকটি লাটিন কবিতায় স্বীকার করেছেন যে, শীতকালে তিনি লিখতে পারতেন না, বসন্ত কিংবা শরৎকাল ছাড়া অন্য সময় বাগ্‌দেবী যে তাঁর কাছ থেকে কোথায় সরে পড়তেন, তার খোঁজ পাওয়া মুস্কিল হয়ে উঠত।

১৬৭৮ খৃঃ অব্দের শীতকালে একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "এ-রকম শীত যদি আর বেশী দিন থাকে তাহলে আমার কল্পনার অবাধ গতি হয়ত চিরদিনের জন্য থেমে যাবে।"

পুস্‌কিনের মাথা শরৎকালে সব-চেয়ে সাফ থাকত। আবার বসন্তের সময় তাঁর মন এমন অবসাদে ভরে আসত যে, সে সময় তাঁর দ্বারা আর কোন কাজ হওয়া সম্ভব ছিল না। সিলারের কতকগুলো চিঠিতে বুঝতে পারা যায়, শীতের সময় তিনিও বড় কাতর হয়ে পড়তেন, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "এমন সময় কোন কাজ করা দূরে থাক্, কোনরকমে বেঁচে থাকাই আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। আকাশের ও প্রকৃতির অবস্থা যতই দেখছি আমি যেন ততই দমে যাচ্ছি।" রুষো বলেছেন, "গরমের সময় তাঁর রচনা-শক্তি যেমন খুল্‌ত, তেমন আর অন্য কোন সময় না।" দান্তে তাঁর প্রথম সনেট ১২৮২ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুন তারিখে লেখেন, ১৩০০ খৃঃ অব্দের বসন্তে তিনি বিখ্যাত Vita Nouva শেষ করেন। ডারউইন, পেত্রার্ক, মাইকেল এঞ্জিলো, ম্যানজোনি, মিলটন, বালজাক, গিয়োরডনো ব্রুনো, বায়রণ, ভলটেয়ার ও গেটে প্রভৃতির অধিকাংশ উৎকৃষ্ট রচনার একটিও শীতের সময় রচিত হয়-নি। পৃথিবীর বড় বড় প্রতিভাবান লোকে কোন্ সময় কি কি কাজ করেছিলেন, লম্ব্রজো এক জায়গায় তার একটা সুন্দর তালিকা দিয়ে দেখিয়েছেন। জ্যোতির্ব্বেত্তারা—এমন-কি, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যন্ত যা-কিছু বড় কাজ করেছেন, তার বেশীর ভাগই গ্রীষ্ম-কালে করা হয়েছে। শীতের সময় কারো কারো প্রতিভা খুলত বটে, কিন্তু প্রতিভা-বানদের মধ্যে সেটা স্বাভাবিক নয়, আর এ-রকম দৃষ্টান্তও খুব বিরল।

এই-সব প্রতিভাবানের সকলেরই যে ঠিক গ্রীষ্মকালেই প্রতিভা স্ফুরিত হ'ত এমন কথাও নিশ্চিত রূপে বলা যেতে পারে না। তবে মোট কথা এই, শীতের সময় এঁরা এতটা কাবু হয়ে পড়তেন যে, (দুই-একজন বাদে) সে সময় কোন কাজে হাত দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। কখন্, কার প্রতিভার বিকাশ হ'ত তার একটা ছোটখাট তালিকা দেওয়া গেল—স্প্যালান-জোনির বসন্ত কালে, গুইষ্টি ও আরক্যান-জেলিওর মার্চ্চ মাসে, লামারটিনের আগষ্টে, কারক্যানো, বায়রণ ও এলফেরির সেপ্টেম্বরে, ম্যালপিঘি ও সিলারের জুন এবং জুলাই মাসে, ভিক্তর হিউগোর মে মাসে, বেরানজারের জানুয়ারিতে, বেলির নভেম্বরে, মেলির

এপ্রিল মাসে, ভল্টা'র নভেম্বরে ও ডিসেম্বরে, গ্যালভিনির এপ্রিলে, গ্যাম্বার্টের জুলাই মাসে, পার্টা'র আগষ্টে এবং লুথারের মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে।

বাক্‌লি তাঁর History of Civilization গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন, "যেখানে আগ্নেয় পর্ব্বতের আধিক্য সেই প্রদেশই হচ্ছে প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে উপযোগী স্থান।" জ্যাকবি বলেন, "বড় ব্যবসাক্ষেত্র ও বড় বড় সহরেই বেশীভাগ প্রতিভাশালী লোক আবির্ভূত হয়ে থাকেন। কিন্তু তা ছাড়া প্রাকৃতিক অবস্থা আর জল-হাওয়ার উপরও এ বিষয় অনেকটা নির্ভর করে।

প্রতিভা-বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। কিন্তু তা বলে আফ্রিকার মতন গরম দেশ হলেও চল্‌বে না—তাতে-করে' প্রতিভা শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে যেতে পারে। গরম দেশের পরেই, প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে উপযোগী স্থান হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ ও পাহাড়ে জায়গা। অবশ্য, এই-সব জায়গার সঙ্গে বাইরের দেশগুলির ভাবের আদান-প্রদান থাকাও বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং এইটী নাই বলেই সুইজারল্যাণ্ডের মত অমন সুন্দর দেশেও প্রতিভাবান লোকের আবির্ভাব এত কম। ইউরোপের মধ্যে ইটালি, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে যত প্রতিভাশালী লোক জন্মেছেন, সেখানকার আর কোন দেশে তত হয়-নি। খোঁজ কর্‌লে আরো দেখা যাবে যে, ঐ সকল দেশের মধ্যেও, অধিক-উষ্ণ এবং পর্ব্বতীয় স্থানগুলিতেই প্রতিভাধরের আবির্ভাব হয়েছে বেশী।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

কে ?

(১)

"সখিরে তু বোলো

* * * * *

কি আছে সো আঁখিয়াতে মই পরাণ হারালো"

সত্যই কি আমি সেই আঁখি দুটী দেখিবামাত্র 'পরাণ' হারাইয়াছিলাম?

তাকে প্রথম দেখি, একটী মেলায় জনতার মধ্যে। ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একজনের সম্মুখে পড়িয়া গেলাম, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি এক তরুণী।

তিনিও একবার আমার দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়াই চক্ষু নত করিলেন; কিন্তু সেই যে চারিচক্ষুর মিলন, আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত তা ভুলিতে পারি নাই।

(২)

তাহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আমি এখানে ডাক্তারি পাশ করিবার পরে অল্পদিন বিলাতে ছিলাম। সেখান হইতে বিলাতি হরফের তক্‌মা আদায় করিয়া লইয়া দেশে ফিরিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়াছি। মা মাঝে মাঝে বিবাহের

জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরেন। হচ্ছে, হবে বলিয়া আমি কথাটা চাপা দিই এবং কোন "সম্বন্ধের" কথা উল্লেখ করিলেই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠি,—পৌত্রমুখদর্শন-লোলুপ মা আমার, ছেলের রকম সকম দেখিয়া অবাক হইয়া যান, বোধ হয় ভাবেন সমুদ্রের পারে হৃদয়খানা হারাইয়া আসিয়াছি—বুঝিবা। আমি মনে মনে হাসি। তখন কোন বিদেশিনীর নহে, সেই অপরিচিতা স্বদেশিনীর চোখ দুটী মনে জাগিয়া ওঠে। কিন্তু সেই জন্যই কি বিবাহে ইচ্ছা নাই? হাস্যকর! তাও নাকি হয়! তবে যে কারণেই হউক আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই এইটে ঠিক। পাঠক ইচ্ছামত একটী কারণ নির্ণয় করিয়া লইলে আমার আপত্তি নাই।

(৩)

আমাদের বাড়ীর পাশের খালি বাড়ীতে নূতন ভাড়াটিয়ারা আসিলেন। ইহারা ব্রাহ্ম, ইংরেজী কায়দাতেই চলেন। কর্ত্তার বড় ছেলে সুবোধবাবু সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন; তাঁহার প্র্যাকটিসের সুবিধার জন্যই সকলে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন।

এখানে আসিয়া বসিতে না বসিতে কেহ কেহ নবজ্বরে আক্রান্ত হইলেন। আমি পাশেই থাকি, আমার ডাক পড়িল। তাঁহাদের আরোগ্য করিয়া সুযশও লাভ করিলাম। ব্যারিষ্টার সাহেবের সঙ্গে ভাবটা এতই জমিয়া উঠিল যে অবসর পাইলেই সন্ধ্যাবেলাটা সেখানে কাটাই।

তাঁহার ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী চমৎকার গাহিতে পারেন, মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার গান শুনিয়া ভাবি, ইনি কি স্বর্গের দেবী?

এতদিনের পর আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ ভাঙ্গিল, হায়রে!

(৪)

কিরূপে বিবাহের প্রস্তাব করিব মনে মনে এতবারই তাহা আবৃত্তি করিয়াছি, যে এখনো সে কথা আমার মুখস্থ। অথচ কোনমতেই সে কথা উর্ম্মিলাকে বলিতে না পারিয়া অবশেষে সুবোধের কাছেই কথাটা পাড়িলাম।

আমি যে এজন্য ব্রাহ্ম হইতেও প্রস্তুত অযাচিত ভাবে একথাও জানাইয়া দিলাম। মনে জানি মা তাহাতে আপত্তি করিবেন; হইলে কি হয়, সে আপত্তি অগ্রাহ্য বা খণ্ডন করিতে যদি না পারি, তবে আর ভালবাসিলাম কি?

কিন্তু হায়! সব আশা, সব কল্পনা আমার আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল, সুবোধের নিকট শুনিলাম উর্ম্মিলা engaged.

(৫)

বাড়ী ফিরিবামাত্র মা বলিলেন, "বাছা সুবোধ, কনকলতার গায়েহলুদ হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, তুই যদি বিয়ে করিস্ তবেই আমার সইদের জাত-ধর্ম্ম রক্ষে হয়। আর মেয়েটী সত্যিই সোণার টুকরো, এমন মেয়ে আর কোথাও পাবিনে।"

আমি আপত্তি করিলাম না। একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় বিনা ঔৎসুক্যে, বিনা আগ্রহে, পরদিন সন্ধ্যাবেলা বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে বরণ গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীআচার স্থলে নীত হইলাম। শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনির মধ্যে অবগুণ্ঠনমুক্তা কন্যার দিকে চাহিলাম, নয়নে নয়নে মিলিত হইল; চমকিয়া উঠিলাম।

এ যেন ঠিক সেই দুটী আঁখিরই দৃষ্টি, যে দৃষ্টি আমি আজও ভুলিতে পারি নাই। সত্যই কি আজিকার এই নববধূ সেই আমার বহুপূর্ব্বের পরিচিতা ... ...!

না, এ মোহ, চোখের ভুল! কে জানে?

বাসর-গৃহে সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গায়িলাম—

"হায় মিলন হোলো!
যখন নিবিল চাঁদ, বসন্ত গেলো।"

শ্রী ... ... দেবী।

বাঙ্গালী পল্টনের যুদ্ধযাত্রা সঙ্গীত

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

ঐ আহ্বান-গীতি বাজে,
জয় জয় জয় জয় প্রণমি রাজরাজে,
সবে জাগি, এস লাগি জন্মভূমির কাজে।
হের দুরিত তিমির রাত্রি,
মোরা দীপ্ত প্রভাতের যাত্রী,
চলি উৎসাহে কোটি ভ্রাতৃ
বীর সৈন্যের সাজে;
যাপি বৃথা আলস্য ঘুমে,
আর লুণ্ঠিত না রব ভূমে,
সম-আসন লব করমে
জগত-জাতির মাঝে।
(কোরাস) ঐ আহ্বান-গীতি বাজে; ইত্যাদি।

মোরা নহি ত দীন-হীন নহি ত তুচ্ছ,
সাহসে গর্ব্বে শির সমুচ্চ,
শোভে অঙ্গে শাণিত অস্ত্রগুচ্ছ,
অনল-উজ্জ্বল তেজে;
মোদের হৃদয়ে মঙ্গল-প্রীতি,
নির্ব্বাণ জড়তা-ভীতি,
বারিতে পীড়ন-নীতি
আজি মৃত্যু ডরিব না যে।
(কোরাস) ঐ আহ্বান-গীতি বাজে; ইত্যাদি।

মোরা শৌর্য্যে বীর্য্যে হইব প্রধান,
নির্ভয়ে বক্ষে ধরিব কামান,
উছলি উঠিবে জননী-প্রাণ,
আর না দহিবে ক্ষোভে লাজে।
সবে ন্যায়ের দণ্ড বহিয়া,
ধর্ম্মের জয়-গান গাহিয়া,
অসাধ্য সাধন যত সাধিয়া
শিরোপা বাঁধিব তাজে।
(কোরাস) ঐ আহ্বান গীতি বাজে; ইত্যাদি।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।
সুর ও স্বরলিপি—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

স্বরলিপি

(কোরাস)—

```
                 ০                    ১
I মা  –া II   মা  –পা  ধা  ধা ।  ধা  –া  –া  ণা ।
  ঐ   ০       আ   ০   হ্বা  ন    গী   ০   ০   তি

 +                  ৩                 ০
I পধা  –ণা  ণা  –া ।  –া  –া II  –া  –া ।  র্মা  র্মা  র্গা  র্গা ।
  বা০   ০   জে   ০     ০   ০     ০   ০     জ   য়   জ   য়

 ১                  +                 ০
। র্রা  র্রা  র্সা  র্সা I  ণা  ণ  ণা  ধা ।  –া  ণা  পধা  ণা ।
  জ   য়   জ   য়     প্র  ণ  মি  রা    ০  জ   রা০   ০

 ০                  ১                 +
। ণা  –া  ধা  ণা ।  র্সা  –া  র্সা  –া I  –া  –া  ণা  র্সা ।
  জে   ০  স   বে    জা   ০  গি   ০    ০   ০  এ   স

 ৩                  ০                 ১
। র্রা  –া  র্রা  –া ।  ণা  –র্রা  র্সা  ণা ।  ধা  পা  মগা  –পা ।
  লা   ০  গি   ০    জ   ০   ন্ম  ভূ    মি  র  কা০   ০

 +                  ৩
I মা  –া  –া  –া ।  –া  –া  "মা  –া" II
  জে   ০   ০   ০     ০   ০   ঐ   ০

                ০                    ১
II ধা  ণা ।  { র্সা  –া  র্সা  র্সা ।  র্সা  র্সা  –ণধা  ণা ।
   হে  র      দূ   ০   রি   ত     তি   মি   ০০   র

 +                  ৩                 ০
। র্রা  –া  র্রা  –া ।  –া  –া  র্রা  র্রা ।  র্মা  –া  র্জ্ঞা  র্রা ।
  রা   ০  ত্রি  ০     ০   ০  মো   রা    দী   ০  প্ত   প্র

 ১                  +                 ৩
। র্সা  –া  ণা  ধা I  পধা  ণা  ণা  –া ।  –া  –া  ধা  ণা }
  ভা   ০  তে   র    যা০  ০  ত্রী  ০    ( ০   ০  হে  র ) {
```

৩ ০ ১
। –া –া র্সা র্রা । র্গা –া র্গা –া । র্গা –র্মা র্রা র্গা ।
০ ০ চ লি উৎ ০ সা ০ হে ০ কো টী

\+ ৩ ০
I র্মা । র্মা –া । –া –া –া –া । র্গা –া –র্রা র্সা ।
ভ্রা ০ তৃ ০ ০ ০ ০ ০ বী ০ র সৈ

১ + ৩
। –না –না ধা –না । র্সা –া –া –া । –া –া মা পা ।
ন্যে র সা ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ যা পি

০ ১ +
। ধা ধা –া ধা । ধা –া ধা –ণা I পধা –ণা ণা –া ।
বৃ থা ০ আ ল ০ স্য ০ ঘু০ ০ মে ০

৩ ০ ১
। –া –া ধা –ণা । র্সা –া র্সা র্সা । র্সা –া ধা ণা ।
০ ০ আর্ ০ লু ০ ণ্ঠি ত না ০ র ব

\+ ৩ ০
I র্জ্ঞা –া র্রা –া । –া –া –া –া । র্মা র্মা –া র্মা ।
ভূ ০ মে ০ ০ ০ ০ ০ স মা ০ ন

১ + ৩
। র্রর্জ্ঞা –া র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা র্রা –া র্রা । র্সা –া র্সা র্সা ।
আ ০ স ন ক রি ০ ব গ্র ০ হ ণ

০ ১ +
। ণা র্রা র্সা ণা । ধা পা মগা –পা I মা –া –া –া ।
জ গ ত জা তি র মা০ ০ ঝে ০ ০ ০

৩
। –া –া "মা –া" II
০ ০ ঐ ০

০ ১
II ধা ণা । { র্সা র্সা –া র্সা । র্সা র্সা ণধা ণা ।
মো রা ন হি ০ ত দী ন হী০ ন

\+ ৩ ০
I র্রা র্রা -া জ্ঞা। র্রা -া র্রা -া। র্মা -া জ্ঞা জ্ঞা।
ন হি ০ ত তু ০ চ্ছ ০ সা ০ হ সে

১ + ৩
। র্রা -া র্সা -া I ণা -ধা পা ধা। (পধা -ণা ণা -া)}
গ ০ র্ব্বে ০ শি ০ র স (মু০ ০ চ্চ ০)

৩ ০ ১
। ণা ণা সা র্রা। র্গা -া র্গা -া। র্গা -র্মা র্রা র্গা।
মু চ্চ শো ভে অ ০ ঙ্গে ০ শা ০ ণি ত

\+ ৩ ০
I র্মা -া র্মা -া। র্মা -া র্মা -া। র্গা র্গা র্রা র্রা।
অ ০ স্ত্র ০ গু ০ চ্ছ ০ অ ন ল উ

১ + ৩
। র্সা না ধা -না I র্সা -া -া -া। -া -া মা পা।
জ্জ্ব ল তে ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ মো দের

০ ১ +
। ধা ধা -া ধা। ধা -া ধা ণা। পধা -ণা ণা -া।
হৃ দ ০ য়ে ম ০ ঙ্গ ল প্রী০ ০ তি ০

৩ ০ ১
। -া -া -া -া। র্সা র্সা -া র্সা। র্সা র্সা ণধা -ণা।
০ ০ ০ ০ নি র্ব্বা ০ ণ জ ড় তা০ ০

\+ ৩ ০ ১
I জ্ঞা -া র্রা -া। -া -া -া -া। র্মা -া জ্ঞা জ্ঞা। র্রা -া র্সা র্সা।
ভী ০ তি ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ রি তে পী ০ ড় ন

\+ ৩ ০
I ণধা -র্সা ণা -া। -া -া ণা ণা। ণা -র্রা র্সা র্ণা।
নী০ ০ তি ০ ০ ০ আ জি মৃ ০ ত্যু ড

১ + ৩
। ধা পা মগা -পা I মা -া -া -া। -া -া "মা -া" II
রি ব না০ ০ যে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০

০ ১
II ধা ণা। র্সা -া -া র্সা। র্সা -া ণধা ণা।

\+ ৩ ০
I র্রা র্রা র্রা জ্র্জা। র্রা -া -া -া -া। র্মা -া জ্র্জা জ্র্জা।
হ ই ব প্র ধা ন ০ ০ ০ নি ০ র্ভ য়ে

১ + ৩
। র্রা -া র্সা -া। ণা ধা পা ধা। ণা -া -া -া।
ব ০ ক্ষে ০ ধ রি ব কা মান্ ০ ০ ০

০ ১ +
। র্সা র্রা র্গা -া I র্গা র্গা র্গা -র্মা I র্রা র্গা র্রর্গর্মা -া।
উ চ্ছ লি ০ উ ঠি বে ০ জ ন নী০০ ০

৩ ০ ১
। র্মা -া -া -া। র্গা -া র্রা র্রা। র্সা না ধা না।
প্রাণ্ ০ ০ ০ আর্ ০ না দ হি বে ক্ষো ভে

\+ ৩ ৩
। র্সা -া র্সা -া। -া -া মা পা। ধা ধা -া ধা।
লা ০ জে ০ ০ ০ স বে ন্যা য়ে ০ র

১ + ৩
। ধা -া -া ণা I পা ধণা ণা -া। -া -া -া -া।
দ ০ ০ গু ব হি০ য়া ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ +
। র্সা -া র্সা র্সা। র্সা র্সা ণধা ণা I জ্র্জা জ্র্জা র্রা -া।
ধ ০ র্ম্মে র জ য় গা০ ন গা হি য়া ০

৩ ০ ১
। -া -া -া -া। র্মা র্মা -া র্মা। জ্র্জা -া র্রা র্রা।
০ ০ ০ ০ অ সা ০ ধ্য সা ০ ধ ন

\+ ৩ ০
I র্সা র্সা ণধা র্সা। ণা -া -া -া। ণা র্রা র্সা ণা।
য ত সা০ ধি য়া ০ ০ ০ শি রো পা বাঁ

১ + ৩
। ধা পা মগা -পা I মা -া -া -া। -া -া "মা -া" II
ধি ব তা০ ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ ঐ ০

বাংলার ব্রত

(৩)

লক্ষ্মী-ব্রতটী মেয়েদের একটি খুব বড় ব্রত। আশ্বিন-পূর্ণিমায় যখন হৈমন্তিক শস্য ঘরে আসবে, তখনকার ব্রত এটি। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীপূজা। সকাল থেকে মেয়েরা ঘর-গুলি আল্‌পনায় বিচিত্র পদ্ম, লতা-পাতা এঁকে সাজিয়ে তোলে। লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন,—লক্ষ্মী-পেঁচা এবং ধান-ছড়া হল এই আল্‌পনার প্রধান অঙ্গ। বড় ঘর—যেখানে ধান-চাল, জিনিষপত্র রাখা হয়—সেই ঘরের মাঝের খুঁটির—মধ্যম খামের গোড়ায় নানা-আল্‌পনা-দেওয়া লক্ষ্মীর চৌকি পাতা হয়। আল্‌পনায় নানা অলঙ্কার, এবং চৌকিতে, লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ-মূর্ত্তি না লিখে, কেবল মুকুট আর দুখানি পা কিম্বা পদ্মের উপরে পা কিম্বা অন্য নানা-রকম চিত্র লিখে দেওয়া হয়। খুঁটির গায়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ আর লক্ষ্মীপেঁচা বা অন্য চিত্র আঁকা থাকে। চৌকির উপরে ডোল ও বেড়—ডালা ও বিঁড়ে। বেড়ের মধ্যে শুয়োরের দাঁত ও সিঁন্দুরের কৌটা এবং তার উপরে নানারকম ফল ইত্যাদিতে পূর্ণ রচনার পাতিল বা ভাঁড় রাখা হয়। রচনার পাতিল (হাঁড়ি) খানির গায়ে লক্ষ্মীর পাঁড়া বা পদচিহ্ন ও ধান-ছড়া; রচনার পাতিলটির উপরে লক্ষ্মীর সরা; সরার পিঠে লাল নীল সবুজ হলদে কালো এই কয় রঙে লক্ষ্মী-নারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদির আল্‌পনা। লক্ষ্মীর কাপড়ে সবুজ রং, গায়ে হলুদবর্ণ, কালীর পরিরেখ, এবং অধর ও পায়ের এবং করতলের জন্য লাল; নীল-বর্ণ পট-ভূমিকার কারুকার্য্যে দেওয়া হয়। লক্ষ্মী-সরার উর্দ্ধে আধখানা নারিকেলের মালই;—মেয়েরা এই মালইকে কুবেরের মাথা বা মাথার খুলি বলে। যশোর-অঞ্চলে সরার পশ্চাতে একটি শীষ সমেত আস্ত ডাব,—সেটিকে ঘোমটা দিয়ে, গহনা ইত্যাদি দিয়ে অনেকটা একটি ছোট মেয়ের মতো করে সাজানো হয়। কলার খালুই দিয়ে ধানের গোলার অনুরূপ কতকগুলি ডোলা, তাহাতে নানাবিধ শস্য পূর্ণ করে আর-একটি কাঠের খেলার নৌকার প্রত্যেক গলুয়ে নানা-বিধ শস্য—ধান, তিল, মুগ, মসুরি, মটর ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মীর চৌকির সম্মুখে রাখার প্রথাও আছে। পূজা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ব্রতীর উপবাস। দেশভেদে কোনো গ্রামে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কুবের—এই তিনটিকে তিন রঙের পিটুলীর পুতুলের আকারে গড়ে দেওয়া হয়। এম্‌নি নানা গ্রামে অনুষ্ঠানের একটু অদল-বদল আছে।

মোটামুটি হিসেবে দেখা যায়, এই কোজাগর পূর্ণিমার ব্রতটির মধ্যে অনেক-খানি অনার্য্য অংশ রয়েছে। শুয়োরের দাঁত,—যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের রচনার পাতিল; কুবেরের মাথা—যেটা সব-উপরে রয়েছে দেখি; কিম্বা সরার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা-দেওয়া মেয়ের মতো ডাব—হলুদ-সিঁদুর মাখানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া,—এক লক্ষ্মীর বাহন, আর-

এক লক্ষ্মীর শস্য-মূর্ত্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য্য বা অন্য-ব্রতদের! আমার এই কথার সমর্থন করার জন্যে হিন্দুস্থানেই যদি প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয় তবে একটু মুস্কিল। কেন না, শুয়োরের দাঁত—সে বরাহ-অবতারের যুগে বেদ-উদ্ধার করে পবিত্র হয়ে গেছে; মড়ার মাথা—সেও তন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মহাদেবের হাতে উঠেছে; বাকি থাকেন পেঁচা ও ধান-ছড়া; হয়তো গরুড়ের বংশাবলীতে পেঁচাকেও পাব; এবং ধানই যে লক্ষ্মী, সেটা ত লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে লুকোনো আছে। কিন্তু ভারত-সমুদ্র ছাড়িয়ে বহুদূরে প্রশান্ত-মহাসাগরের পারেও যখন দেখি ধানছড়া মূর্ত্তিতে পূজো পাচ্ছেন—ঠিক এম্‌নি আর-এক মা-লক্ষ্মী বা 'ছড়া-মা'—মেক্সিকো পেরু প্রভৃতি দেশের অনার্য্যদের মধ্যে, তখন কি বলা যাবে?

আমাদের দেশে যেমন ধান, ও-সব দেশে তেম্‌নি জোয়ার, জনার বা ভুট্টা হচ্ছে প্রধান শস্য। এই-সব শস্যের রক্ষা যে দেবতারা করেন তাঁদের বলা হয় 'মাম্মা'। আলুকে বলে এরা 'আক্সু' এবং আলু-দেবীকে বলবে এরা 'আক্সুমাম্মা'। জনারকে বলে এরা 'সর' বা ছড়; তার দেবীকে বলে এরা 'সরমাম্মা';—ঠিক উচ্চারণটা হয়তো 'সরাম্মামা' 'ছড়াম্মামা'। কিন্তু যা বলেই ডাকা হোক, এই পেরু-দেশের মা-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি হচ্ছে ভুট্টার ছড়—যেমন আমাদের ধানছড়া। শস্য-সংগ্রহের কালে সেখানে লোকেরা ভুট্টার ছড়গুলি দিয়ে তাদের মা-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি গড়ে। পূজার পূর্ব্বে তিন রাত্রি জাগরণ করে ছড়াম্মামা বা সরম্মামাকে নজরে নজরে রাখা নিয়ম। একে পূর্ণিমা-জাগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। পূজোর দিন এরা ভুট্টাছড় বা এদের লক্ষ্মীমূর্ত্তির সাম্‌নে রচনার পাতিলে নানারকম খাবার সাজিয়ে একটি সিদ্ধ করা ব্যাং সকলের উপরে রাখে; এবং সেই ব্যাঙের পিঠে একটি জনারের শীষের মধ্যে নানা শস্য—ভুট্টা, মুগ, মুসুরী ইত্যাদি চূর্ণ করে ভরে গুঁজে দেওয়া হয়। এই ব্যাং হলেন জলদেবতার স্ত্রী (বেদেও মণ্ডূককে জল ও ধন দান করেন বলা হয়েছে)। পূজার রাত্রে নাচ গান এবং নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে মেয়েরা এলোচুলে নৃত্য করতে-করতে একটি কুমারীকে হলুদে-সিঁদুরে অলকা-তিলকা দিয়ে মুখটি সাজিয়ে—কতকটা আমাদের লক্ষ্মী-পূজোর ডাবটির মতো—এবং নানা অলঙ্কার ভালো কাপড় পরিয়ে পূজারীর সাম্‌নে উপস্থিত করে। পূজারী কুমারীকে পূজা দেন; ও সকলের একসঙ্গে মৃত্যুর নাচ সুরু হয়। তার পরে সেই কুমারীকে বলি দিয়ে তার সদ্যছিন্ন রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডটি রচনার পাতিলে রেখে পুরোহিত ছড়াম্মাকে প্রশ্ন করেন—মা তুমি তুষ্ট হয়ে রইলেতো? যদি পুরোহিতের প্রতি আদেশ হয়—রইলুম, তবে জনারের ছড় তারা পূজার ঘরে তুলে রাখে; আর যদি আদেশ হয়—রইবোনা, তবে জনারের ছড় পুড়িয়ে নতুন ছড়াম্মামা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়।

"Sometimes an image of Saramama was carved in stone in the shape of an ear of maize. The Saramama was also worshipped in the form of a doll or huantay-sara, made out of stalks of maize

as e great Corn-Mother of Mexi o (Chicomecohuatl) ··· after haiv made, the image was watched over for three nights (কোজাগর) and then sacrifice was done to it. The priest or medicine-man of the tribe would then inquire of it wheather or not it was capable of existing until that time in the next year. If its spirit replied in the affirmative it was permitted to remain where it was until the following harvest. If not, it was removed, burnt and another figure took its place..." (Page 295.—Myths of Mexico and Peru. duise Spence.)

এইবার Chicomecohuatl—যিনি মেক্সিকোর great Corn-Mother বা মা-লক্ষ্মী, তাঁর পূজার অনুষ্ঠান দেখি—"A more important festival of Chicomecohuatl however, was the Xalaquia which lasted from June 28 to July 14, commencing when the maize-plant had attained its full growth. The women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long. Chianpinolli was consumed in immense quantities, and maize-porridge was eaten. Hilarious dances were nightly performed in the teopan (temple), the central figure in which was the Xalaquia, a female captive or slave, with face painted colours of the maize-plant...... Throughout the duration of the festival she danced and on its expiring night she was accompanied in the dance by the women of the community, who circled round her. ...when daybreak appeared......the entire community then approached the Teo Calli (pyramid of sacrifice) and its summit reached the victim was stripped to a nude condition, the priest plunged a knife of flint into her bosom, and, tearing the still palpitating heart offered it up to Chicomecohuatl. In this manner the venerable goddess weary with the labours of inducing growth in the maize-plant was supposed to be revivified and refreshed. (Page 86-89 Myths of Mexico and Peru.)

এখন, দক্ষিণ-আমেরিকার জল-দেবী ব্যাং এবং শস্য নষ্ট করবার একটি ওস্তাদ যে ইন্দুর, তার যম লক্ষ্মী-পেঁচা; সেখানকার নর-বলির হৃৎপিণ্ড এবং এখানকার নারিকেল-মালই, বা কুবেরের মাথা বা যশোরের সেই তেল-হলুদ-সিঁদুরে সাজানো ঘোমটা-দেওয়া গয়না-পরানো ডাবটি এবং মেক্সিকোর হলুদে সিঁদুরে অলকা-তিলকা দিয়ে ভূষিতা ব্রত-দাসীটির সঙ্গে বস্তুত যোগাযোগ চোখে না দেখলেও, দুই দেশের লক্ষ্মী-ব্রতর মধ্যে একটা সাদৃশ্য অনুভব না করে থাকা যায় না।

লক্ষ্মী-পূজার এদেশে আর-একটা অনুষ্ঠান রয়েছে;—যেটা নজর করে দেখলে, শাস্ত্রীয় লক্ষ্মীপূজা-পদ্ধতি যে, অনার্য্য এবং

অধিকার করেছে তা বেশ বোঝা যায়। গৃহস্থের বড়-ঘরের লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বে, ঘরের বাহিরে একটি পূজা চলে; তাকে বলা হয় 'অলক্ষ্মী-বিদায়'। এটি শাস্ত্রোক্ত দীপান্বিতা। লক্ষ্মীপূজার একটি অনুষ্ঠান, যথা—"প্রদোষ সময়ে বহির্দ্বারে গোময়নির্ম্মিত অলক্ষ্মীকে বামহস্ত দ্বারা পূজা করিবে। আচমনান্তে সামান্যার্ঘ্য ও আসন-শুদ্ধি করিয়া অলক্ষ্মীর ধ্যান যথা, ওঁ অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধানাং কৃষ্ণগন্ধানুলেপনাং তৈলাভ্যক্ত-শরীরাং মুক্তকেশীং দ্বিভুজাং বামহস্তে গৃহীত ভস্মনাং দক্ষিণহস্তে সম্মার্জ্জনীং গর্দ্দভারূঢ়াং লৌহাভরণভূষিতাং বিকৃতদংষ্ট্রাং কলহ-প্রিয়াম্—এই বলিয়া ধ্যান করিয়া আবাহন পূর্ব্বক অলক্ষ্মীর পূজা; পূজান্তে পাঠ্য মন্ত্র যথা, ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থান-বাসিনী সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ণ পূজাঞ্চ শাশ্বতীম। পরে গৃহমধ্যে গিয়া লক্ষ্মীপূজা যথাবিধি আরম্ভ—গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বা-লঙ্কারভূষিতাম্" ইত্যাদি।

পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা অলক্ষ্মী-বিদায় নিজেরা করেনা; পূজারীকে দিয়ে এ কাজ সারা হয়। এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্ত্যব্রতদের লক্ষ্মী বা শস্য-দেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীনা লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে অলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরূপা-কুৎসিতা বলে এঁকে ছেঁড়া চুল ও ঘরের আবর্জ্জনার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন। মেয়েরাও ব্রহ্মকোপের ভয়ে অলক্ষ্মীর পূজোর জায়গা বাইরেই করলেন; এবং যথাবিধি পূজা করা না-করার দায়-দোষ সমস্তই ভয়ে পূজারীরই নিতে হল এবং ফেলার মতো তখনো একটু যে গোলোযোগ না হল তা নয়। মেয়েরা পূজারীর কথা শুনে প্রাচীনা লক্ষ্মীকে বেশি-রকম অপমান করতে ইতস্ততঃ কল্লেন। এখন অলক্ষ্মীই বলি আর যাই বলি, একসময়ে তিনি তো লক্ষ্মী বলেই চলছিলেন, কাজেই তাঁর কতকটা সম্মান ধূর্ত্ত পূজারী বজায় রেখে মেয়েদের মন রাখলেন;—নিজেরও মনে অলক্ষ্মীর কোপের ভয় না-হচ্ছিল তা নয়; ঘরের বাইরে হলেও, মা-লক্ষ্মীর আগে অলক্ষ্মীর পূজা হবে, স্থির হল।

লক্ষ্মীপূজো'র সঙ্গে কলার পেটোর উপরে তিনটি পিটুলীর পুতুল সবুজ হলুদ লাল, তিন রঙে প্রস্তুত করে, রাখা হয়। এই পুতুলগুলিও অনার্য্য-লক্ষ্মীপূজার নিদর্শন। এই তিন পুতুলকে বলা হয়—লক্ষ্মী, নারায়ণ আর কুবের। কিন্তু এঁরা আসলে যে কি তা আমরা দেখব। সবুজ হলুদে লাল পুতুল, আর অলক্ষ্মী-বিদায়ের ছেঁড়া খানিক মাথার চুল—এইগুলির কোনো অর্থ অন্য-দেশের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে পাই কিনা দেখি। পূর্ব্বেই দেখেছি, মেক্সিকোতে কোজাগর লক্ষ্মীপূজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয়,—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছা-গোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়।—"the women of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long"

মেক্সিকোর পুরাণে আরো দেখা যাচ্ছে শস্যের রক্ষয়ত্রা তিন-বর্ণের তিন-দেবতা।

ফলন্ত স্বর্ণশস্যের হলুদ এবং আর-এক আতপতপ্ত সুপক্ক শস্যের সিন্দূরবর্ণ।

মেক্সিকোতেও শস্যের নানা অবস্থায় এক-এক দেবী রক্ষা করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে 'Centeotl' এবং তাঁদের একজন Xilonen সবুজ, অপক্ক-শস্যের অধিষ্ঠাত্রী।

"A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or other of the various aspects of the Maize-plant"......"Xilonen—she typified the xilote or green ear of the Maize. (Page 85, Myths of Mexico and Peru.)

আমাদের দেশে মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড় লক্ষ্মীব্রত করে থাকেন। প্রথম ফাল্গুনমাসে বীজ-বপনের পূর্ব্বে। কৃষীরাই বেশী এ-ব্রত করে—রবি আর বৃহস্পতিবারে। এঁকে বলা যেতে পারে হরিতা-দেবী—সবুজবর্ণ। এই পূজা করে' তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয়। দ্বিতীয় লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে আশ্বিনে কোজাগর-পূর্ণিমায়—যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। ইনি হলেন স্বর্ণলক্ষ্মী,—হলুদবর্ণ। তৃতীয় লক্ষ্মীব্রত হল অগ্রাণে, যখন প্যাকা ধান ঘরে এসেছে;—ইনি অরুণা লক্ষ্মী। মেয়েরা বছরে আরো-কয়েকবার লক্ষ্মীব্রত করেন,—যেমন ভাদ্রে, কার্ত্তিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি ঐ তিন লক্ষ্মীব্রতরই ছাঁচে ঢালা। দেখা গেল, প্রাচীন লক্ষ্মীব্রতের অনার্য্য কতক অনুষ্ঠান গেল ঘরের বাইরে—যেমন অলক্ষ্মী; কতক রইল ঘরের মধ্যে—যেমন কুবেরের

বড় লক্ষ্মীপূজো কোজাগর-পূর্ণিমায়। তারি ব্রতকথা থেকে বেশ বোঝা যায়, অলক্ষ্মী আর লক্ষ্মী দুই দেবতার পূজো নিয়ে দেশের মধ্যে একসময় বেশ-একটু গোলোযোগ চলছে। কথাটি এই—

এক দেশের রাজার নিয়ম ছিল হাটে কেউ কিছু যদি বিক্রি করে উঠতে না পারতো, তবে তিনি রাজ-ভাণ্ডার থেকে হাট শেষ হলে হতাশকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে ঝড়তি-পড়তি সবই নিজের জন্যে কিনে রাখতেন। এম্‌নি একদিন এক লোহার দেবীমূর্ত্তি এক কামারের কাছ থেকে হাট-শেষে রাজা কিন্‌লেন—কামার যখন রাজ-বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল। রাজা সত্যপালনের জন্যে সেই লোহার দেবী কিন্‌লেন এবং ঘরে আন্‌লেন। লোহার মূর্ত্তি ছিল অলক্ষ্মীর। লক্ষ্মী অম্‌নি সেই রাত্রেই বিদায় হয়ে যান; রাজা বল্লেন আমি সত্যপালন করেছি এতে দোষ কি? লক্ষ্মী রাজাকে বর দিলেন তিনি পশু-পক্ষীর কথা বুঝবেন কিন্তু লক্ষ্মী আর রাজ্যে রইলেন না। এম্‌নি-এম্‌নি প্রথমে রাজলক্ষ্মী তার পর ভাগ্যলক্ষ্মী যশলক্ষ্মী সবাই একে-একে গেলেন; তার পর ধর্ম্ম আর কুললক্ষ্মী চল্লেন। রাজা ধর্ম্মকে বল্লেন—কুললক্ষ্মী যেতে চান্‌ তো যান, কিন্তু ধর্ম্ম, আপনি তো যেতে পারেন না, কেননা আমি সত্যধর্ম্ম পালন করতেই এ কাজ করেছি। ধর্ম্ম রাজ-বাড়ীতেই রইলেন।

এর পরের কথাটুকুর মর্ম্মঃ—রাণী দেখেন রাজা পিঁপড়েদের দিকে চেয়ে একদিন ভোজনের সময় হেসে উঠলেন। পিঁপড়ে-

গুলো রাজার পাতে খাবার সময় ঘী না দেখে রাজাটা যে গরীব এই বলাবলি কচ্ছিল। রাজা হঠাৎ হাসলেন কেন, এই কথা রাণী জানতে চাইলে, অনেক পেড়াপিড়িতে রাজা সম্মত হয়ে—কথাটা প্রকাশ কল্লে তাঁর মৃত্যু জেনেও—গঙ্গাতীরে রাণীকে নিয়ে গিয়ে একটা ছাগল আর ছাগলীর ঝগড়া শুনলেন :—নদীর মধ্যে একবোঝা ঘাস দেখে ছাগলী সেটা চাচ্ছে আর ছাগল তাকে বলছে, আমি কি রাজার মতো বোকা যে তোর কথায় প্রাণ হারাতে যাবো। রাজা তখন রাণীকে তাড়িয়ে দিলেন। তার পর রাণী অনেক কষ্টে লক্ষ্মীপূজো করে তবে রাজা রাজ্য সব ফিরিয়ে আনলেন।

দুই ধর্ম্ম, দুই দেবী, দুইদল মানুষে যে দুই পূজো নিয়ে একটা বেশ গোলোযোগ চলেছিল এবং শেষে নতুন লক্ষ্মীই যে দেশের প্রাচীন লক্ষ্মীর পূজা দখল করেছিলেন এবং হাটে যে পূর্ব্বকালে প্রাচীনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি বিক্রি হতে আসতো এবং সেটি রাজা কিনে ধর্ম্মলোপের ভয় করেন নি, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

মেয়েরা যে-যে-মাসে লক্ষ্মীব্রত করছে এবং অন্য দেশের লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে আমাদের পূজাটি মিলিয়ে দেখলে দেখি যে, লক্ষ্মীব্রত হচ্ছে দেশের তিন প্রধান শস্য-উৎসব। কিন্তু পূজারীরা লক্ষ্মীব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণন করে যে শ্লোকটি মেয়েদের শুনিয়ে দেন, সেটা থেকে কিছুতে বোঝা যাবেনা যে এই ব্রত অফলন্ত, ফলন্ত এবং সুপক্ক শস্যের উৎসব-অনুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় শ্লোক বলছে—

"লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত সর্ব্বব্রত সার,
এ ব্রত করিলে ঘোচে ভবের আঁধার।
বন্ধ্যানারী পুত্র পায় যায় সর্ব্ব দুখ,
নির্ধনের ধন হয় নিত্য বাড়ে সুখ॥"

ধানের কি কোনো শস্যের নাম-গন্ধ এতে পাওয়া গেল না! প্রাচীনকালের প্রধান উৎসব এবং শস্য দেবতারা খুবই প্রসিদ্ধ বলে এই ব্রতকে হিঁদুয়ানীর চেহারা দেবার জন্য এর উপর এত জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে যে আসল-ব্রতটি কেমন ছিল তা আর এখন কতকটা কল্পনা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যে ব্রতগুলি ছোট এবং অপ্রধান বলে শাস্ত্রের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে অনেকটা অটুট অবস্থায় রয়ে গিয়েছে তার থেকে ব্রতের খাঁটি ও নিখুঁৎ চেহারাটি পাওয়া সহজ। যেমন এই 'তোষ্‌লা' ব্রতটি। কোথাও একে বলে "তুঁষ্‌তুষ্‌লি!" পূর্ব্ব-বঙ্গে পশ্চিম-বঙ্গে দু-জায়গায়ই এই ব্রতের চলন আছে। প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে। ব্রতের বিধি এই :—অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রতি-সকালে স্নান করে গোবরের ছ'বুড়ি ছ'গণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পাকিয়ে, কালো দাগ-শূন্য নতুন সরাতে বেগুন-পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক'টি রাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি করে সিঁদুরের ফোঁটা এবং পাঁচগাছি করে দুর্ব্বা-ঘাস গুঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সর্ষে সিম মূলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সার-মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্ব্বর করে ...

ব্রত। ব্রতের ছড়াগুলি পূর্ব্ববঙ্গে এক, পশ্চিম-বঙ্গে আর-এক হলেও ছড়াগুলি পড়তে-পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবন-যাত্রার এমন-একটি পরিষ্কার ছবি মনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় ব্রতে আমরা পাই না। পৌষমাসে এদেশে বেশ একটু শীত, এবং সকালবেলার ব্রত এটি, কাজেই আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি বহুযুগ-আগেকার বাংলাদেশের এক-খানি গ্রামের উপর রাত্রির যবনিকা আস্তে সরে গেল; সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দেখ্‌ছি শীতের হাওয়া বইছে,—গ্রামের উপরে বড় গাছের আগায় এখনো কুয়াশা পাতলা চাদরের মতো লেগে রয়েছে; শিশিরে সকালটি একটু ভিজে-ভিজে; বেড়ার ধারে-ধারে আর চালে-চালে সিমপাতার সবুজ; ক্ষেতে-ক্ষেতে মুলোর ফুল, সরষের ফুল—দুধ আর হলুদের ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে; নতুন সরায় বেগুন-পাতা চাপা দিয়ে, সার-মাটি নিয়ে মেয়েরা দলে-দলে তোষ্‌লা ব্রত করতে ক্ষেতের দিকে চল্লো এবং সেখানে মুলোর ফুল, সিমের ফুল, সরষের ফুল দিয়ে ব্রত আরম্ভ হল—

প্রথম, তোষ্‌লার স্তুতি—

"তুঁষ-তুঁষলি, তুমি কে!
তোমার পূজা করে যে,—
ধনে ধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি অন্ত॥
তোষ্‌লা লো তুঁষকুন্তি!
ধনে ধানে গাঁয়ে গুন্তি,
ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি॥"

তারপর অনুষ্ঠান-উপকরণের বর্ণনা, যেমন—

"গাইয়ের গোবর, সর্‌ষের ফুল,
আসনপিঁড়ি, এলোচুল,—
গেয়ের গোবরে সর্‌ষের ফুল,
ঐ কোরে পুজি আমরা মা-বাপের কুল।"

'আসনপিঁড়ি এলোচুল'। এখানে আমরা সেই মেক্সিকোর মেয়েদের এলোচুলে ব্রত করার প্রতিচ্ছবিটি পাচ্ছি। এর পরে মেয়েরা তোষ্‌লা-ব্রতের কামনা জানাচ্ছে—

"কোদাল-কাটা ধন পা'ব,
গোহাল-আলো গরু পা'ব,
দরবার-আলো বেটা পা'ব,
সভা-আলো জামাই পা'ব,
সেঁজ-আলো ঝি পা'ব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পা'ব।
ঘর করবো নগরে,
মরবো গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।"

তারপর, পৌষের সংক্রান্তির দিনে মেয়েরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রত সাঙ্গ করে একটি সরায় ঘীয়ের প্রদীপ জ্বেলে সেগুলি মাথায় নিয়ে সারি-বেঁধে নদীতে স্নান করে তোষ্‌লা ভাসাতে চলেছে। পায়ের তলায় মাটি ঠাণ্ডা; হিম বাতাস, নদীর শীতল জলের পরশ পেয়ে, কন্‌কনে বইছে। এই শীতের জল-স্থল-আকাশের প্রতিধ্বনি দিচ্ছে মেয়েরা নদীতে যাবার পথে—

"কুলকুলনি এয়ো রাণী,
মাসে মাসে শীতল পানি,
শীতল শীতল ধাইলো,
বড় গঙ্গা নাইলো।"

এর পর, নিথর শীতের মধ্যে সূর্য্যের ও পৃথিবীর মিলনের একটু আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌লো—

"শীতল শীতল জাগে,
রাই বিয়ে মাগে।"

এর পর, গঙ্গাতীরে জলের কলধ্বনি, পাখীদের কাকলীর সঙ্গে সূর্য্যের বরযাত্রার বাদ্য বাজ্‌ছে—

"আমাদের রায়ের বিয়ে
ঝাম্‌-কুর্‌-কুর্‌ দিয়ে।"

তখনো রাত্রের শিশিরে-ভেজা শাক-শবজীর পাতাগুলি ঘুমিয়ে রয়েছে; সেই সময় বরবেশে সূর্য্য আসছেন; তারি সূচনা একটু ঝিক্‌মিকে সোনার আলো।

"বেগুন-পাতা ঢোলা-ঢোলা
রায়ের কানে সোনার তোলা।"

এইখানে নদীতে তোষ্‌লার সরা ভাসিয়ে তোষ্‌লার সার-মাটি আর সূর্য্য—চাষের দুই প্রধান সহায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেয়েদের জলে ঝাপাঝাপি বালি-খেলা—

"তোষ্‌লা গো রাঙ্গি, তোমার দৌলতে
আমরা ছ-বুড়ি পিঠে খাই,
ছ-বুড়ি ন-বুড়ি গাঙ্‌-সিনানে যাই,
গাঙের বালিগুলি দুহাতে মোড়াই,
গাঙের ভিতর লাড়ু কলা ডব্‌ডবাতে থাই।
তুষ্‌লী গো রাঙ্গী, তুষ্‌লী গো ভাই,
তোমার ব্রতে কিবা পাই?
ছ-বুড়ি ছ-গণ্ডা গুলি খাই,
তোমাকে নিয়ে জলে যাই,
তুষ্‌-তুষ্‌লী গেল ভেসে—
বাপ-মার ধন এল হেসে,
তুষ্‌-তুষ্‌লী গেল ভেসে—
আমার সোয়ামির ধন এল হেসে।"

এর পর, সূর্য্যের উদয় দর্শন করে স্নান করে ব্রতশেষে নদীতীরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় বর্ণন করে ছড়া—

"রায় উঠছেন রায় উঠছেন বড়-গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতেরে তেল-গামছা?
দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠছেন রায় উঠছেন মেজো-গঙ্গার ঘাটে।
কার হাতেরে শাঁখা সিঁদুর?
দাওগো রেয়ের হাতে।
রায় উঠছেন রায় উঠছেন ছোট-গঙ্গার ঘাটে।
রায় উঠছেন অন্নে, তামার হাঁড়ির বর্ণে,
তামার হাঁড়ি, তামার বেড়ি—"

এর শেষটুকুতে হিঁদুয়ানী আপনার নাম দস্তখত করে এক আঁচড় দিয়েছে—'উঠ-উঠ মা-গৌরী নিবেদন করি'। হঠাৎ মা-গৌরী এসে কেন যে বেড়ি ধরেন তা বোঝা গেল না। ঝক্‌ঝকে আয়নার উপরে পেরেকের আঁচড়ের মতো এই শেষ লাইনটা; বা যেন মিশনারি-স্কুলেপড়া মেয়ের মুখে—'বড় মেম নমস্কার'—খাপ্‌ছাড়া, শ্রুতিকটু, অর্থহীন। এর পর মেয়েরা ঘরে এসে পোষমাসের পিঠে খাবার আয়োজন করে যে ছড়া বল্‌ছে—সেটাও এ-লাইনটার চেয়ে সহজ আর সুন্দর—

"আখা জলন্তি, পাখা চলন্তি,
চন্দন-কাষ্ঠে রন্ধন ঘরে,
জীরার আগে তুষ পোড়ে,
খড়িকার আগে ভোজন করে,
প্রাণ স্বচ্ছন্দে নতুন বসতে
কাল কাটাবো মোরা জন্মায়স্তে।"

তোষ্‌লা-ব্রতের অনুষ্ঠান—এই শীতের প্রভাতের দৃশ্য-পটগুলি আর সদ্যস্নাত মেয়েদের মুখে সিন্দুর এবং মার্জ্জিত তামার বর্ণ রক্তবাস সূর্য্যের উজ্জ্বল বর্ণনা আমাদের সহজেই সেই-কালের মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে দেখি মানুষে আর বিশ্ব-চরাচরের মধ্যে সরস একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে ;—গড়াপেটা শাস্ত্রীয় ব্রতের এবং হিন্দুয়ানীর আচার-অনুষ্ঠানের চাপনে মানুষের মন যেখানে সব-দিক দিয়ে অনুর্ব্বর, নিরানন্দ এবং প্রাণহীন হয়ে পড়েনি। এই তোষ্‌লা ব্রতের জীবন্ত দৃশ্যকাব্যটির সঙ্গে ছোট-একটি শাস্ত্রীয় ব্রত মিলিয়ে দুয়ের মধ্যে কি নিয়ে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট ধরা পড়বে। হরিচরণ ব্রত। বছরের প্রথম মাসে, খুব ছোটো মেয়েরা এই ব্রত করছে—চন্দন দিয়ে তামার টাটে হরিপাদপদ্ম লিখে। কিন্তু এই ব্রতে ছোটো মেয়ের মুখের কথা বা প্রাণের আনন্দ এমন-কি ছোটোখাটো আশাটুকু পর্য্যন্ত নেই। পাকা-পাকা কথা এবং জ্যাঠামিতে ভরা এই শাস্ত্রীয় ব্রতটি অত্যন্ত নীরস। হরির পাদপদ্মে পূজো দিয়ে পাঁচ-ছয়-বছরের ছোট মেয়েগুলি বর চাইছে—গিরিরাজ বাপ, মেনকার মতো মা, রাজা সোয়ামি, সভা-উজ্জ্বল জামাই, গুণবতী বৌ, রূপবতী ঝি, লক্ষ্মণ দেবর, দুর্গার আদর—"দাস চান্‌, দাসী চান্‌, রূপার খাটে পা মেল্‌তে চান্‌, সিঁথেয় সিঁদুর, মুখে পান, বছর-বছর পুত্র চান্‌।" আর চান্‌—"পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে একগলা গঙ্গাজলে মরণ এবং উবোতে পারলে ইন্দ্রের শচীপনা, না পাল্লে কৃষ্ণের দাসীগিরি!"

হরিচরণ-ব্রত করছে এই যে মেয়েগুলি

বৈশাখের সকালবেলায়, আর শীতের সকালে শীর্ণধারা নদীতীরে, তোষ্‌লা ব্রতের দিনে, সর্ষে সিম এম্নি নানা ফুলে সাজানো সরা ভাসিয়ে, স্রোতের জলে নেমে, সূর্য্যের উদয়কে এবং শস্যের উদ্গমকে কামনা করছে যে মেয়েগুলি,—এই দুই দলে কি বিষম পার্থক্য, দুই অনুষ্ঠানেই বা কি-না তফাৎ! একদল একগলা গঙ্গাজলে আত্মহত্যায় উদ্যত; অন্যদল বিশ্বচরাচরের সঙ্গে সূর্য্যের আলোতে হলুদ, সাদা ফুলে-ফুলে-ভরা ক্ষেতের মতো জেগে-ওঠবার জন্যে আনন্দে উদ্‌গ্রীব!

প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এই সব অশাস্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্য্য-রকম সৌন্দর্য্যে রসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালীর সম্পূর্ণ-নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলব কি ষড়ঋতুর এক-একটি উৎসব বোলব ঠিক করা শক্ত। চৈত্রের এই অশথ-পাতার ব্রত—যার সমস্ত অনুষ্ঠানের অর্থ হচ্ছে, কিশলয় থেকে ঝরে-পড়া পর্য্যন্ত কচি, কাঁচা, পাকা এবং শুক্‌নো পাতার একটুখানি ইতিহাস; তাকে কি বল্‌ব?

বসন্তের বাতাস লেগে গত শীতের শুক্‌নো পাতা গাছের তলায় ঝরে পড়েছে; নদীর ধারে অশথ, কুঞ্জলতা, চাঁপাসুন্দরী আর শ্যাম পণ্ডিতের ঝি—কেউ পাকা-পাতার তামাটে লাল, কেউ কাঁচা-পাতার সতেজ সোনালি সবুজ, কেউ কচিপাতার কোমল শ্যাম, কেউ শুক্‌নো-পাতার তপ্ত সোনা, কেউ বা ঝরাপাতার পাণ্ডুর রঙে সেজেছে।

'অশথ পাতা' কুঞ্জলতা, চম্পকসুন্দরী আর

এই তিন বনসুন্দরীর সঙ্গে সেজেগুজে ব্রত করতে বেরিয়েছেন শ্যাম পণ্ডিতের ঝি। শ্যাম পণ্ডিতের সাত-সাত বৌ, জোয়ান সাত বেটা, পণ্ডিতের গিন্নি, আর বুড়ো পণ্ডিত নিজে,—ছোট, বড়, আরো-বড়, একেবারে বুড়ো,—কচি মেয়েটি, কাঁচা বয়সের বৌ-বেটা, পাকাগিন্নি আর বিষম শুক্‌নো কর্ত্তা।

"অশত্থপাতা কুঞ্জলতা চম্‌কাসুন্দরী!
গঙ্গাস্নান করতে গেলেন শ্যাম-পণ্ডিতের ঝি;—
সাত বৌ যায় সাত দোলায়,
সাত বেটা যায় সাত ঘোড়ায়,
কর্ত্তা যান গজহস্তীতে,
গিন্নি যান রত্ন-সিংহাসনে,
ঠাকুর ঠাকৃরুণ দোলনে যান।

এই ছড়াটি পরিষ্কার বোঝাচ্ছে, বসন্তের দিনে নদীর ধারে চাঁপা কুঞ্জলতা অশত্থ এদের একটা উৎসব চলেছে—সবুজে পাণ্ডাশে নতুন-ফুটে-ওঠা থেকে আস্তে ঝরে-পড়ায় দলে-দলে বুড়ো-বুড়ি ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী এই উৎসব দেখতে আসছে—কেউ হেলতে দুলতে, কেউ নাচতে নাচতে, কেউবা গজেন্দ্রগমনে! এর পরেই ঠাকুর ঠাকরুণ। এঁরা যে কোন্ দেবতা তা বলা যায় না। শিব-দুর্গা হতে পারেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারেন, পিতৃ-পুরুষদেরও কেউ হতে পারেন: এঁদের দুজনে কথা হচ্ছে—

ঠাকুর জিজ্ঞাসেন—ঠাকৃরুণ! নরলোকে গঙ্গার ঘাটে কি ব্রত করে?

উত্তর—অশত্থপাতার ব্রত করে!

প্রশ্ন—এ ব্রত করলে কি হয়?

উত্তর—সুখ হয়, সহায় হয়, সোয়াস্তি হয়।

এর পর ঠাকুর দেখলেন ছেলে বুড়ো সবাই মিলে একটি করে পাতা মাথায় রাখছে আর জলে ডুব দিচ্ছে আর পাতাগুলি জলের স্রোতে ভেসে চলেছে। ঠাকুর ভেবে পান না মানুষরা সব করে কি? এই বসন্ত-কালে, লোকে এ কি পাগলামি করতে লাগল! তখন ঠাকৃরুণ তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করে বলছেন, এরা গাছে আর মানুষে মিলে এক-এক পাতার কামনা জানিয়ে ব্রত করছে।

এরা—"পাকা পাতাটি মাথায় দিয়ে—
পাকাচুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিয়ে—
কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুক্‌নো পাতাটি মাথায় দিয়ে—
সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
ঝরা পাতাটি মাথায় দিয়ে—
মণি-মুক্তোর ঝুরি পরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিয়ে
কোলে কমল পুত্র ধরে।"

এই ব্রতটিকে বসন্তদিনে মানুষে আর গাছ-পালায় মিলিয়ে একটুখানি রূপক—ছোট-একটু নাটকের মতো করে গাঁথা হয়েছে ছাড়া আর কি বলা যাবে? এইতো একটুখানি ব্রত, কিন্তু তবু এর মধ্যে বসন্তের দিনে নতুন এবং পুরোনোর, মানুষের এবং বনের নিশ্বাসটুকু যখন এক-তালে উঠছে পড়ছে দেখি তখন এটিকে ছোটো বলতে ইচ্ছা হয় না; এইটুকুর মধ্যে কতখানির ইঙ্গিত, কতখানি রস না পাচ্ছি!

মেয়েলী-ব্রতে দেব-দেবীকে দেখি, একেবারে নির্ম্মল,—তরল যতটা হতে হয়। "ভাদ্রে ভাদুলী—নদী বৃষ্টির জল" রোদ আর

বৃষ্টি—দুয়ের মাঝে তিনি জোড়া-ছত্র মাথায় বর্ষা এবং শরতের আশা আশীর্ব্বাদে ভরা দুই ঋতুর দিন-রাত্রির দুই নৌকায় পা রেখে আসছেন।

সেঁজোতি হলেন—

"সাঁজ পূজন সেজোতি
বারোঘরে তেরো বাতি।"

সন্ধ্যা, সাঁঝের বাতি, জাঁতি ফুল, সন্ধ্যার একটুখানি ঝিক্‌মিক্—এই সব মিলিয়ে জ্যোতিরূপিণী সেঁজুতী। এঁদের সন্ধান কোন্ শাস্ত্র দেবে?

খাঁটি মেয়েলী-ব্রতগুলি ঠিক কোনো দেবতার পূজো নয়। এর মধ্যে ধর্ম্মাচরণ কতক; কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটু-খানি। কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতি-ধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্য নৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্ম্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্ততঃ এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।

'আদর-সিংহাসন' ব্রতে মানুষ আদর চেয়ে—মিষ্টি কথা পাবার কামনা করে তো শাস্ত্রীয় হরিচরণ-ব্রতের মতো তামার টাটে দেবতার-পাদপদ্ম লিখে পূজা করে বরপ্রার্থনা করছে না! সে যেমন-আদরটি কামনা কচ্ছে সেটি একটি জীবন্ত প্রতিমার মধ্যে ধরে দেখবার আয়োজন করছে। সত্যি এক স্বামিসোহাগিনীকে সাম্‌নে বসিয়ে বসনে-ভূষণে সাজিয়ে যেমন আদর সে

অ তার

মূর্ত্তিমতী কামনাকে অর্পণ করছে এবং জানছে যে এতেই তার আদর-পাওয়ার কামনা চরিতার্থ হবে নিশ্চয়। এইখানে ব্রত আর পূজোতে তফাৎ।

মেয়েলী-ব্রতগুলির সব-কটি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। কালে কালে তাদের এত ভাঙচুর অদলবদল উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে যে কোন্‌টা পূজো কোন্‌টা ব্রত ধরতে হলে আদর্শ ব্রতের লক্ষণগুলির সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে গোলে পড়তে হয়। খাঁটি ব্রতের লক্ষণ মোটামুটি এই বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে:—খাঁটি ব্রতে ব্রতীর কামনার সঙ্গে ব্রতের সমস্তটার পরিষ্কার সাদৃশ্য থাকা চাই,—জল চেয়ে পাদপদ্ম লিখে তাতে ফুল দিলে চলবেনা;—জলকে প্রত্যক্ষ করতে হবে বৃষ্টির অনুকরণে ঝারা দিয়ে কিম্বা বৃষ্টির ছবি লিখে বা বৃষ্টির বর্ণনা করে ছড়া বেঁধে অথবা এই তিন ক্রিয়ারই একত্রে অনুষ্ঠান করে। ইচ্ছা, বাইরের কোনো ঘটনা-থেকে —যেমন আকালের দিনে শস্যের কামনা— কিম্বা নিজের অন্তর-থেকে অকারণে উঠে মনকে দোলা দিচ্ছে এবং সেই দোলা মানুষের নানা চেষ্টায় প্রতিফলিত হয়ে একটা চরিতার্থতা পাচ্ছে, ধরতে গেলে, এই হল ব্রত। কিন্তু এর মধ্যে একটু কথা রয়েছে। ক্রিয়া যখন একের মধ্যেই ধরা রইল তখনতো সেটিকে ব্রত-অনুষ্ঠান বলা চলে না; ব্রতে দেখি, দশে একই প্রেরণার বশে, একই ক্রিয়া করে চলেছে। তবেই বলতে হবে ব্রত হতে হলে একের কামনা অথবা একের মনের দোলা দশকে দুলিয়ে একটা ব্যাপার হয়ে নাচে গানে ভোজে ইত্যাদিতে অনুষ্ঠিত

হওয়া দরকার। আমাদের নিত্যভোজন ও পরিপাক—আমাদের ইচ্ছা এবং শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া; কিন্তু সেটাকে তো ব্রত-অনুষ্ঠান বলব না; কিন্তু পাকস্পর্শ কিম্বা পিঠে-পার্ব্বন এর এক-একটা অনুষ্ঠান। যখন একজন মুসলমান নমাজ করছে প্রতিদিন, তখন সে ধর্ম্ম করছে বলতে হবে, কিন্তু সে ব্রত-অনুষ্ঠান করছে তখন, যখন সে আর দশহাজার মুসলমানের সঙ্গে একত্র হয়ে ইদের পর্ব্বদিনে এক ভঙ্গীতে নতি-প্রণতি দিচ্ছে দেখি। আবার হাজার লোক যখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মার-মার করে ছুটেছে তখন সেটিকে কোনো অনুষ্ঠান বলবনা, কিন্তু হাজার সেপাই যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে প্রতিদিন মাঠে কুচ্‌ করছে দেখি তখন একটা অনুষ্ঠান চলেছে বলব।

কামনা এবং তার চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া যখন একেরই মধ্যে কিম্বা অসংহত ভাবে দশের মধ্যে ছাড়াছাড়ি অবস্থায় রইলো তখন সেই একেরই সঙ্গে বা একে-একে দশের সঙ্গে তার লোপ হয়ে গেল। কিন্তু এক ভাব, এক ক্রিয়া যখন সমস্ত জাতিকে প্রেরণা দিলে তখন সেটি ব্রত হল, এবং বেঁচেও রইল দেখি।

আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্যে আধুনিক কিণ্ডার-গার্টেন প্রণালীর মতো ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে গেছেন! শাস্ত্রীয় ব্রত-গুলি কতকটা তাই বটে, কিন্তু আসল মেয়েলী ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরও পূর্ব্বেকার পুরুষদের; —তখনকার—যখন শাস্ত্র হয়নি, হিন্দুধর্ম্ম বলে একটা ধর্ম্মও ছিল না এবং যখন ছিল লোকেদের মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান যে-গুলির নাম ব্রত।

এই-সব ব্রতের মূলে কিসের প্রেরণা রয়েছে বলা শক্ত। মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, না মানুষের শিল্প-সৃষ্টির বেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে এই ব্রতগুলি সেটা পরিষ্কার করে দেখার পূর্ব্বে ব্রতগুলির সঙ্গে পরিচয় আরো-একটু ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া দরকার। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ; খাঁটি ব্রতের লক্ষ্য ও লক্ষণ দুইই তাতে নেই; সুতরাং সেগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল খাঁটি মেয়েলী ব্রত কি-ভাবে আপনাদের প্রকাশ করছে তাই দেখি।

প্রথমে দেখি, কতকগুলি ব্রত—যাতে কামনা এবং আল্‌পনা ও ছড়া একটি অন্যকে অনুকরণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। যেমন, কামনা হল সোনার চিরুনি, সোনার কৌটো, আয়না, পাল্‌কি। সেখানে পিটুলীর আল্‌পনা দিয়ে একটা চিরুনি একটা কৌটা, পাল্‌কি একটা, আয়না একটা আঁকা হল এবং তাতে ফুল ধরে ধরে বলা হল—

"আমরা পূজা করি পিঠালীর চিরুনি,
আমাগো হয় যেন সোনার চিরুনি।
আমরা পূজা করি পিঠালীর কুটুই,
আমাগো হয় যেন সোনার কুটুই।
আমরা পূজা করি সোনার পাল্‌কি,
আমাগো হয় যেন সোনার পাল্‌কি।"

এখানে, চিরুনি-দেবতা, কৌটা-দেবতা, পাল্‌কি-দেবতা ইত্যাদিকে পূজা করে বর

চাওয়া। একেবারে কাজের কথা, এবং যতটুকু কাজের কেবল ততটুকু, একটু বাজে কিছু নেই। যা চাই তারি অনুরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কল্পনা করে বর প্রার্থনা।

আর-এক রকম, তাতে কামনার অনুরূপ ছড়া কিন্তু আল্পনাটি ভিন্নরূপ। মাদার গাছ এঁকে বলা হচ্ছে,—

"আমরা পূজা করি চিত্রের মান্দার,
আমাগো হয় যেন ধান চাউলের ভাণ্ডার।"
"আমরা পূজা করি পিঠালীর মান্দার,
সোনায় রূপায় আমাগো ঘর আন্ধার!"

মাদার-গাছের সঙ্গে ধান-চাল, সোনা-রূপোর পরিষ্কার যোগ নেই অথচ তাতে ফুল দিয়ে বর চাওয়া হল এবং এখানেও কাজের জন্য যতটুকু, ততটুকু হল—আল্পনা, এবং ততটুকু হল ছড়া! গদ্য-সাহিত্য আধুনিক, সুতরাং কথায় এখন যা বলি, পূর্ব্বে যখন পদ্যই সাহিত্যের ভাষা তখন ছড়াগুলি পদ্যেই বলা হত। কিন্তু এই ধরণের ছড়াকে কবিতা কিম্বা গান, কি নাটক কিছুই বলা যায় না। এরা কেবল পদ্যে মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করছে—এই মাত্র। 'জল দে বাবা' না বলে বলছি 'দে জল, দে জল বাবা!' এতে জল আছে স্পষ্ট বোঝালো কিন্তু কাব্যরস তো নেই! এই ধরণের ছড়া কিম্বা এই ছাঁচের ব্রতগুলিতে পদ্য, আল্পনা ও নানা-চলাবলা থাকলেও, এগুলিকে কোনো দিন চিত্রকলা কি কাব্য বা নাট্য-কলা বলে ধরা সম্ভব নয়। কিন্তু পরে যে দু-একটি ব্রতের ছড়া প্রকাশ করছি সেগুলির গঠনের এবং বাঁধুনীর প্রণালী দেখলেই বোঝা যাবে তার মধ্যে নাট্যকলার লক্ষণ কেমন পরিস্ফুট।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষা ও সাধনা

ভাবুক এডমণ্ড হোম্‌স্‌ আমাদের দেশে অপরিচিত নন। Creed of Buddha (বুদ্ধের ধর্ম্ম) নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষের সাধনা সম্বন্ধে ইঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সম্প্রতি শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে ইঁহার মতামতের একটু পরিচয় দিব।

হোম্‌স্‌ খুব বড় করিয়াই শিক্ষা জিনিসটিকে দেখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা বলিতে কতকগুলি খবরের সমষ্টিমাত্র বুঝি, যা ছেলেদের যেন-তেন-প্রকারে গলাধঃকরণ করাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইনি শিক্ষাকে মানুষের জীবনের সাধনারই প্রথম সোপানরূপে দেখিয়াছেন।

হোম্‌স্‌ মানুষের সাধনাকে প্রাকৃতিক জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বীজ যেমন বাহিরের আনুকূল্যে অন্তর্নিহিত প্রকৃতির প্রেরণায় যতদিন তার বৃক্ষ-জীবন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, কেবলি বাড়িতে থাকে, মানুষের আত্মাও তেমনি পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠে। কি করিলে তার অন্তর্নিহিত

শক্তি গোড়া হইতেই অবাধে বিকশিত হয় সেইটিই শিক্ষকের ভাবিবার বিষয়।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে তাহার বৃদ্ধির সহায়তার জন্য প্রকৃতি কতকগুলি প্রবৃত্তি (instincts) দিয়াছেন, যেমন খাইবার এবং হাত-পা নাড়ার প্রবৃত্তি; এই ভাবে অজ্ঞাতসারে শিশুর শরীর পুষ্টিলাভ করিতে থাকে; তেমনি তার আত্মার বৃদ্ধির জন্যও ব্যবস্থা আছে। যে কেহ শিশুকে লক্ষ্য করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে সে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে ভালবাসে—

(১) কথা বলা এবং শোনা
(২) অভিমান করা
(৩) আঁকা
(৪) নাচা এবং গান করা
(৫) প্রশ্ন করা
(৬) জিনিষ তৈরি করা

এই সমস্ত প্রবৃত্তির কি উদ্দেশ্য, তাহা একটু তলাইয়া দেখা যাক্।

(১) কথাবার্ত্তা বলা ও শোনাই পরে লেখা ও পড়ার মধ্যে প্রসারতা লাভ করে। এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু অন্যান্য জীবনের সঙ্গে তার যোগ স্থাপনা করে।

(২) শিশু যখন সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করে, তখন প্রায়ই দেখা যায়, তাহারা নিজেদের অন্য-কিছু কল্পনা করিয়া লইয়া—অর্থাৎ প্রবীণ বা আর-কিছু সাজিয়া অভিনয় করে। এই উভয় প্রবৃত্তিতেই দেখা যায় যে শিশুরা কল্পনা ও সহানুভূতির সাহায্যে বাহিরের প্রাণীদের মধ্যে আপনাদিগকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে।

(৩) শৈশব হইতেই ছেলেরা ছবি ভালবাসে, পরে নিজেরা আঁকিতে চায়। পেন্সিল ও কাগজ, খড়ি, কয়লা, রংএর বাক্স প্রভৃতি দিলেই শিশু কিছু-না-কিছু আঁকিতে বসিয়া যায়। এই প্রবৃত্তির দ্বারা শিশু নিজের অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আপনার আনন্দ প্রকাশ করে।

(৪) নাচে এবং গানে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দ, সকলেরই এটি জানা কথা। এই দুইটি প্রবৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে শিশুর জীবন বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে।

(৫) শিশুর প্রশ্ন করার অভ্যাসও সুবিদিত।

(৬) শিশুকে এক বাক্স খেলনা ইট দিলে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি তৈরির কাজে কাটাইয়া দিবে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের ঘরকন্নার খেলা সকলেরই জানা আছে। এই প্রবৃত্তি দুটির সাহায্যে শিশু প্রকৃতির কলকারখানার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিবার চেষ্টা পায়। প্রকৃতির এই দ্বারটি জ্ঞানের চাবির দ্বারাই খোলা যায়।

প্রথম দুটি বৃত্তির সাহায্যে শিশুর আত্মা প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়—দ্বিতীয় দুটির সাহায্যে সৌন্দর্য্যের দিকে এবং শেষের দুটির সাহায্যে সত্যের দিকে। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের দিকে প্রকৃতি নিজেই অহরহ শিশুর আত্মাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

হোম্‌স্‌ বলেন শিক্ষকের কাজ শিশুর এই স্বভাব-দত্ত বৃত্তিগুলির বিকাশের সাহায্য করা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই বিকাশের নাট্যলীলায় শিশুকেই প্রধান অভিনেতা করিতে হইবে। শিশু আপনার

আনন্দে আপনাকে বড় করিয়া তুলিবে—শিক্ষক বাগানের সুদক্ষ মালীর কাজ করিবেন মাত্র।

গ্রন্থকার ইংলণ্ডের একটি বিদ্যালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন,—যেখানে এই প্রণালী-অনুসারে কাজ হয়। ইহাতে হোম্‌সের কথার মূল্য আরো বাড়িয়া গেছে, কারণ কল্পনার সঙ্গে তথ্যের মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়টির বিস্তারিত বর্ণনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, তবে একটু উল্লেখ করিতে পারি।

(১) এখানে ক্লাসে ছেলেদের কথাবার্ত্তা বলায় কোন বাধা নাই। পাঠের সময় তাদের প্রশ্ন করিতে এবং অবাধে মতামত ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করা হয়। এ ছাড়া খেলা, অভিনয় প্রভৃতি কাজ তারা নিজেরাই আলোচনার দ্বারা ঠিক করে।

(২) অভিনয় ত ইস্কুলের একটি প্রধান অঙ্গ। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অভিনয়ের জন্য তারা নিজেরাই দস্তরমত নাটক তৈরি করে এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস বা বড় কোন ইতিহাস হইতে সেই সময়কার প্রচলিত সাজসজ্জা ঠিক করিয়া লয়। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক বা কোন ভাল উপন্যাসের অংশবিশেষও তারা অভিনয় করে। এইরূপে অন্য মানুষের স্থলে নিজেদের অধিষ্ঠিত করিতে করিতে তারা ক্রমে উদারতা, দয়া, প্রীতি ও সহানুভূতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

(৩) আঁকা-শেখানোর সম্বন্ধে সেখানকার শিক্ষক বলিতেছেন, "আমি প্রত্যেক শিশুকে একটি করিয়া আইভি-পাতা দিলাম; এবং লতাটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। পরে আমি বলিলাম, এইবার তোমরা মাঝে মাঝে পাতাটির দিকে দেখিয়া পাতাটি আঁকো দেখি।" অনেকেরই আঁকায় অবশ্য ভুল হইল, কিন্তু আমি বোর্ডে শুদ্ধ করিয়া আঁকিয়া দিই নাই। আমি তাদের বলিলাম, 'এই এই জায়গায় কি পাতাটির সঙ্গে তোমার ছবির মিল আছে? কি তফাৎ? কি রকম করিলে ইহা বদলানো যায়? ইত্যাদি, ইত্যাদি।' আমি শিশুদের দিয়াই তাদের ভুল বলাইয়া লই। বোর্ডে ছবি আঁকিয়া দিই না।" এই স্কুলে ছবি দেখিয়া ছবি আঁকার নিয়ম নাই।

(৪) এই বিদ্যালয়ে ইংলণ্ডের লোক-গাথা (folk-song) এবং মরিস্‌-নৃত্য শেখানো হয়। আর একটি উপায়ে ইহাদের পাঠের মধ্যেই সুরের জাল বোনা হয়। ইহারা যখন সেলাই, অঙ্কন বা অন্য কোন কাজ স্থিরভাবে করিতে থাকে, তখন শিক্ষক কোন উচ্চ অঙ্গের সুর বাজাইতে থাকেন, সেটা তাদের কাজ ও চিত্তের গভীর তলদেশে সুর সঞ্চারিত করিতে থাকে।

(৫) প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের (Nature-study) ক্ষেত্রেই জিজ্ঞাসু বৃত্তি খোরাক পায়। যখনি ফুল, পাতা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক জিনিষ সম্বন্ধে ক্লাসে আলোচনা হয়, প্রত্যেক শিশুর হাতে তখনি একটি করিয়া সেই জিনিষ ও একখানি আতস কাচ (lens) দিয়া জিনিষটিকে খুব তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হয়, যখনি কোন বিশেষত্ব ধরা পড়ে, তৎক্ষণাৎ শিশুরা তার কারণ বাহির করিতে চেষ্টা পায়; এই চেষ্টাতে তারা খুব বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ

করে এবং শিক্ষকের সাহায্যে ইহার সত্য কারণ ও সেই বিশেষত্বের সঙ্গে সমস্ত জিনিষটির সম্বন্ধ আবিষ্কার করে। এইরূপে কেবল যে তাদের প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণের শক্তি বাড়ে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন-বৃত্তিরও উন্নতি হইতে থাকে।

(৬) পাখীরা যেমন বসন্তকালে বাসা বাঁধে, এখানকার শিশুরাও তেমনি হাতের কাজ করিতে ভালবাসে। এ কথা সত্য যে সাধারণ স্কুলের মত বাগান-করা বা রন্ধনবিদ্যা সম্বন্ধে প্রণালী-বদ্ধ কোন ব্যবস্থা নাই, কিন্তু সখের বাগান করা, রন্ধন করা, কাঠের কাজ করা ইস্কুলের একটি প্রধান অঙ্গ, গড়িবার এই বৃত্তিটিকে এইটুকু কাজের মধ্যেই থামিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষক সমস্ত বিদ্যালয়টি গড়িয়া তুলিবার ভার শিশুদের হাতে দিয়াছেন, যাহাতে ক্রমে ক্রমে ইহা স্বায়ত্তশাসনকারী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়।

এই ত গেল বাহিরের প্রণালীর কথা; কিন্তু ইহার ভিতরে শিক্ষার যে গভীর তত্ত্বটি আছে সেটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হোম্‌সের বইখানি পড়া দরকার। তিনি বলেন, মানুষের আত্মা যদি আপন প্রকৃতির প্রেরণায় এইরূপে নানাদিকে প্রসারিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তার ছোট-আমির নাগপাশ-বন্ধন আপনা হইতেই খুলিয়া পড়িবে। পৃথিবীর বারো আনা পাপের মূল হইতেছে, অহঙ্কারে ছোট-আমিকে সত্য-আমি বলিয়া মনে করায়। মানুষের বড়-আমি যদি একবার খোরাক পাইয়া সত্য ও সতেজ হইয়া ওঠে, তাহা হইলে ছোট-আমি আপনিই কোথায় মিলাইয়া যাইবে এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি পাপ তাহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। শিশুর প্রসারণী বৃত্তিগুলি এই বড়-আমির প্রকৃতি-দত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অতএব ইহাদের খোরাক যোগানোই শিক্ষা ও সাধনার একমাত্র কাজ।

সব দেশেই নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষাকে ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের মত এক একটা "বিষয়" করিয়া তোলার চেষ্টা দেখা যায়; হোম্‌সের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই। হোম্‌স্ বারম্বার এই কথাই বলিয়াছেন, বাহির হইতে যা দি, তার দ্বারা আমরা আত্মাকে আঘাত করি; ভিতর হইতে শিশু আপনি যা লয়, তার দ্বারাই তার আত্মা পুষ্টি লাভ করে। হোম্‌সের শিক্ষার আদর্শ যে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য একটি জায়গা উদ্ধৃত করি—

"Far from wishing to secularise education, I hold that it cannot be too religious. And, far from wishing to limit its religious activities to the first forty minutes of the morning sessions, I hold that it should be actively religious through every minute of every school session, that whatever it does it should do to the glory of God."

তাৎপর্য্য—"শিক্ষাকে পার্থিব ব্যাপার করিয়া তোলা দূরে থাক্, আমার মতে ইহা একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া উচিত। এবং ধর্ম্মশিক্ষাকে প্রথম-চল্লিশ মিনিটে আবদ্ধ না রাখিয়া আমার মতে ইস্কুলের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে ইহার

অধিকার করা উচিত, যাহাতে ইস্কুলের সমস্ত কাজ ভগবানের মহিমা প্রচার করে।”

যাঁহারা Creed of Buddha সাধন-তত্ত্বের সহিত পরিচিত, তাঁহারা এই পুস্তকে আত্মোপলব্ধির পথের প্রথম অংশটি দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইবেন, সেই পথে কি করিয়া মানুষের আত্মা একেবারে শিশুকাল হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিতে পারে, প্রতি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের এই আগ্রহ চিত্তকে মুগ্ধ করে। তাই মনে হয় ভাবুক সাধকেরাই যেন মানুষের শিক্ষার ভার নেন,— পণ্ডিতদের সংসদ নয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাল্যদান

(১২)

আমাদের দেশেই বিশেষতঃ বুঝি সকল মঙ্গল-কার্য্যের মূলেই মতানৈক্য সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যায়াম-সমিতিও যে তাহার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

প্রথমতঃ—অতুলেশ্বরের মাসহারাভোগী প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ বেকার আত্মীয় অনাত্মীয়-দল যাঁহারা কর্ম্মেশ্বরের মোসাহেবি করিয়া দিনপাত করিতেন তাঁহারা এই অবসরে পুরাতন স্মৃতি উদ্‌ঘাটিত করিয়া পুরাতন রাজার স্তুতিবাদ ছলে বর্ত্তমান রাজার মতি-গতির নিন্দা আরম্ভ করিলেন। সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এই এমন একটি আলোচনা আছে, যাহাতে আমাদের দেশেও মতের একতা দেখা যায়। সকলেই তাঁহারা এক বাক্যে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, প্রসাদপুর আর পুরুষের রাজ্য নহে, তাঁহারা বাস করিতেছেন এখন নারীরাজ্যে! আহা সে কি সুখের দিনই গিয়াছে! রাজার পশ্চাতে মদের বোতল লইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন রাঙ্গারসে আকণ্ঠ তাঁহাদের ভরিয়া উঠিত! আর এখন তামাকটা আফিংটাও কষ্টে জোটে! হায়রে!

যুবকেরা গন্‌গন্ করিতে লাগিল, অন্য-কারণে। রাজকুমারী পণ্ডিত মহাশয়কে সমিতির সেক্রেটারী করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তাহাদের অসহ্য বোধ হইল। যদিও ইহারা সকলেই প্রায় প্রসাদপুরের স্কুলে পড়ে, অতএব পণ্ডিত-মহাশয়ের ছাত্র,—হইলে কি হয় সংস্কৃত শেখান এক কথা, আর ব্যায়াম-বিস্তার অধ্যক্ষতা করা অন্যকথা। হাজার হোক তাহারা রাজার আত্মীয় কুটুম্ব, তাহাদের মধ্যে এ পদের উপযুক্ত লোক কি কেহ ছিল না! প্রকাশ্যে কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট এ আপত্তি তুলিতে তাহারা সাহসী হইল না। তবু ভাবে-গতিকে এই অসন্তুষ্টি বুঝিয়া লইয়া, তর্ক-যুক্তিতে মিষ্টবাক্যে বালিকা তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, পণ্ডিত মহাশয় সেক্রেটারী হইয়াছেন বলিয়া, ইহাতে তাহাদের অপমান নাই। চিরদিনই এদেশে ব্রাহ্মণেই অস্ত্রবিদ্যারও গুরু হইয়া আসিয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি, অসুরগুরু শুক্র, এবং কুরু পাণ্ডব-গুরু দ্রোণাচার্য্য সকলেই ব্রাহ্মণ।

অতএব এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহাশয়ের নিয়ন্ত্র কর্ত্তৃত্বে তাহাদের ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণ বা নজীর নাই।

এইরূপ নানা বাধা বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া তেজস্বিনী নারী অবশেষে জয় লাভ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার সমিতি বড় ছোট ছেলের দলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজবংশীয় এবং প্রজাবংশীয় যুবকদিগের সম্মিলনে রীতিমত ব্যায়াম কার্য্য চলিতে লাগিল। লাঠিখেলার সর্দ্দার হইল হরিরাম, তাহার সহকারী স্বরূপ আরও কয়েকজন পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা ছোট খাঁড়া চালাইতেও শিখাইত। ইহাছাড়া কুস্তি, দৌড়ধাপ, হাডুডুডু, ব্যাটবল প্রভৃতি নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া চলিত। প্রত্যেক খেলার জন্য সপ্তাহে দুই এক দিন করিয়া সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী ছোট লাঠি লইয়া অন্তঃপুরেও একটি ক্লাশ খুলিয়া দিল। ফুটবল ক্রিকেট খেলা হইত একটু দূরের মাঠে, কিন্তু লাঠি খেলা ইত্যাদির জন্য ছেলের দল সপ্তাহে তিনদিন রাজবাড়ীর পশ্চাতের আম-বাগানে আসিয়া জড় হইত। রাজা খেলার সময় সবদিন উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলেও অধিনায়কতা করিত তাঁহার কন্যা। ছেলেরা সকলেই বয়সে তাহার বড়—বালিকার পিতার বয়সী দুচারজন লোকও ইহার মধ্যে ছিলেন—যেমন পণ্ডিত মহাশয়! কিন্তু সকলকেই জ্যোতির্ম্ময়ী সেনাপতির ন্যায় পরিচালনা করিত। কোন ছেলের পদাঙ্গুলিটুকুও সীমানা রেখার বাহিরে পড়িয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ীর ইঙ্গিতে সে তটস্থ হইয়া যথাস্থানে দাঁড়াইত। লাঠিখানা কেহ ঈষৎ অযথা ভাবে ধরিলে জ্যোতির্ম্ময়ী নিজে লাঠি বাগাইয়া ধরিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিত। কোন দলে কোন ছেলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে তাহাও ঠিক করিয়া দিত জ্যোতির্ম্ময়ী। কেবল হার-জিতের মীমাংসা করিতেন স্বয়ং রাজা। জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচালনায় পণ্ডিত-মহাশয়ের ন্যায় শ্মশ্রুধারী ব্যক্তিও যেন লাটিমের ন্যায় ঘুরিতেন। তাহার উৎসাহ-কটাক্ষে শ্রান্ত খেলোয়ারগণও নব বলে যেন বলীয়ান হইয়া উঠিত। সমিতির অভিধান হইতে শ্রান্তি ক্লান্তি কথা দুইটা একেবারেই যেন উঠিয়া গিয়াছিল। এইরূপে নামে মাত্র পণ্ডিত-মহাশয় রহিলেন কর্ত্তা কিন্তু আসলে কর্ত্তৃত্ব করিত তাঁহার ছাত্রী। ইহাতে রাজ-আত্মীয়গণের মনের মেঘও ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। রাজা এই ক্ষণজন্মা নারীর কার্য্য-কলাপ মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়া ভাবিতেন,—না জানি কোন্ মহাকার্য্য সাধন-উদ্দেশ্যে ইহার জন্ম?—অথবা এই অসাধারণ রমণীর জীবনের পরিণতি অবশেষে সাধারণ ভাবেই সম্পন্ন হইবে? মনোদেবতার নিকট হইতে রাজা এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইতেন না।

বাধার আর শেষ নাই। ব্যায়াম পরীক্ষার দিন সন্নিকট, রাজা সহসা ঘোড়া হইতে পড়িয়া জখম হইলেন। তিনি অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন জীবন-পুরের সীমানা পরিদর্শনে, ইহার প্রান্তে তাহার এক সরিকের জমীদারী। সরিক অপর কেহ নহেন, বিজনকুমারের পিতা। ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ শঙ্কর রায় যোগমায়া দেবীর দূরসম্পর্কীয় খুল্লতাত ছিলেন। রাজা কন্যাকে রাজ্য-

ধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবংশকে বিষাদপুর জমীদারী দিয়া যান। কিন্তু এই দানে সন্তুষ্ট বা কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, শঙ্কর রায়ের সন্তানসন্ততিগণ বংশপরম্পরায় চিরদিনই যোগমায়া দেবীর বংশের প্রতি একটা বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কন্যাকে আবার কোন্ রাজা বিষয়বিভব প্রদান করে? রাণীর নামে রাজসিংহাসনে বসায়? প্রধান বংশের কাহাকেও তিনি পোষ্যপুত্র লইতে পারিতেন না কি? তাহা না করিয়া ন্যায়তঃ প্রসাদপুর-বংশকেই তিনি ত ফাঁকি দিলেন।

যাঁহার বিষয় ছিল তিনি যে ইচ্ছা করিলে এক কানাকড়িও তাহাদের নাও দিতে পারিতেন, এ কথা মনে করিয়া কেহ এ বংশের প্রতি কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ অবকাশ পাইলেই প্রসাদপুরের রাজাকে তাহারা ক্লেশ দিয়াই আনন্দ অনুভব করে। উভয় পক্ষীয় প্রজার মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ত এজন্য প্রায় লাগিয়াই আছে। অথচ প্রকাশ্যে ইঁহাদের মধ্যে ভদ্রতা-সৌজন্যের ত্রুটি নাই। কোন ক্রিয়া-কর্ম্মে উভয় দলেই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। এবং দেখা হইলেই উভয় পক্ষ—বিশেষতঃ বিষাদপুর-পক্ষ মিষ্ট সম্ভাষণে আত্মীয়তার উৎস ছুটাইয়া দেন।

আপাততঃ বিজনকুমারের পিতা সুজন রায় বিষাদপুরে আসিয়াছিলেন—অতুলেশ্বরের প্রজাগণ তাঁহার আগমনে অতিরিক্ত উৎপাত সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুজন রায়ের মস্তিষ্ক এত উর্ব্বর যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আগে হইতে বুঝিয়া সাবধানতা অবলম্বন করাও সহজ নহে। যাহা হউক, রাজা উভয় সীমানার মধ্যে লোকজন যথেষ্ট রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং প্রায়ই প্রতিদিন নিজে একবার এদিকে আসিয়া খোঁজ খবর লইয়া যাইতেন।—

আজ পরিদর্শনের পর গৃহে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—জীবনপুরের পুল পার হইয়া বন্য রাস্তায় পড়িবামাত্র ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তেজস্বী আরব প্রভুর একান্ত বাধ্য, কিন্তু আজ রাজার ইঙ্গিতে সে চলিল না, কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইল।—রাজা এদিক ওদিক চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, রাত্রি হইয়া পড়িলে বিপদ ঘটিতে পারে—তিনি ঘোড়াকে কশাঘাত করিলেন—অগত্যা ঘোড়া ছুটিল, কিন্তু দশপদ জমি অগ্রসর হইতে না হইতে হঠাৎ গাছ হইতে একটা বিকটাকার জন্তু রাজার মাথার উপরে লাফাইয়া পড়িল—এই অসতর্কিত অবস্থায় ঘোড়া ও অশ্বারোহী দুজনেই পড়িয়া গেলেন।

জন্তুটাও সঙ্গে সঙ্গে নীচে পড়িয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল—রাজাকে আক্রমণ করিবে বা ঘোড়াকে—সে যেন ভাবিবার জন্য মুহূর্ত্ত কাল সময় গ্রহণ করিল। এই অবসরে ভূপতিত অবস্থাতেই বক্ষের পিস্তল ডান হস্তে বাহির করিয়া লইয়া রাজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িলেন। কুঁইকুঁই শব্দে কাতরোক্তি করিয়া জন্তুটা শুইয়া পড়িল। রাজা তখন দেখিলেন, সে একটা বনমানুষ! সেই সময় রাজার পশ্চাৎবর্ত্তী ঘোড়সওয়ার দুইজন রঙ্গস্থলে আসিয়া পড়িয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাইতে বিলম্ব করিল না।

রাজা পড়িয়া জানুদেশে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন। সওয়ারদের সাহায্যে কষ্ট-শ্রষ্ঠে পুনরায় ঘোড়ায় উপর বসিয়া কোনরূপে বাড়ী আসিয়া পড়িলেন,—তাঁহার মৃত শীকারও তাঁহার সঙ্গে আনীত হইল।

প্রসাদপুরের টেলিগ্রাম আফিস ৯টার পর বন্ধ হইয়া যায় সুতরাং সে রাত্রে আর কলিকাতায় তার পৌঁছিল না। পরদিন সংবাদ পাইয়া শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য যথাসময়ে ডাক্তারাদি সহ যে প্রসাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহা পাঠক ইতিপূর্ব্বেই অবগত আছেন।

রাজবাড়ীর সকলেই বুঝিল—এই নূতন রকম উৎপাত সুজন রায়েরই সৃষ্টি। তাহার পিতা মাতা কেন যে পুত্রের দুর্জ্জন নাম না দিয়া অনর্থক এই সাধুনামটির পর্য্যন্ত অবমাননা করিয়াছেন, এই পুরাতন আক্ষেপোক্তি আবার অনেকেরই মুখে নূতন সুরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজবাড়ীর মনের কথা বাহিরে প্রকাশ হইতে না হইতে সুজন রায় নিজেই রাজাকে নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিলেন যে "তাঁহার পলাতক পোষ্য নরবানর কর্ত্তৃক রাজা আহত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার দুঃখের শেষ নাই। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার লোকজন এ কয়দিন উহাকে ধরিতে পারে নাই, রাজা উহাকে মারিয়া ভালই করিয়াছেন।" পত্রে এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না, একদিন রাজাকে দেখিতেও আসিলেন। তখন জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার নিকটে ছিল, তাহার মহিমময়ী সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। জীবনে এই প্রথমবার মনে একটা অনুতাপও জাগিল—যে ইহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, অত্যাচার তাঁহার কর্ত্তব্য হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে সংকল্প জাগিল যে এই কন্যার সহিত বিজন কুমারকে বিবাহসূত্রে গাঁথিয়া উভয় রায়-বংশকে এক করিবেন। ইহাতে রাজকন্যা এবং রাজত্বের অধিকারী হইবেন তাঁহারা —এবং পরস্পরের মনোমালিন্যও চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে।

এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় তিনি বিলম্ব করিলেন না,—রাজাকে দেখিবার পর মহারাণীর চরণধূলি গ্রহণ বাসনায় অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এবং রীতিমত ভাবে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। মহারাণী ইহাতে মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, মেয়ের ত বিবাহ দিতেই হইবে, এমন সুবিধামত ঘর বর আর মিলিবে কোথা! তবে নিজের ছেলের উপর তাঁর বিশ্বাস নাই,—রাজা যে এ প্রস্তাবটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন—তাহা ত বলা যায় না!

মহারাণী তাই আহ্লাদ প্রকাশের মধ্যেও একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন -"আমার ত বাবা খুবই ইচ্ছে দুহাত বাঁধা পড়ে, দুই পরিবার এক হয়ে যায়। কিন্তু আজ কাল সেদিন নেই তাও ত দেখছ বাবা! মেয়েকে যে রকম স্বাধীন করে তুলেছে বাপ, কোন দিন সে কারো গলায় নিজে মালা তুলে না দিলে বাঁচি।"

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন—"তা স্বয়ম্বর সভায় আমার ছেলে যদি বসে, তার গলাতেই মালা উঠবে—কাকিমা; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

মহারাণীও হাসিলেন,—বলিলেন "তা বেশ! বিজনকুমার কি এখানে এসেছে? তাকে তবে পাঠিয়ে টাটিয়ে দিও। মেয়ে ছেলে দুজনের পরিচয় আগে হোক্। আজকাল ত আমাদের ইচ্ছাতেই শুধু কাজ হবে না।"

রায়মহাশয় বলিলেন—"বিজন কলকাতা-তেই আছে। আমি যত শীঘ্র পারি বাড়ী গিয়ে তাকেই জমীদারী দেখতে এখানে পাঠাব।"

মহারাণী রাজার কাছে, সুযোগমত একদিন এ কথা পাড়িলেন,—রাজা কিন্তু এ প্রস্তাব একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া বসিলেন,—বলিলেন, "বাপকো বেটা ত? অমন কুচক্রী বাপের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রে কখনই আমি বিয়ে দেব না। তবে মেয়ে যদি কোন দিন আপনা থেকে ওকে বিয়ে করতে যায় ত স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তারও কোনই সম্ভাবনা নেই।"

মহারাণী মনে মনে ভারী রাগিয়া গেলেন, —রাজার যে কি রকম মতিগতি হইয়াছে, —ভালকথা যা বলা যায় তাই মন্দ হইয়া ওঠে। তবুও হাল ছাড়িলেন না—ভাবিলেন, "বেশ, তবে তাই হবে,—মেয়ে নিজেই যাতে পছন্দ করে বিয়ে করতে চায়—সেই চেষ্টাই দেখা যাবে।"

(১৩)

ঘোড়া হইতে পড়িয়া রাজার যেরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, আসলে সেরূপ কোন ক্ষতি হয় নাই। জানুর অস্থি সরিয়া পড়িলেও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সেই জন্য যথাশীঘ্র তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে নিরাপদ দেখিয়া দু-এক দিনের মধ্যেই চলিয়া গেলেন। কাজকর্ম্ম ফেলিয়া শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যও অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতার দলের মধ্যে শরৎকুমার একাকী মাত্র রাজ-চিকিৎসকরূপে তাঁহার সেবার জন্য এখানে রহিয়া গেলেন।

রাজা পড়িয়া গিয়া পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়ী পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে ছেলেদের ব্যায়াম খেলার সময় উপস্থিত থাকিতে পারে না। ছেলেরা আপনারা খেলে, ঝগড়া করে, সর্দ্দারদের উপর সর্দ্দারি করিয়া শিক্ষার বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। পণ্ডিত-মহাশয়ের সাধ্য কি তাহাদের রাশ টানিয়া সোজা রাখেন! অথচ শরৎকুমার যখন মাঝে মাঝে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়ান—তাঁহাকে সর্দ্দাররূপে মানিতে তাহারা অপমান বোধ করে না। কেন না প্রতিপদেই তাঁহার নায়ক যোগ্য ভাব তাহারা অনুভব করিয়া স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকৃষ্ট হইয়া উঠে।

জ্যোতির্ম্ময়ী বিকাল বেলা পিতার নিকট থাকিয়া প্রায়ই শরৎকুমারকে এ-সময়টা খেলিবার ছুটি দেন। শরৎ কোনদিন বা ফুটবল কোনদিন বা ক্রিকেট খেলায় যোগদান করেন,—আর কোনদিন বা লাঠি খেলার স্থলে উপস্থিত থাকিয়া কাহারও ভুল চুক দেখিলে সংশোধন করিয়া

দেন। শরৎকুমার ইহাদের মধ্যে সম্প্রতি দুইটি অভিনব খেলার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

গৎকা, এবং ইংরাজি প্রথায় দস্তানা ধারণে ঘুসা-ঘুসি খেলা।

এইস্থানে গৎকা খেলার একটু ব্যাখ্যা করিলে যাঁহারা এ খেলা দেখেন নাই তাঁহাদের বুঝিতে সুবিধা হইবে।

গৎকা চামড়া মোড়া একরূপ ছোট লাঠি, ইহা থাকে খেলকের ডান হাতে, আর বামহাতে থাকে একটা হরিণ শৃঙ্গ, ইস্ক্রুপ দ্বারা আঁটা দুইটা ছোট হরিণ শৃঙ্গ দ্বারা ইহা প্রস্তুত। ইহা ঢাল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন স্থলে ইহাদ্বারা বিপক্ষের প্রহার হইতে সাধারণতঃ আত্মরক্ষা করা হয় এবং সুবিধামত বিপক্ষকে ইহা দ্বারা খোঁচা দেওয়াও চলে। এই খেলায় ডান পা সম্মুখে রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অর্দ্ধভঙ্গ ঠাটে দাঁড়াইতে হয়।

রাজা বেশ ভাল হইয়া উঠিলেন। জন্মাষ্টমীর উৎসব দিনে বালিকা পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবে, সেইদিন তাহার ব্যায়াম-সমিতির পরীক্ষা উৎসব। কিছুদিন হইতে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভাদ্রমাস, কি জানি যদি বৃষ্টি আসিয়া পড়ে, মাঠের স্থানে স্থানে ছোট তাম্বু পড়িল। ফুটবল প্রভৃতি দৌড়ধাপ খেলার মুক্তমাঠ এক পাশে রাখিয়া অন্যপাশে একটা বড় চালা বাঁধা হইল, চালার মধ্যে প্রেসিডেণ্টের মঞ্চের চারিদিকে দর্শকদিগের স্তরনির্ম্মিত আসন, এবং মধ্যস্থলে ঘুষাঘুষি ও লাঠি খেলা প্রভৃতির স্থান নির্ম্মিত হইল।

শরৎকুমার কলিকাতার অভিজ্ঞ লোক; তাঁহার উপরেই প্রধানতঃ এই আয়োজনের নেতৃত্ব ভার পড়িয়াছে, তিনিও প্রসন্নচিত্তে এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন! রাজা কন্যার সহিত মাঝে মাঝে এখানে তত্ত্বাবধান করিতে আসেন; শরতের কার্য্যোদ্যম, ক্ষিপ্রকারিতা এবং দূরদর্শিতা দেখিয়া পিতা কন্যা উভয়েই মুগ্ধ হইয়া যান। শরৎ যেন চলিয়া কাজ করিতে জানে না, সে কাজ করে ছুটিয়া।—অধিকন্তু রাজা এ সম্বন্ধে এমন কোন উপদেশও ইঙ্গিতও করিতে পারেননা—যাহা ইতিপূর্ব্বে শরৎ ভাবিয়া ঠিক করিয়া না লইয়াছে।

ছেলের দলের আনন্দ উৎসাহের সীমা নাই। দুর্গা-পূজার প্রতিমা গঠনের সময় যেরূপ আনন্দোৎসাহে বালকেরা মূর্ত্তি গঠন নিরীক্ষণ করে—সেইরূপ আনন্দে তাহারা মত্ত। প্রভেদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাহারা দর্শক নহে, সকলেই এক একজন গঠন-তৎপর পটুয়া। পণ্ডিত-মহাশয়ের হাতে-কলমে কিছুই বড় একটা করিতে হয় না। বিনা শ্রান্তিতেও হাঁপাইয়া উঠিয়া তিনি কেবল মাঝে মাঝে বন্দেমাতরং বলিয়া ডাক ছাড়েন,—ছেলেরাও কাজ করিতে করিতে পণ্ডিত-মহাশয়ের সহিত সমস্বরে বন্দেমাতরং শব্দে গগন ফাটাইয়া তোলে। ছেলের দল এই এক বিষয়ে নির্ব্বিরোধে তাঁহাকে মানিয়া চলে।

এইরূপ আনন্দমত্ততার মধ্যে যথাসময়ে উৎসব আয়োজন সম্পন্ন হইল। মাঠ, চালা, তাম্বু, রঙ্গিন বস্ত্রে, নিশানে, ফুলে ফুলে সজ্জিত হইয়া উঠিল।

প্রেসিডেণ্টের নামে প্রসাদপুরের সকল

ইংরাজই নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজার নামে ধনী দরিদ্র সকল প্রজাই আহূত হইল। আশে-পাশের জমীদার এবং কর্ম্মচারীগণও নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। যাঁহারা পত্র পান নাই--তাঁহারাও ভিক্ষা করিয়া নিমন্ত্রণ লইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য বিজনকুমার কিছু পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদপুরে আসিয়াছেন—এবং তাঁহারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে।

আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর মহানন্দের দিন। কিন্তু সে আনন্দে তাহার অধীরতা প্রকাশ পায় নাই। ম্যাজিষ্টেট সাহেব সস্ত্রীক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র ছেলেরা বন্দেমাতরং ধ্বনিতে তাঁহাদের সমাদৃত করিয়া মঞ্চে আনিয়া বসাইল। রাজা কন্যাকে লইয়া প্রেসিডেণ্টের পাশেই বসিলেন, বিজনকুমার তাঁহাদের পার্শ্বেই স্থান গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ইংরাজ ও জমীদারগণও বসিলেন এইস্থানে।

সভাপতি এবং তৎপত্নীকে ফুলগুচ্ছ এবং ফুলমাল্য উপহারে জ্যোতির্ম্ময়ী অভিনন্দিত করিবার পর কতকগুলি গেরুয়াবস্ত্রপরিহিত ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণ-বেশী বালক গান আরম্ভ করিল—

ভিক্ষাং দেহি জননি গো ভরিয়ে দে এ ঝুলি;
আর কিছু চাহি না ত শুধু পদধূলি।
শুধু মাগো চাই বর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
তোমার সেবায় প্রাণ পূণ্য করে তুলি।
মনে রাখি যেন তোরে সকল কাজে,
তোর দুঃখ নিশিদিন প্রাণে যেন বাজে।
তব মুখ সব আগে যেন নিত্য মনে জাগে
তোমার চিন্তাতে যেন সব চিন্তা ভুলি।

গানের পর প্রেসিডেণ্ট অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহার পর খেলা আরম্ভ হইল। ফুটবল প্রভৃতি খেলা কাল হইবে, চালার ভিতরে যে সব খেলা হইতে পারে—তাহারই দিন আজ। প্রথমে আরম্ভ হইল কুস্তি। তাঁহার মীমাংসা হইয়া গেলে—১৫ মিনিট কাল অবসর দেওয়া হইল। ইহার পর লাঠালাঠি প্রভৃতি খেলা আরম্ভ হইবে।

(১৪)

সকলে খেলা দেখিতে মত্ত, কিন্তু বিজনের সেদিকে মন ছিল না; সে মাঝে মাঝে জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে আড়নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিম্নলিখিত কবিতার লাইনটি মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিল।

"Fain would I climb,
but that I fear to fall—"

যদি জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মনের কথা জানিতে পারিতেন তাহাহইলে কি রাজ্ঞী এলিজেবেথের মতন বলিতেন—

"If thy mind fail thee,
do not climb at all"

বিজনের বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রণে যাইবার সময় কত জরীজড়াও কিংখাপ বস্ত্রে, কত রাশি রাশি রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া ওঠেন, আজ জ্যোতির্ম্ময়ীর সাজসজ্জার অনাড়ম্বর বিজনের চক্ষে ভারী নূতন বলিয়া ঠেকিল। বালিকা পরিয়াছে একখানি জরী-কিনার নীলাম্বরী বারাণসী সাড়ি, তদুপযোগী একটি জ্যাকেট ও ওড়না। অলঙ্কার দুচারিখানি যাহা পরিয়াছে বসনের মধ্যে সেগুলি একরূপ ঢাকাই পড়িয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে কেবল তাহার শিরোভূষণ—ওড়নার উপরিস্থিত হীরক টায়েরা—রাজা আজ তাহার জন্মদিনে এই উপহারটি প্রদান করিয়াছেন। এই মুকুটচ্ছটায় তাহাকে চিত্রাঙ্কিত দেবী মূর্ত্তির ন্যায়ই জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

ভারত-কন্যা এত সুন্দরী! ইংরেজগণ মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া বঙ্গান্তঃপুরের মহিমা কল্পনা করিতেছিলেন। আর বিজনকুমার? এই জ্যোতির নিকট কিরূপে পৌঁছিবে, কখনও পৌঁছিতে পারিবে কি না তাহাই ভাবিয়া একান্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্যায়াম-ক্রীড়ার ১৫ মিনিট কাল বিরাম অবসরে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন তাম্বুতে আহারে আহূত হইলেন।

দেশী বিলাতি কোনরূপ ভোজায়োজনেরই ত্রুটি ছিলনা। রাজা ম্যাজিষ্ট্রেটপত্নীকে করদান পূর্ব্বক লঞ্চ গৃহে লইয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব করপ্রসারণ পূর্ব্বক জ্যোতি-র্ম্ময়ীকে বলিলেন—"May I have the pleasure of" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহাকে আস্তে আস্তে কি বলিল—তিনি হাসিয়া বলিলেন—"Very well, let thy Will be done, my queen" বলিয়া আর একজন ইংরাজ-পত্নীকে হস্তদান পূর্ব্বক লঞ্চে লইয়া গেলেন।

ইংরাজরা সকলেই এবং অনেক বাঙ্গালীও ইহাদের অনুসরণ করিলেন। বাকী সকলকে ছেলেরা দেশী ভোজের ঘরে লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িল, কিন্তু বিজনকুমার উঠিল না।—জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তাম্বুতে গিয়ে খেতে কি আপনার আপত্তি আছে?" বিজন কি উত্তর দিবে যেন ভাবিয়া পাইল না। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন— "বেশ, আপনি তবে এই খানেই কিছু খান—"

একজন যুবক ভলণ্টিয়ার মঞ্চের নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে বলিলেন, "সন্তোষ, কিছু খাবার এখানে আনতে বলবে তুমি?"

তাহার মুখের কথা শেষ না হইতে হইতে শরৎকুমার পুরোবর্ত্তী হইয়া আর একটি ছেলের সহিত মিষ্টান্নের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা হাসিয়া বলিল—"ডাক্তার-দা নিজেই যে খাবার নিয়ে হাজির!"

শরৎ হাতের থালা টেবিলে রাখিয়া কহিল' "আশা করি অন্যায় কাজ করি নি?" বালিকা কহিল "অন্যায়! খুবই ন্যায় কাজ করেছেন। নইলে আমার অতিথি অভুক্ত থাকতেন, সে পাপ লাগত আমাকে।"

"বেশ আপনারা খান। চল কান্তি, আমরা লেমনেড আর আইস ক্রিম নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া শরৎকুমার চলিয়া গেলেন, বিজন থালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—কত রকমের খাদ্য! স্যাণ্ড-উইচ, প্যাটি, নানাবিধ কেক; নানা রকম মিষ্টান্ন! অন্য সময় হইলে এ সকলের লোভ সম্বরণ তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ আতিথ্যকারিণী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী! তাহার দিকে চাহিয়া তাহার কেমন যে বিভ্রম উপস্থিত হইল—সহজ ভাবে সে কোন খাদ্যই উঠাইয়া লইতে পারিল না। জ্যোতির্ম্ময়ী আবার বলিল—"খান না বিজন বাবু! এখনি ত আবার সভা পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

শরৎ সম্ভাষিত হয়—দাদারূপে—আর বিজন যে ব্যক্তি যথার্থই রাজকুমারীর একজন আত্মীয়, সে হইল বাবু পদবাচ্য—হায়রে!

কিন্তু আর খাইতে দেরী করাটা সত্যই ভাল দেখায় না; মনের জ্বালা মনে চাপিয়া বিজনকুমার একটা 'ম্যারাং' হাতে তুলিয়া লইল। মুখে তুলিতে গিয়া তাহার মনে হইল—আদব-কায়দার ত্রুটি হইতেছে না ত? রাজকুমারীকে তাহার কি খাইতে অনুরোধ করা উচিত ছিল না? সে সহজ ভাবে বলিতে চেষ্টা করিল—"আপনি খাবেন না?" বলিয়া হাতটা তাহার দিকে বাড়াইবা মাত্র 'ম্যারাং'টা হস্তচ্যুত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর পদ বস্ত্রের উপর পড়িয়া ফাটিয়া গেল; মধ্যস্থিত ক্রিমে তাহার নীলাঞ্চল শাদা হইয়া উঠিল। এম্‌নি বিজনের দুর্গ্রহ,—ঠিক এই সময় কি শরৎকুমার আসিয়া পড়িবেন! তাহার সহচর ভলেণ্টিয়ার এই ঘটনায় কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া লইল; শরৎকুমার নিঃশব্দে হাতের ট্রে-খানা টেবিলে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল একখানা বাহির করিয়া লইয়া বেশ সচ্ছন্দ স্বাভাবিক ভাবে বালিকার কাপড়ের ক্ষীরটা মুছিয়া তুলিয়া দিল। বিজনকে অপ্রস্তুত দেখিয়া তাহার লজ্জা দূর করিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতির্ম্ময়ী মধুর হাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "কিছু মনে করবেন না—বিজনবাবু, সেদিন আমিও একজন মেমের কাপড়ে কাফি ফেলে দিয়েছিলুম।—তাড়াতাড়িতে অনেক সময় এমনতর হয়েই থাকে।" কিন্তু বিজনকুমারের তাহার শিরা উপশিরা কাঁপিয়া উঠিল। আর শরৎকুমারের সহজ নিঃসঙ্কোচ ভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া মনে মনে তাহাকে শত সহস্র অভিশাপ দিতে লাগিল। বিজন যদি জানিত, কিছুদিন পূর্ব্বে হাসিকে একটি ফুল দিতে গিয়া শরৎকুমারের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা হইলে বোধ হয়—তাহার মনের জ্বালার একটু নিবৃত্তি হইতে পারিত।

শরৎ পুনরায় কাজে চলিয়া গেলেন। বিজনের আহারান্তে পার্শ্ববর্ত্তী ভলেণ্টিয়ারগণ ট্রে-গুলি লইয়া গেল। মঞ্চে আর জনপ্রাণী নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী ও বিজনকুমার। বিজন ভাবিতে লাগিল, এমন অবসর কি সে বৃথা যাইতে দিবে? সে কি পুরুষ নহে?—একজন নারীকে প্রসন্ন করিবার মত একটি কথাও কি সে কহিতে জানে না? তাহার ব্যায়াম-দক্ষতার পরিচয় পাইলে রাজকুমারী যে সন্তুষ্ট হইবেন—ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কি করিয়া একথা পাড়িবে, কি করিয়া জানাইবে, যে সে ফুটবলে, ক্রিকেটে, লাঠি-খেলায় দক্ষ।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল; খেলার স্থানে লোকজন আসিতে আরম্ভ করিল; দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িলেই মঞ্চ পূর্ণ হইয়া উঠিবে। বিলম্বের সময় নাই, ভাবিবার অবসর নাই; বিজনকুমার সহসা জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজকুমারি, বাহিরের লোক কি কেহ এ খেলায় যোগ দিতে পারে?" জ্যোতির্ম্ময়ী কিছু না ভাবিয়া আনমনেই একরকম বলিল, "পারবে না

"আমি কি লাঠিখেলায় যোগ দিতে পারি ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী তখন সজাগ হইয়া কহিল—"কিন্তু আজকে পরীক্ষার দিন; আমার নতুন খেলোয়ারদের সঙ্গে আপনার মত দক্ষ লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ঠিক হবে ?"

"না আমি কোন সর্দ্দারের সঙ্গেই খেলতে চাই।"

শরৎকুমার ঠিক এক মিনিট আগে এখানে আসিয়া পরিত্যক্ত চৌকি গুলি সাজাইয়া রাখিতেছিলেন,—নিকটে আসিয়া বলিলেন—"আমি বিজনবাবুর সহিত খেলিতে প্রস্তুত আছি।"

শরৎ যে একজন নিপুণ খেলোয়ার তাহা জ্যোতির্ম্ময়ী জানিত না—তবু তাহার মান রক্ষা হইল ভাবিয়া সে আনন্দবোধ করিল। অবশ্য খেলাতে ত হারজিত আছেই,—শরৎ না হয় হারিয়াই যাইবে।

শরতের এই প্রস্তাবে বিজনও অসন্তুষ্ট হইল না—শরৎকে হারাইয়া আপনার পৌরুষ গৌরবে সে যে রাজকুমারীর নিকট সম্মান লাভ করিবে সে বিষয়ে সে খুবই আশ্বস্ত বোধ করিল।

বালক একদলের খেলা হইয়া গেলে—প্রেসিডেণ্টের আদেশমত শরৎ ও বিজনকুমার রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। গৎকা খেলায় তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, ইহাই স্থির হইয়াছিল।

উভয়েরই ইংরাজি সাজ, উপরের কোটটা মাত্র খুলিয়া রাখিয়া, তাঁহারা হাতের আস্তিন গুটাইয়া লইয়া গৎকা ও শৃঙ্গ হস্তে খেলার স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দাঁড়াইলেন। দুজনেই দেখিতে ভাল, শরৎ একটু দীর্ঘকায় এবং দৃঢ়পেশী,—বিজনকুমার ধনীপুত্র, তাহার ক্ষীর-নবনী-গঠিত দেহ অপেক্ষাকৃত কোমল সুকুমার ও লাবণ্যপূর্ণ। বিবাহ সভায় সৌকুমার্য্যে বিজনকুমার নারী-সমাজে যে একচেটিয়া প্রশংসালাভ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর রুচি একটু অদ্ভুত বলিতে হইবে। শরতের মাংসপেশীবহুল দেহগঠনে একটা পৌরুষিক ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার নারীবক্ষ সহসা একটা অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব মোহময় সুখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।—তাহার সম্মুখে সত্যই কি একটা জীবনোপন্যাস অভিনীত হইতেছে! এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যেন কোন অনামিকার তুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। মনের অজ্ঞাতসারে তাহার মন উপলব্ধি করিল, সেই অনামিকা সে নিজে। একটা মোহময়, সুখময় চাঞ্চল্য-আবেগে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

উভয়ের যুদ্ধ চলিল—পরস্পরে আত্মরক্ষা করিয়া পরস্পরকে পরাজয় করিবার জন্য—কত ছলে কত কৌশলে তাহাদের লাঠি ও শৃঙ্গ পরিচালিত হইতে লাগিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা দেখিতে লাগিল।

একবার শরৎকুমার সহসা ওষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত হইয়া উঠিলেন। সে আঘাত-ব্যথা নিজের বক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী অনুভব করিয়াও, তাহাতে কাতর হইল না,—বরঞ্চ এই শোণিতপাতেও সে একটা সুখ অনুভব করিল। এমন কি তাহাকে মুমূর্ষু দেখিতেও সে প্রস্তুত—কিন্তু পরাজিত দেখিতে চাহে না।

দর্শকগণের দারুণ ঔৎসুক্য-আবেগের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। শরৎকুমার বিজনের হস্তের লাঠি—বিনা-আঘাতে হস্তগত করিয়া লইলেন, বিজনের সহিত যে সকল দলবল আসিয়াছিল তাহারা নতমুখ হইয়া রহিল ;—আর এ পক্ষে বন্দেমাতরম্ শব্দে সভা ফাটিয়া উঠিল—ইংরাজগণও সেই সঙ্গে হুর্‌রে বলিয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ীর মোহ তখনও ভাঙ্গে নাই, শরৎকুমার বিজিত-গৎকা মঞ্চে আনিয়া তাহাদের পদতলে রাখিয়া উন্নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। ইহাদের জন্য আগে হইতে পুরস্কার ঠিক ছিল না, রাজা নিজের অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরী খুলিয়া তাহার হস্তে পরাইয়া দিলেন,—আর জ্যোতির্ম্ময়ী টেবিলে রক্ষিত একগাছি ফুলমাল্য লইয়া সহাস্য বদনে তাহার কণ্ঠে অর্পণ করিল।

ইহার পর বালকদিগের পুরস্কার বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হইল।

* * * * *

মহারাণী পরদার মধ্য হইতে সব দেখিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন—বিজনের গলায় এই মালা পড়িবে। তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত ভাবে সুখী হইতেন,—কিন্তু তাহা হইল না,—তবুও নিতান্তই যে অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহাও নহে। জহরীর নিকট জহরের অনাদর হয় না। শরৎকুমারের বীরত্বে মনে মনে তিনি তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নাতনীকে পরে ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"স্বয়ম্বরা হলি নাকি রে? সন্ন্যাসী বই আর কি কোন বর মিলল না—আমার নাতনীটির?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখ লজ্জায় লাল না হইয়া মলিন হইয়া গেল। এই মাল্যদানের অর্থ কি লোকে এইরূপ করিবে নাকি! ইহা ত তাহার স্বপ্নেরও অগোচর! আর শরৎকুমার? তিনি কি ভাবিয়াছেন? অন্যে যে যাহাই ভাবুক—শরৎকুমার কখনই এরূপ ভাবিবেন না!

তথাপি জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে ভারী একটা অস্বস্তিকর লজ্জা বেদনা অনুভব করিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভু-প্রকৃতি ও চাষবাস।

(ফরাসী হইতে)

এক্ষণে ভারতের প্রধান প্রধান চাষ কি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

এক পক্ষে, অধিবাসীদের খাদ্যের জন্য যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যথা :—চাউল, জোনার তৈলজ শস্য, ইক্ষু। কেবলমাত্র নদ-নদীর ব-দ্বীপ-প্রদেশে কিংবা নদীর তীরে ধান্য উৎপন্ন হয়—এবং (ব্রহ্ম দেশ গণনার মধ্যে না-আনিয়াও) এই ধান্যোৎপন্ন চাউল ৬ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর প্রধান খাদ্য। যে সকল প্রদেশ তত সমৃদ্ধ

নহে, সেই সব প্রদেশের লোক জোয়ারা, বাজ্‌রা ও শাকসবজি খাইয়া থাকে। ইক্ষুদণ্ড হইতে প্রতি বৎসর ২০॥০ লক্ষ টন্ অশোধিত চিনি উৎপন্ন হয় এবং তামাকের চাষও খুব পরিব্যাপ্ত। সাধারণত 'ছোট' চাষ—খুব 'ছোট' চাষেরই প্রাধান্য।

পক্ষান্তরে, রপ্তানির উৎপন্ন দ্রব্য :—তুলা, পাট, নীল, আফিম, রেশম, চা, সিন্‌কোনা, কাফি, এবং সেই সব শষ্য যাহা পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের বাহিরে দেশীয় লোকের ব্যবহারে আসে না।

প্রায় সর্ব্বত্রই বৎসরে দুইবার ফসল হয়।

*
* *

উপরে চাষের কথা সাধারণভাবে বলিয়াছি, এক্ষণে বিভিন্ন প্রদেশের চাষের বিশেষ বিবরণ বলিব।

বঙ্গদেশ

সমুদ্রের কূল। সেই সব জলাভূমি যেখানে খাগ্‌ড়া জন্মায়, সেই সব অনূপ দেশ যেখানে শীর্ণ, তাপদগ্ধ বায়ুদলিত দুর্লভ গুল্ম সকল দেখিতে পাওয়া যায়; সেই সব দীর্ঘ বিল যেখানে বকেরা ডুব দিতেছে, যেখানে হাজার হাজার বক এক পায়ের উপর ভর দিয়া ঘুমাইতেছে, কিংবা ডানা ঝাপ্‌টাইয়া পরস্পরের সহিত লড়াই করিতেছে, আর একদিকে শুকনীরা ঠোঁট্ দিয়া পালক খুঁটিতেছে, কিংবা তাহাদের লম্বা নির্লোম গলা বাড়াইয়া রহিয়াছে।

সমুদ্র হইতে দূরে, নারিকেল, তাল, সুপারী, খেজুর, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি। খাল নদীর উপর দিয়া বড় বড় নৌকা মাল লইয়া সারি সারি চলিয়াছে। কতকগুলি নৌকা বাষ্পাকৃতি বৃহৎ পাল তুলিয়া তর্‌তর্ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর ধারে গ্রাম। গ্রামের ধূসরবর্ণ কুটীরগুলি কলাগাছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। জলের ভিতর পাট ও ধান; মাঠে মস্‌লার গাছ, আফিম ও নীলের চারা। আকাশ কখন কখন ঘন নীল, অনেক সময়ই বাষ্পপূরিত। সায়াহ্নে চমৎকার শোভা।

প্রথমে অগ্নিশিখার আকারে সূর্য্য অন্তর্হিত হয়; তাহার পর সমস্ত আকাশ রক্তিমাভ স্থূল মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সূর্য্য কোথায় অস্ত যাইতেছে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হঠাৎ আকাশের মুক্ত বায়ু মেঘগুলাকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। গভীর নীলিমা; নক্ষত্র সকল ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে; এবং চন্দ্রমা ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিয়া, খাল, বিল, ধানের ক্ষেত কনক-কিরণে প্লাবিত করে।

আরও আগে অভ্যন্তর প্রদেশে মন্থরগতি নদীর ধারে, মধুর তরঙ্গ-লীলা। লাল-খাপ্‌রায়-ছাওয়া মাটির কুটীরসমন্বিত গ্রাম-গুলি সুন্দর গাছের ছায়ায় অবস্থিত। আম, বট, পিপ্পল, তেঁতুল, তাল, কার্পাস—এই সমস্ত গাছের কুঞ্জবন। মাঠে আফিম, নীল, তুঁতের চারা। বরাবর জলের ধারে ধারে বিভিন্ন জাতীয় ধান্য।

অশ্রুতপূর্ব্ব উর্ব্বরা ভূমির উপর অধিষ্ঠিত, আইলের দ্বারা সুরক্ষিত বাঙ্গলার চাষা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করে। দুর্ভিক্ষ

খুবই বিরল; এক শতাব্দী যাবৎ কেহই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় নাই।

কি দেশীয় কি য়ুরোপীয় সকল জমিদারেরই সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি। বিস্তারে লক্ষ পর্য্যন্ত বিঘা ভূমি হইতে পারে।

একজন উপন্যাস-লেখক, এক ধনী জমিদারের বাসস্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

(নগেন্দ্রের বাড়ীর) বাহিরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎপুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গো-গণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তালা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপান আরোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারাণ্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লুটেড্ থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত। অতিশয় উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ড দ্বয়ের দুই পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতালা কোঠা। এক সারিতে দফ্‌তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান, ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারী বাড়ী।" উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী"। পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান, আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময় বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান দরদালান পায়রায় ভরিয়া গিয়াছে, কুঠারী সকল আস্‌বাবে ভরা—চাবিবন্ধ।

তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট নাটমন্দির। তিন পাশে দেবতাদের পাক-শালা পূজারিদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে স্থলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা :চন্দন তিলকবিশিষ্ট পূজারির দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে; চাকর দাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণ-দের সহিত কথাই কহিতেছে, অতিথি-শালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসীঠাকুর জটা এলাইয়া চীৎ হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও উর্দ্ধবাহু একহাত উচ্চ করিয়া দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা

ভাগবদগীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি-ময়দার পরিমাণ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। মাথায় আর্কফলা নাড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া······ কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগীরঞ্জন রসকলি কাটিয়া খঞ্জনীর তালে ······গীত গাইতেছে। কোথাও কিশোর-বয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে।······

এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারী বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য; তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্চ্চায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। ······এই মহল নূতন নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটী।

তাহার পাশে পূজাবাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত, ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র এবং অপরিষ্কৃত। এই পুরী আত্মীয় কুটুম্ব কন্যা মাসী মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীর ভাইয়ের মেয়ে ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রি দিবা কলকল করিত এবং অনুক্ষণ নানাপ্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন······ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত।

তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরও জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন, কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রু-লোচনা হইয়া বাড়ীর সমস্ত পরনিন্দা করিতেছে······কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া দশনাবলী বিকট করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া আছেন····· কোথাও বা বড় বটী পাতিয়া বামী ক্ষেমী ······লাউ কুমড়া বার্ত্তাকু পটোল শাক কুটিতেছে······এই তিন মহলের পর পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান-পথে নীলমেঘতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীর বেষ্টিত······"

*

* *

আসাম।

ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহে, বর্ষার জলে আসামের ভূমি উর্ব্বরা হইলেও উহার আর্দ্রতা দেশের পক্ষে হানিজনক, এমন-কি যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ ঐ দেশে বাস করিয়াছিল সেই মোগলদের পক্ষেও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন, এই উপত্যকার উত্তর প্রদেশটি প্রায় অনালোড়িত অপরীক্ষিত; দক্ষিণ

আসামে চাউল, আফিম, তামাক, রাই-সর্ষে বিশেষত চা উৎপন্ন হয়। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আসামের চা আজকাল চীন ও সিংহলের চায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে।

*

* *

হিমালয়।

বিশাল বিস্তৃত সমভূমি হইতে পর্ব্বত সকল খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ স্থানে শীত-দেশের উদ্ভিদ, মাঝামাঝি জায়গায় নাতিশীতোষ্ণ দেশের ফুল উদ্ভিদ, তাহার পর উষ্ণদেশের উদ্ভিদ যাহা বৃষ্টির প্রাচুর্য্য-বশতঃ খুব সতেজে বাড়িয়া উঠে। কোথাও বা স্রোতের তোড়ে ঢালুস্থানসকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, কোথাও বা উর্ব্বরা উপত্যকা প্রসারিত। বেগ্নী রঙের ফুল-বিশিষ্ট রডোডেন্‌ড্রন, দেবদারু, কোমল হরিৎবর্ণের বাঁশ, "সিডার," কৃষ্ণপ্রায় হরিদ্বর্ণের পাইন-গাছ, বাদাম-গাছ, মেপ্‌ল্ গাছ, চেস্‌ট্‌-নট্ গাছ, এবং শৈবাল, ও পরগাছা,—যাহা উর্দ্ধোত্থিত বাষ্পের দ্বারা, ও পর্ব্বতগাত্রে লম্বমান মেঘের দ্বারা সর্ব্বদাই আর্দ্র। বসন্তকালে 'ক্লেমাটিস্'-লতা, মেড্‌লার-গাছের সাদা ফুল; শরৎকালে, বেগ্নী ও ধূমল বর্ণের ভাজিনিয়া-লতা। বর্ষাকালে ছোলার ফর্সা ক্ষেত, বাজ্‌রার লাল রঙের ক্ষেত, দার্জিলিঙ্গের কাছাকাছি চায়ের বাগান। প্রস্তরের উপর স্রোতস্বিনী গর্জ্জন করিতেছে, তাহাদের উচ্ছ্বসিত শুভ্র ফেনে শতবর্ণের অরণ্য-ভূমিকে ধবলিত করিতেছে, বড় বড় ফর্ণের মধ্যে ও গাছের মধ্যে রডডেন্‌ড্রন বন আধিপত্য করিতেছে —এই সমস্তের উপরিভাগে সরু সরু সুঁড়ি পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে; বোজকা-বুজকির বোঝাই লইয়া অস্খলিত-পদ টাট্টু ঘোড়া, গরু ও ভেড়া উপরে উঠিতেছে। তাহাদের পিছনে মোগলজাতীয় চালক দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, চ্যাপ্‌টা-মুখ, বাঁকা-চোখ; গ্রীষ্মকালে উহারা নগ্নপ্রায়, শীতকালে দীর্ঘ পরিচ্ছদ ও চর্ম্মাদি পরিধান করে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকও দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। একই প্রকার পরিচ্ছদ, কিন্তু তীব্র শীতেও বুকের কাছে কাঁচুলী গোল করিয়া কাটা ও খোলা। তাহার মধ্য হইতে কঠিন ও ঈষৎ নীলাভ বক্ষদেশে দেখা যাইতেছে। সুঁড়ি পথের বাঁকে, সূর্য্য জলদ-জাল বিদ্ধ করিয়া, কোনও এক শৈলের কঠিন গাত্র প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে,—উহার উপরিভাগ বরফ্-নদীর ঘর্ষণে মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। এরই মধ্যে সূর্য্য মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে; আরও ঘন হইয়া কুয়াসা নীচে নামিতেছে, পথিককে আচ্ছন্ন করিতেছে। এখন ঘোড়ার চালক-দিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ঘোড়াদিগকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেবলই উপরে উঠিতে হইতেছে, ক্রমাগতই উপরে উঠিতে হইতেছে। একটা দম্‌কা বাতাস আসিলে তাহার বেগে নীচে পড়িয়া যাই আর কি! এইবার পর্ব্বতের গ্রীবাদেশ। এইখানে রুদ্ধনিঃশ্বাস হইয়া থামিতে হয়......বৃক্ষশাখা হইতে লতা ঝুলিতেছে, কুয়াসা ক্রমশ পিছে হটিয়া যাইতেছে—বৃক্ষশাখার নীচে, একটা জায়গা

যেন হঠাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ১০টা, ২০টা, ১০০টা খুব উজ্জ্বল পাথরের চাক্‌লা। ঝটিকার দ্বারা তাড়িত হইয়া, মেঘগুলা ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর-আকাশে একটা প্রজ্জ্বলিত রেখা। উহা কি মেঘ? না, পর্ব্বত-গাত্রের একটা বিশেষ অংশ হইতে আলোক হঠাৎ প্রতিফলিত হইয়াছে। ওগুলা কি শৈলমালা? অত উচ্চ, অসম্ভব! চারিদিকে পর্ব্বত। বাতাসের জোর দ্বিগুণ বাড়িল, মেঘগুলা আরও দ্রুত ছুটিতেছে। দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কুয়াসার মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র। কোথাও অরণ্য; কোথাও ভূগুদেশের পশ্চাদ্ভাগে উপত্যকা; উপত্যকার উপর দিয়া কতকগুলি স্রোতস্বিনী বহিয়া চলিয়াছে; কোথাও কতকগুলি শৈলপিণ্ড একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; কোথাও বা ভীষণ বরফ্-নদী। একটা বৃহৎ ফাটল। সমস্ত শৈলমালা—শত শত ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। সর্ব্বোচ্চ শিখর উচ্চতায় ৯০০০ metre; যে চূড়া সবচেয়ে নীচু তাহারও মাথা Mont Blancকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, গৌরীশঙ্করের তিনটা শিখর এবং ঐ দেখ কাঞ্চনজঙ্ঘার মহাবল প্রস্তরখিলান। অস্তমান সূর্য্য এই বরফ-সমুদ্রকে অগ্নি-সমুদ্রে পরিণত করিয়াছে। মনে হয় যেন রক্তবর্ণ তরঙ্গরাজি টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে, ফুলিয়া উঠিতেছে। ধীরে ধীরে দীপ্তি কমিয়া আসিতেছে: বরফ-নদীগুলা প্রথমে লাল, তাহার পর বেগ্‌নী, তাহার পর ধূমল-বর্ণ হইয়া উঠিতেছে,—অবশেষে একেবারে অদৃশ্য হইতেছে। মেঘেরা তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। ফিন্‌ফিনে বৃষ্টি, কুয়াসা; আর কিছুই দেখা যায় না; যে গাছে ঠেসান দিয়া আছি, সেই গাছটি পর্য্যন্ত আর দেখা যায় না।

*

* *

হিন্দুস্থান

বৃহৎ উর্ব্বরা সমভূমি; গঙ্গা ও তাহার শাখানদী সকল উহার উপর দিয়া প্রবাহিত। ধান্য, ইক্ষু, আফিম, নীল, তৈলাক্ত শস্য; ছোলা, ভুট্টা, সর্ষপ, বাজরা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গম্। উচ্চ তৃণপুঞ্জের মধ্যে, বহুসংখ্যক গরুর পাল। কালো কালো মহিষ, মনে হয় যেন ঘাড়ে-গর্দ্দানে এক—এবং ছুচাল ককুদ-বিশিষ্ট ছোট ছোট গরু চাঁদোয়া-দেওয়া গাড়ী অথবা লাঙ্গল টানিতেছে—লাঙ্গলের ফলা কাঠের, ফলার মুখ লোহার। সর্ব্বত্র, সমভূমি হইতে উচ্চ বাঁধের দ্বারা খালসকল সংরক্ষিত; কূপ; গরুরা কঁ্যাচ্-কঁ্যাচে জল-তোলা যন্ত্রগুলাকে লইয়া ঘুরপাক দিতেছে; লোকগুলা নগ্নপ্রায়,—সাদা ধুতি কালো গায়ে জড়ানো—বড় বড় মসকে জল বহিয়া লইয়া যাইতেছে। ছোট ছোট পাহাড়ের উপর হইতে, শরৎ কালে, হিমালয়ের শুভ্র শৈলমালা দৃষ্টি-গোচর হয়—ঐ সকল পহাড়ের উপর জমিদারদিগের বাসস্থান: হিন্দুধরণের মণ্ডপ-গৃহ, ইংরাজ গথিক-ধরণের দুর্গপ্রাসাদ; উদ্যান উপবনে, বংশ, বট তালাদি বৃক্ষ রোপিত। বানর, পেঁচা কাক ও টিয়া পাখিতে উদ্যান উপবন পরিপূর্ণ।

*

* *

পঞ্জাব

পঞ্জাব একটা বৃহৎ একঘেয়ে সমভূমি; ঢেউ-খেলানো ভাব জমিতে আদৌ নাই। কেবল নদী-সমূহের বৃহৎ গতি-পথ-সকল ঐ সমভূমি কাটিয়া চলিয়াছে। নদীগুলির তেমন গভীরতা নাই; এমন-কি বসন্তকালে একেবারেই শুকাইয়া যায়। মাটি খড়িময় বা বালুকাময়। শুষ্ক আব্-হাওয়া, শীতকালে কন্‌কনে ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মকালে জ্বলন্ত উত্তাপ। যে উত্তরাংশ, হিমালয়ের শেষ সম্বলস্বরূপ ক্ষুদ্র পাহাড়-অঞ্চলের সহিত সংস্পৃষ্ট, সেই উত্তরাংশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়। মাটি তেজালো; সর্ব্বত্রই বৃক্ষ, পুষ্প, মাঠ বেশ কর্ষিত; গ্রামগুলি লোকাকীর্ণ। যে সময় আফ্‌গান ও মারাঠার আক্রমণ-ভয়ে গৃহ দুর্গাকারে নির্ম্মিত হইত, এখনকার গৃহগুলি সেই সময়কার মতো। গম, জোয়ারা, তৈলজ শস্য, নীল; কোন কোন স্থানে ধান্য; তা ছাড়া খেজুর, আম, কমলানেবু, কলম্বী নেবু, ডুমুর; শীতকালে, নদীর খোলে তর্মুজ। পাহাড় হইতে যতই দূরে সরিয়া যাওয়া যায়, ততই সেখানকার বর্ষা কম হইয়া পড়ে। বন ও গ্রাম অতি বিরল। দক্ষিণ ভাগে কেবল নদীর উপত্যকাগুলিই উর্ব্বরা। এই সকল উপত্যকার অন্তবর্ত্তী স্থানে জলাভূমি—এই ভূমিতে বৃক্ষাদি খর্ব্বাকৃতি,—এইখানে অসংখ্য গরু, মহিষ, উট, ভেড়া, ছাগল চরিয়া বেড়ায়। তাহার পর রাজস্থানের মরুভূমির আরম্ভ; সূর্য্যদগ্ধ ধূলারাশির মধ্যে এইখানে প্রবেশ করিতে হয়—বায়ুর ঘূর্ণিপাকে এই ধূলারাশি আনীত হয়।

*

* *

কাশ্মীর

অদ্ভুত আকৃতির কতকগুলি সূচাগ্র শিখরের নীচে, বরফ্-নদী সমূহ, দেবদারু সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত, বিহাট বা ঝিলমের প্রসিদ্ধ উপত্যকা। আব্‌হাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। নদী, খাল; খালের ধারে ধারে পপ্‌লার-ঝাউ, 'এল্‌ম্‌' ও 'প্লেন্‌' গাছ; ফলের বাগান, ধান্য যবাদি রোপিত ক্ষেত্রভূমি; বাদাম গাছের নীচে গ্রামসমূহ; কাঠের ঘর; এই সকল ঘরে বলিষ্ঠ, ছিপ্‌ছিপে দীর্ঘকায় পুরুষ এবং ফর্সা-রঙ, মহৎভাবব্যঞ্জক ও সুপরিমাণ মুখশ্রীবিশিষ্ট রমণীরা বাস করে।

সিন্ধুদেশ

পশ্চিমে পর্ব্বত, দক্ষিণে জলাভূমি (সিন্ধুনদীর ব-দ্বীপ), পূর্ব্বদিকে বালুময় মরুভূমি। ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বে, বেলুচি সর্দ্দারদিগের জন্য মৃগয়ার উপবন; উদাসীন ও অলস-প্রকৃতি সিন্ধীরা পূর্ব্বে ঐখানে তাহাদের গো-মহিষাদি রাখিত। ইংরাজেরা বড় বড় পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া জলাভূমি সকল, এমন-কি মরুভূমিরও কিয়দংশ উর্ব্বরা ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। এই সকল ভূমি হইতে গম, ছোলা, বাজ্‌রা, তৈলজ শস্য, শণ, আফিম ও তামাক উৎপন্ন হয়, শরৎকালে চাউল, মক্কা, তুলা, নীল ও ইক্ষু।

*

* *

গুজ্‌রাট

নর্ব্বদা ও তাপ্‌তীর সমৃদ্ধ উপত্যকা। ইংলণ্ডের অনুরূপ ভূদৃশ্য; বেশ জল-সেচিত বিস্তৃত প্রান্তরে সুন্দর বৃক্ষাদি; কিন্তু তা ছাড়া আবার নীল সমুদ্র, উপকূলে গভীর ঢালু খাত, বড় বড় তালজাতীয় বৃক্ষ এবং প্রাচ্যদেশের সূর্য্য। ঝোপ্‌ঝাড় ও গুল্ম-বেড়ার মধ্যে গৃহগুলি অবস্থিত; গৃহের ছাদ লাল খাপ্‌রার; বটের, কাদাখোঁচা, বুনো হাঁস, কাঠবিড়ালী, হাজার হাজার টিয়া পাখী, সকাল-সন্ধ্যায় উহাদের চীৎকারে কাণ ঝালাপালা; লালমাথাবিশিষ্ট সারস পক্ষী এবং শাম্‌লা ও সাদাটে রঙের অসংখ্য বানর। কার্পাস, রেশম, নীল, ফলের গাছ, ধান্য এবং যবাদি অন্যান্য শস্য।

*
* *

মধ্য-ভারত

পূর্ব্বদিকে, সাতপূরার বৃহৎ মালভূমি; পর্ব্বতের উপত্যকা; পর্ব্বতগুলা খাড়া উঠিয়াছে এবং নিম্ন-সমভূমির দিকে নামিয়া গিয়াছে; গোঁদ্‌জাতীয় লোক এবং দ্রাবিড়ীয় ও আর্য্যদিগের কর্ত্তৃক বিতাড়িত অন্যান্য জাতির আশ্রয়স্থান।

পশ্চিম দিকে, নর্ব্বদা, তাপ্‌তী এবং গোদাবরীর শাখাসমূহের সমৃদ্ধ উপত্যকা-সমূহ; গম, তুলা, রেশম, তৈলজ শস্য, আফিম।

*
* *

করমণ্ডল উপকূল

প্রথমে, দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অনুর্ব্বরা ভূমি, দুইটি উর্ব্বরা ভূখণ্ডকে বিভক্ত করিয়াছে; কৃষ্ণা ও গোদাবরীপ্রসিক্ত প্রদেশ; উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যে জল-সেকের বৃহৎ বৃহৎ পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা ঐ-সকল প্রদেশ বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; সেখানে খেজুর, তামাক, তুলা ও ধান্য উৎপন্ন হয়।

আরও দক্ষিণে একটা বিস্তৃত সমভূমি; ঐখানে গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ বৃক্ষাদি জন্মে; ত্রিচনপলির শৈলদৃশ্য; নিম্নসমভূমি উদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কাবেরীর ব-দ্বীপ; ব-দ্বীপ-খণ্ডে অসংখ্য খাল, ফলের বাগিচা, তামাক, ধানের ক্ষেত, এবং উচ্চ তালজাতীয় বৃক্ষসকল শুভ্র আকাশের গায়ে যেন ছবি-আঁকা।

*
* *

মালাবার উপকূল

'ঘাট' নামক দীর্ঘ গিরিমালা; তাহার শৈল-দুর্গপ্রাসাদ, অলিন্দ, বনসঙ্কুল ঢালু স্থান সকল নীলসমুদ্রের উপর সগর্ব্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। উত্তরদিকে আরও রূঢ় ধরণের উদ্ভিদ; কুর্গ্‌-প্রদেশে গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ অরণ্য, বটবৃক্ষের গায়ে লতা জড়াইয়া আছে; ৩০, ৪০, গজ উচ্চ বাঁশের ঝাড়; তাল বৃক্ষাদিকে ছাড়াইয়া বিবিধ রঙের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা তুলিয়া আছে। হাতী, বাঘ, বুনো মহিষ, হরিণ, চিতা, —লতায় জড়ানো বৃক্ষাদির মধ্যে অবস্থিত।

ঘাট এ সমুদ্রের মাঝে, একটা বিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমি; সেখানে খুব গরম দেশের সমস্ত ফসল সংগৃহীত হয়—এমন-কি দক্ষিণ অঞ্চলে কফিও জন্মে।

*

* *

কানারী দেশ

কানারীর অভ্যন্তর প্রদেশের মাটি কালো; ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীরা এই জমি চাষ করে; উহাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। আরও দক্ষিণে, ঘাট ও তিলেভেলীর সুন্দর মাঠ-ময়দানের মাঝে একটা বিস্তৃত শুষ্ক সমভূমি।

*

* *

ব্রহ্মদেশ

বৃষ্টি-বহুল ব্রহ্মদেশের চারটি পৃথক অঞ্চল। ইরাবতীর উপত্যকা; ইরাবতীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ; উত্তরদিকে শাণ্ দেশের পাহাড়। পশ্চিমে যোমাগিরি; যোমা-গিরি ও সমুদ্রের মাঝে একখণ্ড বিস্তীর্ণ সমভূমি—অ্যারাকান্, শাল্ পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝে আর-একটা সমভূমিখণ্ড—তেনাসেরিম। পর্ব্বতের উপর গ্রীষ্মমণ্ডল-সুলভ অরণ্য; সেগুনগাছ, বাঁশ, তালজাতীয় বৃক্ষ, গরম-ভিজা জায়গায় পাতা-বাহার, শৈবাল, পরগাছা। ইরাবতীর উপত্যকা, অ্যারাকান্ ও তেনাসেরিম সমস্ত মিলিয়া একখণ্ড বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত; কোন কোন স্থানে তামাক, গরমমশ্লা, তৈলজ শস্য।

*

* *

অতএব, ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে সকল প্রকার ভূমি, সকল প্রকার আব্-হাওয়া, অতি বিচিত্র প্রকারের উৎপন্ন দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের সমৃদ্ধিসম্বন্ধে যে এত গর্ব্ব করা হয় তাহা নিতান্তই ভুল। কত শুষ্ক অঞ্চল! মধ্যদেশের পর্ব্বত, দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চল, সিন্ধুদেশ, রাজস্থান ও রেঙ্গুন ও বেলুচিস্থানের মরুভূমি। এমন কত অঞ্চল আছে যাহা অর্দ্ধশতাব্দী এমন-কি এক শতাব্দী ধরিয়া খাটিলেও আবাদ করিতে পারা যাইবে না! আসামের উত্তরাঞ্চল, যে অংশ ব্রহ্মদেশ হইতে আসামকে পৃথক করিয়াছে,—সেই সমস্ত প্রদেশ, ও মধ্য-প্রদেশ সমূহের বনজঙ্গল। এবং ভারতের যে সকল প্রদেশ খুব উর্ব্বর সেখানেও শুষ্কতার আশঙ্কা। একবার যদি যথোচিত বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলেই যোজন-যোজন ভূমি ফসল-শূন্য হইয়া পড়েঃ জলসেকের পূর্ত্তকার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতকে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিতে এখনো শত শত বৎসর লাগিবে ও ক্রোড় ক্রোড় টাকা ব্যয় করিতে হইবে। ইংলণ্ড এই উদ্দেশে প্রভূত পূর্ত্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়া দূরে থাক্, মনে হয় যেন উহা ঐ কাজের একটা আদ্‌রা মাত্র।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবির তিরোধান

(স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহান্তে)

ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্‌নি ক'রে ম'রে গেল কবি,
চলে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে ;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা ; আন্‌মনে হায় ; সেই সমাচার লভি'
দূরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠ্‌ল নিমেষ তরে।

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডেরায় কাঁটার মালা গলে ;
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন্ পূবে হাওয়ায় বেরুল নীড় ত্যেজে,
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা ক'রে রইল চোখের জলে।

ধনজনের ধার্‌ত না ধার, চিন্‌ত তারে অল্প কটি লোকে,
নয় দারোগা নয় খেতাবী,—খাতির দাবী কর্‌বে সে কোন্ মুখে ;
মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তায় দেখ্‌ত প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চলে,—রেশ রয়েছে সারা দেশের বুকে।

বাদ্‌লা রাতির সাথী সে যে শরৎ-প্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে,
মরেনি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা স'য়ে ;
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুট্‌ছে ত্রিকাল ধরে,—
কবি জানে,—পরম সুখে সে আছে আজ তারি পরাগ হ'য়ে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সোনার কাঠি

(গল্প)

বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে আমি। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর বিয়ে হল। স্বামী দেখতে যেমন, গুণও তাঁর তেমনি! পয়সা-কড়ি বেশ আছে, তবে তিনি একা ; সংসারে আত্মীয়-স্বজন তেমন-কেউ নেই।

ফুলশয্যার রাত্রে আমার ব্যবহারটা তাঁ অত্যন্ত রূঢ় ঠেকেছিল, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলুম। তিনি যখন আদর করে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কনক, এই শূন্য সংসারটিকে সব দিক দিয়ে তুমি পূর্ণ

করে তোলো—”তখন সে কথা শুনে কোনমতে আমি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না। আমার সমস্ত অতীতটা বুকের উপর এমনি পাষাণ-ভার চেপে ধরলে যে, সহস্র চেষ্টাতেও আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। দুনিয়াটাকে তখন এমনি বিশ্রী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছিলুম যে, আমার স্বামী,আমার দেবতা,—তাঁর এই মধুর আদর-টুকুকে বুকের মধ্যে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করতে পারলুম না—এমনি অভাগী আমি! স্বামী আমায় বললেন, “কনক, আমি অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া, যখন খুব ছোট, তখন মা-বাপ দুই হারিয়েছি। আরাম পাব বলে সংসার পেতে বসব, এ কথা কোনদিন আমার মনে হয় নি। লোকের কথায় একটা অত্যন্ত হাল্কা কৌতুহল নিয়েই তোমায় দেখতে গেছলুম। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম, তাই স্বার্থপর আমি তোমায় এই শ্মশানে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। লক্ষ্মী তুমি, তোমার রূপ আর লাবণ্যের জ্যোৎস্নায় এ শ্মশানে আলো জাগিয়ে তোলো, তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ কোমল সৌরভে চারিধার ভরপূর করে দাও, আমি মুগ্ধ হয়ে তাই দেখি।”

রূপ আর লাবণ্য! পুরুষ কি এই দুটোকেই চিনেছে শুধু রে! নারীর এই যে মন—ওগো, সেই মনটাকে কেন তোমরা অবহেলা কর? কি তুচ্ছ রূপ আর লাবণ্যের কথা তোলো,—শুনে আমাদের লজ্জা হয়! সে ত দেহের উপর একটা পালিশ মাত্র, রোগে তা ঝরে যায়, একটু তাপেই সে ম্লান হয়ে পড়ে—কিন্তু এই মন,—এ যে রাজার ঐশ্বর্য্যের চেয়েও ঢের দামী, ঢের বেশী যে তার শোভা!

স্বামীকে মুগ্ধ করবার মত রূপ আর লাবণ্য আমার অঙ্গে প্রচুর ছিল, আমি তা জানতুম,—তাই তার উল্লেখে একটুও গলে গেলুম না! স্বামী মুগ্ধ চিত্তে মুখে চুম্বন করলেন; আমি পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মতই অচঞ্চল বসে রইলুম। স্বামী যেন একটু ব্যথিত হলেন, বুঝলুম,—একটা নিশ্বাস চেপে তিনি বললেন, “শুয়ে পড়।”

... ...

আমায় সুখে রাখবার জন্য স্বামীর সে কি চেষ্টা পড়ে গেল! দাসী-চাকরের উপর ঘন-ঘন নিয়ম-জারী হতে লাগল,—নিজেও তিনি তদ্বিরের ঘটা বাধিয়ে দিলেন। তার উপর দামী গহনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ তিনি মুড়ে ফেললেন,—হীরে-পান্না-চুনি-মুক্তোর ভারে আমি নুয়ে পড়লুম! পাথরের মেজেয় চলে বেড়ালে পাছে পায়ে ব্যথা লাগে, তাই অর্ডার দিয়ে পায়ের জন্য জুতো-মোজা আনিয়ে দিলেন,—কোন্ কাপড়টি, কোন্ জামাটি কখন্ পরলে আমাকে ভালো মানায়, হরেক রকম কাপড়-জামা আনিয়ে আমায় তা পরিয়ে ঠাউরে দেখে-দেখে কাপড়ে-ব্লাউসে তোরঙ্গ আমার ঠেসে ফেললেন। একটু যদি চুপ করে আকাশের পানে কখনো চেয়ে বসে থাকতুম ত তিনি অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, বলতেন, “তোমার মনটা একটু খারাপ দেখচি,—যাও, দুদিন তোমার বাবার ওখানে বেড়িয়ে এসোগে!” সত্যি, এত আদর আমি কখনো পাইনি! আমার লজ্জা হত! আমি

কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়তুম। কৃতজ্ঞতায় বুক আমার ভরে উঠত, তবু একটু মুখের হাসি দিয়েও তাঁর কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতুম না, এ কি কম আপশোষ! অত আদরে প্রাণে আমার বেদনা বাজত! কিন্তু উপায় ছিল না, উপায় ছিল না! আমার বুকের মধ্যে কি কাঁটা যে দিবারাত্রি খচ্ খচ্ করছিল! আমি শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁর সে ভালবাসা অনুভব করতুম! আমার সমস্ত অতীত তখন নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আমার বুকে অসহ্য শর নিক্ষেপ করত। তাই যখন স্বামীর সে আদরের আতিশয্যে আনন্দের উত্তেজনায় আমার অভিভূত মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়বার কথা, তখন সেই ব্যাধের তীক্ষ্ণ শরের বিষে ভিতরটা আমার জ্বলে খাক্ হয়ে উঠত! আমি চুপ করে পড়ে থাকতুম! নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসত,—চোখের সামনে থেকে সমস্ত পৃথিবীটা তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সব অনুভূতি নিয়ে কোথায় মিলিয়ে যেত!

* * * * * *
* * *

এমনি করেই দিন কাটছিল। সেদিন বিজয়া-দশমী। সন্ধ্যার সময় আমি একখানা শাদা কাপড় পরে ঘরের কোণে কি-একটা বই নিয়ে বসে ছিলুম। স্বামী ঘরে এলেন, পিছনে চাকর; চাকরের ঘাড়ে প্রকাণ্ড এক পাৎলা টিনের বাক্স। সেটা ঘরে রেখে চাকর চলে গেলে স্বামী বাক্সটা খুলতে খুলতে বললেন, "এতে তোমার কাপড় আছে, বোম্বাই থেকে আনিয়েছি, আর এই নাও, এক ছড়া হার।" সুন্দর একছড়া মুক্তোর মালা। মালাটা নিজের হাতে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে স্বামী বললেন, "তোমার পছন্দ হয়েছে?"

হাঁ-কি না, কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরুল না। আমি শুধু একবার তাঁর পানে চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম—আহা, তাঁর চোখে-মুখে কি সে আগ্রহ! কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর পানে চেয়ে থাকতেও পারলুম না—কে যেন মাথাটা আমার জোর করে ধরে নুইয়ে দিলে। তিনি কি বুঝলেন, জানি না,—শুধু ভারী রকমের একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। আমার সর্ব্বশরীরে কে যেন কাঁটার চাবুক মারতে লাগল। ভিতরটা আমার হাহাকার করে উঠ্‌ল। আমি তখন সেই হারটিকে বুকের উপর মুঠি ভরে চেপে ধরে মেজেয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম, ওগো দেবতা আমার, স্বামী আমার, এসো, এসো, তুমি ফিরে এসো। আমি তোমার এত আদর সহ্য করতে পারছিনা। কেন তুমি এ অভাগীকে এমন করে আদর কর গো? তুমি জানো না, আমি যে মহাপাতকিনী, আমার পাপের সীমা নেই! আমি এখানে তোমার এই ঘরে বসে আছি, এতে আমার নিশ্বাসের হাওয়ায় তোমার ঘর বিষিয়ে উঠছে, পবিত্র মন্দির কলুষিত হচ্ছে! তোমায় যে এই ফিরিয়ে দিচ্ছি, ওগো, সে অহঙ্কারের জন্য নয়, তেজের জন্য নয়,—আমার আবার কিসের তেজ, কিসের অহঙ্কার! তা নয় গো, তা নয়!

ভাবলুম, না, সব কথাই বলব! কিসের ভয়! অনর্থক আর এ কৃতজ্ঞতার ভার বাড়িয়ে তুলবো না! আমায় যদি ভিখারিণী হয়ে পথে

দাঁড়াতে হয়, তাতেও ক্ষোভ নেই, কিন্তু তাঁর কোমল চিত্তে আর এমন আঘাত দেব না, কখনো না!

উঠে ভাল করে চুল বাঁধলুম, সাবান মেখে গা ধুয়ে এলুম, স্বামীর-দেওয়া নতুন কাপড়খানি বাক্স থেকে বার করে পরলুম, বাছা-বাছা গহনায় গা সাজালুম, তারপর সুইচ্ টেনে দশ-বাতির ঝাড়টা জেলে দিলুম। দিয়ে আয়নার সামনে একবার এসে দাঁড়ালুম—হাঁ, ঠিক! আজ বিদায়ের পূর্ব্বে দেহের রূপকে ষোল কলায় ফুটিয়ে তুলে স্বামীর পায়ে পাপের ভার নামিয়ে দেব! তারপর তাঁর পায়ের ধুলো সর্ব্বাঙ্গে মেখে যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব। গঙ্গায় অতল জল আছে, আশ্রয়ের অভাব কি!

রাত্রি তখন ন'টা। দাসী এসে বললে, বাবু আজ গাড়ী করে তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন না? তা সোফার দু'ঘণ্টা হল, গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই বাবু বলে দিলেন. তোর মাঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করে আয়, গাড়ী চলে যাবে, না, তিনি বাগবাজারে বেড়িয়ে আসবেন?

বাগবাজারে আমার বাপের বাড়ী।

আমি বললুম, তোর বাবু কোথায় রে?

দাসী বললে, দোতালার বৈঠকখানায়।

—কি করছেন?

—কেদারায় শুয়ে কি বই পড়ছেন।

আমি বললুম, কাছে আর-কেউ আছে?

—না।

আমি বললুম, তোর বাবুকে একবার ডেকে দিতে পারিস্?

দাসী চলে গেল।

আমি মনটাকে বেঁধে নিলুম। সব কথা খুলে বলব বলেই স্থির করেছিলুম—কিন্তু তবু সেই-সময়টা যখন একেবারে এত-নিকট হয়ে এল, তখন বুকখানা কেঁপে উঠল—তাইত! এখনি যদি তিনি তাড়িয়ে দেন? এত আদর, এত ভালবাসা, এ যে জন্ম-জন্ম সাধনা করলেও কোনো নারীর ভাগ্যে মেলে না! এই সব ফেলে—মনকে চোখ রাঙিয়ে উঠলুম, খবরদার—তোর এতে কিসের অধিকার রে! জানিস্ না, রাক্ষসী তুই, রাণীর সাজ পরে কত-বড় হৃদয়-রাজ্য গ্রাস করছিস্! লজ্জা করে না তোর?

স্বামী এলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমায় ডেকেছ? কি শান্ত মিষ্ট সে স্বর! তাঁর পানে চেয়ে দেখলুম, মুখে সেই মৃদু হাসির রেখাটি তেমনি সুন্দর ফুটে আছে! মনে একটু দুর্ব্বলতা এল—বললুম, এ সাজ পছন্দ হয়েছে তোমার?

তিনি বললেন, বেড়াতে যাবে?

আমি বললুম, গেলে তুমি সুখী হও?

তিনি বললেন, মানে, সকলেই যাচ্ছে। আজ বিজয়ার রাত্রি! তা তুমি যদি বাগবাজারে যেতে চাও—

মন আরো নুয়ে পড়ছিল; জোর করে তাকে খাড়া করলুম। মুখ নীচু করে বললুম, সেখানে যাব না। যেতেও চাইনা কোনদিন।

বলেই তাঁর পায়ে প্রণাম করলুম, একেবারে দুটি পা আঁকড়ে ধরে মুখ গুঁজে সেই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লুম। চোখ দিয়ে হু-হু করে জল ঝরে পড়ল।

তিনি বললেন, ও কি করছ কনক?

আমি কোন কথা না বলে সেই দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম। তিনি আমার দু'হাত ধরে আমায় টেনে তুললেন।

বললেন, হঠাৎ আজ এমন করছ কেন?

—আমার বুক কেমন করছে।

—বাগবাজারে যাবে?

—না, না।

—তবে কি চাও, বল?

—আমি বড় পাপী গো, আমি মহাপাতকিনী—আমি যে কত-বড় বিশ্বাসঘাতক—

বাধা দিয়ে তিনি বললেন, পাগলের মত এ কি বকছ?

—না। আমি পাগল নই, পাগলের মত কিছুই বকি-নি। আজ আমি সব কথা খুলে বলব, তুমি শোনো। শুনে আমায় তাড়িয়ে দাও, এই রাত্রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও, তাতেও আমি এতটুকু দুঃখিত হব না। তুমি জানো না, এতদিন তোমার অসীম অগাধ ভালবাসার কি ভয়ঙ্কর অমর্য্যাদা আমি করে এসেছি। তুমি যখন অত আদর করেছ, তখন আমি পাষাণের মত শক্ত হয়েছি, তা গ্রহণ করতে পারিনি। সে আদর আমার প্রাণে কি আগুন জ্বেলে দিয়েছে, তা তুমি জানোনা। কেন দিয়েছে, তা তুমি শোনো। শুনে বিচার কর, দণ্ড দাও। যত কঠিন দণ্ডই সে হোক, আমি তা অম্লান বদনে মাথা পেতে নেব।

স্বামী কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিয়ে বললুম, তুমি আমার অতীত জানো না; আমি আজ সব কথা খুলে বলব, তুমি শোনো—

তুমি জানো, বাবার সখ ছিল, আমায় খুব ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন। বাড়ীতে মাষ্টার-পণ্ডিত রেখেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজেও দুবেলা আমার লেখাপড়ার তদ্বির করতেন। অর্থাৎ সে দিকটায় তিনি এমনি ঝোঁক দিয়ে ফেলেছিলেন যে আমার বয়স পনেরো পার হতে চললেও আমার বিয়ে দেবার কথাটা তাঁর খেয়ালেই আসেনি। ভাগ্যে সমাজ-দেবতা তাঁর বিরাট লগুড় ঘাড়ে নিয়ে ধর্ম্মরক্ষা করছিলেন! তাই তাঁর দূতদলের অস্তরালের কাণাঘুষোগুলো একদিন যখন প্রচণ্ড রূপ ধরে প্রকাশ্য আসরে অবতীর্ণ হল, তখন বাবা একটু চঞ্চল হলেন। সেদিন বাবা খেতে বসে আমার পানে বারবার চেয়ে-চেয়ে দেখে মাকে বললেন, তাইত, কনকটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছে, ওর আর বিয়ে না দিলে চলছে না। কি বল?

মা পাখা নিয়ে কাছে বসে বাতাস করছিলেন; পাখাটা রেখে দুধের বাটিটা বাবার পাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তোমায় ত বলে-বলে পারলুম না। মেয়ে নিয়ে পাড়ায় কারো বাড়ী পা দেবার জো নেই আমার।

বাবা বললেন, 'কিন্তু এইটে আমি বুঝতে পারিনে, মেয়ে আমার—তার বিয়ে কবে দি না দি, তাতে পাড়ার পাঁচজনের এত মাথা-ব্যথা কেন!

মা দুধের বাটিতে চিনি ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে বললেন, কথার শ্রী দেখ! সমাজ বলে একটা জিনিষ আছে ত—সে চুপ করে থাকবে কেন?

বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, তা ঠিক !

তখন সুযোগ পেয়ে বিস্তর ঘটক-ঘটকী এসে বাবাকে একেবারে ছেঁকে ধরলে। ফলে আমার শাস্তি সুরু হল ! সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন ছুট্‌ বলতেই মাথায় ভিজে গামছা চেপে পাতা কেটে চুল বেঁধে, নানা ধাঁচে সেজে-গুজে আড়ষ্ট কাঠের পুতুলটির মত আমায় বৈঠক-খানায় গিয়ে বসতে হত, বিচিত্র পাত্রের দল আর তাদের অভিভাবকদের মন ভোলাবার জন্য। সেখানে হত সেই মামুলি ব্যাপারের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ,—আমার রূপের তারিফ, নাম-জিজ্ঞাসা, গৃহিণীপনায় কতটা মুন্সিয়ানা জন্মেছে, তারি পরিচয় নেওয়া,—ব্যস্‌ ! হাড় আমার জ্বলে উঠ্‌ত। আমি কি কচি খুকী যে আমাকে এই সব উদ্ভট প্রশ্ন ! মানুষের মধ্যে যে-জিনিসটা আসল, যেটা আছে বলেই মানুষ মানুষ, সেই জিনিস, এই মনটার সম্বন্ধে, এত লোক আসে যায়, কৈ, কোন রকম খবরা-খবর ত কেউ চায় না—সেটাতে কারো নজরই নেই ! হায়রে, এরা চায় শুধু নারীর এই দেহখানা—! কেউ দেখবে, কতখানি রূপ আছে ! বিলাসের বিচিত্র উপকরণ, রঙিন খেলনা,—সেটি নিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে, ইচ্ছা হলে পেড়ে নানা ভাবে সেটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখে অলস উদ্দেশ্যহীন সখ মেটাবে ! নয় কেউ চাইবে, সুস্থ, সবল পেশী,—যার জোরে সংসারের জাঁতা কলটাকে আচ্ছা করে ঘুরিয়ে নেওয়াবে ! ছিঃ এই পুরুষ ! এরই সঙ্গে নারীর জীবন-মরণের সকল সম্পর্ক কত জন্ম-জন্মান্তরের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা !

আমার ঘৃণা ধরে যাচ্ছিল। এ ত বিয়ে নয়, এ যেন এক লটারির খেলা চলেছে ! নেব-নেব করে বিস্তর লোক এসে নাকটা কানটা মাপছিল আর হাত বাড়াচ্ছিল, আবার ফিরছিল,—ভাবছিল, তাইত যদি ঠকে যাই ! এর চেয়ে আরো-ভালো ত মিল্‌তে পারে ! সকলেরই মনের ভাব, লাভটা ষোল গণ্ডায় খতিয়ে নেওয়া চাই ! জানিনা, আমার মধ্যে কোন্‌ পদার্থটির অভাব তারা লক্ষ্য কর্‌ছিল ; কিন্তু তাদের এই কুণ্ঠিত ভাব দেখে বাবা সাহস পাচ্ছিলেন না—কাজেই এইভাবে ঢেউ খেতে খেতে আমার নাকে-মুখে জল ঢুকে দম আটকে গেলেও এই স্রোতেই গা ভাসিয়ে আমি চলেছিলুম।

সেদিন পাত্রের দল দেখা দেয়নি,—সন্ধ্যার একটু আগে আমি রাস্তার দিকের বড় ঘরের খড়খড়িটার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলুম, রাস্তা দিয়ে খুব ঘটা করে এক বর যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলুম, পাশে ছিল কিরণ-দিদি। আমার এক পিসিমা আছেন, কিরণ দিদি, তাঁরই মেয়ে। সে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাবে পুরীতে, তাই সেদিনটা আমাদের ওখানেই এসে উঠেছিল। পরের দিন তার পুরী যাবার কথা।

আমরা দুজনে বরের সাজসজ্জার সমালোচনা কর্‌ছিলুম। বরটি দেখতে কালো, মোটা-সোটা, সাটিনের জামার উপর গোড়ে মালা আর গার্ড-চেন ঝুলিয়ে গম্ভীর হয়ে গাড়ীতে বসে আছে ;—পাশে কনে, তারও রঙটা ময়লা, বেঁটে মোটা চেহারা।

কিরণদি বললে, কি বেহায়া বর, মাগো,—লজ্জা করলে না ওর,—ধেড়ে মিন্সে—এমনি সেজে-গুজে খোকার মত বাজনা-বাদ্যি করে যেতে!

আমি বললুম, এ তোমার অন্যায়। ওর যদি ঐ রকম সখ্ হয়!

কিরণদি বললে, এ যে সৃষ্টিছাড়া সখ, ভাই!

এমন সময় হঠাৎ আমার নজর পড়ল ও-ধারকার ফুটপাথের উপর। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে,—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে, রঙ খুব ফরসা, চোখে সোনার চশমা, মুখে একটু দুষ্টু হাসি মিটমিট করছে। একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে সে বর-কনে দেখছিল। আমি কোন কথা লুকোব না; সেই ছেলেটির চেহারাখানি আমার দেখতে খুব ভাল লাগছিল, চকিতে কেমন নেশা লেগে গেল। আমি তাকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলুম, এমন সময় কিরণদি বললে, দেখ্ ভাই, কি সুন্দর ছেলেটি।

আমি বললুম, কে—? যেন দেখিনি এমনি ভাবেই কথাটা বললুম। ওকেই যে আমি দেখছিলুম সে কথাটা প্রকাশ করতে আমার কেমন লজ্জা হল!

কিরণদি বললে, ঐ যে লো—ঐ সামনেই, ও ফুটপাথে।

আমি বললুম—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

কিরণদি বললে, ঐ ছেলেরই বর সেজে বসলে মানায়, তা না, মাগো, এই ধেড়ে-কেষ্ট বর! সত্যি ভাই, তোর অমনি বরটি হয়!

আমি তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বললুম, যাঃ!

কিরণদি বললে, আচ্ছা, ওরই সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয়!

আমি রাগের ভাণ করে তার পিঠে ছোট একটা কিল বসিয়ে বললুম, দেখ, ভাল হবেনা বলছি। ও সব কি কথা!

আমার চোখ ছলছলিয়ে এল। কিরণদি বললে, ও বাবা, এ ঠাট্টাটুকু গায়ে সইল না! অমনি আমার অভিমানিনীর চোখে জল এল!

তারপর কিরণদি বললে, সরে আয়লো, ছেলেটা আমাদের দেখছে। ঐ দ্যাখ্ না!

আমি চেয়ে দেখলুম, ছেলেটি একদৃষ্টে আমাদের জানলার পানে তাকিয়ে আছে!

আমাদের সরে আসতে হল। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল—কেবলই ওকে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কেন, তার কোন কারণ আজ পর্য্যন্তও বুঝতে পারিনা।

পরের দিনও তার চেহারাটা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল,—এমনি সময় শূন্যমনে সেই খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওদিককার ফুটপাথে। দেখি, সেই ছেলেটি; একগোছা বই নিয়ে ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বাড়ীর সামনে এসে তার গতি একটু মন্থর হয়ে গেল। তার উৎসুক দৃষ্টি এক ব্যাকুল সন্ধানে আমাদের খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়ল! তাকে দেখব, এ কল্পনাও আমার ছিল না। দেখে মনটা কি যে হল! প্রাণের মধ্যে একটা মিষ্টি হাওয়া বয়ে গেল। আমি শার্সির পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলুম। কেবলই মনে জাগছিল, কিরণদির কথাটা। ঠিক, চমৎকার চেহারাই বটে! হঠাৎ কিরণদি

পিছন থেকে বলে উঠল, কিগো, কি দেখা হচ্ছে অত-গোপনে ?

আমি রেগে বলে উঠলুম, যাও কিরণদি, আবার ঐ রকম ঠাট্টা ? রাগের আমার কোন কারণ ছিল না, কথাটা বলেই তা বুঝতে পরলুম ; এবং লজ্জিত হলুম যখন কিরণদি বললে, সত্যি ভাই আমি ত কিছু লক্ষ্য করে তোকে ও কথা বলিনি। তুই কি দেখছিস্ তা জানি-ও না। ও কে রে ? সেই ছেলেটি না ?

কথাটা বলেই কিরণদি এসে সাশির ধারে দাঁড়াল। সেই ছেলেটিরও তখন, জানিনা কি কারণে, জুতোর ফিতে হঠাৎ আল্‌গা হয়ে গেল, সে দিব্যি জুতোর ফিতে বাঁধতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার গাটা শির্-শির্ করে উঠল। কিরণদি হেসে বললে, ওঃ!

আমি বললুম, ওঃ কি ! না, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগেনা, বলছি !

কিরণদি বললে, কিলো,—ধরা পড়ে গেলি নাকি ? সেই যে বলে,—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথায় ধরে পড়ে, কে জানে !

আমি বেশ তীব্র স্বরেই বললুম, কিরণ-দি—

—না হলে তোর এত দরদ কেন ভাই ? বলে, ঠাকুরঘরে কে, না কলা খাইনি! আচ্ছা, বল্ না, খুলে। মামাকে তাহলে বলে খবরটা নি। আমার কেমন মনে হচ্ছে,—দেখছিস্ না, ওরও ঠিক এইখানটিতে এসে জুতোর ফিতে খুলে গেল—ঐ তোর বর, নিশ্চয় !

'যাওঃ' বলে আমি সেখান থেকে সটান্ একেবারে ছাদে উঠে চিলের ছাদের পাশে এসে বসলুম। আল্‌সের ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। চেয়ে দেখলুম, সে চলেছে, কেমন আপনা-ভোলা-ভাবে! তার পাঞ্জাবির পকেটে রুমালের মুখটুকু শুধু দেখা যাচ্ছিল! আর পায়ের রঙ্‌টুকু সকালের সেই রৌদ্রের আলোয় যেন চাঁপা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। আমি গোপন করছিনা—আমার তখন সত্যই মনে জাগছিল, কিরণদির কথা—'ঐ তোর বর'—ঠিক! তাই, নিশ্চয় তাই! নাহলে দু'দুবার এমন করে দেখা হবে কেন ? কাল হঠাৎ চোখে পড়ল—আজও সকালে দেখতে পাব, সে আশা ত একবারও মনে হয়নি,—তবু এমন মেঘ না চাইতে জল এল! এমন ত কতদিন সকালে সন্ধ্যায় খড়খড়ির ধারে দাঁড়াই, কৈ কোন দিন ত চোখে পড়েনি ঐ মূর্ত্তি, ঐ রূপ! মনে মনে তখন রাজ্য গড়তে লাগলুম। বাড়ীতে যেন খুব ধুম বেধে গেছে, আমার বিয়ে! ভারী ঘটা করে বর এল—শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলে চেয়ে দেখি, এ, সে-ই!

আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, স্বামী, ঐ আমার স্বামী! নাহলে আবার এমনভাবে দেখা হবে কেন ?

এ কল্পনা আমায় একেবারে দেখতে দেখতে কেমন নাচিয়ে তুললে—সমস্ত শরীরে মনে আগুন ধরে গেল। আমার আর বসে-দাঁড়িয়ে চলে-ফিরে সোয়াস্তি রইল না! দুপুর-বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই সাশির আড়ালে একখানা বই নিয়ে একটা ইজিচেয়ার টেনে তার উপর বসে পড়লুম।



তীর্থযাত্রী

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ অঙ্কিত।

খড়খড়ির সাশি খোলা রইল। কাকেও আশঙ্কা করবার কিছু ছিল না, কারণ এমন আমি হামেশাই বসে থাকি। বসে বই খুলে কেবলই ভাবছিলুম, কিরণদির কথা! তার চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত! সে সন্দেহ করে ফেলেছে! প্রথমটায় রাগ দেখিয়ে ছিলুম, কিন্তু এখন কিরণদির সে ঠাট্টাটুকুও ভারী আরামের বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলুম, কিরণদিকে কেন বকলুম! কেবলি মনে হচ্ছিল, কিরণদি কখন্ আসবে! এখানে এসে আমায় এ অবস্থায় দেখলে ঠাট্টা যে করবে নিশ্চয়, তা বুঝছিলুম—তবু মনে হচ্ছিল, করুক ঠাট্টা, সে বেশ লাগবে! সে যে সন্দেহ করেছে,—তাতেও আমার আরাম বোধ হচ্ছিল। বসে বসে আরো ভাবছিলুম, বই নিয়ে সে যাচ্ছিল—নিশ্চয় স্কুলে কি কলেজে,—নাহলে এ-বেলায় বই নিয়ে ও-বয়সের মানুষ আর কোথায় যাবে? যখন গিয়েছে, তখন ফিরবেও ঠিক! কিন্তু কখন, কখন সে ফিরবে? আবার মনে হচ্ছিল, তাই বা ভাবি কেন! এমন ত হতে পারে, কোন বন্ধুর বাড়ী থেকে হয়ত বই নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে, তাহলে আজ বিকেলে এখানে আসবার সম্ভাবনা কোথায়? দেখাই বা আবার হবে কি করে?

বই খুলে এমনি সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় কিরণদি এল, এসে বললে, কি বই পড়ছিস্ রে?

হাতে বই একখানা ছিল বটে, কি বই তাও কি দেখেছিলুম? না। মলাটটা দেখে আমি বললুম, ভূধর চক্রবর্ত্তীর 'মনোরমা'।

—কেমন বই?

—জানিনা, তবে মন্দ লাগছে না।

—ভূধর চক্রবর্ত্তী লেখে ভাল। ও কোন্ বইটা রে? সেই নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর থেকে সাগরে ঝাঁপ খাচ্ছে গোড়াতেই?

—হ্যাঁ।

—দেখি, ও বইটা সত্যি আমার ভারী ভাল লেগেছিল। পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে যায়; না? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! দেখি—বলে বইটা হাতে তুলে নিলে। দু'চার পাতা উল্টে-পাল্টে বললে, দূর, সেটা ত 'প্রণয় না হলাহল' উপন্যাসে আছে। এটাতে ত সেই যমপুরী থেকে পালানোর ব্যাপারটা! তুই ত তবে খুব পড়ছিস্ লো?

আমি একটা নিশ্বাস ফেললুম। কিরণদি আমার কপালের উপর নিজের মাথাটা রেখে বললে—ভাই কনক, আমার আজ সারাদিন, জানিনা কেন, কেবলই মনে হচ্ছে, ঐ ছেলেটির সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। তাহলে হয়ও বেশ। চমৎকার দেখতে কিন্তু ভাই! আমি তাই এ-ঘরে এলুম, আজ সকালে সে বই নিয়ে যাচ্ছিল, আমি ছাদে চুল শুকোতে শুকোতে দেখছিলুম। ও নিশ্চয় কলেজে যাচ্ছিল।—আমি মামীমাকে বলে এলুম, এ ঘরে আসতে। বলেছি—তোমার মেয়ের বিয়ের ঘটকালী করব; পাত্র চাও? আজই পাত্র দেখাব। মামীমা বললে, পানটা খেয়ে আমি যাচ্ছি।

আমি বললুম, ছি ভাই কিরণদি, এ কি করছ তুমি?

কিরণদি বললে, কি আর করেছি—মানুষটা যাবে, মামীমাকে দেখাব।

—যাবে যে ঠিকই, তা তুমি জানলে কি করে?

—আমার মন বলছে, সে যাবেই এ পথে। তুই ত ওবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেলি, আমি ওকে লক্ষ্য করছিলুম—ও তু'পা করে যায়, আর নানা ছলে এই খড়খড়িটির পানে ফিরে-ফিরে চায়—!

ঘণ্টাখানেক পরেই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। সেই ফুটপাথে তারই দর্শন মিলল। বেশ জোরে জোরে সে আসছিল, কিন্তু এবারও দেখলুম, আমাদের বাড়ীর কাছ-বরাবর গতি আবার মন্থর হল। মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কাজেই আমি খড়খড়ির পাখির ফাঁক দিয়েই দেখছিলুম, মা না টের পায়! মা বললে, বেশ ছেলেটি! আহা, জামাই করে বুকে তুলে নিতে সাধ হয় বটে!

ছেলেটি লক্ষ্য করলে, যে আমাদের খড়খড়ির পাশ থেকে তাকে দেখা হচ্ছে—তার মুখখানা সস্মিত হয়ে উঠল। সে চলে গেল। মাও অন্য ঘরে গেল।

কিরণদি বললে, কনক, আয় দেখি, ছাদে যাই—ও কোন্ দিকে যায়, দেখব।

আমি বললুম, তুমি ক্ষেপেছ!

—হ্যাঁ ক্ষেপেছি। বেশ, তুই না যাস, আমিই দেখিগে—

কিরণদি ছাদে দৌড়ুল, আমিও বসে থাকতে পারলুম না—ছাদে গেলুম। আলসের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম, বাঃ, এ ত বেশী দূর নয়—ওদিককার ফুটপাথ যেখানটায় বেঁকেছে, ঠিক সেই মোড়টার উপর তেতালা বাড়ীখানার মধ্যে সে ঢুকল।

কিরণদি মহানন্দে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, রোস্, সন্ধান নিচ্ছি। বলে দৌড়ে নীচে ছুটে গেল।

অর্থাৎ কিরণদি কেমন করে' জোগাড়-জাগাড় করে সরকার মশাইকে সেই বাড়ীর দিকে রওনা করিয়ে দিলে; আধ ঘণ্টা পরে সরকার মশাই ফিরে এসে বললে—একটি বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে বেড়াতে বেরুচ্ছিল—তারই কাছে সন্ধানে জানা গেল, ওরা আমাদেরই পাল্টা ঘর; ওরা চাটুয্যে।

কিরণদি বললে, মামীমাকে বলে যাচ্ছি ঘটক পাঠাতে—মামা বেরিয়েছেন, ফিরে আসবেন কাল; আমার সঙ্গে ত আর দেখা হবে না!—আমাকে যে চলে যেতে হচ্ছে, না হলে মামাকে একেবারে পাকা কথা ঠিক করতে পাঠিয়ে দিতুম।

... ...

কিরণদি ত চলে গেল; তারপরই বাড়ীতে নন্তুর খুব অসুখ হল,—কাজেই ঘটক পাঠানো ঘটে উঠল না। কিন্তু প্রত্যহই আমাদের তুজনের সেই চোখের খেলা চলতে লাগল। সকালে, বেলা ঠিক দশটার সময় বইয়ের গোছা নিয়ে তাকে কলেজে যেতে দেখতুম,—এবং বেলা তুটো থেকে তিনটের মধ্যে আবার এই পথেই সে ফিরত! সে বেশ বুঝে নিলে, এখানে তাকে দেখবার জন্য আমি উদ্গ্রীব হয়ে থাকি! আমিও বুঝলুম, আমাকে দেখবার জন্য তার ঔৎসুক্যও বড় কম নয়!

একদিন মজা দেখব বলে ঐ সময়টিতে দোতালার খড়খড়ির ধার ছেড়ে ছাদে আলসের আড়ালে এসে লুকিয়ে রইলুম—মনে ভাবলুম,

আমি তাকে ঠিক দেখব; কিন্তু ও ত আর দেখতে পাবে না, তাতে দেখা যাক্, ওর মনের ভাবখানা কেমন হয়! ও কি করে!

সেদিনও ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে বইয়ের গোছা নিয়ে সে দেখা দিলে—আমাদের খড়্খড়ির পানে উৎসুক দৃষ্টি নিত্যকার মতই তেমনি অধীর আগ্রহে আমার আশায় ছুটে এল; —কিন্তু দেখা মিলল না! তার চোখদুটি তখন একেবারে ম্লান হয়ে গেল। অত্যন্ত মলিন হতাশ মুখখানি নিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে পড়ল —আমার ভারী আমোদ হল! তারপর সে কি করে, তা দেখবার জন্য আমি আল্‌সের আর একটা ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে লাগলুম। দেখি, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল—তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কি-একটা মস্ত-প্রয়োজনীয় জিনিষ বাড়ীতে ফেলে এসেছে, পাচ্ছে না, এমনি ভঙ্গী করে আবার সে ফিরল। আমি একেবারে মাথা তুলে ছাদে দাঁড়িয়ে উঠলুম, সে ততক্ষণে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছে,—দৃষ্টি তার সেই খড়খড়ির পানেই। আমার দুঃখ হল; তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব বলে আঁচলটা একটু আকাশের দিকে আমি উড়িয়ে দিলুম—এবং তখনি রাস্তার পানে ফিরে তাকালুম। আমায় তখন দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল—তারপর সে কি হাসি, কি প্রসন্নতা, সার্থকতার কি সে আনন্দ যে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল! আমি তা স্পষ্ট দেখলুম। বেচারা ফ্যাসাদে পড়ে গেল আর কি! এখন করে কি? আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েই আবার পকেটে হাত পুরে দিলে, তারপর চকিতে মাথাটা নেড়ে সে তার গন্তব্য পথের দিকে ফিরে দাঁড়াল—অর্থাৎ ভাবটা এমনি দেখালে, যেন যার জন্য আমি ফিরেছিলুম, তা পেয়েছি গো, পেয়েছি!

এমনি করেই আমার চিত্তে তীব্র নেশা তীব্রতর হয়ে উঠছিল। একদিন হল কি,—সন্ধ্যার সময় এক মাসীর বাড়ীর নিমন্ত্রণ গেছলুম—পরদিন ভোরেই ফেরবার কথা; কিন্তু মাসীর অত্যন্ত জেদে মা বললেন, তা'হলে সন্ধ্যার সময়ই বাড়ী ফিরব।

শুনে আমি জ্বলে উঠলুম! কি! সারাদিন তাকে দেখতে পাব না আজ, সে বেচারাও হতাশ মলিন মুখে ফিরে যাবে! নিজে দেখতে পাব না সে দুঃখ ত ছিলই,—কিন্তু সে আমায় দেখতে পাবে না, এইটেই বেশী বাজছিল!

না, কখনো তা হবে না। গোঁ ধরে মাকে বললুম, আমি এখনি বাড়ী যাব—

—সে কি হয় কখনো?

—কেন হবে না? সেখানে বাবার কষ্ট হবে, তা ভাবছ?

—একবেলার জন্যে আর কষ্ট কি! লোকজন ত আছে সব—

—না মা, তবু বাবার কষ্ট হবে। বাবাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আমোদ করতে পারব না আমি। তোমার সাধ হয়, থাকো।

—তোর গিন্নেপনা রাখ্ দেখি।

আমি কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে তুললুম। মাসী এবং বাড়ীর সকলেই বললেন, বাপের উপর বড্ড মায়া, বুঝি! অর্থাৎ আমায় কেউ রাখতে পারলে না।

আমি একা ফিরলুম,—বাড়ী পৌঁছুলুম, বেলা তখন প্রায় দশটা। মনটা ধড়ফড় করছিল! গাড়ীটার উপর রাগ ধরছিল, ভারী আস্তে চলেছে! সব বৃথা হল বুঝি! গাড়ী থেকে নামছি, এমন সময়ে পিছনে কার কাশির শব্দ পেলুম, ফিরে দেখি, সে। এক ছুটে উপরের ঘরে গিয়ে সার্শির ধারে এসে দাঁড়ালুম—দেখি, সেই সতৃষ্ণ আঁখির দৃষ্টি ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়েছে! চোখোচোখি হয়ে গেল। দুজনেই দুজনের পানে চেয়ে হেসে ফেললুম। হেসেই আমি ভাবলুম, ছি ছি, এ কি করলুম! লজ্জায় তখনি সরে এলুম।

... ...

না, আর বাড়াবো না, খুব সংক্ষেপেই সেরে নিচ্ছি।

বাড়ীতে নন্তুর অসুখ সারতেই পশ্চিমে যাবার কথা উঠল। আমি ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়লুম। সকলেই যাবে; সেখানে গেলে তাকে ত দেখতে পাবো না—অথচ কি করেই বা বলি, আমি যাব না? আমায় এখানে একলা রেখে ত আর যাবে না কেউ!

যাবার দিন ক্রমে ঘনিয়ে এল—কি করি, কি করি! মহা দুর্ভাবনায় পড়লুম। মার উপর রাগ ধরছিল,—কৈ, মা ত বাবাকে বলে একদিনও ঘটক পাঠাবার ব্যবস্থা করলে না। কিরণদিই বা কি-রকম লোক! একটা কথা দিয়ে সে সম্বন্ধে একেবারেই চুপচাপ! বাঃ দুনিয়ার উপর রাগ ধরে গেল—স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর দুনিয়া!

যে দিন আমাদের পশ্চিম যাবার কথা তার আগের দিনের কথা বলছি। আমি বাইরের ঘরে বাবার কতকগুলো কাগজ-পত্র দেখে শুনে গুছিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রাখছিলুম—হঠাৎ খড়খড়িতে একটা ঠক্ করে শব্দ হল। এগিয়ে গেলুম—দেখি, সে একেবারে এ ফুটপাথে, ঠিক আমাদের খড়খড়ির নীচেয় এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। গা ছমছম করতে লাগল। মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ ছলাৎ করে যেন ঢেউ তুলে নাচতে লাগল। এগুব কি পেছুব, ঠিক করতে পারলুম না।

সে-ও একবার আমার পানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। আমার চোখে জল এসেছিল। সেও অপ্রতিভ হয়ে পড়ল,—তার চোখে সে ভাব পষ্ট আমি লক্ষ্য করেছিলুম। কোন মতে সে বলে উঠল,—গলাটা কাঁপছিল,—সে বললে, মাপ করবেন, বড় দুঃসাহসের কাজ করেছি আমি। কিন্তু শুনলুম, আপনারা পশ্চিম যাচ্ছেন! আপনি পশ্চিমে যাবেন না—আপনাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাব।—শেষের দিকটায় তার গলার স্বর এমনি করুণ হয়ে এল যে আমার প্রাণটা বেদনায় ঝরে পড়বার মত হল!

কথাটা শুনে আনন্দ যেমন হল,—তেমনি ক্ষোভও হল। ছি—এমন করে কথা বলাটা কি ঠিক হয়েছে! আমি একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে, বয়সও খুব কম নয়—আর ওর সঙ্গে পথের আলাপ বৈ ত না—কোনো পরিচয় নেই—কেউ কারো সম্বন্ধে কিছুই জানি না, হঠাৎ এতটা ঘনিষ্ঠতা!

জানি না, মনের কোন্‌খানে একটা ঘা লাগল। মনের মধ্যে যে রঙিন ফানুসটা জ্বলছিল, ঘা খেয়ে সেটা ছিঁড়ে পুড়ে গেল—আর তখনি একটা কি-রকম বিশ্রী কালো কালির দাগ চোখের সামনে ফুটে উঠল!

তবু সরে আসতেও পারলুম না। পা যেন কে এঁটে ধরে রেখেছিল।

সে বললে, যদ্দি যান, তাহলে জেনে রাখবেন, ১২নম্বর বাড়ীর চুনি চাটুয্যেকে আর জীবনে দেখতে পাবেন না।

আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না—ছি!

চোখের দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা হেনে আমি সরে এলুম—সে ঘরে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালুম না। একেবারে ছুটে তেতালার ছোট ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে এসে বসে পড়লুম। ভয়ঙ্কর কান্না পাচ্ছিল। তীব্র অনুশোচনায় মন ভরে গেল। বড় সাধের কল্পনা হঠাৎ দম্‌কা বায়ে ছিঁড়ে গেলে মনের যেমন ভাব হয়, তেমনি ভাব হল। পরক্ষণেই কিন্তু মমতায় প্রাণ আবার ভরে উঠল! আহা, কি করুণ ঐ নিবেদন! ঠাকুর-ঘরের দরজায় মাথা রেখে বললুম, হে ঠাকুর, আমাদের পশ্চিম যাওয়া বন্ধ করে দাও।

আশ্চর্য্য! সেই রাত্রে বাবার নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। টেলিগ্রাম পড়ে বাবা বললেন, না, কাল মধুপুর যাওয়া আর হল না। আমায় ভোরেই মফঃস্বল যেতে হবে। প্রজারা কাছারি লুঠ করেছে!

শুনে আমার সে-যে কি আনন্দ হল!

এ ঘটনায় তার উপর আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। তবে এ-ই আমার স্বামী, এ-ই সে নিশ্চয়! না হলে ঠাকুর কথা রাখবেন কেন! তখন পরদিন সকালেই তাকে এ খবরটুকু জানাবার বড় ইচ্ছা হল। খুসী হবে! একটা কাগজে মোটা অক্ষরে লিখলুম—"মধুপুরে যাওয়া হল না।" ভাবলুম, সে যখন যাবে,—এই পথেই ত যাবে, তখন কাগজখানা রাস্তায় ফেলে দেব'খন।

আবার মনে হল, না—ছি! মনকে শক্ত করে বললুম, না—না।

ঘড়িতে দশটা বাজল, আর অমনি আমাকে জোর করে যেন কে খড়খড়ির ধারে টেনে এনে বসিয়ে দিলে! পথে নানা সাজের লোক চলেছে ফিরিওলা হেঁকে যাচ্ছে, গরিব-দুঃখী লোক তাদের দুঃখের ভারে নুয়ে পথে চলেছে, ও-বাড়ীর উড়ে বামুনটাও রান্নাঘরের জঞ্জাল ধুয়ে মুছে তালি-দেওয়া একটা আল্‌পাকার কোট গায়ে এঁটে তার উপর গরদের চাদর বেঁধে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে! সবই দেখছিলুম, মনটাকে অন্ত দিকে ফেরাব ভাবছিলুম। কিন্তু সে কেবলি বেঁকে দাঁড়াচ্ছিল, আর হুম্‌কি দিয়ে বলছিল,—কেন 'না'! কিসের 'না'! ও যে তোর স্বামীরে, ও ত পর নয়, পথের লোক নয়, স্বামী, স্বামী, স্বামী! ওর কাছে তোর কিসের লজ্জা! আমি মনকে কেবলি চেপে ধরে বলছিলুম, না, না, না। এমনি সময়ে ওদিকে সেই মূর্ত্তি আবার যথাসময়ে ফুটে উঠল, তার সকল আকর্ষণ নিয়ে। আনন্দে আমার চিত্তও নেচে উঠল!

সে কাছে এল, একেবারে সামনে, ওধারের ফুটপাথে। আমি অমনি কাগজখানা খড়খড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলুম। কাগজটা উড়তে উড়তে পথের উপর পড়ল।

চম্‌কে উঠলুম,—যদি কেউ দেখে! সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখতে লাগলুম, দেখি, কি করে! সে একেবারে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এল—পথে নেমে তার জুতো ফিতের হাত রেখে ঝুঁকে কাগজখানা কুড়িয়ে নিলে, নিয়ে পড়লে। পড়ে একবার উপর-পানে প্রসন্ন হাসি-ভরা দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

আমার মনে হল, ছি, ছি, এ কি করলুম! ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় আমার মনের নিভৃত মন্দির থেকে ইষ্টদেবতাকে টেনে এনে একেবারে পথের মধ্যে এমনভাবে আজ বসিয়ে দিলুম—প্রাণের নীরব পূজাকে আজ কাঁশর ঘণ্টার হট্টরোলে মিশিয়ে দিলুম!

তার উপরও রাগ ধরল! কেন ও কাগজটাকে সে কুড়িয়ে নিয়ে গেল! কেন,—কেন? খবরটুকু জানা হলে কাগজখানা কেন সে ছিঁড়ে ফেললে, না? কেন ছিড়লে না? এ অন্যায়, ভারী অন্যায়! ঠিক করলুম—বেশ, কলেজ থেকে ফেরবার সময় কখনো আজ দেখা দেব না ত, কখনো না—খুব শাস্তি হবে তখন।

... ...

কিন্তু ছুটোর সময় আড়ালে বসে থাকতে পারলুম না ত! কে আবার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সেই খড়খড়ির ধারেই আমায় বসিয়ে দিলে। পথের পানে তাকাতেই দেখি, সে আসছে—একটু দূরে সে ছিল, কিন্তু ও কারা! সঙ্গে দু'জন সঙ্গী যে! হাতে, ও? দেখেই বুঝলুম, আমারই হাতের লেখা সেই কাগজখানা। সে-কাগজখানা সে খুলে দেখাচ্ছিল, আর সঙ্গী দুজন অমনি হেসে লুটিয়ে কৃতার্থ বন্ধুর সার্থকতায় তার পিঠ চাপড়াচ্ছিল! দূর থেকে আমাদের খড়খড়িটার পানে আঙুল নেড়ে সে কি ইসারা করলে। তারাও অমনি চেয়ে দেখলে।

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল! কি! এই প্রেম, এই খেলা—এ তোমার কৌতুকের উৎস খুলে দিয়েছে! হতভাগা, কাপুরুষ! ইচ্ছে হল, বাঘের মত ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ হাসিশুদ্ধু মুণ্ডুগুলো ঘাড় থেকে উপড়ে তুলে নি! অভদ্র, ইতর!

তিনবন্ধুতে এগিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে এল। আমি সজোরে সাশিটা বন্ধ করে দিলুম। চোখে এমন কঠিন দৃষ্টি হেনেছিলুম যে যদি তারা মানুষ হত ত তখনি আহত মূর্চ্ছিত হয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়ত! কিন্তু তা হল না। কাজেই আমার নিজের মনকে আমি রাগের আগুনে পোড়াতে লাগলুম!

মনে করলুম, ছাদ থেকে এখনি লাফিয়ে পড়ি, হাড়গুলো গুঁড়ো হয়ে যাক; আর এই লক্ষ্মীছাড়া দেহখানা, যার রূপের গর্ব্বে অন্ধ হয়ে আছি, সেই দেহটা কদর্য্য মাংসপিণ্ড হয়ে পথে লোকের পায়ের তলায় পড়ে পিষে কাদা হয়ে যাক! দারুণ ধিক্কারে, ভীষণ অন্তর্দ্দাহে আমার লোকালয় ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাবার সাধ হতে লাগল। আমি কেঁদে ফেললুম!

তবু মরতে পারলুম না! কোথাও পালানোও হল না—কে যেন মনকে চড় মেরে বললে, কি! তোর একটা খেয়ালের খেলা ভেঙে গেছে বলে এই মা, এই বাপ, তাদের মুখে চুণকালি দিয়ে আত্মহত্যা করবি, আর

কদর্য্য কুৎসায় তাদের অঙ্গ ছেয়ে যাবে! তাই আমি মরতে পারিনি গো, তাই পারিনি! না হলে সেই নীচ পশুটা মানুষের উপর যে ঘৃণা জন্মে দিয়েছিল,—

তারপর যেদিন তোমায় দেখলুম, সেদিন ঐ চোখে কি আশ্বাস, নির্ভরতার কি সে আভাষ পেয়েছি, তা আমিই জানি। তুমি দিনে-দিনে যত আদর, যত সোহাগ, যত ভালবাসা দিয়েছ, ততই আমার প্রাণ জ্বলে জ্বলে উঠেছে! কেবলি মনে হয়েছে, এ কি, এ কি পাষাণে তুমি ফুলের আশা করছ! তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে মন আমার মাথা নুইয়ে লুকোবার পথ খুঁজে পায় না,—তাই যখনি তুমি ভালবেসেছ, আদর করেছ, তখনি আমি কুণ্ঠিত হয়েছি! মুখের হাসিটুকু দিয়েও আমার প্রাণের অসীম সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারিনি—

আজ জানাচ্ছি,— ওগো—পাষাণী অহল্যার মত এ পাষাণীকেও কি পরশ দিয়েছ তুমি—আজ আর কোন ভয় নেই আমার, —এখন শাস্তি দাও, মাথা পেতে নেব, হাসিমুখে নেব আমি—

... ...

... ...

শাস্তি চাইছ?

আমার সমস্ত বুক কেঁপে উঠল। আমি চোখ বুজলুম।

স্বামী আমায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে চুমু দিয়ে বললেন, এই নাও শাস্তি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

বাংলার মাসিকপত্র

বাংলায় মাসিক পত্র বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে বসিলে বাংলা সাহিত্যের ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে আমার মনে একটু সংশয়ের উদয় হয়। দেখি, হয় প্রত্নতত্ত্ব—তত্ত্বটুকু বাদ দিয়া; নয় পত্নীতত্ত্ব, অর্থাৎ বাজে গল্প ও উপন্যাস—হয় গণেশের তাম্রশাসন, নয় অত্যন্ত সাধারণ নায়ক-নায়িকার হা-হুতাশ, মর্ম্মবেদনা, হৃদয়-বিদারক ঘটনা; এই সব একাদশ শ্রেণীর নায়ক নায়িকার তথা-কথিত প্রণয় অথবা বস্তুত nervous titillation, স্নায়বিক উত্তেজনার কাহিনীটা এমনি রোচক নয় যে, তার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি সহ্য হয়। "কমলিনী একটি সুন্দরী তরুণী, নায়ক ললিত তাকে দেখিয়া মুগ্ধ কিন্তু বিবাহ হইতে পারেনা বলিয়া নায়ক কিম্বা নায়িকা কিম্বা উভয়েই মনঃক্ষুণ্ণ।—অথবা অনেক গোলমালের পর কমলিনী তার নায়ককে লাভ করিয়া তাকে ভাল করিয়া রাঁধিয়া খাওয়াইত ও রাত্রে গা টিপিয়া দিত।" 'স্বর্ণলতা'র আমল হইতে এই ত বাংলার গার্হস্থ্য উপন্যাসের নমুনা। খুব হালে দেখিতেছি যে, প্রণয়ে বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য নায়ক-নায়িকার মধ্যে একটা তৃতীয় পক্ষের অবতারণা করিয়া নবেলকে জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। সেদিন একজন বলিতেছিলেন যে,আধুনিক বাংলা সব

গল্প-উপন্যাসেই মিথুন-সমস্যা (sex-problem) দেখা দিয়াছে। অবশ্য ঐ তৃতীয় পক্ষের অবতারণাটাই যদি সমস্যা হয়, তবে তাঁর কথা শিরোধার্য্য। কিন্তু এপর্য্যন্ত বাংলায় একটি মাত্র 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস বাদে নিতান্ত ছায়াভাসের মতনও, মিথুন-সমস্যা আর কোন উপন্যাসেই দেখা দেয় নাই।

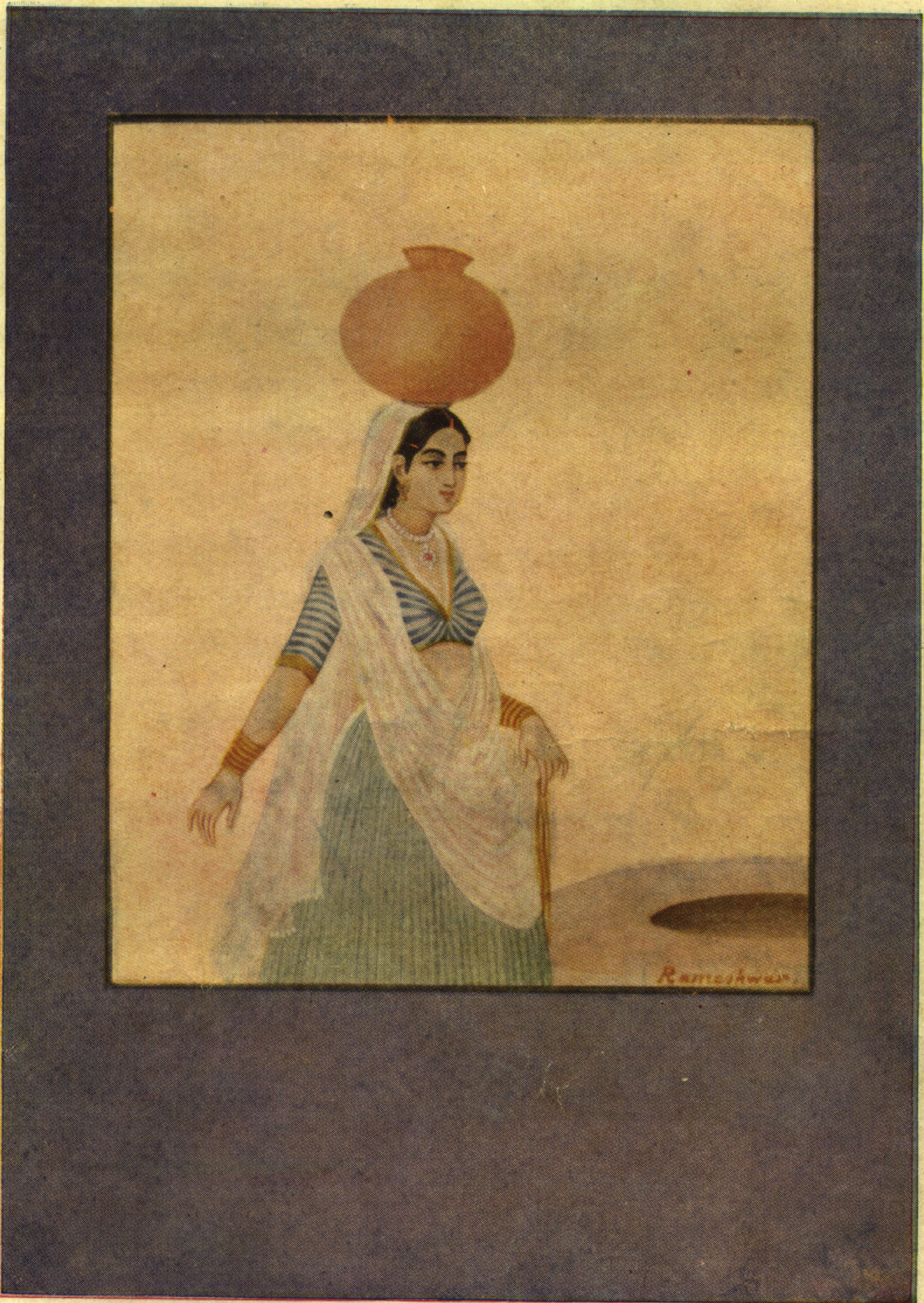
—*—

এদিকে "মহান্ মানব মানস"-লোকে যে সৃজন-প্রলয়-লীলা চলিয়াছে, বাংলা মাসিক সাহিত্যে তার অভিঘাত নাই। মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্যও বটে, নব নব পরীক্ষার পথে ধাবমান—পুরাতনের জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে ব্যস্ত; কিন্তু মানুষের যে প্রচণ্ড চিত্ত-বেগে এই সকল রূপ-স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত আক্ষিপ্ত হইতেছে, আমাদের দেশের লেখকদের তা কি কোথাও নাড়া মাত্র দিল না? আমাদের সমাজের বিশেষ সমস্যা কি এবং তার মীমাংসা কি, বিশ্ব-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমাদের দেশেরই বা কি চিন্তা করিবার আছে, বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্গে আমাদের দেশের সভ্যতার আদান প্রদানের কোন্ কোন্ রাজপথ উন্মুক্ত হওয়া দরকার—এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা, কোন ভাবনা আমাদের দেশের মধ্যে আছে বলিয়াই ত মনে হয় না। অথচ আমরা সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থতত্ত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া ডিগ্রি লই; আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারার সঙ্গেও যে আমাদের সকলের অপরিচয় একথাও বলা চলে না। গর্কির উপন্যাস • বাঙালী পাঠক সাধারণের প্রিয়; কিন্তু গর্কি তাঁর নবেলের ভিতর দিয়া যে বিরাট্ গণ-ধর্ম্মের অভ্যুদয় কল্পনা করেন, সে কল্পনা আমাদের মনকে তো চেতায় না। গর্কির "Confessions"কে নবেল বলিতে পারি, ভাবী মানব-সভ্যতার খসড়াও বলিতে পারি—অথচ তাতে নবেলের যে প্রধান ঔৎসুক্য গল্পের ঔৎসুক্য—তাহা বিন্দু পরিমাণেও খর্ব্ব হয় নাই। রোম্যা রোলাঁর John Christopher আমরা অনেকেই পড়িয়াছি ও পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। একদিকে এক আর্টিষ্টের ব্যক্তিগত জীবনের, অন্যদিকে ফরাসী-জার্ম্মাণ সভ্যতা প্রবাহের সম্মিলিত সেই বিরাট এপিক্ কাহিনী পড়িয়া কমলিনী ও ললিতের গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী আমাদের রুচি-রোচন হয় কেমন করিয়া, সেই কথাই আমি ভাবি। যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি, যে পরিবর্ত্তন-তরঙ্গ-মালার নিয়ত উত্থান-পতন আমাদের চোখের সামনে ঘটিতেছে, তাতে এর চেয়েও বৃহত্তর উপন্যাস, বিচিত্রতর গল্পের সম্ভাবনা জাগিতেছে। এই বিপুল বিশ্ব-স্রোত, এই সমস্যার তরঙ্গ-লীলা; তারি মাঝখানে আজ মানব ও মানবী তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত।

আমি গল্প উপন্যাসের অভক্ত নহি এবং "সারবান্ সাহিত্যের" জন্য কিছুমাত্র ব্যস্তও নহি। আমি শুধু বলি যে প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, উপন্যাস এই পাঁচ মিশালো খিচুড়ি-ভোগ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে অর্থাৎ মাসিক পত্রে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পরিবেষণ করিলেই ভাল হয়। অবশ্য তখন দর্শন বা প্রত্নতত্ত্ব কেহ পড়িবেনা। মাসিক পত্রে দিলেই কি কেহ পড়ে? তার ফল হইবে এই যে, বিলাতী ম্যাগাজিনের মত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা গল্প-মাসিকে বাড়িয়া গিয়া জঞ্জাল যত জমিতে থাকিবে, বিশুদ্ধ সাহিত্যের দরও তেমনি বাড়িতে থাকিবে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত।



জল্‌কে

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ। শ্রীরামেশ্বরপ্রসাদ অঙ্কিত।

ভারতী

৪২শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৫ [১০ম সংখ্যা

বার্হস্পত্য-সূত্রম্

শুক্রাচার্য্য যেমন অসুরগণের গুরু, বৃহস্পতি তেমনি দেবগণের গুরু বলিয়া পৌরাণিক প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। লোকায়ত বা চার্ব্বাক-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা এক বৃহস্পতির উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। অর্থ ও রাজনীতির প্রণেতা আর-এক বৃহস্পতির পরিচয় কৌটিল্যের গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ চার্ব্বাক-দর্শনের প্রণেতা ও রাজনৈতিক বৃহস্পতি একই ব্যক্তি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থানে স্থানে বৃহস্পতির মতের উল্লেখ আছে। সুতরাং, কৌটিল্যের পূর্ব্বে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বৃহস্পতি যে আপনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কৌটিল্য, বার্হস্পত্য পদ্ধতির মত উদ্ধৃত করিয়া, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কৌটিল্যের পূর্ব্বে, বৃহস্পতির যে একাধিপত্য ছিল এ কথা বলা যায় না। কারণ, কৌটিল্য যেখানেই বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আরও দুইটি নীতি-বেত্তার মত উল্লেখ করিয়াছেন,—তাঁহাদের নাম মনু ও উশনস। অর্থশাস্ত্রে পরাশরের মত স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে যে কয়জন রাজনীতি-প্রণেতার নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে বৃহস্পতির মত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক না হউক, অতি প্রসিদ্ধ, ও প্রাচীন কালের শেষ-যুগের প্রচলিত মত বলিয়া বোধ হয়।

“বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মনুঃ॥২
“ভরদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ॥৩

× × ×

“ততস্তাং ভগবান্ নীতিম্ পূর্ব্বং জগ্রাহ শঙ্করঃ।
সঙ্ক্ষিপ্য ততঃ শাস্ত্রং মহাস্ত্রং ব্রহ্মণা কৃতম্॥৮১

"বৈশালাক্ষমিতি প্রোক্তং তদিন্দ্রঃ প্রত্যপদ্যত।
দশাধ্যায় সহস্রাণি সুব্রহ্মণ্যো মহাতপাঃ ॥৮২
ভগবানপি তচ্ছাস্ত্রং সঞ্চিক্ষেপ পুরন্দরঃ।
সহস্রৈঃ পঞ্চভিস্তাত যদুক্তং বাহুদন্তকম্ ॥৮৩
"অধ্যায়ানাং সহস্রৈস্তু ত্রিভিরেব বৃহস্পতিঃ।
সঞ্চিক্ষেপেশ্বরো বুদ্ধ্যা বার্হস্পত্যং তদুচ্যতে ॥৮৪

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৯ অধ্যায়।

কৌটিল্য শুক্র ও বৃহস্পতিকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রাদি সংহরণ করিয়া অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

"পৃথিব্যা লাভে পালনে চ যাবন্তি
অর্থশাস্ত্রাণি পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ
প্রস্থাপিতানি প্রায়শস্তানি সংহৃত্য
একমিদমর্থশাস্ত্রং কৃতম্ ॥"

কৌটিল্য তাঁহার পূর্ব্বগামী যে সকল রাজশাস্ত্রবিদ্‌গণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—তাঁহাদের নাম—ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌনপদন্ত, বাতব্যাধি, বহুদন্তীপুত্র (বাহুদন্ত), উশনস্, বৃহস্পতি এবং পরাশর। ইহাঁদের মধ্যে চারিজন শাস্ত্রকার মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ, পিশুন, কৌনপদন্ত, ও বাতব্যাধি,—বৃহস্পতি ও কৌটিল্যের মধ্যযুগের শাস্ত্রকার ছিলেন। অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে এখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐকমত্য নাই। তথাপি, কৌটিল্য, চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত, ইত্যাদি নামধারী রাজনৈতিক যে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক একথা অনেকেই স্বীকার করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যনীতিশাস্ত্র ভারতের একাধিক পণ্ডিতগণের আলোচ্য ও অনুশীলনীয় বিষয় ছিল। এবং কৌটিল্যের সময়ে, এই শাস্ত্রের নানা প্রচলিত মতের সমন্বয় ও পরিপুষ্টিসাধন হইয়াছিল। কৌটিল্যের মত পরবর্ত্তী যুগে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছিল। এবং তাঁহারই গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কামন্দকীয় নীতি রচিত হইয়াছিল। ভারতের বাহিরে, এই নীতিবাদের আদর্শ, তিব্বত, চীন, শ্যাম, যব ও বলিদ্বীপ প্রভৃতি নানাদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল।

কৌটিল্যের পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের মধ্যে একজনের নাম-সংযুক্ত একখানি সূত্রগ্রন্থ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে, সেটি "বার্হস্পত্য সূত্রম্"। এই প্রবন্ধে আমরা সূত্রটীর কিঞ্চিৎ পরিচয় লইব।

এই গ্রন্থটি কৌটিল্যের উল্লিখিত বৃহস্পতির রচিত কি না বলা বড় কঠিন। কারণ, কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে যে যে বিষয়ের উপলক্ষে, বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমাদের আলোচ্য সূত্রটীতে সে সকল বিষয়ের অবতারণা নাই। সম্ভবতঃ বৃহস্পতির রচিত একাধিক গ্রন্থ ছিল, এবং বোধ হয় যে বার্হস্পত্যসূত্র কৌটিল্যের সম্মুখে ছিল—অধুনা আবিষ্কৃত পুঁথিখানি ঠিক সেটি নহে। তথাপি সূত্রটি যে অতি প্রাচীন এ কথা অনেকটা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। চাণক্যের নামে পরিচিত এইরূপ একটী সূত্রগ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সূত্রসাহিত্যের পরিণতিকাল খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ২০০ বর্ষ ধরিলে, এবং অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষ ধরিলে, বার্হস্পত্যসূত্র

মোটামুটি খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসরের রচনা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের আলোচ্য পুঁথিখানি ঠিক এই কালের রচনা না হউক, অন্ততঃ ঐ সময়ের রচিত ও পূর্ব্বে প্রচলিত কোনও আদর্শ গ্রন্থের প্রবাদ বা ছায়া অবলম্বনে রচিত বলিয়া গ্রহণ করিলে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না। দিন যেমন রাত্রিকে অনুসরণ করে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, তেমনই ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ, সূত্র-গ্রন্থকে চিরকাল অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। বার্হস্পত্যসূত্র সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। "বার্হস্পত্য-সূত্র-টীকা" নামে একটি পুঁথি Oppert সাহেব তাঁহার তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন (Vol I, No. 6061)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পুঁথিটির এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। বার্হস্পত্যসূত্রের দুইখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; একখানি বিলাতের Royal Asiatic Societyর সংগ্রহে আছে (Winternitz : Catalogue, No. 160 (3) p 219); দ্বিতীয়খানি মান্দ্রাজে Government Oriental Library তে আছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ত্রিবন্দ্রম্ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক রাও বাহাদুর রঙ্গস্বামী আয়ঙ্গর মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি এই পুঁথিটির একখানি নকল পাইয়াছি। Royal Asiatic Societyর পুঁথিটিতে দেবগিরির যাদব-রাজগণের উল্লেখ আছে। এবং এই প্রমাণের বলে Thomas সাহেব পুঁথিটিকে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা বলিতে চাহেন। কিন্তু সাহেব এ কথাও বলিয়াছেন যে এই অংশ এবং শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণবগণের তীর্থক্ষেত্রাদির বিবরণের অংশ প্রক্ষিপ্ত ধরিলে, পুঁথিটি যে বহুপ্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই মতের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, কামন্দকীয় নীতি ও শুক্রনীতির বহুল প্রচারের পর এই সূত্র-গ্রন্থটী এই আকারে সঙ্কলিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য যে কৌটিল্য, কামন্দক বা শুক্রাচার্য্যের নাম উল্লেখ এই পুঁথিটীতে পাওয়া যায় না। এই সূত্রটীর প্রধান বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব এই যে কৌটিল্যের পূর্ব্বগামী কোনও আচার্য্যের নামযুক্ত সূত্র আকারের রাজনীতিগ্রন্থের এই প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কিঞ্চিৎ সূত্রাকারে এবং অধিকাংশে ভাষ্যরীতিতে রচিত। "দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্। স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রঞ্চ ভাষ্যঞ্চ॥" সুতরাং কেবল সূত্ররীতিতে রচিত রাজনীতিশাস্ত্রের গ্রন্থের এই প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। ভারতের রাজনীতি যে বিশেষভাবে মৌলিক ও পুরাতন বিজ্ঞান তাহা এই সূত্রগ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতেছে। রাজনীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির প্রতিপত্তি প্রাগৈতিহাসিক প্রবাদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। জ্যোতিষগ্রন্থের নানা বচনে তাহার ছায়াচিহ্ন আছে :—

"নৃপেন্দ্র-মন্ত্রী নৃপলব্ধকামো
বিদ্যাবিনোদী চতুরঃ প্রগল্ভঃ।
আচারপূজ্যো মধুরস্বভাবো
বারে ভবেদ্দেব গুরোর্ম্মনুষ্যঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

আমাদের পুঁথিটি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ১১০টী সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে

৭০টী, তৃতীয়ে ১৪৭, চতুর্থে ৫০টী, পঞ্চমে ৩০টী এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৪টী সূত্র আছে। সূত্রগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে সংযোগ ও সঙ্গতি আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, পরস্পরের মধ্যে সূত্রগুলির কোনও বিশেষ যোগ বা সম্বন্ধ নাই। এক একটী সূত্রে এক এক নূতন কথার সমাবেশ আছে—অনেক স্থলে একটির সহিত অন্যটির কোনও সম্পর্ক নাই। বিষয়-অনুসারে কোনও শ্রেণীবিভাগ করিয়া, কিম্বা অন্য কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাৎসায়নের কামসূত্রে আমরা বিষয়-বস্তুর যে শ্রেণীবিভাগ ও সন্নিবেশ-পদ্ধতির পরিচয় পাই, আমাদের আলোচ্য সূত্রটিতে তাহার একান্ত অভাব। তৃতীয় অধ্যায়ের স্থানে স্থানে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বিষয়-বস্তুর কিঞ্চিৎ ধারাবাহিকতা আছে। সূত্রটির দুই-এক স্থানে বৌদ্ধগণের নাম উল্লেখ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক অধ্যায় হইতে কয়েকটি সূত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

"বৃহস্পতিরথাচার্য্য ইন্দ্রায়
নীতিসর্ব্বস্বমুপদিশতি॥

১। আত্মবান্ রাজা॥

২। আত্মবন্তং মন্ত্রিণমাপাদয়েৎ॥

৩। ধর্ম্মমপি লোকবিক্রুষ্টং ন কুর্য্যাৎ॥

× × ×

৫। স্ত্রীবালবৃদ্ধৈঃ সহ ন বিবদেদ্
ধর্ম্মনীতিকৃত্যানি॥

৬। ঐন্দ্রজালিকং ন কুর্য্যাৎ॥

× × ×

৩০। মলবেষং ন কুর্য্যাৎ॥

৩১। মৃগয়াতিসঙ্গং চ নাচরেৎ॥

৩২। স্ত্রীষ্বতিসাঙ্গাদযশো বর্দ্ধতে॥

৩৩। আয়ুশ্চ ক্ষীয়তে॥

× × ×

৩৭। বৃথা ধর্ম্মধ্বজিনং ন বিশ্বসেৎ॥

৩৮। নিন্দেয় চ॥

× × ×

৪৯। অপ্রিয়মপি বচনং শৃণুয়াৎ॥

× × ×

৫৬। সন্ন্যাসিনৃপবেশ্যামন্ত্রবাদোপজীবেষু
চিরং ন সেবেত॥

× × ×

৮৫। ধর্ম্মগুপ্তিঃ গুহ্যমাত্রাগুপ্তিঃ,
কার্য্যগুপ্তিঃ বৈরগুপ্তিঃ,
যশোভঙ্গে সত্যমপি নেতি বদেৎ॥

× × ×

৯০। আত্মানমনৃণী কুর্য্যাৎ॥

× × ×

৯২। নিত্যকর্ম্ম ন ত্যজেৎ॥

৯৩। জনঘোষে সতি ক্ষুদ্রকর্ম্ম ন কুর্য্যাৎ॥

৯৪। নষ্টে ন স্থাতব্যম্॥

৯৫। দূর পরিহরণীয়ং গুরুতরমপি
তত্রাজ্যকার্য্যম্॥

× × ×

৯৭। অন্নহানিঃ সোঢব্যা॥

× × ×

১০৯। জ্ঞাতিষু যত্র বৈরং তৎকুলদ্বয়মামূলং নশ্যতি॥

১১০। যঃ শাস্ত্রং দণ্ডনীতিং পরিত্যজত্যনর্থকো
শলভ ইব বহ্নিং প্রবিশত্যজ্ঞানাৎ॥
ইত্যাহ ভগবানাচার্য্যঃ সুরেন্দ্রগুরুঃ॥
ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১। গুণবতো রাজ্যম্॥

২। বিদ্যাগুণোঽর্থগুণঃ সহায়গুণশ্চ॥

৩। স্বকুলরঞ্জনং চ চরিত্রলক্ষণম্॥

৪। কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যানি॥

৫। সর্বথা লোকায়তিকমেব শাস্ত্রমর্থসাধনকালে॥

৬। কাপালিকমেব কামসাধনে॥

৭। আর্হতং ধর্মে॥

৮। লোকায়তিকমসেনার্থং ক্ষিপ্রং নশ্যতি তৎ॥

৯। কাপালিকার্হত বৌদ্ধাশ্চ॥

১০। এতেষু তিষ্ঠন্ শলভবহ্নিবৎ॥

× × ×

১৪। যদা বেদোক্তকর্মজ্ঞানং শিবং বিষ্ণুং
শ্রিয়মপি পরিত্যজ্য সর্বং শূন্যমিতি
বদন্তি তদা বৌদ্ধাভিধান পাষণ্ডী॥

× × ×

২২। পরাপবাদার্থং বেদশাস্ত্রধর্মাদীন্ পঠতি॥

২৩। সর্বান্ নিন্দতি॥

২৪। মহেশ্বর বিষ্ণ্বাদীনামপি॥

২৫। সোঽপ্যাশনার্থং ধর্মং বদতি॥

২৬। বদনার্থং পরান্ স্তৌতি সঃ বৌদ্ধঃ॥

× × ×

৪১। নীতেঃ ফলং ধর্মার্থকামাপ্তিঃ॥

৪২। ধর্মেণ কামার্থৌ পরীক্ষ্যৌ॥

× × ×

৫১। সর্বাণি রত্নান্যপি দীয়ন্তাং-
স্বকার্যজীবশোরক্ষণে॥

৫২। মন্ত্রকালে ন কোপয়েৎ॥

৫৩। ধর্মপ্রধানং পুরুষার্থম্॥

× × ×

৫৫। অপথ্যভোজনো মৃত্যুপ্রীতিকরইব সত্যব্রতঃ
শাস্ত্রেষু নিষ্ঠিতঃ পুরুষঃ সাগরমপি শোষয়েৎ॥

× × ×

৫৮। সজ্জনো ন ভয়াৎ ব্যতিবর্ত্ততে॥

× × ×

৬১। অজিতাত্মানং শাসিতুং নোৎসহেত॥

× × ×

৬৩। দুর্জনমধ্যে সূর্য্যাবৎ প্রকাশতে সুজনঃ॥

৬৪। অধর্মব্যবস্থিতান্ ন্যায়বৃত্তেন বারয়েৎ॥

৬৫। অকীর্তিং নার্জয়েৎ॥

× × ×

৬৮। বালো নিবার্য্যমধর্মে পাঠাঙ্কুশেন গজইব॥

৬৯। গুরুবচনমলঙ্ঘনীয়ম্ নয়ানুগতং চেৎ॥

৭০। গুরুমপি নীতিবিযুক্তং নিরাসয়েৎ॥
ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১। জিত ক্লেশস্য পৌরুষম্॥

২। দেশান্তরবাসেন জিতক্লেশো ভবতি॥

৩। সর্ব-বল-কাল-দেশ-সাম-প্রকৃতিসহায়া-
মবয়সাংজ্ঞানং কার্যম্॥

৪। উপবাসাদিসহিষ্ণুত্বংচ॥

৫। সুগন্ধবাসান্ কেশান্ কুর্য্যাৎ॥

৯। বহুবাদং মধুরমেব কুর্য্যাৎ ॥

১০। মোক্ষপূর্বান্ দ্বারংত্রয়ম্ ॥

১১। শাক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ শৈবাঃ ॥

× × ×

১৩। মহাপথবৎ বৈষ্ণবম্ ॥

১৪। কেবলপ্রধানিকমশ্বরথযানবৎ ॥

১৫। লৌকায়তিক ক্ষপণক বৌদ্ধাদি-বহু-শার্দূল-দুষ্ট-মৃগ-কীর্ণ-শূন্যাটবীগুহামার্গবৎ।

১৬। এতন্নিরূপ্যমেকমাশ্রয়েৎ ॥

১৭। জ্যোতির্নাথস্থিতং সদা নিরূপয়েৎ ॥

১৮। চাতুর্বণ্যং রক্ষেচ্চ ॥

× × ×

২১। দানমানালঙ্কারবিন্তাভিঃ সিদ্ধিংলভেত ॥

২২। অষ্টাদশতীর্থানি নিরূপয়েৎ ॥

× × ×

২৭। শৃঙ্গারবেষং কুর্য্যাৎ ॥

× × ×

৩০। ইতিহাসপুরাণানি মানয়েৎ ॥

× × ×

৩৬। ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ দোষদুষ্টমপি ॥

× × ×

৪৯। ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ শরণাগতং সর্বপাতকযুক্তমপি রক্ষেৎ ॥

৫০। দুষ্টনিগ্রহং কুর্য্যাৎ ॥

৫১। শিষ্টপরিপালনং চ ॥

× × ×

৫৫। আসবানি সেবয়েৎ ॥

৫৬। অতি ন ॥

৫৭। মাংসানি চ ॥

৫৮। ঘৃণা কার্য্যা ॥

৫৯। [illegible] চ ॥

৬২। পঞ্চাশৎ কোটিযোজনা পৃথিবী ॥

৬৩। সপ্তদ্বীপবতী চ ॥

৬৪। সপ্তসমুদ্রাবৃতা চ ॥

৬৫। কর্মভোগাতিভোগদিব্যশৃঙ্গারসিদ্ধ কৈবল্যা ইতি দ্বীপাভিধানাঃ ॥

৬৬। মধ্য কর্মভূমিঃ ॥

৬৭। তন্মধ্যে মে রোরাস্থুঃ।

৬৮। তত্রোত্তরে হিমবান ॥

৬৯। তস্য দক্ষিণে নবসাহস্রী ভূঃ ॥

৭০। তত্র দাক্ষিণাত্য ভারতঃ খণ্ডঃ ॥

৭১। তত্র সাক্ষাৎ ধর্মাধর্মফলাঃ সিধ্যন্তি ॥

৭২। তত্র দণ্ডনীতিঃ ॥

× × ×

৮০। গঙ্গাসরস্বতীকালিন্দী গোদাবরীকাবেরী-তাম্রপর্ণী-ঘৃতমালা কুলনদ্যশ্চ ॥

৮১। অষ্টাদশ বিষয়াশ্চ ॥

৮২। অষ্টাদশসাগরা নৃপাঃ ॥

× × ×

১১৯। অথ বৈষ্ণবক্ষেত্রাঃ।

১২০। বদরিকাশালগ্রামপুরুষোত্তম-দ্বারকা-বিন্ধ্যাচলানন্তসিংহ শ্রীরঙ্গাঃ ॥

১৪০। কৃতে জ্ঞানিনঃ ॥

× × ×

১৪২। ত্রেতায়াং কর্মিণঃ নীতিবিশারদাঃ ॥

১৪৫। তিষ্যে পাদেহজ্ঞানকর্মা ঘনা দণ্ডনীতিকোবিদা নরাঃ ॥

১৪৬। তদুত্তরং বিরুদ্ধধর্ম-বর্ণ-বেষা দণ্ডনীতিবর্জিতাঃ ॥

১৪৭। পশ্যন্তি প্রজা অমৃতবাদতৎপরাশ্চেত্যাহ আচার্য্যাঃ ॥

ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

১। ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে উত্থানম্ ॥

২। ধর্ম্মমর্থং চ চিন্তয়েৎ ॥

৩। কুক্কুটশব্দং শুভং ॥

৪। গজাদিদর্শনং চ ॥

৫। গজশব্দ মঙ্গলস্তুতি বেদপাঠনং চ ॥

৬। দেবতাপুণ্যকথা চ ॥

৭। রাজণ্যস্মরণং চ ॥

৮। নেত্রাঞ্জনং চ ॥

৯। আদর্শদর্শনং চ ॥

১০। অলঙ্কারয়েৎ ॥

১১। তাম্বুলচর্বণং চ ॥

× × ×

১৪। তূর্য্যঘোষাশ্চ ॥

১৫। দিব্যপ্রমদাদর্শনং চ ॥

× × ×

২৬। অবশ্যনিরূপনীয়ান্যেতানি কর্ম্মাণি ॥

২৭। মন্ত্রমূল্যো বিজয়ঃ ॥

× × ×

৩০। বন্ধুভিঃ বান্ধবৈর্হিতৈঃ বহুশ্রুতৈঃ ধীরৈঃ সহ যৎ কর্ম্মারভতে তদুত্তমম্ ॥

× × ×

৪৭। কামাদীন্ যে জয়ন্তিতে সর্বানরীন্ জয়ন্তি ॥

৪৮। পূর্বমুপকারং ন কারয়েৎ ॥

৪৯। উপকারং নিয়তং কুর্য্যাচ্চ ॥

৫০। নাভাবিব্যসনং পূর্বংজ্ঞাত্বা ব্যসন প্রতীকারং কার্য্যমিতি গুরুরাহ ॥

ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

১। চত্বার উপায়াঃ ॥

২। ত্রয়শ্চ ॥

৩। মায়োপেক্ষাবধশ্চ ॥

৪। সুরিষু সাম ॥

৫। শক্তিতেষু সামভেদৌ ॥

৬। লুব্ধেষু সামদানভেদাঃ ॥

৭। কষ্টেষু সামভেদদানমায়োপেক্ষাবধাঃ ॥

৮। সামং পূর্বং প্রযোক্তব্যম্ ॥

× × ×

১২। সর্বভয়েষু জ্ঞাতিভয়ং ঘোরম্ ॥

১৩। গোষু পয়ঃ ব্রাহ্মণে কোপশ্চ ॥

× × ×

১৭। লোকবিরুদ্ধং নাচরেৎ ॥

× × ×

২০। শত্রুপক্ষাদাগতং ন বিশ্বসেৎ ॥

২১। গুণতঃ সংগৃহ্নীয়াৎ ॥

২২। ভাবৈঃ পরীক্ষয়েৎ ॥

× × ×

২৮। হৃদয়ে যথাবৎ শুভাশুভং পূর্বমুদেতি ন দুষ্টাচারঃ সর্বত্র কারয়েৎ ॥

২৯। চপলা ন বহুমান্যাঃ ॥
ইত্যাহ আচার্য্যো বৃহস্পতিঃ ॥

ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

১। দেশকালযোগ্যং কর্ম নয়ানয়ৌ চ বেদয়েৎ ॥

২। বিপরীতং ন বেদবীর্য্যদর্পেণ ॥

৩। হিতানি নিরূপয়েৎ ॥

৪। নয়ো মাত্রভিনিরূপ্য কার্য্যতে ॥

৬। অহিতং বিকারং যস্য প্রতিভাতি
সমস্তরোগ্যঃ ॥
৭। অর্থমার্জয়েৎ ॥
৮। যস্যার্থরাশিরস্তি তস্য মিত্রাণি ধর্ম্মশ্চ
বিদ্যা চ গুণবিক্রমৌ চ বুদ্ধিশ্চ ॥
৯। অধনেনার্থমার্জ্জয়িতুং ন শক্যতে
গজং গজেনেব ॥
১০। ধনমূলং জগৎ ॥
১১। সর্বাণি তত্র সন্তি,
নির্ধনো মৃতশ্চণ্ডালশ্চ।
১২। এবং ধর্মমূলং চ বিদ্যামর্জয়েৎ ॥
১৩। বিদ্যামূলং জগৎ ॥
১৪। বিদ্যা পুনঃ সর্বমিত্যাহ গুরুঃ ॥

ইতি বার্হস্পত্যসূত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তোঽয়ম্ গ্রন্থঃ

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

নাদিরশাহের জাগরণ

[স্থান—পারস্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত। কাল—নিশাবসান।]

নাদির! নাদির!—
কার আহ্বান আকাশে বাতাসে আজ!—
মেঘে-চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে মিঠা যেন এস্রাজ!
চাঁদ ডোবে যেথা পাহাড়ের চূড়ে—বিরাট প্রেতের কায়া!
আক্রোশে যেন ডাক দিয়ে ফেরে ইরাণ-বীরের ছায়া!
কতকাল ধরি' বালুকার তালু 'আমু-শির'-দরিয়ার
পায় নি পরশ তুরাণী টুঁটির রক্তের ফোয়ারার!
খিভা হ'তে সিস্তান্—
সারা মুল্লুক জুড়ে' বসে' আছে ইল্লত্ আফ্গান্!

নাদির! নাদির!—
ওই ডাকে শোন', মাথায় আগুন জ্বলে!
থির হ'য়ে যায় চোখের পলক অন্ধকারের তলে!
মনুচেহরের সেনাপতি ওই অঞ্জলি ভরি' আনে
'হেল্মন্দ্'-বারি, পান করি' তায় কি আশা জাগিছে প্রাণে!
রোস্তমেরি সে বিশাল মূর্ত্তি দেখা'ল কৃপাণ-ধরা
বক্ষে বাহুতে একি উল্লাস বিজয়-অশনি-ভরা!
দিকে দিকে জয়রব—
হাহাকার করে ক্ষেত্রপাল যত, নরবলি উৎসব!

নাদির! নাদির!—
শুনিয়াছি আমি, উঠিয়াছি তাই জাগি',
ইস্পাহানের গুলাব-বাগান—কে ছোটে তাহার লাগি'!
সিরাজী-সিরাপ দ্রাক্ষার চুনী করে নাই চোখ রাঙা,
শাহজামসীদ্-প্রাসাদের ভিত—হেরি নাই সে কি ভাঙা!
উত্তর হ'তে হুহু হুহু হাওয়া ছুটে আসে দিশাহারা,
লাফাইয়া ছোটে ঝরণার জল শ্বেতচমরীর পারা,
তুহিন, তুষাররাশি,
বাজ-বিদ্যুৎ,—তারি মাঝে প্রাণ উঠিয়াছে উল্লাসি'।

নাদির! নাদির!—
আর কাজ নাই, বুঝিয়াছি কারে বলে
মাটীতে এ মাথা রাখিবার আগে দলে' নেওয়া পা'র তলে।
পশু-মেষ যেই পালন করেছে—মানুষ-মেষের দল
তারি দুর্ব্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল!
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিব দুর্ব্বলতার গ্লানি,
লুটাইব পায় হীরার মুকুট, রাজ্য আর রাজধানী,
—কাবুল কান্দাহার
দিল্লী হিরাট মেশেদ্ গজ্নী নিশাপুর পেশাবার।

ইস্পাহানের ইস্পাত হ'তে রক্তের ধোঁয়া-ধার
নিবিবেনা কভু, প্রাণের মমতা ঘুচাইব সবাকার।
কোহি-রহমতে 'চেহেল্-মিনার' গড়েছিল জান্জান্—
আমিও গড়িব কাঁচামাথা দিয়ে, দেহ করি' খান্ খান্।
লক্ষপ্রাণীর গল-শৃঙ্খল বাজিবে সমুখে পিছে,
তখ্তের 'পরে চড়িয়া শুনিব বান্দারা গায় নীচে—
'ধন্য নাদির শাহ!
মারিবে, তবুও একবার দেখি, অভাগারে ফিরে' চাহ।'

'নাদির! নাদির! নারীর জঠরে জন্ম কি তোর নয়!'—
পাপ-সয়তান কুহরিছে কাণে কাপুরুষ-সংশয়!
খোদার বান্দা এন্সান্ যেই নাই তার নিস্তার,—

চিবাইয়া খাবে আপন কলেজা, যদি সে ফেরেস্তার
'আখেরি-জমানা'-দিনের নিশানা তুলিবারে চায় ধরি',
মরণের পরে 'দোজোকে' নামিবে তু'বার করিয়া মরি'!
—হাহা, মোর হাসি পায়!
মমতার চেয়ে আর কিছু পাপ আছে নাকি তুনিয়ায়!

বুল্‌বুল্ আর সিরাজের গুল্ নয় শুধু আল্লার,
বজ্র-বাজনা মরু-মরীচিকা আরো যে চমৎকার!
শুধু মিটমিটে তারার লাগিয়া আকাশের শামিয়ানা!
ধূমকেতু আর উল্কার দলে পাতে নি সেথায় থানা?
শিশুর অধরে মার পয়োধরে মিলায় খেলার ছলে,
তেমনি খেলার খেয়ালে ছড়ায় মারীবিষ থলে জলে—
বাহবা কি বাহবা রে!
আল্লার মত দিলাবর যেই—এ খেলা খেলিতে পারে।

বাম হাতখানি তুলিয়াছে উষা 'পামীর'-পাহাড়-চূড়ে,
আগুনের বাণ অরুণের ওই উড়িল কুয়াসা ফুঁড়ে';
আলোকের বিষ-বল্লম ছুঁড়ি' রাত্রির কালো বুকে
পুবের শিকারী নীলবালুচরে দাঁড়াইল রাঙা মুখে!
উহারি মতন ঊর্দ্ধে উঠিবে এই প্রাণ-বাজপাখী,
'হিন্দু-তাতার-তুরাণী-শোণিত!' চীৎকার করে' ডাকি'।
—ইরাণ! গানের রাণি!
রক্তপাগল নাদির তুহার পীড়ন করিবে পাণি।

গানের মহিমা কিছু নাই নাই, তাই তোর অপমান!
মূর্খ সে কবি গানেরই নেশায় বিকাইত খোরাসান!
গজ্‌নীর রাজা দিয়েছিল দাম? মনে নাই তার ব্যথা?
তারি শোকে কবি ত্যেয়াগিল প্রাণ, হাসি পায় শুনি' কথা!
সাকী ও পেয়ালা, শ্লোক তুই-চারি,—জীবনের দান এই!
নাইশাপুরের ধূলিতলে তাই অস্থিখানাও নেই।
দাস যারা গান গায়,
ভীরু হৃদয়ের ভিখারী পিপাসা গানেই মিটাতে চায়!

দুর করে দাও গোলাপের মালা, পেয়ালা ভাঙিয়া দাও!
'নাদির! নাদির!'—শুধু ওই সুরে পার ত' আবার গাও।
কত বড় আমি একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
অধীর হয়েছে বক্ষ-কারায় শুধু সেই কামনাই।
বর্ষাফলকে ঝলসি' উঠেছে মধুর রক্তরেখা,
ছায়াখানি মোর পড়িয়াছে পিছে, যতদুর যায় দেখা!
—কাবুল কান্দাহার
গজ্‌নী হিরাট দিল্লীতে ওই ওঠে বুঝি হাহাকার!

শ্রীমোহিতলাল মুজমদার।

বাংলার ব্রত

(৪)

আল্‌পনার অংশটাকে দৃশ্যপটের হিসাবে নিয়ে, ছড়া ও ক্রিয়া থেকে ভাদুলীব্রতের অনুষ্ঠানের যে মূর্ত্তিটি পাওয়া যায় তা এই :—

ক্রিয়া আরম্ভ হল;—ভাদ্রমাসের ভরা নদী, কলসী-কাঁকে জল তুলতে চলেছে একটি ছোটো মেয়ে এবং তার চেয়ে একটুও-বড়-নয় এমন-একটি ঘোমটা-দেওয়া নতুন বৌ এবং সঙ্গিনীগণ।

(জল-তোলার গান বা ছড়া)

এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,
ভাদুলীঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ।
এ-নদী সে-নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ।

একে একে নদীর জলে ফুল দিয়া—

(ছোটো মেয়ে)—

নদী, নদী, কোথায় যাও?
বাপ-ভায়ের বার্ত্তা দাও।

(ছোটো বৌ)—

নদী, নদী, কোথায় যাও?
সোয়ামি-শ্বশুরের বার্ত্তা দাও।

ইতিমধ্যে একপসলা বৃষ্টি এল; সকলে জলে-স্থলে ফুল ছিটাইয়া—

নদীর জল, বৃষ্টির জল, যে জল হও,
আমার বাপ-ভায়ের সম্বাদ কও।

বৃষ্টির শেষে, মেঘে-কালো আকাশ দিয়ে একঝাঁক সাদা বক উড়তে-উড়তে চলে গেল; একদল কাক কা কা করতে-করতে বড়-একটা বকুল-গাছ ছেড়ে গ্রামের দিকে উড়ে পালালো; আকাশ একটু পরিষ্কার হচ্ছে।

(মেয়ে)—

কাগারে! বগারে! কার কপালে খাও?
আমার বাপ-ভাই গেছেন বাণিজ্যে
কোথায় দেখলে না'ও?"

মেঘ-কাটা-রৌদ্র ভরা-নদীর বুকে বালু-

চরের একটু মরীচিকার মতো ঝিক্‌মিক্ করেই মিলিয়ে গেল।

(মেয়ে)—

চড়া! চড়া! চেয়ে থেকো,
আমার বাপ-ভাইকে দেখে হেসো।

কোন্ গ্রামের একটা দড়ি-ছেঁড়া ভেলা স্রোতের টানে হুহু করে বেরিয়ে গেল।

(মেয়ে)—

ভেলা! ভেলা! সমুদ্রে থেকো,
আমার বাপ-ভাইকে মেনে রেখো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রত-ক্রিয়ার দ্বিতীয় পালা বা দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হল;—বনজঙ্গলে ঘেরা কাঁটা-পর্ব্বত, অন্ধকার রাত্রি, দূরে নানা জন্তু ও সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে।

(মেয়ে সভয়ে)—

বনের বাঘ! বনের মোষ!
তোমরা নিওনা আমার বাপ-ভায়ের দোষ।

(সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে)—

বাপ-ভাই গেছেন কোন্ ব্রজে?
সোয়ামি-শ্বশুর গেছেন কোন্ ব্রজে?

(বনদেবী আশ্বাস দিয়া)—

তাঁরা গেছেন একপথে,
ফিরে আসবেন আর-পথে।

উদয়-গিরিশিখরে সূর্য্যোদয়ের আভা লাগলো; উদয়-গিরিকে ফুল-দিয়ে পূজো কোরে

(সকলে)—

কাঁটার পর্ব্বত! সোনার চূড়া! উদয়গিরি!
তোমারে যে পূজলাম সুমঙ্গলে,
আসুন তাঁরা আপন বাড়ি।

(বনদেবীর প্রতি সকলে)—

তোমার হোক্ সোনার পিঁড়ি।

সূর্য্যোদয়ের আলোর মধ্যে জোড়া-ছত্র মাথায় দিনরাত্রি শরৎ-বর্ষার দুই নৌকোয় পা রেখে সমুদ্রের উপরে ভাদুলীর আবির্ভাব।

(সাগরের গান)

সাত-সমুদ্রে বাতাস খেলে,
কোন্ সমুদ্রে ঢেউ তুলে!

(বনদেবী সাগরের প্রতি)—

সাগর! সাগর! বন্দি।

(মেয়ে)—

তোমার সঙ্গে সন্ধি।

(সাগরকে ঘিরিয়া সকলে)—

ভাই গেছেন বাণিজ্যে,
বাপ গেছেন বাণিজ্যে,
সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে।

(আকাশ-বাণী)

ফিরে আসবেন আজ,
ফিরে আসবেন আজ,
ফিরে আসবেন আজ।

(সকলে মিলিয়া নমস্কার)—

জোড়-জোড়-জোড় সোনার ছত্তর
জোড়নৌকায় পা।
আসতে-যেতে কুশল করবেন
ভাদুলী-মা।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামের মধ্যে ভাদুলী-অনুষ্ঠানের তৃতীয় দৃশ্য বা পালা সুরু হল;—ভাদ্রের শেষদিন, নতুন শরতের সকাল ঘুমন্ত-গ্রামখানির উপরে এসে পড়েছে, মেয়েদের খিড়কির পুকুর কানায়-কানায় পরিপূর্ণ, তারি উপরে সোনার রোদ

ঝিক্‌মিক্ করছে, পুকুরের পাড়ে জোড়া তাল-গাছ। তাতে বাবুই-পাখীর বাসা।

(বাবুই-পাখী গাইছে)—

পুঁটি! পুঁটি! উঠে চা'।
ভাদুলী মায়ে বর দিল
ঘাটে এল সপ্ত না'।

কুটীরের ঝাঁপ খুলে, নৌকো-বরণের ডালা হাতে সব মেয়ে-বৌ একে-একে বাহির হচ্ছে।

(বুড়ি পড়্‌সী)—

পড়্‌সী লো পড়্‌সী!
তাল-তাল পরমায়ু, তালের আগে চোখ!
ঘাটে এসে ডঙ্কা দেয় কোন্ বাড়ীর নোক্?

(মেয়েরা, বৌরা)—

আমার বাড়ির নোক্, আমার বাড়ির নোক্!

দূরে ডঙ্কা পড়লে একদল বাবুই কিচ্‌মিচ্ করে বাসা ছেড়ে উড়লো।

(মেয়েরা সকলে)—

বাবুই বাসা দল দল!
নৌকা ব'রতে ঘাটে চল, ঘাটে চল!

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

সকালবেলার নদীতীরে ভাদুলীর পালা সাঙ্গ হচ্ছে;—গঙ্গার অনেক-দূরে-দূরে ঘর-মুখো নৌকো, সাদা-সাদা পালগুলি দেখা দিয়েছে। কতকগুলি নৌকো পরের পর এসে ঘাটে লাগল, যাত্রী ওঠা-নাবার, নৌকো ভেড়াবার কোলাহল; প্রবাসীরা সব পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে ডাঙায় নামছে।

(মেয়েরা নৌকাবরণ কোরে)—

এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে চন্দন দিলাম,
বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম।
এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে সিন্দুর দিলাম,
বাপ-ভায়ের দর্শন পেলাম।

(বৌরা জলে কলাবৌ ও ফুল ইত্যাদি ভাসাইয়া)—

কলার কাঁদি! কলার কাঁদি!
তোমাকে দিলাম গঙ্গায়,
আমরা গিয়া রাঁদি।

(যাত্রী ও নাবিকদলের গান)

একূল ওকূল উজান ভাটি,
নামলাম এসে আপন মাটি।
এক নৌকা চড়ায় লাগালাম,
এক নৌকা ছাড়লাম।
ব্রজে যাই, বাণিজ্যে যাই,
সকল নৌকা পেলাম।

(সুতো ধরিয়া সকলকে ঘিরিয়া মেয়েরা)—

দিক্ দিক্ সকল দিক্
সকল দিকেই বামুন।
ব্রজে হোক্ বাণিজ্যে হোক্
দেবতায় বেঁধে রাখুন।

[গায়ে নামাবলী কোশাকুশি হাতে গ্রামের আচার্য্যির প্রবেশ]

(আচার্য্যি)—

নম নম ভাদুলীদেবী ইন্দ্রের শাশুড়ি
বছর বছর রক্ষা কোরো ব্রতীর পুরী।

[যবনিকা]

যার যে-কথাটি এবং ক্রিয়াটি কেবল সেইটুকু নির্দ্দিষ্ট করা এবং প্রত্যেক দৃশ্যের গোড়ায় যা-যা আল্পনা দেওয়া হয় সেইগুলি একটু বর্ণনা করে দেওয়া ছাড়া, ছড়াগুলির সংস্থানে আমি কিছুমাত্র উল্টোপাল্টা করিনি; অথচ কেমন সহজে আপনি এর নাট্য-সংস্থান

বেরিয়ে এল! এই ব্রতের প্রত্যেক ছড়া, ঘটনা-স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে আপনিই এক-এক অঙ্কে ভাগ হয়ে রয়েছে দেখি। প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘরের লোকরা সন্ধান করছে, যারা বাইরে গেছে তাদের নিরাপদে দেশে আসার প্রতীক্ষা করছে, কামনা করছে। এটি প্রতীক্ষা ও বিরহের অঙ্ক। তৃতীয়, চতুর্থ দৃশ্য হল মিলনের;—নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ছে, পথে-ঘাটে আনন্দ। এটাকে একটা মহানাটক বলা চলে না কিন্তু নাট্যকলার অঙ্কুর যে এখানে দেখছি সেটা নিশ্চয়।

ছেলে-ভুলোনো ছড়া একটিমাত্র ভাব, দৃশ্য বা ঘটনা নিয়ে যেমন কোরে সেটাকে বর্ণন করে, ভাদুলীব্রতের ছড়াগুলি তো জিনিষটাকে আমাদের সাম্‌নে তেমন কোরে উপস্থিত করছেনা! ছেলেভুলোনো ছড়া, যেমন—

ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমের বাড়ী এস,
সেঁজ নেই, মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বস।
ডিবে ভরে পান দেব গাল ভরে খেও,
খিড়কি-দুয়োর খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেও।

কিম্বা যেমন—

আঁটুল-বাঁটুল-শ্যামলা-সাঁটুল
শ্যামলা গেছে হাটে,
শ্যামলাদের মেয়েগুলি
পথে বসে কাঁদে!

আবার যেমন—

ইকড়িমিকড়ি চাম্‌চিকড়ি
চাম্‌কাটা মজুমদার
ধেয়ে এলো দামুদার
দামুদার ছুতোরের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।

এবং—

ভাতে পড়ল মাচি
কোদাল দিয়ে চাঁচি ইত্যাদি।

এগুলোর মধ্যে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, মাসি, পিসি, মজুমদার, দামুদার, ছুতোরের পো—এম্‌নি নানা ঘটনা, নানা পাত্রপাত্রী যথেষ্ট রয়েছে; কিন্তু এদের নিয়ে অভিনয় বা নাটক করা চলেনা। কিন্তু ভাদুলীর অনুষ্ঠান গাছ-পালার মধ্যে, নয়তো ষ্টেজে সিন্ খাটিয়ে একদিন লোককে দেখিয়ে দেওয়া চলে।

ভাদুলী-ব্রতের মতো আরো ব্রত রয়েছে যার ছড়াগুলি আলাদা-আলাদা টুকরো-টুকরো জিনিষ নয় কিন্তু একটি সমগ্র পদার্থ, পুরো একটি নাটিকা—যদিও খুব ছোটো!—ছবি ও ছড়া আঁকায় ও অভিনয়ে একটুখানি। এই সব ছড়ায় নানা রসের সমাবেশ দেখা যায়,—শুধু কামনাটুকু জানানো এই-সব ছড়ার উদ্দেশ্যও নয়। দুই রকমের দুটি ব্রত পাশাপাশি রাখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। একশ্রেণীর ছড়া কামনাকে স্বর দিচ্ছে—সুর দিচ্ছেনা; কিম্বা মনের আবেগের অনুরণনও তার মধ্যে নেই। এই ভাবের ছড়া দিয়ে মেয়েদের এই সেঁজুতী ব্রতটি গাঁথা হয়েছে। সেঁজুতী খুব একটি বড় ব্রত। "সকল ব্রত কল্লেন ধনি, বাকি রইল সাঁজ-সুঁজনী।" এই ব্রতটিতে প্রায় চল্লিশ রকমের জিনিষ আল্‌পনা দিয়ে লিখতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধরে এক-একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্তু ছড়াগুলি সব টুকরো-টুকরো। কেবল কামনা জানানো ছাড়া আর কিছু পাইনে, যেমন—

সাঁজপূজন সেঁজুতি
ষোল ঘরে ষোল ব্রতী ;
তার একঘরে আমি ব্রতী ।
ব্রতী হয়ে মাগলাম বর—
ধনে পুত্রে পুরুক বাপ-মার ঘর ।
(দোলায় ফুল ধরে)—
বাপের বাড়ির দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ি যায় ।
আসতে-যেতে দুই জনে
ঘৃত মধু খায় ।
(বেগুনপাতায় ফুল ধরে)—
বেগুনপাতা ঢোলা-ঢোলা
মার কোলে সোনার তোলা ।
(এম্‌নি প্রত্যেক জিনিষে ফুল ধরে)—
মাকড়সা, মাকড়সা, চিত্রের ফোঁটা !
মা যেন বিয়োয় চাঁদপানা বেটা ।
গুয়ো গাছ ! কাঁকুনী গাছ !
মুঠে ধরি মাজা ।
বাপ হয়েছেন রাজ্যেশ্বর,
ভাই হয়েছেন রাজা ।
শর, শর, শর !
আমার ভাই গাঁয়ের বর ।
বেণা, বেণা, বেণা !
আমার ভাই চাঁদের কোণা !
আম-কাঁটালের পিঁড়িখানি
তেল কুচ্‌ কুচ্‌ করে ।
আমার ভাই অমুক যে
সেই বসতে পারে ।
বাঁশের কোঁড়া ! শালের ঢোঁড়া !
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘী,
আমি যেন হই রাজার ঝি ।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি মৌ,
আমি যেন হই রাজার বৌ ।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি পানি,
আমি যেন হই রাজার রাণী ।
কুলগাছ, কুলগাছ, ঝেঁকুড়ি !
সতীন বেটি মেকুড়ি ।
ময়না, ময়না, ময়না !
সতীন যেন হয়না ।
হাতা, হাতা, হাতা !
খা সতীনের মাথা ।
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি !
সতীন মাগি চেরী ।
পাখী, পাখী, পাখী !
সতীন মাগী মরতে যাচ্ছে
ছাদে উঠে দেখি !
বঁটি, বঁটি, বঁটি !
সতীনের শ্রাদ্ধে কুট্‌নো কুটি ।
অসৎ কেটে বসৎ করি,
সতীন কেটে আল্‌তা পরি ।
চড়ারে, চড়িরে, এবার বড়-বান,
উচু করে বাঁধবো মাচা,
বসে দেখবো ধান ।
ওই আসছে টাকার ছালা,
তাই গুণতে গেল বেলা ।
ওই আসছে ধানের ছালা,
তাই মাপতে গেল বেলা ।
কেনরে নাতি এত রাতি ?
কাদায় পড়িল ছাতি,
তাই তুলতে এত রাতি ?
এস নাতি, বস খাটে,
পা ধোওগে গড়ের মাঠে ।
সোনার ভেঁটা দেব হাতে,
খেলা করবে পথে পথে ।

গঙ্গা-যমুনা জুড়ি হয়ে,
সাত-ভেয়ের বোন হয়ে,
সাবিত্রী সমান হয়ে,
গঙ্গাযমুনা পুজ্যান্,
সোনার থালে ভুজ্যান্।
চন্দ্রসূর্য্য পূজ্যান্,
সোনার থালে ভুজ্যান!
সোনার থালে ক্ষিরের লাড়ু,
শঙ্খের উপর সুবর্ণের খাড়ু।
অরুণঠাকুর বরণে,
ফুল ফুটেছে চরণে।
যখন ঠাকুর বর দেন,
আপনার ফুল কুড়িয়ে নেন।

ইত্যাদি—

এইবার মাঘ-মণ্ডল ব্রতটি কেমন তা দেখি। পৌষের সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয়ে মাঘের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ব্রত চলে। এই ব্রতের ছড়া দেখি তিন-অঙ্কে ভাগ করা রয়েছে। প্রথম, শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্য্যের উদয় বা শীতের পরাজয় ও সূর্য্যের অভ্যুদয়। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের বিয়ে, শেষ অংশে বসন্তের জন্ম ও মাটির সঙ্গে তাঁর পরিণয়। প্রথম দৃশ্যপট উঠলো—

প্রথম দৃশ্য

শীতের শেষ রাত্রি, কুয়াসা তখনো ঘন হয়ে চারিদিক ঢেকে রয়েছে, রাত্রের ফুল-ডুটি শিশিরের ভারে একেবারে জলের ধারে ঝুঁকে পড়েছে, একটুখানি বাতাসে ঘাসের শীষগুলি দুলে-দুলে সেই ফুলডুটির সঙ্গে দিঘির জল থেকে-থেকে স্পর্শ করতে লেগেছে। মালীর বাগানে ছোটো-ছোটো ফুলবালারা আর গ্রামের ব্রতীরা পুকুরের পাড়ে সব পা-মেলে ফুলের আগায় পুকুরের জল নিয়ে খেলা করতে লেগেছে।

(ফুলবালারা)—

চোখে-মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে?

(ফুলেরা)—

ইতল বেতল সরুয়া সরুয়া দুটি ফুল লাগে!

দিঘির ওপার থেকে নাগেশ্বরের মন্দিরের মালী প্রশ্ন করছে—"ওপার থেকে জিজ্ঞাসেন মালী"—

(মালী)—

বলি, কি কি ফুলে মুখ পাখালি?

(ফুলেরা)—

ইতল বেতল দুই ফুলে!
সরুয়া মরুয়া দুই ফুলে!

(মালী)—

সেই ফুলে খা'ন কি?

(ফুল)—

নল ভেঙে জল খান?

(ফুলবালারা, ফুলেরা, ঘাসেরা এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে)—

যে জল ছোঁয়নালো কাকে বগে,
সে জল ছুঁই মোরা দুর্ব্বার আগে!

ব্রতীরা, ফুলবালারা, ফুলেরা সকলে আছোঁয়া পুকুরের পরিষ্কার জল মুখে-চোখে দিচ্ছে; সাজি-হাতে মালিনীর প্রবেশ এবং এই কাণ্ড দেখে মালিনীর রঙ্গভঙ্গ ও উচ্চ হাস্য।

ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মেলেনীটা খট্‌খটাইয়া হাসে।

হেসে যে মালিনী কি বলছে তা পরের উত্তর-প্রত্যুত্তর থেকে বেশ এঁচে নেওয়া যায়।

মালিনী বলছে যেন—একি ? একি ? আজ যে বড় "ফুলের গন্ধজল পুকুরেতে ভাসে !" ওমা এই শীতের রাত না পোহাতে গেরস্তর মেয়ে তোমরা এই আঘাটায় কেন গো ?

(মেয়েরা)—

হাসিস্‌নালো, খুসিস্‌নালো,
তুই তো আমার সই !
মাঘ-মণ্ডলের বর্ত্ত করুম্‌,
ঘাট পামু কৈ ?

(মালিনী)—

আছে আছেলো ঘাট, বামুনবাড়ির ঘাট !

(মেয়েরা)—

রাত পোহালে বামুনগো পৈতে-ধোয়নের ঠাট।

সেখানে আমরা যাবনা মালিনী, জল ভালো নয়—"পৈতা-কচ্‌লানো জল পুকুরেতে ভাসে।"

(মালিনী)—

আছে আছে লো ঘাট, গোয়ালবাড়ির ঘাট !

(মেয়েরা)—

গয়লাগো দই-ক্ষিরের হাঁড়ি-ধোওনের ঠাট।

(মালিনী)—

নাপিতবাড়ির ঘাট ?

(মেয়েরা)—

নাপিতগো খুর-ধোওনের ঠাট !

(মালিনী)—

ধোপাবাড়ির ঘাট ?

(মেয়েরা)—

ধোবাগো কাপড়-ধোওনের ঠাট !

(মালিনী)—

ভুঁইমালির ঘাট।

(মেয়েরা)—

ভুঁইমালিগো কোদাল-ধোওনের ঠাট !

(মালিনী হাসিয়া)—

মেলেনী-বুড়ির ঘাট ?

(মেয়েরা)—

মেলেনী-বুড়ির ফুল-ধোওনের ঠাট !

(গান)

মালী— আধাগাঙ্গে ঝড়বিষ্টি,
আধাগাঙ্গে মালী,
মধ্যখানে পড়ে রয়েছে
জৈত্‌ ফুলের ডালি।
মেয়েরা—কৈ যাসলো মালিনী
ফুলের সাজি লৈয়া ?
মালিনী—ফুল ফুটেছে নানা রকম
ডাল পড়েছে নুইয়া।
সকলে—আগের ফুল তুলিস্‌ নালো
কলি-কলি !
গোড়ের ফুল তুলিস্‌ নালো
বালি-বালি !
মালিনী—মধ্যের ফুল তুইলা আনিস
নাগেশ্বরের মালী।
নাগেশ্বরের মালীরে !
কোন্‌ কোন্‌ ডালে রাঁধিলি বাড়িলি ?
কোন্‌ কোন্‌ ডালে খাইলি-লইলি ?
কোন্‌ কোন্‌ ডালে নিশি পোহাইলি ?
মালী—জইতের ডালে রাঁধিলাম-বাড়িলাম,
অতসীর ডালে খাইলাম-লইলাম,
গাঁদার ডালে নিশি পোহাইলাম !
সকলে—জইত-গাছেকে ডাল নামাইয়া দে,
সূর্য্যি-ঠাকুর চাইছেন ফুল
সাজি ভরিয়া দে।

এইখানে ফুল-তোলার পালা সাঙ্গ হয়ে দ্বিতীয় পালা আরম্ভ হল—কুয়াশার মধ্যে একটি ফুলগাছের সামনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মেয়েরা বেত্রলতা হাতে)

কুয়া ভাঙ্গুম্, কুয়া ভাঙ্গুম্, বেত্‌লার আগে।
সকল কুয়া গেল ওই বরই গাছটির আগে।
ওরে রে বরই গাছ, ঝুল্লন দে!
দে দে বরইরে, ঝুল্লন দে!

বেত্রলতার আগে জল ছিটাইয়া কুয়াশা ভাঙার অভিনয়। সকলে মিলিয়া তার পরে সূর্য্যের স্তব।

(মেয়েরা)—
উঠ উঠ সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া!
(সূর্য্য)—
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের* লাগিয়া।
(মেয়েরা পরস্পরে)—
ইয়লের পঞ্চকোটি শিয়রে থুইয়া
উঠিবেন সূর্য্য কোন্‌খান দিয়া?
(মালিনী)—
উঠিবেন সূর্য্য বামুন-বাড়ির ঘাটখান দিয়া!
(মেয়েরা)—
উঠ উঠ সূর্য্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া।
(সূর্য্য)—
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাগিয়া।
(মেয়েরা)—
উঠিবেন সূর্য্য কোন্‌খান দিয়া?
(মালিনী)—
গোয়াল-বাড়ির ঘাটখান দিয়া।

এমনি কত ঘাটেরই নাম হল কিন্তু কোনো ঘাটেই সূর্য্য উদয় হলেন না। শেষে বুড়ি মালিনীর ঘাট, যেখানে ফুলের গন্ধ-জল পুকুরেতে ভাসছে সেইখানে সূর্য্যোদয় হল—কুয়াসা ভেঙে। এইবারে মধুমাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্য্যের বিয়ের পালা আরম্ভ হল।

প্রথম দৃশ্য

বাসর-ঘরে চন্দ্রকলা ও সূর্য্য। কুঞ্জের মধ্যে সকাল হচ্ছে।

(চন্দ্রকলা সনিশ্বাসে)—
কাউয়ায় করে কল্‌মল্! কোকিলে করে ধ্বনি!
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, মা বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার মা তোমার শাশুড়ি, মা বলিও তারে।
(চন্দ্রকলা)—
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, বাপ বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার বাপ তোমার শশুর, বাপ বলিও তারে।
(চন্দ্রকলা)—
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, বইন বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার বোন তোমার ননদ, বইন বলিও তারে।
(চন্দ্রকলা)—
তোমার দেশে যাব সূর্য্য, ভাই বলিব কারে?
(সূর্য্য)—
আমার ভাই তোমার দেওর, ভাই বলিও তারে
(চন্দ্রকলা সনিশ্বাসে)—
কাউয়ায় করে কল্‌মল্! কোকিলে করে ধ্বনি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সূর্য্যের বাড়ির সম্মুখ, বৈতালিকের গান)
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন কেশ,
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন নানা দেশ।
চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা মেলিয়া দিছেন সাড়ি,
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর ফিরেন বাড়ি-বাড়ি।

* শিশিরের

চন্দ্রকলা মাধবের কন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তাই দেখিয়া সূর্য্যঠাকুর বিয়া করতে চায়।

(পড়সী)—

বিয়া করলেন সূর্য্য ঠাকুর
দানে পাইলেন কি ?

(বৈতালিক)—

হাতিও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন
আর মাধবের ঝি।
খাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন
আর মাধবের ঝি।
লেপ পাইলেন, তোষক পাইলেন,
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন,
থালা পাইলেন, খোরা পাইলেন,
আর মাধবের ঝি।

(পড়সী)—

মায়ের জন্য আনছেন কি ?

(বৈতালিক)—

শাঁখা সিঁদুর!

(পড়সী)—

বাপের জন্য আনছেন কি ?

(বৈতালিক)—

হাতি ঘোড়া!

(পড়সী)—

বৈনের জন্য আনছেন কি ?

(বৈতালিক)—

খেলানের সাজি।

(গৌরী বা সন্ধ্যা—সূর্য্যের আগের স্ত্রীকে দেখিয়া চুপি চুপি)

(পড়সী)—

সতের জন্য আনছেন কি ?

(বৈতালিক)

কুঁইয়া পুঁটি!

(গৌরী)—

থামুনা লো থামুনা লো, শিয়রে থুমু।
রাতখান পেহাইলে কাউয়ারে দিমু।

(শাঁখ বাজাইয়া, উলু দিয়া, কনে-বরণের ডালা ইত্যাদি লইয়া একদল মেয়ের প্রবেশ।)

(মেয়েরা)—

উরু উরু দেখা যায় বড়-বড় বাড়ি।
ঐযে দেখা যায় সূর্য্যের মার বাড়ি।

(সূর্য্যের মার বাড়ির দরজায় গিয়া)—

সূর্য্যের মা* লো কি কর দুয়ারে বসিয়া ?
তোমার সূর্য্য আসতেছেন জোড়-ঘোড়ায় চাপিয়া

(সূর্য্যের মা)—

আসবেন সূর্য্য বসবেন খাটে,
নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে,
গা হেলাবেন সোনার খাটে,
পা মেলাবেন রূপার পাটে,
ভাত খাইবেন সোনার থালে,
বেন্নন খাইবেন রূপার বাটিতে,
আঁচাইবেন ডাবর ভরা,
পান খাইবেন বিড়া বিড়া,
সুপারী খাইবেন ছড়া ছড়া,
খয়ের খাইবেন চাকা চাকা,
চুন খাইবেন খুটুরী ভরা,
পিক্ ফেলাইবেন লাদা লাদা!

বরবেশে সূর্য্য চন্দ্রকলা-বধুকে লইয়া জাঁকজমকে আপনার পুরীতে প্রবেশ কল্লেন।

---

* বেদে উষাকে সূর্য্যের মা বলা হয়েছে।

(নট-নটীর নৃত্যগীত)

নট—সোনার বাটি ঝুমুর-ঝুমুর
মিষ্টি বাটির তৈল।
তাই লইয়া সূর্য্যঠাকুর
নাইতে গেলেন কৈলো।
নাইয়া-ধুইয়া বাটি থুইলেন কৈলো॥

নটী—বাটি বাটি কুমার আটি,
সকল পুড়িয়া গেল।
লক্ষটাকার বাটি আমার
হারাইয়া গেল।

নট— গেছে গেছে ইহ বাটি
আপদ-বালাই নিয়া।
আরেক বাটি গড়াম-নে
চাকা সোনা দিয়া।

উভয়ে—সোনার বাটি ঝুমুরঝুমুর
মিষ্টি বাটির তৈল।

তৃতীয় দৃশ্য

সূর্য্যের অন্তঃপুর। সূর্য্যের বাপ-মা এবং ভাই-ভগিনী খুড়ো-খুড়ি ও ভাণ্ডারী সিক্‌দার যে যার কাজে। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। এদিকে, ওদিকে বিয়ের দান-সামগ্রী ছড়ানো। চন্দ্রকলার দেশ থেকে সবার জন্য উপহার এসেছে, কেবল সূর্য্যের বড়-স্ত্রী গৌরী বা সন্ধ্যা কিছু না পেয়ে চোখ মুছতে-মুছতে সূর্য্যের ধাইমার কাছে গিয়ে বাপের বাড়ি যাবার জন্য বলছেন।

(গৌরী)—
'আগ্যা'টনী পানবাটনী ধাই-শাশুড়ি গো।
আমারে নি নাইয়র দিবা? *
আমারে নি নাইয়র দিবা?

(ধাই)—
কি জানি, কি জানি বউ গো,
জান গিয়া তোমার শ্বশুরের ঠাঁই।

(গৌরী)—
বাড়ির কর্ত্তা শ্বশুর-ঠাকুর গো!
আমারে নি নাইয়র দিবা?
আমারে নি নাইয়র দিবা?

(শ্বশুর)—
কি জানি, কি জানি বউ গো,
জান গিয়া তোমার শাশুড়ীর ঠাঁই।

(গৌরী)—
বাড়ির গিন্নি শাশুড়ী-ঠাকুরাণী গো,
আমারে নি নাইয়র দিবা?

(শাশুড়ী)—
কি জানি, জান ননাশের ঠাঁই।

(গৌরী)—
আনাজ-তরকারি-কুটনী ননা'শ-ঠাকুরাণী গো—

(ননাশ)
কি জানি, জান দেওয়রের ঠাঁই।

(গৌরী)
লেখইয়া পড়ইয়া দেওয়র গো—

(দেওয়র)—
জান সিক্‌দারের ঠাঁই।

(গৌরী)
আড়লের ভাঁড়লের কর্ত্তা সিক্‌দার হে—

(সিকদার টাকে হাত বুলাইয়া)—
জান তোমার সোয়ামীর ঠাঁই।

(গৌরী সূর্য্যের কাছে গিয়া)—
ঘরগৃহস্থী সোয়ামী হে!
আমারে নি নাইয়র দিবা?
আমারে নি নাইয়র দিবা?

* নাইয়র দেওয়া=বাপের বাড়ী পাঠানো।

(সূর্য্য রাগিয়া)—

আনিব চিকন্ চাটিলের চটা *

ভাঙিব গৌড়া নাইয়রের ঘটা !

এইখানে সূর্য্যের পুত্র লাউলের পালা আরম্ভ হল—"রাওল বা সূর্য্য-পুত্র ঋতুরাজের বিয়ে"। রাতুল থেকেও লাউল কথাটি আসা সম্ভব।

প্রথম দৃশ্য—ঋতুরাজ রাওলের সঙ্গে মাটির কন্যা হালামালার বিয়ের আয়োজন চলছে। সকলে নানা আয়োজনে ব্যস্ত; সূর্য্যের বাপ হুঁকো-হাতে চালা বাঁধাতে ব্যস্ত। বাঁশ দড়ি খড় ইত্যাদি চারিদিকে ছড়ানো। লোকজন, ঘরামিরা কাজের একটু অবসরে হাঁড়ি বাজিয়ে গান ধরেছে—

(গান)

কাউয়া বলে কা,

রাত পোহাইয়া যা !

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসীর কাঁধা,

আজ লাউলের বড় বাড়ি বাঁধা।

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসীর কাঁধা,

আজ লাউলের কলাবাগান বাঁধা।

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর-ঠুকুর কলসীর কাঁধা,

বড় বাড়ি বাঁধা।

কলাবাগান বাঁধা।

কাউয়া বলে কা,

রাত পোহাইয়া যা !

(কাদা-মাটির ঝুড়ি মাথায় একদল মালি-মালিনীর প্রবেশ)

কাদা মাটির তলেলো কাদামাটি,

তাতে ফেলাইলাম কাঁঠালখানি,

কাঁঠালের আগে লো তুলাখানি,

তা'তে বসাইলাম বামুনহাটি।

(ঘটক-ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

(ব্রাহ্মণকে হুঁকা দিয়া সূর্য্যের বাপ)—

বামুন ভাইয়া, বামুন ভাইয়া,

ভাহুলা তামুক খাইও।

আমার লাউয়ের বিয়ার সময়,

ফুল মন্ত্র পড়িও।

(হাঁড়ি পাতিল লইয়া কুমোরের প্রবেশ)

(সূর্য্যের বাপ)—

কুমার ভাইয়া, কুমার ভাইয়া,

ভাহুলা তামুক খাইও।

আমার লাউয়ের বিয়ার সময়

হাঁড়ি পাতিল দিও।

(ধোপা,নাপিত, গোয়ালা প্রভৃতির প্রবেশ।)

(সূর্য্যের বাপ)—

ভাহুলা তামুক খাইও,

ভায়া, ভাহুলা তামুক খাইও !

দ্বিতীয় দৃশ্য—লাউলের বিয়ের ভোজ। অন্দর-বাড়ীতে রন্ধনশালায় সূর্য্য ঘুরে-ঘুরে তদারক কচ্ছেন—গামছা মাথায়। জেলে সঙ্গে সিক্দারের প্রবেশ।

(সিকদার)—

সূর্য্যগো, পুকুরে ফেলাইলাম জাল,

তা'তে উঠিলনা কিছু মাছ।

(জেলেনীদের মাছ লইয়া প্রবেশ)

জেলেনীরা—উঠলো লো, উঠলো মাছ।

সিক্দার—নিবে কে ?

---

* বাঁশের চটা।

জেলেনী—ওই আস্‌ছে বামুন-মেয়ে
খালুই হাতে করে।
(মেয়েরা খালুই ভরিয়া মাছ লইল)
সিকদার—নিলাম লো, নিলাম লো!
মাছ কোটে কে?
ব্রাহ্মণী—ওই আসছে মাছকুটুনী
বঁটি হাতে করে।
(মাছকুটুনী মাছ কুটিতে বসিয়া গেল)
সিক্‌দার—কুটলাম লো কুটলাম!
মাছ ধোয় কে?
মাছকুটুনী—ওই যে আসে ধোয়নী
ঘটি হাতে করে।
(ধোয়নী মাছ ধুইতে লাগিল)
সিকদার—ধুলাম লো ধুলাম!
মাছ রাঁধে কে?
মাছাধোয়নী—ওই যে আসে রাঁধুনী
আগুন হাতে করে।
(রাধুনীর রাঁধা আরম্ভ)
সিকদার রান্নার ধোঁয়াতে চোখ মুছিয়া, নাক সিটকাইয়া
—খাইবে কে?
রাঁধুনী—ওই আসছে খাউনী
থালা হাতে করে!
(সকলে খাইতে বসিয়া গেল)
সিক্‌দার (সনিশ্বাসে)—এঁটো নেবে কে?
খাউনীরা—ওই আসছে এঁটো-নেওনী
গোবর হাতে করে!
সিকদার চটিয়া সকলকে ধাক্কা-ধোক্কা দিয়া—
যা নেওনি, মাছকুটুনি, আশধোয়নী,
মাছরাধুনী, ভাতখাওনী, পাত্‌কুড়োনি যা।
(সিকদারণী)—
আমরা নিমো, ধুমো, রাঁধমো,
কুটমো খামো, ফেলমো, যেমন-তেমন কৈর‍্যা!

ব্যস্ত হইয়া সূর্য্যের বাপের প্রবেশ।
(বাপ)—
পান দিবে কে?
সিক্‌দার—ওই আসছে পান-খাওয়ানী
ডিবা হাতে করে।
বাপ— বিছানা পাতিবে কে?
সিকদার—ওই আসছে বিছানা-পাতুনি
তোষক হাতে করে।
সিকদারণী—শুইবে কে?
—ওই আসছে শুয়নী বালিস
হাতে করে।
সিকদার—রাত পোহাইবে কে?
—ওই আসছে রাত-পোহানী
কাউয়া হাতে।
(গান)
কাউয়া বলে কা!
রাত পোষাইয়া যা!

তৃতীয় দৃশ্য—হালা-মালার বাড়ি, ছাদনা-তলায় একদল স্ত্রী ও পুরুষ বরবেশী লাউলকে আর হালা-মালাকে লইয়া। সকলে ফুল ছিটাইতে ছিটাইতে—

এপারে লাউল, ওপারে লাউল,
কিসের বাদ্য বাজে?
রাজার বেটা সওদাগর
বিয়ে করতে সাজে।
সাজো সাজন্তি লাউল
মাথায় মুকুট দিয়া।
ঘরে আছে রাজার কন্যা
তুইলা দিব বিয়া।
সাজ সাজন্তি লাউল
পায়ে নেপুর দিয়া।

ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা
তুইলা দিব বিয়া।

(ফুল ছিটাইয়া গান)

আমের বইল আসে লো লোচা লোচা।
আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি।

(মালি-মালিনীর গান)

ফুল ফুইলাম গাঁয় গাঁয়,
সে ফুল গেল দখিন্ গাঁয়।
মালিনী—দখিন গাঁইয়া মালীরে!
মালী— ফুলের ডালা লবিরে?
মালিনী—হাতে কলসী, কাঁখে পোলা
কেম্‌নে লব ফুলের ডালা রে!

এইখানে মাটির সঙ্গে রায় বা সুর্য্যের ছেলে রাওলের (লাউলের) বিবাহের ও মিলনের পালা শেষ হল। এর পরে ঋতুরাজ পৃথিবীকে ফলে-ফুলে উর্ব্বরা করে বিদায় হচ্ছেন। মেয়েদের লাউলকে ধরে রাখবার চেষ্টা।—

কৈ যাওরে লাউল গামছা মুড়ি দিয়া?
তোমার ঘরে ছেইলা হইছে
বাজনা জানাও গিয়া।
ধোপা জানাও গিয়া,
নাপিত জানাও গিয়া,
পরুইত জানাও গিয়া।

কিন্তু ঋতুরাজের তো থাকবার জো নেই, তাঁকে একলা যেতেই হবে। আবার শীতের মধ্যে দিয়ে তিনি ফিরবেন—এই আশ্বাস দিলেন এবং মেয়েরা বিদায়-ভোজের আয়োজন করে লাউলের ছোটো ভাই শিবাইকে পাত কেটে আনতে বলে চাল ধুতে বস্‌লো।

চাউল ধুমু, চাউল ধুমু,
চাউলের মালো পানি
চাউল ধুইতে পড়লো চাউল,
পাটি বিছাইয়া ধলো চাউল
যত বর্ত্তিয়ে জানি।

তারপর আলোচাল দুধের জলে লাউলের স্নান।

আলোচালে কাঁচা দুধে লাউল ছান করে
শ্বশুর-বাড়ী বউ থুইয়া লাউল ভাতে মরে।

(এদিকে শিবাই কলাপাতা কাটছেন)

মালী— লাউলের বাগানে
কেরে কাটে পাত?
শিবাই—লাউলের ছোট ভাই
শিবাই কাটে পাত।
মালী— শিবাই রে, শিবাই রে!
না কাটিও পাত।
শিবাই—বাইছা বাইছা কাটুমনে
সব্‌রি কলার পাত।
মালী— সব্‌রি কলার পাতে নাকি
লাউলে খায় ভাত?
বাইছা বাইছা কাট গিয়া
চিনিচম্পা কলার পাত!

এদিকে লাউলের বৌ ছেলেকে ঘুম পাড়াতে বসেছেন—

১

লাউলের ঘরে ছেইলা হইছে
কি কি নাম থুমু?
আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু।
বরই দিয়া হাতে বলাই নাম থুমু।
কমলা দিয় কমল নাম থুমু।
জল দিয়া জয় নাম থুমু।
রাজার বেটা রাজার ছেইলা
রাজা নাম থুমু।
লাউলের ঘরে ছেইলারে
কি কি গয়না দিমু?

হাত জোখা বলয়া দিমু,
গলা জোখা হার দিমু,
বুকজোখা পাটা দিমু
কোমর জোখা টোড়া দিমু,
পাঁওজোখা গুজরী দিমু,
দুই চরণে নেপুর দিমু,
লাউলের ছেইলা নাচবে,
রাজার রাজ্য হাসবে।

২

লাউলের ঘরে ছেইলালো
দুধ খাইবে কিসে?
রাজার বেটা পাশা খেইলা
বাটি জিনিয়া নিছে।
পাশা খেলিয়া জিনলাম কড়ি,
কিনে আনলাম কপিলেশ্বরী,
কপিলেশ্বরী কিবা খায়?
পুকুর-পাড়ে দুর্ব্বা খায়।
দুর্ব্বা খাইয়া লো সই শুকাইল দুধ,
কি দিয়া পালবো মোরা লাউলের ঘরে পুত?
লাউলের ঘরের পুত নালো শক্ত বেড়ার মাটি,
বর্ত্তি গো ভাই যেন লোহার কাটি!

লাউলের ছেলেকে ঘুম-পাড়িয়ে হালামালা একশত বহিন সঙ্গে জলে নাইতে চল্লেন।

আসলো শত বইন্ জলেরে যাই;
জলেরে যাইয়া লো ঝাপ্পাটি খেলাই।

হাতের শাঁখা, টাকা-কড়ি, পায়ের নুপুর এমনি সব নানা জিনিষ জলে ফেলে-ফেলে কুড়িয়ে খেলা।

খেলতে খেলতে নালো দুপ্পুর বেলা।

যখন জল থেকে উঠে এসে লাউলকে তারা ডাকছে তখন মধুমাস শেষ; ঋতুরাজের চলেছেন। বৈশাখের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঝড়-বাতাসে লাউলের আসন যেখানে মেয়েরা দেখছে সেখানে ফুলে-ভরা জইতের একটি ডাল ভেঙে পড়েছে—

জইতের মটকা ডাল ভাইঙ্গা পড়লো ঘরে,
লাউলের দুধভাত ছচি হইয়া পড়ে!

তখন মেয়েরা লাউলকে একটু অপেক্ষা করে কিছু খেয়ে যেতে মিনতি করছে—

খাও খাও লাউল, গোটা চারি ভাত;
আমরা শত বইনে ফেলাম-নে পাত।

বৈশাখের মেঘ গর্জ্জন করে উঠলো, ঝড় হুহু বইলো, উৎসবের সাজ-সরঞ্জাম লণ্ড-ভণ্ড করে গরম বাতাসে ধুলো উড়লো, মলিন-মুখে মেয়েরা ঋতুরাজকে বিদায় দিলে;—

আজ যাও লাউল,
কাল আইসো।
নিত্য নিত্য দেখা দিও।
বছর বছর দেখা দিও॥

[পালা সাঙ্গ]

এই মাঘমণ্ডল-ব্রতের প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য্য যা, তাঁকে সেই-রূপেই মানুষে দেখছে এবং বিশ্বাস করছে যে, জলের ছিটায় কুয়াসা ভেঙে দিলে সূর্য্য-উদয়ের সাহায্য করা হবে। এখানে কামনা হল সূর্য্যের অভ্যুদয়। ক্রিয়াটিও হ'ল কুয়াসা ভেঙে দেওয়া ও সূর্য্যকে আহ্বান। দ্বিতীয় অংশে চন্দ্রকলাকে দীর্ঘকেশ গোল-খাড়ুয়া-পায়ে একটি মেয়ে এবং সূর্য্যকে রাজা-বর এবং সেই সঙ্গে সূর্য্যের মা ও চন্দ্রকলার বাপ কল্পনা করে মানুষের নিজের মনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি বাপেরবাড়ির যে-সব ছবি আছে,

দেখছে। তৃতীয় অংশে সূর্য্য-পুত্র বা রায়ের পুত্র রাউল বা লাউল, এক-কথায় বসন্তদেব; টোপরের আকারে এঁর একটি মূর্ত্তি মানুষে গড়েছে, এবং সেটিকে ফুলে সাজিয়ে মাটির পুতুল হালামালার সঙ্গে বিয়ের খেলা খেলছে। এখানে কল্পনার রাজ্য থেকে একেবারে বাস্তবের রাজ্যে বসন্তকে টেনে এনে, মাটির সঙ্গে এবং ঘরের নিত্যকাজের এবং খুটিনাটির মধ্যে ধরে রাখা হল; তাকে জামায়ের আদরে খাওয়ানো-দাওয়ানো হলো; তার ছেলেকে ঘুম-পাড়ানো, দুধ খাওয়ানো, মানুষ করে তোলার নানা কাজ। এই পুতুল-খেলা আর-একটু অগ্রসর হলেই মা-যশোদার নীলমণিকে ক্ষীর সর ননী খাওয়ানো;—"খাওয়াবো সর, মাখাবো ননি।" এবং জগন্নাথকে খিচুড়ি-ভোগ রাজভোগ দিয়ে, তাঁর রাজবেশ হস্তীবেশ এম্নি নানাবেশ এবং রুক্মিণীহরণ চন্দনযাত্রা এম্নি তাঁর নানা লীলা গড়ে নিয়ে মূর্ত্তি-পূজার পুরো অনুষ্ঠানে দাঁড়ায়।

ভাদুলী-ব্রতটি আমরা দেখলেম বর্ষা—দেশ জলে ভাসিয়ে দিয়ে বিদায় হচ্ছে, আর শরৎ আসছে—এরি একটা উৎসব। মাঘ-মণ্ডল ব্রতে শীতের কুয়াসা কেটে সূর্য্যের আলোতে ঝল্‌মল্ বসন্ত দিনগুলি আসছে তারি উৎসব। দু-জায়গাতেই মানুষের মনের কামনা নাট্য-ক্রিয়ায় আপনাকে ব্যক্ত করলে। এমনি শস্‌পাতার ব্রত। সেখানে আমরা দেখি মানুষ প্রচুর শস্যের কামনা করছে; কিন্তু সেই কামনা সফল করবার জন্যে সে যে নিশ্চেষ্টভাবে কোনো দেবতার কাছে জোড়-হাতে দাও দাও করছে তাও নয়; সে যে ক্রিয়াটা করছে তাতে সত্যিই ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে এবং ফসল-ফলার যে আনন্দ সেটা নাচ গান এম্‌নি নানা ক্রিয়ার প্রকাশ কচ্ছে। বর্দ্ধমান-অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এই শস্‌পাতার ব্রত বা ভাঁজো, ভাদ্রমাসের মন্থন-ষষ্ঠী থেকে আরম্ভ হয়ে পরবর্ত্তী শুক্লা দ্বাদশীতে শেষ হয়। মন্থন-ষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন পঞ্চমী তিথিতে পাঁচ রকমের শস্য—মটর, মুগ, অরহর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে রাখা হয়; পরদিন ষষ্ঠীপূজায় এইগুলি নৈবেদ্য দিয়ে বাকি শস্য সরষে এবং ইঁদুর-মাটির সঙ্গে মেখে একটি নতুন সরাতে রাখা হয়; দ্বাদশী পর্য্যন্ত মেয়েরা স্নান করে প্রতিদিন এই সরাতে অল্প অল্প জল দিয়ে চলে; চার-পাঁচদিন পরে যখন শস্য সব অঙ্কুরিত হতে থাকে তখন জানা যায় এ বৎসর প্রচুর শস্য হবে এবং মেয়েরা তখন শস্য-উৎসবের আয়োজন করে। ইন্দ্র-দ্বাদশীতে এই উৎসব; চাঁদের আলোতে উঠানের মাঝখানে এই অনুষ্ঠান! নিকোনো বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রচিহ্ন-দেওয়া-আল্‌পনা; কোথাও মাটির ইন্দ্র-মূর্ত্তিও থাকে। এই বেদীর চারিদিকে, পাড়ার মেয়েরা সকলে আপন-আপন শস্‌পাতার সরাগুলি সাজিয়ে দেয়, তার পর সাত-আট থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মেয়েরা হাত-ধরাধরি-করে বেদীর চারি-দিক ঘিরে নাচ গান সুরু করে। উঠানের এক অংশে পর্দ্দার আড়ালে বাদ্যকর তাল দিতে থাকে;—

ভাঁজো লো কল্‌কলানী, মাটির লো সরা,
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চফুলের মালা।
এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘী,
বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি?

এর পর দুই দলে ভাগ হয়ে মুখে-মুখে ছড়া-কাটাকাটি করে—

পূর্ণিমার চাঁদ হেরে তেঁতুল হলেন বঙ্ক!
গড়ের গুগ্‌লী বলে—আমি হব শঙ্খ!
ওগো ভাঁজো তুমি কিসের গরব কর?
আইবুড়ো বেটাছেলের বিয়ে দিতে নার!

সমস্ত রাত্রি দুই দলের নাচ-গান, ছড়া-কাটাকাটির উপরে চাঁদের আলো, তারার ঝিক্‌মিক্—এই ছবির একটি সুন্দর বর্ণনা পূর্ব্ববঙ্গের তারাব্রতে একটি ছড়ায় আমরা পাই—

ষোল ষোল বর্ত্তির হাতে ষোল সরা দিয়া,
মোরা যাই ইন্দ্রপুরীর নাটুয়া হইয়া।

এর পরে রাত্রি শেষ; মেয়েরা আপন-আপন শস্‌পাতার সরা মাথায় নিয়ে পুকুরে কিম্বা নদীতে বিসর্জ্জন দিয়ে ঘরে আসে। এখানে শস্যের উদ্গমের কামনা সরাতে শস্য-বপন-ক্রিয়া থেকে আরম্ভ হল এবং অনুষ্ঠান শেষ হল উৎসবের নৃত্যগীতে। কিন্তু দুঃখের দিনও বছরের মধ্যে আসে—যখন পাতা ঝরে যায়, মাটি তেতে ওঠে, জল ফুরিয়ে যায়! সেই সব দিনে মনের নিসন্নতার ছবিও ব্রতে ফুটেছে দেখি! সেদিনের বসুধারা ব্রতের ছড়ায় কেবল জল আর জল!

কাল বৈশাখী আগুন ঝরে!
কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু-শুকু আকাশে ছাই!

উৎসাহ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই,—কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাসের মতো ছড়াটুকু হুতাশ জানাচ্ছে। অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আমাদের যদিই-বা এখন কোনোদিন চঞ্চল করে তবে হয়তো 'হরিহে রক্ষা কর' বলি মাত্র; কিন্তু ঋতু-বিপর্য্যয়ের মানে যাদের কাছে ছিল প্রাণ-সংশয়, সেই তখনকার মানুষরা কোনো অনির্দ্দিষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা কেবল মুখে জানিয়ে তৃপ্ত হতে বা নিশ্চিন্ত হতে পারতো না; সে বৃষ্টি দাও বলে ক্ষান্ত হচ্ছে না; সে বৃষ্টি সৃষ্টি করতে, ফসল ফলিয়ে দেখতে চলছে। এবং সে নিশ্চয় জানছে বৃষ্টির কামনা করে দল-বেঁধে তারা মাটির ঘটকে মেঘরূপে কল্পনা করে শিকের খোঁচায় ফুটো করে বট, পাকুড় ইত্যাদি গাছের মাথায় জলধারা দিয়ে যে বসুধারা-ব্রতটি করছে, তাতে করে বৃষ্টির দাতা যে দেবতা তিনি তুষ্ট হচ্ছেন এবং এই প্রক্রিয়ার বলে মেঘও জল দিতে বাধ্য! এখনকার মানুষ এ-রকম বিশ্বাস করে না, ব্রতও করে না। কিন্তু তখনকার লোকে যে-বিশ্বাসে ব্রত করতো তার মূলে যে কামনা, এখনো পূজায় বা প্রার্থনাতে সেই কামনা, কেবল অনুষ্ঠানটা ভিন্ন রকমের; ব্রতে কামনার সঙ্গে অনুষ্ঠানের স্পষ্ট সম্পর্ক দেখি, যেমন—

বট আছেন, পাকুড় আছেন,
তুলসী আছেন পাটে।
বসুধারা ব্রত করলাম
তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল, বাপের কুলে ফল,
শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জল-গঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে,
অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে!

ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি! আল্‌পনায় তার প্রতিচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি; এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার নাটে,

নৃত্যে ;—এক-কথায় ব্রতগুলি মানুষের গীত-কামনা, চিত্রিত বা গঠিত কামনা, সচল জীবন্ত কামনা!

বেশির ভাগ ব্রতে ছড়া হয় গীত কিম্বা নাট্য আকারে, আল্‌পনা হয় প্রতিচ্ছবি নয় মণ্ডনরূপে থাকেই থাকে—কামনাকে সুব্যক্ত সুশোভন রূপে ব্যাখ্যা করতে। নাট্য, নাচ, গান এবং ছবি-আঁকা বলতে মানুষের স্বাধীন চেষ্টা বলে' আমরা এখন বুঝি, তখন কিন্তু সেগুলো ব্রতের অঙ্গ বলেই ধরা হতো। ব্রতের ছড়াগুলি যেখানে ছোটো-ছোটো যাত্রার পালার মতো গাঁথা হয়েছে সেখানে নাট্য নৃত্য ও গীতকলার যথেষ্ট অবসর রয়েছে দেখি।

আমের বইল আসে লো লোচা লোচা,
আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি।

আবার যেমন—

ফুল কুইলাম গাঁয় গাঁয়,
সে ফুল গেল দখিন গাঁয়।
দখিন-গাঁইয়া মালিরে!
ফুলের ডালা লবি রে?
কাঁখে কলসী, হাতে পোলা,
কেম্‌নে লব ফুলের ডালা রে!

এই-সব ছড়াকে গান ছাড়া কি বলব? ছড়াগুলির বাঁধুনী আর কথা-সাজানোর ভঙ্গী এমন তালে-তালে যে এগুলিতে সুর এবং নাচ দুয়েরই টান স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। এমনি মাঘমণ্ডল ব্রতে কুয়াশা ভেঙে সূর্য্য-ওঠবার ছড়া এবং ভাদুলী ব্রতের ছড়া-গুলিতেও গীত, নাট্য দুইই রয়েছে। দুই ব্রতেই পাত্র-পাত্রী স্থান-কাল ভেদে ছড়াগুলি নাটকাকারে গাঁথা। এ-থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় একসময়ে এগুলি মন্ত্রের মতো করে বলা হতোনা,—অভিনীত হতো!

ব্রতের অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে, এখন যাকে বলি আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান, তা নয়; এখন যাকে বলি আমরা কলাকৌশল, তাও নয়! ধর্ম্ম এবং শিল্প দুইই এখানে স্বাধীন ভাবে আপনাদের দুটো দিক অবলম্বন করে চলছেনা। ব্রতের মূলে কতখানি ধর্ম্ম-প্রেরণা, কতখানি-বা শিল্পকলার সৃষ্টির বেদনা রয়েছে তা বোঝা শক্ত।

এখনো পাড়াগাঁয়ে রাখালেরা 'কুলাই-ঠাকুরের' ব্রত বলে একটা অনুষ্ঠান করে। সেটি থেকে ধর্ম্ম আর শিল্প ক্রমে কেমন করে স্বস্বপ্রধান হয়ে উঠছে তার একটু আভাস পাব। পৌষ-সংক্রান্তির একপক্ষ পূর্ব্ব থেকে রাখালেরা একজনকে বাঘ সাজিয়ে গৃহস্থের বাড়ি-বাড়ি সন্ধ্যার সময় এই গানটি গেয়ে পূজার চাল ভিক্ষে করে বেড়ায়—

সকলে—ঠাকুর কুলাই ভেঁা
হ্যাটা চল রে॥ ধ্রু॥
হ্যাটা চল পাঁচিল পার।
বাঘ— ঝপৎ গিরিরে॥ ধ্রু॥
ঝপৎ গিরি সজাগ হয়।
সজাগ হয়্যা না করে রব॥
সকলে—সুন্দের বনেরে॥ ধ্রু॥
বাঘ— সুন্দের বনে বাঘের ছাও।
হাম্বুর হাম্বুর করে রব।
ম্যাক্ বাঘ রে॥ ধ্রু॥
সকলে—ঠাকুর কুলাই ভেঁা ইত্যাদি—

এই ছড়া তো শুধু আউড়ে যাবার নয়; এতে বাঘ হতে হবে, জোরে-জোরে হাঁটা,

ঝাপাৎ-করে পড়া, সজাগ হয়ে এদিক-ওদিক দেখা এবং হাম্বুর হাম্বুর গর্জ্জন! নাট্যকলার অনেকখানিই পাওয়া গেল। গানে কোরাস্ পর্য্যন্ত। এর সঙ্গে পাড়া-গাঁয়ের রাত্রি, অন্ধকার গাছপালা, মশাল জেলে রাখাল-ছেলেরা এবং ছেলে মেয়ে-বুড়ো নানা দর্শকের নানা ভাব-ভঙ্গী, খড়ের ঘর, প্রদীপের আলো ইত্যাদি জুড়ে দেখলে একপক্ষব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই আমরা পাবো। বাঘের ভয় থেকে গরুবাছুর যাতে রক্ষা পায় সেই কামনা করে রাখালেরা বাঘ সাজিয়ে এই বাঘের ছড়া প'ড়ে ব্রত করবে এইটেই আশা করা যায়। কিন্তু এখানে দেখছি চাল প্রার্থনা করে রাখালেরা এই বাঘের গান গেয়ে-গেয়ে রোজগার করছে। এখানে দেখছি অনুষ্ঠানের গীত-কলার অংশ ব্রতের বাকিটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে গান নাচ দুইই যদৃচ্ছা করছে; এবং ব্রতের দিন কেবল বাঘের মূর্ত্তিকে পূজো দিয়েই কাজ সারছে! এইখানে ধর্ম্মাচরণ আর শিল্পকলা দুটির ছাড়াছাড়ি হল। ব্রতের ধর্ম্মাচরণের অংশ মূর্ত্তি-পূজার দিকে এগিয়ে গেল এবং শিল্প-অংশ ক্রমে বহুরূপীর বাঘের অনুকৃতি থেকে আরম্ভ হয়ে শিল্পের উচ্চতর একটি স্থানে পৌছতে চল্লো। পূজার দিকে পড়লো পূজ্য মূর্ত্তি আর পূজক; আর শিল্পের দিকে এল দর্শক আর প্রদর্শক; এবং ব্রতকথা স্বাধীনভাবে কবিরা গাইতে লাগল—যেমন চণ্ডীর গান, শীতলার গান। এর থেকে রাম-যাত্রা, কৃষ্ণ-যাত্রা, পাঁচালী, কবি। এম্‌নি পরে পরে ব্রতের সম্পর্ক থেকে দূরে যেতে-যেতে নিছক যাত্রা, নাটক, থিয়েটারে এসে দাঁড়ালো—সেইসব শিল্পকলা যার গোড়া-পত্তন হয়েছিল ব্রতীর কামনাকে ব্যক্ত করবার চেষ্টায়। খাঁটি অবস্থায় দেখি ব্রতে দর্শক-প্রদর্শক নেই, যে নট সেই ব্রতী বা সেই চিত্রকর এবং গায়ক; কিন্তু ব্রত থেকে যখন শিল্প বিচ্ছিন্ন তখন যে আল্‌পনা দিচ্ছে, চিত্র করছে, অভিনয় করছে বা ছড়া বলছে কিম্বা বাঘ সেজে কি আর-কিছু সেজে নৃত্য করছে সে যে ব্রতী হয়ে ধর্ম্ম-কামনায় সেটা করছে এ হতেও পারে, নাও হতে পারে; বাঁধাবাঁধি কিছু নেই। ব্রতের বাঘ বহুরূপীর বাঘে যেমন দাঁড়ালো, অমনি সেখান থেকে লাট-সাহেবের ফটকের উপরের বাঘ পর্য্যন্ত হতে তার আর কোনো বাধা রইলো না। মাঘমণ্ডলের সূর্য্যদেব যেদিন ফুলের টোপর মাথায় রাখল বা লাউল মূর্ত্তিতে ধরা পড়লেন, সেইদিন থেকে গ্রীক আপোলো থেকে কৃষ্ণনগরের পুতুল, পুরীর জগন্নাথ পর্য্যন্ত সব রাস্তা খোলসা হয়ে গেল। কল্পব্রত ও পুন্যিপুকুরের মেলের ডাল পাথরে গড়া হয়ে বুদ্ধ-যুগের কল্পদ্রুম এবং আজ-কালের অস্‌লার কোম্পানীর ইলেক্‌ট্রিক বাতির ঝাড় হয়ে দাঁড়াতে চল্লো—প্রতি পদক্ষেপে ব্রতের ধর্ম্মানুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে-হতে। ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য সমস্তই একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্গত রয়েছে এবং তারাই বড় হয়ে ক্রমে স্বস্বপ্রধান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে,—ধর্ম্ম ও শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসের মূলে এই কথা রয়েছে দেখি।

এই স্বতন্ত্রতা শিল্প-সাহিত্য এবং ধর্ম্মের প্রচারের পক্ষে দরকার কিনা এবং এই পার্থক্য থাকা ভালো কি মন্দ সেটা বিচার করতে বসা কেবল তর্ক করা মাত্র। এইটে ঘটেছে। একসময়ে দেব-মন্দিরের সঙ্গে নাটমন্দির এবং পুজাপার্ব্বনের সঙ্গে দেবতার চরিত বর্ণন করে চন্দন-যাত্রা রাস-যাত্রা রুক্মিণী-হরণ এম্‌নি নানা অভিনয় ও চিত্র-কার্য্য ইত্যাদি জড়িয়ে ছিল; এখন তারা সে-সম্পর্ক সে-গলাগলি-ভাব ছেড়েছে; ধর্ম্ম-মন্দিরে, নাটকের রঙ্গমঞ্চে ও শিল্প প্রদর্শনীতে সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ হয়ে গিয়েছে। এখন আর থিয়েটারে কি গানের মজলিসে কিম্বা চিত্র-প্রদর্শনীতে গিয়ে বলা চলেনা যে আমরা ব্রতী, ব্রত কর্‌তে বসেছি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্যাবাইন-রমণী

নাটিকা

[রোমক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা]

প্রথম অঙ্ক

[সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী মুক্তকেশী স্যাবাইন-রমণীদিগকে টানিতে টানিতে অস্ত্রধারী রোমানরা পর্ব্বত হইতে বাহির হইল; রমণীরা সকলেই আঁচড়াইয়া ও চীৎকার করিয়া বাধা দিতেছে, কেবল একজন একেবারে শান্ত নিদ্রিতপ্রায়। রোমানরা নাকের ঘায়ে অস্থির ও কাতর হইয়া রমণীদিগকে একজায়গায় জড়ো করিল এবং একটু সরিয়া গিয়া নিজেদের বিস্রস্ত বেশ-ভূষা ঠিক করিয়া লইল—সকলেই হাঁপাইতে ছিল। ক্রমে কোলাহল থামিল—রমণীরা রোমানদের গতিবিধি দেখিয়া সুস্থির হইল; পরে আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা সুরু হইল]

প্রথম রোমান। সত্যি, আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেছি—দিব্যি করে' বলতে পারি আমার যিনি, ওজনে তিনি দুশো মণের কম নন……

দ্বিতীয়। সব-চেয়ে যেটি বড় আর মোটা, সেইটিকে বেছে নেবার কি দরকার ছিল? আমি বেশ দেখে-শুনে ছোট্ট রোগাটিকে নিয়েছি—

প্রথম। ও কি হে? তোমার নাকে কি হল! সেই রোগা ছোট-খাটোটির এত দাপট…

দ্বিতীয়। আর ভাই, বল কেন! একেবারে বেরালের মত আঁকড়ে ধরে ছিল…

প্রথম। যা বলেছ! এরা বেরালের জাত, বেরালের মতই আঁচড়ায়। আমি কত যুদ্ধে গিয়েছি, কত তলোয়ারের চোট খেয়েছি, কত লাঠির ঘা, নুড়ি-পাথর

হজম করেছি—কত ঘর-বাড়ী পর্য্যন্ত আমার ঘাড়ে পড়েছে, কিন্তু এমন দশা আর-কথনো হয়নি···হায়, হায়, আমার এমন সাধের নাকটি একেবারে গেছে!

তৃতীয়। ভাগ্যে আমাদের গোঁফ-দাড়ি ভাল করে কামানো ছিল, তাই রক্ষে—নইলে বোধ হয় গোঁফদাড়ির একগাছি চুলও থাকত না—দেখেছ ত, তাদের আঙুলগুলো কেমন সরু সরু, সুন্দর, কিন্তু ঐ নখগুলো,—আঃ, কি বিশ্রী ধারালো! বলছি কেন? আচ্ছা, বেরালই বা বলি কেন? বেরাল তো তাদের নাম নয়। আমার-যিনি, তিনি সারা পথ কোন কথা বলেন নি বটে, কিন্তু মাথার চুল আমার একগাছিও আর মাথায় রাখেননি!

চতুর্থ। (দেখিতে খুব মোটা এবং লম্বা; একটু চড়া সুরে) আমি তার হাতদুটো বগলে চেপে ধরে আনছিলুম—কিন্তু সে আমাকে এমনি কাতুকুতু দিয়েছে যে, হেসে খুন হবার জোগাড়!

[রমণীগণের অবজ্ঞার মৃদু হাসি শুনা গেল]

প্রথম। ওহে, ওরা শুনতে পাচ্ছে···

দ্বিতীয়। ওহে, সব এসো, কান্না থামাও, গুছিয়ে ফিটফাট হও। প্রথম দিন থেকেই এঁরা আমাদের তাচ্ছল্য করলে আমাদের আর দুঃখের সীমা থাকবে না। দেখছো, পলাস কি রকম! ও-ই ঠিক মান রাখতে পারবে—

পঞ্চম। সত্যি, গায়ে একটা দাগও লাগেনি যে হে পলাস! তোমারটিকে কি করে নিয়ে এলে?

পলাস। (বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) তা ভাই জানি না। গোড়া থেকেই সে আমায় এম্‌নি জড়িয়ে ধরলে, যেন আমি তার চিরকালের স্বামীটি—কিন্তু তোমরা আমায় অবাক করলে! কেন, এরা তো বেশ শান্ত, নিরীহ। যেই আমি তাকে তুলে নিলুম, অম্‌নি সে দু'হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলে—ভয় হচ্ছিলো, বেশী জড়িয়ে ধরে' শেষে চেপে না মেরে ফেলে! হাতগুলো তার রোগা বটে, কিন্তু ভারী শক্ত···

প্রথম। পলাস, তোমার খুব জোর বরাত, যাহোক—

পলাস। বল্‌ছি ত শান্ত, নিরীহ। সে মনে-মনে বুঝতে পারলে, তাকে আমি ভালবাসব, খুব খাতির করব। অর্দ্ধেক পথ ত সে ঘুমন্ত ছোট্ট ছেলেটির মতই এলো ···এ-সব বলছি বটে, কিন্তু তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস করছ না···

স্থূলকায় ভদ্রলোক। মশাইরা—থাক্, ও-সব কথা এখন রাখুন। কোন্‌টি কার, এখন বেছে নেওয়া যায় কেমন করে? অন্ধকার রাত্রে খাঁচার মধ্যে থেকে মুর্গী চুরি করার মত তাদের নিয়ে এসে···

রমণীগণ। (ক্রুদ্ধস্বরে)। দেখেচ মিন্সের উপমার ভঙ্গী!

প্রথম। ওহে, ওরা যে আমাদের কথা সব শুনতে পাচ্ছে।

স্থূলকায় ভদ্রলোক। (মোটা গলায়) আচ্ছা, ওদের এখন বেছে নেওয়া যায় কি করে? আমারটি কিন্তু ভারি আমুদে, সেটি আমি কাউকে নিতে দিচ্ছি না—আমার উপর যে কেউ চাল চালবে, সে হচ্ছে না।

দ্বিতীয়। গোবর-গণেশ!

তৃতীয়। আমারটিকে তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পারব—তাঁর সে স্বর আমি ভুলব না, মরে' গেলেও না।

পঞ্চম। আমারটির হাতের নখ দেখেই চেনা যাবে।

সিপিও। আমারটিকে তার চুলের মিষ্টি খোস্‌বু থেকে চিনতে পারবো।

পলাস। মনের সৌন্দর্য্য আর বিনয়েই আমারটিকে চেনা যাবে। ওহে শোন, আজ থেকে আমাদের জীবন-ধারায় কিছু পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আমরা আজ গার্হস্থ্য জীবনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি—একা থাকার কষ্ট আজ থেকে আর ভোগ করতে হবে না।

চতুর্থ। ঠিক বলেছ হে, আজ থেকেই আমরা সংসারে প্রবেশ করতে চলেছি!

রমণীগণ। (ব্যঙ্গের সুরে) তা বই কি! একবার চেষ্টা করে দেখুন না—আসুন না সব এগিয়ে!

প্রথম। ওহে, তোমরা কি করছো? ওরা যে সব শুনতে পাচ্ছে।

দ্বিতীয়। আর দেরী নয়, এবার সময় হয়েছে…

তৃতীয়। কিন্তু আগে যাচ্ছে কে?

[সকলে নির্ব্বাক ও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; রমণীগণ বিদ্রূপের হাসি হাসিল]

চতুর্থ। আমি আগে যাচ্ছি না—যত কাতুকুতু খাবার, তা খেয়েছি—আর-কেউ চেষ্টা করগে, তবে আমার উপর যে কেউ চাল চালবে, সেটি হবে না। আচ্ছা পলাস, তুমিই আগে যাও না!

পলাস। মুখ্যু, দেখছো না, আমার প্রেয়সী এখনও ঘুমুচ্ছেন! পাথরের কাছে কালো ঝোপের মত যে জায়গাটা, ঐ যে ঐ দিকে চেয়ে দেখ না, ঐ যে তিনি। কি শান্ত, নিরীহ!

সিপিও। তোমরা গোল চোকাতে যে গোলমাল বাধাচ্ছ, তাতে মনে হচ্ছে, ঐ নিষ্ঠুর জীবগুলির কাছে এগুতে তোমাদের কারও সাহস নেই। আমি একটা ব্যবস্থা কিন্তু ঠিক করেছি—

চতুর্থ। বেশ বেশ, বল ত ভাই।

সিপিও। আচ্ছা, আমার পরামর্শটা শোনো। খুব ধীরে-সুস্থে, চল, সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাই—সবাই সবাইয়ের পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে চলুন—ওদের স্বামীদের ভয় করলুম না, আর ওদের—

স্থূলকায় ভদ্রলোক। ওদের স্বামী! ছি, ছি, কি বলছো তুমি!

[রমণীদের গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল —ক্রন্দনের লক্ষণও প্রকাশ পাইল]

প্রথম। ওহে, ওরা যে সব শুনতে পাচ্ছে।

সিপিও। আবার মুখ খুলছো! লক্ষী-ছাড়া স্বামীগুলোর কথা কেউ তুলো না। বোঝ না, ঐ কথাটায় সুন্দরী অবলাদের মনে ভারী ব্যথা! আচ্ছা, আমার ব্যবস্থায় কারও অমত নেই ত?

সকলে। কোন আপত্তি নেই, কোন আপত্তি না—সবাই মত দিচ্ছি।

সিপিও। আচ্ছা, তাহলে সকলে…

[সৈনিকেরা আক্রমণে ও রমণীরা আত্ম-রক্ষায় প্রস্তুত হইল। রমণীদের ধারালো নখ উদ্যত দেখা গেল—আঁচড়াইতে আর চুল

ছিঁড়িতে তাহারা প্রস্তুত। সাপের হিস্ হিস্ শব্দের মত একটা শব্দ শুনা গেল। সৈনিকেরা অগ্রসর হইতে লাগিল অর্থাৎ পরস্পরের পিছনে লুকাইতে গিয়া সকলেই ক্রমে আরও পিছাইয়া আসিল। রমণীরা হাসিয়া উঠিল—সৈনিকেরা হতভম্ব হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।]

প্রথম। সিপিও, আমার মনে হয়, তোমার এ ব্যবস্থায় কিছু খুঁৎ ছিল—সক্রেটিস থাকলে বলতেন, আমরা পিছন দিকে এগুলুম।

স্থূলকায় ভদ্রলোক। আরে এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না যে!

পলাস। ওহে বীরত্ব দেখাও, ভয় পেয়ো না—ক'টা নখের আঁচড়ে কি আসে যায়? একবার শেষ পর্য্যন্ত লড়তে পারলে তারপর কত সুখ, কত মজা! চলো, সব এগিয়ে চলো।

[সৈনিকেরা সকলে গোলযোগ করিয়া রমণীদের আক্রমণ করিল, কেবল পলাস স্থিরভাবে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলে কিছুক্ষণ আক্রমণের পর দ্রুত পশ্চাৎপদ হইল। পরে সব চুপচাপ—সৈনিকেরা নিজের নিজের নাকে হাত বুলাইতে লাগিল]

সিপিও। (নাকি সুরে) সবাই বোধ হয় লক্ষ্য করেছ, ওরা এবার মোটেই চীৎকার করেনি! ভারী খারাপ লক্ষণ, চেঁচানো যে ছিল ভাল—

প্রথম। কিন্তু এখন করা যায় কি?

দ্বিতীয়। গার্হস্থ্য জীবন উপভোগের জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে উঠছে—

তৃতীয়। আচ্ছা, রাজ্য ত বসানো গেল, আর কেন? ঢের হয়েছে—এবার বিশ্রাম না নিলে আমার আর চলছে না।

স্থূলকায় ভদ্রলোক। মশাইরা, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী-জাতির মনস্তত্ত্ব ভাল করে জানে, এমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই! যুদ্ধ করে' রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, আমরা একেবারে অসভ্য, বেরসিক বনে গেছি—রমণী কি বস্তু, তা পর্য্যন্ত একবারে ভুলে গেছি!

পলাস। (সবিনয়ে) না, সকলে তা বলে' ভোলে নি।

সিপিও। এরা যে এক-সময়ে স্বামীর ঘর করেছে, সেই সব স্বামী, যাদের আমরা যুদ্ধে হারিয়েছি—এই থেকে আমি সিদ্ধান্ত করছি, অপরিচিত স্ত্রীলোককে হাত করবার কোন উপায়—কোন গূঢ় উপায় নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু সে উপায়টা যে কি, তা বার করা যাচ্ছেনা।

চতুর্থ। আচ্ছা, ওদেরই যদি উপায়টা জিজ্ঞাসা করা যায়?

প্রথম। বলবে না, বলবে না।

(রমণীরা অবজ্ঞাভরে হাসিয়া উঠিল)

দ্বিতীয়। ওহে, করছো কি! সব যে শুনতে পাচ্ছে।

সিপিও। আমি একটা ব্যবস্থা ঠিক করেছি—

চতুর্থ। তুমিই বুদ্ধিমান বটে, বিচক্ষণ—

সিপিও। এ-সব সুন্দরী বন্দিনীদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমরা ওদের ধরা দূরে থাক্, ওরাই আমাদের বন্দী করেছে। মুখ আঁচড়াতে, চুল ছিঁড়তে আর বগলে

কাতুকুতু দিতে এরা এমনি ব্যস্ত থাকে যে, আমাদের কথাই শুনতে পায় না! আর শুনতে পায় না বলেই আমাদের কথায় ভোলে না, আর সেইজন্তেই ত ওদের মনে বিশ্বাস জন্মে দিতে পারছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—

[রোমানরা সবাই "ব্যাপারটা এই" বলিয়া গম্ভীরভাবে ভাবিতে বসিল এবং রমণীরা তাহাদের কথা শুনিবার জন্ত উৎকর্ণ হইয়া রহিল]

সিপিও। তবে শোন, সামরিক ব্যবস্থা-মতে আমাদের দল থেকে একজনকে দূত করা যাক্, আর আমাদের সুন্দরী বিপক্ষদেরও তাই করতে বলা হোক্—তখন দুপক্ষের দূতেরা সাদা নিশেনের তলায় দাঁড়িয়ে একটা ব্যবস্থা—

[সৈনিকেরা বক্তৃতায় বাধা দিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সিপিও সকলের মতে দূত নির্ব্বাচিত হইয়া শ্বেতপতাকা হাতে লইয়া রমণীদিগের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিল—"ওহে, আমায় একলা ফেলে তোমরা পালিয়ো না যেন"]

সিপিও। (প্রার্থনার সুরে) সুন্দরীগণ, আপনারা যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন। দেখতেই পাচ্ছেনত, আমার হাতে সাদা নিশেন রয়েছে—সাদা নিশেন অতি পবিত্র বস্তু এবং আমার দেহ এখন যদি আপনারা স্পর্শ করেন, তাহলে সেটা নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ হবে, জানবেন। অতএব রমণীগণ, শুনুন, সবেমাত্র কাল আমরা আপনাদের ধরেছি। ধরে আমরা আনন্দ যদিও লাভ করেছি, তা কিন্তু পুরোমাত্রায় নয়। কারণ, এর মধ্যে পরস্পরের মনোমালিন্য, বিবাদ-বিসম্বাদ—

ক্লিওপেট্রা। কি আস্পর্দ্ধা! একটা ছড়ির ডগায় এক টুকরো সাদা ন্যাকড়া বেঁধে ভাবছে, এই-সব কথা বলে অপমান করবে!

সিপিও। (সানুনয়ে) আজ্ঞে, ক্ষমা করুন। এ-সব অপমানের কথা নয়—ভুল বুঝছেন আপনারা। সত্যি, দিব্যি করে বলছি, আমরা আপনাদের প্রেমে পড়েছি—আমাদের প্রতি আপনাদের সহানুভূতি দেখে একটা প্রার্থনা জানাতে সাহস হচ্ছে। দয়া করে আমাদের মত আপনাদের ভিতর থেকেও একজনকে দূত ঠিক করুন—

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, আমরা জানি, সব শুনেছি, তোমায় আর-কিছু বলতে হবে না—

সিপিও। সে কি! কি করে শুনলেন? আমরা তো খুব চুপিচুপি সব বলাবলি করছিলুম

রমণীগণ। হয়েছে, হয়েছে, ও সব কথাই আমরা শুনেছি—

ক্লিওপেট্রা। তোমার ও ন্যাকড়া নিয়ে যেখান থেকে এসেছো, সেইখানে ফিরে যাও। যাও, বলছি। আমরা গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি—না, আরও দূরে চলে যাও। আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনতে হবে না। ঐ ওখানে হাঁ করে রয়েছে, ওটা কে? [পলাসকে দেখাইয়া] ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও...

রোমানরা। (আস্তে আস্তে) এইবারেই ঠিক কাজ আরম্ভ হলো—

[রোমানরা আস্তে আস্তে সরিয়া গেল এবং কেহ কেহ রমণীদের মনে বিশ্বাস

উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কানে হাত চাপা দিল]

প্রথম রমণী। কি অপমান, কি ভীষণ অত্যাচারই আমাদের উপর করছে! আহা, বেচারা স্বামীরা—

দ্বিতীয় রমণী। বেচারা স্বামীদের কাছে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অবিশ্বাসিনী হবার আগে শপথ করে বলছি, হাজার রোমানের চোখ কানা করে দেবো। প্রিয়তম আমার, ঘুমাও, ঘুমাও—এ দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ তোমার মান ঠিক বজায় রাখব—

তৃতীয়া রমণী। আমিও তাই দিব্যি করছি···

চতুর্থ রমণী। আমিও—

ক্লিওপেট্রা। শপথ তো তোমরা সবাই করলে, কিন্তু তাতে হবে কি? এই বর্ব্বর অশিক্ষিত লোকেরা কি ও-শপথের মান রাখতে জানে? ধর না কেন, যে আমায় ধরে এনেছে—যদিও তার নাক আমি কামড়ে নিয়েছি—

প্রথম রমণী। এখনও তোর তাকে মনে আছে?

ক্লিওপেট্রা। (অবজ্ঞাভরে) মরবার সময় পর্য্যন্ত তাকে মনে থাকবে—বর্ম্ম তলোয়ার আর সৈনিকদের গায়ে কি সব থাকে, সে সবের সেই বদ্ গন্ধ, উঃ, কি নির্দ্দয়ভাবেই আমায় পীড়ন করেছে! হায় প্রিয়তম, কোথায়, তুমি কোথায়!

প্রথম রমণী। ওদের সবাইয়ের গায়েই, ভাই, বিশ্রী গন্ধ—

দ্বিতীয় রমণী। ভালুকের মত চেপে ধরা ওদের সবাইয়েরই স্বভাব। বোধ হয়, এটা একটা সামরিক নিয়ম—

তৃতীয় রমণী। ছেলে-বেলায়, আমার মনে আছে, একজন ছোকরা সৈনিক একদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিল—বলছিলো; সে অনেক দূর থেকে এসেছে, আর সেখানে—

ক্লিওপেট্রা। ওলো, এটা আমাদের ছেলেবেলাকার গল্প বলবার জায়গা নয়—

তৃতীয় রমণী। হঁ্যা, সেই ছোকরার কথা বলছিলুম—

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা জুনো, যখন প্রত্যেকেরই ঘাড়ে একটা করে সৈনিক আপাতত রয়েছে, তখন তোমার সেই ছোকরার কথা শুনে আমাদের আর কি হবে? এখন কি করা যায়, তাই ভাবো। একটা মতলব আমি ত ঠিক করেছি—

ভেরোনিকা। (ঘুম হইতে উঠিয়া আসিল—চেহারা খুব রোগা এবং আশ্চর্য্যরকম লম্বা—চোখদুটি তখনও অর্দ্ধমুদ্রিত—অলসভাবে ক্লিওপেট্রার কথায় বাধা দিয়া সে কথা কহিল) কৈ, তারা কৈ? ও কি, অতদূরে! কাছে আসছে না কেন? ওরা কাছে না থাকলে আমার ভারী লজ্জা করবে—এতক্ষণ ঘুমের ঘোরে ছিলুম। আমায় যে ছোকরাটি এনেছে, তাকে তো কৈ দেখতে পাচ্ছি না—তার গায়ে বেশ একটা গন্ধ—

ক্লিওপেট্রা। ঐখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছো না? ঐ যে, মুখ হাঁ করে—

ভেরোনিকা। আমি ওর কাছে যাবো—

ক্লিওপেট্রা। ওলো, সবাই ওকে ধরে রাখ্—আচ্ছা, ভেরেনিকা, এরি মধ্যে কি

তোমার প্রিয়তম স্বামীকে একেবারে ভুলে গেলে ?

ভেরোনিকা। ওগো না, সত্যি বলছি, তাকে কখনো ভুলবো না। কিন্তু ওদের কাছে তোমরা যাচ্ছো না কেন ? বোধ হয়, নিজেদের ভেতর কিছু ঠিক করেছো—যাই হোক না, সব করতেই আমি প্রস্তুত আছি।—কারো সঙ্গে রাগারাগির পরই ভাবটা বড় বেড়ে যায় কি না !

ক্লিওপেট্রা। শোন ভাই সকলে, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য আমাদের বেচারা স্বামীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না। এইটে সকলে শপথ কর—ওরা যেমন ব্যবহারই করুক, আমরা পাহাড়ের মত অটল থাকবো। যখনই মনে হচ্ছে, বেচারা স্বামী আমার একলা রয়েছে—শূন্য শয্যায় পড়ে বৃথাই ডাকছে—ক্লিওপেট্রা, ক্লিওপেট্রা, তুমি কোথায় ? যখনই তার প্রেমের কথা মনে পড়ছে—

(রমণীরা কাঁদিতে লাগিল) এসো, শপথ করো—ভাবছো কি ? স্বামীরা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে—

রমণীরা। শপথ করছি, এরা আমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুক, আমরা স্বামীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না।

ক্লিওপেট্রা। এই ঠিক,—তাদের কথা মনে হলেই আমার একটু শান্তি আসে—প্রিয়তম, ঘুমাও, শান্তিতে ঘুমাও। আমাদের তারপর একটা কাজ আছে—রোমানদের মত একজনকে দূত ঠিক করা, আর তাকে—

প্রথম রমণী। তাকে বলে দেওয়া, ওদের ঐ ছুটোর চোখ ক'টা গেলে দেওয়া—

দ্বিতীয় রমণী। না, না, তা নয়, ওরা শুধু আমাদের নখের পরিচয় নিয়েই যাবে ? আমাদের মনের কথা কি, তাও জেনে যাক্।

ভেরোনিকা। যখন ওদের হাতেই রয়েছি, তখন এ-সব কথা আর কেন ?

ক্লিওপেট্রা। চুপ করো, ভেরোনিকা,—রোমান আইনে যাই-ই থাক্ না কেন, জোর যার মুল্লুক তার নয়। আমাকে তোমরা দূত ঠিক করো, আমি বুঝিয়ে দিয়ে আসবো যে আমাদের এখানে আটকে রাখবার ওদের কোন অধিকার নেই—আমাদের ছেড়ে দিতে ওরা বাধ্য। ওরা যে আইনেরই দোহাই পড়ুক, আর যাই বলুক না কেন,—এটা সত্যি যে ওরা একেবারে নিরেট বর্ব্বরের মত কাজ করেছে—

রমণীগণ। যাও, যাও, ক্লিওপেট্রা, তুমিই যাও—

প্রথম রমণী। ভেরোনিকা, তোমায় কিছু বলতে হবে না, চুপ করো—

ক্লিওপেট্রা। মশাই, ও সাদা পতাকা-ধারী দূত-মশাই, এখানে এগিয়ে আসুন—আমি একটু কথা কইতে চাই—

সিপিও। আমার অস্ত্রশস্ত্র কি সরিয়ে ফেলবো ?

ক্লিওপেট্রা। না, তার দরকার নেই—তা করতে হবে না। ভেবো না যে, তোমার ঐ সব অস্ত্র দেখে আমরা ভয় পাচ্ছি। চলে এসো, ভয়ের কিছু নেই—তোমায় আমি কামড়াবো না। সেদিন রাত্রে যখন সেই নিস্তব্ধ রাত্রে বাড়ীতে ঢুকে বেচারা স্বামীর হাতের ভিতর থেকে আমাকে বর্ব্বর ডাকাতের মত জোর করে কেড়ে নিয়ে এলে, তখনতো এত ভীতু

ছিলে না! আচ্ছা, যাক—যদি আসবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে এগিয়ে এসো—

সিপিও। ভদ্রে, আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি—

ক্লিওপেট্রা। মুগ্ধ হয়ে গেছি! রাহাজান, চোর, পাগল কোথাকার—খুনে, পাজি, রাক্ষস, হতভাগা—কাজ যা করেছ, সে কি বিশ্রী, জঘন্য—

সিপিও। ভদ্রে—

ক্লিওপেট্রা। কি ভীষণ আমায় পীড়ন করেছো ভাবো! তোমায় দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে! —গায়ে তোমার সৈনিকের গন্ধ, নাকে আঁচড়ানোর দাগ, ও-সব যদি না থাকতো, তা হলে—

সিপিও। ক্ষমা করবেন—এ সব আপনারাই করেছেন—

ক্লিওপেট্রা। আমি? ও, তুমিই সেই লোকটা? (ঘৃণাভরে দেখিল) আচ্ছা, কিছু মনে করো না—আমি চিনতে পারি নি।

সিপিও। (সানন্দে) কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি—আপনার চুলে সেই ভারবেনার গন্ধ ছিল না? এখনো আছে?

ক্লিওপেট্রা। যে গন্ধই থাক্, তোমার তাতে কি দরকার?—ভারবেনার গন্ধ কি সব-চেয়ে ভাল নয়?

সিপিও। ঠিক। আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম—

[সিপিও অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইল—মঞ্চের দক্ষিণে রোমানরা এবং বামে রমণীরা—উভয় পক্ষই ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়া সন্ধি-প্রসঙ্গ শুনিতে লাগিল]

ক্লিওপেট্রা। কিছু বলো বা নাই বলো, সে আমি গ্রাহ্য করি না। তোমার গন্ধ সম্বন্ধে আমিতো কিছু বলিনি—আচ্ছা, সে সম্বন্ধে মুখ্যুর মত বক্‌বক্ করবার কি দরকার? থাক্, ঢের হয়েছে—ভদ্রলোকের মত মশাই, এখন এগিয়ে এসো আমাদের নিয়ে কি করতে চাও, বল—

[সিপিও সবিনয়ে মাথা নীচু করিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর মুখে হাত দিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিল—রোমানরা সবাই খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল এবং রমণীরা গভীর অবজ্ঞাভরে দাঁড়াইয়া রহিল]

ক্লিওপেট্রা। (লজ্জায় রক্তিম হইয়া) খিল্‌খিল্ করে হাসলে কথার উত্তর হবে না। তোমরা কি ভয়ঙ্কর—আচ্ছা, বলছো না কেন—আমাদের নিয়ে কি করতে চাও—তোমরা কি করতে চাও? তোমরা সবাই বোধ হয় জানো—আমাদের সকলেরই বিবাহ হয়েছে এবং আমাদের স্বামী আছেন!

সিপিও। ভদ্রে, যদি অভয় পাই ত বলি, তোমাদের হাতে আমরা প্রাণ-মন দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি—

ক্লিওপেট্রা। সত্যি! তোমরা সব তাই ভাবছো? তোমরা পাগল!

সিপিও। আমাদের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ—আমরা সব ফুলবাবুর মত বেড়াচ্ছি না—আমাদের কাজকে চিরস্মরণীয় করে রাখতেও ব্যস্ত নই। আমাদের কথা একবার ভেবে দেখ। একটু দয়া কর,—যদি সকালে তোমাদের স্বামীরা উঠে দেখে, তোমরা কাছে নেই—তাহলে মনে মনে কিন্তু

তাদের জন্মে একটু দুঃখ হবে, জানি? কিন্তু ছাখ, আমরা সব একলা রয়েছি—

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি। সত্যি, বড্ড একলা—

ভেরোনিকা। (চোখ মুছিতে মুছিতে) ওদের জন্মে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে—

সিপিও। যে শুভ মুহূর্ত্ত হারিয়েছি—হে ভদ্রে, যাক্, ক্ষমা কর—আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাদের স্বামীদের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করছি—

ক্লিওপেট্রা। [সসম্ভ্রমে] তোমার মুখে এ কথা শুনে খুসী হয়েছি—

সিপিও। কিন্তু সে মুখ্যুগুলো—তারা তোমাদের ছেড়ে দিলে কেন?

[রোমানরা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঠিক বলছো, সিপিও, ঠিক বলছো" —কিন্তু রমণীরা ক্রোধভরে—"কি নীচ,— আমাদের স্বামীদের অপমান করছো— মিথ্যাবাদী বদমায়েসের দল"]

ক্লিওপেট্রা। (কর্কশ স্বরে) যদি এভাবে সন্ধি প্রসঙ্গ করো, তা হলে প্রার্থনা করছি— আমাদের স্বামীদের বিষয় বলবার সময় একটু সম্মান রেখে কথা কয়ো।

সিপিও। নিশ্চয়। খুব সম্মানের সঙ্গেই বলবো—কিন্তু দেখ, যতই আমরা সম্মান করি না কেন, তারা তোমাদের অযোগ্য, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। ঠিক এ সময়, যখন তোমাদের অমানুষিক যাতনা আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করছে—পাহাড়ের ঝরণার মত স্বামী-বিরহ-বেদনা-জনিত উষ্ণ অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে—এমন কি, এই পাথরগুলো তোমাদের দুঃখে নড়েচড়ে দুঃখ আর বিরক্তি জানাচ্ছে—

ক্লিওপেট্রা। থাক্, আর বেশী আড়ম্বর করে বলতে হবে না—

সিপিও। যখন সমস্ত প্রকৃতি,—বেশ, থাক্—আচ্ছা, তোমাদের স্বামীরা কোথায়? তাদের কেন দেখছি না? তারা তো এলোই না—নিশ্চয় তারা তোমাদের ত্যাগ করেছে —যদিও তোমাদের রাগ হবে শুনে, তবুও বলছি—তারা অতি নীচের মত তোমাদের ত্যাগ করেছে—

[কোমরে হাত রাখিয়া রোমানরা বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল—রমণীরা উত্তেজিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল—প্রসারপিনা মৃদুস্বরে বলিল, "ঠিক কথা, সত্যি তারা তো এখানে নেই—এই সময়েই তো তাদের এখানে আসা উচিত ছিল।"]

ক্লিওপেট্রা। বাঃ, চমৎকার! সত্যি, তোমাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গী ভারি সুন্দর— কিন্তু ভাবছো কি যে রাত্রে ডাকাত পড়ে আমাদের চুরি করে' নিয়ে আসে—

সিপিও। সে কি, আমরা যে সারারাত প্রহরীদের সঙ্গে—

ক্লিওপেট্রা। আর যদি দিনের বেলায়—

সিপিও। না, না, না, দিনের বেলায় চুরির কথা ভেবো না—

[ভেরোনিকা অলসভাবে বলিল—"কি বিশ্রী! অতদূরে এরা রয়েছে কেন? দূরে থাকলে যে আমার ভারী লজ্জা করে! আরও কাছে আসছে না কেন?]

স্ত্রীলোকেরা। (মৃদু স্বরে) ওকে থামাও, চুপ করাও—

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা, তোমাদের সব দোষ সত্ত্বেও, তোমাদের জন্মে আমরা দুঃখিত

কারণ যৌবনের স্রোতে তোমরা বিপথগামী হয়েছো। আর তোমাদের কষ্টের জন্যেও আমরা সহানুভূতি করছি। যাক্,—এবার কিন্তু এমন কথা বলবো, যাতে তোমাদের সব আশা ঘুচে যাবে, তোমরা লজ্জিত হবে। আচ্ছা, মশাইরা, আমাদের ছেলেদের অবস্থা কি হবে, ভেবেছেন?

সিপিও। হাঁ, ঠিক বলেছ, সত্যি সে একটা গুরুতর সমস্যা। আচ্ছা, অনুমতি দাও, দলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কয়ে আসি—

[পরস্পর পরস্পরের দলে ফিরিয়া গেল এবং আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।]

সিপিও। ভদ্রে—

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, বল, কি হলো?

সিপিও। বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডার পর আমার বন্ধুরা অর্থাৎ প্রধান রোমানরা তোমাদের বলতে বল্লেন—যে তোমরা আবার শীঘ্রই নতুন সন্তান লাভ করবে—

ক্লিওপেট্রা। [চমকিয়া] কি! তোমরা এত বর্ব্বর!

সিপিও। শপথ করছি, মশাইরা সব শপথ করুন—

[রোমানরা গোলমাল করিয়া শপথ করিল]

ক্লিওপেট্রা। কিন্তু চারদিকের দৃশ্য তত মনোরম নয়—

সিপিও। (রাগতভাবে) চারদিকের দৃশ্য!

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, এ বড় ভয়ানক জায়গা—চারদিকে পাহাড় আর চূড়ো—একেবারেই বিশ্রী। এখানে এ পাথরটা রয়েছে কেন? সরিয়ে ফেল—

সিপিও। আচ্ছা, সরিয়ে ফেলছি—

[পাথরটি সরাইল]

ক্লিওপেট্রা। আর এ রকম গাছপালা—আমার এখানে দম আটকে যাচ্ছে—এ একটা বিশ্রী গাছ এখানে, তোমরা বড় ক্লান্ত, নয়? আচ্ছা—আমি যাচ্ছি, এখনি এসে উত্তর দেবো—

সিপিও। উত্তর, কিসের উত্তর?…

ক্লিওপেট্রা। কেন, আমায় যে একটা প্রশ্ন করলে?

সিপিও। আমি, ক্ষমা করো—আমি কি বোকা হয়ে যাচ্ছি? তোমায় আবার কিসের বিষয় প্রশ্ন করবো—

ক্লিওপেট্রা। আমায় অপমান করবে, ভাবছো!

সিপিও। অপমান করব? আমি?

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ, তুমি এখনি বল্লে না, যে বোকা না কি হয়ে যাচ্ছো—

ক্লিওপেট্রা। হ্যাঁ তুমিই—ওসব কথা আমি কিছু বলিনি—নিজে বলে আবার ভুলে যাচ্ছো—

সিপিও। কে? আমি?

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা, আমি চল্লুম—কথা কইতে দেরী হলে কিছু মনে করো না, ততক্ষণ একটু নিজেকে সাফ বুঝে দেখো। তোমার চেহারাখানি দেখবার জিনিষ। আচ্ছা, তোমার কি একখানা রুমালও নেই? মুখটা মুছে ফেল, ঘামে একেবারে ভিজে গেছে যে, যেন কত পাথর বয়ে এসেছ! [সরিয়া যাইবার ভাণ করিল)

সিপিও। কিছু মনে করো না—আমার বিশ্বাস, তাই করে এলুম—কিন্তু তোমাদের জন্যেই করতে হলো—

ক্লিওপেট্রা। আমার জন্যে? কৈ, আমি তো ওসব কিছু বলিনি—

সিপিও। আচ্ছা, ক্ষমা কর। যাক্—কি বলছিলুম?

ক্লিওপেট্রা। আমি তা কি করে জানবো?

সিপিও। ও বুঝেছি, আমায় নিয়ে ঠাট্টা করছো—

ক্লিওপেট্রা। তুমি সেটা লক্ষ্য করেছো, দেখচি।

সিপিও। আমায় নিয়ে ঠাট্টা! আর না--

ক্লিওপেট্রা। কি করে আটকাবে?

সিপিও। আমি এখনও অবিবাহিত—ভগবানকে ধন্যবাদ—

ক্লিওপেট্রা। আ মরি, আবার ভগবানকে ধন্যবাদও আছে! বা, বেশ বলেছো—তোমাদের শপথে বিশ্বাস করলে কি বিপদেই পড়তুম—(সঙ্গীদের) ওলো, শুনেছিস্, এদের যে স্ত্রী নেই, এর মধ্যেই এরা কৃতজ্ঞ—

সিপিও। কি সর্ব্বনাশ! হয় আমাকে নিয়ে ঠাট্টা থামাও, নয়—

ক্লিওপেট্রা। নয় ত কি?

সিপিও। নয়ত বাড়ী চলে যাও—হ্যাঁ, আমি বলছি, তোমরা বাড়ী ফিরে যাও—ঢের হয়েছে। আর কেন? এই শেষ- সত্যি, রাজ্য তো বসালুম, কিন্তু সে কি এই সব অসঙ্গত তর্ক-বিতর্ক শোনবার জন্যে?

ক্লিওপেট্রা। অসঙ্গত?

সিপিও। তা না ত কি!

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমায় অপমান করছো...

সিপিও। বা, কাঁদতে আরম্ভ করলে—কি চাও, বলতো?—আমায় বার বার দোষ দিচ্ছ কেন? প্রবীণ হতে চল্লুম, কিন্তু তুমি দেখছি, আমায় পাগল করে দেবে! ঢের হয়েছে, কান্না থামাও গো, বলি কি ব্যাপার,মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না যে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—ব্যাপারখানা কি?

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের যেতে দেবে?

সিপিও। নিশ্চয়। রোমানগণ, তোমাদের সবাইয়ের মত আছে? আমি তো হাল ছেড়েছি—

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা সব চলে যাক্—ইটুরিয়া থেকে এবার কতকগুলো স্ত্রীলোক ধরে আনা যাবে—

সিপিও। আচ্ছা, বেশ। তাই ভালো—এ জীবগুলো স্ত্রীলোকই নয়—এরা একেবারে—

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) সত্যি বলছো!

সিপিও। সত্যি আবার কি?

ক্লিওপেট্রা। আমাদের যেতে দেবে! হয় তো ফন্দী করেছো, যেই যাবো, অম্নি গিয়ে ধরে আনবে—

সিপিও। না, না, দৌড়ে পালাও—এখানে কি আঠা দিয়ে আমরা জুড়ে রেখেছি?

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের রেখে আসবে?

সিপিও। কি সর্ব্বনাশ! তারপর—

ক্লিওপেট্রা। তোমরা তো জানোই, যখন এখানে এনেছো, তখন আমাদের রেখে আসতে ভদ্রতার খাতিরে তোমরা বাধ্য—পথটাও বড় সহজ নয়—

[রমণীরা বিদ্বেষভরে হাসিল—রাগে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া সিপিও কিছু বলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিল এবং মাটীতে পা ঠুকিয়া দলের কাছে ফিরিয়া গেল—রোমানরা সবাই রমণীদিগের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া রহিল—রমণীরা আস্তে আস্তে পরামর্শ আরম্ভ করিল]

ক্লিওপেট্রা। তোমরা সবাই শুনেছো—আমাদের এরা যেতে দেবে—

ভেরানিকা। কি ভয়ানক!

দ্বিতীয় রমণী। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে—এ একেবারে অসহ্য! নিরীহ ভাল মানুষ আমরা, আমাদের ধরে নিয়ে এসে—রাত-দুপুরে বাড়ীশুদ্ধ জাগিয়ে তুলে জিনিষ-পত্র সব ভেঙ্গে-চুরে তচ্-নচ্ করে—ছেলেগুলোর ঘুম ভাঙ্গিয়ে, আর তারপর কিনা এখন এখানে টেনে এনে বলে,—তোমাদের চাই না!

প্রথম রমণী। বেচারা স্বামীরা আমাদের বৃথাই বসে' কষ্ট করছে—

দ্বিতীয় রমণী। ব্যাপারটা সব ভাবো দিকি। সেই রাতদুপুরে একেবারে মরার মত সবাই যখন ঘুমুচ্ছে—

তৃতীয় রমণী। আচ্ছা, তোমাদের কারো ফিরে যাবার পথ জানা আছে?

চতুর্থ রমণী। কি আশ্চয্যি! তুমি কি ভাবো যে সারা পথ লক্ষ্য করতে করতে এসেছি—তাতো করিনি, আর করাও যায় না—তবে বেশ মনে আছে, পথটা অনেক—

তৃতীয় রমণী। এটা ঠিক, এরা আমাদের ফিরিয়ে রেখে আসবে না—

[রমণীগণের চাপা হাসির শব্দ]

ভেরোনিকা। (দুঃখের সুরে) দেখেছো, আমার সেই লোকটিকে ওরা পিছন করে বসিয়েছে? আচ্ছা, যাচ্ছি আমি—

প্রথম রমণী। ভেরোনিকা, থামো—তোমায় ছেড়ে সে যাবে না—আমাদের ব্যবস্থাটা আগে শেষ হয়ে যাক্—

প্রসারপিনা। আচ্ছা, আমাদের তো স্বামী নিয়ে কথা—এরা বা তারা, তা নিয়ে কি আসে যায়! তারা বেশ, অথচ এরাও মন্দ নয়—স্বামী নিয়ে গোলযোগ করবার দরকার নেই। বাড়ী গেলেই সে স্বামীটি আগেই খাবার করে' দিতে বলে, বরং এ নতুনটিকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা যাবে—সে স্বামীটি তো আমার হাতের তৈরি খাবার খেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছে, রোজ বকাবকি করে। কিন্তু এ আহাম্মকটা আমার রান্না পেলে খুব আমোদ করে খাবে—

ক্লিওপেট্রা। ছি ছি প্রসারপিনা, কি বলছো—ইতিহাসে আমাদের দুর্নাম থেকে যাবে যে!

প্রসারপিনা। কত ইতিহাস আমাদের ব্যাপার জানতে পারবে? আর এখানে রোমেতে এটা মোটেই খারাপ নয়।

ক্লিওপেট্রা। প্রসারপিনা, কি বিশ্রী কথা তুমি বলছ! ভাবছো কি, ওরা ঐ সব কথা শুনছে? কিন্তু শোন—আর একটা মতলব ঠিক করেছি—যদিও সেই প্রিয়তমদের কাছে ফিরে যাবো, তবু কথাটা হচ্ছে, পথও অনেক, নিজেরাও ভারী ক্লান্ত—

প্রথম রমণী। আমার শরীর তো অবশ হয়ে একবারে নুয়ে পড়ছে ভাই।

দ্বিতীয় রমণী। হাজারই বলো এ সহ্য

করা যায় না—হঠাৎ, কোথাও কিছু নেই, রাতদুপুরে ডাকাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বাড়ী-শুদ্ধ জাগিয়ে তুলে—

ক্লিওপেট্রা। সেই জন্যেই তো বলছি, এখানে দুদিন থেকে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক্—তা হলে এরাও সন্তুষ্ট হবে, আমাদেরও কিছু করবে না। যখন দেখবে, আমরা বেশ শান্ত, প্রফুল্ল—আমাদের সঙ্গও তখন এরা ছেড়ে দেবে। সত্যি আমার সেই রোমানটির জন্যে দুঃখ হচ্ছে···তার নাকটি সত্যিই একেবারে দেখবার জিনিষ দাঁড়িয়ে গেছে···

তৃতীয় রমণী। কিন্তু দুদিনের বেশী এখানে থাকছি না···

চতুর্থ রমণী। একদিনই আমার যথেষ্ট··· আচ্ছা একটু বেড়ালে হয় না?

ক্লিওপেট্রা। ওঠো, ওঠো, ওরা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে···

ক্লিওপেট্রা। (সিপিওকে) বলি, মশাই, ও মশাই—

সিপিও। (না ফিরিয়া) কি চাও, বল—

ক্লিওপেট্রা। দয়া করে একবার এদিকে আসবে?

সিপিও। বল না, আমি ঠিক আছি···

ক্লিওপেট্রা। ঠিক করেছি, তোমাদের হুকুম-মত এখনি বাড়ী ফিরে যাবো···এতে রাগ হবে না তো?

সিপিও। না, মোটেই না—

ক্লিওপেট্রা। কিন্তু কথা হচ্ছে···ঠিক করেছি, আমরা একটু বিশ্রাম করবো—বিশ্রামের জন্যে এখানে একদিন থাকতে দেবে? এ জায়গাটি আমাদের সবার বড় ভাল লেগেছে···

[রোমানগণ একসঙ্গে ফিরিয়া লাফাইয়া উঠিল]

সিপিও। (সহর্ষে) জায়গার কথা কি বলছো···যেখানে যত দেবতা আছে, সবার নামে শপথ করে বলছি—

হেমহিলা। ওগো প্রাচীন রোমানবৃন্দ··· না, না, ওর নাম কি—ওহে···সব ওঠো—জাহাজ ঠিক করো---চ—চলো।

ক্লিওপেট্রা। আমরা সবাই একটু বেড়াতে চাই—

সিপিও। আঃ—রোমানগণ—ওঠো না, দাঁড়িয়ে ওঠো—সেজে নাও—ডান, বাঁ—ডান, বাঁ---সারে-সারে দুজন করে---[সিপিও ক্লিওপেট্রার হাত ধরিয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল এবং তাহার আদেশ-মত সব রোমানই এক-একটি রমণীকে লইয়া তাহার পিছন-পিছন সার-বন্দী হইয়া সগর্ব্বে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল] ডান, বাঁ—ডান, বাঁ---এক, দুই—এক, দুই---

পলাস। (মঞ্চের উপর একা শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল—হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এদিক ওদিক চাহিয়া) সে কৈ? কৈ সে? ওহে, সব দাঁড়াও—তাকে হারিয়ে ফেলেছি যে, কৈ, সে গেল কোথায়?

[ভেরোনিকা নববধুর মত দাঁড়াইয়া ছিল—মুখ মাটির দিকে নত]

পলাস। (অন্ধের মত তাহার দিকে দৌড়িয়া গিয়া) ক্ষমা করুন,—ভদ্রে—তাকে আপনি দেখেছেন?

ভেরোনিকা। তুমি মুখ্যু, আহাম্মক—

পলাস। কাকে? আমাকে বলছেন?

ভেরোনিকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মুখ্যু—

পলাস। ও কি, আমায় ধমকাচ্ছো কেন? আমি কি করলুম?

ভেরোনিকা। তোমাকেই ধমকাচ্ছি। মুখ্যু কোথাকার—দেখতে পাচ্ছো না? প্রিয়তম, ত্রিশ বছর যে তোমার জন্যে আমি বসে আছি। ওঃ! চলো—চলো—আমার হাত ধরে আমায় সঙ্গে নাও—

পলাস। কাকে নেবো?—

ভেরোনিকা। আমাকে! আবার কাকে? —দেখতে পাচ্ছো না, আমিই সে—আঃ—কি মুখ্যু, আহাম্মক—

পলাস। তুমি? না, না, তুমি তো সে নও—

ভেরোনিকা। হাঁা, আমি বলছি—আমিই সেই—

পলাস। না, না, তুমি সে নও—(মাটীতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল)

ভেরোনিকা। দেখছো, আমি একা পড়ে আছি—আমার লজ্জা করছে—ওঠো, চলো—

পলাস। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না, না, তুমি সে নও—আর-কেউ—

ভেরোনিকা। কিন্তু আমি বলছি, না—আমিই সেই। আঃ—বিরক্ত করে তুল্লে দেখছি—আমার মত আবার কাকে দেখলে? —আমার সে স্বামীটি ত্রিশবছর ধরে' বলে আসছে—তুমি সে নও, আর-কেউ—আর এখন ছেলেমানুষ তুমিও সেই কথা বলছো! দাও, তোমার হাত দাও—

পলাস। (ভয়ে উঠিয়া পড়িয়া) তুমি সে নওগো, আর-কেউ। হায়, হায় ওগো, আমায় রক্ষা করো, সকলে রক্ষা করো—আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

ক্রমশঃ

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতের নগর

(ফরাসী হইতে)

ভারতের নগরে যাহা প্রথমেই চখে পড়ে, এবং যাহা হইতে ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা বুঝিতে পারা যায় তাহা কি?—না, য়ুরোপীয় ও দেশীয় লোকদের মধ্যে একটা পার্থক্য। অবশ্য, দেশীয় লোকদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী নগরে বাস করে; আবার কাহারও কাহারও আফিস্ ও দোকান আছে। কিন্তু দুই পৃথক্ সহর; চিনীয় সহর ও চীনের নির্দ্দিষ্ট য়ুরোপীয় বাসস্থান যেরূপ পৃথক্—এ সেইরূপ পৃথক্।

বোম্বায়ে, কলিকাতায়, মাদ্রাজে, ইংরেজ-টোলা য়ুরোপকে স্মরণ করাইয়া দেয়; বড় বড় অট্টালিকা, হোটেল, ব্যাঙ্কের বড় বড়

ইমারৎ, ব্যবসায় তেজারতি ও সওদাগরীর কুঠী, ইংরেজী কারখানার তৈয়ারী জিনিসের বহু খরিদ্দার-সমন্বিত বড় বড় দোকান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুরোপে যেরূপ ছিল, কলিকাতায় সেইরূপ ক্লাসিক্ ধরণের অট্টালিকা ; বোম্বায়ে, ভিনিস্ লম্বার্ড্ ও রোমের গথিক ধরণের ইমারৎ,—যে ধরণটা আমরা লণ্ডনের ইদানিন্তন অট্টালিকা-সমূহে দেখিতে পাই।

বাসগৃহ সকল ইংরেজী আদর্শের—ছোট কিন্তু সুখ-সুবিধাসমন্বিত, সিঁড়ি আছে, বারাণ্ডা আছে ; অধিকাংশ বাড়ীই উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত ; উপকণ্ঠস্থ বাগান-বাড়ীর উদ্যান-উপবনে ফলের গাছ, তালজাতীয় গাছ ও বাঁশ-ঝাড় রোপিত হইয়া থাকে। চক্, সুন্দর সুন্দর পরিসর-ভূমি, সুব্যবস্থিত ও গ্যাস-আলোকে আলোকিত বড় বড় রাস্তা। গাড়ী, অম্‌নিবাস্, ট্রামওয়ে। বোম্বায়ে একজন বড় বিশপ থাকেন। অনেক যুরোপীয় বাসিন্দা। দেশীয় লোকের মধ্যে অনেকের যুরোপীয় ধরণের পোষাক, আবার অনেকের দেশী পরিচ্ছদ ; পাগ্‌ড়ী ও জুতা। দেশীয় মহিলা অল্পই দেখা যায় ;—কেবলই দাসী চাকরাণী।

যে সকল নগরে ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা তত বেশী নয়, সেখানে ছাউনী—(যেখানে সৈন্তরা থাকে তাহাই প্রকৃতরূপে ছাউনী নামের যোগ্য—কিন্তু ইংরেজটোলা মাত্রকেই ছাউনী বলা হইয়া থাকে)—সরকারী ইমারৎ, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের বাসগৃহ, সেনানিবাস, হাসপাতাল, কালেজ, অ্যাংলিক্যান ও প্রেসবিটিরীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের গির্জা। বড় বড় গাছের ছায়া-সমন্বিত রাস্তা। যুরোপ ও এশিয়ার বৃক্ষ-ভূষিত উদ্যান, রমণীয় বাগান-বাড়ী ;—অনেকগুলি তালায় বারণ্ডা ; সেই সব বারণ্ডা আতপ-তাপ হইতে সুরক্ষিত। সাদাসিধা ভাব, ইংরেজি সুখ-সুবিধা, একটু প্রাচ্যধরণের জাঁকজমক ; সহজ-যাপ্য জীবন ; অনেক ভৃত্য,—দাসবৎ পদানত ও আজ্ঞাবহ।

*

* *

দেশী সহর। বড় বড় রাস্তা;—ট্র্যামওয়ের দ্বারা কর্ত্তিত,—এই ট্র্যামওয়ে, খোলা-ময়দানে অবস্থিত যুরোপীয় সহরের সহিত দেশী সহরকে সংযুক্ত করিয়া দেয়। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর রাজপথ ; রং-করা কাঠের বাড়ী অথবা চুন-কাম করা মাটির বাড়ী,—তার নীচু চাল বা ছাদ ; অন্তঃপুরের জান্‌লা-বারণ্ডা ও গরাদে-দেওয়া জান্‌লা। যুরোপীয় ধরণে শিক্ষিত ধনী লোকদিগের সুরম্য গৃহ :—কলিকাতায় বাঙ্গালী জমিদার, বোম্বায়ে গুজরাটী ও পার্সী কুঠীওয়ালা ও বণিকবৃন্দ। চারিদিকেই বড় রাস্তার ভিতর সরু সরু অপরিচ্ছন্ন আঁকা-বাঁকা জটিল গলিঘুঁজি ; ইঁটের ছাদ-ওয়ালা মাটীর ঘর, চুন-কাম করা দরমার বেড়া। বেড়ার ভিতরে কলাগাছ, বাব্‌লা-গাছ, ডুমুর-গাছ। রাস্তার উপর জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত রহিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নিজ গৃহের দরজার সম্মুখে অথবা স্বকীয় উন্মুক্তদ্বার কুটীরের ভিতর কাজ করিতেছে। দাড়ি-কামানো হিন্দু ও লম্বা-দাড়ী মুসলমান ; রঙ্গীন শাড়ী-পরা রমণীগণ—তাহাদের জঙ্ঘা ও জানু অনাবৃত, একটা শাদা শাড়ী গায়ে জড়ানো ও তাহা কাঁধের উপর দিয়া গিয়াছে ;

নগ্নশিশু; কোথাও কোন শিল্পী চিকনের কাজ করিতেছে, কোথাও কুম্ভকার, কোথাও বা কাঠের খোদাইকার আপন আপন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ বা চাউল কুটিতেছে, কেহ বা ময়দা পিষিতেছে।

বাজারের চতুর্দ্দিকে রাস্তার ভীড়। সকল ছাঁচের সকল জাতীয় লোক, সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছদ। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গো মহিষের পাল। অনেক নগরেই প্রাচ্যদেশ-সুলভ প্রকৃত বাজার। বোম্বায়ে, কলিকাতায়, আবৃত হাট-বাজার; ভারতের সমস্ত ফল; জাহাজে আনীত সিংহল ও শিঙ্গাপুরের ফল; সমুদ্রের মৎস্য, গুগ্‌লী ও কচ্ছপ; মাংস, শিকার-পাখী, শাকসব্‌জি; গরম-মস্‌লা, আফিম।

বোম্বাই ও কলিকাতায় বন্দর; বড় বড় বাষ্পপোতের চারিপাশে দেশী নৌকার ভীড়; জাহাজ-ঘাটের উপর লোকের ঠেলাঠেলি; এদিকে এক প্রাচীরের আড়ালে, কোন ফেরীওয়ালা দোকানদার তাহার জিনিসের থলিয়া খুলিয়া বসিয়াছে; কোথাও এক মেয়ে-গণৎকার ভাগ্য গণনা করিতেছে; কোথাও সাপুড়িয়া তুবড়ী বাজাইতে বাজাইতে সাপের উপর একটা বেজি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে; সুন্দর গোখ্‌রো সাপ সোজা হইয়া উঠিয়াছে, তার লেজ কুণ্ডলী-পাকানো; গ্রীবাদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে—চ্যাপ্‌টা হইয়া গিয়াছে; তাহা হইতে একটি ছোট্ট মাথা বাহির হইয়াছে—দৃষ্টি স্থির।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলের-আল্‌পনা

পঁচিশ

পরের দিন সকালে জয়ন্ত বুকের উপরে দুইহাত রাখিয়া বিছানায় শুইয়া আছে—সূর্য্যের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে;—সে স্তব্ধ হইয়া সেই আলোকের তাপ আপন হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেছিল।

এমনসময় ভজহরি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "খোকন, ও-বাড়ীর জগৎবাবু তোমার সঙ্গে ছাখা করতে চাইচেন।"

জয়ন্ত ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "জগৎবাবু!"

জয়ন্তের মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া বলিল, "ইন্দু?"

"হুঁ। গাড়ী থেকে দেক্‌লুম জিনিষ-পত্তর্ সব নামানো হচ্চে—বোধহয় ওরা সবাই এক্ষুনি বিদেশ থেকে এল।"

চিন্তিত মুখে নীরস স্বরে জয়ন্ত বলিল, "ওঁদের ওপরে নিয়ে এস।"

একটু পরেই জগৎবাবুর পিছনে-পিছনে ইন্দু আসিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। জগৎবাবুর মুখ বিষন্ন, চোখ ছল্‌ছলে, ভাব-ভঙ্গি অপরাধীর মত সঙ্কুচিত। ইন্দুও অত্যন্ত জড়সড়—তাহার মাথাটি বুকের উপরে

জয়ন্ত দরজার দিকে অন্ধ চোখ তুলিয়া বলিল, "জগৎবাবু, নমস্কার!"

জয়ন্তের দিকে তাকাইয়াই জগৎবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—এই সেই জয়ন্ত, সেই হাস্যপ্রফুল্ল, গৌরকান্তি, পরমসুন্দর জয়ন্ত! মানুষের দেহ এত-শীঘ্র এমন বদ্‌লাইতে পারে? জগৎবাবুর পা-থেকে-মাথা-পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—তাঁহার মুখ একেবারে বোবা হইয়া গেল!

ইন্দুও বিবশ হইয়া গৃহতলে বসিয়া পড়িল—একবার দেখিয়াই ভয়ে শিহরিয়া, জয়ন্তের দিকে আর সে ভরসা করিয়া মুখ তুলিতে পারিল না!

জয়ন্ত শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "চুপ করে' কি দেখ্‌ছেন জগৎবাবু? এই জ্যান্ত মড়াটাকে দেখে কি আপনাদের ভয় হচ্ছে?"

জগৎবাবুর চমক্ ভাঙিল। পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া, জয়ন্তকে একেবারে আপন বুকের ভিতরে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া, হাহাকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, এ কী দেখ্‌তে এলুম জয়ন্ত, এ কী দেখ্‌তে এলুম!"

জগৎবাবুর সেই নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে জয়ন্ত চুপ-করিয়া পড়িয়া রহিল।—

অনেকক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া জয়ন্ত একটু সরিয়া বসিল।

জগৎবাবু কাতর স্বরে বলিলেন, "জয়ন্ত, আমার ওপরে রাগ কোরো না বাবা, আমি এই জোড়হাতে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি! তোমার নির্ম্মল চরিত্রে আমি সন্দেহ

তাড়িয়ে দিয়েছিলুম—এ মহাপাপ আজ আমাকে দণ্ডে-দণ্ডে মার্‌ছে, আমার দিন-রাতকে বিষময় করে' তুলেছে—আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর! ইন্দু, উঠে আয় মা, উঠে আয়—জয়ন্তের পায়ে ধরে বল্ তোর বুড়ো বাপকে ক্ষমা কর্‌তে!"

কিন্তু ইন্দুর তখন সাড়্ ছিল না—মৃত দেহের মত স্থির হইয়া, নিষ্পলক নেত্রে মাটির দিকে চাহিয়া সে তেম্‌নি ঠায় বসিয়াই রহিল।

মনের আবেগে জয়ন্ত ইন্দুর কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জগৎবাবুর মুখে ইন্দুর নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল! আপনার অন্ধ চক্ষুকে ঘরের চারিদিকে বুলাইয়া, অত্যন্ত অভিমানে ফুলিয়া-ফুলিয়া বলিল, "না, না, ইন্দুকে আর আস্‌তে হবে না! আপনার ভ্রম ভেঙেছে আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট! তবে, আজ না এসে আর কিছুদিন আগে যদি আস্‌তেন, তাহলে রোগের যাতনার ভেতরেও হয়ত আমি শান্তি পেতুম।"

এই সময়ে অবনী ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত নেত্রে সকলকার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "এই যে, আপনারা এসেছেন! আমি জানি, আপনারা আস্‌বেন!"

জগৎবাবু অবনীর দুইহাত ধরিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু, আপনার কাছে আমি চিরদিন কেনা হয়ে রইলুম। আপনি যদি চিঠি লিখে সমস্ত না প্রকাশ করে' দিতেন, তাহলে আমার বুক থেকে এক মহাপাপের বোঝা কোনদিনই হয়ত নাম্‌ত না—" থামিয়া,

"কিন্তু আর দু-দিন আগে যদি এ খবরটা পেতুম!"

অবনী বলিল, "তাহলে সত্যিই ভালো হ'ত জগৎবাবু!"

জয়ন্ত দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিল, "অবনী-বাবু আপনাকে কি খবর দিয়েছেন জগৎবাবু?"

—"অবনীবাবুর পত্রেই ত কাল আমরা জান্‌তে পারি, তুমি নিরপরাধ! স্বর্ণেন্দুর চক্রান্তের কথা তিনি সব প্রকাশ করে' দিয়েছেন। সেই পত্র পেয়েই আমরা কল্‌কাতায় ছুটে আস্‌ছি!"

জয়ন্ত একেবারে অবাক হইয়া গেল। পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পর্য্যন্ত এই অবনীকে সে প্রত্যহ তাহার কাছে-কাছে ছায়ার মত লাগিয়া থাকিতে দেখিয়াছে এবং ভজহরির মুখে এও শুনিয়াছে যে, অবনী নিজেই ভালো-ভালো ডাক্তার আনাইয়া, তাহার দেশে খবর দিয়া যাহাতে চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটি না-হয় সে-সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে। অবনী তাহার প্রতিবেশী হইলেও এর-আগে তাহার বাসায় বড়-একটা আসিত না; তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব বলিয়া কোন-কিছু ছিল না। বরং সে তাহার এক রকম শত্রু ছিল বলিলেই হয়। স্বর্ণেন্দুর সেই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের ভিতরে অবনীরও যে যোগ ছিল, জয়ন্তের এ বিশ্বাস আজ-পর্য্যন্ত অটল আছে। সুতরাং, অবনী যে কেন তাহার সঙ্গে হঠাৎ এতটা আত্মীয়তা করিতেছে, যাচিয়া উপকার করিতেছে, এর কোন হদিস্ না-পাইয়া জয়ন্ত মনে-মনে ভাবিত, সে বোধ কোন চাল্ চালিতে চায়! তবু এ সন্দেহ সে বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিত না—কারণ অবনীর চাল্‌চলনে পরের বিপদে সাহায্য করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কোন মন্দ অভিসন্ধি জয়ন্ত এখন-পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারে নাই!

কিন্তু আজ জগৎবাবুর কথা শুনিয়া জয়ন্তের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। এই অবনীকে সে বিশ্বাস না-করিয়া তাহার উপকারকে অপকার বলিয়া ভাবিয়াছে বলিয়া জয়ন্ত মনে-মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কৃতজ্ঞ স্বরে সে বলিল, "অবনীবাবু, আপনি জগৎবাবুকে চিঠি লিখে আমার যে উপকারটা কর্‌লেন, তার জন্যে—"

বাধা দিয়া অবনী বলিল, "তার জন্যে কি ভাষায় আমাকে ধন্যবাদ দেবেন, সেটা নিয়ে আপনাকে একটুও মাথা ঘামাতে হবে না জয়ন্তবাবু! আমি যা করেছি নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যেই করেছি। সত্যি কথা বল্‌তে দোষ নেই যে, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কিছুদিন আগে বিশেষ মধুর ছিল না। এমন অবস্থায় স্বর্ণেন্দুর দোষের জন্যে আমাকে দায়ী হ'তে হয়—কারণ, সে আমার অন্তরঙ্গ না-হ'লেও বাল্যবন্ধু, আমার সঙ্গেই সে ঘোরে-ফেরে, জগৎবাবুর বাড়ীতে যায়। আর, ঠিক বল্‌তে পারি না, তবে জয়ন্ত বাবুর মুখ দেখে আমার সন্দেহ হ'ত—তিনি যেন আমাকেই সন্দেহ করতেন!"

জয়ন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। কিন্তু সে-সব কথা আজ ভুলে যান—অসময়ে যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর চেয়ে

আনন্দে আপ্লুত হইয়া জয়ন্তের দুই কাঁধে দুই হাত রাখিয়া অবনী বলিয়া উঠিল, "তোমার ওপরে অনেক অবিচার করেছি জয়ন্ত, তার বদলে তুমি আমাকে যে বন্ধুত্ব আজ দান করলে, সে দান আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে নিলুম!"

এমনসময় ভজহরি ব্যাজার-মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনারা আমার খোকনকে একটু জিরুতে দিন,—ওর দেহের দশা দেখ্‌চেন না!"

জয়ন্ত বলিল, "ভজা, তোর কি এখনো বুদ্ধি হ'ল না! ভদ্রলোকদের—"

ভজহরি মুখভার করিয়া বলিল, "তুই থাম্ খোকন! ভজা বয়েসে তোর চেয়ে তিনগুণ বড়, আঁতুড়ঘরে তুই যখন ট্যাঁ করিস্-নি,ভজার বুদ্ধি আর মাতার চুল তকুনি পেকে উটেচে। ভজার বুদ্ধিতে চল্‌লে আজ তোর এ হাল হ'ত না। তোর অসুক্ বাড়্‌লে ভুগ্‌তে হবে ত আমাকেই!"—

অবনী হাসিয়া বলিল, "ভজহরি, তোমার কথাই ঠিক্, জয়ন্তবাবুকে এখনি এত বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়।"

ভজহরি যো পাইয়া বলিল, "বলুন ত বাবু, বলুন ত! শুন্‌লি খোকন? না, অ্যাখনো বল্‌বি ভজার মত অবনীবাবুরও বুদ্ধিসুদ্ধি কিচ্ছু নেই?"

জগৎবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ ভজহরি, জয়ন্তকে আজ আমরা আর বিরক্ত করব না। ইন্দু, এস!"

ইন্দু এতক্ষণ তেম্‌নি নীরবে বসিয়াছিল। পিতার আহ্বানে যেন হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নের মাঝখানে জাগিয়া, ধীরে-ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং করুণ নয়নে একবার জয়ন্তের দিকে চাহিয়া বিদ্রোহী পা-দুটোকে টানিয়া টানিয়া—যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত—ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

সন্ধ্যার অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে, ইন্দু আপন ঘরে একলাটি বসিয়া-বসিয়া কত-কি যে ভাবিতেছিল!

আজ সকালে যে দৃশ্য সে দেখিয়া আসিয়াছে, সারাদিন আর তা ভুলিতে পারে নাই; জয়ন্তের সেই দুটি দৃষ্টিশূন্য কাতর অন্ধ চক্ষু, দু-দুটো বিষধরের মত রহিয়া-রহিয়া তাহার মর্ম্মের মাঝে দংশন করিতেছে,—আর রুদ্ধ যাতনায় তাহার প্রাণ যেন বুকের মধ্যে ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছে।...... ...ইন্দু ভাবিতেছিল, এর আগে সেও যদি অন্ধ হইয়া যাইত, তবে এমন নিদারুণ দৃশ্য আর ত তাহাকে দেখিতে হইত না!

আরো ঢের কথা ইন্দুর মনের তটে স্রোতের মত আসিয়া আঘাত করিতেছিল। সকালে জয়ন্তবাবুর বাসায় সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময়ে একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হইয়াছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে মেয়েটিও মুখ বাড়াইয়া অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিল—তাহার চোখে যেন পলক পড়িতেছিল না। ইন্দু তাকে চেনে না—কখনো দেখেও নাই; কিন্তু সে যে কে, তা সে তখনি বুঝিতে পারিয়াছিল। জয়ন্ত বাবুর মুখে সে অনেকবার যার কথা শুনিয়াছে, এ নিশ্চয়ই সেই গৌরী!

তাহার ঘরের সাম্‌নেই রাস্তার ও-ধারে

জয়ন্তের বাসা। তাহার ঘর হইতে জয়ন্তের ঘরের ছোটখাট জিনিষটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। জান্‌লার পাল্লা ভেজাইয়া, খড়্‌খড়ির ফাঁকে চোখ রাখিয়া আজ সারাদিন সে বসিয়া আছে। সমস্ত দিন গৌরী জয়ন্তের শিয়রে বসিয়া জয়ন্তকে পাখার হাওয়া করিয়াছে, তাহার যখন যেটির দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে যোগাইয়া দিয়াছে।

ইন্দুর চোখের সুমুখে, তাহারি কর্ত্তব্য যেন গৌরী জোর-করিয়া কাড়িয়া লইতেছে! এ দৃশ্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠিলেও সে চোখ ফিরাইয়া মনকে বুঝাইতে পারে নাই! ....জয়ন্তের উপরে তাহার রাগ হইয়াছে, গৌরীর উপরে তাহার হিংসা হইয়াছে!

তারপরেই আবার বারবার মনে পড়িয়াছে, কাহারও উপরে রাগ, অভিমান, হিংসা করিবার তাহার আর কোন অধিকারই নাই! জয়ন্তের মনে আর কি তার একটু-খানিও ঠাঁই আছে? যে লোক সব ছাড়িয়া একদিন সুধু তাকেই আপন করিতে চাহিয়াছিল, জীবন-মৃত্যু যখন যুঝাযুঝি করিতেছে—সেই অসময়ে সে যে তার দিকে একবারও ফিরিয়া তাকায় নাই! এ নিষ্ঠুরতার কি ক্ষমা আছে?... ... ...

শেষ-ফাল্গুনের উদাসী বাতাস একটা গানের খানিকটা তাহার ঘরের ভিতরে বহিয়া আনিল।

সেই চির-চেনা স্বর ইন্দুর ভাবনা-বিভোর চিত্তকে আচম্বিতে সচেতন করিয়া তুলিল—

"... ...গেঁথেছ যে রাগিনী
একাকিনী দিনে দিনে,
আজিও যায় ব্যেপে
কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে,
গাঁথিতে যে আঁচলে
ছায়াতলে ফুলমালা,
তাহারি পরশন
হরষণ সুধাঢালা,
ফাগুন আজো যেরে
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,
আজিকে সবি ফাঁকি
সে কথা কি গেছ ভুলে?

একদা তুমি প্রিয়ে,
আমারি এ তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে
সে কথা যে গেছ ভুলে!
একদা তুমি প্রিয়ে........"

ইন্দুর সমস্ত দেহ যেন শ্রবণময় হইয়া উঠিল, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া আবেগভরে দুইচক্ষু মুদিয়া সে শুনিতে লাগিল,

"একদা তুমি প্রিয়ে—"

কে এ প্রিয়া?... ...এ কি, সে? তাকে কি এখনো তার মনে আছে—এ প্রিয়া কি বিস্মৃত প্রিয়া নয়?

ইন্দুর মুখের উপরে জাগ্রত ফাল্গুনের নন্দিত বাতাস উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া গেল, আর সেই স্মৃতি-জাগানো বাতাসের মোহন ছন্দের সঙ্গেই যেন তাল রাখিয়া অন্ধ জয়ন্ত গায়িতে লাগিল,

"ফাগুন আজো যেরে
খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে,
আজিকে সবি ফাঁকি
সে কথা কি গেছ ভুলে?"

এ কি অভিমানীর কাতর জিজ্ঞাসা, না, ব্যর্থ প্রেমের হতাশ তিরস্কার?........ইন্দু ত ভুলে নাই—ভুলিতে পারে না। স্মৃতির যে মালা সে গাঁথিয়াছে, সে যে প্রাণপণ যত্নে তাকে মর্ম্মের ভিতরে চাপিয়া আছে! পাছে শুকাইয়া যায় সেই ভয়ে ইন্দু যে অশ্রুধারায় সে স্মৃতিমাল্যকে স্নিগ্ধসজল করিয়া রাখিয়াছে!

ইন্দু কাঁদিতে-কাঁদিতে ব্যথিত চোখদুটি মেলিয়া দেখিল, জয়ন্ত তার ঘরের সাম্‌নের বারান্দায়, একলাটি চাঁদের আলোতে বসিয়া আপনমনে গান গাহিতেছে।

উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত ঘরের ভিতরে চাহিয়া দেখিল, গৌরী তখন সেখানে নাই।

সাতাশ

সেদিন বসন্তের হাওয়ায় জয়ন্তের মন হঠাৎ-কেমন উতল হইয়া উঠিল।

গৌরী যখন তাহাকে বারান্দায় বসাইয়া গৃহস্থালীর কাজে চলিয়া গেল, তখন চাঁদের আলো আসিয়া তাহার মুখ-চোখের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই আলোক-দূতের স্নিগ্ধ স্পর্শ পাইয়া, অভ্যাসমত সে আকাশের দিকে মুখ তুলিল—কিন্তু দেখিল সুধু নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! তখন মনে পড়িল তাহার এই জীবনব্যাপী নিবিড় তিমিরে চাঁদের ছবি আর-কখনো জাগিবে না!... ...ভবিষ্যতের যে আশার সাম্রাজ্য এতদিন সে মনে-মনে গড়িয়া তুলিয়াছিল—নিয়তির একটি আঘাতে আজ তাহা ভাঙিয়া চুর্‌মার হইয়া গিয়াছে,—কল্পনার সেই বিশাল ধ্বংসস্তূপে আজ তাহার জীবন্মৃত হৃদয় সুধু দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুজল আর হাহাকার সম্বল করিয়া পড়িয়া আছে!... ... তাহার স্মৃতির শ্মশানে আজ সমস্ত অতীত পুড়িয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে!

জয়ন্ত সকাতরে বলিয়া উঠিল, "ভগবান, চোখ কেড়ে নিলে, কিন্তু এ পোড়া চোখের জল ত তবু শুকল না—তোমার এ কি অবিচার!"

জয়ন্ত অনেকক্ষণ আপনাতে আপনি বিলীন হইয়া বসিয়া রহিল। কী যে ভাবিতেছিল, সেই-ই জানে!

ইন্দুদের বাগান হইতে কোকিল-পাপিয়ার মিলিত কণ্ঠে বাসন্ত-জ্যোৎস্নার বন্দনাগান ফুটিয়া উঠিল। মাঝে-মাঝে বাতাস জাগিয়া তাহার কাণেকাণে যেন নিষ্ঠুর কৌতুকে বারংবার বলিয়া যাইতে লাগিল, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ, তুমি অন্ধ!

... ...জয়ন্তের ক্ষুধিত অন্তরের ভিতর হইতে তাহার প্রেম-বেদনার ভাষা ধীরে-ধীরে প্রাণের আবেগে, গানের কথায় ফুটিয়া উঠিল,—

"একদা তুমি প্রিয়ে,—"

তাহার তৃষাতাপিত চিত্তের সমস্ত অতৃপ্তি আজ যেন এই রাগিনীকে সুরের একটা হাহাকারের মত করুণ করিয়া তুলিল!

একবার, দুইবার, তিনবার গাহিয়া জয়ন্ত আবার নীরব হইয়া বসিয়া রহিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ; হঠাৎ জয়ন্তের মনে হইল তাহার পাশেই যেন কাহার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে!

হাত বাড়াইতেই আর-একজনের নরম হাত তাহার হাতে ঠেকিল। জয়ন্ত বুঝিল এ গৌরী, তাহার গান শুনিয়া এখানে আসিয়াছে।

সে একটু লজ্জিত হইল। মনের আবেগে সে এ-বাড়ীতে গৌরীর অস্তিত্বের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল—নহিলে এ গানটা গৌরীর সাম্‌নে কখনোই গায়িত না। সঙ্গীতে তাহার হৃদয়ের যে প্রতিধ্বনি ছিল, তাহা শুনিয়া গৌরী নিশ্চয় কাতর হইয়াছে!

গৌরীর হাতখানি ধরিয়া জয়ন্ত অনুতাপ-ভরে মৃদুস্বরে ডাকিল, "গৌরী!"

সাড়া মিলিল না—তাহার হাতের ভিতরের হাতখানি যেন অসহায়-ভাবে আরো এলাইয়া পড়িল।

—"গৌরী, তোমার কাজ এরি-মধ্যে সারা হয়ে গেল?"

—"জয়ন্তবাবু, আমি গৌরী নই!"

—"ইন্দু! তুমি!"—সবিস্ময়ে এই কথা বলিয়া জয়ন্ত ইন্দুর হাত ছাড়িয়া দিল!

কোন কথা না বলিয়া জয়ন্তের পায়ের কাছে ইন্দু বসিয়া পড়িল।

বিস্ময়ের প্রথম বেগ্‌টা যখন কাটিয়া গেল, জয়ন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "ইন্দু, তুমি কখন্ এখানে এলে?"

ইন্দু আস্তে-আস্তে বলিল, "আপনার গান শুনে বাড়ীতে আর থাক্‌তে পার্‌লুম্ না।"

—"আমার গান এখনো কি তোমার ভালো লাগে ইন্দু?"

—"জয়ন্তবাবু, আপনার গান আমার ভালো লাগে না! আপনি এমন কথা কি-করে' বল্‌লেন!"

জয়ন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "এ জীবন যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল ইন্দু, কৈ, তখনো ত তুমি একটি ছত্র লিখে আমার খবরটা নেওয়াও দরকার মনে কর-নি! তাই ভেবেছিলুম, আমার কথা তুমি ভুলে গেছ!"

জয়ন্তের কথাগুলো শাণিত অস্ত্রের মত ইন্দুর প্রাণকে যেন ছিঁড়িয়া খান্ খান্ করিয়া দিল;—সে আঘাত কোনরকমে সহিয়া আহত কণ্ঠে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনার অসুখের খবর আমি পাই-নি। বাবা জান্‌তেন, কিন্তু আমার কষ্ট হবে ভেবে আপনার কথা আমাকে তিনি বলেন-নি!"

জয়ন্ত চুপ করিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে এসেছ আর কেউ কি দেখেছে?"—

—"আপনার চাকর দেখেছে।"

—"তবে আর কেউ দেখ্‌বার আগেই তুমি বাড়ী যাও। ভেবনা, আমি রাগ করে' এ-কথা বল্‌ছি। তোমাকে এখানে আর কেউ দেখ্‌তে পায়, এ আমার ইচ্ছা নয়!"

—"আর কেউটা কে জয়ন্তবাবু? আপনার গৌরী? কেন, তাঁকে আমার ভয় কি?"

জয়ন্ত বাধো-বাধো গলায় বলিল, "ভয়ের কথা বল্‌ছি না। কিন্তু—"

—"থাম্‌লেন কেন? বলুন!"

—"নিতান্তই শুন্‌বে ইন্দু? তোমাকে এখানে দেখ্‌লে গৌরী কিছু মনে কর্‌তে পারে!"

—"তিনি আর বেশী কি মনে কর্‌বেন? আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তিনি কি তা জানেন না?"

জয়ন্তের মাথা-হইতে-পা-পর্যন্ত চমকিয়া উঠিল। বিস্মিত স্বরে বলিল, "ইন্দু, এ কী বল্‌ছ!"

জয়ন্তের চমকিত বিস্মিত মুখের দিকে দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া, ইন্দু প্রশান্তভাবে অবিচল স্বরে বলিল, "আমি আপনাকে ছেড়ে যাব কেন? যাঁকে স্বামী বলে—"

বিবর্ণমুখে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া জয়ন্ত বলিল, "তুমি এখনো আমাকে বিবাহ করতে চাও!"

—"কেন চাইব-না জয়ন্তবাবু! আপনাকে ছাড়লে আমি দাঁড়াব কোথায়?"

—"ইন্দু, ইন্দু, তুমি কি ভুলে গেছ আমি অন্ধ, রোগে ক্ষতবিক্ষত—কুৎসিত?"

নারীর স্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া ইন্দুর মুখবন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু সে বুঝিল, আজ যদি সে নীরব হইয়া থাকে, তবে সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহাকে এই নীরবতার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতএব মনকে শক্ত করিয়া সে বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হবার পর আপনি যদি এমন হ'তেন, তাহলে আমি কি আপনাকে ত্যাগ করতে পারতুম?"

জয়ন্ত বলিল, "কিন্তু আমাদের বিবাহ ত হয়-নি! তখন তুমি বাধ্য হয়ে যা করতে—"

জয়ন্তকে মুখের কথা শেষ না-করিতে দিয়াই ইন্দু বলিল, "এখন স্বেচ্ছায় তাই করব! ছুটো মন্ত্র পড়া হয়-নি বলেই যে আমাদের বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাবছেন? আমাদের সাক্ষী যে অন্তর্যামী!"

—"তাই যদি হবে ইন্দু, তাহলে একটা তুচ্ছ অপবাদ শুনেই তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন? অপবাদে লোকে কি স্বামীকে ত্যাগ করে?"

ইন্দু বেদনাবদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বারবার আপনি খালি ঐ কথাই ভাবছেন! কিন্তু আমি যে স্বাধীন নই, আমার মাথার ওপরে যে বাবা আছেন, সেটা ত একবারও মনে করছেন না!"

—"কিন্তু তোমার বাবা যে অন্ধের হাতে তোমাকে দেবেন না, তুমিও ত সেটা ভাবছ না!"

—"অন্ধ! কী হয়েছে তাতে জয়ন্তবাবু? অন্ধ বলে বাবা আপনাকে ত্যাগ করবেন?—আমি কি বাবাকে চিনি না? এমন মানুষ তিনি নন!"

—"তুমি তোমার মনের কথা বলছ ইন্দু, —কিন্তু অন্ধের হাতে কন্যা-সম্প্রদান করতে যে কোন পিতাই সম্মত হবেন না!"

—"জয়ন্তবাবু, বিশ্বাস করুন, আপনি অন্ধ হয়েছেন বলে বাবার মত বদলায়-নি। আমি তা জানি।"

পৃথিবীতে ছুটি জিনিষকে ভোলা যায় না—প্রেম ও মৃত্যু! ইন্দুর কথায় তাই জয়ন্তের মনের বাঁধ একটু-একটু করিয়া ক্রমেই আলগা হইয়া আসিতেছিল—ইন্দুকে সে যে এখনো ভালোবাসে! কিন্তু যে গৌরী তাহার অসহায় রোগশয্যার পাশে বসিয়া দিবারাত্র অনাহারে-অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, প্রাণপণে যে তাহাকে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাকে আর ত সে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না! এ যে তাহার মহা কর্ত্তব্য! গৌরীর মুখ ভাবিয়া জয়ন্ত ইন্দুর আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিল। ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "ইন্দু, কেন তুমি আর-ছুদিন আগে আস-নি! মায়ের প্রাণে

ব্যথা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর হেতু হয়েছি, এখন যার দয়ায় প্রাণে বেঁচে আছি, সেই গৌরীকে ত্যাগ করে' আমি ত মনুষ্যত্ব হারাতে পার্‌ব না! সে মহাপাপ কর্‌লে আমার ইহকাল-পরকাল দুই যাবে। ইন্দু, তোমাকে আমি ভালোবাসি—চিরকাল ভালোবাস্‌ব—সেই ভালোবাসা সম্বল করে'ই আমাকে জীবন কাটাতে হবে—কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার মিলন অসম্ভব!"

শুনিতে-শুনিতে যাতনায় ইন্দুর কাণ যেন বধির হইয়া গেল;—মনের ব্যথা মনেই চাপিয়া রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও পারিল না—আপনার অজ্ঞাতসারেই সে হঠাৎ হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া জয়ন্তের দুই-পা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বলস্বরে বলিল, "ওগো, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না, আমাকে তুমি ত্যাগ কোরো না!"

প্রেম হচ্ছে বাতির শিখার মত; তখনি সে বেশী-করিয়া জ্বলিয়া উঠে, শেষমুহূর্ত্ত যখন কাছে ঘনাইয়া আসে।

ইন্দুর সেই ব্যাকুল আত্মনিবেদনে জয়ন্তের শিরায়-শিরায় তপ্ত রক্তপ্রবাহ উথলিয়া উঠিল,—তাহার সমস্ত চিত্ত একেবারে ইন্দুর বুকের উপরে গিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল!... ... ...কিন্তু জয়ন্ত প্রাণপণে আপনাকে আবার সাম্‌লাইয়া লইয়া, অতি কষ্টে অস্ফুট বিদীর্ণ স্বরে বলিল, "ইন্দু, তুমি বাড়ী যাও!"

ঝর-ঝর-ঝর অশ্রুজলে, জয়ন্তের দুই পা ইন্দু ভাসাইয়া দিল।... ...

জয়ন্ত তবু পাথরের দেবমূর্ত্তির মত অচল-অটল হইয়া বসিয়া রহিল—বসিয়াই রহিল!

আটাশ

বামুন লুচি বেলিতেছিল এবং গৌরী নিজের হাতে একে-একে সেগুলি ভাজিয়া তুলিতেছিল। বামুনের হাতে জয়ন্তকে খাওয়াইয়া গৌরীর মনের সাধ মিটিত না—রান্নাবান্নার ভার তাই সে আপন হাতে গ্রহণ করিয়াছিল।

ভজহরি আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। গৌরীর দিকে হাতের কলিকাটা আগাইয়া দিয়া বলিল, "দিদি গো, একটু তামুক্‌ খেতে বাসনা হয়েচে, ধাঁ-করে' একটুক্‌রো আগুন দাও-দিকি!"

আগুন দিয়া গৌরী বলিল, "ভজহরি, তুমি ওপরে বাবুর কাছে যাও, তিনি এক্‌লা আছেন।"

ভজহরি কলিকাতে ফুঁ দিতে-দিতে বলিল, "অ্যাক্‌লা থাক্‌বেন ক্যানো, ও-বাড়ীর সেই ঠাক্‌রোণটি যে এয়েচেন।"

চকিতে মুখ ফিরাইয়া গৌরী বলিল, "ও-বাড়ীর ঠাক্‌রুণটি আবার কে?"

—"ঐ যে গো, ইন্দু না বিন্দু—আমার বাছা অত নাম-টাম্‌ মুকস্ত টুকস্ত থাকে না! ঐযে খোকন যাকে বৌ কর্‌বে বলে ক্ষেপেচিল—বুঝেচ? তা দ্যাকো দিদিমণি, খোকনের তাকে পছন্দ হ'লে হ'বে কি, মেয়েটা বাপু হদ্দবেহায়া! এই দ্যাকনা, মাঝ-রাস্তা দিয়ে পায়ে জুতো পরে মদ্দের মত গট্‌মট্‌ কর্‌তে-কর্‌তে অ্যাক্‌লা আমাদের বাসায় এসে ঢুক্‌ল—যেন ভয়-ডর লজ্জা-সরম কাকে বলে জানে না। ও খেষ্টানি, বুঝেচ দিদিমণি, নিশ্চয় যীশু ভজে! ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লো না,

তাই রক্ষে—নৈলে ও খোকনের জাত্ না-মেরে ছাড়্‌ত না!”—আপনমনে ইন্দুর সম্বন্ধে তাহার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে-করিতে এবং কলিকায় ফুঁ দিতে-দিতে ভজহরি চলিয়া গেল।

গৌরী চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিল—শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া! ভজহরির শেষ-কথাগুলোর একটাও তাহার কাণে ঢুকে নাই।

বামুনঠাকুর বলিল, “মা-ঠাক্‌রোণ, কড়া যে জ্বলে যাচ্চে!”

তখন গৌরীর হুঁস্ হইল। তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করিয়া বাকি লুচিগুলো ভাজিয়া তুলিয়া সে বলিল, “ঠাকুর, লুচিগুলো চাপা দিয়ে তুমি একটু বোসো, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।”

গৌরীর মনে হঠাৎ একটা কৌতূহল জাগিয়া উঠিল—উপরের ঘরটা একবার উঁকি-মারিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য!

উপরে উঠিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া সে জয়ন্তের ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সেইখান হইতে দেখিতে পাইল, জয়ন্তকে সে যেখানে বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল ঠিক সেই জায়গাতেই সে বসিয়া আছে। তাহার পায়ের কাছে একটি রমণী-মূর্ত্তি—মুখখানি তার হেঁট-করা। চাঁদের আলোয় তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না—কিন্তু গৌরীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—কে সে!

গৌরী শুনিতে পাইল ইন্দু বলিতেছে—“দুটো মন্ত্র-পড়া হয়-নি বলেই যে আমাদের বিবাহ হয়-নি, কেন আপনি তা ভাব্‌ছেন? আমাদের সাক্ষী যে অন্তর্যামী!”

—শুনিয়াই গৌরীর হৃৎপিণ্ডটা বুকের মাঝে দোল্ খাইয়া দুপ্‌দুপ্ করিয়া উঠিল!… …

তারপরেই জয়ন্ত কথা কহিল। জয়ন্তের কথা শুনিয়া গৌরীর আবার আশা হইল,—অত্যন্ত আগ্রহভরে সেইখানে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া সে দুজনের কথা শুনিতে লাগিল।

কিন্তু, ইন্দুর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলেও, জয়ন্ত কাতর স্বরে যে কথাগুলি বলিল, তাহা শুনিয়া গৌরীর মনে হইল, কে-যেন তাহার কাণের ভিতরে হুড়্‌হুড়্ করিয়া দ্রবীভূত অগ্নির ধারা ঢালিয়া দিল। আদালতে দাঁড়াইয়া আসামী যখন বিচারকের মুখ হইতে ফাঁসীর হুকুম শোনে,—গৌরীর অবস্থা তখন ঠিক সেইরকম!

এক-মুহূর্ত্তের মধ্যে গৌরী বুঝিতে পারিল, জয়ন্ত তাহাকে গ্রহণ করিবে শুধু কর্ত্তব্যের দায়ে বাধ্য হইয়া,—জয়ন্তের প্রাণ তাহার প্রতি একান্ত বিমুখ!… …সে যদি জয়ন্তকে বিবাহ করে, তাহাহইলে অন্ধ জয়ন্তের নিরানন্দ জীবন চিরদিন ব্যর্থপ্রেমের হতাশ হাহাকারে ভরিয়া থাকিবে—তাহার বাহিরের দেহ এবং ভিতরের মন দুইই একসঙ্গে সমান-অসার্থক হইয়া যাইবে!… … …

গৌরী দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অপার ভাবনা ভাবিতে লাগিল।

ওদিকে জয়ন্তের পায়ে পড়িয়া অভাগী ইন্দু অনেকক্ষণ নীরবে চোখের জল ফেলিল, কিন্তু জয়ন্তের কঠোর মৌনব্রত কিছুতেই আর ভঙ্গ করিতে পরিল না; দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া অভিভূতের মত বসিয়া, জয়ন্ত আপনার বুকের তুফান বুকের ভিতরেই

চাপিয়া রাখিল। ইন্দুর চোখের প্রতি অশ্রুবিন্দু তাহার পায়ের উপরে পড়িতেছে, আর জয়ন্তের মনে হইতেছে, তাহার কঙ্কাল হইতে যেন এক-একখানা হাড় খসিয়া-খসিয়া সেই অশ্রুসাগরে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে!

অবশেষে ইন্দু বারান্দার রেলিং ধরিয়া, আপনার অবশ দেহটাকে কোনমতে টানিয়া দাঁড় করাইল। তারপর আস্তে-আস্তে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনি নিয়তির চেয়েও নিষ্ঠুর! আপনি ভালো থাকুন সুখে থাকুন—এই আমার শেষ-কামনা।"

জয়ন্ত তেম্‌নি মূক হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

নয়নাগ্রে সমস্ত প্রাণ একাগ্র করিয়া, জয়ন্তের দিকে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ইন্দু ধীরে-ধীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে দেখাইতেছিল ঠিক যেন একখানি জীবন্ত বিষাদ-প্রতিমার মত!

তাহার পদশব্দে জয়ন্ত চমকিয়া মুখ তুলিল—পাগলের মত সাম্‌নে দুইহাত বাড়াইয়া, ক্রন্দনভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ইন্দু, ইন্দু!"

ইন্দু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—"তোমার চোখের জল আমার পা থেকে ইহজীবনে আর শুকবে না—ইন্দু, এ অভাগাকে ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো!"

ইন্দু কলের পুতুলের মত দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

জয়ন্ত আবার বলিয়া উঠিল, "যেওনা ইন্দু, যেওনা—যেওনা!"

ইন্দু আবার দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন জয়ন্তবাবু!"

—"না, না, কিছু বল্‌ছিনা,—তুমি যাও, তুমি যাও"—বলিতে-বলিতে জয়ন্ত মূর্চ্ছিতের মত টলিয়া মাটির উপরে হেলিয়া পড়িল।

সে পতনশব্দ শুনিয়া ইন্দু ও তাহার পিছনে-পিছনে গৌরী তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া আসিল।

গৌরীকে দেখিয়াই ইন্দুর মুখ শুকাইয়া পাঙাশ হইয়া গেল—থতমত খাইয়া পায়ে পা বাধিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

গৌরী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না—একেবারে জয়ন্তের পাশে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু গৌরী কোন সাহায্য করিবার আগেই জয়ন্ত দুইহাতে ভর্ দিয়া আবার উঠিয়া বসিল।

গৌরী তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কোথায় লেগেছে?"

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "গৌরী! তুমি কোত্থেকে এলে?"

গৌরীর মুখে মিথ্যা কথা বাধিয়া গেল। ইতস্তত করিয়া বলিল, "আমি এইখানেই ছিলুম।"

—"এইখানে ছিলে! কতক্ষণ?"

—"এই খানিকক্ষণ।"

—"ইন্দু—ইন্দুকে—"

—"হ্যাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি!—" ফিরিয়া ইন্দুর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া গৌরী আবার বলিল, "এই যে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

—"ইন্দু! ইন্দু এখনো আছে!"

—"তোমার কোথায় লেগেছে বল-না?"

—"কোথাও লাগে-নি, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যাওয়াতে পড়ে গিয়েছিলুম।...অনেক রাত হ'ল ইন্দু, এবার তুমি বাড়ী যাও!"

ইন্দু দরজার দিকে ফিরিতে-না-ফিরিতে গৌরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল। কোমল স্বরে বলিল, "তুমি কোথা যাও বোন্!"

ইন্দু অবাক হইয়া গৌরীর মুখের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

গৌরী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "উনি যেতে বল্‌ছেন বলেই অম্‌নি তুমি চল্‌লে দিদি? এত সহজে কি নিজের পাওনা ছাড়তে আছে ভাই! যা আদায় কর্‌তে এসেছ জোর করে' তা আদায় করে' নিয়ে যাও!"

আরো-বেশী ব্যস্ত হইয়া জয়ন্ত বলিল, "ইন্দুকে যেতে দাও গৌরী, রাত হয়ে যাচ্ছে যে!"

সে কথায় কাণ না-দিয়া ইন্দুকে জোর-করিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া গৌরী বলিল, "যে সংসারে আর দুদিন পরে তুমি ঘরের লক্ষ্মী হয়ে বস্‌বে, এরি-মধ্যে সেখান থেকে পালাই-পালাই কর্‌লে চল্‌বে কেন?"

ইন্দু হতভম্ব হইয়া মাথা তুলিল, এ নির্দ্দয়া কি তাহার দুঃখে বিদ্রূপ করিতেছে?

জয়ন্ত বুঝিল, গৌরী সব দেখিয়াছে. সব শুনিয়াছে! মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া সে বলিল, "গৌরী, যা তা কী বল্‌ছ?"

গৌরী ধীর শান্ত স্বরে বলিল, "যা তা কিছুই বল্‌ছি না।"

—"গৌরী!"

—"না, তুমি আমাকে বাধা দিও না। তোমাকে এঁর হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে দেশে ফিরে যাব!"

—"দেশে ফিরে যাবে?"

—"হ্যাঁ, দেশে।"

—"আমি ত সে কথা বল্‌ছি না গৌরী! তুমি দেশে ফিরে যাবে কেন?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া গৌরীর কান্না আসিতেছিল,—কোনক্রমে অশ্রুর বেগ্ সাম্‌লাইয়া সে বলিল, "আমার ত আর-কোথাও ঠাঁই নেই!"

—"গৌরী, তুমি কি আমাকে কষ্ট দিতে চাও?"

—"না, তোমার কষ্ট হবার ভয়েই আমি দেশে ফিরে যাব!......চোখ হারিয়ে তুমি যে-যন্ত্রণা দিন-রাত ভোগ কর্‌ছ, তার ওপরে যদি আবার মনের সুখও হারাও, তবে তুমি বাঁচ্‌বে কেমন করে'?" বলিতে-বলিতে দুঃখের আবেগে গৌরীর গলা ধরিয়া আসিল; একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তোমার চেয়ে আপনজন আমার কেউ নেই গো, কেউ নেই! কিন্তু নিজের সুখের জন্যে আমি যদি তোমার দরদ না-বুঝি তাহলে আমিও মর্‌ব, তোমাকেও মার্‌ব! আমার কাছে তুমি কিছু লুকিও না—আমি তোমার মন জানি! তুমি ত আমাকে ত্যাগ কর্‌ছ না—আমিই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি, এতে তোমার আর দোষ কি বল? আমি যখন মন স্থির করেছি, তখন তোমার কোন বাধাই আর মান্‌ব না!——"

গৌরী হঠাৎ থামিয়া, জয়ন্তের একখানি

হাত ধরিয়া, ইন্দুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "দিদি, তোমার হাতখানি দাও ত!"

ইন্দু আচ্ছন্নের মত আস্তে-আস্তে একখানি হাত বাড়াইয়া দিল।

ইন্দুর হাতে জয়ন্তের হাত রাখিয়া, গৌরী অনিমেষ নয়নে বাহিরের আকাশ-ভরা চাঁদের আলোর দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রান্তের মত দেয়ালের উপরে হেলিয়া পড়িয়া, কেমন ধুঁকিতে-ধুঁকিতে জয়ন্ত বলিল, "আমার জন্যে তোমারও চোখে জল পড়্‌বে? এম্‌নি পাষণ্ড আমি,—যার কাছে যাব তাকেই কাঁদাব!"

জয়ন্তের নিষ্প্রভ মুখের উপরে প্রশান্ত দৃষ্টি রাখিয়া পরিষ্কার স্বরে গৌরী বলিল, "কৈ, আমার চোখে জল কৈ? চোখের জল ফেলে আমি তোমার অকল্যাণ কর্‌ব? এমন কথা মনের কোণেও ঠাঁই দিও না! যতদিন বাঁচ্‌ব দেবতার কাছে প্রার্থনা কর্‌ব, তোমাদের যাতে মঙ্গল হয়।"—একটি করুণ অথচ সুন্দর শুভ্র হাসির সঙ্গে মনের সমস্ত মালিন্য বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুর দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে গৌরী বলিল, "একটু বোসো ভাই, অনেক কথা আছে! ওঁর খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এইবেলা নিয়ে আসি!"……এই-বলিয়া, চোখদুটি নামাইয়া, ক্ষণকাল আনমনে দাঁড়াইয়া রহিল—ঠিক যেন সন্ধ্যা-বেলার ঝরাফুলের একটি এলানো পাপ্‌ড়ির মত;—তারপরেই সে চকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

স্বরলিপি

মিশ্র-বাহার—কাশ্মিরী খেম্‌টা।

আমার গীতি-কুসুম, প্রীতি-পবনে, গন্ধে-বরণে ফুটেছে হৃদয়-মাঝ!
এসহে মম বসন্ত-কুঞ্জে, ওহে রাজরাজ।
আমি ছন্দে গাঁথিয়া বাণীর মালা,
সাজায়ে রেখেছি ডালা, পরাব তোমার গলে হে;—
আমার ছুটেছে সব সঙ্কোচ-মোহ টুটেছে সরম লাজ!
আমি নব নব সুরে রচিয়া গান
বীণায় তুলেছি তান, তোমারে শুনাব বলে হে;—
তুমি হইবে তাহে সুপ্রসন্ন, যশঃ-গৌরবে মানিব ধন্য,
চরম আশা হইবে পূর্ণ, পরমানন্দ পুণ্য, বহিবে মরম-তলে হে,—
এসহে এস মনের দেবতা, নিরাশ কোরোনা আজ॥

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

না না II {র্সা –া না। র্সা র্সা র্সার্র। ণা –ধণা পা।

আ মার {গী ০ তি কু সু ম০ শ্রী ০০ তি

পা পা পাধ I মপা –ধা পা। মা পা মজ্ঞা I মা ধা ধা।

প ব নে গ০ ০ ন্ধে ব র ণে০ ফু টে ছে

। ধা ধা না I (নর্সা –র্রর্সা –নর্সা। –া ধা না)} I নর্সা –র্রর্সা –নর্সা। II

হৃ দ য় (মাঝ্ ০০ ০০ ০ আ মার্)} মাঝ্ ০০ ০০

। –ণা –ধা –া I ণা ধণা পা। মা মা পা I মজ্ঞা –রজ্ঞা মা।

০ ০ ০ এ স০ হে ম ম ব স০ ০০ ন্ত

। রা –া সা। সা সা –মা। মা –া জ্ঞা I মরা –া –সা। –া "না না" II

কু ০ ঞ্জে ও হে ০ রা ০ জ রাজ্ ০ ০ ০ আ মার

II –া ধা ধা I {না –া র্সা। র্সা র্সা র্সা I

০ আ মি {ছ ০ ন্দে গাঁ থি য়া

I র্সা র্সা না। র্সা –া র্সা I না র্রা র্সা। র্রা র্রা র্সা।

বা ণী র মা ০ লা * সা জা য়ে রে খে ছি

I নর্সা –র্রা –র্সা। র্সা –ণা –ধা } । ণা ধণা পা। মা গা মা I

ডা০ ০ ০ লা ০ ০ } প রা০ ব তো মা র

I পা না র্সা। –র্রর্সা ণধা ণা I র্সা র্মজ্ঞা জ্ঞা। –া জ্ঞা জ্ঞা।

গ লে ছে ০০ আ০ মার্ ছু টে০ ছে ০ স ব

I র্মা –া জ্ঞর্রা। র্রা র্সা র্সা I না র্সা র্সা।

সং ০ কো০ চ মো হ টু টে ছে

I র্সা র্রা র্সা I নর্সা –র্রর্সা –ণর্সা। –ণধা "না না" II

স র ম লাজ্ ০০ ০০ ০০ আ মার্

II –া সা সা I {সা মা মা । মা মা . মা I মা পা মা ।
০ আ মি {ন ব ন ব সু রে র চি য়া

। পমা –জ্ঞা –া I মা মধা –া । ধা ধা ণা I পর্সা –নর্সা –ণধা ।
গান্ ০ ০ বী ণায়্ ০ তু লে ছি তান্ ০০ ০০

। ধা ণা পা I মা জ্ঞা মা । রা –া জ্ঞা I সা সা সা } ।
তো মা রে শু না ব ব ০ লে (হে আ মি)}

I সা –া –া । –া ধা না I {না র্সা না । র্সা –া র্সা ।
হে ০ ০ ০ তু মি {হ ই বে তা ০ হে

I র্সা –া না । র্সা –া র্সা I না র্রর্সা র্রা ।
সু ০ প্র স ০ ন্ন য শঃ গৌ

। –র্জ্ঞা র্রা র্সা I না র্সর্রা র্সা । ণা –া ধা } ।
০ র বে মা নিং ব ধ ০ ন্য }

I র্সা র্সা র্সা । ণা ধা ণা I র্সা র্মা র্জ্ঞা । র্রা –া র্সা ।
চ র ম আ ০ শা হ ই বে পূ ০ র্ণ

I মা মা মা । পা –া পা I র্সা ণা –া । র্সা –া –া ।
প র মা ন ০ ন্দ পু ০ ০ ণ্য ০ ০

I র্সা র্রা র্সা । ণা ধা ণা I পা র্সনা র্সা । –ণা –ধা –া ।
ব হি বে ম র ম ত লে হে ০ ০ ০

I র্সা র্সা ণা । –ধা ধা ণা I র্সা র্মজ্ঞা র্রজ্ঞা । র্রজ্ঞা র্রজ্ঞা র্মা ।
এ স হে ০ এ স ম নে র দে ব তা

I র্রা র্রা র্জ্ঞা । র্রা র্সা র্সা I পার্সা –র্রর্সা –নার্সা ।
নি রা শ কো রো না আজ্ ০০ ০০

। –ণধা "ধা ণা" II II
০০ আ মার্

(১৫)

প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসব দর্শন শচীন্দ্রের ভাগ্যেও ঘটিয়া গেল। জন্মাষ্টমীর ছুটি উপলক্ষে বিজনকুমারের অতিথিরূপে সে সময়ে সে বিষাদপুরেই বাস করিতেছিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হাসি ধরিয়া পড়িল "দাদা, কি দেখে এলে গল্প কর না? কাগজে ত পড়লুম খুব সেখানে ঘটা হয়ে গেছে।"

হাসি অপেক্ষা শচীন বয়সে বৎসর দুই মাত্র বড়। ছেলেবেলা ৬।৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একত্র খেলাধূলা করিয়াছে এক পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছে; কিন্তু যখন হইতে রীতিমত ভাবে শচীনের পাঠ্য জীবন আরম্ভ হইয়াছে, স্কুলের ছেলেদের সহিত ভাবটা জমিয়া উঠিয়াছে, তখন হইতে হাসিকে সে বেশ-একটু খাট নজরে দেখে, মস্ত মুরুব্বিয়ানা চালে চলিয়া—দরকারে অ-দরকারে পদে পদে জানান্ দেয় যে, সে তাহার শ্রদ্ধা-ভাজন দাদা—বয়স্য বন্ধু নহে। হাসি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই—বিশেষত যদি সে কথা তাহার স্কুল বা বন্ধু-বান্ধব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হয়—তাহা হইলেই ধমক দিয়া বলিয়া উঠে, —"তোর সে খবরে কাজ কি?" হাসির এমন রাগ ধরে! সেদিন পর্য্যন্ত দুজনে মায়ের কোল অধিকার করিবার জন্য ঝগড়া করিয়াছে, রূপকথা শুনিবার জন্য দিদিমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, বাবার দুই হাত দুজনে অধিকার করিয়া লইয়া দুপাশে চলিতে চলিতে নিজের গল্পের স্রোতে অন্যের মুখ বন্ধের চেষ্টা করিয়াছে। বাগানে ফুল তুলিয়াছে, তারা গণিয়াছে, পরস্পরকে হারাইবার অভিপ্রায়ে কবিতা মুখস্থ করিয়াছে। আর আজ হঠাৎ দাদা যে কি করিয়া এতটা বাড়িয়া উঠিল—সে তাহা বুঝিতেই পারে না। দেহায়তনে শচীন চিরদিনই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং দাদার শরীরের বাড়টা হাসির নজরে পড়ে না,—মুখের নবীন গোঁপ-দাড়ির রেখাকেই সে ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া মনে ঠাওরাইয়া লইয়া রাগ করিতে করিতেও হাসিয়া বলে—"ইস্, ভারী যে মুরুব্বি-আনা,—তবু ত এখনো শর-দার মত গোঁপ দাড়ি হয়নি!" শর-দা এ সম্বন্ধে বুঝি তাহার আদর্শ পুরুষ! একদিন দেখা গেল,—এই সামান্য শ্মশ্রুরেখাও শচীনের বালক-বদন হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে,—সম্ভবতঃ হাসির—হাসির জ্বালাতেই ইহার উপর সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তবুও ত তাহার হাসি শচীন থামাইতে পারিল না। দাদার শ্মশ্রুহীন চেহারা দেখিয়া আরো বেশী করিয়া হাসিয়া হাসি বলিল—"বেশ হয়েছে দাদা! দেখ ভাই একবার আয়না দিয়ে নিজের মুখখানা। ঠিক আমার মতই তোমার মেয়েলি চেহারা হয়েছে! বিজনদাও এইরূপ কামায়—না?"

শচীনের অসহ্য হইল, সে রাগিয়া মুখ গোম্‌সা করিয়া চলিয়া গেল।

আজ মা গিয়াছেন নিমন্ত্রণে, দাদার সান্ধ্য ভোজনের সময় পরিবেষন করিতেছিল হাসি। সে যে চুপ করিয়া বসিয়া তাহাকে খাওয়াইবে—এমন প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—আজ হাসির প্রশ্নে শচীন ধমক দিয়া উঠিয়া তাহাকে নিরুত্তর করিল না—। প্রসাদপুরের উৎসব-দৃশ্যের তরঙ্গিত স্মৃতি, তাহার মুরুব্বিয়ানার বাঁধ ঠেলিয়া আজ উপরে উঠিতে চাহে, সে তাহা রোধ করিতে অসমর্থ। তাই প্রসন্ন-ভাবেই কহিল—

"শুধু একটি জিনিষ দেখলুম।"

"কি জিনিষ ?"

"প্রসাদপুরের রাজকুমারীকে !"

হাসি আগ্রহে বলিয়া উঠিল—"দেখেছ তাঁকে ? আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করে। শুনেছি খুব সুন্দরী তিনি ?"

"সুন্দরী ! অতুলনীয়া তিনি। শুধু রূপে না গুণেও। আমাদের দেশে এমন মেয়ে আছে তা না দেখলে মনেই করা যায় না !"

হাসি হাসিতে লাগিল। কথায় কথায় এরূপ অকারণ হাসি শচীনের কখনই ভাল লাগে না। সে রাগ করিয়া বলিল—"তুই কেবল হাসতেই জানিস্! তাঁর গুণের যদি একটি কাণাকড়াও পেতিস ! জানিস তোর চেয়েও বয়সে রাজকুমারী ছোট কিন্তু অত-বড় একটা ব্যায়াম-সমিতি তিনিই গড়ে তুলেছেন। আর ছেলেরা সৈনিকের মত উৎসাহে তাঁর ইঙ্গিতে অস্ত্র-চালনা করছে !"

বিস্ময়ে হাসির হাসি থামিয়া গেল ;—বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, "সত্যি নাকি ?"

"সত্যি না ত কি মিথ্যা বলছি ? প্রসাদপুর

যেন একটা সেনানিবাস, আর সেই ছোট্ট বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ী সেখানে সেনাপতি !"

হাসি বলিল"—শর-দাও ত সেখানে আছেন ? তিনিও বোধ হয় একজন সেনা হয়েছেন ? দেখা হোল তাঁর সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ আমি দেখেছি তাঁকে,—কিন্তু তিনি আমাকে দেখেননি !"

"তোমাকে দেখেন নি ?"

"কি করে দেখবেন ? তিনি যে আজ কাল মস্ত লোক ? আমার মত লোক তাঁর নজরে পড়ে কি এখন ?"

শরৎ শচীনকে দেখেন নাই সত্য—কিন্তু অপরাধটা তাঁর নহে শচীনেরই। শরদার ঋণটা যে এখনো শোধ দেওয়া হয় নাই, একথা শচীন ভোলে নাই। এই লজ্জায় সে নিজেই শরৎকে এড়াইয়া চলিয়াছিল, এমন কি সেই জন্য সে বিজনের পাশে মঞ্চেও বসে নাই।

দাদার কথার উত্তরে হাসি যেন তাহার প্রতিধ্বনির মতই বলিল—"মস্ত লোক !"

"হাগো হ্যাঁ। রাজকুমারী যে তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন !"

"রাজকুমারী তাঁকে মালা দিয়েছেন ? তিনি কি স্বয়ম্বরা হলেন নাকি ? সেইজন্যেই কি প্রসাদপুরের এ উৎসব ?"

শচীন অধীর চিত্তে কহিল "থাম্‌বি একটু ! এইজন্যেই ত তোকে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না। একটা কথা শুনতে শুনতে দশটা কথা তোর মুখ দিয়ে ছোটে ! জানিস্ ওটা ভারী বদ-এটিকেট।"

"আচ্ছা আচ্ছা, বল বল, আমি আর কথা বলব না।"

"বিজনদাতে শরদাতে গৎকা খেলা হোল, শরদা জিত্‌লেন, তাই রাজকুমারী তাঁকে মাল্যোপহার দিয়েছেন।" হাসি আহ্লাদে করতালি দিয়া উঠিল "শরদা জিতেছেন!"

"অত আহ্লাদের আমিত কোন কারণ দেখিনে। বিজনদাই আসলে best player, কিন্তু এর মধ্যে শরদা একটু কারচুপি খেলে-ছিলেন। ধারাল শিংটা নিজে বেছে নিয়ে ভোঁতা শিংখানা বিজনদাদাকে দিয়েছিলেন।"

বলা বাহুল্য বিজনের দল এইরূপ রটনা করিয়াছিল। হাসি রাগিয়া গেল, বলিল "কক্ষণো না। শরদা কখনোই এমন অন্যায় করবেন না, আমি তাঁকে বেশ জানি।"

"তুই ত সব জানিস!"

"নিশ্চয় জানি!"

"বেশ, জানিস্ ত জানিস্, শরদা এখন আর আমাদের বন্ধু নেই এটাও জেনে রাখ্। শুন্‌লি ত রাজকুমারী তাঁর গলায় মালা দিয়েছেন।"

শচীন ভগিনীর মুখ বন্ধ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এইরূপ খোঁচা দিল। হাসি নীরব হইয়া গেল, শচীন তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া, চটিজুতার ভিতরে আধখানা, বাহিরে আধখানা পা রাখিয়া জুতাজোড়ার সহিত পাজোড়া টানিতে টানিতে হাত ধুইবার অভিপ্রায়ে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাসী ঘটি-গামছা লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল; তাহার হাত হইতে ঘটিটা কাড়িয়া লইয়া দুই-একটা কুলকুচা করিয়াই চটপট গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজকুমারীর গুণের কথা শুনিয়া হাসির হৃদয় শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; ঘরে আসিয়া হৃদয়ের উথলিত সেই শ্রদ্ধানুরাগে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিল। চিঠিখানি খামে বন্ধ করিয়া তাহার মনে হইল, রাজকুমারীর ঠিকানা ত তাহার জানা নাই! শুধু প্রসাদপুর ঠিকানায় পাঠাইলেই কি তাঁহার হাতে পৌঁছিবে? না দাদার নিকট ঠিকানাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইতে হইবে? কিন্তু তাহা হইলেই ত দাদা কারণটা ধরিয়া ফেলিবে? তাঁহাকে কথাটা জানাইতেও ত ইচ্ছা করে না! সমস্যায় পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে সে গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শচীনের বিদায়-দিনের কথা মনে পড়িল। আজ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। সেদিনের মত জ্যোৎস্নাধারায় চারিদিক হাস্যোজ্জ্বল নহে। অবসর পাইয়া আজ আকাশের স্থানে স্থানে তারকারাশি গুচ্ছে গুচ্ছে দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল,—কোন কোন গুচ্ছস্থিত এক-একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র দীপ্ত মহিমায় অন্য সকলকে হীন-প্রভ করিয়া চন্দ্রের স্থল আজ অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

পশ্চিম দিকে জ্বলিতেছিল শুক্রতারা; মাথার উপর জ্বলিতেছেন, বৃহস্পতি; কিন্তু হাসি উত্তরমুখে দাঁড়াইয়া খুঁজিতেছিল সপ্তর্ষিকে। কিন্তু এই সাতটি তারা যে এলোমেলো ভাবে কোথায় এখন হারাইয়া পড়িয়াছে হাসি তাহাদের সঙ্কেতে ধ্রুব-তারাটির নির্দ্দেশ পাইল না। আকাশ হইতে বাগানের দিকে তখন সে দৃষ্টিপাত করিল,—গাছপালার মধ্যে শতসহস্র জোনাকি পোকা একইসঙ্গে তাহার নয়নে জ্বলিয়া উঠিয়া আবার মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। —হাস্নুহানার গন্ধরাশি—তাহার নাসিকার

উপর প্রবল তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেদিনও এই গন্ধে দিক ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত যে সঙ্গীত-ধারা উথলিয়া উঠিয়াছিল আজ তাহা নীরব। সইসের বোন—জোয়ানীর অনেক দিন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর শরদা? তিনি এখন কোথায়? সম্ভবতঃ রাজকুমারীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—প্রেম-সম্ভাষণ করিতেছেন। দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার নয়নে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়া ক্রমশ কপোল বাহিয়া নীচে পড়িল।—কেন? হাসি ত তাঁহাকে ভালবাসে না, তাঁহার প্রেম ত সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—তবে?

ভালবাসে না—ইহাই কি ঠিক? না—সে ভালবাসে,—কিন্তু সে ভালাবাসা ত তার প্রেম নয়, তাহা সখ্যতা, তাহা শ্রদ্ধা, তাহা মহৎ হৃদয়ের প্রতি আকর্ষণ। যদি সে মাতার মনের ভাব না জানিত, সম্ভবতঃ এই সখ্যতা এই শ্রদ্ধা কোন দিন প্রেমে পরিণত হইতে পারিত, কিন্তু মাতৃ-ইচ্ছার মধ্যে সে আত্মবিলুপ্ত করিয়া দিয়া চিরদিনই শরৎকুমার হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়াছে, এবং চিরদিনই রাখিবে—তবে? তবুত অধিকার বলিয়া একটা জিনিষ আছে! চিরদিন যাহাকে আপনার বলিয়া জানে—সে আজ পরের হইয়া গেল—একবিন্দু অশ্রুও কি সেজন্য পড়িবে না!

দাদার নিকট আর তাহার রাজকুমারীর ঠিকানা জানিয়া লইতে হইল না।

মাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া কুন্দবালা প্রসাদপুরের ব্যায়াম-উৎসবের পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়াছিল। মাতা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এখন সে প্রসাদপুরে ফিরিয়া যাইবে। যাইবার আগে সে হাসিকে দেখিতে আসিল। হাসি ও কুন্দ দুজনেই বেথুন স্কুলের ছাত্রী। ছোট্ট মেয়েটি হাসি প্রথম যেদিন হাস্যপ্রফুল্ল মুখে স্কুলে দৈনিক ছাত্রীরূপে ভর্ত্তি হইয়াছিল সেইদিন হইতে সেখানকার উচ্চ শ্রেণীর বোর্ডার—বালিকা কুন্দের হৃদয় অনেকখানি সে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। যতদিন হাসি স্কুলে ছিল কুন্দ বালিকাকে তাহার স্নেহাঞ্চল ছায়াতলে রক্ষা করিত। স্কুল ছাড়িবার পরেও উভয়ের মধ্যে এই ভালবাসার বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। কুন্দ প্রসাদপুরে কাজ লইয়া পর্য্যন্ত তাহারা একটু দূরে পড়িয়াছে সত্য, দেখা শুনাও নাই, চিঠিপত্র লেখাও একরকম বন্ধ; তথাপি কলিকাতা আসিলেই কুন্দ একবার হাসিকে দেখিতে আসিতে ভোলে না। দৈববশত ঠিক পরদিনই কুন্দ হাসিকে দেখিতে আসিল। রাজকুমারীকে দিবার জন্য তাহার চিঠিখানি হাসি কুন্দকে দিল।

(১৬)

রাজা ভাল হইয়াছেন; ব্যায়াম-উৎসবও শেষ হইয়া গিয়াছে। শরৎকুমারের আর কলিকাতায় যাইবার বাধা নাই, তিনি আজ বিকালে বাহিরে না গিয়া জিনিষ-পত্র প্যাক্ করিতেছিলেন। অভিপ্রায়, আজ সন্ধ্যাবেলা রাজাকে এ কথা জানাইয়া পরদিনই বাটী যাত্রা করিবেন।

মেজের উপর ট্রাঙ্ক দুইটা খোলা, কাপড় চোপড় তাহার মধ্যে সাজান হইয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর যে দুএকখানা বই ও ছোট-খাট দুই-একটা জিনিষ পড়িয়াছিল—তাহা

পোর্টম্যাণ্টে উঠাইয়া লইয়া তিনি দেয়ালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দেয়ালের গায় রাজকুমারীর দত্ত মালাগাছি টাঙ্গান ছিল, কুন্দফুলের গড়েমালা, মাঝে মাঝে চাঁপা ও গন্ধরাজের মিলান্। মালাগাছি দুদিনের বাসিমালা—পাছে স্পর্শে একটি ফুলও ঝরিয়া পড়ে—হাত দিতে শরতের সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। নিকটে আসিয়া আঘ্রাণ লইবামাত্র একটি মনোহর সুগন্ধে তাহার নাসিকা যেন ভরিয়া উঠিল,—শরতের মনে হইল—এ বুঝি স্বর্গেরই পারিজাত মালা। যাহার হস্তস্পর্শে ইহা এত পুণ্যময় গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে—তাহাকে স্মরণ করিয়া শরৎ শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে মস্তক অবনত করিলেন।

আর যেই যাহা বুঝুক শরৎ রাজকুমারীকে ভুল বুঝেন নাই! এ মাল্য যে রাজকুমারীর বরমাল্য নহে, জয়মাল্যোপহার তাহা তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। ভুল বুঝিবার জন্য যেরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আত্মম্ভরিতার প্রয়োজন—শরতের স্বভাবে সেরূপ হাস্যকর গর্ব্বভাবের বিশেষ অভাব। জ্যোতির্ম্ময়ী রাজকুমারী,—জ্যোতির্ম্ময়ীর আকাঙ্ক্ষা বাসনাও অসাধারণ; মহৎকার্য্যেই তাঁহার সমস্ত মনোপ্রাণ উৎসর্গীকৃত; শরতের মত একজন নগণ্য সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার যে প্রেমোদ্রেক হইতে পারে—ইহা তাঁহার কল্পনারও অগোচর। ইহার উপর তাঁহার নিজের হৃদয়েও এক্ষেত্রে প্রেমের চাঞ্চল্য নাই। অতএব রাজকুমারীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার একদিকে শ্রদ্ধা-সম্মানপূর্ণ অন্যদিকে বেশ নিঃসঙ্কোচ,—স্বাভাবিক। এই শক্তিময়ী রমণীর সান্নিধ্য, তাহার সখ্যতা, তাহার প্রশংসা শরতের ক্ষত হৃদয়ে যে মহৌষধ-সুধা ঢালিয়াছিল—সেজন্য রাজকুমারীর প্রতি তিনি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

হাসিকে কি শরৎ ভুলিয়াছেন? এত শীঘ্র কি ভোলা যায়? কিন্তু তাঁহার উপেক্ষিত হৃদয় বিস্মৃতিদেবের নিকট যে কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিল তাহা একেবারে অগ্রাহ্য হয় নাই। রাজকুমারীর সখীত্বের আশ্রয়ে তিনি বল পাইয়াছেন, ভুলিবার নূতন পথ চিনিয়াছেন। উপেক্ষিত প্রেমিকেরও জীবন বৃথা যায় না, কর্ম্মের পথে তাহা সার্থক হইয়া উঠে;—রাজকুমারী তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন—তিনি তাঁহার নমস্য দেবী।

বিদায়ের দিনে হাসি যে বনফুলটি শরৎকে পরাইয়া দিয়াছিল সেটি শরতের বুকের পকেটেই থাকিত,—তাহা বাহির করিয়া লইয়া তিনি দেখিলেন—বুকের চাপে ফুলটি পেষিত হইয়া গিয়াছে—তবু যেন ঠিক তেমনিটিই আছে, একটিও দল ইহার খসে নাই। রাজকুমারী-দত্ত ফুলমাল্যের দোলন-গুচ্ছের সহিত সেই ফুলটি তিনি সযত্নে বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর মালাগাছি—অতি সাবধানে দেয়ালের হুক হইতে খুলিয়া একটি শূন্য কাগজের বাক্সে পুরিলেন। বাক্সটি যখন নিরাপদে ট্রাঙ্কে উঠিল তখন তাঁহার প্যাকিংও শেষ হইল,—তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজার গৃহপার্শ্বেই শরতের ঘর;—রাজকুমারী থাকেন অন্তঃপুরে—তাহার চূড়ামাত্র এখান হইতে নজরে পড়ে; সেই চূড়ার দিকে চাহিয়া, মন্দির মধ্যে বিরাজিত

দেবীমূর্ত্তির মহিমা তিনি কল্পনা করিলেন। তখন কি আর কাহাকেও তাঁহার মনে পড়িয়াছিল? যেখানে ব্যথা—সেইখানেই প্রথমে হাত পড়া স্বাভাবিক—কিন্তু তবুও হৃদয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে চায়।

রাজকুমারী কিন্তু তখন অন্তঃপুরে ছিলেন না। তিনি শরতের ঘরের পাশেই—রাজার নিভৃত উপবেশন-কক্ষে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজা মধ্যাহ্নের পর যেখানেই গমন করুন, যে কাজেই ব্যস্ত থাকুন—এই সময় প্রায়ই ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে লইয়া মোটারে বেড়াইতে যান। আজ তিনি এখনো ফেরেন নাই—রাজকুমারী একটু উৎকণ্ঠিতচিত্তে পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সেদিনকার সেই আকস্মিক বিপদের পর হইতে—রাজার আসিতে বিলম্ব দেখিলেই জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে একটু ভাবনা জন্মে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। অপরাহ্ন কাল প্রভাতের মতই অরুণ রাগে সুরঞ্জিত করিয়া সূর্য্যগোলক গাছপালার মধ্য দিয়া পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িতেছে। ভাদ্রের ভরা নদীর বক্ষে—লাল আলোর বিদ্যুৎ লহরী চমকিয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্নে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—গাছপালা মাঠ এখনো আর্দ্র; মাঠের ধারে, গাছের শাখায়, আটচালার গায়ে সজ্জিত উৎসবের শুষ্ক ফুলমালা সহসা যেন নবীন হইয়া দুলিয়া উঠিয়াছে। মাঠে আজ খেলা চলিতেছে না, ব্যায়াম-উৎসবের পর দুইদিন ছেলেরা ছুটি পাইয়াছে। তবুও মাঠ শূন্য নহে, ছেলের দল—মাঠ, তাম্বু, আটচালা অধিকার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হারমোনিয়মের সঙ্গে হঠাৎ সেই গানটি আটচালার ভিতর হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

ভিক্ষাং দেহি জননী গো ভরিয়ে দে ঝুলি।

বোধ হয় সেদিনকার মত তাহারা আবার অভিনয় আরম্ভ করিল। গানটি শুনিতে শুনিতে রাজকুমারী ক্ষণকালের জন্য অন্য চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। সার্থকতার আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু মাঠে সাজান শুষ্ক ফুলগুলির মত সে আনন্দ পরমুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীর বাসনা পূর্ণ হইয়াছে সত্য,—তাহার ব্যায়াম-সমিতিতে আজ কত লোক, কত যুবক, কত সুনিপুণ,—খেলোয়াড়। কিন্তু তথাপি কয়জন ইহারা? —দেশের পক্ষে কয়জন? বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যখন এইরূপ আয়োজন হইবে—তখনই না একদিন তাহার মনোগত আশা-অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে!

ভারতের সর্ব্বদেশের লোক বীর বলিয়া পরিচিত,—সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত, কেবল বঙ্গবাসী এই অধিকার-বিচ্যুত। একটা জনরব—বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ—এই অখ্যাতি অপবাদ কেমন করিয়া রটিল—কে রটাইল? যেদিন বাঙ্গালীর এই মিথ্যা কলঙ্ক অপনীত হইবে—স্বয়ং রাজা ইহাদিগের বীরত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ইহাদিগকে সেনার অধিকার দান করিবেন—সেইদিন—সেইদিন জ্যোতির্ম্ময়ীর অন্তরতম আশা পূর্ণ হইবে,—তাহার আত্মা প্রসন্ন হইয়া উঠিবে।

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী কি একলাই এরূপ করিয়া ভাবিতেছে? নহে নহে তাহা নহে, বাঙ্লার দিন আসিয়াছে—সম্ভবতঃ দেশের

অনেকেই তাহার মত করিয়া ভাবিতেছেন, এই অভিপ্রায়ে কাজ করিতেছেন—তাহার চিন্তা—তাহার চেষ্টা—তাহার কার্য্য সেই শত সহস্রের মধ্যে একটি কণা। "তাহাই হউক—তাহাই হউক—হে ভগবান তাহাই হউক।—তুমি দেশের সকল লোকের মনের আকাঙ্ক্ষা-বাসনার সহিত আমার এই শক্তিকণাকে মিলিত সংযোজিত করিয়া ইহাকে মহান্ করিয়া, বিরাট করিয়া তোল।"

অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিল। সূর্য্যদেব তাঁহার রক্তিম করমালা জ্যোতির্ম্ময়ীর মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিয়া যখন তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নদীর পরপারে অন্তর্হিত হইলেন, তখন বালিকা গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। এই সুবিস্তৃত বারান্দারই একধারে শরৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন, রাজকুমারীকে দেখিয়া তিনি নিকটে আগমন করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন—"ডাক্তার-দা! আপনিও বুঝি বাবার জন্য অপেক্ষা করছেন? বেড়াতে যাননি যে কোথাও?"

"কাল বাড়ী যাব মনে করে, জিনিষ-পত্র প্যাক্ করছিলুম।"

"বাড়ী যাবেন? এত শীঘ্র?"

"শীঘ্র আর কই—প্রায় ছ'মাস ত আপনাদের অতিথি হয়ে আছি—"

"এমন শীঘ্র শীঘ্র সময় চলে যায়! মনেই হয় না যে আপনি এতদিন এসেছেন! আপনার বোধ হয় অনেক কাজের ক্ষতি হচ্ছে?"

"কাজের ক্ষতি!—না তা ঠিক বলতে পারিনে—"

শরৎ একটু থামিয়া থামিয়া কথাগুলা বলিলেন—রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন,

"আপনি দেখছি আদর্শ বিনয়ী,—"

দূরে অশ্বের পদশব্দ হইল—উভয়েই সেই দিকে মনোনিবেশ করিলেন,—কিন্তু ক্রমশঃ সে শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল। রাজকুমারী বলিলেন—"ডাক্তার দা—বাবা এখনো এলেন না—আমার একটু ভাবনা হচ্ছে।"

"ভাবনার কি কারণ? তিনি যে অবস্থাতেই পড়ুন আত্মরক্ষা করতে পারবেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"তা ঠিক। আচ্ছা বাঙ্গালীদের ভীরু বলে একটা অপবাদ আছে—না?"

শরৎ হাসিলেন—বলিলেন,—"মেকলে এইরূপ বলে গিয়েছেন—।"

"কিন্তু এমন মিথ্যা কথাটা আপনারাও ত অম্লানবদনে মেনে নিচ্ছেন? বাঙ্গালী যদি ভীরু জাত হোত তাহলে তাদের জমীদারী থাকত না। প্রত্যেক জমীদারীতে ত সারা-দিন লাঠালাঠী চলছে—আর লাঠিয়ালেরা ত অকাতরে প্রভুর জন্য প্রাণ দিচ্ছে। এরা যদিও সামান্য লোক তবু বীরত্বে কি এরা কোন শিক্ষিত রাজসৈন্যের চেয়ে কম?"

"গভর্ণমেণ্ট তা বোঝেন কই?"

"আপনারাও ত বোঝাবার চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না। আমি কলকাতায় গিয়ে স্বদেশী চিত্র-মেলায় একখানা ছবি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলুম! ছবিখানি বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের; তিনি প্রাণভয়ে অন্তঃপুরের রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছেন! ভীরুতার

বীভৎস প্রতিমূর্ত্তি! আর এই চিত্রকল্পনার জন্য নবীন চিত্রকর নাকি দেশের নামজাদা চিত্রকরদের কাছে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন! দুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল এসেছিল; ইচ্ছা হচ্ছিল ছবিখানা টেনে নিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলি।"

ক্রোধের আবেগে জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। শরৎকুমার নীরব হইয়া রহিলেন। বালিকা পুনরায় উত্তেজিত ভাবে কহিল "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কলঙ্ক! কক্ষণো লক্ষ্মণসেন প্রাণভয়ে অমন করে চোরের মতন পালান নি।"

"অসম্ভব বলেই ত মনে হয়। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকেরা নাকি ঐ রকম বলেছেন?"

"আর সেই মিথ্যা ইতিহাসকে আমরা অমর অক্ষরে ধরে রেখে নিজেদের ভীরুতার প্রচারে প্রশংসা আদায় করে গর্ব্ব অনুভব করছি। উঃ, আমার সমস্ত রক্ত আগুণ হয়ে ওঠে! আচ্ছা—গণেশদেব, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম প্রভৃতি বীরগণের চিত্র আমাদের চিত্রশালায় নেই কেন? চিত্রকরের কল্পনা-তুলিতে কেবল পলাতক লক্ষ্মণসেনই চিত্রিত হলেন?"

শরৎকুমার লজ্জিত ভাবে মুখ নত করিলেন। বালিকা কহিল "আসবেন ডাক-দা একবার ঘরের ভিতর—" বালিকার অনুবর্ত্তী হইয়া শরৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, যোগমায়া দেবীর চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজকুমারী কহিলেন;—"ইনি বাবার প্রমাতামহী; বর্গির উপদ্রবের

দেখুন কেবল রাজপুতানায় নয় বাংলাদেশেও বীরাঙ্গনা আছে। আর আমি বেশ বলতে পারি দরকার হলে এখনো অনেক মেয়ে দেশের জন্যে প্রাণ দেবে। আমাকে ভারী গর্ব্বিত বলে মনে করছেন—বোধ হয়?"

"মোটেই না। আপনি যথার্থই বীরাঙ্গনা।"

এই প্রশংসালাভে একটা নূতন রকম আনন্দে জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়প্রাণ যেন ভরিয়া উঠিল। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের চমক তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ত কত প্রশংসা করেন—ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতি ত আদর করিয়া কত কথা বলেন,—পিতার চক্ষেও ত জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বদা সুখ্যাতির আবেগ দেখিতে পায়, কিন্তু কাহারও প্রশংসায় এমনতর একটা আত্মপ্রসাদে তাহার হৃদয় ত ইতিপূর্ব্বে কোনদিন পূর্ণ হইয়া উঠে নাই!

মনের অজ্ঞাতসারে তাহার মন যেন একটু লজ্জিত হইল। কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে সলজ্জভাবে কহিল—"আচ্ছা—ডাক্তার-দা—আপনার ত একটা ambition আছে?"

শরৎ কোন উত্তর না দিয়া হাসিলেন, বালিকা বলিল—

"আপনার ambition যে কি, তা কিন্তু আমি বলতে পারি; ভাল ডাক্তার হওয়া—না?"

"নিশ্চয়ই!"

"আমার কি ambition শুনবেন?

দেখা। আচ্ছা, আমাদের দেশের মুখপাত্র যারা—তাঁরা কেন এজন্যে চেষ্টা করেন না ?"

"করেন বই কি ? কত লেখালেখি করেন।"

"কাগজে ও-রকম ক'রে এক কলম মাঝে মাঝে লিখলে কি কাজ হয় ? দেশের সর্ব্বসাধারণের মনে এ-ভাব জাগিয়ে তোলা চাই ; সে রকম চেষ্টা কি করছেন তাঁরা ?"

"তা ঠিক জানিনা। এইটুকু জানি, যে আপাততঃ দেশের মুরুব্বিরা বঙ্গবিভাগ আইন যাতে না হয় তার চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন।"

"হলোই বা বঙ্গবিভাগ,—তা নিয়ে এত গোলযোগ কেন ? ক্ষতি কি তাতে ?"

"একেই আমাদের মধ্যে একতা নেই ; তাতে আমরা আরও তফাৎ হয়ে পড়ব,—সকলে এই আশঙ্কা করেন।

"বৃথা আশঙ্কা। ভিতরে একতা থাকলে বাইরের লোকে কি তা ভাঙ্গতে পারে ? —যদি দেশের লোকে বঙ্গবিভাগ না চায় তা হলে গভর্ণমেন্টের এ কাজে একতা বাড়বে তবু কমবে না !"

"আপনার বাণীই সফল হোক্ !"

ইঁহারা ঘর হইতে পুনরায় বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সহসা হারমোনিয়মের সঙ্গে ধ্বনিত গান বন্দেমাতরম্ শব্দে ডুবিয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলিলেন —"পণ্ডিত মশায় দেখছি ছেলের দলে ঢুকলেন।"

"উনি ত আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ?"

"উনি আমার গুরুদেব। ওঁর মধ্যে যে খাঁটি জিনিষ আছে তা সংসারে বড় দুর্লভ। কুন্দ যখন ওঁকে নিয়ে হাসি বিদ্রূপ করে, আমার এমন রাগ ধরে।"

শরৎ হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন—"জানেন ত খাঁটি জিনিষ মাত্রেরই ভার বেশী ; হাল্‌কা জিনিষের পক্ষে সেটা স'য়ে নেওয়া ত সবসময় সহজ নয়। বিশেষ যখন আধার বস্তু balast হারিয়ে নিজেই টলমল করতে করতে চারদিকে একটা laughing গ্যাসের সৃষ্টি করেন—তখন দর্শক বেচারাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় একবার ভেবে দেখুন দেখি ? আমাকেও এই অবস্থায় কোন কোন সময় পড়তে হয়েছে ! জানেন ত মানুষ স্বভাবতঃই পাপী ; আদমের পাপ বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে আসছে। আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের জন্যে আশা করি মার্জ্জনা পাব ?"

বলিতে বলিতে শরতের মনে পড়িল, হাসিকে। পণ্ডিত মহাশয়ের ধরণ ধারণ কথাবার্ত্তায় হাসি যে কিরূপ হাসিত—তাহা তিনি কল্পনার চক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। আর—জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট স্তরে যে কথা জাগিতেছিল—তাহার মনে পড়িল সেই কথা। শরতের কথায় রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা ডাক্তার-দা, ভেবে দেখুন দেখি পণ্ডিত-মহাশয়ের সেদিন কি আহ্লাদ হবে—?"

"কোন্‌দিন ?"

"যেদিন তিনি বাঙ্গালীদের সৈনিকবেশ দেখবেন—অবশ্য যদি এমন দিন কখনো আসে ! আচ্ছা, আমরা যে পথ ধরেছি—এটা কি ঠিক পথ ডাক্তার-দা ? ব্যায়াম-শিক্ষাতে ছেলেদের মনের তেজও কি

বাড়বে? আর গভর্ণমেণ্টের চোখে—একদিন সেটা সূর্য্যচন্দ্রের মতই এমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে যে তখন আর এদের বীরত্ব অগ্রাহ্য করতে পারবেন না?"

"গভর্ণমেণ্ট কি বুঝবেন না বুঝবেন বলতে পারিনে,—তবে ছেলেরা এতে যে তেজস্বী হয়ে উঠবে,—তাতে সন্দেহ নেই।"

"কেজানে এক এক সময় আমার মনের মধ্যে এমন একটা নৈরাশ্য জমাট বাঁধে—মনে হয় এ যেন আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে সাগর বাঁধার প্রয়াস হচ্ছে!"

"না রাজকুমারি, আপনি ক্ষুদ্র শক্তি নন, শক্তিতে আপনি মহীয়সী। আপনার কার্য্যের ফল যে একদিন খুব বড় হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ করবেন না।"

অতিরিক্ত উৎসাহের সহিতই শরৎকুমার একথা বলিলেন; তাঁহার বাক্যে সত্যের একটি মূর্ত্তি প্রতিভাত হইল। আবার পূর্ব্বের ন্যায় একটা আনন্দ-প্রবাহ রাজকুমারীর হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই স্রোতোবেগে চালিত হইয়া কহিলেন—"আপনি জানেন না—ডাক্তার-দা—আমি কতটা দুর্ব্বল! এক এক সময় কাজ করবার কোন শক্তিই থাকে না আমার। আচ্ছা ডাক্তার-দা—আপনি আমার সহায় হবেন?"

"যদি অধিকার দেন,—সর্ব্বপ্রাণে"।

এই উত্তরে সহসা যেন জ্যোতির্ম্ময়ী সচেতন হইয়া উঠিল। ঠাকুরমার ঠাট্টা মনে পড়িয়া গেল। শরৎকুমার তাহাকে ভুল বুঝিলেন না ত?—"

অকারণে সহসা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বালিকা বলিল—

"মাপ করবেন—শরৎবাবু কি বাজে বকছি!—আমার সহায় বন্ধু আর কেউ হতে পারবে না—আমি নিজেই—"

পিতার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল—রাজা সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাকিলেন—"রাণী!" জ্যোতির্ম্ময়ী চমকিয়া উঠিল—উভয়ে কথা-বার্ত্তায় এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল—যে কখন্ যে রাজা ঘোড়া হইতে নামিয়া উপরে উঠিয়াছেন—তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। মুখের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া উঠিল—"বাবা এসেছেন!" বলিয়া তাঁহাকে স্বাগত করিয়া লইবার জন্য সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎ অপরাধীর মত বারান্দাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন;—হঠাৎ কি কথায় কি ব্যবহারে রাজকুমারীকে তিনি অপ্রসন্ন হইবার কারণ দিলেন—তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

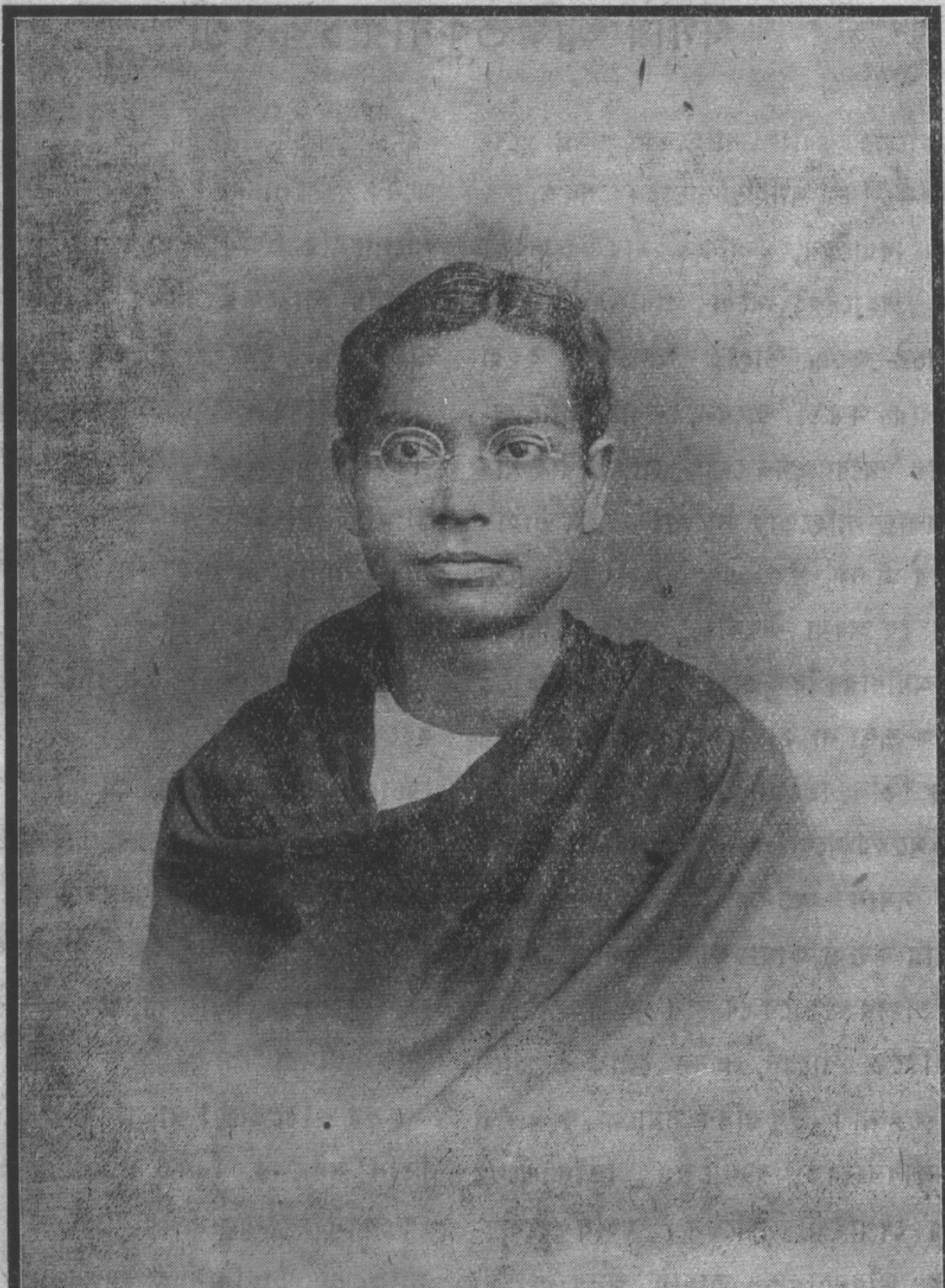
রাজকুমারীও বোঝেন নাই কোন্ ভাবের এ উন্মেষণা! কেন তিনি বিরক্ত হইলেন? কাহার প্রতিই বা বিরক্ত হইলেন? নিজের প্রতি না শরতের প্রতি?

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

একালের বাংলা-সাহিত্যে অল্প যে-কয়েকজন লেখক সাহিত্য-চর্চ্চায় বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে প্রধান একজন। সমালোচন-ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা রাখেন, নবীন সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে এমন লোক প্রায় দেখাই যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত এবং এই কঠিন কার্য্যে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, প্রাণপণ আগ্রহ এবং অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এদিকে তিনি ছিলেন একাকী; এবং সহস্র বিরুদ্ধ মতের মধ্যে এম্নি একাকী দাঁড়াইয়াই তিনি সমান অটলতা ও সফলতার সঙ্গে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া চলিতেছিলেন। আজ তাঁহার অভাবে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূর্ণ করিতে পারেন, এমন লোক ত চোখে পড়িতেছে না। শুধু রসিক সমালোচক বলিয়া নয়—জীবনচরিত রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের জীবনচরিত তাঁহার অমর কীর্ত্তি। ইদানীং কিছুকাল ধরিয়া তিনি মহাত্মা রাম-মোহন রায়ের জীবনচরিত রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাহার যে সামান্য কিছু-কিছু নমুনা সাময়িক-পত্রাদিতে বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, অজিতকুমারের রামমোহনচরিত সমাপ্ত হইলে, বাংলা ভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত-রূপে সমাদর লাভ করিত। শুধু এদেশের সাহিত্য নয়, বিদেশের সাহিত্য লইয়াও অজিতকুমার অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি সাধারণ পাঠকের চোখের সাম্নে সাহিত্যের খাঁটি রূপটি ফুটাইয়া দেখাইতে পারিতেন এবং হৃদয়ের মধ্যে সাহিত্য-রস-গ্রাহিতার একটা অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মর্ম্মের সহিত বাঙালী পাঠক-সাধারণের পরিচয়-সাধন করিয়া দিবার জন্য তিনি যে-সকল সুলিখিত প্রবন্ধ মাসিক-পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার রসগ্রাহিতা, বিচারক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি এই অল্পবয়সেই পরি-পক্বতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার উপার্জ্জিত জ্ঞানকে তিনি অকেজো রাখিয়া যান নাই।

কেবল একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক রূপে নয়—সৎচরিত্র, সদালাপী, সুরসিক বন্ধুরূপেও আজ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছি। স্বাভাবিক সুকণ্ঠের জন্যও তিনি সকলের নিকট আদর পাইতেন;—যে-কোন বন্ধু-সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহার মধুর স্বরলহরীতে, গানের পর গানে সে-সভার সকলকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত ভুলাইয়া রাখিতেন। অজিত কুমার আজ নাই, বন্ধুদের সভাও আজ নীরব;—তেমন-করিয়া অশ্রান্তভাবে রবীন্দ্র-নাথের গানও আর-কেউ বোধ হয় শুনাইতে পারিবে না! রবীন্দ্রসঙ্গীতের অমৃত-রসধারায় হৃদয়-মন অভিষিক্ত করিয়া তিনি আমাদের সকলকে ধন্য করিয়াছেন। বস্তুত বাংলা



স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

তাঁহার দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধারণে অনেকটা প্রসার লাভ করিয়াছে।

মৃত্যুকালে অজিতকুমারের বয়স হইয়াছিল চৌত্রিশবৎসর মাত্র। নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার সাহিত্য-সাধনাকে পরিপূর্ণতা লাভের অবকাশ দিল না। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে যথেষ্ট ক্ষতি হইল তাহা বলা বাহুল্য এবং ভারতীর যে কি ক্ষতি হইয়াছে তা শুধু আমরাই জানি। তাঁহার অভাবে আমাদের অনেক সংকল্প আজ নিভিয়া আসিতেছে। ভগবান তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন।

সমালোচনা

হেরফের। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫এ রামকৃষ্ণ বাগচী লেন, কলিকাতা, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য সাত সিকা। এখানি উপন্যাস। উপাখ্যান মোটামুটি এই,—রজত ও শিশির এক-কলেজে বি-এ পড়িত। রজত বড়-লোকের এক-ছেলে, তার কবি-প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'সংগ্রহে' তার লেখার ভারী আদর; ঘরে তাহার বিধবা মা সুনয়নী, আর তরুণী স্ত্রী সন্ধ্যা এবং অগাধ সুখৈশ্বর্য্য। শিশির গরিবের ছেলে, স্কলার-শিপ-হোল্ডার—কলিকাতায় এক মেশে নীচের তলায় স্যাঁতানে ঘরে থাকে। দৈবাৎ একদিন কলেজে শিশিরের সঙ্গে রজত সখ্য স্থাপন করিল এবং একেবারে তাহাকে নিজের গৃহে আনিয়া মা ও স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। সন্ধ্যা স্বামীর সাহিত্য-যশের গর্ব্বে গরবিনী। শিশিরকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যেই রজত তাহাকে সন্ধ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করিল। তখন তিনজনে বসিয়া নানারূপ সাহিত্যালোচনা চলিত। রজত শিশিরকে সাহিত্য-রচনায় উৎসাহিত করিল—কিন্তু যখন দেখিল, শিশিরের লেখার আদর তাহাকে ছাপাইয়া উঠিল, এমন কি রজতের বন্ধু সংগ্রহ-সম্পাদকও তাহার লেখা ফেলিয়া শিশিরের লেখার আদর করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে হিংসা জ্বলিল। প্রসাদলোভী বন্ধুদের উত্তেজনায় রজত শেষে সাহিত্য-ক্ষেত্রে শিশিরের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল এবং স্বনামে-বেনামে শিশিরের রচনার নিন্দা করিয়া কাগজে সমালোচনা বাহির করিতে লাগিল। সেই সূত্রে শিশিরকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করিয়া সে গৃহে মাতা ও স্ত্রীর কাছে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। শিশির কিন্তু রজতের এই শত্রুতা গায়ে মাখিত না। সন্ধ্যার কাছে বিদ্যুৎ নামে একটি তরুণী প্রায়ই বেড়াইতে আসিত—সে বেচারী এক রূপজীবীনীর কন্যা। বিদ্যুৎ মার সহিত একসঙ্গে বাস করিত না—বোর্ডিংয়ে সে মানুষ হইয়াছিল। সে মার দুর্ভাগ্যের কথা কিছুই জানিত না—মাও তাহার কাছে সে পরিচয় গোপন রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার গৃহে শিশির ও বিদ্যুৎ দুইজনের মনে অনুরাগ সঞ্চার হয়। তারপর হঠাৎ বিদ্যুৎ একদিন মাকে "সমাজগণ্ডীর বাহিরে" পল্লীর এক গৃহে একদল স্তাবক বাবুর সম্মুখে হাবভাবময় নৃত্যে নিযুক্ত দেখিল; দেখিয়া ঘৃণায় ক্ষোভে সে সে-স্থান ত্যাগ করিল। মাও মেয়েকে সম্মুখে দেখিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। মা আর বাঁচিল না। মরিবার সময় শিশিরকে ডাকিয়া মেয়ের সচ্চরিত্রতার বিবরণ বলিল, এবং তাহার হাতে মেয়ের ভার সঁপিয়া মরিল। উক্ত ঘটনার পর বিদ্যুৎ কলিকাতা ছাড়িয়া বিদেশে চাকরি করিতে গেল এবং শিশিরও সেখানে গিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। ঘটনা মোটামুটি এই। লেখক এই গ্রন্থে আরম্ভ হইতেই এমনি বিচিত্র কৌতূহল জাগাইয়া তুলিয়াছেন যে পাত্র-পাত্রীর কার্য্য-কলাপ কোন্ সূত্রে ধরিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয় এবং বহিখানি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকের আর স্বস্তি থাকে না। ইহার চরিত্রগুলি সবই রক্ত-মাংসের জীব এবং যে-সকল নরনারীকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে সর্ব্বদা চলিতে-ফিরিতে দেখি, ঠিক তাহাদেরই মত এই গ্রন্থের পাত্রপাত্রী নিজের নিজের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, হাসি ও অশ্রু লইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের গায়ে কোথাও একটা পুঁথির ছাপ মারা নাই, বা কাহাকেও পরম গম্ভীরভাবে আদর্শ শিখাইবার জন্য অস্বাভাবিক মূর্ত্তিতেও আবির্ভূত বলিয়া মনে হয় না—পাত্র-পাত্রীর মনের ছোট ভাবটুকু হইতে বাহিরের বিরাট কার্য্য-কলাপ অবধি দস্তুরমত সম্ভাবনার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ; সর্ব্বত্রই সজীবতার লক্ষণ একান্ত পরিস্ফুট। অনেক সুলিখিত উপন্যাসে দেখা যায়, লেখকের শক্তি ও সতর্কতার ফাঁকে ঘটনা প্রভৃতির একটু-আধটু অস্বাভাবিকতা উঁকি দেয়—সৌভাগ্যের বিষয়, এ বহিখানিতে সে ত্রুটি কোথাও

চোখে পড়ে না! সবচেয়ে উপভোগ্য হইয়াছে, ইহার ভাষা। খুব সহজ স্বচ্ছ ভাষায় এমনি কৌশলে রচনাটি ঢালা হইয়াছে যে মানুষগুলা একেবারে জলুস্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং প্লটেও কোথাও ঘোর-প্যাঁচ বা হেঁয়ালির চিহ্ন নাই—তবে ত্রুটিও যে দুই-একটা চোখে না ঠেকিয়াছে, এমন নয়। রজত বেচারাকে কণপ্রভার মজলিসে না বসাইলে কোন ক্ষতি ছিল না; বরং ঐ ব্যাপারে রসটা একটু গাঢ় বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সন্ধ্যা ও বিদ্যুতের চরিত্র আমাদের চমৎকার লাগিয়াছে। আমরা চাই সমাজে এমনি সন্ধ্যার মত স্ত্রী—যে স্বামীর নীচতা বা অত্যন্ত নির্লজ্জ ক্ষুদ্রতার সায় দিয়া "লক্ষ্মী বৌটি" হইয়া ঘরের কোণে চুপ করিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিবে না! দৃপ্ততেজে স্বামীর নীচতা ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বামীর ত্রুটি দেখাইয়া দিবে, এবং সন্ধ্যার মতই স্বামীর সেই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রত্যেক আদর্শ স্ত্রীর তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। নহিলে দুশ্চরিত্র স্বামীর দুশ্চরিত্রতায় মৃদু ক্রন্দনে অনুযোগ তুলিয়া স্বামী-দেবতার পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিতা হইয়া স্ত্রী যে স্বামীর পদযুগল বুকে ধরিয়া বলিবে, "লাথি মেরেছ, বেশ করেছ প্রভু, দেবতা আমার, দুঃখ নাই, তবে তোমার পায়ে যে বড় বেদনা বেজেছে, দেবতা!" এবং শেষে দেবতার শ্রীচরণে তেল মালিশ করিতে বসিয়া যাইবে, তেমন স্ত্রী কোনকালেই 'সহধর্ম্মিণী' পদবাচ্যা হইতে পারেন না। তেমন স্ত্রী সংসারে ডাল-ভাত রাঁধিতে পারে, তবে সে মাটীর পুতুল লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। দিন কয়েক পূর্ব্বে এমনি আদর্শে বাঙলা কেতাবে স্ত্রী ঢালাই চলিতেছিল—আমাদের সৌভাগ্য, সাহিত্যের সে স্রোত ফিরিয়াছে। আমরা এখন বাঙালীর ঘরে ঘরে দেখিতে চাই, সুনয়নীর মত বলিষ্ঠ-চিন্তা মা, সন্ধ্যার মত কোমলে-কঠিনে গঠিতা প্রেমময়ী কর্ত্তব্য-পরায়ণা স্ত্রী বিদ্যুতের মত স্বাধীন-চিন্তা নারী এবং শিশিরের মত আদর্শ আত্মনির্ভরশীল যুবা! এ উপন্যাসখানিতে বাঙালীর ভবিষ্যৎ-আশার বার্ত্তা আমরা পাইয়াছি। গ্রন্থখানি বাঙলার উপন্যাসের রাজ্যে বেশ একটা দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসপ্রিয় প্রত্যেক বাঙালীকে এই নির্ম্মল অনাবিল সমাজ-চিত্রখানি একবার চোখের সম্মুখে ধরিতে বলি। বইখানির ছাপা-কাগজ প্রভৃতি সুন্দর হইয়াছে।

নিয়তি। সামাজিক নাটক। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কলিকাতা ফাইন আর্ট কটেজে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা মাত্র। এই নাটকখানির কলেবর ক্ষুদ্র নহে—সুবৃহৎ। গ্রন্থে লেখক সমাজের নানা সমস্যার কথা তুলিয়াছেন। গরিব চাষাভূষার ছেলেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আভাষও দুই-একটি দৃশ্যে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন মদ খাওয়ার পরিণাম, চরিত্র-হীনের প্রায়শ্চিত্ত, অর্থ-লোভীর দুর্দ্দশা—নানা বিষয়ই অবতারিত হইয়াছে এবং এই ব্যাপারগুলি ফুটাইবার জন্য ডাকাতের দল, বারাঙ্গনা, পুলিশ, মদ্যবিক্রেতা, ইয়ারগণ—এমনি নানা প্রাণীকে লেখক নাটকে টানিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু একই নাটকে এতগুলি ব্যাপার ঠাসিতে হইয়াছে বলিয়া লেখক কাহারো প্রতি তেমন সুবিচার করিতে পারেন নাই—কেবল এক জমিদার-পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি জীববিশেষকে লইয়া এক বিশেষত্বহীন ঘটনার কাঠামো মাত্র খাড়া করা হইয়াছে—নাটকে প্রাণ-বস্তুটির একান্ত অভাব। নাট্য-রচনায় যে কৌশলের প্রয়োজন এ গ্রন্থে তাহার ইঙ্গিত কোথাও দেখিলাম না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



শাপসন্তপ্ত অহল্যা।

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ। [শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ অঙ্কিত।

ভারতী

৪২শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩২৫ [১১শ সংখ্যা

পাটেল-বিল্*

অসবর্ণ বিয়ের কথা মহাত্মা পাটেল যেম্‌নি উত্থাপন করেছেন, অম্‌নি দেখা গেল, বুড়ো-বাংলা বাইরে থেকে ধার-করে-আনা টোপর মাথায় দিয়ে গড়ের মাঠের সমাধি-স্তম্ভটির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কেবলি ঘাড় নাড়তে লাগলো—না-না-না! এরা মৃত্যুকেই চায়! পাঁচকে অনেকখানি মিথ্যে এবং অনেকগুলো শূন্যের উপরে খাড়া কোরে কবর ও হাড়কাঠ—দুটোই সাক্ষী রেখে পাড়া-পড়্‌সির সেদিনের রামলীলায় সমস্ত বাংলা যোগ দিয়েছে, কাগজের ঢাক্‌-পিটিয়ে এই যে মিথ্যে কথাটা জগতে প্রচার করবার চেষ্টা হচ্ছে, সেটাকে অপ্রমাণ করা চাই। বুড়োর দলকে বাংলার মাথায় এই উপহাস কিছুতেই চাপাতে দেওয়া নয়। বুড়োরাই তো বাংলার সবখানি নয়! সবদিক দিয়েই নতুন বাংলা আপনার কথা, আপনার আশা-ভরসা নিয়ে জগতের সাম্‌নে এসেছে। তাকে উড়িয়ে দেওয়া কোনো সভাপণ্ডিত বা কোনো সনাতন মোড়লের সাধ্য নেই। আমরা জানি মাঠের গোরটার কাছ থেকে এবং শ্মশানের মশানের কাছ থেকে যে অসম্মতির চীৎকার শোনা যাচ্ছে, সেটা অসবর্ণ বিয়েতে সারা বাংলার মানুষদের অসম্মতি বোলে কোথাও গ্রাহ্য হবে না। অসবর্ণ বিয়ে করবে দেশের সাহসী যুবক-দল। বিয়ে দেবে তার চেয়েও অসম-সাহসী মেয়ের বাপ-মা। আইন হচ্ছে তাদের নিরাপদে থাকার জন্য। পাড়ার বুড়ো এবং পড়সী মোড়লদের এতে ঘুমের ব্যাঘাত কেন হবে? এবং এ-নিয়ে তারা চেঁচামেচি করবেইবা কেন?

বাঙালীর সমাজের সম্মতি-অসম্মতি জানাবার জন্যে বেহার থেকে সভাপতি ধরে আনায়, এদের সভার অসম্মতি খুব যে

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে পাটেল-বিলের সমর্থন-সভায় সভাপতির বক্তৃতা।

পাকা-রকমের; তার পরিচয় তো পাওয়া যায় না।

সুখের বিষয়, সারা বাংলার নামে বুড়োর দলের সেদিনকার সভায় বাইশখানা বক্তার আসনের মধ্যে একুশখানাই খালি পড়েছিল—সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত দেখেছি। শুনেছি তারপরে অন্ধকারে পঞ্চাশ-হাজার সেখানে কীর্ত্তন ও আইনের কর্ত্তন করবার জন্যে জুটেছিল এবং সহরের রাস্তায় কোনো গোলযোগ না ঘটিয়ে সাড়ে-ছ'টায় ট্রাম ধর্ম্মতলায় লাগবামাত্র তাতে চড়ে ঘরে গিয়েছিল—এত চট্‌পট্‌ যে কেউ তাদের দেখেনি। বায়স্কোপের চেয়েও সচল অথচ মোটেই সজীব নয় এমন ছবির মতো এই একটা মহাসভার জনতা যা এল এবং গেল, শুনছি, তাকে সত্যিকার বলে সহজেই বিশ্বাস হয়তো খবরের কাগজ পড়ে অনেকেই করছেন। কিন্তু দেশের গতিবিধির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এই অসবর্ণ বিয়ের আইন যাঁরা করতে চলেছেন, ধর্ম্মতলার এ কার-সাজিটা তাঁদের চোখে ধূলো দিতে পারবেনা, আশা করা যায়।

এই আইন পাশ হবার পূর্ব্বে যে-দলের যা বল্‌বার, সেটা ব্যক্ত কর্‌বার স্বাধীনতা সবারই আছে। সেদিনের লোকেরা সেদিনের ও সেদিকের কথা বোলে প্রেতাত্মাদের নিশ্চিন্ত করে ছেড়েছেন; এখন এদিনের লোক ইহকালের ব্যবস্থাটা কোরে না-নিয়ে, অচল হয়ে বসে থাকবে, কেবলই ভূত-পূর্ব্বদের ভাবনা ভেবে, এটাই বা কেমন করে আশা করা যায়?—বিশেষত যখন বিয়ে নিয়ে কথা উঠেছে।

একদিকে পাহারা দিচ্ছে টোলের সশিষ্য পণ্ডিত, আর-একদিকে ততোধিক পণ্ডিত মোড়ল-মহাশয়েরা, মধ্যে রয়েছে হিন্দুমাত্রেই। এইটেই কি ঠিক? না, এটাও ঠিক যে তুই-তুই জমাদারের সব ধম্‌কানি, সব চাপন সময়-সময়ে অগ্রাহ্য কোরে ঠেলে ফেলে সমাজে বন্দী অথচ স্বাধীন-চেতা তাঁরা মানুষকে চিতার আগুন এবং আজীবন চিতার চেয়েও ভয়ঙ্কর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার উপায় নিজের শক্তিতে কোরে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। সমাজের জমাদারের সঙ্গে, যাদের নিয়ে সমাজ ও যাদের নিয়ে জাত, তাদের লড়াই ইতিপূর্ব্বে হয়ে গেছে এবং হবেও—জাতির কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য। বিদ্রোহের আগুন সমাজের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে জ্বলে তা নিবারণের উপায় মনুসংহিতার পুঁথি পুড়িয়ে ছাই-চাপা দেওয়া নয়,—যাতে জ্বালা নিবারণ হয়, তাই করা।

জ্বালার উপর জ্বালা দেবার জন্যে যখন দরোয়ান রয়েছে, এবং যন্ত্রণা সয়েও দারোয়ানদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বার লোকও রয়েছে যখন যথেষ্ট, তখন যে-আইন পুরস্কার, সেটাকে তিরস্কার বোলে কতক লোকে নেবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! সরকারি আইনের সাহায্য নিয়ে সমাজ-সংস্কার একদল অপছন্দ করছেন। অবশ্য নিজেদের ঘর নিজেরা গুছিয়ে নিতে পারলেই ভালো; কিন্তু যতদিন জমাদার ক'জন দরজায় থেকেও প্রভুত্ব খাটাচ্ছে, ততদিন ঘর এবং ঘরের লোকও যে তাদের খপ্পরে বন্দী এ-কথাটা যদি সত্যি না হতো, তবে অন্য-সব ব্যাপারে যাঁরা সদর্পে সদম্ভে

অগ্রসর ও নেতা হচ্ছে ব্যস্ত, তাঁরা এ-সময়ে আইনের স্বপক্ষ-দলকে মিষ্টি কথায় গোপনে সহানুভূতি জানিয়ে বিদায় কোরে নিজের-নিজের সাফাইয়ের পথ পরিস্কার রাখতে ব্যস্ত হতেন না! এবং বুড়োদের খবরের কাগজে কেবল বিপক্ষ-দলের সভার খবরগুলো বার করবার ও স্বপক্ষদের খবর চেপে-যাবার চেষ্টা চল্‌তোনা। হিন্দু-সমাজের দরোয়ান ক'জন যদি শুধু পাহারওয়ালা হতো, তবে তাদের হাতে হিন্দু-সমাজ এ-পর্য্যন্ত যা সয়েছে ও সইছে তার শোধ নিশ্চয় নিতো—খুনোখুনি ব্যাপার কোরে। কিন্তু জমাদারগুলো বন্দীদের সঙ্গে নানা কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা এম্‌নি পাতিয়ে বসেছে, যে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া কোরে বন্দীদের দিন চলা দায়! ধোবা-নাপিত বন্ধ হতে পারে, জাতঃপাত থেকে আরম্ভ কোরে নির্য্যাতন কতটা যে এগোতে না-পারে তার ঠিক কি! কাজেই হিন্দুসমাজ নিজের ভিতর থেকে যে আপনার ক্ষত আপনি শুধ্‌রে নেবে, তার আশা খুবই কম। ডাক্তার-সাহেবের দরকার আছেই-আছে। ভিতরটা যখন এমন অপটু যে ভিতরের রোগ নিজে দূর কোরে দেবার সাধ্য নেই, তখন বাইরের বোলে ডাক্তারের চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে শুধু তো গঙ্গোদকে নির্ভর কোরে নেতারাও একদিন থাকেন না! তবে এক্ষেত্রে কেন যে তাঁরা আমাদের আর-এক মনুর জন্মানো পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছেন তা বোঝা যায় না! বড়-কবিরাজের অনিশ্চিত আগমনের আশা ও ধৈর্য্য যতখানি তাঁদের আছে, বেচারা রোগীর জীবন ততখানি অপেক্ষা করতে চাইবে কিনা বলা যায় না। আমার ভয় হয় তাঁরা যখন কবিরাজ এনে হাজির করবেন, তখন দেখা যাবে এদেশে সমাজটি ঠিক শিবেরও অসাধ্য অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে!

অসবর্ণ বিয়ের আইন পাশ হলেই যে দেশশুদ্ধ কোমর-বেঁধে সেই কাজে লেগে যাবে, সে-আশা খুবই কম। সতীদাহ-আইনের পশ্চাতে বৃটিশ-রাজশক্তি ও ইচ্ছা ছিল। কাজেই সে শুভ কাজটা চট্ করে নির্ব্বাহ হয়ে গেল। কিন্তু বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ—এম্‌নি সব আইনগুলির সঙ্গে মুখ্য-ভাবে আমাদের নিজশক্তির ও ইচ্ছার যোগ। সতীদাহ ধর্‌তে গেলে সাহেবরা বন্ধ করেছেন—সতীকে আগুনের মুখ থেকে জোর করে টেনে এনে এবং ধর্ম্মের নামে নরহত্যাকারীদের কঠিন শাস্তি দিয়ে। বিয়ের আইনের বেলায় তো তা হবার যো নেই! কাজেই বালিকা-বিধবার দুঃখ ঘুচ্‌তে, চারবর্ণের আত্মীয়তা বাড়তে নিশ্চয় আরো-গোটা-কয়েক যুগ কেটে যাবে, ভাবনা নেই। তবে এ-আইন হ'লে আপাতত এইটুকু লাভ হবে—কড়া পাহারা শিথিল হবে, জেলখানার নিরেট দেয়ালে আর-একটা ফাঁক বাড়বে, দুই জমাদারের অযথা ধমক মান্‌তে না চাইলে যাদের এদেশে টিঁকে থাকা, এমন কি পৃথিবীতে টিঁকে থাকা দায় ছিল, তারা রক্ষা পাবে; এরা জাত-হাড়কাঠের কাছে মানুষকে পশুর মতো যখন-খুসি যেমন-খুসি ধোরে-ধোরে গলা-কাটতে পারবেনা; আর ছেলের বাজারও কিছু সস্তা হবে।

হিন্দুসমাজের দরজার বাইরে দরওয়ানদের

যতই দাপট থাক্, এটা নিশ্চয় যে মন্থুর আমলের খাঁচা-কলের অনেকগুলো কাঠি ও খিল ভেঙে, খাঁচার মধ্যেকার পূর্ণতা ক্রমেই কমে চলেছে। এবং বেরিয়ে যারা যাচ্ছে, বাইরে থেকে ফিরে এসে সেই খাঁচা-কলের পূর্ণতা পুনরায় ভর্ত্তি করবার জন্মে তারা মোটেই ব্যস্ত হচ্ছে না। এতে যদি কারু মনোকষ্ট হয় তো সে মন্থুর; এবং অন্ন-যাবার ভয় যদি কারু হয় তো সে আমাদের দরোয়ানগুলোর।

একালে মনু যদি বর্ত্তমান থাকতে পার্ত্তেন, তবে হয়তো তাঁর কলটা তিনি মেরামৎ কোরে, শুধরে এখনকার উপযোগী কোরে নিতে পার্ত্তেন। কিন্তু মনু নেই -যিনি বানালেন খাঁচা ও খুটিনাটি; রয়েছে কেবল ভাঙা খাঁচায়-ধরা মানুষগুলি; এবং দরজায় মন্থুর আমলের থেকে বহাল-করা দরোয়ানীর উপযুক্ত জন-দুই;—যাদের কলকজা-জ্ঞান কয়েদী যারা, তাদের চেয়েও কম। তারা বংশানুক্রমে এ-পর্য্যন্ত ধম্‌কেই এসেছে এবং সেইটেতেই তারা মজবুদ্। এ-ক্ষেত্রে মন্বন্তর পর্য্যন্ত খাঁচা-কলের কোনো ব্যবস্থা হওয়া কঠিন; এবং কয়েদীর সব-ক'টিকেও সেখানে ধোরে রাখা শক্ত—যদিনা কয়েদী স্বইচ্ছায় স্বস্থানে থাকে এমন-একটা ব্যবস্থা করা না হয়। হ'লে তারা ফাঁক পেলেই পালাবে এবং খাঁচার শিক আরো ফাঁক হয়—এই প্রার্থনাই বৃটিশ-গভর্মেণ্টকে জানাবে।

'কিংকর্ত্তব্যং'? এই-জাতীয় একটা সমস্তার মীমাংসা একবার সত্যিকার পাখীদের নিয়ে আমাকে করতে হয়েছিল। লাগিয়ে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পাখীকে আমি লালন-পালন করছিলেম। খাঁচাটা ছিল বহু-কালের; কাজেই পাখী সেখানে তালা-সত্ত্বেও আস্তে-আস্তে কম্‌তে লাগল। আজ এ-ফাঁক বন্ধ করি, কাল ও-ফাঁক দিয়ে পাখী পালায়; অথবা নিজেরাই নতুন-নতুন ফাঁক আবিস্কার করে। যারা পালায় তারা দেশ ছেড়ে নয়তো পাখী-লীলা সাঙ্গ করেই পালায়। সব যায় দেখে 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'-বুদ্ধিই আমি করলেম। খাঁচাটাকে আর খাঁচা রাখলেম না। ডবল-তালা সরিয়ে সেটাকে আশ্রয় এবং আহারের স্থান, আর, সমস্ত-বাগানটাকে পাখীদের বিহারের স্থান করে দিয়ে আমি সরে দাঁড়ালেম। দেখলেম তখন পাখীরা ইচ্ছা-সুখে খাঁচার মধ্যে আনাগোনা কর্‌তে লাগলো এবং আমার বাগান ছেড়ে আর কোথাও নড়া আর প্রয়োজন বলেই বোধ করলে না। শুধু যে এতে পোষা-পাখীরাই কাছে রইল তা নয়, বাইরেরও পাখী নিকটে পেতে আমাকে কোনো মায়া-জালই বিস্তার করতে হ'ল না। হিন্দুসমাজের খাঁচা-ও-কলে-পড়াদের জন্ত উপরের মতো কিছু-একটা ব্যবস্থা ভালো কি মন্দ তা স্তায়-বাগীশেরা বুঝুন; আমি যখন ব্যাধ নয়, তখন ফাঁদ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে ফাঁদেরও দুরবস্থা, নিজেরও বিপদ ঘটা সম্ভব। কিন্তু এটা ঠিক যে হিন্দুসমাজের চাবি কতকটা খুলে গেলে সমাজ পরিত্যাগ কোরে যারা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে বা অন্ত সমাজে গিয়ে মিল্‌ছে, তাদের আর সেটা করবার কারণ

সঙ্গে যাদের দরোয়ানীও যায়, তারা বল্‌বে —ডবলের উপরেও ডবল তালা নইলে চল্‌ছে না, হুজুর!

চারবর্ণ এ-ওর সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেলে হিন্দুসমাজের চেহারা কতকটা যে বদ্‌লে যাবে, তার সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-বদলটা যে খুব ভীষণ-আকারের একটা-কিছু হবে, তাতো মনে হয় না। চারবর্ণ কেন, রাম-ধনুকের সব-ক'টা বর্ণ নিয়েই আমি বাল্যকাল থেকে এ-পর্য্যন্ত কারবার করে আস্‌ছি। এটা দেখেছি বর্ণকে স্বস্ব-স্থানে অমিশ্র-অবস্থায় রেখে চালচিত্র পর্য্যন্ত করা চলে, তার উপরে আর ওঠা যায় না। জীবন্ত ছবির বেলায় এক বর্ণকে আর-এক বর্ণে না মেলালে উপায় নেই।

এই আইন যদি-বা পাশ হয়, তবে এদেশের জল-হাওয়ার গুণে তার ফল ফল্‌তে এত বিলম্ব হবে যে ততদিন খুব-বুড়োর দল নিশ্চয়ই লোপ পাবে; সুতরাং তাঁরা নির্ভয়ে থাকুন। ভয় কেবল তাদেরই, যারা কচি-বয়েস থেকেই প্রেতলোকের ভাবনা খুব বেশি-কোরে ভেবে মাথা ধরাচ্ছে।

আর আমরা—যারা এই অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন করতে এসেছি, আমাদেরও যে কোনো ভয় নেই, তা কেমন কোরে বলি, যখন অপর-পক্ষের হাতে কাগজের খাঁড়ায় এখনি শান্ পড়ছে জান্‌ছি; এবং জান্‌ছি ভালোবাসা, আত্মীয়তা, বন্ধুতা এম্‌নি সব সোনার কৌটোর ভিতর কৌটোর মধ্যে যেখানে আমাদের প্রাণটুকু লুকিয়ে রেখেছি, সেখানেও ঘুণ-ধরাবার পরামর্শ গোপনে চলেছে—এরি মধ্যে।

এই ঘুণ এবং কাগজের খাঁড়া—দুটোই আমাদের সোনার ঘরের আশেপাশে অনেকবার দাঁত বসিয়ে বুড়োদেরই মতো এমন ভয়ঙ্কর ফোগ্‌লা হয়ে পড়েছে যে অনায়াসে সে-দুটোকে আমরা উপেক্ষা কোরে কাজ করে যেতে পারি—নতুন কোরে অস্ত্র-আইনের দরখাস্ত না লিখে। প্রাচীনের দলকে এটা আমাদের স্পষ্ট করে বোলতে হবে যে চীনের প্রাচীরের মধ্যে বাঁধা থেকে আমরা মরতে রাজি নই এবং তোমাদের জাতরূপী-জাঁতাকলের মুঠো হয়ে নিজের জাতকে নিজেরা পিষে মারতেও রাজি নই।

খুব নরম কোরে বল্লেও, অসবর্ণ বিয়ের সমর্থন কোরে যতগুলো সভা, সবগুলোকেই বিপক্ষ-দলের কাগজগুলো বল্‌বে নাস্তিকের সভা;—যদি-না এই-সব স্বপক্ষ-সভার বিবরণ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশের সৎসাহস দেখাতে সাধারণ খবরের পেয়াদা যে সম্পাদকরা এ-পর্য্যন্ত যা কোরে আসছে, তা না করে—অর্থাৎ তাদের কাগজটা দেশের সবদিকের সব-রকমের খবরের জন্যে নয়, কিন্তু নিজেদের ঘরে পয়সা মুড়ে আন্‌বার থলি প্রস্তুতের জন্য, এইটেই মনে না করে। আর খুব গরম কোরে যদি আমাদের কোনো খবরের কাগজে এই আইনের বিপক্ষ-দলের গালাগালির প্রতিবাদ করা চলে, তবে ভদ্রলোক এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারে—"ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং। ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন। সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং, ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ।" ওগো আমরা নাস্তিকও নয়, অহিন্দুও নয়, এবং তোমাদেরই মতো আমরাও পরলোকের

বিষয় চিন্তা কোরে থাকি ; কিন্তু সময় এসেছে যখন নাস্তিক হতে হবে—"স চাপি কালোঽয়-মুপাগতঃ শনৈর্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।" —এমন সময় এসেছে তোমরা যাতে ভালো-মানুষটি বল্‌বে এমন-সব তোমাদের মন-যোগানো কাজ কোরে জাতাসুরের জাঁতার চাপনে দেশসুদ্ধকে মরতে দিলে গোলোকে স্থান দেবে বল্লেও সে কাজে রাজি নই। কেননা, ইহলোকের জীবন-যাত্রা তাহ'লে আমাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠবে—পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কাজেই যা বল্‌বার, তা বলতে হবে। হিন্দুস্থানের হিন্দু একজাত নয়, কাজেই একও নয় ; কিন্তু এক হতে পারে। কেননা ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জর্ম্মানিতে সেটা হয়েছে। ভারতবর্ষেই বা সেটা হওয়া আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু ঐ জাতের জাঁতা নিয়ত ঘুরে-ঘুরে একককে শতখণ্ডে যতদিন চূর্ণবিচূর্ণ কর্‌তে থাকবে, ততদিন সেটা কিছুতে হবে না।

সময়ের সঙ্গে যদি আমরা চলতে চাই, তবে আমাদের সমাজের পুরাতন ডিঙিখানাকে বেশ-কোরে নতুন ও মজবুৎ কোরে স্রোতে ভাসাতে হবে। মিউজিয়ামের উপযুক্ত বোলে সেটাকে ডাঙায় তুলে আগ্‌লে বসে থাকলে তো চল্‌বে না! ডিঙিও চল্‌বে না, আমরাও চল্‌বো না—যদি জল ছোঁয়া কিনা এই তর্ক নিয়েই কাল কাটাতে থাকি। যে-সব ধর্ম্মের কর্ম্মের ও চিন্তার স্রোত আমাদের কাছ দিয়ে বহে যাচ্ছে, তা থেকে দূরে থাকারই পরামর্শ যাঁরা কচ্ছেন, তাঁরাও কি জানেন না যে বাণ যেদিন এসে উপস্থিত হবে—যে-অবস্থায় আছি সে-অবস্থায় থাকা আর সেদিন সম্ভব হবে না, —ভেসে যেতেই হবে এবং সে-সময় অকর্ম্মা মাঝি এবং অচল ডিঙি—দুটোই বৃথা চেষ্টা কর্‌বে যাত্রীদের বাণের মুখে ভাসিয়ে রাখ্‌বার জন্যে! আমরা ডুব্‌বোই! ভব-সাগরের পারে যাবার আশায় যে-ডিঙিখানা ডাঙার উপরে নিয়ে বসেছিলুম, সেটা যখন সত্যিকার সাগরের তোড়ে চুরমার্ হয়ে যাবে, তখন তার ঘুণ-ধরা ফোপ্‌রা কাঠগুলো আমাদের দুই-মুঠোর চাপনে গুঁড়ো হয়ে গঙ্গামৃত্তিকার চেয়েও তরল পদার্থে পরিণত হ'বে এবং তারি বর্ণ সর্ব্বাঙ্গে মেখে আমরা চট্‌-কোরে রসাতলের দিকে চলে যাবো। যদি যেমন চলছে এম্‌নিভাবে হিন্দু-সমাজরূপ ডিঙি-খানিতে একটুও অদল-বদল, একটুও সংস্কার না কোরে, জল-ছোঁয়া প্রভৃতি দরকারি কাজ থেকে একেবারে আগ্‌লে রেখে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি—ইহকাল-পরকাল, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—দুটো তাল-পাকিয়ে, আজগুবি লাড়ু হাতে লাড়ু গোপালটির মতো ভালোমানুষ, তবে ভরা-ডুবি রক্ষা হবে না। পূর্ব্বতন ঋষিদের কালে হিন্দুসমাজের মধ্যে নানা সংস্কার নানা দিক দিয়ে আস্‌তে দেওয়া হতো খোলেই; সমাজ তখন এপার ওপার দুপারেই যাত্রীদের বহন করে চলেছিল। এখন যাঁরা সমাজের খবরদারি কর্‌তে ব্যস্ত, তাঁরা সমাজকে প্রধানত ইহকালের সুবিধা-অসুবিধার জন্য না প্রস্তুত রেখে, পরকালে সাক্ষী দেবার জন্যে পোঁট্‌লা বেঁধে রাখ্‌তে চান। এটা তাঁরা ভুলে যান যে সমাজ হচ্ছে জীবন্ত মানুষদের নিয়ে এবং ইহজীবনের কাজে লাগ্‌বার জন্যই তার বিশেষ প্রয়োজন। প্রেতলোকে গিয়ে পিণ্ড দেবার জন্য সমাজের সৃষ্টি

হয়নি ; ইহলোকের কাণ্ডকারখানার জন্যই রয়েছে সমাজ ; কাজেই ইহলোকের কাজে লাগাতে হলে সময়-মতো সংস্কারাদি কোরে সমাজের কল্-বল্ ঠিক রাখতে হবে না হলে আর বেশীক্ষণ সে আমাদের কাজে আস্‌বে না। সংস্কারের দ্বারা হিন্দুসমাজের কতটা বিপদ, সে-ভাবনার চেয়ে সংস্কারের অভাবে তার কি দুর্দ্দশা হবে সেইটেই বেশী কোরে ভাববার বিষয়। কিন্তু ভাবতে বল্লেই যাঁরা চটে উঠে মনুসংহিতা আউড়ে যান, তাঁদের সঙ্গে চেঁচিয়ে তো আমরা পার্‌বো না ! লেখালেখি করেও যে পেরে উঠি তা নয়। কেননা খবরের কাগজের প্রায় সব বাঙালী তাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতিয়ে বসেছে। এ অবস্থায় গভর্মেণ্টের কাছে আইনের সাহায্য না চেয়ে, মনুমেণ্টের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে সময় নষ্ট করা বৃথা। ভিতর থেকে সমাজসংস্কার যখন একপ্রকার অসম্ভব, তখন বাইরে থেকেও যদি সেটা না আসে, তবে বল্‌তেই হবে ভিতরে-বাইরে আমরা একেবারেই মলেম ! একমাত্র তখন বুড়োর দলের শীঘ্র বিলুপ্তির কামনা বিধাতার কাছে করা ছাড়া আর যে আমরা কি কর্‌বো ভেবে পাইনা। কিন্তু হায় বিধাতা যে অভিসম্পাত দিয়ে বসেছেন যে বুড়োর দল এদেশে অনেক যুগ বাঁচ্‌বে !

কিন্তু অকস্মাৎ বোলে একজন তো আছে, —যে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে গেল ! যার বস্‌বার কথা শ্রোতার জায়গায়, তাকে বসিয়ে দিলে সভাপতির সিংহাসনে ! যখন এমন অঘটন চোখের সাম্‌নে ঘট্‌ছে, তখন হঠাৎ এই অবসর্ণ বিয়ের বিলের সঙ্গে হিন্দু-সমাজের সংস্কারও ঘটে যেতে পারে এবং যাকে শাপ বলে ঠাউরে ছিলেম সে বর হয়েও দেখা দিতে পারে। বিয়ের আইন নিয়ে যখন লড়াই, তখন যে-পক্ষে যুবার মেলা, সেই-পক্ষেই জয়ের মালা নিশ্চয়ই এসে পড়েছে, এই বিশ্বাসেই বয়সের ধর্ম্ম না মেনেই আমি এ-দলে ভিড়েছি এবং এর জন্যে বুড়োরা হয় তো আমাকে কিছু একটা উপাধি দিয়েছেন এবং হয় তো আমার ছবি খুব জাঁকালো-রকমে কাগজে ছাপিয়ে ঘরে-ঘরে বিলি করছেন। কিন্তু দেখলেম হয়তো এর একটাও হল না ; অকস্মাৎ সব উল্টেপাল্টে গিয়ে বুড়োরই গলায় পড়লো বরণ-মালা, আর আমি যে ফাঁকে সেই ফাঁকাতেই অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে হাঁপ্ ছাড়লেম ! এই ভাবে অকস্মাৎও যদি হিন্দু-সমাজের মধ্যে একটা সংস্কার ঘটে যায়—যেমন একবার আমার এক দূর-সম্পর্কে বড়দাদার ঘটেছিল, তা হলেও ভালো। দাদার ঠাকুরদাদা ছিলেন খুব ছোটোখাটো মানুষটি। তিনি নিজের মাপে আফিস্-গাড়িখানি বানিয়েছিলেন। সেখানি খুব বুড়ো হয়ে মর্‌বার সময় নাতিকে বখ্‌শিস্ দিয়ে গেলেন। এদিকে দাদার শরীর হল তাঁর ঠাকুরদাদার চেয়ে আড়াই-গুণ লম্বা-চওড়া, কাজেই পিতামহের গাড়িখানি চড়ে-বেড়াতে তাঁর কষ্ট বাড়্‌ছিল বই কম্‌ছিল না।

আমি একদিন বল্লেম দাদা, গাড়িখানি একটু কেটে-কুটে এদিক-ওদিক করে বাড়িয়ে নিন্, আরাম পাবেন। পিতামহের গাড়ি, তার উপর করাৎ চালাতে দাদার মায়া হ'ল।

কেবল আমার অনেক অনুরোধে গাড়ির চারখানা চাকা মোটা লোহা আর কাঠ্-কাট্রা দিয়ে মজবুৎ করে নিলেন। তারপর একদিন যিনি অকস্মাৎ তিনি এক ফুঁয়ে দাদার সেকেলে গাড়ির কচ্ছবের পিঠের মতো ছাদ-খানা রাস্তার মধ্যে থেকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। দাদা দেখলেম, সেই ছাদ-খোলা গাড়িতে গলির মোড়ে উপস্থিত—ছাতা-মুড়ি দিয়ে। আমি কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা কোরে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে শুধোলেম—দাদা, এ কি কাণ্ড! দাদা খুব গম্ভীরভাবে বল্লেন—ছিল পাল্কি, হল ফেটিন্! একটু হাওয়া-খাবার আর হাত-পা ছড়িয়ে বস্বার সুবিধে হল! ভাগ্যি তুমি বলেছিলে চাকা-চারখানা মজবুৎ রাখতে; না হলে, আজ কি বিপদই হতো।

দাদার ফিটেনের মতো এই অবসর্ণ বিয়ের আইনটা সবখানি অকস্মাতের জিম্মায় রেখে কিন্তু বাড়ি যেতে আমার সাহস হয় না। কি জানি অকস্মাৎ হয় তো বুড়োদের ভাবগতিক দেখে আমাদের রাজপুরুষেরা ভাবতে পারেন এ-আইনের সমর্থন এ-দেশের জনপ্রাণীও করেনি। তাই আমরা-সবাই—যারা এখনো বুড়োদের মতো ভয়ঙ্কর বুড়ো হইনি এবং হতেও চাইনে, তারা এই সংস্কারের সমর্থন করে সোজা হাত ওঠাবো নির্ভয়ে; কেন না জানি যে জাতির কল্যাণের জন্য যা, তাকে সমর্থন করে হাত ওঠালে যদি যা চাই তা এখনি নাও পাই, তবু কারু কাছে লজ্জা পেতে হবে না। আর যে-হাত সবার উপরে রয়েছে সে-হাতের ইঙ্গিত মেনে যদি সংসারের সব কাজে সায় দিয়ে যেতে পারি, তবে আমাদের নিরাশও হতে হবে না—হারও মান্‌তে হবে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাতিল-প্রমাদ
বা
প্রসহ্য-প্রতিবাদ

আমরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইনু সবে,
বর্ণ-গর্ব্ব রাখিব—পণ;—
চিঁড়ে-ফলারিয়া চিড়িতন আর
ইস্কু-দাঁতন ইস্কাবন!
পাতিলের বিল নাকচ বাতিল
করিব আমরা পষ্ট কই,
হরবোলা-গাঁই হরতন মোরা,
মোরা হেঁজিপেঁজি মোটেই নই!

দ্যাখ তাসের মতন মোরা চারি জাতি,
আমরা সবাই জ্যান্ত তাস,
তাসের কেল্লা সাকিম, রয়েছি
ভয়ে ভয়ে পাছে লাগে বাতাস!
অঘরে অজাতে বিয়ে হবে নাকি?
ছিছি শুনে লাজে মরিয়া যাই!
তাতে যে বর্ণ-সঙ্কর হয়
গীতাকার ব্যাস বলেছে ভাই!

বলেছে মৎস্যগন্ধার ছেলে
অজ্ঞাতে অঘরে বিবাহ নয়,
সত্যবতী ও জাম্ববতীরে
ধামা-চাপা দিয়ে গাও রে জয়!
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

হো হো পাতিলের বিল করিতে বাতিল
উদয় হয়েছি আমরা হে,
এই তামাটে ও মেটে ভুসুটে পাঁশুটে
কুচ্‌কুচে কালো আম্‌রা হে!
ছি ছি ভিন্ন বর্ণে বিয়ে কভু হয়?
বধির হও রে কর্ণ—উঃ!
আরে বিয়ে হয়নাকো, বিয়ে হয়নাকো,
নিকে হয় অসবর্ণ—হুঁঃ!
দ্যাখ উচ্চবর্ণ আমরা বেজায়,
আমরা দেশের ভরসা তাই,
শুধু কলিকাল বোলে রংটা বেতর,
একটু কলি দিলে হব ফর্সা ভাই।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

দ্যাখ জম্বুদ্বীপে বাস কোরে হ'ল
জামের মতন জেল্লাটা হে!
মোদের Arctic Homeএ ফিরে যদি যাই,
মেরে দিই তবে কেল্লাটা হে!
শুধু জাম খেয়ে রঙে জাম্‌ড়ো পড়েছে,
নইলে আর্য্য আমরা খাঁটি ও সাঁচ্চা,
তাই প্রতি পরিবারে চাতুর্বর্ণ্য
কিবা কালো, ধলো, ব্লু, ব্রাউন্ বাচ্চা!
তবে রঙের বড়াই কর একজাই,
কৃষ্ণচর্ম্ম শর্ম্মা জাগো!
খেঁটে খুন্তি-কলমে লেখ বক্তৃতা
সাড়ে-সাতান্ন ফর্ম্মা দাগো!
দ্যাখ রঙে আছি মোরা রঙের গোলাম
রঙের টঙের সঙের পাতি
রঙে আছি, তাই টঙে বোসে আছি,
কেউবা কাগ্‌জী, কেউবা পাতি।
কেউবা মাচায়, কেউবা তলায়,
কেউ ঘেঁষাঘেঁষি, কেউবা তফাতে,
সব সঙই যদি টঙে ভিড় করে
ধপাৎ হবে যে অধঃপাতে।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

দ্যাখ সতীদাহ রদ, বিধবা-বিপদ
বাধিয়ে তো ডেকে এনেছ ফাঁড়া,
বাস্ রহিত-গোত্র রুইতন বলে
রঙের এ টঙে দিয়ো না নাড়া।
দ্যাখ ভেস্তে দিয়ো না রঙের খেলাটা,
ফেলোনাকো দেখে হাতের তাস,
(কিন্তু সনাতন হরতনের টেক্কা?—
আরে! কোথা গেল? সর্ব্বনাশ!)
আহা গুলিয়ে দিয়ো না, রোসো বাপু, রোসো,
এই যে—চিঁড়ের তিরির গায়—
দ্যাখ লেখা আছে হরতনের টেক্কা,
আর ভয় মোরা করি কাহায়?

তবে ভেঁজে নাও তাস, বাস ভায়া বাস্,
লম্বা টিকিতে লাগাও মাঞ্জা,
মোদের সেট্-ভাঙা তাস, কোরোনাকো ফাঁস,
কসে খেলো,—হবে ছক্কা পাঞ্জা!
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

যথা অ-আ-ই-উ বলি হাই যদি থালি
তোলা যায় স্বরবর্ণেতে,
টিকটিকি তবে কি করিতে পারে?—
তোলে না তা কেউ কর্ণেতে।
কিন্তু স্বরে-ব্যঞ্জনে ঝঞ্ঝাট ঘাই
বাক্যের হয় সৃষ্টি গো,
অমনি অর্থেরও খোঁজ পোড়ে যায়, পড়ে
আইনেরও খর-দৃষ্টি গো!
তাহে ফ্যাসাদের পর ফ্যাচাং আসিয়া
করয়ে সমাচ্ছন্ন হে,
এর হেতুটা কি জানো?—স্বরে-ব্যঞ্জনে
বিবাহটা অসবর্ণ যে!
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

যথা বর্ণধর্ম্মে করি অবহেলা
দেবতারও নাহি অব্যাহতি—
হেঁহেঁ ফ্যাল্‌ফ্যালাইয়া কি দেখিছ বাপু?
বোসো ঐখানে শুনিবে যদি।
ঐ ঘুঁটিঙের চুন চেয়ে সাতগুণ
রং ছিল মহেশের সাদা রে
তিনি করিলেন বিয়ে হলুদ-বরণা
উমারে,—গ্রহের ফের দাদা রে।
তাহে কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ
কর যদি থাকে কর্ণ, আহা!
হল পার্ব্বতীসুত লম্বোদরের
চুনে-হলুদিয়া-বর্ণ ডাহা!
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

যথা ছাপাখানা হয়ে ছত্রিশ জাতে
শাস্ত্র বেবাক পড়িছে হায়,
নাই পেয়ে-পেয়ে অলপ্পেয়েরা
মাথায় ক্রমশঃ চড়িতে চায়!
আহা ভালো ছিল যবে শাস্ত্র শিকায়,
ধর্ম্ম ছিলেন টিকিতে ভোঃ!
এখন ছোট-মুখে শুনি বড় বড়-কথা,
তর্কে না যায় টিকিতে, ওঃ!
আরে শাস্ত্র-তর্ক তোরা কি জানিস্?
ভারি দেখি আস্পর্দ্ধা যে!
জোড়া-ঠ্যাং-ওলা শাস্ত্র আমরা
আমাদিগে নাই শ্রদ্ধা রে!
তর্ক তোদের শুনে হাসি পায়,
হায় রে গণ্ডমূর্খ হায়!
শাস্ত্র-তত্ত্ব সোজা নয় মূঢ়,
পূর্ণ সে গূঢ় সূক্ষ্মতায়!
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
নাস্তিক সব তার্কিক hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

হেঁহেঁ তপন-তনয়া তপতীর কেন
নরকুলে বিয়ে হইল রে,
আর ঋষি বশিষ্ঠ বিলোম্ বিবাহে
ঘট্‌কালি কেন কৈল রে।
মানুষের ছেলে দেবতার মেয়ে—
এ ত অনুলোম বিবাহ নয়,
এই ত প্রশ্ন ?—শ্রদ্ধাযুক্ত
চিত্তে শুনহ কিসে কি হয়।—
স্থাথ সূর্য্যসুতারে বিবাহ করিলে
যম শনি হয় বড়-কুটুম,
তাই তপতীর সাথে বে'র কথা হ'লে
দেবতাকুলের ঘুচিত ঘুম।
কারণ শনি কি যমকে শ্যালক বলিলে
হন যদি ওঁরা ক্রুদ্ধ হে,
তবে হয়ত দণ্ড পড়িবে মুণ্ডে
কিম্বা উড়িবে মুণ্ড-স্কন্ধ রে!
আবার জায়া যদি কভু বায়না ধরেন
ভায়ের বাড়ীতে যাইতে গো,
তবে যম-ঘরে তাঁরে হয় পাঠাইতে,
আশা ছেড়ে দাও তার চাইতে ও।
কিন্তু সূর্য্যের মেয়ে থুবড়ো থাকিবে
সে যে মহাপাপ শাস্ত্রে কয়,
তাই ঘট্‌কালি করি বিলোম বিবাহ
দিল বশিষ্ঠ হয়ে সদয়।
স্থাথ সকল অবিধি বিধি হয় তেজী
তেজপাতাদের পক্ষেতে,
আর যমকে তো লোকে বলেই শ্যালক—
তাই বাধিলনা সম্পর্কেতে।
(কোরাস্) ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল—বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

হুঁহুঁ ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি,—ওকি ও!
ফের লোকগুলা আসে যে ঝুঁকে,
বলে হরের ঘরণী গঙ্গা কেমনে
করিল বরণ শান্তনুকে?
বলি অত খবরে কি দরকার শুনি
তামাসা পেয়েছ? ভারি যে ইয়ে?
গঙ্গার কথা গঙ্গা জানেন,
যা না সেথা দড়িকলসী নিয়ে!
হেসে কুটিকুটি, ভারি যে আমোদ,
ফষ্টিনষ্টি সবারি কাছে;
বলি যাওনা ঢেউয়ের বহর দেখগে,
হুঁহুঁ হাঁ-করা মকর মুখিয়ে আছে।
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang!
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং!

ওকি ফের গুজ্‌গাজ্ কাণ্ড কি আজ,
ফের হাউচাউ, চাও কি বাপু?
হেরে হেরে দেবো হারিয়ে সবারে,
বচনে কখনো হব না কাবু।
কি? শৈব বিবাহ? গোস্বামী-মত?—
বাধ্য নহিক শুনিতে অত;
গোস্বামী-মত হবে সে পরাহে,
শ্রদ্ধাহীনের তর্ক যত!
স্থাথ শুনে যাও শুধু, তর্ক কোরো না,
কথার উপরে কয়ো না কথা,
নিজের গলাটা জাহির করিতে
বাহির কোরো না ছুতো ও নতা।
আমরা বলিব, তোমরা শুনিবে,—
এই সনাতন দেশের রীতি,

মোদের দিয়ে-থুয়ে তোরা ভক্তি করিবি,
নিয়ে-থুয়ে মোরা জানাব প্রীতি।
তর্ক কোরো না, তর্কের শেষ
হয় না কখনো জাননা তা কি ?
হেঁহেঁ গণেশের কলা-বৌকে দেখিয়ে
শেষে উদ্ভিদ-বিয়ে চালাবি নাকি ?
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

স্বাধ মোরা সনাতন রঙের গোলাম,
বর্ণের দাস আমরা সবে,
ভিন্ন রঙের টেক্কা যে মারি
সে কথা স্বীকার করিতে হবে।
ওই পরের নহলা কেবলি ন ফোঁটা,
আমার নহলা চৌদ্দ সে,
একথা যেজন জানে না সে মূঢ়,
মানে না যে—চোর বৌদ্ধ সে।
আমরা ফ্যাশানের ঝোঁকে হব না নেশান,
যা আছি তা মোরা রব নাগাড়,
দলাদলি কোরে, কিলোকিলি কোরে
ভাগে ভাগে সোড়ে যাব ভাগাড় !
শত্রুরা বলে চোটে গেছে রং,
যা আছে সে শুধু রঙের ঢং,
যাক্ রং, থাক্ ঢং আমাদের,
রঙের ঢঙের আমরা সং !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

স্বাধ ছুঁৎ-মার্গের আমরা পাণ্ডা,
বর্ণ-গর্ব্বে বনেদ গাঁথা,
মোদের বর্ণ যদিচ বর্ণনাতীত,
কিছু তামা কিছু তামাক-পাতা !
তবু বর্ণে আমরা শ্রেষ্ঠ শুনেছি,
শ্রুতি সে, যে হেতু শোনা সে যায়,
অহো শ্রুতি অমান্য করিবি কি তোরা
ইহ পরকাল খোয়াবি হায় !
জাগো জাগো তবে ভাই, ওঠ তবে ভাই,
জাগহ, কিন্তু মেলো না চোখ,
বর্ণ মানে যে রং হয়, সেটা
জানা ভালো নয় যতই হোক।
চক্ষু কর্ণে বিবাদ বাধায়ে
বল্‌তো মানিবি কারে সালিস ?
তবে জেগে চোখ বুজে চেঁচারে,—যদি এ—
নিরেট গুরুর সল্লা নিস্।
সোনামুগ কালো কলায়ে ভিসিতে
ভুসিতে মিশিয়া রয়েছি বেশ,
বর্ণগর্ব্ব রয়েছে বজায়
চোখ খুলে কেন বাড়ালো ক্লেশ ?
বর্ণ সত্য জাতি সনাতন,
Inter-caste ? কখনো নয়।
সনাতন চিড়িভন হরতন
ইস্কাবনের গাহরে জয় !
(কোরাস) ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং !

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

টুক্‌নি

(গল্প)

দার্জিলিঙে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে দেখি খোকা এই-এতটুকু একটা ছোট্ট ভুটিয়া ছেলের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে আছে। ভুটিয়া ছেলেটা কখনো হামাগুড়ি দিয়ে খোকাকে পিঠে-চাপিয়ে 'ডংকি' হয়ে ছুটছে, কখনো গলায় একটা ফিঁতে-বেঁধে কুকুর সেজে খোকার সঙ্গে-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করতে-করতে ঘুরছে, কখনো-বা একখানা বেতের মোড়াতে তাকে বসিয়ে 'রিক্‌স' ঠেলছে ;—এম্‌নি নানারকম খেলা। আমি খোকাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"এ কে রে?"

খোকা বল্লে—"ও টুক্‌নি।"

আমি বল্লুম—"কোথায় পেলি ?"

খোকা বল্লে—"রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।"

মোটামুটি ইতিহাসটা এই যে খোকা বিকেলে চৌরাস্তায় বেড়াতে গিয়েছিল ; সেইখানে টুক্‌নির সঙ্গে তার দেখা ; যেমন দেখা অম্‌নি ভাব ; এবং যেমন ভাব, অম্‌নি সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেফ্‌তার হয়ে বাড়ি আসা।

খোকাকে যখন প্রশ্ন করছিলুম, টুক্‌নি তার পাশে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়েছিল। বাহিরের দেহটা তার চুপ করে থাকলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তার ভিতরটা ভারি ছট্‌ফট্‌ করছে। খোকার সঙ্গে তার খেলা অকালে ভেঙে যাওয়াতে সে ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল এবং সেই-খেলা পুনরায় জোড়্‌বার জন্যে তার আর তর্‌-সইছিল না। আমি তার এই অধীরতা চেয়ে-চেয়ে লক্ষ্য কর্‌ছিলুম।

টুক্‌নি খুবই ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তার চেহারার মধ্যে ভারি-একটা মজা ছিল। তাকে দেখলে মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড কাঁচা মাটির পুতুলকে থেব্‌ড়ে-থুব্‌ড়ে ছোট্ট করে ফেলা হয়েছে। মোটা-সোটা—যেন পাহাড়ের গা থেকে কুঁদে বার-করা হাত-পা ; খুব চ্যাটালো বুক ; এবং মস্ত-একখানা মুখের উপর ছোট্ট-একটু নাক ও আধ-বোজা চোখের টানের একটু ইসারামাত্র। দেহটি স্বাস্থ্যে ভরা ; কিন্তু সেই-দেহের নানা অঙ্গ যেন নানা-বয়সের মানুষের দেহ থেকে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। দেহের কোনোখান্‌টা তার বয়েসকে ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে গেছে, কোনোখান্‌টা পিছিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এত অসামঞ্জস্য থাক্‌লেও মোটের উপর তার চেহারা যে খুব বিশ্রী, কি খুব অদ্ভুত বলে চোখে ঠেকে তা নয়। ছেলে-বয়সের একটা অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি বিদ্যুতের আভার মতো তার দেহের উপর এমন-একটা চিক্কণ ছড়িয়ে দিয়েছে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য একেবারে ঢেকে গেছে। এই স্ফূর্ত্তি যদি তার না থাক্‌ত, তাহ'লে তার চেহারা ভয়ানক ভীষণ হয়ে উঠত এবং খোকা আকৃষ্ট না হয়ে তার দিক থেকে ভয়ে পালিয়ে আস্‌ত।

খোকাকে আমি ছেড়ে দিলুম। টুক্‌নি

যেন হাঁপ্-ছেড়ে বাঁচল! লাফাতে-লাফাতে ছুটে গিয়ে খোকার সঙ্গে আবার খেলা জুড়ে দিলে। আমি আমার কাজ কর্ম্মে মন দিলুম।

রাত্রিবেলা শোবার সময় ঘরে গিয়ে দেখি খোকার খাটিয়ার নীচে টুকনি জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। আমি ব্যস্ত হয়ে তাকে ঠেলে তুলে বল্লুম—"এই টুক্‌নি! তুই বাড়ি যাস্‌নি যে?"

টুক্‌নি আমার দিকে চোখ-পাকিয়ে বল্লে—"হম্ নেই যায়েগা!"

—"নেই যায়েগা কি রে?"

—"হাঁ, হম্ নেই যায়েগা!"

টুক্‌নি এমন সুরে "নেই যায়েগা" বল্লে, যেন আমার বাড়িতে তার থাকা, না-থাকার উপর কথা-বল্‌বার কর্ত্তা যদি কেউ থাকে তো সে নিজেই! আমি আমার স্ত্রীকে ডেকে বল্লুম —"এই ত্যাখো, খোকা এক ফ্যাসাদ্ বাধিয়ে বস্‌ল! কার ছেলেকে এনে ঘরে পুর্‌লে, এখন বার করা দায়!"

স্ত্রী বল্লেন—"আঃ, থাকুক না বাপু আজকের রাতটা! কাল খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় কর্‌লেই চল্‌বে।"

আমি মহা ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—"তুমি বুঝ্‌চ না! এই এতটুকু ছেলে—ওর বাপ-মায়ের প্রাণে কি হচ্ছে বল দেখি!"

স্ত্রী বল্লেন—"তাহ'লে ওর বাপ-মাকে একটা খবর পাঠাও।"

আমি টুক্‌নিকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখি, সে এরই মধ্যে শুয়ে-পড়ে দিব্যি ঘুম দিচ্ছে। তাকে আবার ঠেলে তুলে বল্লুম—"এই! তোর বাড়ি কোথায়?"

টুক্‌নি আমার চোখের দিকে তার সেই আধ-বোজা ঘুমন্ত চোখদুটো টেনে তুলে খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে রইল; তারপর একটা ঝট্‌কা-মেরে বলে উঠ্‌ল—"নেই বোলেগা!" বলেই সে ধপাস্-করে শুয়ে পড়্‌ল।

আমি ধমক দিয়ে বল্লুম—"তোকে বল্‌তেই হবে।"

টুক্‌নি আমার দিকে পিছন-ফিরে শুয়ে অত্যন্ত একটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্লে—"নেই বোলেগা!"

আমি তাকে আরো দু-চারবার ডাকা-ডাকি করলুম; সে সাড়াই দিলে না। শেষে নিরুপায় হয়ে চাকরদের কাছে খোঁজ করতে লাগলুম; কিন্তু কেউই কোনো খবর দিতে পার্‌লে না। গিন্নী বল্লেন—"তবে আর কি করা যাবে!"

আমি তখন হাল ছেড়ে দিলুম।

পরদিন সকালে চা খাচ্ছি, খোকা এসে বল্লে—"বাবা, টুক্‌নি আমার ডংকি ভাগিয়ে দিচ্ছে।"

আমি বল্লুম—"কেন?"

সে বল্লে—"জানি না। যতবারই উঠ্‌তে যাচ্ছি, সে আমার হাত-ধরে খালি বল্‌চে—'নেই'!"

আমি টুক্‌নিকে ডেকে বল্লুম—"এই! কি বল্‌ছিস?"

সে ঘাড়টাকে গোঁ-ভরে নীচু করে বল্লে—"হম্ ডংকি হ্যায়!"

আমি তার হাতখানা ধরে বল্লুম—"তুই তো ভুটিয়ার বাচ্ছা, তুই ডংকি হবি কি করে?"

সে সজোরে হাত টেনে নিয়ে বল্লে—

"নেই! হম্ ডংকি হ্যায়!"—বলেই খোকাকে পিঠের উপর তুলে গট্-গট্-করে ঘর-থেকে বেরিয়ে গেল। তার রকম-সকম দেখে গিন্নীর ভয় হল। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ছেলেটা যে-রকম কাঠ-গোঁয়ার, ভয় করে বাপু! ওরে নন্দ, দেখ্ দেখ্, খোকাকে নিয়ে কোথায় গেল!"

নন্দ-বেহারা তাদের পিছন্ পিছন ছুট দিলে।

দশটার সময় খোকা বেড়িয়ে ফিরে এল। শুনলুম সমস্ত-ক্ষণ টুকুনি তাকে পিঠে-করে ঘুরেচে—একবারও নাম্‌তে দেয়নি। তা-ছাড়া খোকার হাতে একটা গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে বলে দিয়েছিল খোকার যখন ডংকিকে ছুট্-করাবার ইচ্ছে হবে সে যেন ঐ ডালের বাড়ি খুব-কসে মারে। টুকুনির গায়ের দু-জায়গা দেখ্‌লুম প্রহারের দাগে রাঙা হয়ে রয়েছে। আমি খোকাকে বল্লুম—"ছি খোকা, এম্‌নি-করে মার্‌তে হয়!"

খোকা কাঁদো-কাদো হয়ে বল্লে—"আমি তো মার্‌তে চাইনি; টুকুনি যে ভয় দেখালে, না মার্‌লে ডংকি খদের দিকে নেমে যাবে। আমি একটুখানি আস্তে মেরেছিলুম; ও বল্লে, আরো জোরে মারো, নইলে ডংকি ভারি দুষ্টুমি কর্‌বে!"

গিন্নী আঁৎকে-উঠে বল্লেন—"এই দেখ কী কাণ্ড! ছেলেটাকে খদে ফেলেই যদি দিত! না বাপু,—তুমি ওকে বিদেয় কর।—এখনই বিদেয় কর।"

টুকুনি হাঁ-করে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছিল; কি বুঝলে তা জানিনা; কিন্তু গিন্নীর কথা শেষ হতেই সে চিম্‌নির তলা থেকে ধোঁ-করে একখানা আধ্-পোড়া কাঠের চ্যালা তুলে নিয়ে গিন্নীর হাতের সাম্‌নে ধরে বল্লে—"হম্ বদ্‌মাস্ হ্যায়, হম্‌কো মার্ লাগাও।"—বলেই পিঠ-পেতে দাঁড়াল।

গিন্নী তার রকম দেখে হেসে উঠলেন। সে হাসি টুকুনির মনে ধরলনা, প্রহার না পাওয়াতে তার মুখখানা ভারি ক্ষুণ্ণ দেখাতে লাগল।

গিন্নী বল্লেন—"ভারি মুস্কিল বাধালে দেখ্‌চি! ঐ বুনোটাকে তাড়াতেও মায়া করে, রাখ্‌তেও ভয় হয়।"

খাবার সময় টুকুনি আবার গোল-বাধিয়ে বস্‌ল। গিন্নী এসে বল্লেন—"দেখো এসে কি কাণ্ড!"

আমি গিয়ে দেখি: খোকার খাবার টেবিলের নীচে টুকুনি চুপ-করে গুঁড়ি-মেরে বসে আছে। তার খাবার নিয়ে ডাকাডাকি হচ্ছে, সে কিছুতেই যাবেনা।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"কি হয়েছে রে টুকুনি?"

সে বল্লে—"হম্ কুত্তা হ্যায়!"

খোকা বল্লে—"বাবা, ও বল্‌ছে যে ও আমার কুকুর; আমি খেয়ে-খেয়ে টেবিল থেকে যা ফেলে দেব, ও তাই কুড়িয়ে-কুড়িয়ে খাবে।"

টুকুনি কিছুতেই সেখান-থেকে নড়্‌ল না; গোঁ-হয়ে বসে রইল। অগত্যা টেবিলের উপর-থেকে মাটিতে খাবার ফেলে তাকে কুকুরের মতনই খাওয়ানো হল। তাতে তার স্ফূর্তি দেখে কে!

খাওয়া শেষ হলে আমি তাকে ডেকে বল্লুম—"টুকুনি, তুই এইবার বাড়ি যা- তোর

বাপ-মায়ের কাছে। তারা হয় ত তোর জন্যে কাঁদ্‌চে।"

কাঁদচে!—এই কথাটাতে হঠাৎ টুক্‌নি যেন থম্‌কে গেল; কেমন-একরকম ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌-করে চাইতে লাগ্‌ল—তার চোখের পাতাগুলো ক্রমে ভারি হয়ে এল। সে ছুটে গিয়ে জান্‌লার উপর উঠে দূর-পাহাড়ের কোন্‌-এক ঝাপ্‌সা কোণের দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল; তারপর আস্তে-আস্তে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।

আমি বল্লুম—"কি রে যাবি না?"

সে ধীরে-ধীরে ঘাড়-নেড়ে বল্লে—"না।"

আমি বিস্মিত হয়ে তার পিঠে হাত-রেখে স্নেহের স্বরে বল্লুম—"কেন বল্‌ দেখি?"

সে খানিকক্ষণ চুপ-করে রইল; মনের মধ্যে কি যেন হাত্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তারপর তার হাতখানা একটু-একটু-করে উঠতে-উঠতে বুকের মধ্যিখানটিতে এসে থেমে-পড়্‌তেই বুক-থেকে একটি কথা ঠেলে উঠল—"খোকাবাবু!"—আর-কিছু সে বল্‌তে পারলেনা।

টুক্‌নির ধরণ-ধারণ সবই অদ্ভুত; সে যে কি বল্‌তে চায়, ভালো করে বুঝতে পার্‌লুম না। কিন্তু তবু তার সেই চোখের চাহনি, তার সেই-ধীরে-ধীরে বুকের মধ্যি-খানটিতে হাত-দেওয়ার ভঙ্গী, তার ঐ একটি কথার উচ্চারণের সুর আমাকে কেমন অভিভূত করে ফেল্লে। আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা কইতে পার্‌লুম না;—তাকে বিদায় দেবার ভাষা মুখে আন্‌তে পার্‌লুম না। সে যে চোখের আভাসে কাতর মিনতি জানিয়ে আমাকে বশ কর্‌লে তা নয়,—তার ব্যবহারের মধ্যে কোথাও দয়া-ভিক্ষার একটুখানি ইসারাও ছিলনা, মমতা-প্রার্থনা করবার মতো ভঙ্গীও দেখিনি; তবু আমি অভিভূত হয়ে পড়্‌লুম।

আমি স্ত্রীকে ডেকে বল্লুম—"আমি ওকে বিদেয় কর্‌তে পার্‌বনা; তুমি পার ত কর।"

গিন্নী বল্লেন—"তবে ও থাক্‌। যখন খুসী হবে, যাবে।"

আমি যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম।

কিন্তু খানিক বাদে আবার গোল বাধল। গিন্নী অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে এসে বল্লেন—"ঐ সর্ব্বনেশে ছোঁড়াটাকে কিছুতেই বাড়িতে রাখা হবে না।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—"ব্যাপার কি?"

গিন্নী বল্লেন—"আর একটু হলেই সর্ব্বনাশ হত!"

আমি বল্লুম—"কেন? কি হয়েছে"

গিন্নী বল্লেন—"ঐ টুক্‌নির কাণ্ড! খোকাকে পিঠে-করে সিঁড়ি-বেয়ে তুল্‌তে গিয়ে ফেলে দিলে! তার কপালটা এই এতখানি ফুলে উঠেছে। যদি অজ্ঞান হয়ে যেত!"

আমি বল্লুম—"কৈ, দেখি খোকাকে!"

বল্‌তে-বল্‌তেই খোকা এসে হাজির হ'ল; সঙ্গে টুক্‌নি। দেখলুম তার মুখখানা শুকিয়ে গেছে; সে থেকে-থেকে খোকার কপালের ফুলোটার দিকে কাতর-চোখে দেখ্‌ছে।

আমি বল্লুম—"দেখ্‌-দিকিন্‌ টুক্‌নি, কি করেছিস!"

বল্‌তেই টুক্‌নির চোখ ছল্‌-ছল্‌-করে এল; সে খোকার কাছে ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি তার সেই কপালের ফুলোটার উপর হাত-দিয়ে চেপে ধর্‌তে গেল, যেন

তার হাতের চাপে ঐ ফুলোটা এখনই সমান করে দিতে পারলে সে বাঁচে! কিন্তু খোকা উঃ-করে উঠ্‌তেই সে হাত সরিয়ে নিলে। গিন্নী তাড়তাড়ি খোকাকে টুকনির কাছ থেকে টেনে নিলেন। তারপর আমার মুখের ভাব দেখে বল্লেন—"না। টুকনিকে কিছুতেই রাখা হবেনা।"

আমি চুপ করে রইলুম।

গিন্নী বল্লেন—"টুকনি, তুই এ-বাড়ি থেকে বেরো।"

টুকনি সিধে দাঁড়িয়ে রইল।

গিন্নী আবার বল্লেন—"বেরো বল্‌চি!"

টুকনি ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে, হাতের একটা আঙুল ধরে সজোরে মোচ্‌ড়াতে লাগ্‌ল;—পা তার নড়্‌লনা।

গিন্নী ডাক্‌লেন—"নন্দ!"

নন্দ-বেহারা এসে হাজির হ'ল। গিন্নী তাকে বল্লেন—"যেমন কোরে পারিস্ ঐ ছোঁড়াটাকে বাড়ি পোঁছে দিয়ে আয়।"

নন্দ টুকনির হাত ধর্‌তে গেল। আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"মুখ দেখছনা? টুকনি অপ্রস্তুত হয়েছে। অমন-কাজ ও আর কর্‌বেনা;—এবার ওকে মাফ কর।"

গিন্নী বল্লেন—"না, না! ও বাড়ি থাক্‌লে আমার আর স্বস্তি থাক্‌বেনা। খোকাকে নিয়ে দিনরাত কি করে বেড়াচ্চে দেখচনা? খোকার উপর যে-রকম টান, যদি চুরি করে নিয়েই পালায়!"

আমি হেসে বল্লুম—"না, অতটা হবেনা।"

গিন্নী বল্লেন—"তা না-হলেও কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব? ও যদি আদর-করে খোকাকে বুকে চেপে ধরে, তা হলেও যে খোকার হাড় ক-খানা গুঁড়িয়ে যাবে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওর সাম্‌নে খোকাকে ছেড়ে-রাখ্‌তে আমার আর সাহস হচ্ছেনা।"

আমি নিরুপায় হয়ে বল্লুম—"বিদেয় যদি কর্‌তে চাও, অমন মার-মূর্ত্তি হয়ে বিদেয় দিয়োনা! একটু আদর-করে বিদেয় দাও। —হাজার হোক্ ছেলেমানুষ!"

গিন্নী নরম হয়ে এলেন। আদর-করে টুকনিকে ডাক্‌লেন—"আয়, শোন্, আমার কাছে আয়!"

টুকনি এই আদরের আহ্বানে চোখ-তুলে একবার চাইলে, কিন্তু এগিয়ে গেলনা। তার চোখ দেখে বোঝা গেল ঐ ডাকে তার মন সাড়া তো দিলেইনা বরং কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। টুকনি যতই ছেলেমানুষ হোক্, আমাদের ভাষা তার যতই অজানা থাক্, দেখলুম, আমাদের মনের ভাব বুঝতে তার আট্‌কায় না। আশ্চর্য্য!

গিন্নী আরো ডাকাডাকি কর্‌লেন, তবু সে কাছে এলনা। এক-এক-সময় পিছনে লাঠি লুকিয়ে কুকুর কি বেড়ালকে আদর-করে ডাক্‌লে যেমন সে কিছুতেই কাছে আসেনা—এ ঠিক তেম্‌নি! গিন্নী তখন উঠে গিয়ে তার হাত-ধরে কাছে এনে বসালেন। হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বল্লেন—"মেঠাই কিনে খাস্, বুঝলি!"

টুকনি টাকার দিকে দেখলেওনা; তাড়া-তাড়ি টাকাটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে, হাতখানা ঝেড়ে ফেল্লে; তারপর ঘরের এক-কোণে গিয়ে দাঁড়াল।

গিন্নী হতাশ হয়ে বল্লেন—"আদর তো করলুম, এখন যা-করবার তুমি কর।"

আমি চুপ করে রইলুম দেখে গিন্নী নন্দকে ইসারা করলেন। নন্দটা যমদূতের মতো এসে টুক্‌নিকে টান্‌তে-টান্‌তে ঘর-থেকে বার করে নিয়ে গেল। টুক্‌নি কিছুতেই যাবেনা সেইটে জানাবার জন্যে সমস্ত শরীরটা নেতিয়ে দিয়ে মাটির উপর চিৎপাত হয়ে পড়্‌ল। নন্দ তাকে কিছুতেই রেহাই দিলেনা—সজোরে হ্যাঁচ্‌ড়া-হেঁচ্‌ড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল। আমি সেই দৃশ্য আর দেখতে পার্‌লুম না; চোখ ফিরিয়ে নিলুম। তারপর হঠাৎ দেখি টানাটানির কোন্‌ ফাঁকে নন্দর হাত-ছাড়িয়ে ছুটে এসে টুক্‌নি গিন্নীর পায়ের উপর ঝপাৎ-করে পড়ল;—দু-হাত দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে। গিন্নী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—"ছাড়্‌, ছাড়্‌!" কিছুতেই সে ছাড়েনা,—মাথা গুঁজে পড়ে রইল। দু-ফোঁটা চোখের জল বোধ হয় তাঁর পায়ের উপরে পড়েছিল। কারণ, হঠাৎ দেখি গিন্নী টুক্‌নিকে কোলের উপর তুলে নিয়েছেন,—টুক্‌নি তাঁর বুকের মধ্যে মুখ-লুকিয়ে ফোঁপাচ্চে!

বলা বাহুল্য, টুক্‌নিকে বিদেয় করা হ'ল না।

দুপুরবেলা খোকা যখন ঘুমতে গেল, টুক্‌নি বাড়ির সব ঘরগুলোর ভিতর ঢুকে, কৌচের গায়ে হাত বুলিয়ে, চৌকির উপরে বসে, ম্যাটিঙের উপর গড়াগড়ি খেয়ে, আয়নার সাম্‌নে মুখ-ভেংচে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। তাকে সব-চেয়ে আশ্চর্য্য করেছিল ইলেক্‌ট্রিকের বাতি। সে একখানা টুল টেনে এনে তার উপরে দাঁড়িয়ে-উঠে হাত-বাড়িয়ে বাতির চাবি অনবরত খুল্‌তে আর বন্ধ করতে লাগ্‌ল। বাতি যেমন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে তার সেই আধ-বোজা চোখদুটো বিস্ময়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌তে থাকে। সে এক-একবার টুল থেকে তড়াক্‌-করে লাফিয়ে ইলেক্‌ট্রিকের তারগুলোর পথ চোখ-দিয়ে অনুসরণ করতে-করতে যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেইখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল; তারপর ছুটে গিয়ে আবার সেই টুলের উপর দাঁড়াতে লাগ্‌ল। আমি তার কাছেই বসেছিলুন; প্রতিমুহূর্ত্তেই আশা কর্‌ছিলুম সে হয় ত এখনই এসে তার এই বিস্ময়টা আমার কাছ থেকে ভাঙিয়ে নেবে। কিন্তু সে আমাকে কোনো প্রশ্নই কর্‌লেনা; আপনার বিস্ময়কে আপনি পরিপাক কর্‌তে লাগ্‌ল। তার এই একঘেয়ে কৌতূহলের ছুটোছুটি দেখে-দেখে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়্‌লুম; কিন্তু তার বিন্দুমাত্র অবসাদের লক্ষণ দেখা গেল না। তারপর, ঘুম-থেকে-উঠে খোকার গলার আওয়াজ যখন বার হ'ল তখন সে একবার কান-খাড়া করে শুনেই নিজের খেলা ছেড়ে ছুটে গেল।

সেদিন সমস্ত-দুপুর-বেলাটা মনের মধ্যে কেবলই একটা আশঙ্কার মতো হচ্ছিল যে এইবার টুক্‌নির বাপ-মা ছেলের সন্ধানে এইখানে এসে পড়্‌ল বলে! কিন্তু দুপুর থেকে বিকেল হ'ল, বিকেল সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু টুক্‌নির বাপ-মায়ের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিকেলে সে যখন খোকার সঙ্গে চৌরাস্তায় বেড়াতে গেল, তখন ভাবলুম নিশ্চয় সে রাস্তায় তার বাপ কিম্বা মায়ের হাতে গ্রেফ্‌তার হবে; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখি সে দিব্যি ফিরে এল। তাকে জিজ্ঞাসা

করলুম—“কি রে, তোর মা-বাপের সঙ্গে দেখা হয়নি ?”

সে বল্লে—“নেই !”—বলেই ছুটে পালিয়ে গেল ; আর প্রশ্ন করবার অবসর দিলে না।

রাত্রে খাবার পর আবার দেখি টুকুনি মহা ফুর্ত্তির সঙ্গে খোকাকে পিঠে-করে দোতলায় তুলছে। গিন্নী ধমক দিয়ে বল্লেন—“টুকুনি, আবার !”

গিন্নীর স্বরে বোঝা গেল খোকাকে পিঠে-করা একেবারে বারণ হয়ে গেছে।

টুকুনি গিন্নীর ধমকে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গিন্নী বল্লেন—“তুই ফের যদি খোকাকে পিঠে করবি তাহ’লে তোর গলা-টিপে বাড়ি-থেকে বার করে দেব।”

টুকুনি আস্তে-আস্তে খোকাকে নামিয়ে দিলে ; খোকা হুড়্দাড়্-শব্দে উপরে উঠে গেল ; টুকুনি সিঁড়ির রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সিঁড়ি-বেয়ে ওঠ্বার যেন আর স্ফূর্ত্তি নেই,—শক্তিও নেই। খানিক পরে সে আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে এক-পা-এক-পা-করে উপরে উঠে গেল। তারপর চুপ-করে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্ল।

পরদিন সকালে দেখি টুকুনির চেহারা একেবারে ফিরে গেছে। তার গায়ের রং যে অত ফর্সা আগে তা বুঝতে পারিনি। অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি দেখে গিন্নী বল্লেন—“উঃ, ওর গায়ে এত ময়লাও ছিল ! যত সাফ্ করি, তত ময়লা বেরোয়। দুখানা আস্ত-সাবান খরচ হয়ে গেল ! খোকার সঙ্গে বেড়াবে, অত নোংরা থাক্লে তো চল্বে না, তাই আজ ওকে সাফ্ করে দিলুম।”

দেখ্লুম, ময়লা উঠে গিয়ে টুকুনির টেবো-টেবো গাল-দুটোয় রক্তের আভা ফেটে পড়ছে ; মাথায় তেল পড়ে শুকনো চুলগুলো চক্চকিয়ে উঠেছে ; জুতো, জামা, টুপি পরে একেবারে ফিট্ফাট্ ! গিন্নী তার দিকে চেয়ে বল্লেন—“এতক্ষণে মানুষের মতন হ’ল ;—ছিল যেন একটা জানোয়ার কি ভূত !”

গিন্নী ঘটা-করে তাকে সাজিয়েছেন বটে, কিন্তু আমি দেখ্লুম সেই সজ্জার ভারে আসল টুকুনি কোথায় তলিয়ে গেছে! তার সেই ফুলে-ফুলে-দুলে-দুলে-ওঠা স্ফূর্ত্তিটা আঁটসাঁট কোট-পেন্ট্লেনে যেন ডুব্ড়ে চুপ্সে গেছে। তার মুখ দেখে মনে হ’ল যেন বেচারা নিতান্ত অসহায় ! চল্ছে, ফির্ছে—প্রতিপদে যেন বাধা ঠেলে-ঠেলে। এইভাবে সে খোকার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ফিরে যখন এল, তার সে-মূর্ত্তি আর নেই ! জামা-কাপড়ের বাঁধন ছিঁড়ে তার সেই চঞ্চল স্ফূর্ত্তি তখন সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। আষ্টেপৃষ্ঠে ধুলো মাখা ; জুতোর গোড়ালি উড়ে গেছে, পায়জামার একটা পা নেই, জামার বোতামগুলো কোথায় কে জানে, এবং পিঠের দিকটা সাম্নের মতোই খোলা হাঁ-হাঁ করছে !

এই অবস্থা দেখে গিন্নী তাকে খুব ধম্কাতে লাগ্লেন। তার মুখ দেখে আমি বুঝ্লুম মার হজম করা তার পক্ষে খুব সহজ, কিন্তু এই তিরস্কার সে সইতে পারে না। সে বকুনি খেয়ে খানিকক্ষণ তাঁর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, তারপর একদৌড়ে একেবারে খোকার খাটিয়ার নীচে গিয়ে সেঁধলো। গিন্নী হেসে বল্লেন—

"আচ্ছা-ছেলে বাপু, ওর সঙ্গে পার্‌বার যো নেই।"

খানিক বাদে খোকা এসে বল্লে—"বাবা, টুক্‌নি কোথায়?"

আমি বল্লুম—"চল্, খুঁজে বার করি।" বলে খোকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলুম। ঘরে ঢুকতেই খাটিয়ার নীচে থেকে কান্নার একটা ফোঁস্-ফোঁস্ আওয়াজ কানে এল। নীচু হয়ে দেখি হাত-দিয়ে চোখ-ঢেকে, টুক্‌নি উবুড়-হয়ে মাটিতে পড়ে কাঁদছে। খোকা ডাক্‌লে—"টুক্‌নি আয়।"

টুক্‌নি কোনো সাড়া দিলে না।

আমি বল্লুম—"টুক্‌নি বেরিয়ে আয়।"

তবুও কোনো সাড়া দিলে না।

শেষে গিন্নীকে ডাক্‌লুম। টুক্‌নিকে মাটিতে পড়ে কাঁদতে দেখে তাঁর যে মায়া করছিল সে তাঁর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল। তিনি ডাক্‌লেন—"টুক্‌নি।" আর-একবার ডাকলেন—"টুক্‌নি!" শুধু ঐ ডাক! বাঁশরী সুরে সাপ যেমন-করে আসে, ঠিক তেম্‌নি-করে টুক্‌নি বেরিয়ে এল। একবার কাতর-চোখে গিন্নীর দিকে চাইলে, কিন্তু যেমন তাঁর উপরে চোখ পড়া অম্‌নি তার মুখের উপরকার কালো ছায়াটা কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল। সে লাফাতে-লাফাতে ঘর থেকে ছুট দিলে।......

গিন্নীর শাসনে পড়ে টুক্‌নি সিধে হয়ে আসছিল। দুর্দ্দান্ত পশুকে যেমন-করে বশ করে, বোধ হয় তেম্‌নি কোনো কৌশলে গিন্নী তাকে বশ করছিলেন। কিন্তু আমি বুঝতে পার্‌তুম না, কিসের দায়ে টুক্‌নি এই শাসনের বশ্যতা স্বীকার করছে। বাঘও মানুষের বশ হয় জানি, কিন্তু কিসের জন্য তা আমি বুঝতে পারিনা!

টুক্‌নির চঞ্চলতাটাকে মুক্ত রাখলে ভাবনার কারণ আছে জেনে গিন্নী তার ঘাড়ে কাজের বোঝা চাপিয়েছিলেন। অবশ্য সেগুলো খোকারই খুঁটিনাটি কাজ। সে-গুলো সে কর্‌ত; কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যেত যে তা-থেকে সে যেন কোনো রস পাচ্ছে না। সকাল-বিকেল দুবেলা খোকা যখন তার চোখের সাম্‌নে ডংকির পিঠে উঠত, সে এমন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকৃত যে দেখে মায়া হয়! মনে হ'ত সে ঐ ডংকিটাকে হিংসে করছে। সে তখন আমাদের দিকে বারবার চেয়ে দেখত,—যদি আমরা-কেউ তাকে একবার বলি, তা'হলে সে এখনি খোকাকে পিঠে করে ছুট-দিয়ে মনের আশটা মিটিয়ে নেয়।...

তিন-চার দিনের মধ্যেই টুক্‌নির এমন বদল হয়ে গেল যে তাকে দেখলে মনে হ'ত না, এ সেই-টুক্‌নি;—যেন একটি শান্তশিষ্ট ছেলে! কিন্তু এক-একবার দেখতুম হঠাৎ তার এই শান্তভাব ঠেলে দুর্দ্দান্ত ঘোড়ার একটা তড়্‌বড়ানি ভিতর থেকে ঝাঁকি-মেরে উঠছে। সে তখন ছুটে-ছুটে খোকাকে পিঠে তুলতে যেত; কিন্তু গিয়েই হঠাৎ থেমে-পড়ে খোকার হাত-দুটোকে পিঠের দিক থেকে আস্তে-আস্তে গলায় জড়িয়ে-নিয়ে গোঁ-হয়ে বসে পড়ত। তারপর খোকাকে ছেড়ে কোথায় ছুটে বেরিয়ে যেত!

নানারকম খেলনা নিয়ে খোকা তাকে প্রায়ই ডাক্‌ত; সে খোকার সঙ্গে খেলায় যোগ দিত বটে কিন্তু তাতে তেমন স্ফূর্ত্তি

বোধ হয় হত না। সে খেল্‌তে-খেল্‌তে হঠাৎ পুতুলগুলোকে বিরক্তির সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠত। খোকা ধমক দিলে আবার সেই ছড়ানো-পুতুলগুলোকে জড়ো করে যেন দায়ে পড়ে খেল্‌তে বস্‌ত।

খেলায় তার মন ছিল না বটে কিন্তু খোকা যে-পুতুলগুলি তাকে বিলিয়ে দিয়েছিল সেগুলির প্রতি তার মায়া ছিল অসীম। সেগুলিকে সে দিন-রাত কাছে-কাছে রাখ্‌ত। খোকা দুপুরবেলা ঘুমুলে সেগুলি বার করে ঝেড়ে-পুঁছে আবার তুলে রাখত—ছোট্ট বুক-পকেটটির ভিতর খুব ঠেসাঠেসি করে। এই পুতুলের গায়ে কারো হাত দেবার যো ছিল না। আমি একদিন আদর করে ঐ পুতুল নিয়ে খেল্‌তে গিয়েছিলুম, সে অম্‌নি বাঘের মতো থাবা তুলে ফোঁস্‌ করে উঠল। তাড়িতাড়ি লুকিয়ে ফেল্লে।

গিন্নী টুকুনিকে দেখতেন আর বল্‌তেন—"নিশ্চয় আর-জন্মে টুকুনি খোকার ভাই ছিল! বোধ হয় এ-জন্মে মনে-মনে চিন্‌তে পেরেছে, নইলে অজানা অচেনা ছেলের উপর ঐ ছেলেমানুষের এতটা প্রাণের টান কোথা থেকে এল?"

যে-জন্মেরই হোক্‌, টুকুনি যে খোকার ভাই এই ধরণের একটা সংস্কার গিন্নীর মনে নিশ্চয় জন্মে গিয়েছিল; কারণ টুকুনিকে তিনি যে-চোখে দেখতেন, যে রকম স্নেহ, যে-রকম আদর দিতেন, তাতে কিছুতেই মনে হত না যে টুকুনি পরের বাড়ির ছেলে!

টুকুনি কি-চোখে আমাদের দেখতো তা টুকুনিই জানে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে সে যে দিন-দিন মুস্‌ড়ে পড়ছিল, আর-কেউ লক্ষ্য না কর্‌লেও, আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেতুম; মনে হত তার যা খোরাক, তা যেন এ-গৃহস্থের বাড়িতে দিন-দিন বাড়ন্ত হয়ে আস্‌ছে। এই বাড়ির আবহাওয়া প্রথম-দিন তাকে যে কৌতূহল দিয়ে আকর্ষণ করেছিল, আজ তা কোথায়? ইলেক্‌ট্রিকের বাতি এখন রোজই জ্বলে, কিন্তু তার সেই আধ-বোজা চোখ আর তেমন করে জ্বলে ওঠে কৈ? মেঝের ম্যাটিং তেমনই পড়ে আছে, তাতে সে কখনো শোয়, কখনো বসে-মাত্র, কিন্তু তেমন-করে লুটো-পুটি দিয়ে গড়াগড়ি খাবার ক্ষুধা যেন আর নেই। কৌচগুলোর সঙ্গে এখন যা সম্পর্ক, সে কেবল ঝাড়-পোঁছের মধ্যে;—তেমন-করে সন্তর্পণে তার স্পর্শটি চুরি-করবার প্রলোভন আজ কোথায় উবে গেছে! কোথাও যেন আর তেমন আকর্ষণ নেই; কেবল দেখতুম আমার আয়নার টেবিলের উপরে ফ্রেমে-বাঁধা খোকার যে-ছবিখানি ছিল, তার দিক থেকে তার চোখ আর ফেরে না। তার পানে সে অনবরত চেয়ে-চেয়ে দেখত — একটা দুর্দ্দমনীয় লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে-দিয়ে!

আমি তাকে বল্‌তুম—'নিবি?'

সে সমস্ত দেহসুদ্ধ-ঘাড়খানা নেড়ে বল্‌ত—"হুঁ!"

আমি যেই বল্‌তুম—"আচ্ছা, দেব এখন!" অম্‌নি সে আমার গায়ের কাছে এসে কুকুরের মতো গা-ঘস্‌তে থাক্‌ত। টুকুনি আর-কোথাও আমায় গ্রাহ্য করতনা, কেবল এই ছবির প্রলোভনে একটুখানি আকর্ষণ আমার জন্যে রেখেছিল। সেই জন্য এই ছবিখানি

আমি হাতে-রেখেছিলুম; তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকিয়ে ফেল্‌তে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না।...

টুক্‌নির বাপ-মায়ের কথা আমরা এক-রকম ভুলেই বসেছিলুম।—সে আমাদের কাছে এমন সহজ হয়ে এসেছিল যে সে যে আমাদের বাড়ির ছেলে নয় এ-কথা মনেই হ'ত না। কিন্তু আমরা ভুল্লেও, টুক্‌নির বাপ-মায়ের কোনো ভুল হ'ল না। একদিন বিকেল-বেলা বেড়াতে যাচ্ছি, এমন-সময় সেই বাপ-মা একসঙ্গে এসে হাজির হ'ল। তাদের মুখে শুনলুম বাড়ি-থেকে পালানো টুক্‌নির স্বভাব। প্রায়ই সে বাড়ি-ছেড়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এবার যে জঙ্গল ছেড়ে মানুষের বাড়িতে ঢুকেছে, বাপ-মা তা কেমন করে টের পাবে? কাজেই এই এক-হপ্তা তারা জঙ্গলে-জঙ্গলে খুঁজে-খুঁজে হয়রান হচ্ছিল। শেষে এই হাটের দিন সহরে এসে খোঁজ পেয়েছে।

টুক্‌নির বাপ গম্ভীর স্বরে বল্লে—"টুক্‌নি ঘর চল্‌!"

আমি আশা কর্‌ছিলুম টুক্‌নি সেই প্রথম-দিনের মতো এখ্‌নই বলে বস্‌বে—"নেই যায়ে গা!" কিন্তু দেখি টুক্‌নি সুড়-সুড় করে বাপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে তার আর কথা নেই। কেবল তার চোখ-থেকে মায়ার টানের একটি ছল্‌ছলানি সন্ধ্যার ম্লান আকাশকে ভার-করে তুল্‌তে লাগল। আমাদের কারো মুখে কোনো কথা বেরুলনা। গিন্নীর চোখের পাতা ভেরে এল; খোকার মুখ কাঁদো-কাঁদো; বাড়ির চাকর-বাকর সবাই পুতুলের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

টুক্‌নির বাপ বল্লে—"সেলাম হুজুর!" বলেই টুক্‌নির হাত-ধরে টান্‌তে-টান্‌তে নিয়ে গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, তার দিকে আমরা চেয়ে রইলুম। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দূর-আকাশের পাখীর মতো সে মিলিয়ে গেল। গিন্নী আর বেড়াতে গেলেন না; সাজসজ্জা ছেড়ে ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার আবছায়ায় চুপ-করে বস্‌লেন; খোকা কোথায় লুকিয়ে পড়ল দেখতে পেলুম না। সবাই একে-একে নীরবে সরে গেল; আমি কেবল একা সেই সন্ধ্যার আলোয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঝাপ্‌সা-চোখে দেখতে লাগলুম—কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকের মাঝের শ্বেতপদ্মটি বিদীর্ণ হয়ে রক্তের ধারা ঝরে-ঝরে পড়ছে!

হঠাৎ মনে হ'ল সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝড়ের মতো কে ছুটে এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতর গিয়ে দেখি খোকার সেই ছবিখানি নেই।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

নাদিরশাহের শেষ

[স্থান—প্রান্তর-মধ্যস্থ শিবির। কাল—হত্যা-রাত্রি, নিশীথ।]

তুমি চলে' যাও এখনি এ রাতে উজ্‌বেগ্-সর্দ্দার!
আমি একা রব'—কোনো ভয় নেই, দেরী আছে মরিবার।
কে মারে আমারে!—এখনো ছেড়েনি আকাশের গ্রহতারা,
জমিন্ ফাটিয়া নীলশিখা কই? প্রলয়ের বারিধারা?
অতলের তলে এখনো নামেনি 'আল্‌বোরজে'র চূড়া,
সুলেমান আর হিন্দুকুশের পাঁজর হয়নি গুঁড়া!
আমি না শাহান্-শাহা!
কার ভয়ে বাজ আকাশে ফিরিবে এখনি?—বাহারে বাহা!

চলে' যাও ফিরে ইমাম জাফর! ডেকে দিও দুরাণীরে,
কাল প্রাতে যেন আফগান-সেনা দাঁড়ায় শহর ঘিরে'।
কাল, কোহিনুর-তাজ শিরে আর তখ্‌ত-তাউসে চড়ি',
আর একবার খুন্-খুস্‌রোজ্ খেলিব পরাণ ভরি'!
দিল্লীর শাহ রেখেছিল পা'য় উষ্ণীষ তরবার,
তাই নিয়ে যাও, পরে' যেন কাল আব্‌দালি-সর্দ্দার।
আলির বংশধর!
মনে থাকে যেন ইমাম হুসেন, কারবালা-প্রান্তর।

সেখ শিয়া সুফী দরবেশ যত বাঁচে না যেনই কেহ,—
কাটিয়া পাড়িবে সবার মুণ্ড, খণ্ড করিবে দেহ;
ওমরাহদের শ্মশ্রু-বাহারে পাকাও পলিতা-ধূপ,—
ভাঙ্গা-মসজেদ চর্ব্বি-চেরাগে রোস্‌নাই হবে খুব!
জাফর! তোমার কাফেরগুলাকে রাখিব না কাল প্রাতে,
'রোজ্ কেয়ামত' দেখো দাঁড়াইয়া জুম্মা-বাড়ীর ছাতে।
—কোনো কথা নয় আর!
যাও, চলে' যাও! এবার জবাব জেনো এই হাতিয়ার।

আঃ বাঁচা গেল! তবু মনে হয় কে যেন রহিল পাছে!
না না, কেহ নয়,—আমারি ও ছায়া পর্দ্দায় পড়িয়াছে।
একি হ'ল একি! বড় তাজ্জব!—ছায়া নয়, ও যে ছবি!
একবার সেই দেখেছিনু ওরে, ভুলে গিয়েছিনু সবি;—
দিল্লি-শহরে দুইপহরের মহামারী-চীৎকার,
একা বসেছিনু, মস্‌জেদ্ সেই রুকনোদ্দৌলার,—
হঠাৎ দেয়ালে ছায়া,
ঠিক এইমত ঘুরে' গেল মাথা, হঠে' গেল চৌপায়া!

দূর দূর! আরে দেখ দেখ—যেন পাহাড়ী সাপের চোখ!
অবশ করিয়া বেহুঁস করিল, হরিল সকল রোখ্;
ওর পানে চেয়ে সেদিনের মত আজো জাগে আফ্‌শোষ্,
মনে পড়ে যায় বালক-কালের দিনগুলি নির্দ্দোষ।
দেখ, সয়তান মিলাইয়া যায় স্মরণে সে কথা আনি',
চোখ দিয়ে বুকে বিষ ঢেলে' দিয়ে, মাথায় মুগুর হানি',
—এ কি হল, হায় হায়!
এ বুড়া বয়সে সে দিনের মত আবার দাঁড়ান' যায়!

মাথা হ'তে যেন সকল রক্ত শুষে' নেয় নাভি-শিরা!
কি যেন বাঁধন বেঁধেছিল বুকে, খুলে যায় তার গিরা!
'হাশিশ্' খাওয়ায়ে, অজ্ঞান করে' রেখেছিল এতদিন—
'জম্‌জম্'-জলে ধুয়ে দিল মাথা দিল্‌দার কোন্ জিন্!
রক্তের নেশা একেবারে যেন ছুটে' যায় লহমায়,
পরীর আঙুলে পরাইল চোখে স্তাম্বুলি সুর্ম্মায়!
—ডুবে' যাই, গলে' যাই!
তাজ সম্‌শের ফেলে দিনু এই, কিছুতেই কাজ নাই।

নাদির! এখনি ভুলে গেলে, তুমি দুনিয়ার দুষ্‌মন্!—
বাতিল করেছ কায়কোবাদের ধর্ম্ম-সিংহাসন;
কোটী শবদেহে দেয়াল তুলিয়া আল্লার আস্‌মান্

পাথরে আছাড়ি' মারিয়াছ শিশু, জননীর কোল ছিঁড়ে',
ক্রোশ হ'তে ক্রোশ আগুন দিয়েছ মানুষের সুখ-নীড়ে ;
আপন ছেলের চোখ,
নখে করি' ছিঁড়ি' উপাড়ি' ফেলেছ, কিছু কর নাই শোক !

সে নহে নাদির, মানুষ নহে সে,—খোদারি সে কারসাজি—
সয়তান, সেও পারে কি এমন দেখাবারে ভোজবাজি ?
স্থির হও মন, ভেবে দেখি আজ কে করেছে সেই খেলা—
আমি ত' মানুষ সবারি মতন, কাদা ও মাটীর ঢেলা !
বুকে মারো ছুরি, গল্‌গল্‌ করে' বাহিরিবে রাঙা-জল,
এই দেখ চোখে এখনি অশ্রু করিতেছে টল্‌টল্‌,
—এত কুদ্‌রৎ তার !
আল্লা তালা আক্‌বর ! এযে মতলব বোঝা' ভার !

বারুদের মত কালোমেঘে বাজ তোপ দাগে, দেখ নাই ?
আগুন ছুটিয়া পাহাড়ের মুখে কত দেশ হ'ল ছাই !
সাগরের জল-স্তম্ভনে আর ভূমিকম্পনে যাঁর
হুকুম তামিল করে দেবদূত পৃথিবীতে বার বার,
ইসারায় তাঁরি জেগেছিল দূর ইরাণের সীমানায়
যুবা আফ্‌সারী—নাদির, এ নাম দিয়েছিল বাপ মা'য় ;
মেষ-পালকের আজি,
দুনিয়ার সেরা দুষ্‌মন্‌ নাম,—এ কাহার কারসাজি ?

সেই কথা মোর ছিল নাক' মনে, থাকে না বোধ হয় কা'রো,
ভুলেছিনু আমি মানুষ যে শুধু—ভেবেছিনু, বড় আরো !
লক্ষপরাণ হানিবার কালে ভুলেছিনু এক প্রাণ—
সে যে সেই-মত করে ধুক্‌ ধুক্‌, তেমনি দয়ার দান !
তারি সাথে আজ মুখোমুখী করে' দিয়ে গেল মাঝরাতে,
দেখিতেছি তা'র আগাগোড়া ছুরি মারিয়াছি এই হাতে—
বিস্‌মিল্লা রহমান !
নাদির তোমার বান্দাই বটে, যত হোক্‌ বেইমান্‌ ।

নাদির ! নাদির !—সাড়া নাহি দেয়, একেবারে মরিয়াছে !
আরে সয়তান ! সয়তানী তোর বেইমানী ধরিয়াছে !
সেই বাহু এই লোহার সমান, ওই সেই করবাল,
তুর্কি-শোণিত-মেহেদির রঙে নখ যে এখনো লাল !
বোখারা-বিজয়-উৎসব-দিনে নর-শির-পর্ব্বত
করে নাই খুসী, ক্ষীণ মনে হ'ল দরবার-নহবত,—
আজ তার হ'ল ভয় !
নাদির ! নাদির ! এতদিনে তোর এই হ'ল পরিচয় !

মরিয়াছি আমি, চলে' গেছি আজ সেই পাহাড়ের ধারে—
প্রেত হয়ে আজ সন্ধান করি, জীবনে ভুলেছি যা'রে ;
জ্যোৎস্নার মত প্রভাত-রৌদ্র মিশে আছে কুয়াসায়,
ঝিক্ ঝিক্ করে' বহিছে নদীটি গিরিদের পা'য়-পা'য়,
দেবদারু-শাখে জড়ায়েছে লতা সোণালিঝুমুকাভরা,
আখ্রোট্-সারি ঝুরিছে শিশিরে, আপেল পাকিবে ত্বরা—
এই সেই গ্রামপথ,
এর ধূলা ছেড়ে চেয়েছিনু আমি বাদশাহী মস্নদ্ !

নওরোজ্-বেলা হ'ল অবসান, আকাশে সুতালী চাঁদ ;
তরুণী ইরাণী সারাদিন কত পাতিয়াছে ফুল-ফাঁদ !
কস্তুরী-কালো পশ্মিনা চুলে বিনায়ে চামেলি-মালা
আজ গোলাপের অপমান কেন ? গজল্ গাহনি বালা ?
আঙ্গুরের রস কোথা পেয়ালায় ?——
তহ্মিনা ! তহ্মিনা !
চাও, কথা কও ! কোথা সুখ নাই নাদিরের তোমা বিনা !
আজ নওরোজ্-রাতে,
আশেক এসেছে যৌতুক দিতে দিল্ তার ওই হাতে।

কবেকার কথা ! আমি ভুলেছিনু, তহ্মিনা ভুলিল না !
স্বপনেও তার চোখদুটি মোর মুখ 'পরে তুলিল না !
তুষার-রশ্মি অচপল দুটি সন্ধ্যা-তারার মত
নয়নে বিঁধিল বড় ঘৃণাভরে হৃদয়ের এই ক্ষত !

লুটাইনু পা'য়, বলিনু বাঁচাও,—সঞ্জীবনী সে পাতা
জেনেছিল তার মায়ের নিকটে, আর কেহ জানে না তা!
তহ্‌মিনা চলে' যায়,
দূরে, দূরে—শেষে মিশে গেল ওই আকাশের তারকায়।

চাঁদ ডুবে গেল, নিবে' যায় ওই 'পার্‌বিন্‌' 'মস্তারা'—
একি থম্‌ থম্‌ করে আস্‌মান্‌ নীল-ইস্পাত পারা!
মাঝখানে তার আগুনের চাকা ঘুরে' ঘুরে' উঠে নামে,
জলন্ত-বালু পার হ'য়ে আসে মুর্দারা তাঞ্জামে!
ঘূর্ণি ঘুরিছে দক্ষিণে বামে রক্তের দরিয়ায়,
দব্‌ দব্‌ করে বাতাস, যেন সে মার খেয়ে মুরছায়!
ঢাল যেন তরবারে—
সারা ময়দান ঝন্‌ ঝন্‌ করে, ফেটে যায় হাহাকারে!

কি ঘোর পিপাসা! জিহ্বা তালু যেন ফুলে' যায় সবাকার!
কালো হয়ে গেল ওষ্ঠ-অধর, জল নাই ভিজাবার।
দূরে দেখা যায় ঝরণা ঝরিছে, কাছে গেলে আর নাই!
এ কি দিল্লগী আল্লা গাফুর! মাফ চাই, মাফ চাই!—
আঃ বাঁচা গেল! কোথায় ছুটেছে,—কি যেন আওয়াজ হয়?
বাহিরে বুঝিবা পাহারা-বদল? নাঃ, ও কিছুই নয়।
খোদা যে মেহেরবান্‌!
স্বপনে এখনি দেখাইল তাই 'হাশরে'র ময়দান।

কে পশিল ওই চোরের মতন? কারা আসে পাছে পাছে?
ইরাণীর লোক,—হাঁ হাঁ বুঝিয়াছি, এস ভাই এস কাছে।
কিরীচ্‌ খোলা যে! আরে বেতমিজ্‌ বজ্‌দেল্‌ কাপুরুষ!
নাদির দাঁড়ায়ে সমুখে তোদের, এখনো হয়নি হুঁস্‌!
হা হা, হঠে' যায়!—মারিবে, তবুও স্বর শুনে' হঠে' যায়!
আয় চলে' আয়, ধর্‌ গর্দ্দান, কাজ নাই তামাসায়।
আফ্‌সারী সর্দ্দার!
তুমিও এসেছ!—বংশের কাঁটা ঘুচাইবে এইবার?

ভয় নাই, এস ; নাদির মরেছে,—নহিলে এখনো তুমি
দাঁড়ায়ে রয়েছ মাথা না নোয়ায়ে, জানু পাতি' মাটী চুমি' !
ফেলিয়া দিয়াছি তাজ দেখ ওই, কাছে নাই হাতিয়ার,—
তোমাদেরো আগে পেয়েছি সমন মৃত্যু-ফেরেস্তার।
এসেছিস বড় ওক্ত বুঝিয়া, তা না হ'লে কুক্কুর !
আর কিছু আগে বুঝিতাম তোরা কত বড় বাহাদুর।
নসীবের কেরামত !—
এতদিনে বুঝি শেষ হয়ে এল জাহান্নামের পথ !

তক্‌রার রেখে ধর্ তরবার ! আহমদ্ আব্‌দালী
এখনি আসিবে, শিরগুলা কাটি' কুত্তারে দিবে ডালি'।
পিঠে কেন ? আহা, ঘাড়ে মারে ফের ! স্থির হ'য়ে মার বুকে—
বড় সে কঠিন !—খুব করে' ছুরি বসা'ও, মরিব সুখে।
আহাহা আল্লা ! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে !
বিচারের কালে এ-কথা ধরিয়া, গুণা কিছু মাফ হ'বে ?
শেষ হয়ে গেল—বাপ !—
ইরাণের ধ্বজা, ইরাণের গ্লানি, বিধাতার অভিশাপ !

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

আধুনিক ভারতের শ্রমশিল্প বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা

(ফরাসী হইতে)

ভারতের শ্রমশিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি কিরূপে হইল তাহা ঠিক বুঝিবার পক্ষে কতকটা সাহায্য হইবে বলিয়াই আমরা ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় নগরের বর্ণনা করিয়াছি।

শ্রমশিল্প

প্রাচীন ভারতের শ্রমশিল্প প্রধানত কলা-শিল্প বা বিলাস-শিল্প ছিল ; জয়পুর, লাহোর ও দিল্লীতে কাগজ বা হস্তিদন্তের উপর ক্ষুদ্রাকারের চিত্র ; লক্ষ্ণৌয়ে পোড়া মাটির ছোট ছোট মূর্ত্তি, সাঙ্গীতিক যন্ত্রাদি, খোদাই-কাজকরা কাঠের জিনিস, রত্নালঙ্কার, সোণার রূপার ও তাঁবার দ্রব্য, মিনার কাজ, স্বর্ণরেখাঙ্কিত ফুলকাটা ইস্পাৎ, লাক্ষা, কাঠ ও মার্ব্বেলের উপর খোদাই-চিত্র (আগ্রা),

মৃণ্ময় পাত্রাদি, কাচের দ্রব্যাদি, পেটা চামড়ার জিনিস, জরির কাপড়, গালিচা, কাশ্মিরী কাপড়, মস্‌লিন, রেশম ও তুলার কাপড়।

প্রাচীন অভিজাতবর্গের দৈন্যদশা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজের প্রতিযোগিতা-নিবন্ধন এই সমস্ত শিল্প-ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়াছে। বিলাতি জিনিসের নকল করায় ভারতীয় শিল্প-সামগ্রীর রমণীয়তা ও মৌলিকতাও নষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে য়ুরোপের নিকট হইতে ভারত মুদ্রাঙ্কনবিদ্যা, এন্‌গ্রেভিং, ও ফোটোগ্রাফি শিখিয়াছে (১)

*

* *

ভারতে, য়ুরোপে-প্রচলিত বড় বড় শ্রমশিল্প খুব কমই সংস্থাপিত হইয়াছে। রেলওএ-কোম্পানীরা তাহাদের উপকরণ-সামগ্রী নির্ম্মাণ করে। পশ্‌মী কাপড়, মাটীর বাসন, চর্ম্মশোধন, মদ-চুয়ানো, কাগজ-তৈয়ারি এই সমস্তের কারখানা আছে; কিন্তু উহাদের সংখ্যা খুবই কম। (২)

১৮৯৯-১৯০০ অব্দে, ১৮৬ তুলার কারখানা, মূলধন ১৫৬,৯৭৪,০০০ টাকা; টাকু—৪,৭২৮,৩২৪; মজুর:—১৬৩,২৪১;—১৯০০-১৯০১ অব্দে মূলধন—১৬৫,৩০৫,০০০ টাকা; টাকু—৪,০৩২; ৬০২। জুট ও শনের ৩৩টা কারখানা; ১৮০৯-১৯০০ অব্দে মূল-ধন—৫১,৯০০,০০০; টাকু ২৯৩,২১৮; মজুর—১০১,৬৩০; ১৯০০-০১ অব্দে, মূল-ধন—৫৪,০৫০,০০০; টাকু ৩১৫,২৬৪।

১৮৯২ অব্দে ২৬টা য়ুরোপীয়দিগের, ১৮টা পার্শীদিগের, ৬৪টা হিন্দুদিগের, ৭টা মুসলমানদিগের ও ৩টা ইহুদীদিগের তুলার কারখানা। বেতনের হার এখনও নিম্ন।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে ভারতবাসীরা বৃহৎ-শ্রমশিল্পের চেষ্টা সবে-মাত্র আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের চেষ্টার পথে অসংখ্য বাধা আছে। কতকগুলি বাধা উপকরণ-সম্বন্ধীয়:—যথা লৌহখনি ও কয়লার অভাব। কতকগুলি বাধা সামাজিক ধরণের, যথা—বর্ণভেদপ্রথা ও পারিবারিক সাধারণ স্বত্বাধিকার-প্রথা। আর কতকগুলি বাধা মানসিক ও ধর্ম্মনৈতিক: সকলের মধ্যেই মনোযোগের অভাব, ব্যবসায়িক শিক্ষা-সম্বন্ধে আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব; অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত লোকের মধ্যে লিখন-পঠন-সাপেক্ষ কাজেই (liberal) বেশী অভিরুচি (৩)।

(১) আধুনিক ভারতের শিল্পকলা আমি আলোচনা করিব না। উহার কোন আকর্ষণ নাই। ইংরেজ বাস্তু-শিল্পীরা, ইংরেজী ধরণেরই হউক, আধা-বিলাতী আধা-প্রাচ্য ধরণেরই হউক, বড় বড় স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রস্তর-মূর্ত্তিগঠনের অস্তিত্বই আর নাই। আর যদি ছবির কথা বল, পারসীকদিগের অনুকরণে শুধু ক্ষুদ্রাকার ধরণের চিত্র আছে।

(২) এই সব শ্রমশিল্পের অধিকাংশই আনুসঙ্গিক সাজ-সজ্জার শ্রমশিল্প। তাই, রেলওএতে যে-সব যন্ত্রপাতি লাগে সে সমস্তই য়ুরোপ হইতে আনান হয়,—পেরেক, ইস্ক্রুপ, ছোট ছোট চাকা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি—

(৩) ভারতীয় শ্রমজীবীর শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক; এই দুর্ব্বলতার কারণ—পুষ্টিকর আহারের অভাব ও বাল্যবিবাহ। যাহা হউক কয়েক বৎসর হইতে, ভারতবাসীরা, যাহা তাহাদের

বাণিজ্যব্যবসায়

কোম্পানীর আমলের আরম্ভভাগে রপ্তানি ১০ লক্ষ পৌণ্ড ছাড়াইয়া যায় নাই।

১৮৯৪-১৯-এর পূর্ব্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য—গড়ে ৭৩,১৫৯,৫৩৪ টাকার রপ্তানি মাত্র ছিল।

কোম্পানীর আমলের শেষাশেষি—১৫৮, ৫১৯,৩৯৬ ও ২০০, ১৭১, ২৫০।

১৮৭০-৭১ অব্দে—৩৯৯, ১৩৯, ৪১৮ ও ৫৭৫, ৫৬৯, ৫০৬।

১৮৯৮-৯৯ অব্দে—৮৯৯, ৯৭১, ৪০০৬ ও ১, ২০২, ১১৯, ৪৪৫।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (১৮৭৮)। (১২ মাস কাল) গড়ে সাহায্য পায়—

পূর্ত্তকর্ম্মে ৫৫৭,০০০ লোক নিযুক্ত হয়, ১৩, ৭৫০ জনকে আশ্রমে আশ্রয় দেওয়া হয়। মৃত্যুর বৃদ্ধি ১,২৫০,০০০।

মাদ্রাজ (১৮৮৯)।

মাদ্রাজ, বঙ্গ, ব্রহ্মদেশ, আজমীর (১৮৯২)।

ভারতের উত্তরাঞ্চল, বাঙ্গলা, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাইতে (১৮৯৭) সরকারী বিবরণ অনুসারে ১৮৭৯ জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৪, ২৪০,০০০ লোক সরকার হইতে সাহায্য পায়। মৃত্যুর বিবরণ-তালিকায় দেখা যায়—১৮৯৭ অব্দে ৭, ৬৫৮, ৬৪২ এবং ১৮৯৮ অব্দে ৫, ৬৯, ৫৫২ জনের মৃত্যু হয়। বিভিন্ন কারণে—১, ৪৪৬, ১৪১; পর বৎসরে ঐ জায়গায় ১, ৩৪৪, ৯২৭ লোক মরে: আমাশা ও উদরাময় ২০৯,০৩৫-এর জায়গায় ৩৯৬, ৭০৪। জ্বর: ৩, ৮১৭ ৫৫৬ এর জায়গায় ৪,৯৮৯,৯১১। ওলাউঠা: ১৫০,৮১৭ এর জায়গায় ৫৫০,৭৪৭। বসন্ত রোগ ৫৫, ৭১৩-এর জায়গায় ১৬০, ২১৭। মৃত্যুর এই বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের উপর আরোপ করিতে হইবে।

পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্য-প্রদেশ, বোম্বাই (১৯০০-১৯০১) ১৯০০র আগষ্ট মাসে প্রথম সপ্তাহে সাহায্য পায়—৬, ৫৫৬,০০০ (যাহার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ দেশীয় রাজার রাজ্যের লোক)। মৃত্যু-সংখ্যা—৮, ৩০৪, ১৫৫।

এখন দেখা যাক পুনঃ পুনঃ সঙ্ঘটিত এই সকল দুর্ভিক্ষের কারণ কি? অবশ্য ভারতের কৃষিকার্য্য, মৌসুমের বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে। উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তিন মাস বর্ষা। জুন মাসের মাঝামাঝি ও সেপ্টেম্বরের শেষ। যথেষ্ট বৃষ্টি না হইলে, আদৌ ফসল হয় না, কেন না, বৎসরের অবশিষ্ট অংশে আর বৃষ্টি হয় না। যেখানে সরকার হইতে খাল বাঁধ প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে কেবল সেই সকল প্রদেশরই রাজস্ব সুনিশ্চিত; পক্ষান্তরে ভারতের যে-সব প্রদেশে বাঁধ নাই, খাল নাই, জলের চৌবাচ্চা নাই, সেই সকল প্রদেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তথাপি দুর্ভিক্ষ বলিলে সচরাচর যাহা

চরিত্রের সহিত খাপ্ খায় না এইরূপ কতকগুলি শ্রমশিল্পের উপযোগী গুণের পরিচয় দিয়াছে; বঙ্গ ও আসামের বাষ্পপোতে দেশীয় লোকেরাই কাপ্তেন ও টাণ্ডেলের কাজ করে; যেখানে যন্ত্রপাতি খুব জটিল ধরণের সেইরূপ কল-কারখানাতেও সকল শ্রমজীবী ও সকল হেড্ মিস্ত্রীই ভারতবাসী লোক।

বুঝায় ভারতের দুর্ভিক্ষ সেরূপ নহে। সুদূরবর্ত্তী জিলাতেও রেল যোগে খাদ্য আনা যাইতে পারে এবং ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য এত বেশী, ভারতবাসীর অভাব এত অল্প, ও বহির্দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য এত সচল ও সচেষ্ট যে ভারতের কোন প্রদেশেই বেশীদিন খাদ্যের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার প্রমাণ,—১৮৯৬-১৮৯৭ ও ১৮৯৭-৯৮—কঠোর দুর্ভিক্ষের এই কয়েক বৎসর ক্রমান্বয়ে ২৭, ৮২৭, ২৬২ ও ২৬, ৩৫৯, ৯৮৮ (hundred weight) চাউল; ১, ৯১০, ৬২৬ ও ২, ৩৯২ ৬০৭, গম; ২, ৬৯৬, ২১৭ ও ২, ২০২, ৬৯৪ (hundred weight), অন্যান্য শস্য রপ্তানি হয়। ১৮৯৯ ১৯০০-দুর্ভিক্ষের এই বৎসরে,—৩১, ৮৬৯, ৫৯১, ৯, ৭০৪, ০৯৭ ও ৩, ০৭৬, ৪০৯ (hundred weight) রপ্তানি হয়। ১৮৯৮-৯৯ এই অনুকূল বৎসরে:—৩৭, ৩৯৭, ৪০,—১৯,২, ৪৯৬ ও ৪, ৫১৩, ২০৮ রপ্তানি হয়। ঐ সকল বৎসরে শস্যের আমদানিও ছিল (১৮৯৭-৯৮) ১, ০৭২, ৪১৫ (hundred weight) মাত্র, (৮৯৯-১৯০০)— , ৫০৯, ৫৭৫; (১৯০০-০১) ১, ৯৫৫, ০৯৫—পক্ষান্তরে সচরাচর স্বাভাবিক অবস্থার বৎসরে (১৮৯৪-৯৫) শস্যের আমদানি হয় ৮৪৩, ৫২৩ hundred weight।

১৮৯৯-১৯০০—৯,২, ৭৮১, ৬৫৬ ও ১, ১৭০, ৩৯৭, ০৯২।

১৯০০-০১—£৭০, ৩১৪, ২৩৭, £৪১, ২৯৭, ৩০৭।

১৮৯৯-১৯০০—আমদানির অঙ্কে—মূল্যবান ধাতু ছিল £১৩, ৯৮২, ৪৫৭।

১৯০০-০১ অব্দে—£১৬, ৩৮৪, ৫০৮;

১৮৯৯-১৯০০ অব্দে রপ্তানির অঙ্কে ছিল £৫, ৩০৪, ২৫৮।

১৯০০-০১ অব্দে রপ্তানির অঙ্কে ছিল £৯, ৪৮০, ৯৩০।

১৯০০-০১ অব্দে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির অতিরেক (মূল্যবান ধাতু-সমেত) ছিল £১০, ৯০৩, ০৭৩।

পক্ষান্তরে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সমস্ত রপ্তানিই কাঁচা মাল এবং সমস্ত আমদানিই কারখানার তৈয়ারী জিনিস্।

অতএব দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ড কর্তৃক পরিচালিত ভারত এখনো দুর্ব্বল, কুণ্ঠিত—ভারতের বিস্তার ও জন-সংখ্যার হিসাবে জগতের বিপণিতে যোগ্য আসন অধিকার করিতে এখনো সমর্থ হয় নাই।

অর্থ নৈতিক অবস্থা

আধুনিক ভারতের বৈষয়িক অবস্থা ত এইরূপ। নৈতিক অবস্থা আলোচনা করিয়া পূর্ব্বেই আমাদের যে ধারণা হইয়াছিল এই বৈষয়িক অবস্থার আলোচনায় সেই ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে:—ভারত দরিদ্র।

*

* *

ইহার প্রমাণ আমরা দেখাইতেছি।

Lord Curzon অনুমান করেন, ব্রিটিশ ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ৪৫০ ক্রোর টাকা হইবে। কৃষি হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় গড়পড়তায় ২০৲ টাকা, উহার সহিত শ্রমশিল্পোৎপন্ন আয় যোগ করিলে, ৩০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। অতএব গভর্ণমেণ্টের অনুকূল

হিসাব অনুসারেও, প্রত্যেক ভারতবাসীর বাৎসরিক আয় গড়পড়তায় হয় ৫০ ফ্র্যাঙ্ক, কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব, ভারতে ধন অত্যন্ত অসমানভাবে বিভক্ত এবং কৃষককে স্বল্প আয়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

এই দারিদ্র্যের আরও প্রমাণ আছে। আয়ের উপর কর:—৪৮২, ৪৮২ ব্যক্তির আয় ৫০০ টাকার উপর, তন্মধ্যে ৮১,০৬৯ ব্যক্তির আয় ২০০০, টাকার উপর। আয়ের অঙ্ক সবশুদ্ধ ধরিলে ৫০, ৬৩০, ০০০ হয়।

ব্যাঙ্কের মূলধন ১৮৮৯ অব্দে নির্দ্ধারিত হয়;—ভারতে অধিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক-সমূহের মূলধন ৪৪, ০২৮, ৭১০ টাকা; ভারতের বাহিরে অধিষ্ঠিত ব্যাঙ্কসমূহের মূলধন ৮, ৯৪৪, ৯৬৩ পৌণ্ড।

সমস্ত যৌথ-কোম্পানীর (ব্যাঙ্ক-বাণিজ্য, শ্রমশিল্প, নৌ-চালন, খনি, চাষ) মূলধন,—১৮৯৯-১৯০০ অব্দে,--২৩, ৬২৫, ৫৫০ পৌণ্ড মাত্র উঠিয়াছিল।

বেতন—(১৯০০) গড়পড়তায় কতকগুলা বেতনের হার দিতেছি:—রাজমিস্ত্রী, ছুতোর কিংবা কামার:—কলিকাতায় ১৮, হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত; দিল্লিতে ১৫, ৫।—কর্ম্মক্ষম বলিষ্ঠ বয়সের কৃষি-মজুর—কানপুরে ৩, ৫৬ হইতে ৫; দিল্লিতে, ৭, ৭৫; বোম্বায়ে ১১; নাগপুরে ৫।

*

* *

কিন্তু ভারতে গুরুতর রকমের দুর্ভিক্ষ পুনঃপুনঃ হইয়া থাকে—ইহাই ভারতের দারিদ্র্য সম্বন্ধে একটা দারুণ প্রমাণ।

১৭৭০ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত ২২ বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী কাগজপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

শেষের দুর্ভিক্ষগুলার বিবরণ:—

মাদ্রাজ বিভাগে (১৮৭৭)। খুব সঙ্কট-কালে (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) ২, ২১৮,০০০ লোক সাহায্য পায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতের দুর্ভিক্ষ খাদ্যের অভাবে হয় না, অর্থের অভাবেই হয়। ইংরেজি বাক্য-অনুসারে ইহা money-famine অর্থাৎ অর্থের দুর্ভিক্ষ! ভারতের চাষা এত দরিদ্র ও এত-কম মিতব্যয়ী যে তাহার কোন সঞ্চিত অর্থ থাকে না। মাঝামাঝি ফসলের বৎসরের পর, যে বৎসরে একেবারেই ফসল হয় না, সে বৎসরে চাষা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে; সুতরাং গভর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে যে খাদ্য পাঠাইয়া দেন, চাষা তাহা ক্রয় করিতে পারে না। আবার সরকারও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারেন, তাহার অধিক নহে। সরকার ধার করিতে পারেন কিংবা টেক্‌স বসাইতে পারেন। কিন্তু ভারতের রাজকোষ ঋণভারে ভারাক্রান্ত; এবং করের কথা যদি বল; ভূমি-করই একমাত্র কর যাহা উৎপাদক; কিন্তু সমস্ত দেশ কর-ভারে অতিমাত্র ভারাক্রান্ত। যে প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেই প্রদেশের সাহায্যার্থ, অন্য সমস্ত প্রদেশকে ত দুর্ভিক্ষে পরিণত করিতে পারা যায় না।

পুনঃ পুনঃ ধার করিতে না হয়, কর বাড়াইতে না হয়—এইজন্য সরকার "দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডার" স্থাপন করিয়াছেন; বিশেষ

বিশেষ টেক্‌স হইতে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করা হয়। সরাচর বৎসরে, এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে রেল-পথ ও খাল তৈয়ারী হয়; যে সকল প্রদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বেশী, এই রেল-পথ ও খালের দ্বারা সেই সব প্রদেশে খাদ্য চালান দেওয়া হয়; এই ভাণ্ডারের কিয়দংশ ঋণ শোধ করিবার জন্য (এই ঋণের মুখ্য অংশ পূর্ব্ববর্ত্তী দুর্ভিক্ষের খরচের দরুণ) প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষের বৎসরে কর্ম্মশালা খোলা হয়, এই কর্ম্মশালায় অভাব-ক্লিষ্ট দৈন্যগ্রস্ত লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ের কাজ চালাইতে পারে।

১৮৯৭-৯৮ অব্দে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার হইতে ৩, ৫৪৮, ৫৯২ পৌণ্ড এবং ১৯০০-১৯০১ অব্দে ৪, ১৭৪, ৪২৮, পৌণ্ড সাহায্য দেওয়া হয়। ভারতের ন্যায়, ইংলণ্ডেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থে প্রায়ই প্রভূত ব্যক্তিগত দান প্রাপ্ত হওয়া যায়। (৪)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুর্ঘটনা

(১৭)

খেলায় হারিল বিজনকুমার, শরৎকুমারের কণ্ঠে উঠিল রাজকুমারীর ফুলমালা; ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন সুজন রায়। জ্যোতির্ম্ময়ীকে পুত্রবধূ করিবেন—এই সংকল্পে কিছুদিন যে উপদ্রব-বাণ কার্য্যকাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, আবার রীতিমত ভাবে তাহার বিক্ষেপণ-আয়োজন আরম্ভ হইল। নদীতে একটা নূতন চড়া পড়িতেছিল; সে চড়া যে রাজার জমীদারী-ভুক্ত, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই; আইন-আদালত বুঝিয়া এতদিন সুজন রায় নিজেই তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন; হঠাৎ এক রাত্রে রাজ-প্রজাদিগের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া এই চরের একাংশ নিজ এলাকাভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিস্ফল হইল; জিতিল রাজদলই,—কিন্তু উভয়পক্ষেই জখম হইল অনেক লোক। ইহার মধ্যে রাজসর্দ্দার বলবন্তসিং গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই সংবাদ পাইয়া দেওয়ানের সহিত পরামর্শে

(৪) সরকারের প্রতিপক্ষীয় লোকেরা বলে, পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষের সংখ্যা এখন বেশী কিন্তু ইহা কথার মার-প্যাঁচ মাত্র। পূর্ব্বে, যে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক অনশনে মরিত; সেই দুর্ভিক্ষকেই দুর্ভিক্ষ বলা হইত; আজকাল এইরূপ বলা হয় যে, বঙ্গদেশ ও অযোধ্যায় ১৯০০-০১ অব্দে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; তখন এই বৎসরেও উক্ত দুই প্রদেশের কোন প্রদেশেই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। ১৯০০-০১ অব্দে যে সকল প্রদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সেখানেও অনশনে অল্প লোকই মরিয়াছিল! খারাপ খাদ্যের দরুন আমাশা, ওলাউঠা ও জ্বর হইয়া, এই মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বে, সঠিক বিবরণ-তালিকার অভাব ছিল; যে ওলাউঠায় মরিত, তাহার মৃত্যু দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যুর মধ্যে পরিগণিত হইত না, তাছাড়া লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মৃত্যু-সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্যাপৃত থাকায় আজ বিকালে যথাসময়ে রাজা গৃহে ফিরিতে পারেন নাই।

পিতাকে স্বাগত করিয়া লইতে সিঁড়ির ঘরে আসিবামাত্র তাঁহার চিন্তা-বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য সব কথা ভুলিয়া গেল। তাহার সৌৎসুক কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—"বাবা!"

এই ক্ষুদ্র সম্বোধন-শব্দের মধ্যে একটা মর্ম্মান্তিক আকুল প্রশ্ন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন—"চল্ রাণি, ঘরে গিয়ে সব কথা বলছি।" বলিয়া কন্যার স্কন্ধে স্নেহহস্ত সংস্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী হরকরাকে কহিলেন—"ডাক্তারকে ডেকে আন।" জ্যোতির্ম্ময়ী কহিল,—"ডাক্তার-দা তোমার অপেক্ষায় বারান্দাতেই আছেন। তিনি কাল বাড়ী যেতে চান।"

পিতা, কন্যা গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর শরৎকুমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তাঁহাকে উপবিষ্ট হইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—"বস ডাক্তার। তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে যাও, কিন্তু আমরা তোমাকে ছাড়তে পারি কই!" শরৎকুমারের মুখ হাস্য-প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—"আমি ত যাবার কথা এখনো আপনাকে জানাইনি।"

—"মনের কথা মুখের অপেক্ষায় সব-সময় যে অব্যক্ত থাকেনা এই ত দায়। কিন্তু আপাততঃ একটা যে মহা দায়ে পড়া গেছে, তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে।"

বলিয়া রাজা সংক্ষেপে তাঁহার লাঠিয়াল-গণের জখম হওয়ার বৃত্তান্ত বলিলেন। শরৎ কহিলেন—"রোগীর চিকিৎসা ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আপনি যদি সেজন্য আমাকে অমন করে অনুরোধ করেন ত লজ্জায় পড়তে হয়। আপনার হাসপাতালে এত প্রবীণ চিকিৎসক থাকতেও আপনি যে আমার মত নবীন চিকিৎসকের উপর এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করছেন এতে ত আমিই কৃতজ্ঞ।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মন হইতে কিছু-পূর্ব্বের অপ্রসন্নভাব একেবারেই মুছিয়া গিয়াছিল; সে তাহার আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি শরতের মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া কহিল—"ডাক্তার-দা, আপনার বিনয়ের এক-কড়াও যদি পেতুম আমি!"

"বিনয় না রাজকুমারি, সত্যই আমি আপনাদের সদয় ব্যবহারে সর্ব্বপ্রাণে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া শরৎ সহসা থামিয়া গেলেন; ক্ষণপূর্ব্বে এইরূপ ভাষার পর রাজকুমারীর নয়নে, স্বরে, কথায় যে বিরক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মনে পড়িয়া গেল,—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই—রাজার দিকে চাহিয়া শরৎ কহিলেন—"ঘটনাটা ঘটেছে কোন্ সময়? আঘাত পেয়েছে তারা কখন্?" রাজা কহিলেন—"শেষ-রাত্রি থেকে মারামারি সুরু হয়ে আজ সকাল আটটা পর্য্যন্ত চলেছিল।"

—"এ পর্য্যন্ত তাদের ক্ষতস্থানে কোন ডাক্তারের হাত পড়েনি বোধ হয়?"

—"না। তবে লাঠিয়ালরা সাধারণতঃ নিজের চিকিৎসা নিজেরাই করে। অনেক ডাক্তারের চেয়ে তাদের মধ্যে কেহ-কেহ এ-রকম ডাক্তারিতে বরঞ্চ বেশী পটু। তবে এবারকার দাঙ্গায় আমার লোকজনেরা তেমন প্রস্তুত ছিলনা; তাই বেশী লোকও

জখম হয়েছে আর দুএকজন বেশী রকম চোটও পেয়েছে। সর্দ্দারের অবস্থা এতই খারাপ যে তুমি আছ বলেই ভরসা হচ্ছে যে তবুও হয়ত বেঁচে যাবে।"

—"কিন্তু এ-রকম আঘাতের চট্‌পট্ প্রতিবিধান আবশ্যক। আমায় কি সেখানে যেতে হবে ?"

—"না। পাল্‌কী করে তাদের আনা হচ্ছে। এখনি এসে পড়বে।"

বলিতে বলিতে খবর পাওয়া গেল,—আহতেরা হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নীচে মোটার প্রস্তুত ছিল—শরৎকে সঙ্গে লইয়া পবন-বেগে অবিলম্বে রাজাবাহাদুর হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্যান্য আহতদিগের শুশ্রূষা-ভার হাসপাতালের চিকিৎসকগণের উপর দিয়া শরৎ সর্দ্দারের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তাহার এক-দিকের কণ্ঠাস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—মনে হয় যেন ভোঁতা খড়্গের আঘাতে স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রোগী অর্দ্ধ অচেতন। শরৎকুমার ক্লোরা-ফর্ম্ম দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ সুপ্ত করিয়া ক্ষত-স্থান ছেদনপূর্ব্বক সতর্কতা এবং তৎপরতার সহিত ভগ্নাস্থিগুলি যথাস্থানে পুনঃ-সংযোজিত করিয়া ঔষধাদি লেপনপূর্ব্বক সুনিপুণ-ভাবে বাঁধিয়া দিলেন। রাজা মুগ্ধনেত্রে তাঁহার হস্ত-নৈপুণ্য দেখিতে লাগিলেন।

শরৎকুমারের কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারদেশে একটা গোলযোগ উত্থিত হইল; রাজা তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, হাসপাতালে প্রবেশ-উদ্যত একজন বৃদ্ধ লোককে প্রহরী বাধা দিতেছে। রাজাকে দেখিয়া প্রহরী সেলামপূর্ব্বক স্থির হইয়া দাঁড়াইল; সেই অবকাশে বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল—"হুজুর, ধর্ম্মাবতার! রক্ষা করেন, আমার ছাইলার মুখের চাপা (চোয়াল) ভাঙ্গা গেছে—ডাক্তরের নামডাক শুইনা আইছি।"

রাজা বুঝিলেন ইহারা বিপক্ষ-দলের লোক। কহিলেন—"কোথায় তোমার ছেলে ?"

—"ঐ ডুলির মধ্যে গাছের তলায়; হুকুম হইলেই আনি!"

একজন কম্‌পাউণ্ডার একটু দূরে বারান্দারই এক-অংশে দাঁড়াইয়াছিল, সে রাজার পিছন হইতে বৃদ্ধকে মুখ-খিঁচাইয়া চাপাকণ্ঠে কহিল—"তোর জমীদারের কাছে যা না। যার শিল যার নোড়া—তার ভাঙ্গলেন মাথা,—আবার এখানে ডাক্তর দেখাতে এসেছেন—মলো যা!" তাহার সকল কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল না তবে সে যে বৃদ্ধকে ভৎর্সনা করিতেছে—ইহা বুঝিয়া বলিলেন—"চুপ করহে! মনুষ্য-ধর্ম্মের নিকট পক্ষবিপক্ষ শত্রুমিত্র নাই। যাও সর্দ্দার তোমার ছেলেকে নিয়ে এস।"

দুর্ম্মুখ কম্‌পাউণ্ডার রাজাদেশেও আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখের কথা-গুলা চিবাইতে চিবাইতে অস্পষ্ট স্বরে কহিল—"হ্যাঁ তারপর আরাম হয়ে আবার আমাদের রাজার বিরুদ্ধে লড়।" এই কথা বলিয়া রাজাকে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপের অবসর না দিয়াই সরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ব্যক্তি রাজার পা ধরিয়া কহিল—"রামাবতার! আপন এলাকায় আমাগো

একরত্তি ভিটা দিতে আজ্ঞা হয়—আমরা আর কোনখানে যামু না—চিরদাস হইয়া থাকিমু।”

রাজাজ্ঞায় তাহার পুত্র তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে আনীত হইল।

রাজ-সর্দ্দারের কণ্ঠের বাঁধন শেষ করিয়া শরৎকুমার বিপক্ষদলের লোকেরও চোয়াল ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। কার্য্য শেষ হইলে হস্তাদি প্রক্ষালনের পর রাজাকে বলিলেন—“এদের ব্যাণ্ডেজ দুদিনের আগে আর খোলার দরকার হবে না। ইতিমধ্যে আমার একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এলে ভাল হয়। ব্যাণ্ডেজ খোলার পর যে-রকম ঔষধাদির দরকার—সে সব প্রায়ই এখানে কিছু নেই। আমি নিজে গিয়ে সে সব দেখে শুনে আনতে চাই। আজই রাতে যদি ছাড়ি তাহলে জিনিষ-পত্র নিয়ে ঠিক সময়েই আবার ফিরে আসতে পারব।”

তাহাই স্থির হইল। অনাদি নামে একটি বালককে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই শরৎকুমার কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ফিরিবার পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল।

রাত্রিকাল,—ফার্ষ্ট ক্লাশ ট্রেনের একটি কামরায় তাঁহারা দুইজনমাত্র আরোহী। অনাদি এক-প্রান্তের শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া, ষ্টেসন হইতে কেনা আট আনা মূল্যের ডিটেক্‌টিভ নভেল একখানা পাঠে মগ্ন; অন্য-প্রান্তের শয্যায় শুইয়া শরৎকুমার মুক্ত বাতায়ন পথে আকাশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কত উজ্জ্বল নিরুজ্জ্বল, কত পরিচিত অপরিচিত, একই তারকারাশি ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া-ফিরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার নয়নের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। গতির দ্রুততায় চেনা তারাগুলিকেও সহসা তিনি চিনিতে পারিতেছিলেন না। ‘ওরায়নে’র রাজসিংহাসনের অর্দ্ধেকখানা একবার তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন,—তাহার দুইটি নক্ষত্র পরিচিত সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহাকে যেন সম্ভাষণ করিয়া গেল। শরতের নেত্র তখন ঘুমে ভরিয়া আসিতেছে—ঘুমের ঘোরে তাঁহার মনে হইল, উহার মধ্যে জ্বলজ্বলে বড় তারাটি জ্যোতির্ম্ময়ী আর ছোটটি হাসি। দেখিতে দেখিতে তাঁহার তন্দ্রানিমীলিত নেত্রে সেই দুইটি তারা মিলিয়া-মিশিয়া এক-হইয়া গেল;—শরৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অর্দ্ধরাত্রে একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেন থামিবা মাত্র একজন স্থূলকায় পাশ্চাত্য মূর্ত্তি সজোরে দ্বার খুলিয়া অনুবর্ত্তী ভৃত্যের সহিত কামরায় উঠিয়া পড়িল। মূর্ত্তিটি এতই রৌদ্রদগ্ধ যে তিনি যে কোন্ জাতীয় জীব—অর্থাৎ খাঁটি ইয়োরপীয় বা ফিরিঙ্গি—তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাঁহার ভৃত্য কামরার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ কুলির নিকট হইতে সাহেবের আসবাব-পত্র উপরে তুলিতে লাগিল। সাহেবের দৃষ্টি ঘুরপাক খাইতে লাগিল—নীচের শয্যা দুইটার উপর। বিজুলি-আলোকে দুইটা ‘বার্থই’ নিগার-অধিকৃত দেখিয়া তাঁহার মেজাজ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতে লাগিল—ইহাদের একটাকে অন্ততঃ বজ্রবলে ধরিয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করেন। সুখের বিষয় এই যে, এ যুগে—ইচ্ছামাত্রেই সুরাসুরেরও মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। পরিচিত ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিয়া এ দুইটাকে যে গৃহ

বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিবেন—তাহারও সময় নাই। তখনই গাড়ী-ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। ভৃত্য জিনিষপত্রগুলা কামরার এক পাশেই স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিয়া শয্যাটা উপরের বার্থের উপর ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। সাহেবের নিজের হাতে ছিল একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ। তিনি সেটাকে অনাদির পায়ের কাছের খালি জায়গার উপরে রাখিয়া—তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর পুনরায় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উপরের বেঞ্চ দুই হাতে ধরিয়া স্খলিত বাক্যে বলিলেন—"Sir Babooneau—will you get down." তাঁহার মুখ হইতে তখন ভুর্‌ভুর্‌ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। অনাদি জ্যোতির্ম্ময়ীর ব্যায়াম-সমিতির মেম্বার, ইংরাজ ফিরিঙ্গি দেখিয়া সে দমিবার পাত্র নহে, সাহস দেখাইবার এমন সুযোগও কদাচিৎ ঘটে, সুতরাং সে নভেলখানা বন্ধ করিয়া—সাহেবের ব্যাগটার উপরে বেশ ভাল-রূপেই পা লম্বা করিয়া দিয়া বলিল—"Why should I get down, you sir pigledy? You may go out if you like!" বানরটার স্পর্দ্ধায় সাহেব অবাক হইয়া গেলেন। উপরের বেঞ্চ হইতে হাত নামাইয়া বিকৃত কণ্ঠে—"all right sir" বলিয়া তাহার প্রতি ঘুষি বাগাইলেন। অনাদি লাফাইয়া শয্যাত্যাগ করিল, কিন্তু সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই সাহেবের এক ঘুষি তাহার মাথায় পড়িল। যদি সেই উদ্যত বজ্রমুষ্টি সুরাপানের ফলে হীনবল হইয়া না পড়িত, তবে অনাদির প্রাণরক্ষা দায় হইয়া উঠিত। কিন্তু এই স্খলিত মুষ্ট্যাঘাতের বিনিময়ে সাহেবের মাথায় অনাদির যে সবল ঘুষি দুইটি পড়িল, তাহাতে সাহেব বেশ সচেতন হইয়া উঠিলেন।

তখন বাম হস্ত ঢালরূপে মুখের সম্মুখে রাখিয়া, ডান হস্ত বাড়াইয়া কহিলেন—"Beg your pardon sir—We are quits now, let us be friends." পদানত শত্রুকে ক্ষমা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ ধর্ম্ম, সাহেবের আহ্বান-বাক্যে অনাদি প্রফুল্ল-ভাবেই হাত বাড়াইয়া দিল।

গোলমালে ইতিপূর্ব্বেই শরতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনাবশ্যক তৃতীয় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা না করিয়া তিনি নীরবে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। যেমন মিটমাট হইয়া গেল অমনি তিনি অনাদিকে রুমাল ভিজাইয়া আনিতে আজ্ঞা করিয়া সঙ্গের ব্যাগটা খুলিয়া ঔষধ বাহির করিলেন। সাহেব এ-সময়েও নিজের ব্যাগটার কথা ভোলেন নাই; তাড়াতাড়ি সেটা অনাদির বেঞ্চ হইতে টানিয়া লইয়া পাশে রাখিয়া, শরতের পরিত্যক্ত শয্যায় বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন—আর শরৎ সুনিপুণ হস্তে তাঁহার আহত মস্তকে পটি বাঁধিয়া দিলেন। কার্য্য শেষ করিয়া তাহাকে কহিলেন—"আমি বরঞ্চ উপরে যাইতেছি আপনি এইখানেই শয়ন করুন।"

শরৎ উপরে উঠিলেন; নভেল পড়িবার প্রবৃত্তি আর অনাদির তখন ছিল না,—বইখানা বালিসের নীচে গুঁজিয়া সেও শুইয়া পড়িল। সাহেব বিনাবাক্যব্যয়ে কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় বসিয়া রহিলেন; তাহার পর

ব্যাগটা খুলিয়া একটা শিশির তীব্র উপাদান—একনিঃশ্বাসে পান করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। কামরা আবার নীরব হইয়া পড়িল।

খানিক পরে অনাদির মনে হইল,—তাহার বুকের উপর যেন পাথরের ভার চাপিয়াছে—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। অতি কষ্টে ঘুমের ঘোরেই সে চোখ মেলিয়া দেখিল,—সাহেব দুই হাতে তাহার বক্ষ চাপিয়া বলিতেছেন—"You savage, you niggard, you dared to insult me! Don't you know who I am! My nick-name is Satan!"

অনাদির তখন সকল শক্তি অবসিত, মূর্চ্ছার পূর্ব্বে লোকের যেরূপ অবস্থা হয় সেইরূপ অবস্থা,—দারুণ কষ্টের একটা চেতনা ছাড়া অন্য কোনরূপ জ্ঞান নাই। সেই অবস্থায় সে অস্ফুট কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শরৎকুমার সে শব্দে সহসা জাগরিত হইয়া—লাফাইয়া নামিয়া পশ্চাৎ হইতে সাহেবের কোট ধরিয়া সজোরে টানিলেন। সাহেব পড়িতে-পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে দরজার কাছে তাহার ফুলগাছের টুকরিতে একখানা কুক্‌ড়ি বেঁধান ছিল; সেই কুক্‌ড়ি খানা তুলিয়া লইয়া বাঘ যেমন মুখের শীকার ফেলিয়া আক্রমণকারীকে দেখে সেইরূপ ভীষণ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখনও নেশায় তাঁহার পা টল মল করিতেছিল, হাতেরও জোর ছিল না সুতরাং কুক্‌ড়িখানা কাড়িয়া লওয়া শরতের পক্ষে কঠিন হইল না। তবে পিঁপড়ারও মরণ-কামড়ের জোর আছে, সাহেবের স্খলিত হস্তের আক্রমণও একেবারে ব্যর্থ হইল না। টানাটানির সময় কুক্‌ড়ির অগ্রভাগ শরতের হাতের কব্‌জার উপর একটু বিঁধিয়া গিয়া দুএক ফোঁটা রক্ত পড়িল। কুক্‌ড়িখানা জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া শরৎ বাথরুমে গিয়া হাতটা জলের নীচে রাখিতেই রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে আসিয়া দেখিলেন,—সাহেব তাঁহার শয্যায় শুইয়া স্খলিত বচনে অশ্রাব্য গালি বর্ষণ করিতেছেন আর অনাদি যেন তখনো ঠিক সচেতন হইয়া উঠে নাই; কেমন যেন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে। তাঁহার ভয় হইল—হয়ত বা সে বক্ষে বিশেষ আঘাত পাইয়াছে। নিজের হাতের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়া তিনি তাহাকে পরীক্ষা করিতে বসিলেন। তাঁহার স্পর্শে অনাদির সে মোহভাব কাটিয়া গেল; তিনি তখন প্রফুল্লচিত্তে তাহার কপালে আর্দ্র হাত বুলাইতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে ভৃত্য আসিয়া সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ করিল। প্রসাদপুরের একটা ষ্টেশন আগে বিষাদপুর—সেইখানে তাহারা নামিয়া গেল। শরৎ পরে জানিলেন—এই ফিরিঙ্গিপুঙ্গব বিষাদপুর-সরকারের আসাম-টি-ষ্টেটের দুর্দ্দান্ত ম্যানেজার।

(১৮)

অনাদি বাড়ী আসিয়া, ট্রেনের বিপদের ঘটনা বেশ মজাইয়া-জমাইয়া যখন-তখন রাজকুমারীর নিকট গল্প করে। সেই এক কথা কতবার শুনিয়াও রাজকুমারীর বিরক্ত ধরে না; তিনি শুনিয়া হাসেন কৌতুক

অনুভব করেন; অনাদির গল্পের ভাষায় প্রতিবারই তিনি একটু নূতন রং দেখিতে পান।

আজও সেই কথাই হইতেছিল। রাজকুমারী কহিলেন—"তুমি যে অনাদি-দা রাঙা মুখ দেখে ভয় পাওনি,—তার অব্যর্থ মুষ্টিকেও ব্যর্থ করেছ—এতে আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে—কি বলব?"

অনাদির বয়স অষ্টাদশ কিন্তু ধরণ ধারণে, ভাবে, সে আরও ছোট। রাজকুমারীর প্রশংসায় সে আহ্লাদিত হইয়া কহিল—"দেখ রাজকুমারি ভাই—তোমার উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি কি না?"

—"তা যদি না করতে ত তোমার সঙ্গে জন্মের আড়ি হোত। কোনো সাহসের কাজে আমার ভাইদের আমি মরতে দেখলেও খুসী হব—কিন্তু—"

—"তোমার ভাগ্যে সে সুখটা ঘটতে ঘটতে রয়ে গেছে দিদি; যদি ডাক্তারদা না থাকতেন ত নিশ্চয়ই সে সাপটা আমাকে মেরে ফেলত। দেখ ভাই রাজকুমারি, ডাক্তারকে যতই আমি দেখছি, চিনছি ততই তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা বাড়ছে। একটা কথা বলব ভাই?"

—"বল না অনাদি-দা।"

—"তুমি কিন্তু হাসবে। বল হাসবে না?"

—"বেশ হাসবনা,—বল তুমি।"

—"আমার মনে হয় কি জান? আমি যদি স্ত্রীলোক হতুম ত ডাক্তারকে নিশ্চয়ই বিয়ে করতুম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শপথ-সত্বেও হাসিয়া কুটিকুটি হইল। অনাদি সলজ্জে কহিল—"আমি জানি তুমি হাসবে! আচ্ছা তবে ও কথা যাক,—সেই সাপটার কথা শোন। সত্যি সত্যি এতদিন পরে ইভের direct বংশধরের আমি দেখা পেয়েছি। যেই ঘুসি চালালুম অমনি beg your pardon, তারপর যেই ঘুমিয়ে পড়েছি অমনি ছোবল্। এ রকম লোক সংসারে আছে না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না!"

—"সাহেব কিন্তু তোমাদেরই অপরাধী করে নালিস করেছে শুনছি!"

—"সত্যি নাকি? রাজা-মামা নালিস-ফরীদ ভালবাসেন না—নইলে আমাদেরই ত নালিস করার কথা। সে সাপের বাচ্ছা নালিস করে কোন্ সাহসে?

—"সাপের বাচ্ছা এই সাহসেই।"

—"তা বেশ! মরবার আগেই পিঁপড়ার পালক গজায়! যখন হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটার টানে তাঁকে শ্রীঘর গর্ত্তে চালান্ দেবে তখন আমরা ঘরে এসে পিকনিক্ করব, কি বল ভাই রাজকুমারি?"

রাজকুমারী হাসিয়া এই বাক্যের অনুমোদন পূর্ব্বক আগে হইতেই সে মকদ্দমার ডিক্রি ডিশমিশ জারি করিয়া সেদিনকার মত এ-গল্পের উপসংহার করিলেন।

সে ফৌজদারী মকদ্দমা দুই চারিদিনের মধ্যেই শেষ হইল; কিন্তু ফল দাঁড়াইল ঠিক বিপরীত। বিচারে অনাদির পক্ষেরই হার হইল! বিচারক সবডিভিজনের মুন্সেফ সুজন রায়েরই সম্পর্কীয় লোক; তাঁহার রায়ের প্রধান যুক্তি ইংরাজ মিথ্যা বলেনা।

এই যুক্তি-সমর্থক প্রমাণও তিনি যথেষ্ট দেখাইলেন। প্রথমতঃ, সাহেব অনাদিকে বিছানা হইতে উঠিতে বলায়—অনাদি যে তাঁহাকে ঘুষি মারিয়াছিল তাঁহার স্ফীত কপাল এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, যে কুক্‌ড়িখানা তিনি শরৎকুমারের হাত হইতে টানিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সে কুক্‌ড়ি খানাও যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। একথাও যে সাহেবের বানানো কথা নহে—ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণ হইতেছে। অতএব ইহারা দুইজনেই অপরাধী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ যুক্তির বলে মুন্সেফ-মহাশয় সামান্য মারামারির (assaulting charge) অপরাধে অনাদির সশ্রম একমাসের কারা বাস ব্যবস্থা করিলেন; আর শরৎকুমারকে খুন অভিপ্রায় জনিত (culpable homicide) গুরুতর দোষে দোষী করিয়া সশ্রম পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। জামিনে অবশ্য তাঁহারা উভয়েই আপাততঃ মুক্তিলাভ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুনর্বিচারের জন্য তাঁহাদের দরখাস্ত পড়িল।

মুন্সেফের বিচারে রাজা আশ্চর্য্য হইলেন না,—কিন্তু বালিকা জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষোভ বিস্ময় এবং ক্রোধের সীমা রহিল না। বিচারক যিনি, তিনি ত নিরপেক্ষরূপে সত্য বিচার করিবেনই—ইহাই তাহার বিশ্বাস। ক্লাউডেন সাহেবের আদর্শে এ সম্বন্ধে তাহার মতামত রচিত হইয়াছে। আর নিজের দেশের লোক হইয়া মুন্সেফ মহাশয়—এরূপ অবিচার করিলেন!

কেবল ক্ষোভ নহে—ইহার সহিত একটা লজ্জার ব্যথা একটা নৈরাশ্য তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল।

ব্যায়ামশিক্ষার কি ফল, যদি দেশের লোকের নৈতিকবল, ধর্ম্মবল না থাকে? যে দেশের কাব্য-গাথা, পুরাণ-ইতিহাস সত্যের, ন্যায়ের জয় ঘোষণা করিতেছে, সেই দেশের লোকের আজ এত অধোগতি! তাহার প্রাণের মধ্যে একটা নিদারুণ হাহাকার উঠিল। দুরাশা! দুরাশা! তাহার চারিদিকে কর্ম্মনাশা দুর্ভেদ্য অন্ধকার! দুষ্কৃতি-তরঙ্গময় সাগর দুস্তর,—! সাধ্য নাই তাহার সাধ্য নাই, তরণী রক্ষা করিতে সাধ্য নাই তাহার!

রাজ-লাইব্রেরিতে থিয়সফিষ্ট পত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া ছিল। আজ-কাল জ্যোতির্ম্ময়ী ক্রমাগত তাহাই পড়ে, পড়িয়া একজন জাগ্রত গুরু পাইবার জন্য মর্ম্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে জাগে।

সে আজ কাতর প্রার্থনায় আকাশের দিকে চাহিয়া করযোড়ে মনে-মনে কহিল —"ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ণধার, কোথায় তুমি কোথায়? আলোক দেখাও, গুরুবেশে —ধ্রুব-তারারূপে উদয় হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চল তুমি—এই দুর্ব্বলা শক্তিহীনা ক্ষুদ্র নারীকে।" মেঘভেদ করিয়া একটি জ্যোতি-রেখা যেন সহসা তাহার নয়নে চমকিয়া উঠিল।

* * * *

এই কষ্টের উপর তাহার আর একটা কষ্টের কারণ ঘটিল। কোর্ট হইতে ফিরিয়া শরৎকুমার প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইলেন। 'Physician heal thyself' এই প্রবাদ-বাক্যের উপদেশ এখানে সার্থক হইল।

দাঙ্গাহেঙ্গামায় আহত রোগীগণ শরতের চিকিৎসায় সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে —তাহার নাম-যশ দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ট্রেনে নিজের হাতে কুকৃড়ির যে আঘাত লাগিয়াছিল—সামান্য বোধে তাহা অগ্রাহ্য করায়—হঠাৎ কয়েক দিন পরে তাহার বিষময় ফল দেখা দিয়াছে। তাঁহার উপদেশ অবলম্বন করিয়াই রাজচিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। সম্ভবত কোন রোগযুক্ত পশু-বধের পর কুকৃড়িখানা ভালরূপে পরিস্কার করা হয় নাই সেইজন্য বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং শরৎকুমার সুস্থ সবল বলিয়াই ইহার আঘাতের ফল যথাশীঘ্র প্রকাশ পায় নাই;—ডাক্তারেরা এইরূপই মনে করিতেছেন।

অস্ত্র করার পর শরতের অবস্থা প্রথম দিন খুবই খারাপ ছিল; দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত ভাল—কিন্তু এখনো আশানুরূপ ভাল নয়। সকলেই চিন্তিত; রাজা, রাজকন্যা উভয়েই এ ঘটনায় নিতান্ত অসুখী। সেবার ত্রুটি নাই,—অনাদির সহিত আরও দুই একটি বালক তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। কিন্তু অনাদি যেরূপ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, মাতা ভগিনী স্ত্রীও তদপেক্ষা অধিক যত্নে সেবা করিতে পারে না। দ্বিতীয় রাত্রিও কোনরূপে কাটিয়া গেল। তৃতীয় সন্ধ্যায় ডাক্তারেরা প্রফুল্ল মুখে ভরসা দিয়া গেলেন। রাজা গৃহে গিয়া অনেক দিনের পর সেই রাত্রিতে কবিতা লিখিতে বসিলেন; জ্যোতির্ম্ময়ী অন্যদিনের ন্যায় সেদিনো সেই সময়ে ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহে তখন অনাদি ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে নিকটে আসিয়া বলিল—"আসবে দিদিমণি ঘরে?—কেউ নেই এখন,—এস।"

বালিকা বলিল—"একটু ভাল দেখছ—অনাদি?"

—"নিশ্চয়। আজ আর তেমন ছটফট করছেন না,—তেমন অচেতন-ভাবও নেই, —সহজভাবে যেন ঘুমচ্ছেন।—এস না রাণি দিদি ঘরে—আজ দেখে খুসী হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। রোগীর মুখ প্রশান্ত—তিনি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—তন্দ্রাঘোরে বলিলেন—"হাসি তুমি? আর ঐ তারাটি—ঐ উজ্জ্বল—তোমার চেয়েও উজ্জ্বল বড় তারাটি—কে ও? চেন না,—হাসি? জ্যোতির্ম্ময়ী উনি—রাজকুমারী।" জ্যোতির্ম্ময়ীর অশ্রুজল সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল;—তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া রোগীর কপালে স্নেহহস্ত বুলাইলেন; সে স্পর্শে শরৎ চক্ষু উন্মীলিত করিলেন—রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু দুর্ব্বল কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন—"তুমি রাজকুমারি?" রাজকুমারী অশ্রুগদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিলেন—"চিনিয়াছেন?" একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শরৎ কহিলেন—"চিন্‌ব না কেন? আমার কি হয়েছে?"

তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করায় রাজকুমারী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন—"কিছু হয় নাই,—কিন্তু উঠবেন না—আপনি ঘুমোন—আমি যাই।"

"যাবেন না রাজকুমারি—বসুন আপনি।" তাহার রুগ্ন কণ্ঠ একান্ত অনুরোধপূর্ণ।

অনাদি নিকটে একখানা চৌকি আনিয়া দিল,—জ্যোতির্ম্ময়ী বসিলেন। শরৎ বলিলেন—"রাজকুমারি?"—বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী ভীত স্বরে কহিলেন,—"ডাক্তার দা?" শরৎ আবার কথা কহিলেন,—বলিলেন—"রাজকুমারি—বড় দুর্ব্বল—বড় একলা মনে হচ্ছে,—আপনার হাতখানি দিন।" রাজকুমারী তাহার হাতখানি ধরিলেন,—অশ্রুতে সে হাত সিক্ত হইয়া উঠিল; অনাদিও বালকের ন্যায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতখানি হাতের মধ্যে ধরিয়া রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরপদে গৃহত্যাগ করিলেন।

পরদিন শরৎকুমারের জ্বর ত্যাগ হইল;—বিপদ-মেঘ কাটিয়া গেল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বাংলার ব্রত

(৫)

ব্রতের ছড়াগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার যে যোগ, ব্রতের আল্‌পনাগুলির সঙ্গেও ঠিক সেই যোগটিই দেখা যায়। কতকগুলি ছড়া রয়েছে কেবল কামনা উচ্চারণ করাই যার কাজ—

বাঁশের কোঁড়া, শালের ঢোঁড়া,
কোঁড়ার মাথায় ঢালি ঘি;—
আমি যেন হই রাজার ঝি।

কিম্বা—

আমরা পূজা করি পিটালীর চিরুনি।
আমাগো হয় যেন সোনার চিরুনি।
ইত্যাদি।

আর-কতকগুলি ছড়া, যার উদ্দেশ্য শুধু কামনাটা উচ্চারণ নয়, কাজের জন্য যেটুকু তার চেয়ে অনেকটা বাজে সুর-সার, চলা-বলা তাতে রয়েছে;—যেমন দেখলেম মাঘমণ্ডল-ব্রতের সূর্য্যের বিয়ের ছড়াগুলিতে। আল্‌পনাগুলি তেম্‌নি দেখি দুই শ্রেণীর। একরকম আল্‌পনা—সেগুলি কেবল অক্ষর বা চিত্রমূর্ত্তি,—কতকটা ইজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো। এই সব আল্‌পনায় মানুষ নানা অলঙ্কারের কামনা করে পিটুলীর সব গহনা এঁকেছে। সেঁজুতী-ব্রতের আল্‌পনায় ঘর-বাড়ি, চন্দ্র-সূর্য্য, সুপুরীগাছ, রান্নাঘর, গোয়ালঘর সবই মানুষ এঁকেছে কিন্তু এদের তো শিল্পকার্য্য বলে ধরা যায় না—এগুলি মন যা চায়, তারি মোটামুটি মানচিত্র। কিন্তু এই যে নানারকমের পদ্ম মানুষ কল্পনা থেকে সৃষ্টি করেছে, কিম্বা এই যে কলা-লতা খুন্তি-লতা শঙ্খ-লতা চাল্‌তা-লতা প্রভৃতি লতামণ্ডন, এই যে নানারকম আসনের পিঁড়ি-চিত্র এগুলি মণ্ডনশিল্প,—মানচিত্র নয়। যেখানে অন্নপ্রাশনের পিঁড়ি, সেখানে শুধু অন্নের বাটিগুলি যেমন-তেমন করে এঁকে দিলেই কামনা সফল হতে পারতো, কিন্তু তা নয়; মানুষ সেখানে দেখছি অনেক লতাপাতা এঁকে পিঁড়িখানিকে সুন্দর করতে

চেয়েছে,—কাজের অতিরিক্ত অনেকখানি লেখা তাতে রয়েছে। তারপর এই "তারা-ব্রতের" সূর্য্য, চন্দ্র, তারা—এরা কিছুর অনুকরণ নয়; শিল্পীর কল্পনা থেকে এদের সৃষ্টি হয়েছে। পিঁড়িগুলিতে কামনার প্রতিচ্ছবি দেওয়ার চেয়ে কারিগরি করবার ইচ্ছাটাই প্রবল দেখা যাচ্ছে। আর, বছরের শেষে পৃথিবীকে নমস্কার দিয়ে "পৃথিবী-ব্রতের" এই যে আল্‌পনাখানি,—নরনারীর জীবনের ক্ষণিক ইতিহাস নিয়ে পদ্মপাতার উপরে একবিন্দুর মতো এই যে টলটল্ একটি সৃষ্টি—এটিকে তো কি পরিকল্পনার দিক দিয়ে, কি কারিগরির দিক দিয়ে মানচিত্র কিছুতে বলা যায় না। পূর্ব্বকালে মানুষ যে-কোনো-কারণে-হোক্ মনে করতো যে-জিনিষ সে কামনা করছে তার প্রতিচ্ছবি লিখে কিম্বা তার প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তাতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিদ্ধিলাভ করবে। সে-হিসেবে আল্‌পনায় জিনিষটির প্রতিরূপ দিলেই তো কাজ চলে; কিন্তু দেখছি মানুষ শুধু সেইটুকু করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; এবং তার মনও তৃপ্তি মানছে না—যতক্ষণ-না শিল্পসৌন্দর্য্যে সেগুলি ভূষিত করতে পারছে। অথচ কামনা পরিতৃপ্তির পক্ষে আল্‌পনা সুন্দর হল কি না হল তাতে বড় আসে-যায় না।

এই যে লক্ষ্মীপূজার আল্‌পনাতে মানুষ বিচিত্র-রকমের পদ্মফুল এঁকেছে, একটির সঙ্গে যার আর-একটির মিল নেই—এমন-কি আসল পদ্মফুলের সঙ্গেও নয়, এরি বা উদ্দেশ্য কি? মানুষের মনে কোথায় একটা গোপন উৎস রয়েছে, যেখান-থেকে এই-সব আল্‌পনা নতুন-নতুন এক-একটি সৃষ্টির বিন্দুর মতো বেরিয়ে আস্‌ছে? ব্রতের আল্‌পনাগুলি থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানুষের অন্তরের কামনার সঙ্গে তার হাতের কাজগুলির বেশ-একটি যোগ রয়েছে—কিন্তু অন্তরের কামনার সঙ্গে বাহিরের চেষ্টার যোগ থাকলেই যে সব-সময়ে শিল্প-আকারে কাজটা দেখা দিচ্ছে তাতো নয়; বরং দেখি কামনা আর তার সিদ্ধির চেষ্টার মধ্যে যত কম অবসর এবং বাধা ততই মানুষের ক্রিয়া সুন্দর হয়ে দেখা-দেবার সুবিধা পাচ্ছে না।

শিল্পের সৃষ্টির মূলে মানুষের মনের তীব্র আবেগ আছে সত্য, কিন্তু আবেগের বশে যাই করি তাইতো শিল্প হয় না। অনেকদিনের পরে বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, আনন্দের উচ্ছ্বাসে তার গলা-জড়িয়ে কত কথাই বলা হল, কিন্তু সেটা কাব্যকলা, কি নৃত্যকলা দুয়ের একটাও হল না। কিন্তু বন্ধু আসবার আশায় ভাবে ডগমগ হয়ে যেন মন নৃত্য করছে, তার জন্যে ফুলের মালা গাঁথছি, নিজে সাজ্‌ছি ঘর সাজাচ্ছি—নিজের আনন্দ নানা খুটিনাটি কাজে, এটা-ওটা জিনিষে ছড়িয়ে যাচ্ছে—এই হল শিল্পের দেখা দেবার অবসর। অতৃপ্তির মাঝে মন দুলছে—এই দোলাতেই শিল্পের উৎপত্তি। কামনার তীব্র আবেগ এবং তার চরিতার্থতা—এ দুয়ের মাঝে যে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের শূন্য ভরে উঠছে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায়, নানা ভাবে, নানা রসে। মনের আবেগ সেখানে ঘনীভূত হয়ে প্রতীক্ষা করছে প্রকাশকে। মনের এই উন্মুখ অথচ উৎক্ষিপ্ত নয় অবস্থাটিই হচ্ছে শিল্পের জন্মাবার অনুকূল অবস্থা। এ-সময় মানুষ সুন্দর-অসুন্দর বেছে নেবার

সময় পায়, যেমন-তেমন করে একটা-কিছু করবার চেষ্টাই থাকে না। হঠাৎ যদি বাঘ এসে সাম্‌নে পড়ে তবে তার গায়ের চিত্র-বিচিত্র ছাপ, তার গঠনের সৌন্দর্য্য, এ-সব কিছুই চোখে পড়ে না; ভয় এবং পালানো তখন এতই কাছাকাছি আসে যে সৌন্দর্য্য বোধ করবার অবসর মন পায়না বল্লেই হয়। কিন্তু খাঁচার ওদিকে বাঘ, এদিকে আমি; কিম্বা দূরে বাঘ লাফিয়ে চলেছে; তখন আবেগ আর ক্রিয়ার মাঝে অনেকটা অবসর; সেখানে বাঘের নানা সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে।

ব্রতের অনুষ্ঠান, শিল্পের উৎপত্তির অবসর কেমন করে এনে দিচ্ছে সেটা দেখা যাক্। ব্রত-আচরণ আর শিল্প-ক্রিয়া—দুয়ের যে নৈকট্য দেখা যায়, তাতে করে দুয়েরই উৎপত্তি যে মানব-মনের একই প্রবৃত্তি থেকে, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাক্‌ছে না। দুয়েরি মধ্যে দেখছি একটা জিনিষ রয়েছে, যা দুইকেই চালাচ্ছে। সেটি হল কামনার আবেগ। যা কামনা হল, তাই পেলেম তখনি,—এ হলে ব্রত হল না। আবেগ থাকা চাই—যেটা নানা ক্রিয়ার মধ্যে গতি পেয়ে পরিসমাপ্তি পাচ্ছে। এই হল ব্রতের মূল কথা।

ব্রতগুলির মধ্যে এই আবেগটির অবসর কোন্‌খানে রয়েছে দেখবো। এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে মানুষ যখনকার যা, তখনকার জন্যে ব্রত করছেনা। ভবিষ্যতের একটা-কিছু পাবার জন্যেই ব্রতগুলির অনুষ্ঠান হচ্ছে দেখি। 'গঙ্গা গুকুগুকু, আকাশে ছাই'!—সেই সময় বর্ষার জলধারা কল্পনা করে 'বসুধারা ব্রতের' অনুষ্ঠান। এই যে জ্যৈষ্ঠের সারা-মাস আষাঢ়ের ছবি মনে জাগিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করছে—এটা বড় কম অবসর নয় আবেগ ঘনীভূত হয়ে নানা শিল্প-ক্রিয়ার প্রকাশ হবার জন্য। এম্‌নি যখন খুব জল—আষাঢ় শ্রাবণ দুইমাস—তখন কুমারী-ব্রত নেই। এর পরে ভাদ্র মাস পড়তেই শরতের দিনগুলির জন্যে ব্রত সুরু হল। শস্য হবে, যারা বাণিজ্যে গেছে তারা ফিরবে—এম্‌নি সব নানা কামনা 'ভাদুলী-ব্রতটি'র মধ্যে নাট্যকাব্য হয়ে দেখা দিলে এবং আশ্বিনের শস্য-উৎসবে তার পরিসমাপ্তি হল। এম্‌নি প্রায় প্রত্যেক ব্রতেই দেখি কামনা অনেকদিন পর্য্যন্ত—কোথাও একমাস কোথাও বা দুইমাস—অতৃপ্ত থাকছে—চরিতার্থতার পূর্ব্বে। শস্য-ফল্‌বার আগেই শস্য-উদ্গমের ব্রত আরম্ভ হল এবং শস্যের প্রকৃত উদ্গমের ও কামনার মাঝের দিনগুলো মনের আবেগে নানা কল্পনায়, নানা ক্রিয়ায় ভরে উঠে নাট্য, নৃত্য, আলেখ্য—এম্‌নি-সব নানা শিল্পের জন্ম দিতে লাগল। চিত্র করতে হলে বড়-শিল্পী তো যেমন দেখলেন, তেম্‌নিটি আঁক্‌লেন না। দেখলেন, দেখে সেটা মনে রাখলেন, এবং হয়তো দেখার থেকে অনেক পরে সেটাকে মন-থেকে প্রকাশ করে দিলেন,—দেখা ও প্রকাশ-করার মাঝে যে-সময়টা, সেই হল যথার্থ শিল্প-কাজের অনুকূল। দেখলেম, কল টিপলেম ফটো উঠলো, এ হলে জিনিষটা ঠিক অনুকরণ করা গেল বটে কিন্তু শিল্প বলতে অনুকরণের চেয়ে বড় যে-জিনিষটা তা হল না। ব্রতের আল্‌পনাতেও তেম্‌নি। সোনার চিরুনি চাই, পিটুলীর চিরুনি এঁকে ব্রত

করলুম। এখানে আল্‌পনায় অনুকৃতি পর্য্যন্ত রইলো। কিন্তু আশ্বিন মাসে লক্ষ্মী ধানের ক্ষেতের মধ্যে দেখা দেবেন কিম্বা বসন্তে ফুল ফুটবে, সূর্য্য উঠবে—এই আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি যখন মনকে তোলাপাড়া করে রয়ে-বসে প্রকাশ হতে চল্লো, তখনি দেখি বিচিত্র-আল্‌পনায় পদ্ম, লতা, পাতা; সূর্য্যোদয়ের নানা রূপক ও ছড়া এবং ফুলের ডালার গান, আমের মুকুলের গান; নানা রঙ্গ-রস।

আল্‌পনা যে কত সুন্দর এবং কত রকমের, তার হিসাব নিলে দেখা যায়, এখনকার আর্টস্কুলের ছাত্রদের চেয়ে ঢের বেশি জিনিষ মেয়েরা না-শিখেই লিখছে এবং সৃষ্টিও করছে। শ্রেণীবিভাগ করলে আল্‌পনার ফর্দ্দটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ—প্রথম—পদ্মগুলি। দ্বিতীয়—নানা লতা-মণ্ডন বা পাড়। তৃতীয়—গাছ, ফুল, পাতা ইত্যাদি। চতুর্থ—নদ, নদী ও পল্লী-জীবনের দৃশ্য। পঞ্চম—পশু-পক্ষী মাছ ও নানা জন্তু। ষষ্ঠ—চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র। সপ্তম—আভরণ ও নানা আসবাব। অষ্টম—পিঁড়ি-চিত্র।

আল্‌পনার শিল্প হচ্ছে সমতল-ভিত্তিকে চিত্রণ, এবং যা আঁকছি তার পরিষ্কার চেহারাটি দেওয়া। হাতা হাতার মতো না হয়ে হাতের মতো হলে চলেনা—ব্রতের কাজে। একটা জিনিষের ঠিক চেহারাটি দু-চার টানে আঁকা যে কতখানি ক্ষমতার কাজ তা চিত্রকরমাত্রেই জানেন। একজন এম্‌এ ক্লাসের ছাত্রকে তার হাতের কলমটা আঁকতে বল্লে সে মাথায় হাত দিয়ে বসবে, কিন্তু তারি হয়তো পাঁচবছরের ভগিনীটি এই আল্‌পনার সব-ক-খানা অনায়াসে এঁকে যাবে নির্ভুল—হাতা, বেড়ি, গহনা, ফুল, পাতা, সবই। মানুষ আর জানোয়ারদের বেলায় মেয়েরা একটু গোলে পড়েছে। কিন্তু এ-ছাড়া যেখানে কল্পনা-খাটানো চলে এমন-সব বড়-বড় আল্‌পনা এবং নানা লতা ও পাড়ের আবিষ্কারে তারা সিদ্ধহস্ত।

সুবচনী-পুজোর আল্‌পনাটিকে আমরা সুবচনী-ব্রতকথার প্রতিরূপ-চিত্র বলে ধরতে পারি। রাজার পুকুরে অনেক হাঁস। তার সর্দার ছিল এক খোঁড়া-হাঁস। এক ব্রাহ্মণ-কুমার সেই খোঁড়া-হাঁস মেরে খেয়েছিল এবং সুবচনীর কৃপায় তার মা সেই হাঁসকে বাঁচিয়ে তবে রাজার কোপ থেকে নিস্তার পেয়েছিল। এই গল্পটাকে দেখাচ্ছে এই সুবচনীর আল্‌পনা। সেজুতীর আল্‌পনা, ভাদুলী-ব্রতের নদী ও তালগাছ—এ-দুটির মধ্যেই নিছক কামনা জানানোর চেয়েও একটু বেশি কাজ মানুষে করেছে;—কোঁচা-দুলিয়ে সুপুরীবাগানে কর্ত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোড়া-বাংলার দরজায় দুই সেপাই পাহারা দিচ্ছে। এই সুপুরী-বাগানের কর্ত্তার সঙ্গে হাতে-পো কাঁখে-পো মানুষের প্রতীকটির অনেক তফাৎ। যদিও খুব কাঁচা-হাতের কিন্তু কর্ত্তার ছবিতে বাস্তবিকতা অন্যটির চেয়ে ঢের বেশি রয়েছে। এম্‌নি নদীর আল্‌পনা। এখানে গ্রামের মাঝ দিয়ে যে-নদীটি বয়ে চলেছে, তার বাস্তবিক চেহারাটা দেবার চেষ্টাই নেই; সমস্ত দৃশ্যটি একটি সুন্দর মণ্ডন-হিসেবে চিত্রকারিণী দিয়েছেন। এর পর, বাঁশের কোঁড়া—শালের কাজের মতো। তারপর নানা মন্দিরের

আল্‌পনাগুলি; এগুলিকে খাঁটি মণ্ডন-চিত্র বলা যেতে পারে, যদিও এগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব যোগ। কিন্তু তাই বলে এগুলি যেমন-তেমন করে মানুষে আঁকেনি। মন্দিরের কারুকার্য্য, তার গঠনের তারতম্য, চিত্রকারিণী প্রত্যেকদিন নজর করে দেখে-দেখে তবে মন থেকে এগুলি প্রকাশ করেছেন বেশ বোধ হয়।

পদ্মের আল্‌পনাগুলির সঙ্গে ব্রতীর কামনার খুব কমই যোগ দেখা যায়। দু-রকমের পদ্ম দেখা যাচ্ছে। প্রথম-শ্রেণীর পদ্মগুলিতে পদ্মের বাস্তব-আকৃতি কতকটা দেওয়া হয়েছে এবং জ্যামিতির ঘরগুলিকে পদ্মের আকারে বাঁধা হয়েছে। কোনো-কোনো জায়গায় পদ্মের সঙ্গে শঙ্খ জুড়ে সেটিকে লক্ষ্মীর আসন বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য যে-সব অষ্টদল পদ্ম এবং সেই-সব পদ্মকে ঘিরে যে-সব নানা লতামণ্ডন, সেগুলিকে মণ্ডন ছাড়া আর কি বলা যাবে? বারো-রকম লতায় ঘিরে আল্‌পনা বিবাহের সময় বরের বাড়ির উঠানে লেখা হয়। কন্যার বাড়ীতেও এই রকম একটি বৌ-ছত্র দেবার নিয়ম। এগুলো ব্রতী বা ব্রতের নয়। বোম্বাই অঞ্চলে অতিথির সম্মানের জন্যে ভোজনের জায়গাটি রঙ্গোলী (আল্‌পনা) দিয়ে সুন্দর করে দেওয়া প্রথা। উৎসবের দিনে বিশেষ-ব্যক্তির সম্মানের জন্যে যে সাজানো-গোছানো করতে হয়, এই আল্‌পনাগুলিকে সেই কোঠায় ফেলাই ঠিক। বোম্বায়ের অতিথি-অভ্যর্থনার জন্যে যে-আল্‌পনা তারি কতকটা প্রতিরূপ হচ্ছে আমাদের নববধূ-আগমনের পান-সুপারী-লেখা আল্‌পনাটি। এই ধরণের আল্‌পনাগুলির সঙ্গে মনের নানা ভাবের যোগ থাকলেও এগুলি ব্রতীর কামনা জানাচ্ছেনা। লক্ষ্মীর আসনে শঙ্খ, ইন্দ্রের আসনে বজ্র, আবার অন্নপ্রাশনের পিঁড়িতে নানা ব্যঞ্জনের বাটি আর বর-কণের পিঁড়িতে 'একবৃন্তে দুই ফুল'—এগুলো প্রধানত জানাচ্ছে আসনের পার্থক্য;—এটি দেবীর, এটি দেবতার, এটি নবকুমারের, এটি বরবধূর। এবং ব্যক্তিবিশেষের রুচি-অনুসারে এই-সব আল্‌পনায় অদল-বদল হয়। যেমন, বিয়ের পিঁড়িতে পদ্ম ও ভ্রমর ইত্যাদিও চলে; এবং এই অদল-বদলে বিবাহাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কোনো ব্যাঘাত হয় না। এমন কি, পিঁড়িতে খানিক পিটুলী-গোলা মাখিয়েও কাজ চলে। কিন্তু ব্রতের আল্‌পনা ব্রতীর কামনার পরিস্কার প্রতিচ্ছবি না হলে ব্রত করা অসম্ভব। প্রথমে কামনা মনে উঠলো, তারপর সেটা আল্‌পনায় অথবা পিটুলি দিয়ে চিত্রিত গঠিত এবং সজ্জিত হল, শেষে ছড়ার মধ্য দিয়ে সেটা ব্যক্ত হল। আগে কামনা, তারপর আল্‌পনা, তারপর ছড়া; শেষে ব্রতের কথা বা ইতিহাস—এই কটা মিলে ব্রত পূর্ণতা পেলে।

মেয়েলী ব্রতের কথাগুলি কেমন সেটা দেখবার পূর্ব্বে আল্‌পনার শঙ্খলতা মণ্ডনটির বিষয়ে একটু বিচার করে দেখা প্রয়োজন। আল্‌পনার সমস্ত লতামণ্ডনগুলিতে একটা বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে সেগুলি মেয়েরা নিজে-থেকেই আবিষ্কার করেছে, এবং এক বাংলার আল্‌পনা ছাড়া, কি মান্দ্রাজে, কি বোম্বায়ে কোথাও এত সুন্দর এই ধরণের

লতামণ্ডন দেখিনি। মান্দ্রাজের দড়ির ফাঁস এবং বিন্দুই আল্পনা-চিত্রের ভিত্তি। কিন্তু বাংলার মেয়েরা প্রকৃতির মধ্যে যে-সব পাতা-লতা, তাকেই ভিত্তি করে আল্পনার কলালতা, কল্মীলতা, খুন্তিলতা, চাল্তালতা, চাঁপালতা, শঙ্খলতা সৃষ্টি করেছে দেখি। শঙ্খের ঘোর-পেঁচগুলি প্রাচীন গ্রীস ও ক্রীটদেশের একটি প্রধান মণ্ডন। কিন্তু এই বাংলাদেশের শঙ্খলতায় শঙ্খের স্বরূপটি যেমন সুস্পষ্ট এমন আর কোনো দেশেই নয়। এই শঙ্খলতার ঘোরপেঁচ শঙ্খ থেকে কি জলের আবর্ত্ত থেকে সেটা ইউরোপের মণ্ডনগুলি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় না এবং এ নিয়ে সেখানকার পণ্ডিতে-পণ্ডিতে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলেছিল। কোনো পণ্ডিতে বলেন এই লতামণ্ডন প্রথম ইজিপ্তে; কেউ বলেন ক্রীটদেশে; আবার কেউ বলেন ইউরোপ-খণ্ডে গ্রীসদেশেই এর প্রথম উৎপত্তি। কিন্তু কোথাও বাংলার মতো শঙ্খলতার নিখুঁত চেহারাটি আমরা পাইনে। ক্রীট, ইজিপ্ত এবং গ্রীস—সব থেকে দূরে এই বাংলাদেশ, এবং ঐ-সব প্রাচীন সভ্যতা থেকে কতদূরে এখনো রয়েছে বাংলার এককোণ যশোর। সেখানকার মেয়েদের হাতের এই শঙ্খলতাটি! এই লতামণ্ডন যে খুবই প্রাচীন, আধুনিক কোনো-কিছু থেকে নকল নয়, তা নিশ্চয়ই বলা যায়। বাঙালীর মেয়ের সব-চেয়ে পুরোনো এবং সব-চেয়ে সুন্দর ও যত্নের অলঙ্কার শাঁখা। শাঁখ-লক্ষ্মীর চিহ্ন এবং কড়ি ছিল এককালে এ-দেশের পয়সা। কাজেই শাঁখ এবং তা-থেকে শঙ্খলতা আবিষ্কার এ-দেশে যে কেন খুবই প্রাচীন কালে হবেনা, বুঝিনে। তাছাড়া বাঙালী-জাতিও বড় কম-দিনের নয়। ইজিপ্তের রাণীরা এবং গ্রীসের সুন্দরীরা ঢাকার মস্লিন পর্তেন যখন, তখন যে বাংলাদেশ ও বাঙালী বর্ত্তমান ছিল অন্তত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাক্‌তে পারে না; এবং পূর্ব্বকালের কোনো ঢাকাই-সাড়ির পাড়ে লুকিয়ে এই শঙ্খলতা গ্রীসে ও ইজিপ্তে চালান যায়নি, তাইবা কে বলতে পারে? একই চিন্তা, একই শিল্প, একই মণ্ডন পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে—এটা মানুষের ইতিহাসের একটা সাধারণ ঘটনা; কাজেই এ-বিষয় নিয়ে তর্ক চলেইনা।

বাংলার ব্রতগুলির মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব শিল্প-সাহিত্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম সবই এক-দোলায় অনেকগুলি ছেলের মতো গলাগলি করে রয়েছে দেখছি। এখন ব্রতের সব-শেষের অংশ যে ব্রত-কথা তারি দু-একটি নমুনা কেমন দেখবো।

ব্রতকথা

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি পুরাণ-ভেঙে যেখানে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার কথাগুলিকে ঠিক বাংলার ব্রতকথা বলে ধরা কিছুতে চলে না; শুধু তাই নয় কথা-সাহিত্য হিসেবেও সেগুলির মূল্য বেশী নয়। একটি নমুনা দিই:—

নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ব্রতকথা—"প্রহ্লাদ জন্মান্তরে সুরাপায়ী অতি-কদাচার এক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সর্ব্বদা নর্ত্তকী ও বেশ্যা-ভবনে দিনযাপন করিতেন। দৈবযোগে নৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর দিনে ঐ বেশ্যার সহিত সেই ব্রাহ্মণ-পুত্রের কলহ হয় এবং কলহ করিয়া দুইজনেই সেইদিন রাত্রি অনাহারে জাগরণে

অতিবাহিত করে। অজ্ঞানতঃ তাহাদের উক্তপ্রকারে নৃসিংহ-ব্রতের ফললাভ হয় ও সেই ফলে ব্রাহ্মণপুত্র পরজন্মে প্রহ্লাদ এবং সেই বেশ্যা স্বর্গের অপ্সরা হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্য এই ব্রত করিয়াছিলেন, মহাদেব ত্রিপুরা-বধের জন্য এই ব্রত করিয়াছিলেন, বহুতর ঋষি অনেক রাজা এই ব্রত করিয়া স্বস্ব অভিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। ব্রতের ফল কোটীকল্প বিষ্ণুলোকবাস, পুত্র-হীনের পুত্র, ধনধান্য, সার্ব্বভৌম সুখ, অধিক কি বলিব ব্রহ্মাও চারিমুখে নৃসিংহ-ব্রতের ফলের কথা বলিয়া উঠিতে পারেন না।"

এটা থেকে হয়তো প্রহ্লাদচরিত্র-উপাখ্যান খুব বড়-করে লেখা যেতে পারে, কিন্তু এখন এটি যা, তা পেটেন্ট-ওষুধের বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এইবার খাঁটি মেয়েলী-ব্রতের কথাটি কেমন দেখা যাক্। মেয়েলী ব্রতকথা যতগুলি বাংলায় ছাপা হয়েছে, তার প্রায় সব কথাই সংগ্রহকারেরা মেয়েলীভাষাকে কোথাও নিজেরা, কোথাও-বা বড়-বড় সাহিত্যিকের সাহায্যে সাধুভাষায় রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেছেন। একমাত্র শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার-মহাশয় তাঁর ব্রতকথায় কথাগুলির স্বরূপ অনেকটা বজায় রেখেছেন, যেমন —

ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রতকথা—"এক সওদাগরের দুই কন্যা। একজনে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত কর্‌ত, একজনে অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত কর্‌ত —(বলা যেতে পারে ভুবন-চতুর্থী আর ভূষণ-চতুর্থী) যে অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত কর্‌ত তার নাম কাঁকন। আর যে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত কর্‌ত তার নাম মাখন। অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করে কাঁকনের গায়ে অলঙ্কার ধরে না, ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করে মাখন কিছুই পায় না।" এর পরে কাঁকন পড়ল রাজার ঘরে, মাখনের বিয়ের হল রাখালের ঘরে। "মাখন রাখালের ঘরে গিয়ে, খুদ পান্ কুড়া পান্, ফুলজল দিয়ে কচি কাঁটালের পাতা দিয়ে ত্রিভুবন-চতুর্থীর ব্রত করেন। দেখতে দেখতে রাখালের ঘর ধানে-কলায়ে ভরে উঠলো। এদিকে পক্ষীর ডাক, ওদিকে গাই-বাছুরের হামা, এদিকে ধানের গোলা, ওদিকে কলায়ের ধামা, মিষ্টি গাছের ফল, নদীর জল,—যাকে যা দেবার দেন্-থোন্ জ্ঞাৎ-গোষ্টি নিয়ে থাকেন......ওদিকে কাঁকনের রাজার রাজ্যে যত জিনিষ ছিল অলঙ্কার-চতুর্থীর ব্রত করে সব অলঙ্কার হয়ে উঠলো। রাজার রাজ্যে অলঙ্কার, সিফাই লস্করের ঢাল-তরোয়ালে অলঙ্কার, হেলে চাষার হাল লাঙ্গলে অলঙ্কার, কামারের হাতুরে অলঙ্কার, কুমারের চাকে অলঙ্কার, জেলের জালে অলঙ্কার, তাঁতি নাপিত ধোবা যার যা-কিছু সব তা'তে অলঙ্কার! কেউ কোন কাজ করে না, যে করতে যায় করতে পারে না! হাড়ি-পাতিলে অলঙ্কার, আথায় অলঙ্কার, কাট-কুঁদায় অলঙ্কার, কেমন করে পাক করবে? চালে অলঙ্কার রাঁধতে পারে না, ফল-ফুলে অলঙ্কার, তরিতরকারিতে অলঙ্কার। সকলে অলঙ্কার নিয়ে বসে থাকে খেতে পায় না কেঁদে মরে। না, শেষে রাজার রাজ্যে হাহাকার উঠলো—হাল কৃষি হয় না, কিনতে গেলে কেউ বেচেনা, বেচতে গেলে কেউ কেনে না—কে বেচবে কে কিনবে? যা বেচতে যায় তা'ও অলঙ্কার—" রাজা সন্ধান

পেলেন রাণী দেশসুদ্ধ লোককে অলঙ্কার-চতুর্থী করিয়ে এই বিপদ ঘটিয়ে বসেছেন। রাণীকে বল্লে তিনি বলেন—এর উপায় আমার সেই রাখাল-বৌ ছোট বোন যদি করতে পারে। রাজ্যসুদ্ধ গিয়ে রাখাল-বৌয়ের শরণাপন্ন হল, সেদিন রাখাল-বৌ মাখনের ভুবন-চতুর্থী ব্রতের প্রতিষ্ঠার সময়। রাজা-রাণীর কথায় মাখন বল্লেন—"কি বা বলি? —সোণা-পিতলের অলঙ্কার, খাওয়া না, দাওয়া না, বোন বা তা'র ব্রত কর্‌লেন কেন? সুখে-স্বচ্ছন্দে খাবেন, ঘী দিয়ে মাটির প্রদীপ জ্বাল্‌বেন, হাল চলবে, গাই বলবে, লক্ষ্মীর হাতের ক্ষীর-অলঙ্কার ক্ষেত-ভরে ফুটে উঠবে, বোন, সেই ব্রত করুন।"

—'সরাটোপা কাঁটালের পাত
ব্রত করলে ঘরের ভাত।'

রাণী কাঁকন তখনি ভুবন-চতুর্থী ব্রত কর্‌লেন। অম্‌নি রাজ্যের অলঙ্কার খসে পড়ল।—"যেমন ছিল তেমন ঢাকের মত ঢাক বাজে, হালের মত হাল চলে, মাটির গায়ে ফুল ফুটে, কুমারের চাকে হাঁড়ি, জেলের জালে রুই-কাৎলা।" সকলে নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে—আঃ বাঁচলাম!

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

মিশ্র—খেমটা।

সমর-সঙ্গীত

কে উহারা নবীন সৈনিক?
বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, তেজোদৃপ্তবল, সাহসী নির্ভীক?

(কোরাস্)
ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বঙ্গ-পদাতিক!
বল, জয় জয় জয় জয় জয়,
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক।

(১) বিশ্বভালে প্রলয়-অগ্নি জ্বলিছে ধক্ ধক্!
শোণিতভুক্ত কৃপাণ মুক্ত চমকে লক্‌লক্!
বজ্রবলে কামান তোপ, গরজি উগারে ভীষণ কোপ

জার্ম্মাণ সনে করি'ছ যুদ্ধ ফরাসী ব্রিটানিক্ ;
মার্কিন গ্রীক্, বেলজীন্ ইতালীক, মারাঠা গুর্খা শিখ।
তার মাঝে কে উহারা নবীন সৈনিক ?
সময়-রঙ্গে, মত্ত সঙ্গে, সাহসী নির্ভীক ?

(কোরাস্)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বঙ্গ-পদাতিক !
বল, জয় জয় জয় জয় জয়,—
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক।

(২) ধরণী বংশ হইল ধ্বংস রক্ষা নাহি নাহি !
সুরাসুর নর অপ্সর কিন্নর করিছে ত্রাহি ত্রাহি !
রক্ত-তুফান সাগরে বয়, শবের স্তূপ পৃথ্বীময়,
প্রেত পিশাচ ভক্ষে লক্ষে, হাসিয়া হা হা হা হিক্ !
বিকট বিষম দৃশ্য-নাট্য ভীষণ সন্ত্রাসিক !

জার্ম্মাণ সনে করিছে যুদ্ধ ফরাসী ব্রিটানিক্ ;
মার্কিন গ্রীক্, বেলজিন্ ইতালিক্, মারাঠা গুর্খা শিখ্ !
তার মাঝে কে উহারা নবীন সৈনিক ?
যুঝিছে রণে, হরষ মনে, সাহসী নির্ভীক ?

(কোরাস্)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পদাতিক।
বল, জয় জয় জয় জয় জয়,
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক।

(৩) সমর-বাদ্য ভীমনাদে ঘোষণা করিয়া বলে,
ধর্ম্মযুদ্ধে হও প্রবুদ্ধ এস এ পতাকা তলে।
বিপুল দক্ষ মহা মহা বীর, বলবান দেহ উন্নতশির
ছোট বড় মিলে আসে দলে দলে জাতি বিজাতিক।

জার্ম্মাণ সনে করিছে যুদ্ধ ফরাসী ব্রিটানিক্ ;
মার্কিন গ্রীক্, বেলজিন্ ইতালিক্, মারাঠা গুর্খা শিখ্।
তার মাঝে কে উহারা নবীন সৈনিক ?
অগ্রগামী বীর, সঙ্কটে স্থির, সাহসী নির্ভীক ?

(কোরাস্‌)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পদাতিক।
বল জয় জয় জয় জয় জয়,
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক!

(৪) আকাশ হইতে বর্ষা-ধারে হইল পুষ্পবৃষ্টি!
রুদ্র কাণ্ড শমিত সাঙ্গ রক্ষা পাইল সৃষ্টি!
উঠিল রব ধন্য ধন্য, দেবতা মানব সুপ্রসন্ন,
আশীষপূর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিছে অনিমিখ—
কে উহারা নবীন সৈনিক?
অসাধ্য কাজে, অগ্রে সাজে, অসম সাহসিক?

(কোরাস্‌)

ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই, বঙ্গ-পদাতিক।
বল, জয় জয় জয় জয় জয়!
বাঙ্গালী সৈনিক, বাঙ্গালী সৈনিক, ওরা বাঙ্গালী সৈনিক।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর—শ্রীযুক্ত প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

১´ • ১ • ১´
II গা –া গা। গা –া –া I রা –া –া। –া –া –া I রা রা –গা।
কে ০ উ হা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ন বী ০

॰ ১´ • ১´ ॰
। সা –ন্‌া সা I রা –া –া। –া –া –া I গা –া ধা। পা –া হ্মা।
ন ০ সৈ নিক্‌ ০ ০ ০ ০ ০ বু ০ দ্ধি তে ০ উ

১´ ॰ ১´ • ১´
I গা –া –া। –া –া –া I র্সা –া র্গা। র্রা –া না I র্সা –া –া।
জ্জ্বল্‌ ০ ০ ০ ০ ০ তে ০ জো দৃ ০ প্ত বল্‌ ০ ০

• ১´ • ১´
। –া –া –া I না –া না। র্সা –া না I পা –া –া।
০ ০ ০ সা ০ হ সী ০ নি র্ভীক্‌ ০ ০

(কোরাস্)

। -া রা রা I রা রা গা । হ্মা পা পা I পা না ধা ।
০ ও রা আ মা দে র্ ছে লে আ মা দে

। পহ্মা পা -া I পা -া পা । না -ধা না I র্সা -া -া । -া র্সা র্সা ।
র্ ভাই ০ ব ০ ঙ্গ প ০ দা তিক্ ০ ০ ০ ব ল

I র্গা র্গা র্রা । র্রা র্সা র্সা I নধা না র্সা । -া -া -া I
জ য় জ য় জ য় জ০ য় জ য়্ ০ ০

I না না -া । র্সা -া না I পা -া -া । -া -া -া I
বা ঙ্গা ০ লী ০ সৈ নিক্ ০ ০ ০ ০ ০

I হ্মা হ্মা -া । পা -া হ্মা I রা -া -া । -া রা রা I
বা ঙ্গা ০ লী ০ সৈ নিক্ ০ ০ ০ ও রা

I রা -া -া । গা -া -া I হ্মা -া -াপ । গহ্মা -া -া I পা -া -া ।
বা ০ ০ ঙ্গা ০ ০ লী ০ ০ সৈ ০ ০ নিক্ ০ ০

এই কোরাস্ সর্ব্বত্র এক সুর।

-া -া -া II
। ০ ০ ০

II সরা -গা রা । পা পা -া I গা রা গা । রা -া সা I
(১) বি০ ০ শ্ব ভা ০ লে প্র ল য় অ ০ গ্নি
(২) ধ০ র ণী বং ০ শ হ ই ল, ধ্বং ০ স
(৩) স ম র বা ০ দ্য ভী ০ ম না ০ দে
(৪) আ কাশ্ ০ হ ই তে ব ০ র্ষা ধা ০ রে

I সা ধা সা । গা -া -া I সা -া -া । -া -া -া I
(১) জ্ব লি ছে ধক্ ০ ০ ধক্ ০ ০ ০ ০ ০
(২) র ০ ক্ষা না ০ হি না ০ ০ ০ ০ ০
(৩) ঘো ষ ণা ক রি য়া ব ০ ০ লে ০ ০
(৪) হ ই ল পু ০ ষ্প বৃ ০ ০ ষ্টি ০ ০

	১´			০			১´			০		
I	পা	পধনা	না ।	ধা	-া	পা I	ক্ষা	ধা	পা ।	ক্ষা	-া	রা I
(১)	শো	নি০	ত	ভু	০	ক্ত	কৃ	পা	ণ	মু	০	ক্ত
(২)	সু	রা০	সু	র	ন	র	অ	প্স	র	কি	ন্ন	র
(৩)	ধ	০	র্ম্ম	যু	০	দ্ধে	হ	ও	প্র	বু	০	দ্ধ
(৪)	রু	০	দ্র	কা	০	ণ্ড	শ	মি	ত	সা	০	ঙ্গ

	১´			০			১			০		
I	গা	ক্ষা	পা ।	না	-া	-া I	পা	-া	-া ।	-া	-া	-া I
(১)	চ	ম	কে	লক্	০	০	লক্	০	০	০	০	০
(২)	ক	রি	ছে	ত্রা	০	হি	ত্রা	০	০	হি	০	০
(৩)	এ	স	এ	প	তা	কা	ত	০	০	লে	০	০
(৪)	র	০	ক্ষা	পা	ই	ল	সৃ	০	০	ষ্টি	০	০

	১´			০			১´			০		
I	র্সা	-া	র্সা ।	না	-া	না I	ধা	ধা	ধা ।	পা	ক্ষা	পা I
(১)	বি	০	শ্ব	ভা	০	লে	প্র	ল	য়	অ	০	গ্নি
(২)	ধ	র	ণী	বং	০	শ	হ	ই	ল	ধ্বং	০	স
(৩)	স	ম	র	বা	০	দ্য	ভী	০	ম	না	০	দে
(৪)	আ	কাশ্	০	হ	ই	তে	ব	০	র্ষা	ধা	০	রে

	১´			০			১			০		
I	রা	গা	রা ।	গমা	রা	-া I	সনা	-া	রা ।	সা	-া	-া I
(১)	জ্ব	লি	ছে	ধক্	০	০	ধক্	০	০	০	০	০
(২)	র	০	ক্ষা	না	০	হি	না	০	০	হি	০	০
(৩)	ঘো	ষ	ণা	ক	রি	য়া	ব	০	০	লে	০	০
(৪)	হ	ই	ল	পু	০	ষ্প	বৃ	০	০	ষ্টি	০	০

	১			০			১´			০		
I	পা	-ধা	পা ।	র্সা	-া	র্সা I	র্রা	র্সা	র্সা ।	র্সা	-া	-া I
(১)	ব	০	জ্র	ব	০	লে	কা	মা	ন	তোপ্	০	০
(২)	র	০	ক্ত	তু	ফা	ন	সা	গ	রে	বয়্	০	০
(৩)	বি	পু	ল	দ	০	ক্ষ	ম	হা	ম	হা	বীর্	০
(৪)	উ	ঠি	ল	র	০	ব	ধ	০	ন্য	ধ	০	ন্য

	১			০			১´			০			
I	র্সা	র্রা	র্গা ।	র্গা	র্পা	র্পা	I র্গা	র্রর্গা	র্রা ।	র্সা	-া	-া	I
(১)	গ	র	জি	উ	গা	রে	ভী	ষ	ণ	কোপ্	০	০	
(২)	শ	বে	র	স্তূপ্	০	০	পৃ	০	থ্বী	ময়্	০	০	
(৩)	ব	ল	বান্	০	দে	হ	উ	০	ন্ন	ত	শির্	০	
(৪)	দে	ব	তা	মা	ন	ব	সু	০	প্র	স	০	ন্ন	

	১´			০			১´			০			
I	র্সা	-র্গা	র্রা ।	র্রা	র্সা	র্সা	I না	-র্রা	র্সা ।	পা	-া	-া	I
(১)	ক	০	ম্পি	ত	ক	রি	স	০	প্ত	লোক্	০	০	
(২)	র	০	ক্ত	পি	শা	চ	ভ	০	ক্ষে	ল	০	ক্ষে	
(৩)	ছো	ট	ব	ড়	মি	লে	আ	সে	দ	লে	দ	লে	
(৪)	আ	শী	ষ	পূ	০	র্ণ	মু	০	গ্ধ	দৃ	০	ষ্টি	

	১´			০			১´			০			
I	ধা	-া	ধা ।	-া	ধা	পা	I র্সা	-া	-া ।	-া	-া	-া	I
(১)	ছার্	০	খার্	০	ক	রি	দিক্	০	০	০	০	০	
(২)	হা	সি	য়া	হা	হা	হা	হিক্	০	০	০	০	০	
(৩)	জা	০	তি	বি	০	জা	তিক্	০	০	০	০	০	
(৪)	দে	খি	ছে	অ	০	নি	মিখ্	০	০	০	০	০	

	১´			০			১´			০			
I	র্সা	র্সা	র্সা ।	না	-া	না	I ধা	-া	ধা ।	পা	-া	পা	I
(২)	বি	ক	ট	বি	ষ	ম	দৃ	০	শ্য	না	০	ট্য	

	১´			০			১´			০			
I	গা	গা	গা ।	রা	-া	রা	I সা	-া	-া ।	-া	-া	-া	I
(২)	ভী	ষ	ণ	স	০	ন্ত্রা	সিক্	০	০	০	০	০	

	১´			০			১´			০			
I	পধা	না	না ।	না	ধা	ধা	I পা	হ্মা	পা ।	হ্মা	-া	রা	I
(১),(২),(৩),(৪)	জা০	০	র্ম্মা	ন	স	নে	ক	রি	ছে	যু	০	দ্ধ	

	১			০			১´			০			
I	রা	গা	ধা ।	ধা	-া	হ্মা	I পা	-া	-া ।	-া	-া	-া	I
	ফ	রা	সী	ব্রি	০	টা	নিক্	০	০	০	০	০	

১´ ০ ১´ ০ ১´

I না –া –া । র্সা –া না I পা –া –া । –া –া –া I ক্মা –া ক্মা

মা ০ ০ কিঁ ০ ন গ্রীক্ ০ ০ ০ ০ ০ বেল্ ০ জিন্

০ ১´ ০ ১´ ০

। পা –া ক্মা I রা –া –া । –া –া –া I রা গা ক্মা । ক্মা গা ক্মা I

ই ০ তা লিক্ ০ ০ ০ ০ ০ মা রা ঠা গু ০ র্খা

১´ ০ ১´ ০ ১´

I পা –া –া । –া –া –া I গা –া –া । গা –া গা I গা –া গা ।

শিখ্ ০ ০ ০ ০ ০ তার্ ০ ০ মা ০ ঝে কে ০ উ

০ ১´ ০ ১´ ০

। গা –া –া I রা –া –া । –া –া –া I রা রা গা । সা ন্‌া সা I

হা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ ন বী ০ ন ০ সৈ

১´ ০ ১´ ০ ১´

I রা –া –া । –া –া –া I গা –া ধা । পা –া ক্মা I গা –া –া ।

নিক্ ০ ০ ০ ০ ০ (১) স ০ ম র ০ র ঙ্গে ০ ০

(২) যু ০ ঝি ছে ০ র ণে ০ ০

(৩) অ ০ গ্র গা ০ মী বীর ০ ০

(৪) অ সা ০ ধ্য ০ কা জে ০ ০

০ ১´ ০ ১´ ০

। –া –া –া I র্সা –া র্গা । র্রা –া র্সনা I র্সা –া –া । –া –া –া I

(১) ০ ০ ০ ম ০ ০ ত্ত ০ সং ঙ্গে ০ ০ ০ ০ ০

(২) ০ ০ ০ হ ০ র ষ ০ ম নে ০ ০ ০ ০ ০

(৩) ০ ০ ০ স ০ ০ ঙ্ক ০ টে স্থির ০ ০ ০ ০ ০

(৪) ০ ০ ০ অ ০ ০ গ্রে ০ সা জে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´

I না –া না । র্সা –া না I পা –া –া II

(১),(২),(৩) সা ০ হ সী ০ নি র্ভীক্ ০ ০

(৪) অ স ম সা ০ হ সিক্ ০ ০

(কোরাস্) ওরা আমাদের ছেলে আমাদের ভাই বঙ্গ-পদাতিক ইত্যাদি।

ডাক-পিয়ন

(গল্প)

আমাদের পাড়ায় চিঠি বিলি করিত সুন্দররাম। জাতিতে সে হিন্দুস্থানী কাহার। পশ্চিমের এক পল্লীতে তাহার বাড়ী; সেখানে আপনার-জনদের ফেলিয়া পেটের দায়ে সে কলিকাতায় আসিয়াছিল চাকরি করিতে। বৎসরান্তে 'পূজা'র কিছুদিন পূর্ব্বে ছুটি লইয়া সে একবার বাড়ী যাইত।

আমার ও আমার প্রতিবেশীদের কাছে তাহার পাওনা ছিল, বৎসরে দুইবার:— দোলের পরে ও পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে। তাহার এই পাওনা দাবী করার মধ্যে একটু মজার কথা আছে।

আমার সমান কিম্বা আমার চেয়ে বড়-দরের লোকের কাছে সে যে-জায়গায় আট-আনা পাইবার আশা করিত, আমার কাছে সেখানে, কি জানি কেন, সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল চার টাকার কম কিছুতেই লইবে না! কিন্তু আমি যে কি দিতাম, সে-কথা বলিতে আমার এখন লজ্জা করে।

সে আশা করিত, উপেনবাবু তাহাকে অন্তত চারিটি টাকা দিবে, কিন্তু যথাসময়ে সেই চারি-টাকার চেয়ে ঢের কম যখন তার হাতে পড়িত তখন সে যে খুব নিরাশ হইয়াছে এমন বোধ হইত না। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম, সে মনে করিতেছে, এখন বাবু দিতে পারিল না বটে কিন্তু আগামী বারে নিশ্চয় পোষাইয়া দিবে! —অথচ আমি তাহাকে ভবিষ্যতের কোনো আশ্বাসই দিতাম না। এবারেও যেমন, আর-বারেও তাহার ভাগ্যে সেই একটি-সিকির বেশী কখনো জুটিত না। তত্রাচ আমার প্রতি তাহার আশা শেষপর্য্যন্ত সমান বজায় রাখিয়াছিল।

সে-বছর পূজার মাস-তিন পূর্ব্বে একটা বড় মকর্দ্দমা জিতিয়া আমার বেশ মোটা লাভ হইয়া গেল।

অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে পাইয়া মনে করিলাম প্রতি-বৎসর মনের মধ্যে যে-সব অতৃপ্ত বাসনাগুলা জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া থাকে, এবার এই পূজার সময় তাহার কতক পূর্ণ করিয়া লইব। মনের নোট-বুকে তারই একটা ফর্দ্দ লিখিতে বসিয়া গেলাম।

রাস্তার ধারের বারান্দায় বসিয়া আছি —এমন সময় সুন্দররাম বরাবর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া আমার হাতে এক-খানি পত্র দিল। তারপর আমার মুখ-পানে চাহিয়া বলিল—"পূজার এখোনো কোতো দিন দেরী আছে বাবু?" আমি বলিলাম,— "এখনও এক মাসেরও বেশী।" সে বলিল —"এখোনো এতো দেরী!" বলিয়া সে আপন-কাজে চলিয়া গেল। পূজার কথা তুলিতেই আমার মনে পড়িয়া গেল তার বখ্‌শিসের কথা। ফর্দ্দের মধ্যে এতক্ষণ এই অঙ্কটা ধরা হয় নাই; মনে-মনে

সে-ত্রুটি তখনি সংশোধন করিয়া লইলাম। একটু মোটা-রকমের অঙ্কই ফেলিলাম ;—আহা বেচারা, অনেকদিন হইতে আশা করিয়া আছে! এবারে তাহাকে খুসি করিবই।

দেখিতে-দেখিতে কুড়ি দিন কাটিয়া গেল। পূজার বাজারে, মনের নোট বুকের সেই ফর্দ্দের মতো খরচ করিতে লাগিলাম। প্রায় সবই সমাধা হইল ; এখন বাকি কেবল সুন্দররামের দাবী। কিন্তু কোথায় সুন্দর-রাম? চুপিচুপি চিঠি বিলি করিয়া সে সরিয়া পড়ে ;—আমার সঙ্গে কৈ দেখা করেনা ত! ভাবিলাম—এখনো পূজার কিছু বিলম্ব আছে, তাই বোধ হয় তার তেমন তাড়া পড়ে নাই।

পূজা আরো নিকট হইয়া আসিল; অন্যবৎসর এর অনেক আগে সে পাওনা চুকাইয়া লইয়া যায়, কিন্তু এ-বৎসর তাহার কি হইল বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। প্রতি-মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল সে এখনই আসিয়া হাত-পাতিয়া দাঁড়াইবে কিন্তু কৈ, শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে বখ্‌শিশ চাহিতে আসিল না।—কেন? তবে কি সে রাগ করিয়াছে? না, অভিমান?

ষষ্ঠীর দিন পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখি—সুন্দররাম পাশের বাড়ীতে চিঠি বিলি করিয়া বাহির হইতেছে। আমার চোখে চোখ পড়িতেই সে যেন মুখটা ঘুরাইয়া লইল। আমি হাসিলাম—বুড়ার অভিমান বড়ই বেশী দেখিতেছি! মনে হইল ডাকিয়া উহার হাতে একখানা নোট গুঁজিয়া দি। আহা, বেচারা!

একটু পরেই সুন্দররাম ঘুরিয়া-ফিরিয়া আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে এক-খানি চিঠি দিল, কোনো কথা না বলিয়াই ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া আমার এই আনন্দ হইতেছিল যে এখনই সে বখ্‌শিসের কথাটা পাড়িবে, কিন্তু তাহাকে গোঁ-ভরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমার ভারি রাগ হইল। ইস্—বেটা যেন নবাব! নিবি ত ভিক্ষা, এত দেমাক কেন তবে! আমি আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না। চিঠিখানা খুলিতে গিয়া দেখি ব্যাটা ভুল করিয়াছে। চিঠি আমার নয়।

সেইদিন বৈকালে বাড়ীর বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখি, সুন্দররাম আর-একজন পিয়নের সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে চলিয়াছে। আমি তাহাকে ডাকিয়া সকালবেলাকার চিঠিখানা ফেরত দিয়া ধম্‌কাইয়া বলিলাম,—"তুই কার চিঠি কাকে দিস্? এ আমার নয়!"

সুন্দররাম অন্যমনস্কে আমার হাত হইতে চিঠিখানা লইল। দেখিলাম তাহার চলা-ফেরা ধরণ-ধারণ সমস্তই একটা অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এমন কি, যে বখ্‌শিসের জন্য অন্য-বৎসর এ-সময় তাহার সমস্ত মন ব্যস্ত হইয়া থাকে, এখন তার কথা যেন তার মনের ত্রিসীমানার মধ্যে নাই। ব্যাপার কি, আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় সেই পিয়নটা বলিয়া উঠিল—"ইয়ে দেখো!—ইস্ লিয়ে মাষ্টার না উস্‌রোজ তোম্‌রা দো রূপেয়া ফাইন কিয়া থা।" বলিয়া সে আরও গম্ভীর স্বরে হইয়া বলিয়া উঠিল,—"গবরমিণ্টিকা কাম্‌মে এসা ভুলচুক্ না করনা।"

সুন্দর সে-উপদেশ কানে তুলিল বলিয়া মনে হইল না; সে চিঠিখানা ব্যাগে পুরিয়া অন্যমনস্কে চলিয়া গেল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল তাহাকে ডাকি কিন্তু সে তার অবসর দিল না।

বিজয়া দশমী। পূজার আনন্দ-অবসানের সঙ্গেসঙ্গে সুন্দররামের কথাটা কেবলই মনের মধ্যে তোলাপাড়া হইতেছিল। আর সে-দিনকার তার সেই অন্যমনস্ক মুখ আমি ভুলিতে পারিতেছিলাম না। কি জানি কেন, তার উপর আমার আর রাগ ছিল না। মনে কেবলই ক্ষোভ হইতেছিল বেচারাকে ডাকিয়া টাকা-কয়টা দিলাম না কেন? সে বোধ হয় কাজে কিছু ভুলচুক করিয়া বিপদে পড়িয়াছে, তাই বখ্‌শিসের দিকে তার খেয়াল নাই,—আমার উপর রাগও নয়, অভিমানও নয়।

সুন্দররামের নামে তুলিয়া-রাখা টাকা কয়টা লইয়া আমি ভারি অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। আমার মনের সাধ এ-বৎসর মোটা-মু' মিটিয়াছে—কেবল এইটাই যে বাকি! দান করিবার জন্য মানুষের মন যে এতটা উতলা হইতে পারে, পূর্ব্বে জানিতাম না;—আর নিজে অনুভব না করিলে বোধ হয় এ-কথা কেহ তামা-তুলসী-গঙ্গাজল ছুঁইয়া বলিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

একটা অস্বস্তির বোঝা বুকে লইয়া আমি সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দররামের মূর্ত্তি পথের উপর দেখা দিল। আমি একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলাম,—"ওরে সুন্দর, উপরে আয় ত।"

সে শান্ত বালকটির মত ধীরে-ধীরে আমার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি একটু অভিমানের সুরে বলিলাম—"তা বেশ ক'রেচিস্ সুন্দর,—আমার কাছে পাওনাটা বুঝি ছেড়ে দিয়েছিস্?—তা' বেশ, বেশ,—কোথায় পাব বল্—গরীব মানুষ আমি—"

শুনিতে-শুনিতে সে কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল; আমার দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল—"আপ্‌নির কাছে কি হামার পাওনা হামি ইচ্ছে করিয়ে ছোড়েছি বাবু—ভগবান্ ছোড়িয়ে দিয়েছে হুজুর—" কথাটা শেষ না করিয়াই সে বসিয়া পড়িল। তারপর একটু সাম্‌লাইয়া, পকেট হইতে একখানি হিন্দুস্থানী-ভাষায় লেখা ছেঁড়া চিঠি বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন বাবু, আর হামার টাকার কি দোর্‌কার আছে—!"

আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম—"ভাল বুঝ্‌লুম না সুন্দর—কি হয়েছে তোর?"

সে বলিল,—"বাবু মুল্লুকমে হামার জরু আছে। একটা সাত ব'ছরের লেড়্‌কাও ছিল—বছর-বছর তা'রই জন্যে কেতো কি খেলানা-উলানা, কেতো ভাল ভাল পোষাক-উষাক্ নিয়ে যেতুম বাবু—"

বুঝিতে পারিলাম। বাধা দিয়া বলিলাম,—"থাক্ সুন্দর, আর তোকে বল্‌তে হ'বে না—" আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল; সাম্‌লাইয়া লইলাম।

সুন্দর আমার নিষেধ মানিল না;

বলিল—"না বাবু, আপ্‌নিকে শুন্‌তে হোবে। আপনার বড় দয়া। হামি এম্‌নি আপ্‌নির কাছে হামার বোকসিস্ ছোড়েনি হুজুর—" বলিয়া সে আরও যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, তাহাদের বাড়ীর পাশে এক বড়লোকের একটি ছোট্ট মেয়ে আছে, তারই দেখাদেখি সুন্দরের মেয়ে নানা দামী জিনিষের আবদার ধরিত। তার জন্য সে—

আমি বলিলাম, "ও কথা থাক্ না সুন্দর—"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুন্দর বলিল—"গেল বারে মেয়ে হামার একজোড়া জরির জুতা মেঙেছিল বাবু—দিতে পারিনি! সেই মেয়ে হামার মোরে গেলো—" বলিয়া সে ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময় কোথা হইতে আমার ছয় বৎসরের মেয়ে আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ডাকিল—"বাবা—"

সেই শব্দে চোখের জল মুছিয়া সুন্দর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; আমার মেয়েটির দিকে একবার সবেগে অগ্রসর হইয়া আসিল; তার পর হঠাৎ পিছু হটিয়া ধীরে-ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

গগন

আরেক জগতে আছি গগনের কাছাকাছি,
হ'ল সত্য আশঙ্কা-কল্পনা!
আছে স্নেহ, নাই শোক, কোথা সে অমর লোক,
রে নন্দন আনন্দের কণা?

কপাল হইতে হাত সরাইয়া অকস্মাৎ
হেরি তায় রক্ত দরদর্—
লুকান' সঙ্গীন কা'র খোঁচা দেয় বার বার,—
ঝরে ধারা তপ্ত ঝরঝর্।

কোথা রে দুলাল কই, এ-আমি সে-আমি নই,
আমা-ছাড়া একা সে কোথায়?
কথা কই স্বপ্ন দেখে' যেন কত দূর থেকে
বাছা এসে শিয়রে দাঁড়ায়।

চাপা কান্না পড়ে ঝরে' অশ্রু-লোণা পথ ধরে',
গলে' যায় একমুষ্টি ছাই,—
এ কি কষ্ট, কি কুয়াসা কণ্ঠমাঝে বাঁধে বাসা,
সান্ত্বনার প্রাণে শান্তি নাই।

এ ঘর পছন্দ তোর হ'ল না কি বাছা মোর?
নিবে গেলি মাণিক আমার!—
এসেছিলি স্বপ্ন দিয়া অফুরন্ত আলো নিয়া
চমকিয়া খনির আঁধার।

আজি যে ঢুকিতে ঘরে কি-যে বুক চেপে' ধরে,
নির্জ্জনতা ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
সাধ-না-মেটার দেশে বুঝি তোর ভালবেসে
পূরোপূরি মিটিল না আশ!

আচম্‌কা থেকে থেকে নাম ধরে' উঠি ডেকে,
কি বলিয়া গেলি ইসারায়?
ছিঁড়ে যদি যাবি হেন' এত জোরে তবে কেন
গিরা দিলি শিরায় শিরায়!

কা'রা যেন আসে সরে' অশ্রুকণা বিদ্ধ করে'
চোখে পড়ে মুখের 'আদল'—
নিবন্ত চাঁদের ফালি, গলে' পড়ে জ্যোৎস্নাকালি
প্রহরেরা ছায়ায় পাগল।

ভাঙ্গে আধ-জাগা ঘুম, যাই তারে দিতে চুম,
ভাবি, আছে কোল্‌টিতে শুয়ে,
অন্ধকারে কত খুঁজি বিছানা ছাড়িয়া বুঝি
অভিমানে ঘুমায় সে ভুঁয়ে।
আচম্বিতে মনে হয় চোখ টুটে' জল বয়,
সব আছে সেই না কি নাই,
লুকোচুরি খেলা দিতে এত বড় পৃথিবীতে
লুকাতে কি পেল না রে ঠাঁই ?

কাঁদে রাতি ব্যথা-ঝড়ে, তারি কথা মনে পড়ে,
সেই কাঁদে হিয়ার মাঝার,
স্বপনের আরসীতে যাই তারে পরশিতে,
ছায়া হাতে ঠেকে বারে বার।
কাঁদে সেও মোর মত মরমে দারুণ ক্ষত,
চায় ছুঁতে আমারি মতন ;
দু'জনের মাঝ্‌খানে কি যে বাধা সেই জানে,
রূপ-হারা তার পরশন।

জীবনের বালুঘড়ি ঝিরি-ঝিরি পড়ে ঝরি,
কত পল, অনুপল আছে !
আয়ু-বিহগের পাখা কি মোচড়ে রক্ত-মাখা,
আঁখিদুটা ছেঁচে দিয়ে গেছে !
পথের বালকে দেখে' কথা কই শত ডেকে,
গগনেরি মত সে তাকায়,
তেমনি মুখের ছাঁদ, অধরে সে চারু ফাঁদ,
তারি মত হাসিটি বিলায়।

মর্ত্ত্য দিবা-স্বপ্নভরা কচি চোখে এত ত্বরা
কে পরাল ভোলার কাজল !
নূতন অধর-পুটে নূতন অমৃত লুটে'
কোথায় আছিস্ ওরে বল্।
তোর সে চোখের খেলা না হেরিলে ভোর-বেলা
আলো যে হ'ত না মোর ঘরে'
তোরি স্নেহরেণু মোরে নিরমল রূপ ধরে'
নিশিদিন ছিল পুণ্য করে' !

এই যে নিখিল খেলা মিলন-প্রয়াগ-মেলা,
খেলা বলে' ভুলেও ভাবিনি—
আঁকুপাঁকু হ'ল সার যুদ্ধশেষ পুরস্কার,—
দংশে আঁখি সাগর-নাগিনী।
তিলার্দ্ধ আমারে ছেড়ে থাকিতে হইলে যে রে
চাহিতিস্ মিনতি-কাতর,
এবে না দেখিয়া মোরে আছিস্ কেমন করে'
রে তরুণ পারুল-কেশর !
তুহারি আঙুল ধরে' আমি যে নতুন করে'
শিখেছিনু চলিতে হাঁটিতে,
ধূলার আল্‌পনা-আঁকা পা দু'খানি ছন্দমাখা
পারিজাত ছড়াত মাটিতে !
তুহারে তুলিয়া পিঠে সয়েছি প্রহার মিঠে
খুসি-ভরা হাতের মুঠায়,
বায়না আব্‌দার ধরে' মেঝেয় আছাড়ি' পড়ে'
দিই নি তো লুটাতে ধূলায়।
খেলার পুঁতুল তোর ফেলিছে আঁখির লোর,
গুমরিছে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া,—
হেরি বাতায়ন খুলি' মূর্চ্ছে বসন্তের তুলি
সে জগৎ গিয়াছে উঁপিয়া।

ওরে যাদু, মোর সাথে না খাইলে এক পাতে
খিদে তোর মিটিত না যে রে,
কি ভালই বেসেছিলি ! হাসি-খেলা নিরিবিলি
ফুরাইল কি গ্রহের ফেরে !
আহ্লাদ-পুতুলি এলি, আদরে-আদরে গেলি
দেখায়ে আসল হাসিরেখা,
শেষ আঁখিনীরে ভাসি' ফুটিল সোনার হাসি,
সে হাসি কাঁদায় মোরে একা !

কলিজার ভাঁজে ভাঁজে আগুনের ফুলকি-মাঝে
আমি সেই হাসির কাঙাল!
দরদ-ভুলান' সেই সুধার তুলনা নেই,
কোথা গেলে পাব রে নাগাল!

আজিকে ভিতর মোর ছেয়েছে বিষের ঘোর,
'বাহির' সে মিলাইয়া আছে,
ওই বাহিরের সাড়া হয়ে' গেছে আমা-ছাড়া
চোখের জলের ঘসা-কাচে।
শূন্য এ কান্নার দিন, ভয়ের জোয়ার ক্ষীণ
থম্‌থমে ক্ষয়ের ভাঁটায়—
উষার অতল-স্পর্শ হারায়েছে মোর হর্ষ,
সোনালি বুদ্বুদ টুটে' যায়।
কৃষ্ণচ্ছায়া বাষ্পে ভরি' আকাশে নিবিড় করি'
তারা-শিশু বলে কি উতলা!
এ বক্ষে দক্ষিণে বামে কি দোলা দিবস-যামে—
দোলে দুই অয়নের দোলা!
কী যে এবে অনুভবি ভাষাতে সে ব্যথা-ছবি
ফুটাইতে বৃথায় প্রয়াস -
শুনি শুভ-শঙ্খমাঝে কি মহাবেদনা বাজে,
ভরা চোখে ভরে জলোচ্ছ্বাস!

একি রে দমকা হাওয়া পিছনে করিছে ধাওয়া?
ঘূর্ণিপাকে ঘোরে সারা মন,—
চক্রবালে তারা ফোটে তেমনি সে জেগে ওঠে,
মনে-মনে-চেনা সে নয়ন।
আসিবে আসিবে ফিরে' সে মোর স্নেহের তীরে
প্রভাত যেমন ফিরে আসে,—
মৃত্যু কি ভুলায়ে তারে তিলার্দ্ধ রাখিতে পারে,
হেন শক্তি নাহি তার পাশে।

পাঁজরে পোড়ার দাগ ঢাকা দিয়ে রাত্রি জাগ,
রাত্রি সে ব্যথার রূপান্তর,
পলকে-পলকে-গাঁথা একি বেড়া-জাল পাতা,—
কি নির্ম্মম মমতার ঘর!
সত্যই কি হ'ল শেষ, স্নেহের আকুল রেশ
তোলে না সুদূর প্রতিধ্বনি?
এই আছে, এই নাই, আঁখি পালটিয়া চাই,
না হেরি আলোর আগমনী।
সে যে গেছে এক হয়ে' অনন্ত ধারায় বয়ে'
জীবনের ফেনবিম্বে ভাসি'—
ব্যাপি' চিরন্তন-অদ্য অমর-জনম-পদ্ম
রসে-রাগে ওঠে পরকাশি'।

পূর্ণিমার কোন্ পারে চির-জ্যোৎস্না ডাকে তারে,
সরে অজগর রাত্রিরূপ,
মৃত্যু সে চুমকি-প্রায় ঝিকিমিকি' নিবে যায়,
প্রশ্ন করে নক্ষত্র নিশ্চুপ।
মহানিশা বাষ্পময়ী ছেয়েছে আমার মহী,
সঙ্কুচিত ব্যোম চরাচর,
একটি অণুর মাঝে রূপাতীত হয়ে রাজে
অতীন্দ্রিয় তন্দ্রা ও জাগর।

তিমির-কুহেলি থেকে ফিরে এসেছিল কে কে?
জগৎ-ডুবান' দুখামৃত
মুখে তার উথলায়, পলাতক বেদনায়
কি ধূসর ছায়ায় বিম্বিত!—
কা'র মৃত্যুজিৎ স্নেহে ফিরে প্রাণ শবদেহে?
কবে তাঁর দেউলে, গগন,
তোকে বুকে করে' সেই দেবতার সম্মুখেই
নত-শিরে হব নির্বেদন।

এই মর্ম্মকাতরতা কোথা শেষ হে দেবতা?
নিতে বাকি আরো কতখানি!
কি বিচিত্র কল্প তব পূর্ণ কর চিরনব
মায়া-রঙা যবনিকা টানি'?

অগণিত প্রাণী নিয়ে কি-নিষ্ঠুর দাগা দিয়ে
একি খেলা খেল' মহেশ্বর ?
না যদি সৃজিতে হায় কিবা ক্ষতি ছিল তায়,
—অপার যে ব্যথার লহর !

যদি এ রাতের বাসা ভরে' দিলে ভালবাসা;
কেন তবে ভাঙ্গ' গো নিঠুর ?
পুটপাকে লৌহপ্রায় পোড়াইয়া নিরুপায়
কি করুণা দেখাও ঠাকুর ?

না-না তুমি স্নেহরূপে গলে' পড় চুপে-চুপে,
জ্বলে' ওঠ দুঃখরূপ ধরে'—
লীলাময়, এ কি দীক্ষা, মর্ম্মান্তিক কি পরীক্ষা,
কি রহস্য জন্ম-জন্মান্তরে !
মনোবনে অলিগলি রাঙা করে' এ বিজলি
বজ্রফালে পাঠাইছ কেন ?
তারি মাঝে পোড়া পথে জয়-ভরা তব রথে
রুদ্রভেরী শোনাইছ হেন !

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বপ্নের উপর স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রভাবের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে পারা যায়; কিন্তু আমাদিগকে সংক্ষেপেই সারিতে হইবে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সহিত এই স্পর্শানুভূতি সম্মিলিত হইয়া স্বপ্নের প্রয়োজন-মত মূর্ত্তিটি গঠন করে। রাত্রে আমরা হাল্‌কা কাপড় পরিয়া নিদ্রা যাই, সেইজন্য ঘুমন্ত অবস্থাতেও প্রায়ই আমাদের এই কথাটি মনে লাগিয়া থাকে যে, আমরা হাল্‌কা কাপড় পরিয়া আছি। যদি স্বপ্নে আমরা পথে বাহির হই, তবে তাহা এই রাত্রির কাপড়েই; পথের লোক কিন্তু এই অপরূপ পরিচ্ছদের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করে না। এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, এরূপ স্বপ্ন খুব সাধারণ। আরো একটী স্বপ্নের কথা লিখিতেছি—এ বিষয়ে অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। এটি বায়ুপ্রবাহে উড়িয়া যাওয়া কিম্বা শূন্যে ভাসিয়া চলার স্বপ্ন। একবার এই স্বপ্ন দেখিলে আবার যে দেখিতে হইবে তাহা একরূপ সুনিশ্চিত; এবং ইহার প্রত্যেক বারের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে হয়, "এর পূর্ব্বেও স্বপ্নে আমি আপনাকে শূন্যে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার এ আর স্বপ্ন নয়, প্রত্যক্ষ সত্য! শেষটা বেশ ভাল রকমই জানা গেল যে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মেরও নড়চড় হইতে পারে।" এই শ্রেণীর স্বপ্ন হইতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াই যদি কেহ চেষ্টা করেন, তবে অবস্থার বিশ্লেষণ-দ্বারা স্বপ্ন দেখিবার কারণাবলী নির্ণয় করিতে পারিবেন। তিনি লক্ষ্য করিবেন, তাঁহার পায়ের নীচে কোন অবলম্বন নাই। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি যে শয়ন করিয়া আছেন সে জ্ঞান না থাকায়, অথচ তাঁহার

পদদ্বয় যে ভূমিস্পৃষ্ট নহে, এ অনুভূতিটুকুও বর্ত্তমান থাকায়—তাঁহার মনে হয় যেন তিনি শূন্যে ভাসিতেছেন! ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, স্বপ্নে মানুষ যখন ওড়ে, তখন কাৎ হইয়াই ওড়ে! জাগিয়া উঠিলে বুঝিতে পারিবেন যে তিনি যে-পাশে ফিরিয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন, স্বপ্নে ঠিক সেই পাশেই কাৎ হইয়া উড়িতেছিলেন! সেই উড়িয়া চলিবার চেষ্টায় পার্শ্বদেশে যে একপ্রকার সঙ্কোচন অনুভূত হইতেছিল—বাস্তবিক তাহা শয্যার সহিত দেহের স্পর্শানুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই প্রকার স্পর্শানুভূতি আমাদের দৃষ্টি-মণ্ডল অবধি সঞ্চারিত হইয়া দৃষ্টি-মণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ উজ্জ্বল বর্ণ-বিন্দু-গুলিকে কিরূপ নানা মূর্ত্তি ও আকৃতিতে রূপান্তরিত করে, তাহার আলোচনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ম্যাক্স সাইমন একটী অদ্ভুত স্বপ্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে যেন পাশাপাশি দুইটী স্বর্ণস্তূপ রহিয়াছে। ইহারা উচ্চতায় সমান নয়। কোন কারণে তাঁহাকে যেন স্বর্ণ-স্তূপ দুইটীকে সমান-উচ্চ করিতে হইল। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা করিতে পারিতেছিলেন না এবং না-পারার দরুণ মনে মনে বিষম অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। প্রতি বারের ব্যর্থতা যখন তাঁহার হৃদয়ের গুরু ভার বাড়াইয়া তুলিতেছিল, তখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার একখানি পা বিছানার চাদরে জড়িত হইয়া পড়ায় পদদ্বয় অসম-অবস্থায় রহিয়াছে—ঘুমন্ত অবস্থায় পদদ্বয়কে সম-অবস্থায় আনা তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। এই অসামঞ্জস্যের অনুভূতির সহিত দৃষ্টি-মণ্ডলের কোন বিশেষ অবস্থার সম্মিলনে স্বপ্নে দুইটী অসমান স্বর্ণ-স্তূপের সৃষ্টি হইয়াছে।

নিদ্রাকালে দেহের উপরের স্পর্শানুভূতি অপেক্ষা দেহের অভ্যন্তরের অন্ত্র ও স্নায়ু মণ্ডলীর বিপর্য্যয়ের অনুভূতি অধিকতর প্রখর হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় কাজে ব্যস্ত থাকি বলিয়া দেহের আভ্যন্তরীন এই পরিবর্ত্তন আমরা সহজে অনুভব করি না। এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে যে, কণ্ঠপ্রদাহ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে রোগী স্বপ্ন দেখে যেন তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থায় কণ্ঠনালীতে একরূপ বিশ্রী প্রদাহও অনুভূত হয়। জাগিয়া উঠিয়া কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই অনুভব করা যায় না এবং স্বপ্নকে স্বপ্ন ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু কয়েকঘণ্টা পরেই হয়ত স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার সত্যে পরিণত হয়! মৃগী রোগ, হৃৎপিণ্ড-সম্বন্ধীয় পীড়া প্রভৃতি নানা ব্যারামে রোগীর পূর্ব্বানুভূতির অনেক কথা শুনা যায়। কাজেই সপেন্‌হয়রের মত দার্শনিক পণ্ডিত যে স্বপ্নের ভিতর হৃদয়ে এক আকস্মিক ব্যাকুলতা এবং বিবেকের দুয়ারে এক অপূর্ব্ব বাণীর প্রতিধ্বনি অনুভব করিয়াছিলেন, কিংবা আর্টিগ্‌নেসের ন্যায় চিকিৎসক যে কোন কোন বিশেষ ব্যাধি-নির্ণয়ে স্বপ্ন-বিবরণের উপর নির্ভর করিবার প্রণালী-সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সম্প্রতি মহঁ টিসি—যাঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের

পাকস্থলী, ফুসফুস এবং ধমনীর বিপর্য্যস্ততার ফলে আমরা কিরূপে বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহার মোদ্দা কথাটা এই—আমরা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় নিদ্রা যাই, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়াদি বহির্জ্জগতের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া ফেলে—অর্থাৎ তাহাদের বাহ্য অনুভূতি বা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, এরূপ ধারণা ভুল। কারণ, তখনও আমাদের ইন্দ্রিয়াদি পূর্ব্বের ন্যায়ই সজাগ থাকে। তাহাদের অনুভব-শক্তি জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় তেমন অভ্রান্ত হয়না সত্য, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় এমন-সব জিনিষ আমরা অনুভব করিতে পারি, জাগিয়া যাহা করা যায় না। ইহার কারণ এই যে, জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা সর্ব্বসাধারণের সম্পর্কিত যে জগৎ, তাহাতেই বাস করি, কিন্তু নিদ্রাকালে আমাদের সম্পর্ক শুধু নিজেদের সঙ্গেই। এ-অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের কার্য্যক্ষেত্র একদিকে সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও অন্য অনেক বিষয়ে আমাদের অনুভব-শক্তি বিশেষভাবে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তবে ইহার তীক্ষ্ণতা একটু ক্ষীণ হইয়া পড়ে; তাই নিদ্রাকালে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা প্রায়ই এলোমেলো ঝাপ্‌সাভাবে। যাহা হউক, এই সমস্ত অনুভূতিই কিন্তু আমাদের স্বপ্নের প্রধান উপাদান।

শুধু এই অনুভূতিই স্বপ্ন ঘটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে; কারণ ইহা অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট

পূর্ব্ববর্ণিত বর্ণ-বিন্দু ও আকৃতিসমূহ, যাহা চোখ বুজিলে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়; তাহাদেরও কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। সাদা জমিতে কতকগুলি কালো দাগ,—স্বপ্নদ্রষ্টার নিকট ইহারা কোন একখানা পুঁথির পাতার মূর্ত্তি, কিংবা নবনির্ম্মিত গৃহের কালো পর্দ্দা-ঝুলানো সম্মুখ ভাগ, কিংবা অন্য আরো নানাপ্রকার রূপও গ্রহণ করিতে পারে। এই-সব অনির্দ্দিষ্ট উপকরণ হইতে কে একটী নির্দ্দিষ্ট ছবি ফুটাইয়া তুলিবে?—আমাদের স্মৃতি। স্মৃতিই স্বপ্নের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

স্বপ্ন সাধারণতঃ নূতন-কিছুই সৃষ্টি করে না। অবশ্য এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, যাহাতে স্বপ্নে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সৃষ্ট হওয়ার কথা শুনা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেহালার গীত-রচয়িতা তার্ত্তিণি সম্বন্ধীয় একটি সুপরিচিত কাহিনীর এখানে উল্লেখ করিব। একটী Sonata রচনা করিবার চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, শয়তান (The Devil) আসিয়া তাঁহার বেহালাটা তুলিয়া লইল এবং তাঁহার ঈপ্সিত Sonataটি চমৎকার ওস্তাদী হাতে বাজাইয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া তার্ত্তিণি স্বপ্নের স্মৃতি হইতে সেই Sonata টী লিখিয়া লইলেন—তাহাই পরে "Devil's Sonata" নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছে। এই-সব প্রাচীন কাহিনীর কোন্‌টী ইতিহাস আর কোন্‌টী কিম্বদন্তী তাহা নির্ণয় করা শক্ত। এরূপ স্থলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ভিন্ন কোন

যায় না। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ষ্টীভেন্‌সনের কথা বলিতেছি,—একটী অতি-বিস্ময়কর প্রবন্ধে (A Chapter on Dreams) তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত মৌলিক গল্পই তিনি একরূপ স্বপ্নে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রবন্ধ একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ষ্টীভেন্‌সনের জীবনে এমন এক সময় গিয়াছে, যখন তিনি এক অদ্ভুত অবস্থায় (in a psychical state) জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সে সময় তিনি কখন্ জাগিয়া আর কখন্ যে ঘুমাইয়া থাকিতেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আমাদের ত ইহাই ধারণা। কোন সমস্যার সমাধান, অসুবিধা-দূরীকরণ, কল্পনা হইতে সাহিত্য-সৃষ্টি প্রভৃতির পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় সমাবেশ ও বিশ্লেষণ করিবার মত মনের অবস্থা যখন মানুষের থাকে, তখন তাহারা বাস্তবিক-পক্ষে নিদ্রিত থাকিতে পারে না। অন্ততঃ মানুষের যে বৃত্তি-সমূহ এই-সব কার্য্য করে, সে বৃত্তিগুলিকে ঘুমন্ত-অবস্থার বলিতে পারি না। নিদ্রায় আমাদের সমস্ত ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বিদূরিত হয়; তখন কেবল আমাদের স্মৃতিই স্বপ্নের জাল বুনিয়া থাকে। কিন্তু প্রায়ই এই স্মৃতিকে তখন আমাদের পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। হয়ত ইহা বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি—আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার আভাসও কোন দিন পাই নাই,—এখন নিদ্রিত অবস্থায় সেই স্মৃতি অতীতের গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে; আবার এমনও হইতে পারে যে জাগ্রৎ অবস্থায় নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে—অন্যমনস্কভাবে, যে সকল বিষয় আমরা অনুভব করিয়াছি, ইহা সেই সকল ব্যাপারের স্মৃতি! অথবা এমনও হইতে পারে, যে, ইহা নানা ঘটনার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্মৃতি, এখান-সেখান হইতে ভাসিয়া আসিয়া ঘটনাচক্রে একত্র জোড়া লাগিয়া এক সামঞ্জস্য-হীন অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি নিদ্রাকালেও যুক্তির অনুশাসন মানিয়া চলে, তাই সে এই অসম্বদ্ধ ও দুর্ব্বোধ স্বপ্নেরও কারণ-নির্ণয়ে প্রয়াস পায়।—যাক্, যে প্রশ্ন আমরা তুলিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি স্বপ্ন-রচনায় এই যে মাল-মসলার জোগান দেয়, তাহা ঐ স্মৃতির সাহায্যেই দেয়—এবং এই যে বিবিধ অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অনুভূতি, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যাহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, এগুলিকে সঠিক, সুসমঞ্জস এবং সুস্পষ্ট আকারে ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা, ঐ স্মৃতিরই শুধু আছে!

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

ঝরা-পাতার গান

লুটিয়ে আছি গাছের তলে
ব্যথায় ভরা প্রাণ,
পথের শত পথিকজনে
গাইব দুখ-গান।
ছোট্ট বটে এ-বুকখানি,
ছোট্ট কথা নয় ;—
আলো-বাতাস অনেক-দিনের
এই বুকেতে রয়।
শাখার শিরে ফাগুন-প্রাতে
মেলনু যবে আঁখি,
আকাশ থেকে চুমা দিলে
সপ্ত-রঙের পাখী।
বাতাস এসে কানে-কানে
দিয়ে গেল গান ;
রৌদ্র-ঝারা ফুটিয়ে গেল
বুকের মাঝে প্রাণ।
গাইল কোকিল কোন্ বনেতে—
উছল সুধা-সুর,
বইছে আজো শিরায়-শিরায়—
পরাণ পরিপূর।
বৈশাখেরি রুদ্র হাওয়া,
মেঘের গরজন,
তাদের সাথে কতই খেলা
—ভয়ের আলোড়ন !
গাঁথা আছে এই বুকেতে
বর্ষা-ধারার গান,
চমকে-দেওয়া তড়িৎ-শোভা,
নদীর কলতান,
মেঘের মায়া, শরৎ-রাতের
স্বপন-পূর্ণিমা,
অস্ত-যাওয়া রক্ত রবির
স্বর্ণ-গরিমা।
দুই-শালিখের গোপন-কথা
এই-বুকেতে রয়,
পাপিয়ারি আকুল উছাস,
প্রেমের অভিনয়।
রঙের ভাতি, পাখীর গীতি,
ঋতুর অভিনয়,
যা' দেখেছি, যা' পেয়েছি
সবাই বুকে রয় ;—
লুটিয়ে আছি ধূলার সাথে
আজকে ভাঙা-প্রাণ,
তাদের কথা—হাজার ব্যথা
জাগ্‌ছে অফুরাণ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

স্যাবাইন-রমণী *

নাটিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[চারিধারে জমাট অন্ধকার পত্নী-বিরহ-কাতর পতিগণের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে —বোধ হয়, বৃষ্টি পড়িতেছে, হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে এবং সম্ভবত আকাশ ঘন মেঘাবৃত]

যবনিকা উঠিলে দেখা গেল—দুইধারে দুইদল স্যাবাইন রীতিমত ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতেছে, মুখে বুলি, "পঁচিশ মিনিট ব্যায়াম করলেই শরীরের সব অসুখ আর বেদনা সেরে যায়"। মঞ্চের মাঝখানে পুত্রবান পিতার দল একসার লম্বা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছে; প্রত্যেকের কোলে একটী করিয়া সন্তান—তাহাদের মাথা ক্লান্তভাবে একপাশে ঢুলিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের ভঙ্গীতে গভীর হতাশা! বড় করুণ ও হৃদয়-ভেদী দৃশ্য। অনেকক্ষণ আর কিছু শোনা গেল না, কেবল সেই অস্ফুট স্বর, "পঁচিশ মিনিট রোজ এমনি ব্যায়াম করলে..."]

মারটিয়াসের প্রবেশ, তাহার হাতে একখানা চিঠি।

মারটিয়াস। মিলেছে! স্যাবাইনগণ, আমাদের স্ত্রীদের ঠিকানা—মিলেছে!

অস্পষ্ট স্বর। ব্যস্, ব্যস্, ঠিকানা পাওয়া গেছে!

(মারাটিয়াস তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ছোট ঘণ্টা বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল)

অনেকে। চুপ, চুপ!

মারটিয়াস। স্যাবাইনগণ, দীর্ঘসূত্রতা আর কর্ত্তব্যবিমূঢ়তার জন্য ইতিহাস কখনই আমাদের নিন্দা করবে না—দীর্ঘসূত্রতা বা অনিশ্চয়তা স্যাবাইনদেরই চরিত্রগত নয়—তাদের প্রবল প্রচণ্ড স্বভাব যুক্তি কি অভিজ্ঞতার লৌহদ্বার-পথে রুদ্ধ হবার নয়। হে পত্নী-হারা স্বামীগণ, স্মরণ করুন—হীন দস্যুদল যে-রাত্রে আমাদের অসহায়া রমণীদের হরণ করে, তার পরদিনকার সেই সকালবেলার কথা একবার স্মরণ করুন। স্থানের সীমা লঙ্ঘন করে সমস্ত বাধা-বিপত্তি পায়ে ঠেলে বিকট হুঙ্কারে দেশ প্রতিধ্বনিত করে চঞ্চল পদ-ক্ষেপে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছিলুম, ভদ্রগণ, একবার সে কথা স্মরণ করুন—

(স্যাবাইনগণ ভীতভাবে চুপ করিয়া রহিল)

মারটিয়াস। সমবেত ভদ্রবৃন্দ, স্মরণ করুন, কে—?

ভীতস্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—প্রেয়সী আমার—ওহো, কোথায় তুমি!

(স্যাবাইনগণ নির্ব্বাকভাবে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।)

মারটিয়াস। (উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সজোরে)। সেই খবরের আফিসে —হাঁ, সেইখানে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা কি আপনাদের মনে আছে? সে হতভাগা আফিস এ-পর্য্যন্ত কোন খবরই

* Leonid Andreyeff রচিত Sabine Womenএর অনুবাদ।

পায়নি আর পুরানো ঠিকানা ছাড়া কোন সংশোধিত তালিকাও তাদের নেই... সাতদিন ক্রমাগত সন্ধানের পর আমরা কি বিষম বিড়ম্বিত হয়েছি! শেষে একদিন জ্বলন্ত উত্তর এল—'কোথায় চলিয়া গিয়াছে'—কিন্তু বন্ধুবর্গ, আমরা তাতে কি সন্তুষ্ট ছিলুম ?—মনে করে দেখুন।

[স্তাবাইনগণ নির্ব্বাক রহিল]

মারটিয়াস। না। আমরা তাতে সন্তুষ্ট হয়ে স্থির থাকিনি। নীরস হলেও কথাটা একবার শুনুন—এই আঠারো মাসে কি করেছি, তা একবার শুনুন। সমস্ত বিখ্যাত খবরের কাগজে সংবাদ-দাতাদের পুরস্কার ঘোষণা করে' বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছি, বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের আহ্বান করেছি, তাঁরা প্রতিরাত্রে নক্ষত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে আমাদের অসহায়া স্ত্রীদের ঠিকানা ঠাওরাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন—

ভীত স্বর। প্রসারপিনা—প্রেয়সী আমার—ওহো :—

মারটিয়াস। আমরা যে কেবল এক হাজার মুরগির ছানা, হাঁসের বাচ্চা, আর ধাড়ি রাজ হাঁস বলি দিয়েছি, তা নয়—উদরস্থ পাখী বা জন্তুর কাছ থেকে খবর পাবার আশায় হাজার হাজার বেরালেরও পেট চিরেছি! কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের সমস্ত অমানুষিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ঐ আকাশের নক্ষত্রগুলো, যাদের পানে আমরা প্রত্যহ সকরুণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতুম—নিষ্ঠুর অবজ্ঞায় তারা আমাদের কোন খবরই দেয়নি! খবরের আফিসে বরং খবর একটু মিলেছিল,—চলে গেছে, তারা চলে গেছে! কিন্তু কোথায়? কোন্ অজানার দেশে?

[স্তাবাইনদের মধ্যে চাপা কান্নার শব্দ শোনা গেল]

ভীত স্বর। প্রসারপিনা! প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। বন্ধুগণ—নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছ থেকে কি আশ্চর্য্য উত্তরই আমরা পেলুম! ওরা অত উপরে থেকে জগতের সমস্ত জানে, কিন্তু—যাক, আমাদের সাফল্যের কথা আমি সগর্ব্বে বলছি, শুনুন। যে-সময় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রের অবস্থান-পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় আমাদের বিজ্ঞ আইন-বেত্তারা কি করছিলেন, সে কথা একবার আপনারা স্মরণ করুন—কৈ, স্মরণ হয় কি?

[সকলে নির্ব্বাক]

মারটিয়াস। ভদ্রমহোদয়গণ, স্মরণ করুন। আপনাদের সঙ্গে কথা কওয়া দায় হল, দেখছি। আপনারা সব মূর্ত্তির মত মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে! আশ্চর্য্য! আপনাদের সকলের সে সব কথা মনে আছে বলেই আমার বিশ্বাস, কেবল বিনয়াধিক্য-বশত মুখে প্রকাশ করছেন না। না? বলুন, মনে করুন, কৈ, বলে ফেলুন। সে-সময় আমাদের আইন-বেত্তারা কি করছিলেন?

ভীত স্বর। প্রসারপিনা—ও হো হো—কোথায় তুমি?

মারটিয়াস। কে ওখানে? চুপ! এর মধ্যে বার বার প্রসারপিনাকে টেনে আনছ কেন? আচ্ছা, আমি আপনাদের সাহায্য করছি—আমরা ব্যায়াম অভ্যাস করছি কেন, তা আপনারা জানেন ত—কেন, বলুন।

ভীত স্বর। (পিছন হইতে) আমাদের দেহ সবল করবার জন্য—

মারটিয়াস। (সোল্লাসে) হাঁ—ঠিক বলেছেন। কিন্তু বলুন দেখি, সবল দেহে আমাদের কি প্রয়োজন? আপনারা ধৈর্য্য-রক্ষা অসম্ভব করে তুললেন, দেখ্‌ছি, আপনাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে দিলুম—এখন বলুন, সবল দেহ নিয়ে কি হবে?

দ্বিধাপূর্ণ স্বর। আমরা যুদ্ধ করব।

মারটিয়াস। (হতাশভাবে আকাশের দিকে হাত তুলিয়া) হা ভগবান—যুদ্ধ করব! আর এ-কথা একজন স্যাবাইনের মুখে শুনতে হল! যারা আইনের বন্ধু, নিয়মের দাস, বিবেকের পুত্র, ন্যায়-পরায়ণতার অবতার,—তারাও বলবে, যুদ্ধ করবার জন্য সবল দেহের প্রয়োজন! এ কথা বলুক সেই নীচ দস্যুরা—আমাদের সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত স্ত্রীদের যারা চুরি করে নিয়ে গেছে, সেই রোমানদের মুখেই শুধু এ কথা সাজে!

ভীত স্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। তুমি চুপ করবে কি? প্রসারপিনা! যেমনই কাজের গোড়ার তত্ত্বে গিয়ে পৌঁচেছি, অমনি তুমি প্রসারপিনা প্রসারপিনা বলে ডাক ছাড়ছ! ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বুঝতে পেরেছি, এ বিরহ-যাতনায় আপনাদের স্বতঃ-উজ্জ্বল স্মৃতি আজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তাই বেশ, আমি নিজেই সব সংক্ষেপে বলছি, শুনুন। সেই রোমানদের ঠিকানা জোগাড় করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে',—বুঝেছেন কি—সে সমস্ত পথ ভারী ভারী আইনের বইগুলো—সমস্ত বিধিবিধান আর ... সংগ্রহ—অর্থাৎ বুঝতে পারছেন কি—আমাদের বিবাহের ন্যায়সঙ্গতি আর ওর নাম কি, হরণের বে-আইনী অপরাধ প্রমাণের জন্য উকিলেরা যে চারশো' খণ্ড পুস্তক সঙ্কলন করেছেন—সে সমস্ত বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই আমাদের আজ শক্তির প্রয়োজন! ন্যায়-সঙ্গত অভিযোগ আর নির্ম্মল বিবেকই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। আমরা সেই দস্যুদের আইনের জোরে বুঝিয়ে দেব যে, তারা চোর, আর স্ত্রীদের বুঝিয়ে দেব যে তারা অপহৃত—শুনে আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠবে! এখন যখন তাদের ঠিকানা পাওয়া গেছে, তখন তাদের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। চেয়ে দেখুন, বন্ধুগণ—

(চিঠিখানি নাড়িতে লাগিল এবং স্যাবাইনরা পায়ের আঙুলে ভর দিয়া চাহিয়া রহিল)

—একজন 'অনুতপ্ত তস্কর' এই নাম দিয়ে একখানি চিঠি এসেছে। না জেনে-শুনে পাপ করার জন্য এক অজানা বন্ধু যথেষ্ট অনুতাপ করে এ চিঠি লিখেছে—সে জানিয়েছে যে, আর কখনও এ রকম ভাবে কারো স্ত্রীকে সে হরণ করবে না; তা ছাড়া ভগবানের কাছে সে দয়া প্রার্থনা করেছে। নামটা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা—বড় জলের ফোঁটায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে—বোধ হয়, চোখের জলেই। —দেখুন, এই ত বিবেকের শক্তি! সে আরও জানিয়েছে যে, আমাদের স্ত্রীদের হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেছে—

ভীত স্বর। প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। আবার! তুমি শুনবে না?

বই নয়! ঠিক যে-সময় আমরা সাধারণ সমস্যা-সমাধানে লেগে গেছি—একটা মতলব ঠাওর করে এনেছি—সে সম্বন্ধে সব কথা এখনি বলছি—যে সময় আমরা জয় বা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, সে সময় তুমি কিনা কোথাকার এক তুচ্ছ প্রসারপিনা না কি নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছো! এ সমবেত-মণ্ডলীর নামে আমি তোমায় চুপ করতে বলছি! চুপ কর। ভদ্রবৃন্দ, আপনারা অগ্রসর হোন! সোজা হয়ে দাঁড়ান! সারবন্দী হয়ে দাঁড়ান—বেশ স্ফূর্ত্তি করে এগিয়ে আসুন। না, পাগল করলে, দেখছি! ডান দিক কোন্‌টা, বাঁ দিক কোন্‌টা, তাও কেউ জানেন না? বলি, যাচ্ছ কোথায় হে তুমি? থামো—

[একটি সার-ছাড়া স্যাবাইনকে ধরিয়া বুঝাইতে লাগিল] তোমার ডান পা কোন্‌টা জানতে চাও ত সোজা হয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াও,—এবার উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াও। না, না, মুখ দক্ষিণ দিকে আর পিঠটা পূবে। আরে, তোমার মুখ কোথায়? ওহে, ওটা তোমার মুখ নয়, ওটা তোমার পিঠ, পিঠ—এই তোমার মুখ—বুঝেছ? নাঃ, এ অসহ্য! তোমার ডান্ পা কোন্‌টা জানতে চাও ত পাশের লোকের দিকে চেয়ে দেখ। আপনাদের কারও কাছে ছুরি আছে? সব পকেট ওল্টান্। অত্যাচারের কোন চিহ্ন যেন সঙ্গে না থাকে! যাতে কাটে বা খোঁচা লাগে—এমন কোন অস্ত্রও কাছে রাখা সঙ্গত হবে না! জানেন বন্ধুগণ, ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ আর নির্ম্মল বিবেকই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এবার বিধি-বিধানের এক-একখানা বই সব হাতে নিন। বেশ! —বাঁধা হলে ভালই হোত—যাক, সে পরে দেখা যাবে। এখন বুঝলে কি, সবল দেহে কি প্রয়োজন? চমৎকার, সুন্দর! ভেরীবাদক, তোমরা সব আগে যাও, মনে রেখো—"অপহৃত স্বামীর অভিযান". সেই সুরটা বাজাতে হবে! চল—না, না, থামো—কেমন করে' চলতে হয়, জানো?

[স্যাবাইনগণ নির্ব্বাক রহিল।]

মারটিয়াস। জানো না? বেশ, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দু'পা এগোও, এক পা পেছোও। সামনে দু'পা এগিয়ে যাওয়ার অর্থ, আমাদের প্রচণ্ড আত্মার অনির্ব্বাণ অনল-তুল্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য অগ্রগতির চিহ্ন এ—আর এক পা পেছুনো অর্থাৎ এ যুক্তি, অভিজ্ঞতা—পরিণত মনের চিহ্ন। এতে বোঝাচ্ছে যে আমরা কাজের ফলাফল বিচার করছি—ঐ এক পা পেছিয়ে যাওয়াতেই আমাদের সুমহান অতীত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, আমাদের সনাতন কুলধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চলছি। ইতিহাস লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না, আর আমরা স্যাবাইনরা এই গৌরবময় মুহূর্ত্তে আমরাই ত ইতিহাস। ভেরীবাদক, ভেরী বাজাও, ভেরী বাজাও!

[ভেরীর কাতর বিলাপধ্বনি একবার যেন হঠাৎ সামনের দিকে হেলিয়া ধীরে ধীরে পিছনের দিকে দুলিয়া গেল এবং সমস্ত স্যাবাইন-সৈন্য সেই সঙ্গে অগ্রসর হইল, দুই পা সম্মুখে—এক পা পিছনে—এই নিয়মে ধীরে ধীরে তাহারা রঙ্গমঞ্চ অতিক্রম করিল]

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য, প্রথম অঙ্কেরই মত, তবে এখানে-ওখানে সুশৃঙ্খলতার চিহ্ন বর্ত্তমান। একটি

কুটীরের কাছে একজন রোমান অলসভাবে দাঁড়াইয়া বেশ স্ফূর্ত্তিতে নাকে হাত বুলাইতেছে —বামদিকে পশ্চাতে সেই একই ধরণে গম্ভীরভাবে স্বামী-সৈন্যদল নিয়ম মত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে—দুইপা আগাইতেছে, এক পা পিছু হঠিতেছে। তাহাদের দেখিয়াই রোমানরা একটু উত্তেজনার ভাব দেখাইল; পরে নাকে হাত না বুলাইয়াই কৌতূহলের সহিত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল—তাহাদের মন্থর গতি দেখিয়া সেই রোমানটি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইল এবং জোরে হাই তুলিয়া অলসভাবে হাত পা নাড়িয়া পাশের একটা পাথরে অবশভাবে বসিল—মারটিয়াসের ইঙ্গিতে ভেরী থামিয়া গেল।]

মারটিয়াস। (হতাশভাবে) স্যাবাইনগণ, থামো, থামো, সব থামো—

(স্যাবাইনরা স্থিরভাবে দাঁড়াইল)

মারটিয়াস। ওহে, সব থামো, থামো। আরে, এ গড়ানে পাথরকে কি কিছুতেই থামানো যাবে না! থামবে না? হাঁ, হাঁ, এবার থেমেছে। সব ঠিক হও—ভেরীবাদক, তোমরা সব পিছনে যাও—অধ্যাপকগণ, আপনারা সামনে আসুন—ওহে, সব এবার ঠিক হয়ে দাঁড়াও—

[ভেরীবাদকের দল পিছনে এবং অধ্যাপকগণ সম্মুখদিকে গেলেন এবং বাকী সকলে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল]

মারটিয়াস। অধ্যাপকগণ, আপনারা সব ঠিক হোন—

[অধ্যাপকগণ তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া বসিয়া এক একটি ছোট টেবিল ...

তাহার উপরে হাতের সেই আইনের মোটা বইগুলি রাখিলেন, তারপর খড় খড় শব্দ করিয়া বই খুলিলেন, যেন বন্দুক-ছোড়ার মত শব্দ হইল—রোমানটি (সে সিপিও) উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া পরিচিতের মত কথা কহিল]

সিপিও। বলি, মশায়রা এখানে কেন? ব্যাপার কি? আমায় কিছু করতে হবে নাকি? যদি সার্কাস করতে এসে থাকেন, তাহলে আগে থেকেই বলে রাখছি, মঞ্চ এখনো সব তৈরি হয়নি—

মারটিয়াস। (গম্ভীরভাবে) চুপ করো, নীচ দস্যু—(স্যাবাইনদিগকে)—স্যাবাইনগণ, এতদিন পরে আমরা সেই অভীষ্ট স্থানে এসে পৌঁচেছি। আমাদের পিছনে আছে, দারিদ্র্য, বুভুক্ষা নির্জ্জনতা—কিন্তু সামনে দ্বন্দ্ব, ভীষণ দ্বন্দ্ব,—ইতিহাস যা কখনো শোনে নি! স্যাবাইনগণ, উত্তেজিত হয়ো না—নিজেদের সংযত করো—শান্ত হও—ভিতরের ক্রোধকে সংযত রেখে অদৃষ্টের ফলের জন্যে ধীরভাবে অপেক্ষা করো—স্মরণ রেখো—আমাদের এখানে আসার কারণ কি!

(স্যাবাইনগণ সব নিস্তব্ধ রহিল)

মারটিয়াস। স্মরণ করো—ওহে সব স্মরণ করো, এ-সব মোটা মোটা আইনের বইগুলো নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই বেড়াতে আসিনি—বলো, বলো, আমরা এসেছি কেন?

সিপিও। কৈ, মশায়রা স্মরণ করুন, চটপট্ বলুন, বলুন—

দেখচো কি! তোমরা সব সময়েই এইরকম নির্ব্বাক—

সিপিও। আপনার কিন্তু বোধ হয় তা ইচ্ছে নয়—

মারটিয়াস। সেইটেই একমাত্র সত্য—পাথরের মূর্ত্তির মতই এরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—কেবল চোখের পাতা কাঁপানো ছাড়া এরা আর কিছুই করতে পারে না। আচ্ছা, "স্মরণ করুন, সব স্মরণ করুন" এই কথাগুলো জোর করে না বলে কেউ ভাল বক্তৃতা দিতে পারে?

সিপিও। [মাথা নাড়িয়া] না, তা পারে না—আর তা না হলে অদ্ভুত শোনাবে কি করে?

মারটিয়াস। ঠিক, ঠিক বলেছো—এটা দেখচি, তুমি বুঝতে পেরেছো—কিন্তু এদের জন্য—

স্যাবাইনদের ভিতর হইতে কম্পিতস্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা, প্রেয়সী আমার—ওঃ, কোথায় তুমি?

সিপিও। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঐ যে, উনি বোধ হয় স্মরণ করেছেন!

মারটিয়াস। [অবজ্ঞাভরে] হাঁ—ও সব সময়েই স্মরণ করছে। স্যাবাইনগণ, সব ঠিক হও—এইবার আমাদের স্ত্রীদের উপর চূড়ান্ত দাবী বসাবো—যদি ওদের বিবেক এখনো না জেগে থাকে, তাহলে ওদের ধিক্! ওহে নীচ দস্যু, তোমার বন্ধুদের সব ডেকে নিয়ে এসো—ভীষণ শাস্তির জন্য সকলে প্রস্তুত হও—

সিপিও। আচ্ছা, আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসি—

[কুটীরে গিয়া ডাকিতে লাগিল—"ক্লিওপেট্রা, ও ক্লিওপেট্রা—বাইরে এসো—এরা কারা সব তোমাদের দেখতে চাইছে"—এককোণ হইতে উঁকি মারিয়া স্যাবাইনদের চিনিতে পারিয়া পলাস সানন্দে বলিল—"এদের স্বামীরা এসেছে। রোমানগণ চীৎকার করে সব ওঠো, ওঠো, দেখ, এদের স্বামীরা সব এসেছে"—জলভরা চোখে মারটিয়াসের দিকে দৌড়িয়া গিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিল—মারটিয়াস একেবারে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পলাস বারবার বলিতে লাগিল,—"এদের স্বামীরা এসেছে—এদের স্বামীরা এখানে এসেছে"—

ঘুম-ভরা চোখে রোমানরা যে-যার ঘর হইতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহির হইল এবং মঞ্চের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইল—যতক্ষণ না তাহারা সকলে একত্র হইল, ততক্ষণ মারটিয়াস বেশ নটের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।]

স্থূলকায় ভদ্রলোক। সত্যি, কি ঘুমই ঘুমিয়েছি! এমন সুখের ঘুম অনেকদিন ঘুমুনো হয়নি! রাজ্য বসাবার দিন সেই ঘুমিয়েছিলুম, আর আজ এই ঘুমুলুম্! এ সব নির্ব্বাক অভিনেতারা এখানে কি করছে?

প্রথম রোমান। ওহে, এরা সব ওদের স্বামীরা—

স্থূলকায় রোমান। ও তাই বুঝি—কিন্তু আমার যে বড় তেষ্টা পেয়েছে। প্রসারপিনা, একটু সরবৎ আনো তো—

স্যাবাইনদের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বর। প্রসারপিনা—ওঃ—ওঃ—ওঃ—

স্থূলকায় রোমান। ও আবার কি চায়? ও কি আমার স্ত্রীকেই ডাকছে নাকি?

প্রথম রোমান। যে ডাকছে, সে যে স্বামী—

স্থূলকায় রোমান। ওঃ, তাই বুঝি! ভুলে গেছলুম—আমার যে বড় তেষ্টা পেয়েছে—সেই গরম গরম খাবার খেয়ে আর তোফা মনের সুখে ঘুমিয়ে আমার পিপাসা বড় বেড়ে গেছে—এখন একটা আস্ত পুকুর বোধ হয় শুষে ফেলতে পারি! কি বলবো, প্রসারপিনা খাবার যা তোয়ের করে! আহা, চমৎকার! সত্যি—ভাই সব—রান্নায় এমন ওস্তাদী হাত—সত্যি, কি বলবো?

প্রথম রোমান। থাক্, চুপ করো—

স্থূলকায় রোমান। আচ্ছা—কিন্তু ভাই, কেমন একটা ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম—ভাবলুম, খুব ঘুমচ্ছি আর হঠাৎ দেখলুম রোমটা পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে—তারপর একেবারে ঝপ্ করে পড়ে গেল—

প্রথম রোমান। কিন্তু আমাদের স্ত্রীদের কি হোলো? তাদের সব ডাকাডাকি করা হচ্ছে, অথচ আসছে না কেন? কি বিশ্রী স্বভাব সব—

দ্বিতীয় রোমান। বোধ হয় কাপড়-চোপড় বদলাচ্ছে—

প্রথম রোমান। হায় রমণী, তোমার নামই হচ্ছে মায়া—হয়তো এসেই বলবে—অ, এরা বুঝি—এরা যে আমাদের সেই আগেকার স্বামীরা! সত্যি, স্ত্রীলোকদের মনস্তত্ত্বটা আমি মোটেই বুঝতে পারলুম না—ও আমার ধারণার বাইরে একেবারে—নাঃ!

চতুর্থ। ওহে, আমারও যে তেষ্টা পাচ্ছে—এ মরা মানুষগুলো কতকাল এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? ঐ যে, এরা আবার বাজনা এনেছে—নিশ্চয়, একটা সুরও অন্তত বাজাবে—দেখ, দেখ—এবার ওরা নড়ছে—না, জ্যান্তই!

মারটিয়াস। রোমানগণ, এতদিন পরে আজ আমরা সামনা-সামনি মিলেছি। আচ্ছা, সত্যি করে আমার কথার স্পষ্ট জবাব দাও। ওহে রোমানগণ, সেই বিশে-একুশে এপ্রিলের মাঝামাঝি রাত্রে তোমরা যে কাজ করেছিলে, তা কি তোমাদের মনে আছে?

[রোমানরা অপ্রতিভ হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল]

মারটিয়াস। ওহে, সব স্মরণ করো, তোমাদের মনেই পড়ছে না, এ কি সম্ভব? ভাবো, চেষ্টা করো, স্মরণ করে বলো, সত্যি বলছি, তোমাদের যতক্ষণ না মনে পড়ে, ততক্ষণ এক-পাও আমরা নড়বো না—

স্থূলকায় রোমান। (ভীত হইয়া পাশের রোমানকে চুপিচুপি বলিল)—তোমার বোধ হয়, মনে আছে, এগ্রিপ্পা? এ্যা, তোমারও মনে নেই! নিশ্চয় একটা বিশেষ কিছু ব্যাপার হবে—কি বল?

রোমানরা। না, না, আমাদের কারোরই মনে নেই—এত বেশী ঘুমিয়েছি যে আমাদের স্মরণ-শক্তি বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে—সব ভুলে গেছি! আচ্ছা, আমরা বরং যখন যাবো, তখন বলো, কি ব্যাপার—তাইত, এদের মতলব কি?

মারটিয়াস। [উচ্চস্বরে] আচ্ছা, আমি

তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি—রোমানগণ, সব শোনো, বিশে একুশে এপ্রিলের মাঝামাঝি রাত্রে এমন ভীষণ একটা অন্যায় পাপ কাজ তোমরা করেছ, যা ইতিহাসের পিঠে ঘন কালি লেপে দিয়েছে!—তোমাদেরই একদল লোক, তাদের পরিচয় আমি পরে দিচ্ছি—আমাদের সুন্দরী স্যাবাইন-রমণীদের দুর্বৃত্তের মত হরণ করে নিয়ে এসেছে—

সকলের মনে পড়াতে রোমনরা আনন্দে মাথা নাড়িয়া বলিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো, ব্যাপারটা বুঝেছি—সত্যি কথা, খুব সত্যি হ্যাঁ, সেদিন বিশে এপ্রিলই বটে—

স্থূলকায় রোমান। (গম্ভীরভাবে) সত্যি, স্যাবাইনদের মাথা আছে, দেখচি। খুব মনে রেখেছে ত!

মারটিয়াস। আর তোমরাই হচ্ছো সেই দস্যুরা -হ্যাঁ, আমি জানি, এ কথা ঠিক! এখন হয় ত তোমরা গোলমাল করবে—কথাটা ওল্টাবার জন্যে কূট তর্ক তুলে নিতান্ত হীনের মত আইনের অপমান করবে—কিন্তু সেটী আর হচ্ছে না—সেইজন্যই আমরা একেবারে ঠিক হয়ে এসেছি—অধ্যাপকগণ, আরম্ভ করুন, আপনারা আরম্ভ করুন...

সারের শেষ থেকে একটানা সুরে অধ্যাপকরা পড়িতে আরম্ভ করিলেন—স্বরটি মনে হইল, স্থান ও কালের ও-পারস্থিত দেশ হইতে আসিতেছে—"স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি-হরণ—প্রথম খণ্ড, প্রথম বিভাগ, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পৃষ্ঠা; সাধারণ দস্যুতা বিষয়ে বলা যাইতেছে—অতি পুরাকালে—বর্ত্তমান সময়ের বহু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি নির্ভয়ে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহাদের মনে অবিচারের কথা মোটেই জাগে নাই, যেহেতু তাহাদের মন বলিয়া কোন পদার্থই ছিল না—সেই অতি-পুরাকালে—"

মারটিয়াস। শোনো, সব শোনো, রোমানগণ, মন দিয়ে সব শোনো—

সিপিও। আচ্ছা, একটু খাটো করে বলে ফেলো হে! মস্ত ভূমিকা ফেঁদে বসচে যে! অত কথা শোনবার যে সময় নেই!

মারটিয়াস। না, এ আর খাটো করা যাবে না—

সিপিও। কিন্তু দেখছো না, তোমাদের শ্রোতারা যে ঘুমোতে যাবে—সব ঘুমে ঢুলছে—

মারটিয়াস। এমন অবস্থা নাকি!

সিপিও। দেখছো না, ঢুলতে তো আরম্ভ করেইছে, আর ঘুমে ঢুলছে বলেই তোমাদের একটি কথাও ওদের কানে যাচ্ছে না—আচ্ছা, ভাল কথা, শেষ দিক থেকে আরম্ভ কর না—যাক—আচ্ছা, যা বলবার তা বল, মোদ্দা স্পষ্ট সোজা করে বলো—

মারটিয়াস। এ ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত রকমের। যাক্, তোমার বন্ধুদের অক্ষমতা গ্রাহ্য না করেও আমি স্পষ্ট বলছি—শোন—ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমরা আমাদের স্ত্রীদের হরণ করে খুব একটা বড়-অন্যায় কাজ করেছো আর তোমরাই হচ্ছো সেই নীচ দস্যুরা। কোনরকম বিস্তার মারপ্যাচ দিয়েও এ কাজকে ন্যায়-সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে পারবে না—আর তা করতে গেলে, আকাশ-পাতাল এখনি কেঁপে উঠবে—

সিপিও। সত্যি—সত্যি কথা, এমন-কি, এটাও আমরা অস্বীকার করি না—

মারটিয়াস। অস্বীকার কর না? বেশ, তা হলে বল, আমরা এখানে এলুম কেন?

সিপিও।। কি করে জানবো? বোধ হয় বেড়াবার মতলবে—

মারটিয়াস। না, তা নয়, এ সব প্রমাণ করবার জন্যেই আমরা এসেছি—তা হলে স্বীকার করছো, তোমরাই সেই দস্যু?

সিপিও। নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু ঐ দস্যু কথাটা, মনে হচ্ছে, যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

মারটিয়াস। ব্যাপারটা তোমরা সবাই বুঝেছ তো—না বুঝে থাকো, বলো—অধ্যাপকরা সব এখনও ঠিক হয়ে আছে। অধ্যাপকগণ, আপনারা ঠিক আছেন?

সিপিও। না, না, আর অধ্যাপক নয়। আগাগোড়া আমরা সব বুঝতে পেরেছি—ভাই সব, আমার কথায় সায় দাও, না হলে আবার অধ্যাপকের দল সুরু করবে—

রোমানরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব বুঝতে পেরেছি—বেশ বুঝতে পেরেছি—

মারটিয়াস। আচ্ছা, তাহলে—এ-সব কিসের জন্যে?

সিপিও। আমরা কি করে' জানবো?

মারটিয়াস। এইখানেই তো বোঝবার গোলমাল। স্যাবাইনগণ, আনন্দধ্বনি করো, জয়ধ্বনি করো—এরা দোষ স্বীকার করছে। আমাদের ভয় দেখানোর ব্যবস্থাতেই এরা বিবেকের প্রচণ্ড স্বর শুনতে পেয়েছে, ঐ যে আকাশ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছে! আমাদের কর্ত্তব্যের বাকী এখন সুধু ফিরে যাওয়া, আর—

কম্পিত স্বর। আমার প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো—ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—বন্ধু, ঠিক বলেছো। রোমানগণ—আমরা এনেছি আমাদের স্ত্রীদের নামের সম্পূর্ণ নির্ভুল তালিকা—সে ফর্দ্দ মিলিয়ে এখন ভদ্রলোকের মত তাদের ফিরিয়ে দাও—সব অনিষ্ট, সব ক্ষতি-সত্ত্বেও—ওর নাম কি, অধ্যাপকগণ, আইনের কথায় কি বলে...

অধ্যাপকগণ। ঝড়তি-পড়তি...

মারটিয়াস। না, না, না—ক্ষতি—হ্যাঁ, সব ক্ষতির জন্যেই তোমরা দায়ী। অধ্যাপকগণ, পাতাটা সব পড় তো—থাক্—আমাদের স্ত্রীরা সব আসছে—ভাই-সব, ঠিক হয়ে দাঁড়াও—মনকে দমন করে রাখো—তোমাদের বিশেষ করে বলছি, যতক্ষণ না বিচারের মীমাংসা হয়, ততক্ষণ হৃদয়ের আবেগকে সংযত করো। দু পা এগোও, এক পা পেছোও। থামো, থামো—স্যাবাইন-রমণীগণ, এসো, এসো—এই যে ক্লিওপেট্রা, এসো—

[রমণীরা মাটীর দিকে চাহিয়া গম্ভীর অথচ বিনয়-নম্রভাবে মঞ্চের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল]

ক্লিওপেট্রা। (নতমুখে) যদি আমাদের তিরস্কার করতে এসে থাকো, মারটিয়াস, —তাহলে আগেই বলছি, আমাদের তিরস্কার করো না। আমরা অনেক বাধা দিয়েছি, অনেক চেষ্টা করেছি, এমন কি অত্যাচার করবার আগে পর্য্যন্ত আমরা মাথা নোয়াই নি—সত্যি বলছি, প্রিয়তম—

মারটিয়াস। তোমার জন্যে কাঁদিনি, এমন এক মুহূর্ত্তও আমার কাটেনি! সারা-

(কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার আভাসে অপর রমণীরাও কাঁদিতে লাগিল)

মারটিয়াস। শান্ত হও, ক্লিওপেট্রা—এরা নিজেদের দস্যু বলে স্বীকার করেছে—চলো, ক্লিওপেট্রা, এখন বাড়ী ফিরে চলো—

ক্লিওপেট্রা। (মুখ না তুলিয়া) আমার ভয় হচ্ছে, আবার তিরস্কার করবে। কিন্তু এখানে এদের সঙ্গে থেকে থেকে এটা আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে—মারটিয়াস, এ-সব পাহাড় তোমার ভাল লাগছে না?

মারটিয়াস। ক্লিওপেট্রা, এ কি বলছো, বুঝতে পারছি না। পাহাড় নিয়ে কি হবে? কি বলছো তুমি?

ক্লিওপেট্রা। তোমাদের বোধ হয় রাগ হবে, কিন্তু সত্যি কথাটা বোঝ, আমাদের মোটেই দোষ নেই—মারটিয়াস, সত্যি বলছি, তোমার নিয়ম-মত আমরা কেঁদেছি কিন্তু তোমরা কি বলছো বা চাইছো, তার কিছুই বুঝতে পারছি না—আরও কাঁদতে বলো, কাঁদবো, আরও কাঁদবো। ভগ্নীগণ, এরা ভাবছে, আমরা এদের জন্যে যথেষ্ট কাঁদিনি। এসো ভগ্নীরা, এদের সে ভুল শুধ্‌রে দাও—কাঁদো, কাঁদো সকলে,—মারটিয়াস, তোমায় কত ভাল বাসতুম—

[রমণীদের চোখ অশ্রুর ধারা বহিল]

সিপিও। ক্লিওপেট্রা, শান্ত হও,—তোমাদের এ সময় উত্তেজিত হওয়া ভারি খারাপ। আর, মশাইরা, শুনছেন, আপনারা বাড়ী যান, বাড়ী ফিরে যান। ক্লিওপেট্রা, এসো—চলো, শোবে চলো—তুমি শোওগে—আমি খাবার-দাবার দেখছি—

মারটিয়াস। খাবার নিয়ে কি হবে? কি সব বলছো—ক্লিওপেট্রা, শান্ত হও,—ভিতরে একটা বোঝবার গোলমাল হয়েছে—তোমরা বুঝতেই পারছো না যে, তোমরা অপহৃত হয়েছো—

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বল্লুম ত, তোমরা এখনি তিরস্কার করবে। সিপিও, প্রিয়তম, আমার রুমালখানা কি তোমার কাছে?

সিপিও। হ্যাঁ, এই যে নাও—

মারটিয়াস। আচ্ছা, রুমাল কি হবে—

ক্লিওপেট্রা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) একটা রুমাল নিয়ে ঠাট্টা! কাঁদবার সময় আমার রুমাল না হলে চলে না যে! আর এ সব তোমারই দোষ মারটিয়াস! তুমি কি নিষ্ঠুর—

রমণীরা সকলেই কাঁদিতে লাগিল—স্যাবাইনরা এবং জন-কয়েক রোমানও কাঁদিতে লাগিল।

ভীত স্বর। প্রসারপিনা, প্রসারপিনা—

মারটিয়াস। (গম্ভীর স্বরে) স্যাবাইনগণ, শান্ত হও, সংযত হও—ঠিক থাকো, নড়ো না। এক পলকের মধ্যেই আমি সব ঠিক করছি। বোধ হয়, আইনের দিক থেকে কোন গোলমাল হয়েছে! এ দুর্ভাগা রমণী ভাবছে যে, ওর রুমাল চুরি করেছে বলে ওকে দোষী করা হচ্ছে—স্বপ্নেও ভাবছে না যে, ও অপহৃত হয়েছে! এইটিই আমাদের এখন প্রমাণ করতে হবে—অধ্যাপকগণ, আরম্ভ করুন (অধ্যাপকগণ পড়িবার উদ্যোগ করিলে রোমানরা ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল; সিপিও ক্লিওপেট্রার হাত ধরিল)

সিপিও। স্বীকার কর, স্বীকার কর ক্লিওপেট্রা, তাড়া-তাড়ি স্বীকার কর, নৈলে এখনি ওরা আবার সুরু করবে—

ক্লিওপেট্রা। আমার স্বীকার করবার কিছু নেইত! এ-সবই মিথ্যা নিন্দা—

মারটিয়াস। অধ্যাপকগণ, আরম্ভ কর—

সিপিও। স্বীকার করো ক্লিওপেট্রা, বলো তাড়াতাড়ি! হায় হায়, ওরা মুখ খুললো বলে—এখুনি আবার আরম্ভ করবে। স্যাবাইনগণ, থামো, থামো, একটু দেরী কর —এরা স্বীকার করেছে—তোমাদের মুখ বুজোও অধ্যাপকগণ, এই যে,এই যে ক্লিওপেট্রা স্বীকার করছে—

ক্লিওপেট্রা। আচ্ছা, ভালো—আমি স্বীকার করছি—[অন্য রমণীদিগকে] ভগ্নী-গণ, স্বীকার কর—

সিপিও। তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ, এরা সবাই স্বীকার করছে। সব ঠিক হয়ে গেছে—ঠিক হয়ে গেছে—ব্যস্, চুকে গেছে—

মারটিয়াস। (হতবুদ্ধি হইয়া) মশায়রা, আর একমিনিট দেরী করুন। আচ্ছা ক্লিওপেট্রা, বিশে-একুশে এপ্রিলের মাঝামাঝি রাত্রে তুমি আর এই সব রমণী এদের দ্বারা অপহৃত হয়েছো—এ কথা স্বীকার করছো?

ক্লিওপেট্রা। (অবজ্ঞাভরে) না, আমরা নিজেরা পালিয়ে এসেছি! লজ্জা হয় না বলতে?

মারটিয়াস। বলেছি, বুঝতে পাচ্ছে না। অধ্যাপকগণ --

ক্লিওপেট্রা। মারটিয়াস, তোমরাই অতি নীচ কাজ করেছো, তোমরাই ঘুমিয়ে ছিলে, আমাদের রক্ষা করনি—তোমরাই আমাদের এদের হাতে তুলে দিয়েছ--তোমরাই আমাদের ভুলে ছিলে, আমাদের ত্যাগ করেছো, আর এখন এসে আমাদেরই ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলছো—আমরা পালিয়ে এসেছি। মারটিয়াস, আমরা হৃত হয়েছি, অতি হীনভাবে অপহৃত হয়েছি। (কাঁদিতে কাঁদিতে,) বিশ্বকোষ খুলছ কেন! যে-কোন রোম-ইতিহাসে এ-বিষয় পড়তে পারো ত, তাতে জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

সিপিও। (খুব জোরে) অধ্যাপকগণ, মুখ বুজোও, বুজোও বলছি। (অধ্যাপকদের মুখ খোলাই রহিল—রোমানরা অতিশয় ভয় পাইল এবং জনকতক মঞ্চ ছাড়িয়া পলাইল)

মারটিয়াস। রোমানগণ, স্যাবাইনগণ—সব শোন—এক মুহূর্ত্তেই সব গোলমাল আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এ গোলমালটা যন্ত্রগত—অধ্যাপক, দেখি, তোমার অবস্থাটা দেখি। এই তো—হুঁ, এটা আমার জানা উচিত ছিল। কব্জা ভেঙে গিয়েছে সেইজন্যে মুখ বন্ধ হচ্ছেনা। যাক্, বাড়ী গিয়ে ঠিক করে নেবো। এদের যে চুরি করে আনা হয়েছে সেইটে এরা স্বীকার করেছে—তাই যথেষ্ট! আমি নিজের কানে সে কথা শুনেছি—এতদিনে আমাদের কাজ সফল হলো—আকাশ-পাতাল একসঙ্গে কেঁপে উঠেছে —ক্লিওপেট্রা চলো, এবার বাড়ী ফিরি—বাস্তুদেবতার—

ক্লিওপেট্রা। আমি তোমার বাস্তুদেবতার কাছে ফিরে যেতে চাই না—

স্যাবাইন রমণীরা। চুলোয় যাক্ তোমা-দের বাস্তুদেবতা। আমরা আর ফিরে

না—এখানেই আমরা থাকবো। বেশ আছি এখানে। আমাদের অপমান করছো তোমরা! আমাদের সব হরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছো। রোমানগণ, আমাদের রক্ষা কর,—আমরা যাব না।

(অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে করিতে রোমানরা ক্রমশঃ পশ্চাতে সরিয়া গেল এবং রাগতভাবে স্যাবাইনদের পানে দেখিতে লাগিল)

একজন রোমান। রোমানগণ, সব অস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হও—তোমাদের স্ত্রীদের রক্ষা করতে হবে—রোমানগণ, সব অস্ত্র নাও —সজ্জিত হও—

মারটিয়াস। (ঘণ্টা বাজাইয়া) ব্যাপার কি? এখনি একটা যুদ্ধ ঘটবে যে! ওঃ, আমার মাথা ঘুরছে। স্যাবাইনগণ—আমার মাথা ঘুরছে—

প্রসারপিনা। (অগ্রসর হইয়া ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে) রোমানগণ, উত্তেজিত হয়ো না—একা মারটিয়াসের সঙ্গে আমি একটু কথা কইবো—

(স্যাবাইনদের সার হইতে কম্পিত কণ্ঠের বিরহ-কাতর আহ্বান—প্রসারপিনা, প্রেয়সী আমার···ওঃ···

প্রসারপিনা। [ধীরে] কে ? প্রিয়তম! কেমন আছ? মারটিয়াস, এখানে এসো, ভয় পেয়ো না—তোমার সব সৈন্যেরা পালাবে না। তোমার স্ত্রী ক্লিওপেট্রা কি আমরা কেউই আর বাড়ী ফিরে যাবো না—বুঝতে পারছো? ব্যাপারটা বুঝতে পারছো?

মারটিয়াস। অবাক হয়ে গেছি, ক্লিওপেট্রা, তা হলে আমি বাঁচবো কি করে? ক্লিওপেট্রাকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি না—আর সে যে আমার একেবারে আইন-সঙ্গত স্ত্রী—আচ্ছা, তুমি কি ভাবো, কোনরকমেই সে আসবে না?

প্রসারপিনা। না, কোনরকমেই না...

মারটিয়াস। তবে আমি কি করবো?—দেখতে পাচ্ছো, তাকে আমি কত ভালবাসি —তাকে না পেলে কি করে বাঁচবো?

(কাঁদিতে লাগিল)

প্রসারপিনা। আরে, কাঁদছ কি! মারটিয়াস—(আস্তে-আস্তে বলিল) সত্যি, তোমার জন্যে ভারি দুঃখ হচ্ছে—আচ্ছা, তোমায় চুপি চুপি বলছি, শোন, একটা উপায়, কেবল এক উপায় আছে—তাকে চুরি করো···

মারটিয়াস। কিন্তু সে কি আসবে?

প্রসারপিনা। [ঘাড় নাড়িয়া] যদি চুরি করো, তাহলে না এসে কি করে থাকবে?

মারটিয়াস। কিন্তু সেটা তো ভারি অন্যায় কাজ হবে। বুঝেছি, আমায় কু-মতলব দিচ্ছ তুমি, যাতে অত্যাহিত করি—তাহলে আমার ন্যায়-বুদ্ধির কি হবে—না, তোমরা স্ত্রীলোক, তাই ভাবো, জোর যার মুল্লুক তার! হায় নারী—

প্রসারপিনা। থাক্, ও-সব কথা আগে অনেকবার শুনেছি। মারটিয়াস, দেবতারা যেদিন তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনটা ভারি খারাপ ছিলো। তোমরা যে কি রকম মুখ্যু, তা বলা যায় না—যদি আমাদের পুরুষের অধীনে থাকতেই হয়, তাহলে যারা বলবান, তাদেরই বেছে নেবো। আর বলবান ঐ ওরাই। তুমি কি ভাবো, আমরা বারবার

চুরি যেতে, আবার ফেরত্ চাইলেই ফিরে যেতে অর্থাৎ এই রকম একবার হারাতে আরবার ফেরত্ যেতে খুব ভালবাসি?

স্বর। প্রসারপিনা, প্রেয়সী আমার ··

প্রসারপিনা। হ্যাঁ, এই যে প্রিয়তম, কেমন আছ?··· আর লোকেরা আমাদের নিয়ে জিনিষপত্রের মত নাড়া-চাড়া করবে—যেই একজনের কাছে তুদিন কাটিয়েছি অমনি আর-একজন চুরি করে নিয়ে যাবে,—আবার যেই সে-নতুনটির কাছে তুদিন থেকে সরে গেছি, অমনি সে পুরোনো লোকটি এসে বলবেন—চলো, ফিরে চলো! সত্যি, মারটিয়াস, যদি এর বিরুদ্ধে লাগতে চাও, যদি আপনার স্ত্রীকে নিজের করে' নিতে চাও, তাহলে এক-কাজ করতে হবে—বেশ বলবান হতে হবে—কারো কাছ হতে মেগে নিয়ো না! আর স্ত্রীর জন্যে প্রাণপণে লড়ো অর্থাৎ যদি মরতে হয়, তাহলে তার রক্ষার্থেই মরো। সত্যি বলছি, মারটিয়াস, শোন, যে-স্বামী তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে-করতে প্রাণ দিতে পারে, সেই স্বামীর সমাধির উপর লুটিয়ে মরাই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, গৌরব সে! মারটিয়াস, এটাও ঠিক জেনো, স্বামী খারাপ হলে স্ত্রীকেও খারাপ হতেই হবে—

মারটিয়াস। কিন্তু ওদের যে সব অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে, আমাদের যে কিছুই নেই...

প্রসারপিনা। যাও, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আনো—

মারটিয়াস। তাছাড়া ওদের গায়েও বেশ জোর, কিন্তু আমাদের তো তা নেই—

প্রসারপিনা। যাও, গায়ে জোর করগে.—সত্যি, মারটিয়াস—তুমি এমন মুখ্যু!

মারটিয়াস। (তার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া), তুমি কি মূর্খ, নারা, আমায় পরীক্ষা করছ! প্রলোভন দেখাচ্ছ! কিন্তু মারটিয়াস ভুলছে না! বেঁচে থাক্ আমাদের এই আইন! পাশব অত্যাচারে পর-স্ত্রীদের হরণ করতে চায় যারা, তারা তা করুক—বাড়ী ধ্বংস করতে হয় করুক—জিনিষপত্র ভাঙ্গে ভাঙ্গুক—আমরা কখনো কোনও আইন-বিরুদ্ধ কাজ করব না—আইন অমান্য করব না। এ হতভাগ্য স্যাবাইনদের দেখে জগৎ যদি হাসে হাসুক—তারা কখনো আইনের অপমান করবে না—আইনের বিরুদ্ধে যাবে না। সৎলোক দরিদ্র হলেও সম্মান পায়—সম্মানের দাম অনেক বেশী! আমরা সে ভব্যতার সম্মান খোয়াব না। স্যাবাইনগণ, ফিরে চলো, ফিরে চলো বন্ধুরা। সব কাঁদো, স্যাবাইনগণ, নয়নে ধারা বইয়ে কাঁদো—শোক করো সব, বুক চাপড়াও—আর কাঁদতে লজ্জা করো না—ওরা ঢিল মারে ত মারুক, ঠাট্টা করে করুক, তাতে কান দিও না, তোমরা শুধু কাঁদো—ওদের যা ইচ্ছে হয়, করুক! স্যাবাইনগণ, কাঁদো,—আজ লাঞ্ছিত অপমানিত আইনের জন্যে তোমরা কাঁদো মনুষ্যত্ব পদদলিত দেখে কাঁদো। কাঁদো, আর কাঁদো। সেই সঙ্গে এই কথাটি মনে রেখো—আইনের মর্য্যাদা অলঙ্ঘনীয়। স্যাবাইনগণ, চলো—সব ঠিক হও—ভেরীবাদকগণ, এবার অভিযানের সুর ধর। তুপা এগোও, এক পা পেছোও—তুপা এগোও, একপা পেছোও—

[রমণীরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল]

ক্লিওপেট্রা। মারটিয়াস, দেরী কর, একটু দেরী কর—

মারটিয়াস। দূর হয়ে যা, মায়াবিনী নারী—আমি তোকে চিনিনা, চাই না! আইনের অপমান! না, কথনো তা হবে না। ওহে, অত তাড়াতাড়ি নয়—আস্তে আস্তে চল সব—

[ভেরীতে করুণ সুর বাজিয়া উঠিল—রমণীরা কাঁদিতে কাঁদিতে স্যাবাইনদের দিকে যাইতে চাহিল; কিন্তু রোমানরা জোর করিয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিল। জয়ী রোমানরা আনন্দধ্বনি করিল। হাস্য বা ক্রন্দন, কোনদিকেই লক্ষ্য না করিয়া, আইনের মোটা মোটা বইয়ের ভারে নত হইয়া স্যাবাইনরা একই ভাবে চলিতে লাগিল—দুই পা আগাইয়া, একপা পিছাইয়া—মুখে এক-কথা, —"দুপা এগিয়ে, একপা পেছিয়ে ... ..."]

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা

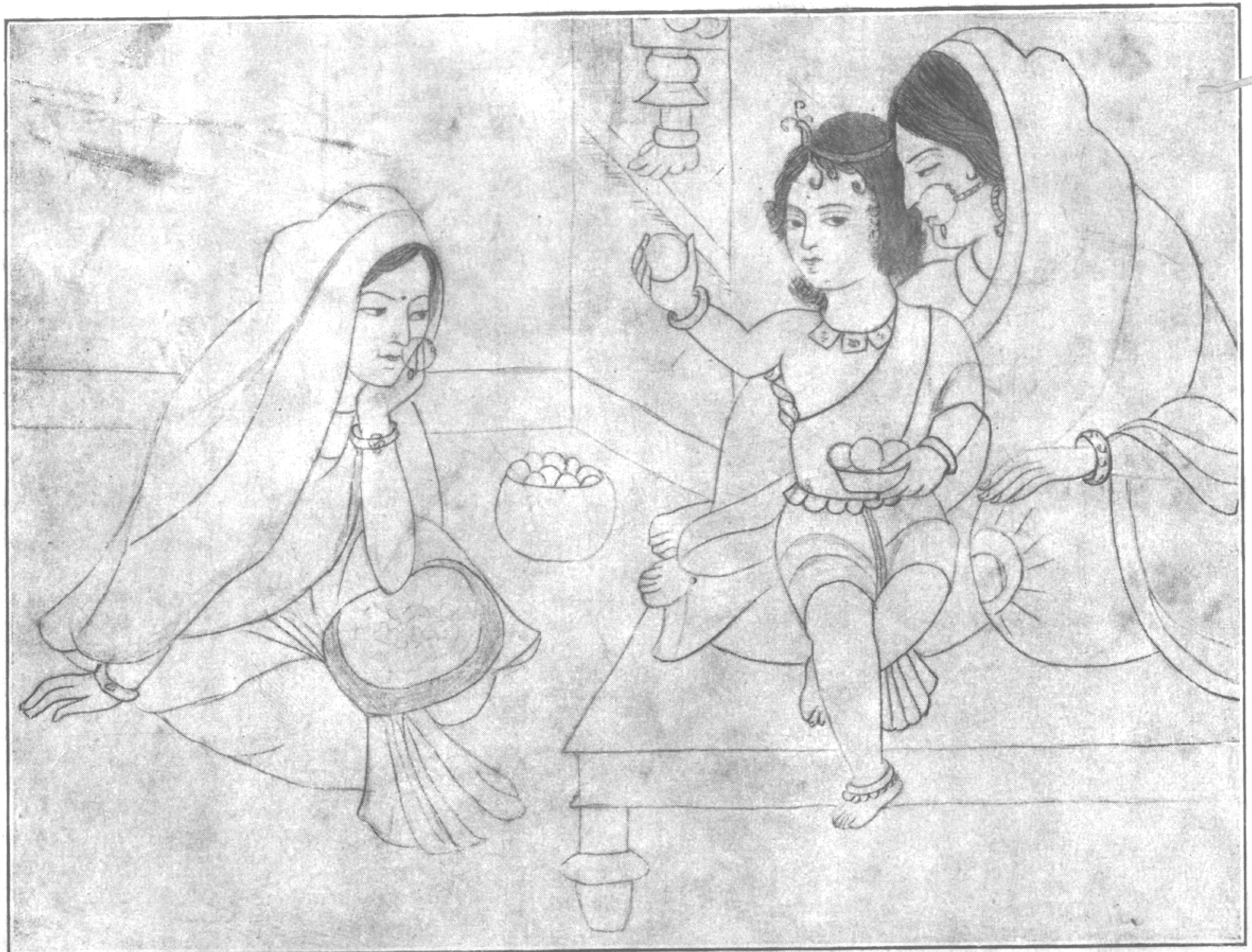
উগ্র-ক্ষত্রিয় পরিচয়। শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্ধু কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, বর্দ্ধমান। কলিকাতা, সেন্ট্রাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শাস্ত্রাদি হইতে তথ্য-সংগ্রহ-দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, উগ্র-ক্ষত্রিয়গণ রাজপুত জাতি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন; এবং তাঁহারা বেদোক্ত বাহুজাত উগ্র-রাজন্যবংশধর ক্ষত্রিয়। রচনাটি কথোপকথনের আকারে গ্রথিত।

উষসী। শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ২০১-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি ছোট গল্পের বহি। "সুনন্দা", "পৌষ-পার্ব্বণ", "পিতৃদায়", "আনন্দ-প্রদীপ", "ময়না" ও "রূপকথা"—এই ছয়টি গল্প এই গ্রন্থে আছে। "ময়না" গল্পটি ব্রেট-হার্টের একটি গল্প-অবলম্বনে লিখিত; বাকী গল্পগুলি মৌলিক। "পৌষ-পার্ব্বণ" ও "পিতৃদায়" গল্পদুইটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে—গল্পদুটি নিখুঁত। "পৌষ-পার্ব্বণে"র গোপাল ও সুরমা, এবং "পিতৃদায়ের" অলকা—এই তিনটি চরিত্র বেশই ফুটিয়াছে। অল্প ঘটনায় ও বিনা-আড়ম্বরে তাহাদের চিত্ত-বৃত্তি সুন্দর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। অপর গল্পগুলির বর্ণনায় লেখিকা ভাষাকে স্থানে-স্থানে বড় মোচড় দিয়াছেন—মাঝে মাঝে অনাবশ্যকভাবে ভাষাকে ফেনানোও হইয়াছে। যাই হোক, এ ত্রুটি সামান্যই; কালে সারিয়া যাইবে। ছোট গল্প-রচনায় লেখিকার হাত আছে। বইখানির ছাপা-কাগজ-বাঁধাই চমৎকার।

বিবেকানন্দ। (সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা)। শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক, গ্রন্থকার। কলিকাতা, লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে মহাত্মা বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব কর্ম্ম-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিবেকানন্দ ভারতের অসাধারণ প্রতিভাশালী কর্ম্মবীর। তাঁহার কীর্ত্তি-কথার যত অধিক প্রচার হয়, ততই দেশের মঙ্গল। গ্রন্থের রচনা চলনসই, তবে মাঝে মাঝে একটু মুরুব্বির ধরণে পাঠককে চমক লাগাইবার চেষ্টা আছে—সেটুকু, আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ পড়িবে। কারণ সূর্য্যের রশ্মি দেখাইতে বাতি জ্বালিবার প্রয়োজন হয় না। বহিখানির ছাপা-কাগজ ভালো।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



মা

শ্রীমতী সুনয়নী দেবী অঙ্কিত।

ভারতী

৪২শ বর্ষ]   চৈত্র, ১৩২৫   [১২শ সংখ্যা

বসন্ত সঙ্গীত

বেহাগ—ঢিমে তেতালা।

বসন্ত জেগেছে আজি প্রাণে :
নিশা মোর সুখে ভোর, দুখের' গানে।
দখিণা বায়, বুলায়ে যায়—
সুবাস হাত গায়, মমতা দানে।
কভু শশি-অম্বরা, কভু তারকা ভরা,—
নিশীথিনী ;
নিদ্রা মায়াবিনী গো—
কি মন্ত্র ঢালে তার কানে কানে,—
জোছনা সে চুম্বনে ঢুলে পড়ে,—
তারকা হেসে ওঠে ঘুমের ঘোরে,—

ভবনে শান্তি নামে, বনে থামে পাখী,
শ্রান্তি-নিমীলিত অবনী-আঁখি ;
ব্যর্থ এ ফাগুন রাতি সবখানে,
গো সবখানে।
বসন্ত জেগেছে শুধু আমারি প্রাণে।
তন্দ্রাহীন দুনয়ন, ভাব বিহ্বল মন
ছুটে চলেছে কোন্ অজানা পানে
কে জানে!
(আমার) গানের সাথী, ধ্রুব তারকাটি
জোগায় আশার ভাষা সুরতানে।
বসন্ত জেগেছে শুধু আমারি প্রাণে।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

স্বরলিপি

```
   ·                    ১                     +
II র্সা  ন্‌া  -প্‌া  ন্‌া ।  র্সা  সা  গরা  -গা ।  পক্ষা  -গা  -া  মা ।
   ব    স    ০    ন্ত    জে   গে   ছে০   ০     আ০    ০    ০   জি

   ৩                        ০                          ১
। গা  -রা  সা  -া ।  সসা  -রগা  -মপা  -ক্ষা ।  পা  -া  -া  -া
  প্রা   ০   ণে   ০    নিশা   ০০    ০০     ০     মোর  ০   ০   ০
```

\+ ৩
। র্সা না –পক্ষা –া । পা –া –মা –গা । –া –া –া –া ।
সু খে ০০ ০ ভোর ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১ + ৩
। গা মা –া পা । মা –গা –রা –সা । সা –া –া –া ॥ I
দু খে ০ র গা ০ ০ ০ নে ০ ০ ০

১ +
II –া না না না । র্সা –া –া না । ধনর্সর্রা –র্সনা –ধপা ক্ষা ।
০ দ খি ণা বায়্ ০ ০ বু লা০০০ ০০ ০০ য়ে

৩ ১
। পা –া –া –া । ক্ষা ক্ষা –া ক্ষা । পা পা ক্ষপধ –পমগা ।
যায়্ ০ ০ ০ সু বা ০ স হা ত গা০০ য়০০

\+ ৩
। গা মা পা মা । –গা –া রসা –ন্সা II
ম ম তা দা ০০ ০ নে০ ০০

১ +
II মা পা না না । না –া না না । –র্সা র্সা র্সা র্সা ।
ক ভু শ শি অ ০ ম্ব রা ০ ক ভু তা

৩
। র্সা র্সা র্রা র্সা । র্সা র্রা না র্সা ।
র কা ভ রা নি শী থি নী

১ + ৩
। র্সা –র্গা র্গা র্গা । র্রগর্মর্পা –র্মগর্রর্সা না না । র্সা –া –া –া ।
নি ০ দ্রা মা য়া০০০ ০০০০ বি নী গো ০ ০ ০

১ +
। র্সা না –া পা । মা –গা গা –মা । পা মা গা –া ।
কি ম ০ ন্ত্র ঢা লে তার্ ০ কা নে কা ০

৩ ১
। রসা –া –ন্সা –া । সা সা সা –ন্া । সা সা গা গা ।
নে০ ০ ০০ ০ জ্যো ছ না ০ সে চু ম্ব নে

+ ৩ ০
| গমা রগা -মপা মা | গা -া -া -া | পা পা ক্ষা -পা |
ঢু০ লে০ ০০ প ড়ে ০ ০ ০ তা র কা ০

১ + ৩
| র্সা না পক্ষা পা | মগা মা পা মা | গা -া রসা -রসা |
হে সে উ০ 'ঠে যু০ মে র ঘো ০ ০ রে০ ০০

০ ১ +
| মা পা পা না | -া না না না | র্সা র্সা র্সা র্রা |
ভ ব নে শা ০ স্তি না মে ব নে থা মে

৩ ০ ১
| সনা -া র্সা -া | র্সা -া না না | ধপা -া ক্ষা পা |
পা ০ খী ০ শ্রা০ ০ স্তি নি মী০ ০ লি ত

+ ৩ ০
| পা না না -র্সা | ধনর্সর্রা -র্সনা -ধপা ক্ষাপা |
অ ব নী ০ আঁ০০০ ০০ ০০ খি০

০ ১ + ৩
| পা -া পা -া | পা -া পা -া | মা গা রগা -মপা | -মা -া গা -া |
ব্য ০ র্থ ০ এ ০ ক্ষা ০ শু ন রা০ ০০ ০ ০ তি ০

০ ১ +
| গা মা পা -া | না না র্সা র্রা | ধনা -র্সর্রা -র্সনা -া |
স ব খা ০ নে গো স ব খা০ ০০ ০০ ০

৩ ০ ১
| র্সা -া -া -া | র্সা র্গা র্গা র্রর্গা | -র্মর্পা র্মা র্গা র্সনা |
নে ০ ০ ০ ব স ন্ত জে০ ০০ গে ছে শুধু

+ ৩
| পা ক্ষপা -মগা মা | গা -রা সনা -সা II
আ মা০ ০০ রি প্রা ০ ণে০ ০

০ ১ +
II সা সা -ন্া -প্ন্া। সা সা সা -া। ন্সরা -গমা পা হ্মপা।
ত ন্দ্রা হীন্ ০০ দু ন য়ন্ ০ ভা০০ ০০ ব বি০

৩ ০ ১
। মা মা গা -া। গা মা -া পা। না না র্সা র্সা।
হ্ব ল মন্ ০ ছু টে ০ চ লে ছে কোন্ ০

+ ৩ ০ ১
। র্সা না -া পা। মা -া -া গা। -া -া -া -া। গমা পা -া -া।
অ জা ০ না পা ০ ০ নে ০ ০ ০ ০ কে০ ০ ০ ০

+ ৩ ০
। মা -া গা -া। -া -রা -সা -া। না না না না।
জা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ আ মা র গা

১ + ৩
। র্সা র্সা -া -া। ধনা -র্সর্রা -র্সনা -ধপা। হ্মপা -া -া -া।
নে র ০ ০ সা০ ০০ ০০ ০০ থী০ ০ ০ ০

০ ১ +
। পা হ্মা হ্মা পা। হ্মপা -ধপা মা -া। গা -া -া -া।
ধ্রু ব তা র কা০ ০০ ০ ০ টী ০ ০ ০

৩ ০ ১
। সা গা -মা -া। পা না -া না। না -া র্সা -া।
জো গায় ০ ০ আ শা ০ র ভা ০ ষা ০

+ ৩ ০
। র্সা র্গা র্রর্সনা -ধপা। -মা -া -া গা। র্সা র্গা র্গা র্রর্গা।
সু র তা০০ ০০ ০ ০ ০ নে ব স ন্তু জে০

১ + ৩
। -র্মর্পা র্মা র্গা র্সনা। পা হ্মপা -মগা মা। গা -রা সন্া -সা II
০০ গে ছে শুধু আ মা০ ০০ রি প্রা ০ ণে০ ০

মধ্য-এসিয়ায় বৌদ্ধ শিল্প-কলা

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম

ভারতবর্ষ হইতে কোন্ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে প্রথম প্রবেশ লাভ করে, সে সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান হইয়াছে; এবং এই সন্ধানের ফলে পরস্পর-বিরোধী নানা মতের উদ্ভব হইয়াছে। ফেনপুঞ্জের ন্যায় এই বিবিধ মতরাশি এখন সঙ্কুচিত হইয়া ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে সম্রাট্ সিঙ্‌টির রাজ্যকাল (৬৫ খৃষ্টাব্দ) হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করে ও চীন-দেশ-বাসিগণের লৌকিক ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রায়ই দেখা যায় যখনই কোন দেশে কোন যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। গল্পগুলি হয়তো একেবারে নিছক কল্পনার বস্তু নয়—বাস্তবের পোড়েনে ও কল্পনার টানায় তাহা বোনা হইয়াছে।

স্বপ্নে আমরা অনেক ভবিষ্য ঘটনার সূচনা পাইয়া থাকি। সম্রাট সিঙ্‌টি এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিলেন;—একজন সুবর্ণময় পুরুষ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজভ্রাতা এই স্বপ্নের বিচার করিয়া বলিলেন যে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ পশ্চিম দেশের (১) সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাক্যমুনি বুদ্ধদেব ভিন্ন আর কেহই নহেন; চীনে যে তাঁহার ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইবে, এই স্বপ্ন তাহারই দ্যোতক। বুদ্ধদেব ও তাঁহার ধর্ম্মের বিষয়ে চীনদেশবাসিগণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু জ্ঞান না থাকিলেও তাঁহারা জানিতেন যে পশ্চিমে ভারতবর্ষ বলিয়া এক দেশ আছে ও সেখানে একজন মহাপুরুষ এক অভিনব ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৭ সালে কয়েকজন বৌদ্ধ শ্রমণ চীনদেশে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন; দৈব-প্রভাবে তাঁহারা মুক্তিও লাভ করেন। গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কারাদ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত হইল, বন্দী শ্রমণগণের দেহ হইতে লৌহ জিঞ্জির স্রস্ত হইয়া পড়িল এবং এক সুবর্ণবর্ণ পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব এই সময়েই ঘটে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীনাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ভূগোল-সম্বন্ধে গ্রীকদের সে ধারণা ছিল তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। কেহ বা ভারতকে ত্রিভুজ, কেহবা ট্রাপিজ, কেহ বা চতুর্ভুজ মনে করিতেন। চীনাদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আমরা চীনের প্রাচীন ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি, ইনি বংশের (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়

(১) অর্থাৎ ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষ চীনদেশের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া চীনসাহিত্যে এ ভারত

শতাব্দী) সম্রাট্ হোয়েটী (Hwei-Ti বা Wu-Ti) প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল ১৯৪-১৭৯ খৃঃ পূঃ। তাঁহার শৌর্য্যে বহিঃশক্রগণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল; দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন-হেতু সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল। এই সুখ-শান্তির একমাত্র কণ্টক ছিল—পার্ব্বত্য জাতি দুর্দ্ধর্ষ হিউঙ্ নুগণ (Hiung-nu)। কিন্তু তাহাদের উৎপাত বেশীদিন স্থায়ী হইতে পায় নাই। এই জাতি তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে চীনের পশ্চিম-সীমান্ত কানসু প্রদেশে অবস্থিত ইউয়েছি (Yueh-chi) নামক আর একটী জাতিকে স্রোতোমুখে নিক্ষিপ্ত তৃণপুঞ্জের মত আরও পশ্চিমে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সম্রাট হোয়েটি হিউঙ-নুগণের অরাতি ইউয়েছি জাতির সহিত সখ্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে তাঁহার সেনাধ্যক্ষ চাঙ-কীয়েনকে (Chuge-K'ien) ইউয়েছি সভায় দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। (২) ইনি ইউয়েছি জাতিদ্বারা সমধিক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সদ্যঅধিকৃত ব্যাক্ট্রিয়া দেশ (বহ্লীক) পর্য্যন্ত তিনি আগমন করেন এবং মধ্য ও পশ্চিম এসিয়া সম্বন্ধে নানা অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেন। এই ব্যাক্ট্রিয়াতেই থাকিবার সময় তিনি ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন এবং তাঁহার প্রথম কয়েকটি অভিযান মুখ্যতঃ নিষ্ফল হইলেও ভারত-আবিষ্কার ইহারই গৌণ ফল বলিয়া ধরিতে হয়। এই সময়ের পর হইতেই চীন ও ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের সদ্ধর্ম্ম-প্রচার-প্রচেষ্টাই এই দৃঢ় সম্পর্কের মূল কারণ। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ প্রচারকগণ পশ্চিমে গ্রীস্, উত্তরে মধ্য এসিয়া ও পূর্ব্বে সুবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশে) প্রচার-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। মধ্য এসিয়ায় শত শত মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুঙ্কুমবর্ণ কাষায় বাস-পরিহিত সযত্ন-ক্ষৌরিতশীর্ষ ভিক্ষুগণের গাথা-গীতে উষর মরুও যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল! কুস্তনের (বর্ত্তমান খোটান) গোশৃঙ্গ মঠ ইহার সাক্ষী। শুধু খোটানই বা বলি কেন, সমগ্র প্রদেশেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান। ক্রমে তাহা বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সম্রাট্ সিঙ টির সময় হইতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তরোত্তর প্রসার হইতে থাকে। এই সিঙ টির প্রখ্যাত সেনাধ্যক্ষ প্যান চাও (Pan

(২) স্যর আরল্ ষ্টাইন মধ্য-এসিয়ায় মিরণ হইতে টুন-হুয়াঙ যাত্রা করিবার সময় প্রাচীনকালে এইখান দিয়া কোন্ কোন্ পথ ছিল, তাহা জানিবার জন্য পুরাতন পুস্তক দেখিতেছিলেন। তিনি লিখিতেছেন—(Ruins of Desert Cathay. Vol, I. p. 512)—

"Ever since the remarkable mission of Chang-Ch'ien whom the Emperor Wu-ti had sent westwards to open communications with the Great Yueh-chi tribe (the later Indo-Scythians then settled on the Oxus) for an alliance against their common enemy the Hsiung-nu or Huns the Chinese knew of two main routes by which to reach the 'Western regions' *i, e.* the Tarom basin and the countries on the Yaxartes

Ch'ao) মধ্য-এসিয়ার শেন-শেন, খোটান, কুচা ও কাশঘর নামক রাজ্যসমূহ জয় করিয়া চীন-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই প্রদেশের চীনাগণ যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন ও তৎপ্রচারে সহায়তা করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি ? এই ঘটনার পর ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ সংখ্যক চীনা লইয়া একটী দৌত্যসমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য খোটানে প্রেরিত হয়। ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (৩) তাঁহারা কতকগুলি বৌদ্ধ পুঁথি ও মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন, আর তাঁহাদের সঙ্গে আনেন, ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষু কশ্যপ মদঙ্গকে। ইঁহার গুরু গোভরণ পরে চীনে আসিলে তাঁহাদের জন্য তদানীন্তন চীন রাজধানী লো-সাঙে একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। এই দুইজন ভিক্ষু চীনা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং বহু বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ চীনাদের সুবিধার জন্য ভাষান্তরিত করেন। (৪) পরে সার্দ্ধ দুই শতাব্দী ধরিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই অনুবাদের কাজ করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সাধারণ লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। অনেকেই আগার পরিত্যাগ করিয়া উপসম্পদা গ্রহণ পূর্ব্বক অনাগারী ভিক্ষু হইলেন।

ভারতে চীন পরিব্রাজকগণের আগমন ও চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার-লাভ

চীনদেশে প্রচলিত বিনয় অর্থাৎ সঙ্ঘের নিয়ামক শাসন সূত্রসমূহ খাঁটী আছে কিনা অথবা তাহার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, এই সন্দেহ অনেক চীনা ভিক্ষুর মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। ভারতবর্ষে গেলে প্রকৃত বিনয়ের অনুসন্ধান হইতে পারে, এইজন্য, আর শাস্তা পরিত্রাতা বুদ্ধদেবের জন্মভূমি সুতরাং গরীয়ান তীর্থক্ষেত্র বলিয়াও বহু চীনা ভিক্ষু দুর্গম পথের বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া এখানে আসিতে লাগিলেন। সুদূর চীনে থাকিয়া উপাধ্যায় অথবা আচার্য্যের নিকট হইতে তাঁহারা তথাগত বুদ্ধের কত কাহিনী মুগ্ধ চিত্তে শুনিয়াছেন—কেমন করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, কেমন করিয়া দেবতারা চতুর্পূর্ব্ব-নিমিত্ত দেখাইয়া সংসারে তাঁহার বৈরাগ্যোৎপাদন করিলেন, কেমন করিয়া রাহুলবক্ষোলগ্না নিদ্রিতা যশোধরার মায়া কাটাইয়া গভীর নিশীথে তিনি নগর ত্যাগ

(৩) This is the date of the arrival of the first Indian Sramans Kasyapa Matanga and Bharana (or Dharmaraksha) who were invited by the Chinese Emperor Ming-ti (A. D. 58—75), and it is the historical beginning of Buddhism in China, though there are some traces of it in the earlier literature"—TAKAKUSU,—*A Record of Buddhist Practices* p. XVII. Footnote.

(৪) These two were the first Indian Buddhists in China ; they came to China in A. D. 671 and translated several Sutras,—Ibid, p. 183, Footnote.

...First translators of Buddhist texts which are said to have been brought loaded on a white horse. The White Horse monastery was built at Lo-yang. One work of translation is ascribed to Kasyap Matanga and five to Dharmaraksha. Ibid p. 207 Footnote.

করিলেন, ছয় বৎসর কঠিন তপশ্চর্য্যায় শীর্ণ-কলেবর হইয়া কঠোর শরীর-পীড়নের অসারতা উপলব্ধি করিলেন, আর শেষে কেমন করিয়া বোধিদ্রুম-মূলে নিষিণ্ণ-অবস্থায় ধ্যান-সমাধিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগরিত হইয়া তাঁহার দিব্য চক্ষুর বিকাশ হইল, প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পঞ্চ স্কন্ধের বিনাশ হইল, কেমন করিয়া মার ও মার-কন্যাগণের প্রলোভন কাটাইয়া তিনি নির্ব্বাণপন্থার আবিষ্কার করিলেন—শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের পুলক সঞ্চার হইয়াছে, শরীর রোমাঞ্চিত অথবা কণ্টকিত হইয়াছে, আর ভগবানের সাধনক্ষেত্র, লীলাক্ষেত্রের নানাবিধ দৃশ্য কল্পনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে! কপিলাবস্তুর ন্যগ্রোধারাম, শ্রাবস্তীর জেত-বনারাম, রাজগৃহের বেণু-বনারাম, গৃধ্রকূট পর্ব্বত; গয়াশীর্ষ, যষ্টিবন, বোধিদ্রুম—এ সবের কথা কি তাঁহারা পিটকত্রয় পড়িয়াই জানিবেন? না। এই পীঠসমূহ একবার দেখিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। দুর্লঙ্ঘ্য গিরির উচ্চতা, মরুকান্তারের মরীচিকাময় বালুকারাশির তপ্ততা, মকর-কুম্ভীরাদিসমাকীর্ণ দুস্তর ক্ষিপ্রগতি নদী-সমূহের গভীরতা, হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল বনানীর ভীষণতা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। ভারতে চীনা ভিক্ষুগণের প্রবাহ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। গয়াতে নাকি কতকগুলি চীনা মঠও স্থাপিত হইয়াছিল! ইহাদের মধ্যে ফা—হিসেন (অথবা ফা—হি সয়েন)। হোয়েন সাঙ্ (হ্‌স্যুয়ান—সাঙ, উয়াম—চোয়াঙ্ না কি ভুল!) ও ই-ৎপিঙের নাম

ভিক্ষু স্থলপথে আসিয়াছিলেন—মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়া। ভারত হইতে তখনও ভিক্ষুগণ চীনে যাইতেছিলেন। ৪০১ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব ইয়া ও—হিসঙ্ নামক সম্রাটের নিকট বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন ও বজ্র (চ্ছেদিকা) সূত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন; পরে তিনি রাজপুরোহিতও হইয়াছিলেন। ইনি অশ্বঘোষ ও নাগার্জ্জুনের জীবন চরিত রচনা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৫২০ খৃষ্টাব্দে বোধি-ধর্ম্ম কাণ্টন হইয়া নানকিঙে গিয়া-ছিলেন। সেখানে রাজা তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারে অসন্তুষ্ট হইলে তিনি স্বীয় অনুভাবের দ্বারা মাত্র একটা নলকে উড়ুপ করিয়া তরঙ্গ-স্ফীত ইয়াঙ্-টাসি নদ অবলীলাক্রমে পার হইয়াছিলেন! চীনদেশীয় শিল্পীগণের নিকট এই ঘটনাটী চিত্রাঙ্কনের উপজীব্য হইয়া আছে। এইরূপে চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাও ধর্ম্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোর শত্রু ছিল ও মাঝে মাঝে বৌদ্ধগণ যেমন প্রতিকূল সম্রাটের আমলে অমানুষিক অত্যাচার সহিয়াছেন, তেমনি আবার অনুকূল নৃপতিবর্গের সহানুভূতির ছায়ায় শীতল হইয়া নিজেদের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সে কাহিনী এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

হান ও পরবর্ত্তী রাজবংশের সময় চীন-দেশের প্রভাব সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং তাহা মধ্য এসিয়ায় সম্যক আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পর চীনদেশে নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে। তাহাতে চীনার প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া তুর্কীদের প্রভাব বাড়িতে থাকে।

অঃ) প্রথমাংশে এইরূপই হইয়া থাকে। পরে এই বংশের সম্রাট্ তাইৎ সুঙ্ (Tai—tsung ৬২৭—৬৫০ খৃষ্টাব্দ) তুর্কীদিগকে পরাজিত করিয়া চীনের লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জ্বল করেন। হামি ও তুরফান চীন সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়, ও কুচা, খোটান, খরস্থান ও কাশঘর চীনা শাসনকর্ত্তার অধীনে আসে। কাশপিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। নেপাল ও মগধ হইতে দৌত্য আসিতে লাগিল, রুমের সুলতান ও পারস্যের বাদশাহ চীন সম্রাট্কে ভেট পাঠাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। জাতীয় একতার প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সাহিত্য ও সুকুমার কলারও উৎকর্ষ সাধিত হইল। এই টাঙ্-বংশ এতদুর শক্তিশালী হইয়া উঠে যে ভারতবর্ষ তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই—ইহার ফল অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুকূলই হইয়াছিল। বিজিত ভারত চীনকে বিজয় করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল চীনক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা বিপুল মহীরুহ হইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ফেলিল।

চীন শিল্পকলায় বৌদ্ধ ভাব ও আদর্শের বিকাশ

চীন কল্পনায় নূতন রঙ্ ধরিল, চীনা আদর্শ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। প্রসিদ্ধ চীন শিল্পী উ—তাওৎ সু (Wu. Tao-tzu) এই যুগের আদর্শ চিত্রকর। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-চিত্র-অঙ্কনে তিনি তাঁহার শিল্প-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মল্লদের শালবনে যুগল শালতরুর মধ্যস্থলে শান্ত নিদ্রায় মগ্ন, আর রাজা' প্রজা, অর্হৎ সন্ন্যাসী, পশু-পক্ষী সমগ্র সৃষ্ট জগৎ তাঁহার শোকে মুহ্যমান। (৫) তাঁহার কোন চিত্র এখনও বর্ত্তমান আছে কি না জানা যায় না। তবে মধ্য এসিয়ার যে শিল্পকলার কথা বলিতে যাইতেছি, তাহা এই উন্নত টাঙ্ বংশের আমলেই আত্মপ্রকাশ করে।

স্যর অরেল ষ্টাইন সাহেব বিস্তর শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মধ্য এসিয়াতে সুগভীর বালুকা-স্তরনিহিত যে লুপ্তরত্নের উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার কতক পরিচয় Ruins of Desert Cathay নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কালে মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের

(৫) Cf. "We must return for a time to China,to consider the classic art of the T'ang epoch (A. D. 618—905), for this is the great creative a :e of the Far East, by which the whole future development both of Chinese and Japanese art is mainly determined: the part that Greece had played for Europe was played for Japan by China— Dr. Coomarswamy's *Budha and the Gospel of Buddhism*—p. 341.

"The Tang era stands in history for the period of China's greatest external power—the period of her greatest poetry and of her grandest and most vigorous, if not, perhaps, her most perfect art. Buddhism now took hold on the imagination of the time. China was never in such close contact with India, numbers of Indians including three hundred Buddhist monks, actively preaching the faith, were to be found in the T'ang capital of Loyang. And Buddhist ideas permeated Tang painting —*Binyon Painting in the Far East*

কিরূপ বিস্তার ঘটিয়াছিল, কিরূপে তুর্কী, সগ্‌দিয়ান, উইঘুর প্রভৃতি শেমিটিক জাতিগণ সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, কিরূপে চীনের সীমান্তে জল-বুদ্‌বুদের সৃষ্টি ও বিলয়ের মত কত-শত ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান-পতন ও সমাধি হইয়াছিল, অধীন রাজ্য-সমূহে চীনের আধিপত্য কিরূপ ছিল, আজ তমিস্রাবৃত ভূগর্ভে প্রোথিত ভাস্বর রত্ন-রাজির পুনরুন্নয়নে তাহা দিবালোকের মত প্রতিভাত হইতেছে। এমন কত সামগ্রী-সম্ভার বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহাতে অর্দ্ধবিলীনস্মৃতি সেই পুরাতন যুগের দৈনন্দিন চঞ্চল জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছি। কত কাজের অকাজের আসবাব, কাঠ-কাঠরার সরঞ্জাম, চেয়ার, টেবিল, ইঁদুর-ধরার কল, ঘর-কন্নার নানান খুঁটীনাটীর সামগ্রী, দলিল-দস্তাবেজ ও অন্যান্য কাগজ-পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন এ-সব কল্যাকার! আর তখনকার গৃহস্থালীর সুস্পষ্ট ছবিটা যেন নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া উঠে! আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে পড়িয়াছি যে কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করা হইত। যে সমস্ত জাতি সভ্যতায় পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাকি অরণি-সাহায্যে অগ্নিমন্থন-প্রথা প্রচলিত আছে। তুখারা ও ইয়ামেনে মন্থনের জন্য দুইটী অরণি ও টুঙ্-হুয়ানে একটা মন্থনদণ্ডও পাওয়া গিয়াছে। (৬) কিন্তু এই মরুকুক্ষি হইতে যে শিল্প-সম্পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ-সব কিছুই নয়। তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

কয়েকখানি চিত্রের ব্যাখ্যা ও বিবরণ

খাদালিক, নিয়া, মিরণ ও টুন হুয়াঙে যে-সমস্ত বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সে গুলিতে গ্রীক-বৌদ্ধ অর্থাৎ গন্ধার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির প্রভাব বর্ত্তমান। কোন কোন স্থলে ইহার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। তাহা বলিতেছি। খাদালিকের একটি বৌদ্ধ মঠের অন্তরভাগ অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্ত্তির দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে—কোথাও বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেছেন, কোথাও তিনি উপবাস-ক্লিষ্ট আর কোথাও বা অর্হৎগণ কর্ত্তৃক পূজিত। নিয়াতে কাঠের জিনিষগুলির উপর খোদাইয়ের কাজ গান্ধার আদর্শে করা হইয়াছে! এই সকল স্থলে ঐতিহাসিক মূল্য-বিশিষ্ট যে-সমস্ত কাগজ ও গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় "মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে দিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মিরণের শিল্পকলায়—কি চিত্রে, কি ভাস্কর্য্যে সেই

(৬) " H. G. Evelyn while recognised them as regular fire-flocks meant for the production of fire by the churning of small wooden sticks which fitted the holds" —Ruins of Desert Cathay Vol. I. p. 313.

"...By the side of so much evidence of a highly organised civilization, it was strange to come upon a small block of wood which had undoubtedly served for producing fire in the manner current at all times among savage races"—Ibid Vol. I

(গান্ধার) আদর্শের অনুবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মূর্ত্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। আসনোপবিষ্ট এবম্বিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলির এরূপ ভাবে পরিচ্ছদ সন্নিবেশিত হইয়াছে যে সেই সুদূর লপ-নর মরুর ভাস্কর কি নিপুণ ভাবেই যে গ্রীক-বৌদ্ধ অঙ্কন-রীতির অনুকরণ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিহার-প্রাচীর-গাত্রে বিবিধ বিষয় অবলম্বনে চিত্রসমূহ লিখিত হইয়াছে—উড্ডীন গন্ধর্ব্ব, উপদেষ্টা বুদ্ধদেব, অবহিত রাজপুত্র। ধ্যান, অভয়, বর, বিতর্ক, নানাবিধ মুদ্রায় বুদ্ধদেব চিত্রিত হইয়াছেন। বুদ্ধদেবের গায়ে সেমিটিক রীতির বেশ, ও মুখে গ্রীকরীতির ভাব লক্ষিত হয়। কোথাও বা আনন্দ-প্রমুখ শিষ্যগণ তাঁহার বন্দনা করিতেছেন, আর কোথাও বা তিনি ধর্ম্মের অপবাদ করিতেছেন, বদ্ধকরপুট রাজপুত্র অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। গান্ধিত, ভারুত, অজন্তা, অনুরাধাপুর বিহারে যেমন জাতক চিত্রসমূহ অঙ্কিত আছে, এখানেও সেইরূপ। আচার্য্য কুমারস্বামী লিখিত Mediaeval Sinhalese Art নামক গ্রন্থে বেসসান্তের জাতকের ঘটনাবলম্বনে যে অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এখানেও সেই বিষয় চিত্রিত হইয়াছে; কিন্তু এই দুই শিল্পকলার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না। মিরণের চিত্রে গ্রীক-বৌদ্ধ পদ্ধতিই বর্ত্তমান।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে জাতক-চিত্রের কণ্ঠদেশে (নিম্নভাগে) সুষমাময় পুষ্পরাশির

চলিয়াছে ও তাহারও ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণ-যৌবনা গন্ধমাল্যপরিশোভিত কতকগুলি নর-নারীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এগুলিতে গ্রীক ও রোমীয় চিত্রাঙ্কন-রীতির সুস্পষ্ট ছাপ বর্ত্তমান; তাহাদের সহিত বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতি অথবা বৌদ্ধ দেবদেবীর কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। এক স্থলে একটী লীলাময়ী কামিনী চারি-তার-বিশিষ্ট মাণ্ডোলিন বাজাইতেছে, তাহার চক্ষু সলজ্জ ও ভূমিনিবিষ্ট, ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলের উপর দিয়া শুভ্রকুসুম-মাল্য ঘুরিয়া গিয়া সুচারু গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে লাল ফিতায় গ্রন্থিনিবদ্ধ হইয়াছে। লোহিত পুষ্পদ্বয় কর্ণভূষণের কায করিতেছে। পূর্ণায়ত সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য-বিধায়ক ওষ্ঠযুগল ললিতভাব-ব্যঞ্জক। ইহার পার্শ্বে একটি বালিকা মালা ধরিয়া আছে ও একজন সুপুরুষ যুবা তাহার দিকে চাহিয়া আছে। রোমীয় আর্ট গল কিংবা গথীয়দিগের যেরূপ আলেখ্য রচিত হইত, এও সেইরূপ। পুরুষের দক্ষিণহস্তে বক্ষের সম্মুখভাগে ধৃত একটী স্ফটিক পাত্র। তাহার পরেই একটী সুন্দরী লোহিতাভ দ্রাক্ষাগুচ্ছ ধারণ করিয়া আছে। তুর্কীস্তানে ও তৎসান্নিধ্যে অবস্থিত জনপদ-বাসীগণ জীবনের আস্বাদ পরিপূর্ণ ভাবেই লইতে শিখিয়াছিল। জীবনের আনন্দ-মদিরা পাত্র ভরিয়া পান করিয়া বিভোর হইয়া থাকার এই ছবি। ওমর খৈয়মের কথা মনে পড়ে না কি? পরে যে সব চিত্র আছে, তাহাতে গ্রীক অথবা লিভাণ্টের আর্ট প্রকট। ঐ ছবিগুলি

যে সিরিয়া অথবা রোমের কোন অধীনস্থ প্রদেশের ধ্বংস-বিশেষের মধ্যে না থাকিয়া তিনি চীন সীমান্তের কোন বৌদ্ধ মঠে আছেন!

উপরিভাগে জাতক-চিত্রে দেখিতে পাই —এক রাজপুত্র অশ্বারূঢ়, সম্মুখে চারিটী ধবলতুরঙ্গম-বাহিত রক্তবর্ণ রথ, একটী রূপসী ললনা সে রথ চালনা করিতেছেন, আর তাঁহার পার্শ্বে দুইটা বালক গহন কাননের নিদর্শন-স্বরূপ একটী ঘন সবুজ রঙের বৃক্ষ, তৎপার্শ্বে ধনরত্নমণ্ডিত সুসজ্জিত শ্বেতকুঞ্জর চিত্রিত হইয়াছে—যেন জীবন্ত! অতিশয় দক্ষতার সহিত কুঞ্জরের চোখে ও মুখের ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—উহার পশ্চাদ্ভাগের দক্ষিণ পাশে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর খরোষ্টি অক্ষরে দুই পঙ্‌ক্তি লেখা আছে। হস্তীর সম্মুখে একজন রাজপুত্র রহিয়াছেন, তাঁহার শ্রুতি, গ্রীবা, বাহু, মণিবন্ধ বহুমূল্য রত্নাভরণে মণ্ডিত। বামহস্ত দ্বিরদের শুণ্ডে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু। হিন্দু তথা বৌদ্ধ শাস্ত্র-মতে দান-কর্ম্ম পূতবারি-সহযোগে সিদ্ধ হয়। ইহাকে "দক্ষিণোদকম্" বলে। ভারুতচিত্রে অনাথপিণ্ডিক সঙ্ঘকে জেত-বনারাম দান করিতেছেন, হস্তে তাঁহার দক্ষিণোদকম্, ইহার পরের চিত্রে চারিজন সামান্তবেশ-পরিহিত ঘনকেশ-শ্মশ্রুলাঞ্ছিত সুদীর্ঘ দণ্ডধারী সন্ন্যাসী।

উপরি ও নিম্নভাগের চিত্র যে একই চিত্রকরের, তাহা উভয় চিত্রে সন্নিবেশিত রাজপুত্রের অঙ্কন হইতেই বেশ বুঝিতে পারা হইয়াছে—রোমীয় আর্টের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও শিল্পী তাহারই ভিতর স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন, তেমনি উপরের চিত্রে পারিপার্শ্বিক দুই-একটা ক্ষুদ্র বিষয়ে রোমীয় আর্টের অনুবর্ত্তন ভিন্ন মূল বিষয়-সম্বন্ধে ভারতীয় আদর্শ পারম্পর্য্য উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে ভরসা করেন নাই।

চিত্রের বিষয় সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না বলিলে জিনিষটা ভাল বুঝা যাইবে না। জাতক কথায় রাজপুত্র বেস্‌সান্তরের গল্প আছে—এস্থলে তাহাই চিত্রের উপজীব্য। শেষ বোধিলাভের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্ব বেস্‌সান্তর হইয়া জন্মিয়াছিলেন। জাতক গ্রন্থে ইহাই শেষ জাতক। যাঁহারা মূল পালি না পড়িয়া অনুবাদ পড়িতে জানেন, তাঁহারা Cowell এবং Rouse দ্বারা অনুবাদিত ৫৪৭ নং জাতক পড়িবেন। সংক্ষেপে কথাটা হইতেছে এই—জন্মিবার পর হইতেই রাজপুত্র খুব দানধ্যান করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অনুভাব-যুক্ত একটী শ্বেতকুঞ্জর ছিল; সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারিত। এক সময়ে কলিঙ্গ জনপদে অনাবৃষ্টিবশত অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়া বড় লোকক্ষয় হইতে লাগিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কলিঙ্গবাসীরা অবশেষে স্থির করিল যে তাহারা শিবিরাজ্যের রাজকুমার বেস্‌সান্তরের নিকট শ্বেতকুঞ্জর ভিক্ষা করিয়া নিজেদের দেশে বৃষ্টি করাইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য দ্বারা তাহাদের জীবন অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাই

তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী মাদ্রী ও বালকদুইটী তাঁহার পুত্র। কেশশ্মশ্রুপরিশোভিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট অশ্ব ও রথ ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছেন। তিনি একপ্রকার নিঃস্ব হইয়া পুত্রপত্নী-সমভিব্যাহারে নির্ব্বাসনে চলিলেন। সেখানেও তিনি পুত্রদ্বয়কে (মূল জাতকে পুত্র ও কন্যা) পূজক নামে এক ব্রাহ্মণের হস্তে দান করিলেন। পাছে স্ত্রীকেও এইরূপে দান করিয়া ফেলেন, সেইজন্য স্বয়ং শক্র (ইন্দ্র) ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া মাদ্রীকে ভিক্ষা চাহিয়া লইলেন; ও পরে তাঁহার দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রথ, পত্নী, পুত্র সব ফিরাইয়া দিলেন।

অন্যান্য চিত্র

টুন-হুয়াঙে আবিষ্কৃত চিত্রগুলির সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখানে ষ্টাইন সাহেবের আবিষ্কৃত কতকগুলি (canvas) অতিসূক্ষ্ম রেশম অথবা লিনেনের তৈয়ারী। বেণু-পেশিকালগ্ন রজ্জু দেখিয়া বোধ হয় যে সেগুলি মন্দির-চূড়াবলম্বী ধ্বজা। উহাতে দুই পার্শ্বেই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের চিত্র। বহুমূল্য রেশমের উপর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা কখনই নিম্ন অঙ্গের নহে—এ কথা বলিলে কোন দোষ হয় না। বাস্তবিকই চিত্রগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর পরিকল্পনার চিহ্ন জাজ্বল্যমান। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত কালে চীনের টা-ঙ রাজাগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ের তাঁহাদের রাজ্যের শ্রী, সমৃদ্ধি, ও সাধারণ উন্নতির সঙ্গে শিল্প-কলাও চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আসল চিত্রকলার নিদর্শনস্বরূপ সেই শিল্প-সামগ্রী চীন ও জাপান হইতে লুপ্ত হইয়াছে। যে চিত্রের কথা বলিতেছি, তাহা ঐ সময়ের। চিত্রাঙ্কনে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম মধ্য এসিয়ায় আসিয়া সমধিক রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেই ধর্ম্মের গ্রন্থান্তর-নিবিষ্ট বিষয়গুলিকে মডেল ধরিয়া লইয়া চিত্রগুলি অঙ্কিত হইলেও চিত্রকরগণ স্থানীয় শিল্পকলার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাজেই ঐ চিত্রগুলিতে স্থানীয় রঙের ছোপ লাগিয়া আছে। (৭)

কোথাও দেবগণ মিলিত হইয়াছেন, কোথাও বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ-বর্ণিত স্বর্গের দৃশ্য—এইগুলি বড় বড় ধ্বজায় অঙ্কিত। আর অন্যান্য পতাকাগুলির বিষয়,—কোথাও পৃথক পৃথক্ দেবতা রহিয়াছেন, আর কোথাও বা বুদ্ধদেবের

---

(৭) Cf.—The Buddhist art of China is on another footing, for notwithstanding it repeats the forms of Indian art, China had already an old, and from a technical standpoint, exceedingly accomplished art, and a profound philosophy of her own, before the Buddhist pilgrims and missionaries carried across the wastes of Central Asia the impulse to a new development of thought and of plastic art,··· Chinese Buddhist art is not entirely Indian but essentially a new thing, almost as much Chinese as Indian.—Coomaraswamy, *Buddha and the Gospel of Buddhism*, p. 328

জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যায়ক্রমে এক একটী করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত চিত্রগুলি সংখ্যায় কম হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব ও মনোহারিত্ব এবং শিল্পকলার চারুতার হিসাবে সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য!

বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বোধিদ্রুম-মূলে তাঁহার সম্বুদ্ধত্ব-লাভ করা পর্য্যন্ত, তাঁহার জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাগুলি অঙ্কন করিতে ভারতীয় চিত্রকরগণ ভাল জানিতেন। টুম হুয়াঙের শিল্পীগণও ঐ বিষয়গুলিই গ্রহণ করিয়াছেন। লুম্বিনি উদ্যানে গৌতমের জন্ম, শৈশব ও যৌবনের অতিমানুষ অদ্ভুত ঘটনাবলী, অন্তঃপুর-প্রাসাদের রম্য জীবন, চতুপূর্ব্বনিমিত্ত-দর্শন ও সংসার-ত্যাগের কল্পনা, নিদ্রিতা যশোধরা ও শিশুপুত্র রাহুলের নিকট নিঃশব্দ বিদায়-গ্রহণ ও প্রাসাদ-পরিত্যাগ, মহাভিনিক্রমণের অনুবর্ত্তী বিবিধ অবস্থা, ছয় বৎসর কঠোর তপশ্চর্য্যা, এবং নৈরঞ্জার নদীতীরে শেষ বোধিস-অবস্থার বিসর্জ্জন ও সম্বুদ্ধত্বের বিকাশ—এই বিষয়সমূহ অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মূর্ত্তি-তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ Foucher সাহেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"In short we meet again with almost the whole catalogue of episodes which have remained classic since the Greeco-Buddhist School of Gandhara. The most important point to note is *the frankly Chinese fashion in which these traditional subjects have been treated.* Under the hands of local artists they have undergone the same disguising transformation which Christian legend has under those of Italian and Flemish painters."

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য হয় যে চিত্রান্তর্গত বিষয়গুলি পরম্পর ক্রমে চলিয়া আসিলেও চীনা ছাঁচে তাহাদিগকে ঢালা হইয়াছে, জীবনের পরিবেষ্টনের মধ্য দিয়াই উক্ত বিষয়গুলিকে স্ফুরিত হইবার অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। চিত্রের প্রতিলিপি দিয়া আমার বক্তব্য বুঝাইতে পারিলেই ভাল হইত; তদভাবে সংক্ষেপে উহার বর্ণনা করিয়া কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

বেণুপেশিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় একটী ধ্বজাকে যেমন-তেমন করিয়া জোড় দেওয়া হইয়াছে। এই পতাকার উপরিতন অংশে বুদ্ধদেবের জননী মায়াদেবী স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন বুদ্ধদেব শ্বেতকুঞ্জর হইয়া তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন। মূল পালি গ্রন্থ "নিদান কথা" হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"অথ বোধিসত্ত্ব সেতবরবারণো হুত্বা— ততো অবিদূরে একো সুবন্নপব্বতো— তত্থ চরিত্বা ততো ওরূথহ রজত পব্বতম্ অভিরূহিত্বা উত্তরদিগতো আগম্ম রজত-দামবণ্ণায় সোণ্ডায় সেতপদুমম্ গাহত্বা কোঞ্চনাদম্ নদিত্বা কনকবিমানম্ পবিসিত্বা মাতু শয়নম্ তিক্খত্তুম্ পদক্খিণম্ কত্বা দক্খিণ সপ্গম তালেত্বা কুচ্ছিম্ পবিটঠসদিসো অহোসি।"

অনুবাদ।—"অতঃপর বোধিসত্ত্ব শ্বেত-কুঞ্জর হইয়া—তাঁহার অনতিদূরে একটা

সুবর্ণ পর্ব্বত ছিল—সেখানে চরিয়া তথা হইতে অবরোহণ করিয়া রজতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া উত্তরদিক হইতে আগমন পূর্ব্বক রজতবর্ণ শুণ্ড দ্বারা শ্বেতসরোরুহ গ্রহণ করিয়া ক্রৌঞ্চ নাদ করিয়া কনক-বিমানে প্রবেশ করিল; মাতার শয্যা বারত্রয় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দক্ষিণপার্শ্ব ভেদ করিয়া যেন কুক্ষিতে প্রবিষ্ট হইলেন।"

এই চিত্রের নীচেই মায়াদেবী চীনা-পরিচ্ছদ পরিহিত চারিজন লোকের স্কন্ধে স্থাপিত শিবিকারোহণে লুম্বিনি উদ্যান-অভিমুখে চলিয়াছেন। শিবিকা-বাহকগণের ত্বরিত গতি-ভঙ্গী চিত্রে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পরের চিত্র হইতেছে, লুম্বিনি উদ্যানে মায়াদেবীর কুক্ষিচ্যুত হইয়া বুদ্ধ-দেবের জন্ম। "সালসাখং গহেত্বা তিট্‌ঠমানায় এব চ অস্যা গব্‌ভবুট্‌ঠানং অহোসি।" শালশাখা গ্রহণ করিয়াই তিনি বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিলেন। এই চিত্রে ট্রাডিসনের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই বটে, কিন্তু গান্ধার শিল্পের আদর্শ রক্ষিতও হয় নাই। চীনাবেশ-পরিহিতা মায়াদেবীর জামার প্রকাণ্ড হাতা হইতে শিশুবুদ্ধ স্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন ইহাই চিত্রিত। এই প্রদেশে বুদ্ধদেবের জন্ম-গ্রহণ-প্রসঙ্গের একই পদ্ধতির অনুসরণ হওয়ায় নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায় যে স্থানীয় প্রভাবই বলবান্।

পরের দৃশ্যটী বড় মনোহর। শিশু বুদ্ধ 'চলি চলি পা পা' করিয়া বেড়াইতেছেন, ও যে যে স্থান তাঁহার চরণস্পৃষ্ট হইতেছে, সেই সেই স্থানে কমলদল ফুটিয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয় পতাকায় দুইটী চিত্র আছে —

সংসার-বন্ধনছেদনাভিলাষী ইন্দ্রিয়-সংগ্রাম-বিজয়ী বীর গৌতম গভীর নিশীথে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতেছেন, আর তাঁহার প্রমোদা-গারে চতুর হাব-ভাব-শালিনী বিলাসিনী কামিনীগণ নিদ্রায় চেতন-হারা—"একচ্চা পগ্ঘরিতখেলা, লালাকিলিন্নগত্তা, একচ্চা দান্ত খাদন্তিয়ো, একচ্চা বিপ্পল গণ্ডিকা, একচ্চা বিকটমুখা, একচ্চা অপগতবথা।' ইহা দেখিয়াই কামে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। দৈবপ্রভাবে রক্ষীবর্গ গভীর নিদ্রায় অভিভূত, চিত্রে উপরদিকে একখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে, তাহারই উপর বুদ্ধদেব প্রিয় তুরঙ্গম কণ্টকের পৃষ্ঠে চলিয়া-ছেন, আর সারথি ছন্দক পাশে পাশে। পর্ব্বত ও বনানীর রঙ দেখিলে কোন্ সময়ে তিনি নগর ত্যাগ করিতে ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিম্নের চিত্রে গৌতম গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই নিদারুণ সংবাদ-শ্রবণে রাজা শুদ্ধোধন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত যে চারিজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে রাজা ও মন্ত্রীর সমক্ষে তাহাদের বিচার হইতেছে, তাহাদিগকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধা হইয়াছে, পশ্চাতে রক্তাম্বর-পরিহিত দুইজন ঘাতক দাঁড়াইয়া আছে।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রের দেবদেবী, বোধিসত্ত্ব, লোকপাল, দ্বারপাল প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। তাহার পরিচয় দিতে গেলে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। প্রবন্ধান্তরে যে কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

গান্ধার আর্ট, গান্ধার আর্ট করিয়া অনেক বকিয়াছি, কিন্তু বিষয়টি কি, তাহা বলা হয় নাই। সে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতেছি। আচার্য্য কুমারস্বামী শিল্প-সম্বন্ধে একজন প্রামাণিক authority। এ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। তিনি বলেন, নিম্নলিখিত কারণে এই গান্ধার অথবা গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পের এইরূপ নাম-করণ হইয়াছে। নিষিণ্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি সম্পূর্ণ ভারতীয়; ইহা ব্যতিরেকে বৌদ্ধ দেবসমাজের যাবতীয় প্রধান আদর্শস্থানীয় মূর্ত্তিগুলি, যথা, দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি; অর্দ্ধশায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি বোধিসত্ত্ব ও অন্য বৌদ্ধদেবতার মূর্ত্তি, অথবা স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবন-দৃশ্যের আদর্শ রচনা-সমূহ তথা স্থাপত্য মণ্ডলের কতকগুলি ক্ষুদ্র বিষয়, হয় গ্রীক-রোমীয় মডেল-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা তদ্দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত। বাস্তবিক প্রাদেশিক রোমীয় কলায় একাংশই হইতেছে গান্ধার শিল্প, তবে এই রোমীয় কলার সহিত ভারতীয় উপাদানের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং ইহা দ্বারা বৌদ্ধ পুরাণকথিত বিষয়গুলির প্রকৃষ্ট স্ফুরণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পের ধরণ যে উত্তর কালের ভারত-বৌদ্ধ ও চীন-বৌদ্ধ শিল্পে সংক্রমিত হইয়াছে, তাহা অতি স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। (৮)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

মনের কুয়াসা

(১৯)

জ্যোতির্ম্ময়ী এইবার আপনার দিকে দৃষ্টি-পাত করিবার অবসর পাইল।—কি দুশ্চিন্তা, কি ঔৎসুক্যের মধ্যে সপ্তাহ কাল কাটিয়া গিয়াছে! এমন কি ব্যায়ামসমিতিকে পর্য্যন্ত এ কয়দিন তাহার মনে পড়ে নাই। এ কিরূপ তন্ময়তা! কই পিতার অসুখের সময় ত জ্যোতির্ম্ময়ী এতদূর কাতর হইয়া পড়ে নাই। তাহার লজ্জাসঙ্কুচিত মন উত্তর স্বরূপ কহিল,—"কোন কারণ ছিল না ত তাহার, পিতার ত জীবনসংশয় হয় নাই।—তবুও"—

ইহার অর্থ,—তবুও একজন অনাত্মীয় পরের জন্য এত কেন ভাবনা! প্রতিদিন ত রোগে তাপে পৃথিবীর কত লোক মৃত্যু

---

(৮) This art is so called, because apart from the seated Buddha form, which must of course, be wholly Indian, the leading types of the Buddhist pantheon—viz. the standing Buddha figure, the reclining type, the figures of Buddhi-Swatta and other Buddhist divinities, as well as the types of composition of some of the scenes of the Buddha's life, and likewise certain details of architectural ornament, are either directly based upon or strongly influenced by Greeco-Roman proto types. Gandhara art is in fact a phase of provincial Roman art mixed with Indian elements and adapted to the illustration of Buddhist legends. The influence of the western forms on all later Indian and Chinese Buddhist art is clearly traceable..."

গ্রাসে পড়িতেছে; কে কার জন্য এত ভাবে? এস্থলে মৃত্যুর কথাটা মনে আসিবামাত্র বালিকার মনের মধ্যে একটা কষ্টের শিহরণ উঠিল!

তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আহারাদির পর সোফায় শুইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্রাম করিতেছিল। পাশেই হাতের কাছে একটি ছোট টেবিলে,ফুলভরা ফুলদানী একটির চারিদিকে নানারকম কাগজ পত্র, বহি সাজান। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মধ্য হইতে একখানি থিয়সফিষ্ট পত্র টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। একটা প্রবন্ধ আগাগোড়া শেষ করিয়া তখন তাহার হুঁস্ হইল,—এক অক্ষরও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। পাঠিকার স্থূল অক্ষি বহির পাতায় নিবদ্ধ ছিল বটে—কিন্তু সূক্ষ্ম আঁখি ঘুরিতেছিল অন্য ঘরে। আজ ইচ্ছা করিয়াই প্রাতঃকালে শরৎকুমারকে সে দেখিতে যায় নাই,—ভাল আছেন ত তিনি! তিনি কি জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিতে চাহিতেছিলেন?

এ কিরূপ প্রশ্ন? সে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল বলিয়া তিনিও কি ব্যাকুল থাকিবেন? এ কি পিপাসা! এখন ত তিনি আরাম হইয়া উঠিয়াছেন—এখনো তাঁহার চিন্তাতেই সে মগ্ন কেন? তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য কেন সে এত তৃষাতুর? এ কি সর্ব্বগ্রাসী ভাব? ইহাই কি প্রেম?

ক্ষতি কি? প্রেমদেবতাকে মনে মনে পূজা করিতে ক্ষতি কি? কিন্তু ইহার পরিণাম? এই আকাঙ্ক্ষা—এই চিন্তা, এই পূজার পরিণাম; লোকে বলে বিবাহ।

হাতের বইখানা জ্যোতির্ম্ময়ী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।—"না তাহা হইতে পারে না—পারে না,—আমি জ্যোতির্ম্ময়ী,—চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—দেশের জন্য জীবনদান করিয়াছি—আমি ব্যক্তি বিশেষের পরিণীতা পত্নী!—অসম্ভব,—অসম্ভব!" একবার সে অতি চুপে চুপে—স্বগত উচ্চারণ করিল—"মিশেষ চৌধুরী—" তাহার চিন্তা-মলিন মুখে সহসা একটা কৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘরের বারান্দায় খাঁচায় রক্ষিত পোষা কোকিলটি এই সময় কুহু কুহু করিয়া উঠিল, বাহিরের আম-বাগানে দুই চারিটা কোকিল এক সঙ্গে ইহার উত্তর গাহিল; সহসা—কুহু কুহুতানে আকাশ ভরিয়া গেল।—জ্যোতির্ম্ময়ী মনে মনে বলিল,—"বনের পাখী তোমরা খাঁচার পাখীকে ধরা দিতে চাও ত দাও, আমি কিন্তু ধরা দিব না।" সে প্রতিজ্ঞা করিল আজ সন্ধ্যাতেও শরৎকুমারকে দেখিতে যাইবে না। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী ফুলদানীর একটি ফুল তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ করিল। ঠিক দুইটার সময় কুন্দ গৃহে আসিয়া হাজির হইল। আজই সকালে সে বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে। হাসির চিঠিখানা, রাজকুমারীর হাতে দিয়া কহিল—

"এই নিন্ রাজকুমারি। চিঠিখানি আপনার হাতে ধরে দিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি। আজ দায়মুক্ত হলুম।"

জ্যোতির্ম্ময়ী চিঠিখানা গ্রহণ করিলেন, কুন্দ থিয়সফিষ্টখানা কুড়াইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, আলমারি খুলিয়া রাজকন্যার বৈকালিক সাজসজ্জার আয়োজনে রত

হইল। আজ তাঁহাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চা-পানের নিমন্ত্রণ।—

হাসির চিঠিখানা পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন—

"সুগুণা দেবী—কে কুন্দ? আমাকে তিনি এত প্রশংসা করে লিখেছেন—লজ্জা করে যে।"

কুন্দ বলিল—"ও আমাদের হাসি। সকলে ওকে হাসি ব'লেই ডাকে। এমন সুন্দর মেয়েটি, কি বলব! আপনি যদি দেখেন রাজ-কুমারি ত আপনিও নিশ্চয়ই ভালবাসবেন।"

শরৎকুমার প্রলাপের ঘোরে যে হাসির নাম উচ্চারণ করিতেন, সেই হাসি নয় ত এ? একটা কিরূপ অস্বস্তি চাঞ্চল্য রাজকন্যার মন দিয়া বহিয়া গেল? ইহা কি ঈর্ষার আন্দোলন?

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"বিয়ে হয়নি বোধ হয় তাঁর?"

"না। কোন বরকেই যে তার বাপমার মনে ধরে না। যা হ'ক এবার শুনছি—একটি মনের মত পেয়েছেন,সম্বন্ধ চলছে তার সঙ্গে।"

"কে সে ভাগ্যবান?" জ্যোতির্ম্ময়ীর বক্ষে শোণিতপ্রবাহ সহসা বন্ধ হইয়া গেল,—এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎকুমারের নাম শুনিবার জন্য সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। কুন্দ বলিল—"তিনি আপনাদেরই আত্মীয়, বিজনকুমার রায়।"

বালিকার রুদ্ধ নিশ্বাস ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করিল,—সে হাসিয়া কহিল—"তা বেশ, হ'লে মন্দ হয় না! আমি বরণ করে কনেকে ঘরে তুলে নেব। তোমাদের

"জানিনে ঠিক, একটা কোন দূর সম্পর্ক থাকতে পারে। কই তার কথা ত হাসির কাছে কখনও শুনি নি। তবে আমার সঙ্গে হাসির দেখা শুনা খুব কমই হয়—বেশী কথা কবার অবসরই ঘটে না।"

"সম্বন্ধের কথা কার কাছে শুনলে?"

কে জানে কেন জ্যোতির্ম্ময়ীর মন বলিতেছিল খবরটা ঠিক নয়।

কুন্দ কয়েকখানা কাপড় ও জ্যাকেটের সুট মিলাইতে মিলাইতে বলিল—

"ও কথা অবশ্য হাসির কাছে শুনিনি। বিদায় নিতে যাবার সময় দিদিমা বলে-ছিলেন।—বিকালে কোন্ কাপড়খানা পরবেন রাজকুমারি?"

"দেখ কুন্দ, কতবার তোমাকে বলেছি—ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, তোমার যেখানা ইচ্ছে—"

"না না বলুন রাজকুমারি—কোন্‌খানা পরবেন?"

"আচ্ছা শাদা রঙের যা হয় একখানা রাখ।"

"রাজা বাহাদুর কিন্তু রঙিন কাপড়ই পসন্দ করেন।"

"তবে তাই রাখ।"

"ফিকে নীল বা গোলাপী কি দেব?"

"তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না! আচ্ছা—নীলই রাখ। চিঠিখানা পড়েছ কুন্দ?"

"না। মতিরমালা-ছড়াই পরবেন শুধু?

"সে হবে এখন কুন্দ; চিঠিখানা আগে পড় না! কলকাতায় গিয়ে সর্ব্বাগ্রে এবার

"তখন সে আপনারও হাসি হয়ে যাবে।"

"মতির মালা ও ব্রেসলেট আপনার জন্তে বার করে রাখছি।—অন্ত কিছু ত আপনি পরেন না।" এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী হাসির চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"এই নেও।"

কুন্দ নিকটে আসিয়া পত্রখানা লইয়া তাহাতে নেত্রপাত করিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"চেঁচিয়েই পড়না—" কুন্দ পড়িতে লাগিল—

সম্মানীয়া রাজকুমারি—

আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই, কিন্তু আপনার গুণের কথা এত শুনিতে পাই—যে না দেখিয়াও আপনাকে ভাল বাসিয়াছি। আপনাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। যখন কলিকাতায় আসিবেন—একবার যদি দেখা দেন ত পরমানন্দ লাভ করিব। সত্য কথা বলিতেছি, বিশ্বাস করিবেন।

ইচ্ছা করে আপনার নিকট আমিও দেশব্রতমন্ত্র গ্রহণ করি,—আমার শক্তি অতি সামান্ত কিন্তু আপনার মত গুরুর উপদেশে সেই ক্ষুদ্র শক্তিও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

আপনি বয়সে ছোট হইয়াও জ্ঞান বুদ্ধি ও শক্তিতে আমার অনেক বড়, তাই পরিপূর্ণ প্রীতিভক্তি ভরে আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে ছোট বোন বলিয়াই মনে করিবেন।

আপনার গুণমুগ্ধা ভগিনী—
শ্রীসুগুণা দেবী

পুঃ

শর-দা যদি এখনো সেখানে থাকেন ত আমার নমস্কার দিবেন।

চিঠিখানি পড়া হইলে কুন্দ তাহা রাজকন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল—"সুন্দর লিখেছে; চিঠিখানি পড়ে হাসিকে যেন ঠিক চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি।"

"ভাষার ঘনঘটা নেই এইটে আমার বড় ভাল লেগেছে।"

"কেবল কি তাই? চিঠিখানি আগাগোড়া আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ—আমার সেইটেই বেশী ভাল লাগছে।"

"এই শ্রদ্ধা দিয়ে তিনিই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন?"

"যেমন গঙ্গা জলে গঙ্গাপুজো সেইরকম আর কি!"

"এ উপমা এখানে ঠিক সঙ্গত হোল না কুন্দ, পণ্ডিত মশায় শুনলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন—"

এই সময় একজন দাসী "পণ্ডিত মশয় আইছেন গো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিল। বাঙ্গালী ঘরে, রাজা সম্রাটের আলয়েও দাসী চাকরের আদব কায়দার বড় একটা আড়ম্বর দেখা যায় না। পণ্ডিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া কুন্দ বলিয়া উঠিল, "নাম করতেই হাজির তিনি, লোকটার আয়ু দেখছি অনেক—"

জ্যোতির্ম্ময়ী দাসীকে বলিল—"আচ্ছা লক্ষ্মীর মা, তোমাকে কতবার বলেছি অত চেঁচিয়ে কথা কবে না,—কিছুতে কি শিক্ষা হবে না তোমার?"

লক্ষ্মীর মা শিরে করাঘাত করিয়া কহিল—"হায়রে কপাল! মারে তোমার ঘরে আইনা শিখাইলাম আমি—আর আমারে

খুকী, পলতে দিয়া যারে কত দুধ খাওয়াইছি! কলিকালই হইছে।"

"বেশ বেশ আর বকতে হবে না, নাকি-গান আমার ভাল লাগে না। যাও পণ্ডিতমশায়কে বল গিয়ে আমরা আসছি এখনি।"

লক্ষ্মীর মা তবুও বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সোনার তাগা পরা হাত দুলাইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোনার কণ্ঠমালা ও কোমরের রূপার চাবি শিকলিও দুলিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে কুন্দর সহিত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এই সময় অনাদির আবির্ভাব হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজ-কন্যার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—প্রথমেই মনে হইল—"ভাল আছেন ত তিনি?" কিন্তু কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই অনাদি কহিল —"একটা কথা আছে দিদিমণি।" রাজ-কন্যা কুন্দকে বলিলেন "যাও কুন্দ তুমি পণ্ডিত-মহাশয়ের কাছে বসে একটু গল্প কর গে—আমি এখনি আসছি।" কুন্দ চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ী কণ্ঠাগত ভাষা রসনামুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—"ডাক্তারদা ভাল আছেন ত অনাদি দা?"

"হ্যাঁ ভাল আছেন,—কিন্তু তুমি আজ সকালে তাঁকে দেখতে যাওনি—তাই তিনি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবছেন—তোমার বুঝি কোন অসুখ করেছে—তিনি তোমাকে দেখতে আসতে চান।" জ্যোতির্ম্ময়ীর পণ ভঙ্গ হইল—বলিল—"না না তাঁর আসতে হবেনা—চল আমি এখনি তাঁকে একবার দেখে আসি।"

পণ্ডিত-মহাশয় যে তাহার অপেক্ষায় আছেন সে-কথা জ্যোতির্ম্ময়ী একেবারেই ভুলিয়া গিয়া অনাদির অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিল।

রাজকুমারী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র—তাহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে শরৎকুমার শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অসুস্থতার পর এই প্রথম তাঁহার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস। তাঁহার পা কাঁপিয়া উঠিল; দেহ ঈষৎ টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু এই কম্পন কি কেবলই দুর্ব্বলতাজনিত, কিম্বা আনন্দের অধীরতাও ইহার মধ্যে অনেকখানি লুক্কায়িত ছিল? রাজকুমারী উদ্বিগ্নভাবে অনুনয়ের স্বরে বলিলেন "কি করেন ডাক্তারদা,—বসুন বসুন—দাঁড়াবেন না?'

"আমি ভাল হয়ে উঠেছি রাজকুমারি।"

"তবুও বসুন; এখনো বিছানা থেকে ওঠবার অবস্থা আপনার ঠিক হয়নি,—পা কাঁপছে আপনার।"

"আপনি বসুন আগে।" প্রত্যুত্তরে এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া রাজকুমারী আর কথা বাড়াইলেন না; শরৎকুমারের শয্যার নিকটেই তাঁহার জন্য অনাদি একখানি চৌকি আগে হইতেই রাখিয়া দিয়াছিল সেইখানিতে বসিয়া পড়িলেন। শরৎকুমার তখন শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"আপনি সকালে আসেননি—তাই মনে হচ্ছিল—"

শরৎ হঠাৎ থামিয়া গেলেন, রাজকুমারী বলিলেন—"না আমার কোন অসুখ করেনি,—ভালই আছি।—আপনি ত ভাল হয়ে উঠেছেন—তাই আর—"

রাজকুমারীরও কথাটা এইখানে বাধিয়া গেল—কেননা—যাহা বলিতে যাইতে ছিলেন,—তাহা সত্য নহে। শরৎকুমার তাঁহার পালায় রাজকন্যার অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া কহিলেন—

"তাই আর আসার দরকার মনে করেন নি?" বলিতে বলিতে তাঁহার রুগ্ন মুখ—একটা ব্যথার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়-তন্ত্রীতেও সে বেদনার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে হাসির চিঠিখানা শরৎকুমারের হাতে দিয়া বলিলেন "দেখুন দেখি চিঠিখানা পড়ে ডাক্তারদা; আপনার ভাল লাগবে মনে করে এনেছি।"

শরৎকুমার চিঠিখানি গ্রহণ পূর্ব্বক পড়িয়া রাজকন্যার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন—"যিনি লিখেছেন—তিনি দেখছি গুণগ্রাহী।"

"তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন—দেখেছেন ত, কি উত্তর দেব?"

"ফিরিয়ে দেবেন নমস্কারটা।" এমন ঔদাসীন্যের সহিত কথাটা শরৎকুমার বলিলেন—যে জ্যোতির্ম্ময়ীর পূর্ব্বগঠিত বিশ্বাস বেশ-একটু টলমল করিয়া উঠিল। বলিল—"চিঠি পড়ে ত মনে হয়—আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তা আছে।"

"ভুল আপনার।—মোটেই না।" বিদায় দিনে হাসির প্রত্যাখ্যানের কথা মনে জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু আজ আর সে স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল না। শরৎকুমার নিজেই যেন তাহাতে একটু বিস্মিত হইলেন। —জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল "আপনার আত্মা কিন্তু চুপি চুপি অন্য কথাই প্রকাশ করেছে।"

"কি রকম?"

"অসুখের সময় অনেক বারই হাসির নাম আপনার মুখে শুনেছি।"

শরৎকুমারের রক্তহীন পাংশুমুখে সহসা লজ্জার আভা চমকিয়া গেল। "সত্যি না কি? প্রলাপের ঘোরে কি কথা না জানি শরৎকুমার বলিয়াছেন—আর রাজকুমারী তাহা শুনিয়া কি না জানি মনে করিয়াছেন, ছি ছিঃ!" সব কথা রাজকন্যাকে খুলিয়া বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু চন্দ্রালোকে বা ম্লান দীপশিখার নিকট বসিয়া যে সব কাহিনী বলা যায়,—দিনের ফ্যাক্ ফ্যাকে উজ্জ্বল আলোক তাহার পক্ষে প্রতিকূল।—তাহা ছাড়া অনাদি ছোকরা ঘরের কোণে বসিয়া আছে, যদিও সে নভেল পাঠে মগ্ন—তবুও ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে উপস্থিত।

শরৎকুমার মৌন হইয়া রহিলেন—তাঁহার ভাষা এই সঙ্কটের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল,—ঘড়িটাও কি ছাই এই মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতিকূল হইবে—সশব্দে এই সময় ৪টা বাজিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "উঠি তবে আজ, ৪টে বেজে গেল, আমাদের আবার আজ চায়ে যেতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন—এখনো দুর্ব্বল আছেন।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বালিকা চলিয়া গেল। শরৎ চোখ বুজিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন! একটা কষ্টের অবসাদে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর একান্ত ক্লান্তিপুর্ণ হইয়া উঠিল। যে সত্য এতদিন তাঁহার নিকট লুকায়িত ছিল—আজ তাহাতে

তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন,—তিনি বুঝিলেন,—অসুখের পূর্ব্বে যে-তিনি ছিলেন—আজ সে-তিনি নাই। হাসির যে হাসিটুকু তিনি এতদিন হৃদয়নিভৃতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন আজ ত আর তাহার সন্ধান পাইতেছেন না! জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃসাগরে তাহার শেষ রশ্মিটুকুও যে সহসা মিলাইয়া পড়িয়াছে!—কেমন করিয়া কোন্ মুহূর্ত্তে এ ঘটনা ঘটিল তাহা তিনি বুঝিলেন না,—এইটুকু শুধু বুঝিলেন—যে জ্যোতির্ম্ময়ী এখন তাঁহার মনে একমাত্র জাগ্রত দেবতা!

অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর উপহাস! তিনি হাসিকে ভুলিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এমনি করিয়া তপ্ত হইতে তপ্ততর অনলদাহের মধ্যে ডুবিয়া কি? হাসিকে যখন তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন—তখন তাহাকে দুষ্প্রাপ্য মনে করেন নাই, সেইজন্ত তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে কখনও তাঁহার কুণ্ঠা বোধ হয় নাই,—কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী যে তাঁহার পক্ষে একান্তই দুর্ল্লভ বস্তু; তাঁহার কাছে আত্মবেদনা জানাইতেও যে সাহস নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্গের তারকা—আর শরৎকুমার মর্ত্ত্যের মানব! চিরদিন এই অনলদাহ নীরবে তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে বহন করিতে হইবে যে।

"ভগবান এমন নিষ্ঠুর তুমি! অথবা ইহাই তোমার করুণা? গৃহী হইবার জন্ত আমাকে তুমি সৃষ্টি কর নাই। এ জীবন পরার্থে দান করিতেই তুমি ইঙ্গিত করিতেছ। তাহাই হউক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক,—বল দাও প্রভু বল দাও।"

(২০)

জ্যোতির্ম্ময়ীও বেশ স্বচ্ছন্দমনে গৃহে ফিরিল না। অন্য দিন শরৎকুমারের অজ্ঞাতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বিকিরণ হইতে সে যে কণিকারাশি কুড়াইয়া আনে সেই আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখে,—কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তে একটা অন্ধকার বেদনা ভার লইয়াই সেখান হইতে সে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহাদের দুজনের মধ্যে এ কি কুয়াসার ব্যবধান আজ! তাহার অন্তরতম প্রাণ "হায় হায়" করিয়া উঠিল,—কিন্তু সে তাহাকে সবলে কশাঘাত করিয়া—শাসন বাক্যে বারবার করিয়া কহিতে লাগিল—"ভালই ত সে ভালই! রে অবোধ মন,—তুমি এতদিন যাহা চাহিয়াছিলে—ভগবান আজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন,—এখন দুঃখ করিলে চলিবে কেন? তাঁহার মঙ্গলদান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সুখ অনুভব কর। ব্যক্তি বিশেষের জন্য হা হুতাশ করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তুমি দেশের কাজে জীবনদান করিয়াছ ইহা ভুলিও না গো—ভুলিও না।"

গৃহে ফিরিয়া দেখিল—কুন্দ উপস্থিত নাই,—যে দাসী তাহার অপেক্ষায় ছিল—সে বলিল—"কুন্দ-দিদি এসে চলে গেছেন,—আপুনি এলে ডাকৃতে বলেছেন—" জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল "না ডাকৃতে হবে না—।" দাসী কাঁকুইখানা লইয়া তাহার চুল আঁচড়াইতে গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে নিরস্ত করিয়া নিজেই তাড়াতাড়ি কোনরূপে দীর্ঘ কেশ-দাম সংবৃত করিয়া ফিরাইয়া বাঁধিয়া লইল

তাহার পর যথাসাধ্য বিনাড়ম্বরে—এবং অল্প সময়ের মধ্যে সাজপর্ব্ব সমাধা করিয়া লইয়া পিতার নিকট ছুটিল। যাইবার সময় দাসীকে বলিয়া গেল— "পণ্ডিত-মহাশয়কে গিয়ে বল আজ আর পড়ব না,—তিনি ঘরে যেতে পারেন।"

পিতৃকক্ষে আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল, রাজা তখনো প্রস্তুত নহেন, তিনি বেশ মগ্ন ভাবেই খাতার উপর কলম চালাইতেছেন। তাহার জন্য পিতা অপেক্ষা করিয়া নাই দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইল,—কোন কথা না কহিয়া ধীর পদে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। রাজা তখন মুখ তুলিয়া, ঘড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"তাই ত! ৪টে বেজে গেছে যে? আচ্ছা তুই একটুখানি অপেক্ষা কর্ রাণি, আমি এখনি আসছি।" তিনি পাশের ঘরে কাপড় ছাড়িতে গেলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল,—টেবিলের উপর খুব দামী ফ্রেমে আঁটা—কালীঘাটের দুই পয়সা মূল্যের একখানি কালীর পট। সেই ছবিখানি হাতে লইয়া বালিকা মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিল।—

এ কি ভীষণ মূর্ত্তি জগদম্বা প্রকৃতির! শিবকে পদদলিত করিয়া তিনি এখন অশিবা! মধুর প্রেমমিলনকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি এখন ভয়ঙ্করা,—নিষ্ঠুরা! কিন্তু প্রকৃতির পক্ষে এই নিষ্ঠুর ভাবেরও যে প্রয়োজন। প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই অন্যায় দমনকারিণী প্রকৃতি এখন মুণ্ডমালিনী, ভীমা।

দেয়ালে আধুনিক কোন চিত্রকর-অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির একখানি পট টাঙ্গান ছিল। একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিল। বিশ্বমাতার এই স্নেহ করুণারূপিণী ভাব কি সুন্দর!—তাঁহার এই ভুবনমোহিনী মাধুরীই ত প্রয়োজনে করালী কালীরূপে রূপান্তরিতা হইয়াছে! বালিকার জীবনের মধুর ভাবও প্রয়োজনের পদতলে এইরূপ বিসর্জ্জন দিতে হইবে,—মাতৃরূপা হইবার সৌভাগ্য লইয়া সে জন্ম গ্রহণ করে নাই!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল মধুর স্বভাবের অংশে একটা দারুণ শিহরণ উঠিল,—সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। রাজা সেই সময় প্রস্তুত হইয়া দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, —"ঐ পটখানি মা আমাকে বাঁধাবার জন্যে দিয়েছিলেন, বেঁধে এসেছে, তাঁকে পাঠাতে ভুলে গেছি।" জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি টেবিলে রাখিয়া কহিল,—"এখন এইখানেই থাক্। ফিরে এসে আমি ঠাকুরমার কাছে নিজেই এখানি নিয়ে যাব।"

মোটরে চড়িয়া রাজা জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন—"ওঃ একটা খবর তোকে দেওয়া হয় নাই। একটু আগে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় পেয়েছি। মকদ্দমায় আমাদের জিৎ হয়েছে। অনাদি ও শরৎ বেকসুর খালাস।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিল, "আমি ক্লাউডেন সাহেবকে প্রাণ ভ'রে ধন্যবাদ দেব। জানতুম যদিও যে জিৎ আমাদের হবেই, আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট যথার্থই ধর্ম্মাবতার—তাঁর কাছে অবিচার নেই।"

"না না—এ কথা আমাদের তরফ থেকে ওঠান ঠিক হবে না। দেখছ না এই

মকদ্দামা তাঁর হাতে গিয়ে অবধি আমি সেখানে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করেছি। তবে যদি তাঁরা একথা তোলেন—তখন ধন্যবাদ দিতে দোষ নেই।"

তাঁহারা যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানে টেবিল চৌকি পাতা,—চায়ের আয়োজন,—বাহিরের লোকও আজ এখানে কেহ নাই, পিতা কন্যাকে দেখিয়া উভয়েই সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেম সাহেব নূতন বাংলা শিখিতে ছিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ীকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন "তোমাকে বড় অধিক দেখ্‌তে ইচ্ছা করছিলাম, আমার প্রিয়তম সন্তান। (My deerest child) ঠিক হইল কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল,—"খুব ঠিক হয়েছে মাদার।" জ্যোতির্ম্ময়ী ইঁহাকে মাদার বলিয়াই সম্ভাষণ করিত। মেম সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে বাহুপাশ হইতে মুক্তিদান-পূর্ব্বক সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া পেয়ালাতে চা ঢালিতে ব্যস্ত হইলেন। সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সমিতি কেমন চলছে my deer girl?"

সে যে এ কয়দিন সমিতির খোঁজ লয় নাই—সে কথা প্রকাশ না করিয়া কহিল—"ভালই।"

"আর উৎসব দিনের সেই hero—ডাক্তার চৌধুরী তিনি কেমন আছেন?"

এই প্রশ্নে রাজকন্যার মুখ ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে উত্তর করিল—"তিনি সেরে উঠেছেন।" কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার লজ্জারাগ লক্ষ্য করিলেন না,—তিনি চাপূর্ণ পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইয়া—রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এমন পচা মকদ্দামা আমার কাছে জীবনে আসে নাই! কি করে যে মুন্সেফ তাকে জিতিয়ে দিলেন!"

রাজা নীরবে হাতের পেয়ালা হইতে সন্তর্পণে—বেশ সুন্দর কায়দার সহিত একটুখানি চা মুখে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী দস্তুরে পেয়ালার চামচখানা এ সময় একরকম অনাবশ্যক শোভাস্বরূপ। চিনি ঘাঁটার কাজে লাগা ছাড়া ইহা চাপানের কাজে লাগে না। দুএকবার চা মুখে লইবার পর রাজা বলিলেন, "কিন্তু সুজন রায়ের দল—আপনার নামে নানা কথা রটনা করবে।"

"Indeed! কিন্তু সেই ভয়ে ত আমি ন্যায়-বিচারের অপমান করতে পারিনে।" জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখকান্তি একটি অপ্রাকৃত জ্যোতিঃসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে গম্ভীরভাবে কহিল—"আপনার এই ন্যায়পরতা জগতের অস্থি মজ্জায় স্থান পাক্ সর্ব্বান্তঃকরণে আমি এই প্রার্থনা করি।" জ্যোতির্ম্ময়ীর বাল্যোচিত সরল উৎসাহে মুগ্ধ হইয়া—ক্লাউডেন সাহেব তাহার পিঠে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিলেন—"Thank you, dear girl—"বলিয়া পত্নীর দিকে চাএর পেয়ালাটা বাড়াইয়া দিলেন। মেমসাহেব তাঁহার পেয়ালা পূর্ণ করিয়া দিয়া রাজাকে কহিলেন, "আপনার পেয়ালাটি রাজা বাহাদুর?" রাজার পেয়ালাও তখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল তিনি মেম-

তাঁহাকে চা ঢালিয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার আধ পেয়ালা চা-ও ত এখনো শেষ হোল না,—আর কখনো যে শেষ হবে না তাও জানি।"—তিনি কতকগুলি চকোলেট মিষ্ট জ্যোতির্ম্ময়ীর 'পিরিচে' তুলিয়া দিলেন। সাহেব বলিলেন—"ঠিক হয়েছে—sweets to the sweet."

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল—"আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি—মিষ্টার ক্লাউডেন?"

সাহেব হাসিয়া কহিলেন—"By Jove, —তুমি কখনই ছেলেমানুষ ছিলে না—তুমি একজন born sage,—একটি ক্ষুদ্র লামা।"

রাজা বলিলেন—"ঠিক বলেছেন মিষ্টার ক্লাউডেন,—জানেন, ও যখন তিন বছরের মেয়েটি,—তখন আমাকে কি রকম জব্দ করেছিল?"

শৈশবে নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কিরূপ অটল ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী রাজার সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, রাজা সেই গল্পটি করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল—"জানেন মিষ্টার ক্লাউডেন, আমি আমাদের দেশের স্ত্রী-জাতির 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করেছিলুম।"

"হ্যাঁ ঠিকই করেছিলে, বিজ্ঞব্যক্তির (sage) মতই কাজ।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কহিল—"হ্যাঁ, যেমন দেশের লোকের সহস্র অনুরোধ অগ্রাহ্য করে গভর্ণমেন্ট—বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে নিজের প্রেষ্টিজ রক্ষা করতে যাচ্ছেন—।"

কথার গতি ফিরিল—ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "বঙ্গবিভাগে ত আমি ক্ষতি বুঝি না—তবে দেশের লোক যখন এই বিভাগের বিরোধী —তখন গভর্ণমেণ্টের এ থেকে নিরস্ত হওয়াই উচিত!"

রাজা কহিলেন "আমাদেরও ত আপত্তির প্রধান কারণ আপাততঃ তাই। যদি গভর্ণমেন্ট আমাদের আবেদন গ্রাহ্য না করেন তাহলে আমরা বিদেশীপণ্য বয়কট করব—"

এই কথা লইয়া তাঁহারা যুক্তিতর্কে পরামর্শে মাতিলেন। মিশেষ ক্লাউডেন এই অবসরে জ্যোতির্ম্ময়ীকে তাঁহার বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন,—খানসামা চায়ের সরঞ্জাম উঠাইয়া লইয়া গেল।

আশ্বিনের আরম্ভ। বাগানের কেয়ারিতে, রাস্তার পটিতে রকম বিরকম বিলাতি ফুলের বসন্ত বাহার জমিয়া নাই। জিনিয়া দোপাটি প্রভৃতি দুইচারি রকমের ফুল সবে মাত্র এখন অল্প অল্প ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোলাপফুলই এখন ফুলবাগানের প্রধান শোভা। কিন্তু জয় এ-সময় সবজি বাগানেরই। কপি, শালগম, বিট, গাজর, পেঁয়াজ মটর প্রভৃতি নানাবিধ তরকারীতে মিশেষ ক্লাউডেনের সবজি-বাগান ভরপুর। ফুলবাগান ও সবজিবাগানের মধ্যস্থিত বাঁশের খিলান-দরজার উপরে 'মার্সেল নিল' গোলাপ লতা ফুলে ফুলে ভরা। এই লতা-গাছ জ্যোতির্ম্ময়ীর উপহার। রাজবাগানের দুইটি কলম আনিয়া একবৎসর পুর্ব্বে নিজের হাতে সে খিলানের দুই প্রান্তে পুঁতিয়া গিয়াছিল। মেমসাহেবের যত্নে এত শীঘ্র সেই কলম দুইটির এমন মধুর রূপ। এখনো প্রত্যহ তিনি এই গোলাপগাছে স্বহস্তে জল সিঞ্চন করেন। তাঁহাদের দেখিয়া মালী ছোট জল পাত্র

একটি আনিয়া ধরিল। এই জলপাত্র লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। মালী বেগতিক দেখিয়া আর একটি বোমা আনিয়া দিল। উভয়ে বয়স্যার মতই হাসি গল্পে, বিবাদ কৌতুকে বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাগানের আশে পাশে ক্রমশ হাসনুহানা ও রজনীগন্ধার দলও খুলিতে আরম্ভ করিল। মিশেষ ক্লাউডেনের স্নেহাদরপূর্ণ, মুক্ত বায়ুসুবাস—নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের অস্বচ্ছন্দ ভাব-প্রফুল্লতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। হৃদয় স্বভাব স্বচ্ছন্দ মুক্তির ছন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিছু পরে রাজাবাহাদুরের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইখানে আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা বলিলেন—"রাণি, কলকাতা থেকে আজ ম্যানেজারের আসার কথা আছে, একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে চাই।"

জ্যোতির্ম্ময়ী একবার আকাশের দিকে চাহিল, পশ্চিমে নদীর পরপারে সূর্য্যদেবের ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত তপস্বীমূর্ত্তি, তৎবিকীর্ণ আলোকে দিগ্‌দিগন্ত লালে লালে সমুজ্জল; নদীর জল বিদ্যুৎকণায় প্রবাহিত। জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—কে জানে কেন? তাহার কি হঠাৎ শরৎকুমারকে মনে পড়িয়া গেল?

মেমসাহেব ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন,—"এখনি যাবেন রাজা-সাহেব?"

রাজা আবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—"একটু দরকার আছে মিশেষ ক্লাউডেন,—নইলে এমন সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই এখনি!" ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি উভয়েই গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন। মেমসাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে পুনরায় সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন।

ফিরিবার বেলা রাজা নিজে মোটরের কল ধরিলেন। শরতের দিন, সূর্য্য এখন দিগন্তনিম্নে, তবুও সায়াহ্নগগন উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান! বিলাতের twilight কি এই রকমই?

ম্যাজিষ্ট্রেটের কম্পাউণ্ড ছাড়াইয়া রাজা আর একবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন—"মিনিট পাঁচেক আমরা আস্তে যেতে পারি।" নদীর ধার দিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিলেন। ওপারে কাশফুলের কি সুন্দর শোভা! মাঝে মাঝে বাতাস শেফালিফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতে লাগিল, একজন মালী কেতকীফুল মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছিল, তাহার সৌরভ পথে ছড়াইয়া দিয়া গেল। নদীর ধারে একটি বটগাছের তলায় একখানা সিন্দূরলেপিত প্রস্তর মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তি কাহার স্থাপনা কেহ জানেনা। পথিকজন অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি বলিয়া ইহাকে প্রণাম করিয়া যায়।

এই প্রস্তর সন্নিধানে বসিয়া একজন ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল—

মঙ্গল শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে—
এলেন আনন্দময়ী ভুবন আলো করে!
আজি আলোকে ঝলকে আনন্দ,
বহে কুসুমে মধুর গন্ধ
উথলে দিকে দিকে গীতিছন্দ,
বরষ দিবস পরে।

রাজা গাড়ী থামাইয়া চাপরাশিকে দিয়া

গানটি রাজারই রচিত। প্রথম যে আশ্বিনে তাঁহার দুই কন্যা শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃ ভবনে আসিয়াছিল; সেই সময় তিনি এই গানটি রচনা করেন। পুরাতন কত স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত; তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী পাশ হইতে তাহা দেখিতে পাইল না। গানটি শুনিতে শুনিতে সে বলিয়া উঠিল—"আশ্বিন মাস পড়েছে বুঝি ?"

রাজা চক্ষের জল—চক্ষেই ধরিয়া লইয়া কহিলেন "রাণীর কাছে বুঝি সে খবর এখনো পৌঁছয় নি।" রাণী হাসিয়া পিতাকে আদরের বাহুপাশে জড়াইল,—রাজা পুরাতন দুঃখ ভুলিয়া গেলেন।—চাপরাশী ফিরিয়া আসিলে তিনি এবার মোটার সতেজে চালাইয়া দিলেন।

ম্যানেজার যে কাজের জন্য আসিতেছিলেন,—তাহার কাগজ পত্র সব ঠিক আছে কি না—তাহা দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া রাজা প্রথমেই গেলেন দপ্তরখানায়, আর জ্যোতির্ম্ময়ী কালীর পট লইবার জন্য গেল রাজার ঘরে। কাছেই থাকেন শরৎকুমার,—হয় ত বা এখন তিনি বারান্দাতেই আসিয়া বসিয়াছেন,—একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাতের কালী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সেই বিষম পিপাসাও সে সবলে চাপিয়া গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। সেখান হইতে আপনার ঘরে গিয়া বৈকালিক সাজ ত্যাগ করিয়া মন্দিরে যাইবার বেশ পরিয়া লইল,—তাহার পর দিদিমার মহলে প্রবেশ করিল। দিদিমা মন্দির গমন উদ্দেশ্যে তখন বারান্দায় পদার্পণ করিয়াছেন—জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া চরণ সংযত করিয়া কহিলেন—"আজ যে আমার রাধারাণীর অসময়ে উদয়? মন্দিরে যাবি বুঝি ? সাজ সজ্জা যে সেই রকম ?"

"হাঁ ঠাকুর-মা, অনেকদিন দেব দর্শনে যাইনি তাই আজ ইচ্ছে হোল। দেখ দেখি তোমার জন্যে কি এনেছি ?"

ঠাকুর-মা ছবিখানি হাতে লইয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিলেন--"ঠিক সময়েই এনেছিস—রাণি, —এখনি মন্দিরে গিয়ে টাঙ্গিয়ে দেব। কালী মূর্ত্তি সেখানে একখানিও নেই। তাই বুঝি দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। স্বপ্ন দেখার পরই পটখানি কালীঘাট থেকে আনিয়েছি।"

"আচ্ছা দাও ঠাকুর-মা,—আমি নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি তাঁহার হাত হইতে স্বহস্তে পুনর্গ্রহণ করিল। ঠাকুরমা তখন তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন— "দিন দিন যে শুকিয়ে যাচ্ছিস নাতনি! বিরহজ্বালা পুষছিস যে বুকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সবাই যা বোঝে তোর বাপ ত তা বোঝে না। বাপের তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে অর্জ্জুন জামাই করবে। আরে ঐ ত সেই। যুদ্ধ জিতলে, মালা নিলে,—ছদ্মবেশী অর্জ্জুনই ত সে,—তোর বাবাকে কে তা বোঝায় বল্ দেখি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের বেদনা মুখে রক্তরাগে ঝাঁপাইয়া উঠিল—পাছে ঠাকুরমা তাহা লক্ষ্য করেন—সে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"না ঠাকুর-মা, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন লো ?"

"সবাই যে বিয়ে করে।"

দিদিমা খুব হাসিয়া উঠিলেন,—নাতনির পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"ওঃ সেইজন্যে ? যেমন বাপ ঠিক তেমনি মেয়ে! সবাই যা করে তা করতে নেই—কেমন ? সেইজন্যে তোর বাপও ত বিয়ে করলে না।"

মেয়ে বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর-মা, বাবা বিয়ে করেননি বলে তোমার এত দুঃখ আমি সে দুঃখ নিবারণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমারও অনেক সময় মনে হয় —বাবার বিয়ে হলে ভাল হয়। তুমি একটি ভাল মেয়ে দেখ—তারপর এবার আমরা দুজনে মিলে বাবাকে ধরে পড়ব।"

ঈর্ষার পরিবর্ত্তে নিজেই যে জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে ইহাতে ঠাকুর-মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন—"হ্যাঁ অসাধারণ মেয়ে বটে!" মুখে বলিলেন—"বেশ কথা! আগে ত তোর হাতে বাঁধন পড়ুক—তখন বাপের চাদরেও গিরে দিস্।"

রসুন-চৌকীর পুরবীরাগ সহসা মন্দিরের আহ্বান ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে থামিয়া পড়িল। রাজমাতা বলিলেন "চল্ রাণি চল্ আরতির সময় হোল, ফিরে এসে এ পরামর্শ করা যাবে।"

মন্দির-অঙ্গনে পৌঁছিয়া প্রথমেই রাজমাতা কালী-মূর্ত্তিখানি একজন সেবকের হস্তে দিয়া, কোথায় ইহা টাঙ্গান হইবে বলিয়া দিলেন। পুরোহিত এবং অন্যান্য রাজ-আত্মীয়গণ এতক্ষণ রাজমাতার আগমন-অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহারা মন্দিরে আসিবামাত্র স্তোত্রপাঠ এবং আরতি আরম্ভ হইল। রাজকুমারীর সহিত মহারাণী সপ্তবার দেব-প্রদক্ষিণ করিয়া দেব-সম্মুখে প্রণত হইলেন। প্রণামান্তে জ্যোতির্ম্ময়ী নতজানু থাকিয়াই করযোড়ে মূর্ত্তি যুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রকৃতি পুরুষের মিলন ভাব—এই যুগল মূর্ত্তিতে আজ সে সর্ব্ব-প্রথমে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল। এই মিলনরূপ—কি সুমধুর,—কি মনোমোহন! জ্যোতির্ম্ময়ী মনে করিয়া আসিয়াছিল, শ্যামসুন্দরের চরণতলে সে তাহার উন্মেষিত প্রেমকে আজ অঞ্জলিদান করিয়া—চির কৌমার্য্য ব্রতে শপথ বদ্ধ হইবে। পারিল না—সে তাহা পারিল না। ভগবানের প্রেমমিলনরূপে তন্ময় হইয়া মোহাচ্ছন্ন ভাবে করযোড়েই সে বসিয়া রহিল। আরতি শেষ হইয়া গেল, স্তোত্র পাঠ বন্ধ হইল—ঠাকুর-মা তখনো রাজকন্যাকে সেই ভাবে বসিতে দেখিয়া একটু যেন ভীত ভাবে ডাকিলেন—"রাণি ?" রাণী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এতদিনে শেষ হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে পৃথিবীর কি-যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উত্তেজনার বশে কেহ হিসাব করিবার অবসর পান নাই; যুদ্ধ-শেষে এখন সেগুলি খতাইয়া দেখিলে বোধ হয় সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন।

আমরা আজ ক্ষতির হিসাব করিতে বসি নাই। চারি-বৎসর-ব্যাপী এই অবিশ্রাম রক্তপাতের ফলে মানব-জাতির কোন লাভ হইয়াছে কি না, তাহারই আজ হিসাব করিতে চাই। কারণ, অমঙ্গলের মধ্যেই ভগবানের মঙ্গল-ইচ্ছা দেখা যায়, এটা দার্শনিক ভাবুকতা নহে; মানব-জীবনের ইহা পরীক্ষিত সত্য।

এতদিন ধরিয়া মানুষ যে সভ্যতা সযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজেই আজ সেই সভ্যতা সে চূর্ণ করিয়া দিল। যে সকল বড় বড় সাম্রাজ্য, সুরক্ষিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই সভ্যতার আব-হাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ঝড়ের মুখে ধুলিরাশির মত কোথায় যে সে উড়িয়া গেল, কেহ তাহা জানিতেও পারিল না। নিত্য-নব যন্ত্রবিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, অতি সূক্ষ্ম রাজনীতি-তত্ত্ব কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। বলদর্পিত যদুবংশীয়েরা যেমন হানাহানি করিয়া মরিয়াছিল,তেমনই এই সভ্যতা নিজের ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই আত্মহত্যা করিয়া বসিল।

যে ভ্রান্ত নীতি এই সভ্যতার প্রাণ-স্বরূপ

জয়, দুর্ব্বলের পতন ইহার মন্ত্র, ভোগবিলাস ইহার দেহ, বাণিজ্য ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ভীষণ অক্টোপাসের মত এই প্রতিযোগিতা-মূলক সভ্যতা বিশ্ব-মানবকে তাহার সহস্র বাহুর জালে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল।

জাতিতে জাতিতে রেষারেষি এই প্রতিযোগিতার এক প্রধান রূপ। যে জাতিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেইই অপর দুর্ব্বল জাতিকে চিরকাল পদানত করিয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত জাতি যে প্রবলের পেষণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন। অপরকে পদানত করিবার এই যে ক্ষমতা, ইহাই ছিল জাতির শক্তির মানদণ্ড। যাহারা যত-বেশী পর-রাজ্য জয় করিতে পারিত, যত-বেশী দুর্ব্বল জাতিকে আত্মসাৎ করিতে পারিত, তাহারাই তত-বেশী সভ্য বলিয়া গণ্য হইত। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিসর, রোম, গ্রীস, পারস্য, তাতার সকলেই এইরূপ উপায়ে সভ্য হইয়াছিল। আধুনিক পৃথিবীর সভ্যতম জাতিদেরও যে এইটিই মূলমন্ত্র ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। আধুনিক কালে আবার "নেসনালিজম্" বলিয়া একটা জিনিষ ঢুকিয়া এই পরজাতি-জিগীষাকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছিল। দেশ-ভক্তি বা

সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার যে বিকৃতি "নেসনালিজ্‌ম্‌" বা স্বাদেশিকতা-রূপে বর্ত্তমান জগতে দেখা গিয়াছিল, তাহা ছদ্মবেশী নয়ন-মনোহর শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা প্রবল জাতির ঘোরতর স্বার্থপ্রিয়তা মাত্র। খাঁটি স্বদেশ-বাৎসল্যে পরজাতি-বিদ্বেষের গন্ধও নাই। কিন্তু এই যে আধুনিক "স্বাদেশিকতা," ইহার মূলে পরজাতির বুকের রক্ত পান করিয়া বর্দ্ধিত হইবার ইচ্ছা! এই ইচ্ছা বা শয়তানী আদর্শের কাছে কেহ ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকেও যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া লইতে কিছুমাত্র বাধে না। বর্ত্তমানে জর্ম্মানিই এই ভীষণ "নেসনালিজ্‌ম্‌"-এর আদর্শকে চরমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার উদ্ভাবিত "Kultur" নামক অপূর্ব্ব পদার্থ বিশ্বশুদ্ধ লোককে-জোর করিয়া গিলাইয়া দিতে সে বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাহার সে শুভ-ইচ্ছা (?) পূর্ণ হইল না। যে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-রূপে সে দাঁড়াইয়াছিল, নিজের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া তবে সে নিবৃত্ত হইল।

এই প্রতিযোগিতার আর এক মূর্ত্তি, বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাক্ষাৎ রক্তারক্তির মত ভয়ঙ্কররূপে দেখা না দিলেও ইহার কার্য্যকারিতা আরও ভীষণ। নীরবে অন্য জাতির বুকের রক্ত পান করিয়া তাহার জীবনী-শক্তি ক্ষয় করিয়া দেওয়াই ইহার কাজ। কঠোর হৃদয়হীন বড়-বড় কারখানা বাহন। অর্থ-নীতি-তত্ত্বের শ্রুতি-মধুর মন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে দুর্ব্বল জাতির দেশের মধ্যে ইহা সূচার মত প্রবেশ করে এবং বর্শার ফলকের মত রক্তপান করিয়া আসে। ডাকিনী-যোগিনী যেমন শ্মশান-বাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, কামান-গোলা-গুলিও তেমনই ইহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। বিগত মহাযুদ্ধের একটী প্রধান কারণ যে এই বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন। স্বর্গীয় ঋষি টলষ্টয় তাহা দিব্য চক্ষে দেখিয়া ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রতিযোগিতার সব-চেয়ে ব্যাপক মূর্ত্তি, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব—ধনী ও দরিদ্রে দ্বন্দ্ব—শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে দ্বন্দ্ব। আর বলিতে গেলে ইহাই প্রতিযোগিতার অন্তরতম রূপ; অন্য সকল রূপ ইহারই প্রতিরূপ মাত্র। সর্ব্বকালে সকল সমাজেই এই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। ধনী ও শিক্ষিতেরা দরিদ্র অশিক্ষিতদের বলে ও কৌশলে চাপিয়া রাখিয়া নিজেরা সকল সুখ ও সুবিধাগুলি ভোগ করিয়াছে। দেশের নামে এই যে যুদ্ধ চলিয়াছে, মূলতঃ ইহা কি? জনকয়েক ক্ষমতাশালী লোক নিজেদের অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য বলে ও কৌশলে অপর-সকলকে মৃত্যুর মুখে পাঠাইতেছে। যদি সাধারণ লোকদের এ বিষয়ে হাত থাকিত, তবে হয়ত এরূপ রক্তপাত ঘটিতে পারিত না। কারণ এই রক্তপাতে সর্ব্বরকমের ক্ষতি এই সাধারণ লোকদেরই। বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেও সাধারণ লোকদের—যাহারা কুলী-মজুর,

হয়, তাহাদের—বিশেষ কিছুই লাভ নাই। জনকয়েক ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেই উহার মধ্যে লাভবান্ হইয়া থাকে। অনেক দিন হইতেই সাধারণ লোকেরা এই কথাটা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং বুঝিয়া এই অন্যায় দাসত্ব হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছে। সকল দেশের শ্রমজীবিদিগের মধ্যে আন্দোলনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যুদ্ধের ফলে "নেশনালিজম্" বস্তুটা হয়ত ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং দরিদ্র অশিক্ষিত সাধারণ লোকদের দাসত্বও যে আর বেশীদিন টিঁকিবে, এমন মনে হয় না। পৃথিবীর চারিদিকে শ্রমজীবি-দলের মুক্তি-লাভের প্রবল চেষ্টার লক্ষণ ইহার মধ্যেই দেখা যাইতেছে। নিন্দনীয় "বলসিভিজম্" জিনিষটা ইহারই এক শোচনীয় বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রতিযোগিতা যে মানব-সমাজেই আবদ্ধ তাহা নহে, ইহা প্রকৃতির একটা সাধারণ নিয়ম। জীব-রাজ্যে সর্ব্বত্রই ইহার বিস্তার। আচার্য্য ডারউইন সর্ব্বপ্রথমে পরিষ্কারভাবে এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীব-বিজ্ঞানের প্রধান সত্য প্রচার করিয়াছিলেন,—"জীবন-সংগ্রাম" (Struggle for existence) ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest)। এই দুই রূপে সংহার-রূপিণী প্রকৃতিকে তিনি সর্ব্বত্র দেখিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিকাশের চির-গোপন রহস্যটুকু ঐ দুই সূত্রের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্য-দ্বারা আধুনিক জীব-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়মকে এরূপ সঙ্কীর্ণভাবে দেখা যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ দেখা, এ কথা আমরা সাহস করিয়া আজ বলিতে পারি। নব্যযুগের জীবতত্ত্ববিদ্গণ এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে কেবল জীবন-সংগ্রামই জীব-বিকাশের একমাত্র নিয়ম নহে—উহা তাহার একটী ধারা মাত্র। উহারই পাশাপাশি আর একটী প্রবলতার নিয়ম প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে—তাহার নাম সহযোগিতা (mutual aid)। জীবরাজ্যের কি নিম্ন কি উচ্চ উভয় স্তরে সর্ব্বত্রই এই সহযোগিতার প্রভাব সমান বিস্তৃত। ইহার অভাবে সৃষ্টির সমস্ত বিকাশ, সমস্ত সৌন্দর্য্য একেবারে অন্ধকারে মগ্ন থাকিত। কি অর্দ্ধবিকশিত উদ্ভিদ্-নামধারী জীবগণের মধ্যে, কি অণুপরিমাণ কীট-পতঙ্গের মধ্যে, কি দলবদ্ধ পশুপক্ষীর মধ্যে অথবা সমাজবদ্ধ শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষের মধ্যে—একদিকে যেমন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ব্যাপার চলিতেছে, অপরদিকে তেমনই আবার তদপেক্ষা প্রবলতরভাবে সহ-যোগিতা ও প্রেমের লীলাও অহরহ দেখা যাইতেছে। তাই নব্যজীবতত্ত্বের মূলমন্ত্র আর জীবন-সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা নহে—তাহা সহযোগিতা বা প্রেম।

এই সহযোগিতার নিয়ম জীবরাজ্যের নিম্ন স্তরে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও উর্দ্ধ স্তরে অর্থাৎ মানব-সমাজে ইহার প্রভাব খুবই বেশী। মানবের সমাজ

তাহার গণ, জাতি, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ, পরিবার, সকলই এই নিয়মের ফল। অবশ্য মানব-সমাজেও প্রতিযোগিতার কিছু প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সহযোগিতা ও প্রেমই তাহার নিজস্ব বস্তু। তাহার মধ্যে ইহার যত বিকাশ হইতে থাকিবে, ততই সে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে; আর যতই সে প্রতিযোগিতাকে আশ্রয় করিবে, ততই তাহার ধ্বংস বা অবনতি হইবে। এতদিন এই পশুনীতি অবলম্বন করিয়াই মানুষ ত যুদ্ধ ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধ তাহারই চরমফল।

মহাযুদ্ধের যজ্ঞভস্ম হইতে যে নবীন সভ্যতা জাগিয়া উঠিবে—আশা করা যায়, সে সহযোগিতা ও প্রেমের অমৃতপূর্ণ কলস লইয়াই সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবে। সেই অমৃত-পানে মানুষের সকল গ্লানি, সকল দুর্দ্দশার অবসান হইবে; সাম্য ও মৈত্রীর ফলে অচিরে তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জল বেশে দেখা দিবে।

যে বিগর্হিত পররাজ্য-জিগীষা সকল ব্যাধির মূল, আশা করি, তাহার অবসান হইবে। "নেসনালিজ্‌ম্" নামক যে ছদ্মবেশী লোভী শয়তান আপনার পসার জম্‌কাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাকেও বোধ হয় দূরে সরিয়া যাইতে হইবে! পৃথিবীময় যে সকল দুর্ব্বল, দরিদ্র জাতি প্রবলের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে, "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইয়া আছে, তাহাদের শৃঙ্খল-মোচন হইবে। সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য, ও আদর্শ-অনুসারে নিজেদের দেশে জাতীয় স্বাধীনতার সুখভোগ করিতে পারিবে। Self-determination কেবল রাজনৈতিকদের কথার কথা নয়, পৃথিবীর ছোট-বড় সকল জাতিই তাহার সুবিধা লাভ করিবে।

নবযুগের বাণিজ্য-ব্যাপারেও আর সেরূপ ক্ষমতাশালী ও অক্ষমের দ্বন্দ্ব চলিবে না। সেই ভীষণ অক্টোপাস-নীতির পরিবর্ত্তে ছোট-বড় সকল জাতির মধ্যে co-operation বা মেলা-মেশার কারবার প্রবর্ত্তিত হইবে। ছোট গরিব জাতিরা তাহাদের নিজেদের দেশের সম্পদ নিজেদের ইচ্ছামত কাজে লাগাইতে পারিবে; বড় ধনী জাতিদের জন্য কেবল "কাঠ ও জল" বহিয়াই মরিবে না।

সর্ব্বোপরি সকল দেশের সকল মানুষ ধনীদের ও বড়দের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। জনকয়েক ধনী, শিক্ষিত ও বল-শালী মিলিয়া দেশের সাধারণকে আর তেমন গরু-ভেড়ার মত তাড়াইতে পারিবে না! কেবল দেশে ও রাষ্ট্রে নহে—সমাজে ও পরি-বারে সর্ব্বত্রই যেন মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে! আচারে ব্যবহারে, শিক্ষায় দীক্ষায় সকল বিষয়েই যেন তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা হয়! ধন কেবল জন-কয়েকের বিলাস-ভোগের জন্য নহে—সর্ব্ব-সাধারণের সেবায় তাহা উৎসৃষ্ট হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দরিদ্রের কুটীরেও যেন পড়িতে পারে, তাহা হইলেই জগদ্ব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্য রোগ-শোক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইবে।

এই সকল বিষয়ই নবযুগের মানুষের সম্মুখে প্রধান সমস্যা; ইহাদের সম্যক সমাধানেই তাহার মঙ্গল এবং মুক্তি।

"মাতৃগুপ্ত"

কবি মাতৃগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজা হর্ষ-বর্দ্ধনের সভায় অতি-দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন; রাজার সেবা তিনি প্রাণপণে করছেন, কিন্তু রাজার সুনজর একদিনও তাঁর উপর পড়েছে একথা কেউ বলবেনা—সেই মলিন মুখ, ছেঁড়া-কাঁথা মাতৃগুপ্তকে দেখে। ঋতুরাজের মতো রাজা হর্ষ সবাইকে সুখের হিল্লোলে পূর্ণ করলেন; কিন্তু দুঃখ—সে শীতের মতো কবির চারিদিকে জড়িয়ে রইলো! রাজা মাতৃগুপ্তের কবিতা থেকে সেটার ইঙ্গিত পেয়েও উদাসীন রহিলেন। এইভাবে কবি কত শীত যে বিনা-পুরস্কারে হর্ষবর্দ্ধনের সেবায় কাটালেন তার ঠিক নেই। রাজা যখনি শোধান—"কবি কি সংবাদ?" কবি উত্তর দেন ছেঁড়া-কাঁথা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—"বড় শীত মহারাজ! হুতাশের গরম নিশ্বাস বুকের মধ্যে না যদি থাকতো, আর যদি হর্ষের কথা দু-একটা মাঝে-মাঝে আগামী বসন্তের আশার মতো শুনতে না পেতেম, তবে নিশ্চয়ই মরেছিলেম।" রাজা মনে-মনে কবির কথায় দুঃখ পান; আর এতদিন কবিকে অনর্থক যে নানা ভোগ ইচ্ছে কোরে ভোগাচ্ছেন সেটা ভেবেও লজ্জা পান; কিন্তু মুখে বলেন—লক্ষ টাকার কাশ্মীরী শাল নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে—"শীততো মোটেই বোধ হচ্ছেনা কবি!" কবি একটু ম্লান হেসে উত্তর করেন—"লোকের হর্ষবর্দ্ধন বসন্ত কাল; শীতের খবর তো তার কাছে পৌছতেই পারেনা মহারাজ!"

একদিন বসন্তকালে রাজা উপবনে বিহার করছেন, মলিন-মুখে মাতৃগুপ্তকে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে আসতে দেখে রাজা বল্লেন—"তুমি ও আমি দুজনে কি আজ সমান সুখী নয়? এই বসন্তকালে শীত তো পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, তবে এখনো তোমার মলিন-মুখ ছেঁড়া-কাঁথা কেন বলতো কবি?" কবি উত্তর দিলেন—"মহারাজ আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা? আপনি ওই সম্মুখের ক্রীড়া-পর্ব্বতটির মতো বসন্তের দিনে বিচিত্র বাসন্তী ফুলের সাজে সেজে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করছেন; আপনার যশের সৌরভ পেয়ে দিগ্‌দিগন্ত থেকে দেখুন কত মধুকর এসে গুণগান করছে—আজ আপনার চারিদিকে আনন্দে হর্ষের মধুবৃষ্টি কোরে! আর আমি ঐ হিমা-চলটার মতো যে শীতে সেই শীতেই ঘেরা রয়েছি এখনো!"

রাজা বল্লেন—"তবে কে বড় হল কবি? হিমাচল? না এই ক্রীড়া-পর্ব্বতটা?"

কবি বল্লেন—"ক্রীড়া-পর্ব্বতটি বসন্তের হর্ষবর্দ্ধন ফুল-ফলের ঐশ্বর্য্যে, ছায়ার মহিমায় বড়; আর হিমাচলটা কায়ায় যেমন, তেমনি দুঃখেও বড় মহারাজ! শীত ওর আর যাবার নয় দেখছি।"

মহারাজ কিছুদিন যুবরাজের হাতে রাজ্য-ভার দিয়ে বিশ্রাম করছেন—গরমের দিনে; কাঁথাখানা চারপাট কোরে স্কন্ধে

রেখে কবি উপস্থিত—বিষম রৌদ্রে, খোলা মাথায়। হর্ষবর্দ্ধন বলে উঠলেন—"এতদিনে শীত দূর হল কবিবরের!"

মাতৃগুপ্ত উত্তর করলেন—"মহারাজ, শীত একটু অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মকে এই হতভাগা কবিটিকে পুড়িয়ে মারবার জন্তই রেখে গেছেন! শীতের আমলে কেবল কেঁপেই মরতেম, কিন্তু এ-আমলে হৃৎকম্প আর স্বেদ দুইই হচ্ছে;—মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা পড়ছে মহারাজ!"

রাজা মৃদু হেসে বল্লেন—"কবিবর, ওই কাঁথাটা স্কন্ধে না রেখে ওটার মায়া ত্যাগ কোরে যদি আমার হাতে সঁপে দাও, তবে ওটা দিয়ে তোমার জন্তে এমন-একটা ছাতা বানিয়ে দিতে পারি—বেশ বড়-গোছের—যার ছায়ায় তুমি সুখে থাকতে পারবে!"

মহারাজের সামনে কবি সেই শতকুটি কাঁথা বিছিয়ে তার উপরে বোসে বল্লেন—"দুঃখের দিনের সম্বল এই কাঁথা দিনে-রাতে শীতে-গ্রীষ্মে কাজ দিচ্ছে এখনো। এমন কি প্রয়োজন হলে মহারাজেরও পদধূলি মুছে নেওয়া কিম্বা সিংহাসনের গদীর আর-এক-পুরু খোলোসও করা যায় একে দিয়ে একদিন! কিন্তু ছাতা হলে এই ফুটোফাটা কাঁথায় রোদ-বৃষ্টি মোটেই আটকাবে না; উপরন্তু যে-কাজগুলো এখন করছে তাও করতে পারবে না।"

মহারাজ বল্লেন—"কবিতা আর কাঁথা আর তার উপর আমি ধরলেম ছাতা!" বোলে রাজা উঠে কবির মাথায় রাজছত্র ধরলেন। আনন্দে সভাসদ সবাই ধন্ত ধন্ত বোলে উঠলো।

কবি ছল্‌ছল্‌-চোখে বল্লেন—"প্রভু এ দাসকে কোন্ দূরদেশের রাজছত্রের তলায় নির্ব্বাসন দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাচ্ছেন?"

"বন্ধু এইখানে"—বোলে রাজা ছাতা রেখে কবিকে বুকে ধরলেন।

মাতৃগুপ্ত বল্লেন—"বন্ধু, ছাতার আড়াল সরে গিয়ে তোমার পা পড়েছে দীনের কাঁথায়, অমনি খোলা আঙিনার শেষপর্য্যন্ত তোমার ছায়া বিস্তারিত হল দেখ।"

রাজা বল্লেন—"বন্ধু, এই ক্রীড়াপর্ব্বতের তপ্ত মাটি ওই দেখ তোমারও ছায়া পেয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত শীতল হচ্ছে!"

গ্রীষ্মকাল এই ভাবে কাটলো। বর্ষা এসে উপস্থিত হল। উজ্জয়িনী-রাজপ্রাসাদের চূড়ায় ময়ূর সব পাখা বিস্তার কোরে মেঘের দিকে চেয়ে কেকা রব করছে; আকাশে ইন্দ্রধনু মেঘের উপরে সাত রং নিয়ে ফুটে উঠেছে। রাজা বল্লেন—"ছাতার দরকার এখনো কি অনুভব করছোনা কবি?" কবি বল্লেন—"এখনো নয় মহারাজ! কেননা এখনো শুনছি ময়ূরেরা বলাবলি করছে—হায় অসার ইন্দ্রধনুর রং দেখে মেঘ মোহিত হয়ে রইলো আর চিত্রবিচিত্র পাখা মেলে আমরা যে তার গুণগান কোরে কৃপাবারি ভিক্ষা করছি, তার জন্তে মেঘপুলক বিন্দু যা দিচ্ছে তাতে তৃষ্ণা মেটা দূরে থাক্, পালকগুলো যে ধুয়ে নেবো তাও হচ্ছেনা। ইন্দ্রদেব যতক্ষণ আকাশ ফুটো-কোরে জল না ঢালছেন ছাতার কথা মনেও আসছেনা। এখন কেবল মনে আসছে—'সন্তপ্তানাম্ ত্বমসি শরণং'।" রাজা বলে উঠলেন—"যদি তাই

হয় তবে—বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী, তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ। জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো, দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥”

এই বোলে রাজা মাতৃগুপ্তকে একখানি পত্র দিয়ে বল্লেন—“আমার এই পত্র নিয়ে আপনি কাশ্মীরে গমন করুন এই মুহূর্ত্তে!”

মন্ত্রী রাজার কাছে এসে বল্লেন—“কবিবরের যান-বাহন পাথেয়—”

রাজা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—“কিছু প্রয়োজন নেই।”

মন্ত্রী অবাক হয়ে কবির দিকে চাইলেন। কবি ছেঁড়া-কাঁথায় রাজার শাসন-পত্র বেঁধে নিয়ে পথে বার হলেন—আর-কিছু প্রয়োজন নেই বোলে।

কবি চলেছেন মেঘে ছায়া-করা দিনগুলির মধ্যে দিয়ে নদী-তীরে-তীরে—গ্রামে গ্রামে বিশ্রাম কোরে। বনের পথে পাখীদের গান শুনতে-শুনতে, মাঠে-ঘাটে নানা ছবি, নানা শোভা দেখতে-দেখতে সারা পথ তিনি আনন্দে ভরপূর হয়ে চলেছেন। শেষে একদিন দূরে হিমাচলের পায়ের কাছে কাশ্মীরে এসে কবি উপস্থিত। তখন সেখানে ফুলের সময়। কবি দেখলেন সমস্ত দেশ ফুলে ফলে-সবুজে যেন একখানি বিচিত্র রাজাসনের মতো বিছোনো রয়েছে। তার উপরে বরফের চূড়া শ্বেত-ছত্রটির মতো শোভা ধরেছে। কবির পথের ক্লেশ দূর কোরে পর্ব্বতের বাতাস ফোটা-ফুলের সুগন্ধে উপবন আমোদ করেছে; ছেঁড়া-কাঁথায় মাথা রেখে মাতৃগুপ্ত সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন; কখন্ দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা আসছে তা তাঁর খবরেও আসেনি। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে যেন জেগে উঠলেন—যেন মনে হল একটা সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে গায়ের কাঁথাখানা কারা কেড়ে নিতে চাচ্ছে আর তিনি প্রাণপণে হাঁকছেন—মহারাজ রক্ষে করুন! আমার কাঁথা আমি কিছুতে ছাড়বোনা! মহারাজ কিছু বলছেন না কেবলি হাসছেন। —কবি চেয়ে দেখলেন সত্যিই এক হরিণশিশু তাঁর কাঁথার উপরে আরামে মাথাটি রেখে নিদ্রা দিচ্ছে; কবিকে উঠতে দেখে বনের হরিণ পালিয়ে গেল। স্বপ্নের অর্থ ভাবতে-ভাবতে মাতৃগুপ্ত সে-রাত্রির মতো সুরপুরের চটিতে এসে আশ্রয় নিলেন। তার পর হর্ষবর্দ্ধনের দানপত্র যথাসময়ে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর হাতে দিয়ে মাতৃগুপ্ত প্রত্যুত্তর চাইলেন; তখন মন্ত্রী কবিকে প্রণাম কোরে বল্লেন—“অনুমতি দেন তো অভিষেকের আয়োজন করি। সিংহাসন কেন আর শূন্য থাকে?” কবি আশ্চর্য্য হয়ে শোধালেন—“কার অভিষেকের অনুমতি চাচ্ছেন আপনি আমার কাছে?” মন্ত্রী উত্তর দিলেন—“হে সুকবি—আপনারি?” কবি বুঝলেন হর্ষবর্দ্ধন তাঁর মাথায় রাজছত্র না দিয়ে ছাড়লেন না। তিনি মন্ত্রীকে ছেঁড়া-কাঁথা দেখিয়ে বল্লেন—“মন্ত্রী, এখানা সিংহাসনে বিছিয়ে দিতে বল, আর অভিষেকের আয়োজন কর।”

মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে বসবার অল্পদিন পরে হর্ষবর্দ্ধন স্বর্গে গেলেন এ-খবর যেদিন কাশ্মীরে পৌঁছল সেই দিন কবি রাজছত্রের মায়া পরিত্যাগ কোরে ছেঁড়া-কাঁথা স্কন্ধে ফেলে যে-পথে এসেছিলেন সেই পথে বারাণসীতে চলে গেলেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতের দারিদ্র্যের কারণ

ভারত যে দরিদ্র তাহার ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল, এখন দেখা যাক্ এই দারিদ্র্যের কারণ কি ?

যদি ভারতবাসী ও কতকগুলি উদার-নৈতিক ইংরাজের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় ইংলণ্ড ভারতের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, অন্তর্জাতীয় কোম্পানী যেরূপ বঙ্গের সার-শোষণ করিয়াছে সেইরূপ ইংলণ্ডও দেড়শত বৎসর যাবৎ ভারতকে দোহন করিয়াছে।

এই প্রশ্নের সমাধানার্থ, এই প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল প্রথমতঃ তাহার আলোচনা করা আবশ্যক; তাহার পর উনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যে ভারত বাস্তবিকই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল কিনা তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক; পরিশেষে ইংলণ্ডের কি লাভ হইয়াছে এবং সেই লাভের অনুরূপ ভারতের কি উপকার হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

*

* *

ইংরেজ-সরকারের প্রতিপক্ষীয়েরা মোগলের সময়কার ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করিতে বিরত হন না। সেই সময় রাজস্বের পরিমাণ কত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, তাহার সংখ্যাঙ্ক তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

কিন্তু ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, তখন অর্দ্ধেক রাজস্ব ভূমিকর হইতে উৎপন্ন হইত। কিন্তু এই ভূমি-উৎপন্ন রাজস্ব কর-হিসাবে ধর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ভূমি সরকারের নিজস্ব ছিল, এবং সরকারের স্বেচ্ছানুসারে ফসলের পরিমাণ ধরিয়া পূর্ব্ব হইতেই রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইত।

মোগল-সম্রাটদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উদার সেই আকবর, ফসলের এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিতেন; পক্ষান্তরে—ইংরেজ-সরকার যাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই দত্ত-মহাশয়ের কথা-অনুসারেও, বঙ্গদেশে ফসলের উপর শতকরা পাঁচ, ভারতের উত্তরাংশে শতকরা ৮, মাদ্রাজে শতকরা ১২ এইরূপ ভূমি-কর ছিল। বোম্বায়ের ভূমিকর তিনি শতকরা ৩৩ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ধরিয়াছেন।

অতএব ইংরেজ-সরকারের একজন প্রতিকূল-বাদীর হিসাব গ্রহণ করিলে দেখা যায়, কেবল কতকগুলি এলাকা এবং এক প্রদেশমাত্র হইতে—সর্ব্বাপেক্ষা উদার মোগল-সম্রাটের আমলে সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভূমির যে রাজস্ব ছিল,—সেই রাজস্ব আদায় হইত। সরকারের নিজ-অনুষ্ঠিত পূর্ত্ত-কার্য্যের জন্য সরকারের প্রাপ্য সুদও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আরংজেবের আমলে, যে সকল বিদেশী পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা [illegible]

কৃপাধীন স্বেচ্ছাধীন দাস-কৃষকের কথা, মনসবদারদিগের 'বেগার-খাটানো' প্রহার-ভোগী কারিগরের কথা বলিয়াছেন। অষ্টাদশ-শতাব্দীর অরাজকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিজয়-অভিযান দেশকে উচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ইংরেজ-বিজয়ের যুগে কতকগুলি জেলা ছাড়া, সমস্ত দেশ দৈন্যগ্রস্ত ছিল।

*
* *

পক্ষান্তরে নিম্নে-প্রদত্ত সংখ্যাঙ্কের দ্বারা সপ্রমাণ হইবে, ১৫০ বৎসর যাবৎ ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কোম্পানীর আয়ব্যয়ের হিসাব (আয়)

(এস্থলে বিশেষরূপে Lord Wellesly ও Lord Dalhousieর শাসনাধীনে রাজ্য-বৃদ্ধির কথা ধরিতে হইবে)

১৭৯৩ অব্দে...£ ৮, ২২৫, ৬২৮

১৮০৮-০৯...£ ১৫, ৫২৫, ০৫৫

১৮৪০...£ ২১, ০০০, ০০০

সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব (আয়)

১৮৭৬-৭৭...টাকা ৫৮৬, ৫১৯, ০৭০

১৯০০-০১...£ ৭৫, ১৬৬, ০০০

১৮৪০ অব্দে...ভূমিকর হইতে পাওয়া যায় ১২, ৫০০, ০০০£,

১৯০০-০১,... ...১৯, ৫৫৩, ৭০০

৬০ বৎসর যাবৎ পূর্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

টেলিগ্রাফ :—লাইন ৫২, ৯০৯ মাইল; তার :—১৭১, ০৪৯ মাইল।

রেল-পথ :—২৫,০৩৫ ½ মাইল।

খাল :—৭,৪১২ মাইল বড় খাল ও ২৮,

বাহ্য বাণিজ্য।

১৮৩৪ ৩৫ অব্দে। আমদানী : টাকা ৬১, ৫৪১, ২৯০।

রপ্তানী...৭১, ৮৮১, ৬১০।

১৮৬০-১৮৬১...আমদানী : টাকা ৩৪১, ৭০৭, ৯০০

রপ্তানী...৩৪০, ৯০১, ৫৪০

১৮৮০-৮১...আমদানী : টাকা ৬২১, ০৪৯, ৮৪৩

রপ্তানী :—টাকা ৭৬০, ২১০, ৪২৮

১৮৯৯-১৯০০...আমদানী : টাকা ৯৬২, ৭৪১ ৩৫৬

রপ্তানী : টাকা ১, ১৭০, ৩৯৭, ০৯২।

ব্যাঙ্ক।

১৮৭১ অব্দে মূলধন : টাকা ৩৪, ৬০৭, ৬১০।

মোট ডেপজিট : টাকা ১১৯, ৬৬০, ৪২৭।

১৮৮০...মূলধন...৩৬, ৮০০, ০০০

ডেপজিট...১২০, ৩৮১, ৬৮০

১৮৯৯...মূলধন...৪৪, ০২৮, ৭১০

ডেপজিট...২১১, ১৪৭, ৫৪২

১৯০০...মূলধন...৪৪, ০৫২, ৪৮০

ডেপজিট...২৩৬, ৪৭৪, ৯৩০

শ্রমশিল্পে যে মূলধন খাটিয়াছে।

তুলার কল-কারখানা (এই শ্রমশিল্প ১৮৫১ হইতে সূত্রপাত হয়)

১৮৭৮-৭৯ মাকু : ১, ৪ ৩৬, ৪৬৪

মূলধন টাকা ৫৭, ০৬৭, ৫০০

১৯০০-১৯০১ মাকু—৪, ৯২২, ৬০২

মূলধন টাকা ১৬৭, ৩০৫, ০০০

কৃষকদিগের মজুরী, ১৮৭৩ হইতে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-তৃতীয়াংশ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, ও কামারের মজুরী ২১৭ হইতে ১০০ এই অনুপাতে (কলিকাতায়), ১৫০ হইতে ১০০ এই অনুপাতে দিল্লিতে (ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড় বড় শ্রমশিল্পের ব্যবসায়ে মজুরীর বেশী বৃদ্ধি দেখা যায়: ১৮৮৫ অব্দে যে হেড-মিস্ত্রী ১৭ টাকা পাইত, আজিকার দিনে সেই মিস্ত্রী প্রায় ৪০ টাকা পাইয়া থাকে।

অবশ্য ভারত এখনো দরিদ্র, অতিশয় দরিদ্র; কিন্তু ভারত ইংরেজের শাসনাধীনে দরিদ্র হয় নাই, বরং সমৃদ্ধ হইয়াছে।

*
* *

ভারত উচ্ছিন্ন হওয়া দূরে থাক, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ভারতের বৈষয়িক উন্নতির পক্ষে বরং সাহায্য হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে; আরও এই কথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত উদার রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড ভারতের সমধিক উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে, আমরা দুই যুগ নির্দ্ধারণ করিব।

ক্লাইভ ও ওয়ারেন-হেষ্টিংসের আমলে কোম্পানী হিন্দুরাজাদিগের নিকট হইতে বিস্তর টাকা জোর করিয়া আদায় করিয়াছে। এই সমস্ত টাকা ভারত হইতে বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহার বদলে ভারত কোন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয় নাই। কোম্পানীর যে খুব বেশী লাভ হইত তাহা মনে হয় না।

১৭৭২ অব্দে আয় £২, ৩৭৩, ৬৫০; ব্যয়—£ ১,৭০৫, ২৭৯। ১৭৮৫ অব্দে, আয়: £ ৫, ৩১৫, ১৯৭; ব্যয়—£ ৪, ৩১২, ৫১৯। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে;—আয়ের অঙ্কে এইরূপ ঘাটতি হইয়াছিল, যথা ১৭৯৭-৯৮ অব্দে £ ১১৪, ৭৪৬; ১৮০৮-০৯ অব্দে £ ২৬,০৪২।

পক্ষান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের স্বার্থপর রাষ্ট্রনীতি আয়র্লণ্ডের দুরবস্থার কারণ হইয়াছিল, এবং আমেরিক-উপনিবেশদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছিল। ভারতের সহিত ব্যবহারেও সেই একইরূপ কঠোরতা: যে সকল ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য ভারতের কারখানায় তৈয়ারী হইয়া ইংলণ্ডের মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ইংলণ্ডে সেই সকল জিনিসের প্রবেশ রহিত করা হয়। পক্ষান্তরে ইংরেজী তৈয়ারী মাল শতকরা দশ হিসাবে মাসুল দিলেই ভারতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত।

কোম্পানীর আমলে ভারত, ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার সম্বন্ধে সত্যসত্যই অভিযোগ করিতে পারেন; অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী যে টাকা জবরদস্তি আদায় করিত বলিয়া কথিত হয়—তার চেয়ে আসলে কম। লর্ড কর্ণোয়ালিসের আমলে উহা একেবারেই রহিত হয় এবং তখন অবাধ-বিনিময় ৬০ বৎসর যাবৎ চলিতেছিল। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার খারাপ পরিণাম একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারতের

এবং সেই বাঙ্গলাই কেবল এই শাসনাধীনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

*
* *

প্রথমে আমরা সরকারী ঋণের বিষয় আলোচনা করিব; ইহাকে সচরাচর home charge বলা হয়।

এই টাকা প্রতিবৎসর ভারত-সরকার ভারতের ষ্টেট্-সেক্রেটারিকে পাঠাইয়া থাকেন—যেমন মনে কর ১৮৯ -১৯০০ অব্দে পাঠাইয়াছিলেন £ ১৬, ৩৯২, ৮৪৬; ১৯০০-০১ অব্দে পাঠাইয়াছিলেন £ ১৯, ২০০, ৯৫৭।

ভারত-সরকার ইংলণ্ডে যে টাকা ঋণ করেন ও রেল-কোম্পানীকে প্রতিভূস্বরূপ যে টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, উক্ত ঋণের মধ্যে ৯· লক্ষ পৌণ্ড তাহারই সুদ। ঐ ধার-করা টাকার অধিকাংশ উৎপাদক পূর্ত্তকর্ম্মে খরচ হইয়াছে। ধারের সুদ অপেক্ষা এই পূর্ত্তকর্ম্মের আয় বেশী। উহার মধ্যে আবার কতক টাকা বিজয়-কার্য্য ও বিদ্রোহের বাবৎ খরচ হইয়াছে। কিন্তু এই খর্চ্চার ভার সমস্ত ভারত-বাসীর স্কন্ধে পড়ে না কি? কিন্তু ভারতের ঐক্যসাধন বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে সকলেরই কি ত্যাগস্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে? পরিশেষে, বজেটের বাৎসরিক ঘাট্‌তি পূরণ করিবার জন্যও টাকা ধার করিতে হইয়াছে। কেবল এই বাবদেই কিছু টাকা হাতে রাখিলে সুবিধা হয়। ভারত-সরকার ও ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি বজেটের এই ঘাট্‌তি একটু বেশী

যে দেশ প্রতিনিধি-সভার দ্বারা পরিচালিত নহে, সে দেশের স্বার্থসম্বন্ধে একটু বেশী চিন্তা করা আবশ্যক।

রাজস্বের এই টাকা যাহা বিলাতে পাঠান হয় তাহা খুব বেশী নহে এবং অনেক স্থলেই (বিশেষত দুর্ভিক্ষের বৎসরে) এই টাকা পাঠান অপরিহার্য্য হইয়াছিল।

আরও যে যে বাবদে ভারত-সরকার ষ্টেট-সেক্রেটারীর নিকট টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধর্ত্তব্য:—

সৈনিক-ব্যয়।

ভারতের ইংরেজ-সৈন্য পোষণের সমস্ত ভার ভারতের স্কন্ধে ফেলা উচিত নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাজে যে সকল যুদ্ধ-অভিযান চালিত হইয়াছে—যেমন সৌদান ও চীনে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ—সেই-সব অভিযানের খর্চ্চা ভারতকে দিতে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে।

রাজ্য-শাসনের ব্যয়।

ষ্টেট্ সেক্রেটারির বজেট্ ইংরেজ কর-দাতাদের হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত। ভারত-সরকারের ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কার্য্যকালে বেতনের কিয়দংশ এবং কর্ম্ম হইতে অবসরের পর সমস্ত পেন্‌সনের টাকা ইংলণ্ডেই খরচ করেন; কাজেই ইহা ভারতের একটা সুস্পষ্ট ক্ষতি—এই সকল ইংরেজ-কর্ম্মচারীর জায়গায় যদি দেশীয় কর্ম্মচারী ক্রমশ অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতের এই

বেতনের সমস্ত টাকাই ভারতে খরচ করিবে। তথাপি এখানে আমি এই কয়েকটি কথা বলিতে চাই :—

ইংরেজেরা ভারতের প্রকৃত উপকার করিয়াছে এবং এখনো করিতেছে। সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব।

ইংলণ্ডের সাহায্য ব্যতীত, ভারত এত কম সুদে টাকা ধার করিতে পারিবে না। সরকারী পূর্ত্তকর্ম্মের খরচই ধরনা কেন; ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে এই টাকা £ ২০৮ মিলিয়ানে উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন ভারতবাসীর দ্বারা শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে ভারত শতকরা ১০ টাকার নীচে কখনই টাকা ধার করিতে পারিত না। ৫০ কোটির বেশী টাকা এই হারে কি ভারত ধার পাইত? এখন দেখ, এই ২০৮ মিলিয়নের সুধ হইতেছে শতকরা ২½ হইতে ৩½ পর্য্যন্ত মাত্র।

পূর্ব্বে যে কথা বলিতেছিলাম, সেই কথায় আবার আসা যাক্ :—

ভারত-সরকারের খরচের কথা— বিশেষত যে টাকা ইংলণ্ডে খরচ করা হইয়া থাকে সেই খরচের কথা অতিরঞ্জিত;

যে দেশে মূলধনের খাঁকৃতি, সে দেশে খরচের অতিরঞ্জিত বর্ণনা বিপদজনক;

ভারতের দারিদ্র্য এই সকল খরচের উপর আরোপ করা অসম্ভব।

*

* *

সরকারী ঋণের সহিত ব্যক্তিগত ঋণও আছে; অর্থাৎ ইংরেজেরা ভারতীয় ব্যবসায়-সুধ :—যথা চায়ের চাষ, নীলের চাষ, কাফির চাষ; খনি, তুলার কল-কারখানা, পাটের কল-কারখানা; জাহাজ-চালনের কোম্পানী, বেঙ্ক ইত্যাদি। বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করা সকল দেশের পক্ষেই সুবিধা; যে দেশের মূলধন খুব কম, তাহার পক্ষে ত নিতান্তই আবশ্যক।

"অনুপস্থিতির" (absentism) উপর যে দোষারোপ করা হয়, তাহা এই সব স্থলে খাটে না। 'অনুপস্থিত' ব্যবসাদার অধিবাসীদিগের শ্রমোৎপন্ন জিনিস বিদেশে খরচ করেন, এবং তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে নূতন মূলধন দেন না। কিন্তু বিদেশী ঋণগ্রাহী নিজের দেশে সেই মূলধন আনয়ন করেন, যে মূলধনের অভাব দেশে ছিল— অর্থাৎ অন্য দেশের লোকের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য স্বদেশে আনয়ন করেন। অবশ্য ঐ মূলধন নিজস্ব হইলে ঋণগ্রাহী দেশের লোকের পক্ষে আরও সুবিধা হয়। কিন্তু মূলধনের অনুরূপ যে শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য তাহা ত উহারা যোগান দেয় নাই। অতএব এই বাবদে ইংলণ্ডকে যে টাকা দেওয়া হয়,—ভারত ইংলণ্ডের নিকট যে উপকার পাইয়াছে ঐ টাকা তাহারই মূল্যস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাক্, ভারত যে উপকার পায়, তাহার তুলনায় ইংলণ্ডের লাভ বেশী হয় কিনা?

এইখানে একটু পৃথক্‌ভাবে দেখা আবশ্যক : ভারতে যে টাকা খাটে, তাহার সুধ সহজ ভাবের চির-প্রচলিত সুধ। এই সুদের হারে, ভারত বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করিতে

আবার আর এক-প্রকার সুদ আছে, যাহা লভ্যজনক। এই লভ্যজনক সুদের কিয়দংশ দেশের লোকেরই হাতে থাকিতে পারিত যদি তাহাদের মূলধন থাকিত, কিংবা ইংরেজেরা যে সকল ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় সেই সকল ব্যবসায়ে যে বিজ্ঞানের আবশ্যক সেই বিজ্ঞান যদি তাহাদের জানা থাকিত। তথাপি ইহা বলা আবশ্যক যে, ভারতভূমি এত বৃহৎ এবং এখনো উহার সারোদ্ধারকল্পে (exploitation) উহাকে এতকম খাটানো হইয়াছে যে, বাস্তবিক বলিতে গেলে, এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কথাই আসিতে পারে না। অতএব ইংরেজ কোম্পানীর লাভের দরুন, ভারতের শ্রীবৃদ্ধি স্থগিদ হয় নাই।

ভারতের যাহা কিছু সমৃদ্ধি ও উদ্যম উদ্যোগ তাহার জন্য ভারত ইংলণ্ডের নিকট ঋণী হইয়াও সম্ভবত অপেক্ষাকৃত প্রবল, সমৃদ্ধ ও যন্ত্রপাতি-সমন্বিত ইংলণ্ডের শাসনাধীনে ভারত কতকটা ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া হইয়াছে এই সমস্যা "Drain of India" (ভারত শোষণ) এই বাক্যের উদ্ভাবকগণ যত সহজ বলিয়া মনে করেন তাহা তত সহজ নহে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অলঙ্কার-শাস্ত্র ও কাব্যের ধারণা

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা ঠিক করিয়া জানিবার উপায় না থাকিলেও, এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে আগে কাব্য তাহার পর কাব্যের লক্ষণ-নির্দ্দেশ, আগে সাহিত্য তাহার পর সাহিত্যের বিশ্লেষণ, আগে আদর্শ তাহার পর আদর্শের বিচার। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বাল্মীকি-রচিত মহাকাব্য বহুশত বর্ষ ধরিয়া 'আদি কাব্য' হিসাবে এই আদর্শ-রচনার স্থান অধিকার করিয়াছিল; পরে বাল্মীকি ও তদনুবর্ত্তী কবিগণের রচনাসমূহের বহুকাল ব্যাপী অনুকৃতি ও আলোচনার ফল-স্বরূপ, বোধ হয়, ক্রমশঃ অলঙ্কারশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। রামায়ণের সময় না হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতে কাব্যপদ্ধতির আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে কোনও না কোনও একটা ধারণা যে বর্ত্তমান ছিল তাহা বেশ অনুমান করা যায়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আলঙ্কারিক গ্রন্থ; ইহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে রচিত এইরূপ সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু দণ্ডীর পূর্ব্বেও যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বেদাদি রচনার সময় অলঙ্কারশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল কি না সন্দেহ। দণ্ডী (১) হইতে সাহিত্যদর্পণকার (১) পর্য্যন্ত আলঙ্কারিকগণ

(১) কাব্যাদর্শ ১।৬ সাহিত্যদর্পণ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ) পৃঃ ৪

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ ভবতি" প্রভৃতি যে সকল প্রামাণিক বৈদিক-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। রসের ধারণা বহুকাল হইতে কোনও না কোনও আকারে প্রচলিত ছিল, সুতরাং ছান্দোগ্যোপনিষদের "বাক্‌ বৈ রসঃ" এই নির্দেশ আলঙ্কারিক-সম্মত বাক্যের রসের স্পষ্ট সূচনা বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু নিরুক্তকার যাস্ক 'উপমা'র যে লক্ষণ দিয়া গিয়াছেন (১) তাহা আলঙ্কারিক মম্মটের নির্দেশ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। পাণিনির সূত্রের (২) মধ্যেও 'উপমান' 'উপমেয়' ও 'সামান্যে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি অন্য দুইটি সূত্রে (৪) কৃশাশ্ব ও শিলালি এই দুইজন নটসূত্রকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কেশবমিশ্র তাঁহার 'অলঙ্কারশেখরে' শৌদ্ধোদনি (৪) নামক কাব্যসূত্রকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' অনেকের মতে (৫) প্রথমে সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল; ইহার বর্ত্তমান ছন্দোবদ্ধ আকার পরবর্ত্তী কালের কৃতিত্ব। ভরত স্বয়ং, কোনও স্থলে দ্রুহিণাদির (৬) স্পষ্ট নামোচ্চারণ করিয়া, এবং কোনও স্থলে 'অন্যে' এই বেনামী নির্দ্দেশ দিয়া, (৭) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক আচার্য্যগণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে অনুমান করা যায় যে বৈদিক সময়ে না হইলেও অন্ততঃ সূত্ররচনার সময়ে, অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায়, অলঙ্কারশাস্ত্রও আলোচিত ও সূত্র-আকারে গ্রথিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃতসাহিত্যে কাব্যের যে বহুল চর্চ্চা ও বিকাশ দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বে অলঙ্কার-বিষয়ক মোটামুটি কোনও ধারণা যে একেবারেই ছিল না তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গুপ্তসম্রাটদিগের আমলে তদনুগত কবিস্তাবকেরা শিলালিপিগাত্রে যে দীর্ঘচ্ছন্দ কাব্যবহুল প্রশস্তি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে এই সকল প্রশস্তি-রচয়িতাগণের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র অজ্ঞাত ছিল না। (৮) কালিদাসাদির কাব্য ছাড়িয়া দিলেও অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্যরীতিতে লিখিত, সর্গবন্ধে গ্রথিত, এবং মহাকাব্য

(১) অথাত উপমা যদতৎ তৎসদৃশমিতি গার্গ্যস্তদাসাং কর্ম্ম জ্যায়সা বা গুণেন প্রখ্যাততমেন বা কনীয়াংসং বা প্রখ্যাতম্‌ বা উপমিমীতে, অথাপি কনীয়সা জ্যায়াংসম্‌ (নিরুক্ত, ৩।১৩)।

(২) পাণিনিসূত্র, ২।১।৫৫; ২।১।৫৬

(৩) পাণিনিসূত্র, ৪।৩।১১০; ৪।৩।১১১

(৪) অলঙ্কারশেখর (কাব্যমালা সংস্করণ), পৃঃ ২

(৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, p. 351 et seq.

(৬) ভরত, নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৬০ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)। 'দ্রুহিণ' অর্থে ব্রহ্মাও হইতে পারে; কিন্তু রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসায়' (গায়কবাড় সংস্করণ) 'দ্রুহিণ' বা 'দ্রৌহিণি' নামক আলঙ্কারিকের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭) ভরত, নাট্যশাস্ত্র, পৃঃ ৪৮।

(৮) Buhler, Indian Inscriptions and the Kavya, in the *Indian Antiquary* 1913, p. 146, p. 243 etc.

সংজ্ঞায় অভিহিত। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র শ্লিষ্ট রচনা যে শুধু অলঙ্কার-বহুল তাহা নহে, উক্ত গ্রন্থে 'শৃঙ্খলাবন্ধ-রচনা' এবং 'শ্লেষ' 'উৎপ্রেক্ষা' 'আক্ষেপ' (১) প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারের স্পষ্ট উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে গ্রন্থকার, অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চা না করিয়া, তাঁহার আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই। এমন কি তাঁহার গ্রন্থের শেষে সুবন্ধু সগর্ব্বে বলিয়াছেন যে তাঁহার রচনায় প্রত্যেক অক্ষরে 'শ্লেষ'-প্রয়োগচাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। (২) বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিতে'র সময় অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ করিবার নাই; কারণ বাণভট্ট 'উপমা' 'দীপক' 'শ্লেষ' 'জাতি' (স্বভাবোক্তি) (৩) ভিন্ন 'অক্ষরচ্যুত' 'মাত্রাচ্যুত' 'বিন্দুমতী' ও 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি (৪) বিশিষ্ট অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আলঙ্কারিকনির্দ্দিষ্ট 'কথা' 'আখ্যানক' ও 'আখ্যায়িকার' ভেদ (৫) তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক হইতে ভামহ দণ্ডী প্রভৃতির গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার পর অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চা ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে আর কোনও কথা থাকে না।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলা যায় না, তবে ইহার বর্ত্তমান ছন্দোবদ্ধ কারিকা-ন্যস্ত আকারও যে ষষ্ঠ শতাব্দের বহু পূর্ব্বের রচনা তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ভরতের গ্রন্থে প্রধানতঃ নাট্য, অভিনয়, নৃত্যকলা, ও সঙ্গীতশাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা থাকিলেও, কতকগুলি অধ্যায়ে প্রসঙ্গতঃ নাট্যে সঙ্গীতে এবং কাব্যে প্রযোজ্য অলঙ্কারাদির বিবৃতি আছে (৬)। পূর্ব্বাচার্য্যগণ কাব্যের দৃশ্যত্ব এ শ্রব্যত্বভেদ (৭) না করিলেও পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ নাটককে কাব্যের ভেদবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভরতের মত সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। ভরত কাব্যের সাধারণ লক্ষণাদি সম্বন্ধে

---

(১) বাসবদত্তা (শ্রীবাণীবিলাস সংস্করণ) 'শৃঙ্খলাবন্ধো বর্ণগ্রথনাসু, উৎপ্রেক্ষাক্ষেপৌ কাব্যালঙ্কারেষু (পৃঃ ১৪৬)। 'ততো দীর্ঘোচ্ছ্বাসরচনাকুলং সুশ্লেষবক্রঘটনাপটু সৎকাব্যবিরচনমিব' (পৃঃ ২৩৮)। সৎকবি-কাব্যরচনামিব অলঙ্কারপ্রসাধিতাম্ (পৃঃ ৩০৩)। 'সৎকবিকাব্যবন্ধ ইবানবদ্ধ-তু-হি-নিপাতঃ (পৃঃ ১৫৮)।

(২) প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রপঞ্চবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিং প্রবন্ধম্।
সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ॥ (পৃঃ ৩৫৭-৮)।

(৩) কাদম্বরী (Ed. Peterson, পৃঃ ২)—'হরন্তি কং নোজ্জ্বলদীপকোপমৈর্নবৈঃ পদার্থৈরুপপাদিতাঃ কথাঃ। নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ সুজাতয়ো মহাস্রজশ্চম্পককুট্মলৈরিব॥'

(৪) 'কদাচিদক্ষরচ্যুতকমাত্রাচ্যুতকবিন্দুমতীগূঢ়চতুর্থপাদপ্রহেলিকাপ্রদানাদিভিঃ' (পৃঃ ৭, পংক্তি ২২-৩)।

(৫) হর্ষচরিত (Introd. verses), 'উচ্ছ্বাসান্তেঽপ্যখিন্নাস্তে যেষাং বক্ত্রে সরস্বতী। কথমাখ্যায়িকা-কারা নতে বন্দ্যাঃ কবীশ্বরাঃ।' কাদম্বরী (পৃঃ ৭), 'কাব্যনাটকাখ্যানকাখ্যায়িকা' ইত্যাদি।

(৬) ৬ষ্ঠ অধ্যায় (রসাধ্যায়); ৭ম অধ্যায় (ভাবব্যঞ্জনাধ্যায়); ১৬শ অধ্যায় (অলঙ্কারলক্ষণাধ্যায়) ইত্যাদি।

(৭) দণ্ডী নাটককে গদ্যপদ্যের মিশ্রকাব্য ধরিয়াছেন (১।৩১); কিন্তু 'তেষামন্যত্র বিস্তরঃ' বলিয়া এক কথায় শেষ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বামন নাটককে সর্ব্বপ্রধান রচনা বলিয়াছেন—'সন্দর্ভেষু দশরূপকং

বিশেষ কিছু বলেন নাই, সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত তাঁহার মতাদির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে ভাব ও অলঙ্কারাদির কথাই বেশী বলিয়াছেন; তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে নাটকের উপজীব্য রস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা পরে দেখিব যে আনন্দবর্দ্ধনাদি কাব্যগত রসের ধারণা মুখ্যতঃ ভরত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা পরে আলোচ্য। কিন্তু ভরতের কাব্যবিষয়ক ধারণা সম্পূর্ণ নাট্যাত্মক (dramatic)। এ কথা নাট্যশাস্ত্র ১৬।১১৮ ও অন্যান্য স্থল হইতে জানা যায়, এবং অভিনবগুপ্ত ইহা বেশ স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'কাব্যং তাবন্ মুখ্যতো দশরূপাত্মকমেব'; কিন্তু এই নাট্যের মূলবস্তু রস। গুণ দোষ অলঙ্কার সমস্তই এই রসাভিব্যক্তির অধীন (১।১০৪)। সেইজন্য ভরত প্রথমেই বলিয়াছেন (৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬২) 'তত্র রসানেব তাবদাদাবভিব্যাখ্যস্যামঃ। ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্তত ইতি।' অভিনবগুপ্ত আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—'নাট্যাৎ সমুদায়রূপাদ্ রসাঃ। যদি বা নাট্যমেব রসাঃ রসসমুদায়ঃ। নাট্য এব চ রসাঃ, কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসঃ কাব্যার্থঃ'। ভরতের মতে, গুণ দোষ অলঙ্কারাদি 'বাচিক অভিনয়' বা 'অনুভাবের' অঙ্গস্বরূপ এবং এই অনুভাব বা বাচিক অভিনয়ের দ্বারা রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। (ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬২; ৭।৫; ৮।৬; ৮।৯১)। বাচিক অভিনয়ের কথা ভরত চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বলিয়াছেন; অলঙ্কারাদি ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং প্রসঙ্গতঃ অলঙ্কারাদিকে তিনি বাচিক অভিনয়ের অন্তর্ভূত করিয়াছেন।

ভরতের পরে এবং দণ্ডী বা ভামহের পূর্ব্বে আরও কয়েকটি আলঙ্কারিকের নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের কোনও গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। দণ্ডী তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে পূর্ব্বাচার্য্যগণকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—"পূর্ব্বশাস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রযোগানুপলভ্য চ। যথাসামর্থ্যমস্মাভিঃ ক্রিয়তে কাব্যলক্ষণম্॥" (১।২)। ইহার ব্যাখ্যায় কাব্যাদর্শের কোনও অজ্ঞাতনামা টীকাকার (১) দণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্যপ ও বররুচির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভামহের গ্রন্থে (২) মেধাবীর নামও পাওয়া যায়। 'বাসবদত্তা'য় 'বুদ্ধসঙ্গতি'-রচয়িতা ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক (৩) কোনও আলঙ্কারিকের নাম দৃষ্ট হয়; কিন্তু বৌদ্ধ

(১) রঙ্গাচার্য্যসম্পাদিত কাব্যাদর্শে হৃদয়ঙ্গমাখ্য টীকা, পৃঃ ৩—'পূর্ব্বেষাং কাশ্যপবররুচিপ্রভৃতীনামাচার্য্যাণাং লক্ষণশাস্ত্রাণি সংহৃত্য' ইত্যাদি।

(২) কমলাশঙ্কর ত্রিবেদীসম্পাদিত প্রতাপরুদ্রীয়ের পরিশিষ্টে মুদ্রিত ভামহের কাব্যালঙ্কার, পৃঃ ২১৭ ও ২২১। রুদ্রটের কাব্যালঙ্কারটীকায় নমিসাধুও (১।২; ১১।২৪; ১২।১৪৫) এই মেধাবী বা মেধাবিরুদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই মেধাবী যে জন্মান্ধ ছিলেন তাহা রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' (পৃঃ ১২) হইতে জানা যায়।

(৩) কন্দর্পকেতুর মুখে বাসবদত্তার বর্ণনাবসরে 'বৌদ্ধসঙ্গতিমিব অলঙ্কারভূষিতাম্' এই পাঠ কলিকাতায় মুদ্রিত সংস্করণে দৃষ্ট হয়। এবং ইহার শিবরামকৃত টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়—'অলঙ্কারো নাম

ধর্ম্মকীর্ত্তি কোন সময়ের লোক তাহা ঠিক জানা যায় না। রাজশেখর (১০ম শতক) তাঁহার 'কাব্য-মীমাংসা'র প্রারম্ভে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিক ও তদধিকৃত বিষয়ের তালিকা দিয়াছেন। 'তত্র কবিরহস্যং সহস্রাক্ষঃ সমাম্নাসীৎ, ঔক্তিকমুক্তিগর্ভঃ, রীতি-নির্ণয়ং সুবর্ণনাভঃ, আনুপ্রাসিকং প্রচেতায়নঃ, যমকানি চিত্রং চিত্রাঙ্গদঃ, শব্দশ্লেষং শেষঃ, বাস্তবং পুলস্ত্যঃ, ঔপম্যমৌপকায়নঃ, অতিশয়ং পারাশরঃ, অর্থশ্লেষমুতথ্যঃ, উভয়ালঙ্কারিকং কুবেরঃ, বৈনোদিকং কামদেবঃ, রূপক-নিরূপণীয়ং ভরতঃ, রসাধিকারিকং নন্দিকেশ্বরঃ, দোষাধিকরণং ধিষণঃ, গুণৌপাদানিকমুপমন্যুঃ, ঔপনিষদিকং কুচভারঃ ইতি'। (পৃঃ ১) ইহা ভিন্ন তিনি সুরানন্দ, শ্যামদেব, আপরাজিতি, কালিদাস, অবন্তীসুন্দরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। অবন্তীসুন্দরী রাজ-শেখরের পত্নী ছিলেন, তাহা 'কর্পূরমঞ্জরী'র প্রস্তাবনা হইতে জানা যায়। 'অগ্নিপুরাণে' কাব্যলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় আছে, কিন্তু তাহা পরবর্ত্তী কালের রচনা হইলেও, তাহাতে ধ্বনিকারের মতের কোনও উল্লেখ নাই এবং স্থানে স্থানে দণ্ডীর বাক্য যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার রচনাকাল বোধ হয় 'কাব্যাদর্শ' ও 'ধ্বন্যালোকের' (৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শতকের) মধ্যবর্ত্তী।

এ পর্য্যন্ত অলঙ্কার সম্বন্ধে যে কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে, ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' (১) ছাড়িয়া দিলে, দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। কাব্যের লক্ষণাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দণ্ডীর গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়।

দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে কুত্রাপি স্পষ্ট করিয়া কাব্যের (Poetry) লক্ষণনির্দ্দেশ করেন নাই, তবে তাঁহার সমগ্র গ্রন্থে কাব্য-সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। 'কাব্যাদর্শ' এই গর্ব্বিত নামে অভিহিত হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ প্রধানতঃ কাব্য-গত গুণ, দোষ, রীতি, ও অলঙ্কারের আলোচনা-তেই পর্য্যবসিত। অলঙ্কার শব্দ কাব্যলক্ষণাদি-শাস্ত্রে (Poetics) সাধারণতঃ দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিস্তৃত অর্থে, কাব্যে যাহা কিছু সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক ও চিত্তা-কর্ষক তাহাই অলঙ্কার। "সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ" বামনের এই সূত্রে (২) এই বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ করণব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন

অলঙ্কারপ্রসাধিতাম্' এইরূপ আছে। এই ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি কি না তাহা অনুসন্ধেয়। তাহা যদি হয় তবে ইহার আবির্ভাবকাল ৭ম শতকের মধ্যভাগ। ধ্বন্যালোকেও (পৃঃ ২১৬-৭) ইহার উল্লেখ আছে।

(১) ভামহ ও দণ্ডীর পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে, কিন্তু ভামহ আগে কি দণ্ডী আগে সে বিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ সমূহ দ্রষ্টব্য—J, R. A. S. 1905, p 535 sq; K. P. Trivedi. Introd. to *Prataparudriya*, p xxviii, sq; J. R. A. S. Bomb. xxiii; Rangacharya, Introd. to *Kavyadarsa*; *Indian Antiquary* 1912, p 90 sq and p. 232 sq; *Indian Antiquary* 1913, p. 258 sq; Jacobi, ZDMG. vol. 64, p. 134.

অর্থে, অলঙ্কার উপমারূপকাদিস্বরূপ শব্দার্থের শোভাতিশায়ি ধর্ম্ম বা প্রয়োগ বুঝায় (১); ইংরাজিতে যাহাকে figure of speech বলে। দণ্ডী ভামহ উদ্ভট রুদ্রট (২) প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ এই সঙ্কীর্ণঅর্থজ্ঞাপক, অলঙ্কারকেই যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়াছেন। যদিও দণ্ডী অলঙ্কারকে "কাব্যশোভাকর ধর্ম্ম" (৩) মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি কাব্যাদর্শের বেশীর ভাগ ইহারই আলোচনায় প্রযুক্ত করিয়াছেন। কাব্যের 'আত্মা' কি সে বিষয়ে দণ্ডী কোনও বিচার করেন নাই, এবং পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ কাব্যের যে তিনটি ভাগ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। অন্য এক স্থলে দণ্ডী অলঙ্কার অর্থে শ্লেষ-প্রসাদ-সমতা-মাধুর্য্যাদি কাব্যের 'গুণ' (qualities of style) বুঝিয়াছেন (৪); এবং কাব্যরীতির যে দশটি গুণের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একস্থলে 'সমাধি' (harmony) গুণকে এত প্রাধান্য দিয়াছেন যে তাহাতে মনে হয় যে তিনি ইহাকেই কাব্যের সর্ব্বস্ব (৫) মনে করেন। তাঁহার নিকট কাব্যের 'ব্যঙ্গ্য অর্থ' (suggested sense) যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাহা বলা যায় না, কারণ 'সমাসোক্তি', 'ব্যাজস্তুতি' 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা' প্রভৃতি অলঙ্কারের লক্ষণে ব্যঙ্গ্যার্থের অল্পবিস্তর ধারণা অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ ধ্বনি (suggestion) অর্থে যাহা বুঝেন তাহা দণ্ডী (৬) (এবং ভামহ ও উদ্ভটও) 'পর্য্যায়োক্তে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন (৭)। তথাপি আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য অর্থ' কে যেরূপ প্রাধান্য দিয়াছেন তাহা এই সকল গ্রন্থে দেখা যায় না। রস সম্বন্ধে দণ্ডীর ধারণা বিশেষ পরিস্ফুট না হইলেও, এ বিষয়ে দণ্ডী যে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তাহা বলা যায় না। মাধুর্য্য গুণের বিশ্লেষণে তিনি 'বাচি বস্তুন্যপি

---

(১) উক্ত সূত্রের বৃত্তিতে বামন বলিয়াছেন—'করণব্যুৎপত্ত্যা পুনরলঙ্কারশব্দোঽয়ং উপমাদিষু বর্ত্ততে।'

(২) ভরত অলঙ্কারকে ভূষণ হিসাবেই ধরিয়াছেন এবং রসব্যক্তিই কাব্য ও নাটকের উদ্দেশ্য এ কথা বহুস্থলে বলিয়াছেন। অলঙ্কার ও গুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'অলঙ্কারৈ গু ণৈশ্চৈব বহুভিঃ সমলঙ্কৃতম্। ভূষণৈরিব বিন্যস্তৈস্তদ্ভূষণমিতি স্মৃতম্॥ (নাট্যশাস্ত্র, ১৬।৪)। 'প্রয়োগমেষাং চ পুনর্বক্ষ্যামি রসসংশ্রয়ম্॥' (১৬।১০৪)।

(৩) কাব্যাদর্শ, ২।১

(৪) কিন্তু দণ্ডী 'গুণ'কে মুখ্য অলঙ্কার এবং উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারকে 'গৌণ' অলঙ্কার হিসাবে ধরিয়াছেন এইরূপ বোধ হয়।

(৫) 'তদেতৎ কাব্যসর্ব্বস্বং সমাধির্নাম যো গুণঃ। কবিসার্থঃ সমগ্রোঽপি তদেনমনুগচ্ছতি' (কাব্যাদর্শ, ১।১০০)

(৬) কাব্যাদর্শ ২।২৯৫

(৭) এ সম্বন্ধে আনন্দবর্দ্ধন বলেন—'পর্য্যায়োক্তেঽপি যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যত্বং তদ্ভবতু নাম ধ্বনাবন্তর্ভাবঃ। নতু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভাবঃ। তস্য মহাবিষয়ত্বাঙ্গিত্বেন চ প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। ন পুনঃ পর্য্যায়োক্তে ভামহোদাহৃতসদৃশে ব্যঙ্গ্যস্যৈব প্রাধান্যম্। বাচ্যস্য তত্রোপসর্জনীভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ।

রসস্থিতিঃ' (১) এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি আর এক স্থলে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অলঙ্কার অর্থকে রসাভিষিক্ত করে (২)। প্রেয়স্ ও রসবদ্ এই দুই বিশিষ্ট অলঙ্কারের লক্ষণেও (৩) তিনি রসের স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন। ভট্টলোল্লট প্রভৃতির ন্যায় দণ্ডীও রসসম্বন্ধে 'উৎপত্তিবাদী'। কিন্তু দণ্ডী ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ আনন্দবর্দ্ধনাদির ন্যায় রসকে প্রাধান্য দেন নাই এবং দর্পণকারের ন্যায় 'কাব্যের আত্মা' বলিয়া সর্ব্বাগ্রে অভিহিত করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন নাই।

ইহা হইতে বোঝা যাইবে কাব্য সম্বন্ধে দণ্ডীর ধারণা অত্যন্ত আদিম, সঙ্কীর্ণ; এবং পরবর্ত্তী জটিলতার দ্বারা অনাক্রান্ত। দণ্ডী একস্থলে কাব্যের 'শরীর' এবং (এই শরীরের) 'অলঙ্কারে'র উল্লেখ করিয়াছেন; (৪) কিন্তু এই শরীরের অন্তর্ভূত শক্তি-স্বরূপ 'আত্মা'র (soul of poetry) কথা কোথাও বলেন নাই। বোধ হয় তাঁহার ধারণা এই কাব্যের 'শরীর' অতিক্রম করিয়া বেশী দূর যায় নাই। 'কাব্য-শরীর' কি তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী"। কিন্তু ইহাই তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সমগ্র ধারণা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ গুণদোষ ও অলঙ্কার ভিন্ন তিনি রীতির (style) উপরেও অনেকখানি জোর দিয়াছেন। প্রকৃত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্যে অর্থ ও ভাবাদি উপযুক্ত ভাষায় ও ভঙ্গীতে ব্যক্ত হওয়া উচিত এ কথা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে বামনাচার্য্য 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' (৫) বলিয়া রীতিকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়াছেন, দণ্ডী ততদূর যান নাই। তথাপি ভামহ যেরূপ রীতিকে উপেক্ষা করিয়াছেন (৬) দণ্ডী তাহা করেন নাই। বরং ইহাকে কাব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বা উপায় বলিয়া ধরিয়াছেন। দণ্ডী বৈদর্ভী

---

(১) কাব্যাদর্শ, ১।৫১।

(২) 'কামং সর্ব্বোঽপ্যলঙ্কারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি' (কাব্যাদর্শ, ১।৬২)।

(৩) কাব্যাদর্শ, ২।২৭৫। তথা ২।২৮১—৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) কাব্যাদর্শ, ১।১০। কাব্যাদর্শের পূর্ব্বোক্ত টীকাকার 'শরীর' অর্থে "কাব্যানাং স্বরূপম্" এইরূপ ধরিয়াছেন। কিন্তু তরুণবাচস্পতি [Rangacharya Edition পৃঃ ৮] এবং প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ [Bibliotheca Indica Ed. পৃঃ ১০] সাধারণ অর্থেই লইয়াছেন। প্রেমচন্দ্র টীকা করিয়াছেন "কাব্যানাং শরীরঞ্চ আত্মভূতস্য রসাদিব্যঙ্গ্যস্য দেহভূতাশ্রয়শ্চ।" অবশ্য এস্থলে 'আত্মভূতস্য রসাদিব্যঙ্গ্যস্য' কথাটা দণ্ডীর নহে, তাঁহার নিজের, ধ্বন্যালোকাদি হইতে দণ্ডীর উপর আরোপিত করা হইয়াছে। 'রসগঙ্গাধরে' জগন্নাথ বলিয়াছেন—'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্'। (পৃঃ ৪)

(৫) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র, ১।২।৬

(৬) 'বৈদর্ভমন্যদস্তীতি মন্যন্তে সুধিয়োঽপরে। তদেব চ কিল জ্যায়ঃ সদর্থমপি নাপরম্॥ গৌড়ীয়মিদমেতত্তু বৈদর্ভমিতি কিং পৃথক্। গতানুগতিকন্যায়ান্নানাখ্যেয়মমেধসাম্॥ ইত্যাদি (ভামহ, কাব্যালঙ্কার ১।৩১-৩২)

ও গৌড়ী এই দুই রীতিভেদ করিয়াছেন এবং মোটামুটি ধরিলে ইহারা অনাড়ম্বর রীতি (plain style) এবং প্রাজ্ঞরীতি (learned style) বুঝায়। এই দুই রীতির সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া দণ্ডী দেখাইয়াছেন যে বৈদর্ভীই শ্রেষ্ঠ রীতি (১।৪১-১০০)। এই দুই প্রকার সীমান্তগত রীতির মধ্যস্থলে যে নানা প্রকার মিশ্র বা অন্তর্বর্ত্তী রীতি থাকিতে পারে তাহা দণ্ডীর অজ্ঞাত ছিল না (১।৪০ ; ১।১০১) কিন্তু কাব্যের রীতি যে সর্ব্বত্র ভাব বা অর্থের অনুযায়ী হওয়া উচিত এ কথার আলোচনা দণ্ডী কোথাও বিশেষভাবে করেন নাই। দণ্ডীর পূর্ব্বে ভরত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কাব্যের বা নাটকের রীতি যে কেবল উপযুক্ত শব্দের দ্বারা অর্থের অনুসরণ করিবে তাহা নহে, পরন্তু কবি যাহার মুখে ইহা বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহারও স্বভাব বা প্রকৃতির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। রীতি যে ব্যক্তিগত (individual) হইতে পারে তাহার উল্লেখ দণ্ডীতে নাই। যাহা হউক, বামনের কথা ছাড়িয়া দিলে, কাব্যাদর্শ ভিন্ন অন্য কোথাও রীতি (বা style) কে এত প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। দণ্ডী মাধুর্য্য-প্রসাদাদি যে দশটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন (১) তাহাও শুধু রীতির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। দণ্ডীর পরবর্ত্তী বামন এই দশগুণের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে ইহা কেবল রীতির গুণ নহে, কাব্যের সমগ্র অর্থের মধ্যেও উপলব্ধি হয়।

রীতির প্রসঙ্গে দণ্ডী বলিয়াছেন যে 'কান্তি' (heightened speech) বৈদর্ভী রীতির বিশিষ্ট গুণ ; গৌড়ী রীতির বিশিষ্ট গুণ 'অত্যুক্তি' (exaggeration) [১।৮৫-৯২]। দণ্ডী যে কান্তিগুণের কথা বলিয়াছেন তাহা ভামহের 'বক্রোক্তি' ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা 'ধ্বন্যালোক' ও 'লোচন'টীকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় (পৃঃ ২০৭-৮)। সুতরাং দণ্ডী যাহাকে গুণমাত্র বলিয়া ধরেন ভামহ তাহাকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়াছেন।

অন্যত্র দণ্ডী মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ (২) করিয়াছেন তাহা হইতেও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অনেকটা পাওয়া যায়। অন্যান্য বিশিষ্টতার মধ্যে তাঁহার মতে মহাকাব্য 'সদলঙ্কারযুক্ত' এবং 'রসভাব নিরন্তর' হওয়া আবশ্যক।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে দণ্ডীর মতে তন্নামযোগ্য প্রত্যেক কাব্যে অন্ততঃ চারিটি জিনিস থাকা উচিত—কাব্যের সম্পত্তিস্বরূপ মাধুর্য্যাদিগুণযুক্ত রীতিতে রচনা, কাব্যের বিপত্তিস্বরূপ দোষের বিসর্জ্জন, কাব্য-শোভাকর অলঙ্কারের সদ্ভাব, এবং বোধ হয় আনন্দবর্দ্ধক রসের সমাবেশ। এই চারিটি কাব্য-ধর্ম্মের সমবায় তিনি 'সৌভাগ্য' (৩) নামে অভিহিত করিয়াছেন

(১) ভরতও এই দশগুণের উল্লেখ করিয়াছেন (নাট্যশাস্ত্র ১৬।৯২) কিন্তু রীতির প্রসঙ্গে নহে। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এই 'গুণ' গুলি কাব্যের গুণ বলিয়া ধরিয়াছেন।

(২) কাব্যাদর্শ, ১।১৪-১৯

(৩) কাব্যাদর্শ ১।১০ (Bibl. Indica)

এবং এই সৌভাগ্যের ফলস্বরূপ সমগ্র কাব্যে 'মাধুর্য্য' (১) নামক আস্বাদের উৎপত্তি হয়; অবশ্য এই মাধুর্য্য ও রীতির গুণস্বরূপ মাধুর্য্য (২) এক জিনিস নহে।

দণ্ডী সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা ভামহ ও উদ্ভটেও অল্প বিস্তর প্রযোজ্য। ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' শ্রীযুক্ত কমলাশঙ্কর ত্রিবেদী তৎসম্পাদিত প্রতাপরুদ্রীয়ের পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিয়াছেন। (৩) প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যলক্ষণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও, প্রধানতঃ গুণ, দোষ, ও অলঙ্কারের বিচারেই ভামহের সমগ্র গ্রন্থ নিয়োজিত হইয়াছে। শব্দার্থই কাব্য এবং রূপকাদি প্রসাধনস্বরূপ, (৪) কারণ "ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্"। (৫) কিন্তু ইহা শুধু কাব্যশরীরের কথা। তৎপরে ১৬০ সংখ্যক শ্লোকে অলঙ্কার বা figures of speech এর বিবৃতি। তদনন্তর দোষের বিচার। শেষ দুই অধ্যায়ে ন্যায়নির্ণয় (logic of poetry) এবং শব্দশুদ্ধি (grammatical purity) সম্বন্ধে আলোচনা। দণ্ডীর ন্যায় ভামহও অলঙ্কারকেই বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন।

ভামহের মতে, কোনও প্রবন্ধের চিত্তাকর্ষক বিশিষ্ট গুণের নাম 'ভাবিক' বা 'ভাবিকত্ব' (৩।৫২); এই ভাবিকের কথা দণ্ডীও (২।৩৬৩) বলিয়াছেন। কিন্তু ভামহ বলেন যে রচনায় এই ভাবিকত্ব 'বক্রোক্তি' ভিন্ন পরিস্ফুট হয় না; কারণ বক্রোক্তিই সমস্ত গুণ বা অলঙ্কারের মূলস্বরূপ, এবং বক্রোক্তি ভিন্ন কোনও অর্থ প্রতীয়মান হয় না—

সৈষা সর্ব্বত্র বক্রোক্তিরনয়াঽর্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্য্যঃ কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা॥ (২।৮৫)

ভামহ কবিগণ 'বক্রবাক্' বলিয়াছেন (৬।২৩) এবং অন্যত্র (২।৮১) 'অতিশয়োক্তি' দ্বারা বাক্যের যে লোকাতিক্রান্তগোচরতা বুঝাইয়াছেন তাহা অলৌকিক 'বক্রতা' ভিন্ন আর কিছুই নহে। অভিনবগুপ্ত ('ধ্বন্যালোকলোচন', পৃঃ ২০৮) এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানম্'। কবিপ্রতিভাহীন ব্যক্তি সাধারণতঃ যে বাক্য ব্যবহার করে তাহার মধ্যে হৃদ্যতা, বৈচিত্র্য, বা বক্রতা নাই, তাহা 'স্বভাবোক্তি' (natural speech); কিন্তু কবির উক্তি ইহা হইতে ভিন্ন। তাহাতে শব্দের ও অর্থের বৈচিত্র্য আছে,, তাহা বক্রোক্তি (imaginative speech)। সেইজন্য ভামহ বলেন যে—

'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ'। (২।৩৬) এবং বক্রোক্তি-শূন্য বলিয়া তিনি হেতু, সূক্ষ্ম, লেশ প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারকে অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য করেন না। (২।৮৬)

---

(১) কাব্যাদর্শ, ১।১০২

(২) কাব্যাদর্শ, ১।৫১

(৩) প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ (Bombay Sans. series) App. viii pp. 209-231

(৪) ভামহালঙ্কার, ১।৯ হইতে ২৩ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২১০-১১। ভামহ গুণ ও অলঙ্কারের পার্থক্য করেন নাই। ভাবিকত্বকে তিনি গুণও বলিয়াছেন, অলঙ্কারও বলিয়াছেন।

(৫) ঐ ১।১৩; এই শ্লোকাংশ কাব্যপ্রকাশে (৫।১) উদ্ধৃত হইয়াছে।

রসভাব প্রভৃতির ধারণা অজ্ঞাত না থাকিলেও, তাহাদিগকে ভামহ বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই। তিনি উল্লিখিত শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বক্রোক্তিদ্বারা সমস্ত অর্থ 'বিভাবিত' হয়। 'বিভাব্যতে' অর্থে অভিনবগুপ্ত বলেন (ধ্বন্যালোকলোচন, পৃঃ ২০৮)—'বিভাবতাং নীয়তে বিশেষেণ চ ভাব্যতে রসময়ীক্রিয়ত ইতি'। এই ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয়, তবে ভামহের 'বিভাব্যতে' শব্দটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক এবং ইহার দ্বারা ভামহ বুঝাইতে চান যে বক্রোক্তি হইতে অলঙ্কার (বা গুণ) ও রস এই দুয়ের উৎপত্তি। রসবদ্ অলঙ্কারের মধ্যেও ভামহ বলিয়াছেন—'রসবদ্দর্শিতস্পষ্ট-শৃঙ্গারাদি রসম্' (৩।৬)। কিন্তু তাঁহার মতে কাব্যে নিরন্তর রসস্থিতির প্রয়োজন নাই; বক্রোক্তির প্রয়োজন আছে (১।৩০)।

বক্রোক্তির যে আধুনিক সংকীর্ণ অর্থ 'সাহিত্যদর্পণ'কার (১০।৯) দিয়াছেন তাহা রুদ্রটে প্রথম দেখা যায় (২।১৪-১৭)। 'বক্রোক্তিজীবিত'কার কুন্তক ভামহের বক্রোক্তিকে বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিলেও, (১) পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ বক্রোক্তিকে ভামহের অর্থে ব্যবহার করেন নাই, সামান্য অলঙ্কারপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভামহের 'বক্রোক্তি' একেবারে লুপ্ত হয় নাই 'কাব্যপ্রকাশে' ও 'সাহিত্য দর্পণে' কবি 'প্রৌঢ়োক্তি' এই নূতন নামে আত্মগোপন করিয়া পুনরায় দেখা দিয়াছে।

উদ্ভটের 'অলঙ্কার-সংগ্রহে' (২) ছয়টি অধ্যায়ভুক্ত ১৭৫ শ্লোকে কেবলমাত্র ৪১টি অলঙ্কারের লক্ষণনির্দ্দেশ আছে। কাব্য-লক্ষণসম্বন্ধে কোনও কথা নাই। ভট্ট উদ্ভট বোধ হয় অলঙ্কারকেই কাব্যের সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়াছেন। প্রতিহারেন্দুরাজ তাঁহার বিস্তৃত টীকায় অনেক নূতন কথা আনিয়াছেন এবং উদ্ভটের মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তাহা কতটা তাঁহার নিজের এবং কতটা উদ্ভটের তাহা বলা কঠিন। (৩) প্রতিহারেন্দু-রাজের বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া

---

(১) রুয্যক, অলঙ্কারসর্ব্বস্ব পৃঃ ৮ (ও জয়রথটীকা)। মহিমভট্ট, ব্যক্তিবিবেক, পৃঃ ২৮, ৩৭, ৫৮, ৬৪, ও ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৬, ৩৬, ৩৭, ৪৩-৪৪

(২) উদ্ভটের গ্রন্থ প্রথম J. R. A. S. vol. xxix. N. S. 1897, p. 829-853তে মুদ্রিত হইয়াছিল। নির্ণয়সাগর যন্ত্রে প্রতিহারেন্দুরাজের টীকার সহিত ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ শ্রীগোপেন্দ্র ত্রিপুরহর গোপাল রচিত বামনের টীকায় (Benares Sans. Series Ed. p, 5) এবং রুয্যকের অলঙ্কার সর্ব্বস্বে (Trivandrum Ed. p. 7) উদ্ভটের যে শোকাংশ পাওয়া যায় মুদ্রিত পুস্তকে তাহা নাই। উদ্ভট ভামহের উপর ভামহবিবরণ নামক একটি অধুনালুপ্ত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এ কথা যে কেবল প্রতিহারেন্দু রাজ (পৃঃ ১৩) বলিয়াছেন তাহা নহে, অভিনবগুপ্তের ধ্বন্যালোক-লোচনেও (পৃঃ ৯০) এ কথা আছে।

(৩) বুহলার (Buhler) (Kashmir Rep. J. R. A. S. Bomb. 1877) উদ্ভটকে কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড়ের সমকালীন বলিয়াছেন (৭৭৯-৮১৩ খ্রীঃ অঃ)। প্রতিহারেন্দুরাজ অনেক পরবর্ত্তী। পিশেলের

য্যাকোবি (ধ্বন্যালোক-অনুবাদ, উপক্রমণিকা পৃঃ ৫ এবং পৃঃ ১৭) বলেন যে উদ্ভট রসকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়াছেন। অবশ্য উদ্ভট রসসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু য্যাকোবি যে শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা উদ্ভটের নহে, প্রতিহারেন্দুরাজ 'তদাহুঃ' বলিয়া কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ('কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহ' পৃঃ ১৭)

রুদ্রট তাঁহার 'কাব্যালঙ্কারে' যে ভামহাদির উপর বেশী উন্নতি করিতে পারিয়াছেন তাহা বলা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে কাব্যের প্রশংসা ও কাব্যের প্রয়োজনসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে নূতন কথা খুব কমই আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাব্যলক্ষণের বিচার করিবেন বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত কাব্য-লক্ষণ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই আছে। প্রথম শ্লোকে "ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্" এই পৃষ্ঠপ্রতিবচনে শব্দার্থই কাব্যের মূল এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া প্রধানতঃ শব্দ এবং অর্থের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার পর বক্রোক্তি ও অনুপ্রাসের কথায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে যমক-লক্ষণ, চতুর্থ অধ্যায়ে শ্লেষের ব্যাখ্যা, পঞ্চম অধ্যায়ে চিত্র নামক শব্দালঙ্কারের বিবৃতি, ষষ্ঠ অধ্যায়ে শব্দালঙ্কারের দোষ-নিরূপণ। সপ্তম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত অলঙ্কারাদির নির্ণয়, একাদশ অধ্যায়ে অর্থালঙ্কারের দোষবিচার, এবং পরিশেষে চারিটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে নায়কনায়িকাদির বিবরণে গ্রন্থের সমাপ্তি। উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রধানতঃ শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের প্রতিপাদনই রুদ্রটের অলঙ্কারগ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। "জ্বলদুজ্জ্বলবাক্‌প্রসরঃ সরসং কুর্ব্বন্ মহাকবিঃ কাব্যম্" (১) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্বেতাম্বর নমি-সাধু 'সরস' অর্থে শৃঙ্গারাদি রসের সূচনা ধরিয়াছেন। (২) কিন্তু এক নায়কনায়িকা প্রকরণে (৩) ৪টি শ্লোক ভিন্ন রুদ্রট অন্য কোথাও রসের অবতারণা করেন নাই। রস সম্বন্ধে রুদ্রটের ধারণা নমিসাধু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'উচ্যতে, কাব্যস্য হি শব্দার্থৌ শরীরম্। তস্য চ বক্রোক্তিবাস্তবাদয়ঃ কটক-কুণ্ডলাদয় ইব কৃত্রিমা অলঙ্কারাঃ। রসাস্তু সৌন্দর্য্যাদয় ইব সহজাঃ গুণাঃ।' (৪) সুতরাং রস তাঁহার মতে কাব্যশরীরের সৌন্দর্য্যাদির মত সহজ গুণ এবং নায়কনায়িকা-প্রসঙ্গেই ইহার অভিব্যক্তি। রুদ্রট ভরতকে (৫) অনুসরণ করিয়া শৃঙ্গারাদি দশটি রসের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে (৬)—

রসনাদ্রসত্বমেষাং মধুরাদীনামিবোক্তমাচার্য্যৈঃ।
নির্ব্বেদাদিষ্বপি তন্নিকামস্তীতি তেঽপি রসাঃ॥

---

(১) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার ১।৪ (২) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৩

(৩) দ্বাদশ অধ্যায়, শ্লোক ১-৪ ইত্যাদি (৪) ১২।১ শ্লোকের উপর টীকা, পৃঃ ১৫০

(৫) ভরত নাট্যশাস্ত্রে ৮টি রসের উল্লেখ করিয়াছেন (নাট্যশাস্ত্র ৬।১৫)। রুদ্রট শান্ত ও প্রেয়ান্ এই দুটি অধিক রসের কথা বলিয়াছেন।

(৬) ভরত, নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৩-৩৪ দ্রষ্টব্য। Jacobi, Introd. to his translation of Dhvanyaloka p. 3 et seq.

রুদ্রট 'রীতি' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা দণ্ডীর মতানুযায়ী নহে। রুদ্রট বৈদর্ভী রীতির কোনও উল্লেখ করেন নাই; পাঞ্চালী লাটী (দাক্ষিণাত্য) ও গৌড়ী এই তিন রীতিভেদ করিয়াছেন। এই ভেদ সম্বন্ধেও দণ্ডীর সহিত মতপার্থক্য আছে। রুদ্রটের মতে বাক্যগত লঘু মধ্য আয়ত সমাসবিরচনা লইয়াই এই ত্রিবিধ ভেদ। (১)

রুদ্রট 'ভাব' এই অলঙ্কারের (২) যে লক্ষণ এবং উদাহরণ দিয়াছেন তাহাতে ব্যঙ্গ্যার্থের (suggested sense) সূচনা আছে কিন্তু ব্যঙ্গার্থের স্পষ্ট ধারণা কোথাও নাই। রুদ্রট যদি আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী হন তবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। (৩)

তাহার পর বামন। (৪) বামনের গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত এবং ইহার বৃত্তিও তাঁহার স্বকৃত। বামনের মতে "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" এবং "বিশিষ্টপদরচনা রীতিঃ"। (৫) এই বিশিষ্ট পদরচনা কি তাহার উত্তরে বামন বলিয়াছেন "বিশেষো গুণাত্মা" অর্থাৎ মাধুর্য্যাদি-গুণাত্মকরচনাই বিশিষ্টরচনা। এবং এইরূপ গুণবিশিষ্ট-রচনা-মূলক রীতিই কাব্যের আত্মাস্বরূপ। বামনের মতে রীতি ত্রিবিধ—(৬) বৈদর্ভী, গৌড়ী, ও পাঞ্চালী। এ বিষয়ে বামন রুদ্রটের মত অনুসরণ করেন নাই; বরং বৈদর্ভী সম্বন্ধে দণ্ডী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বামনের সহিত বিশেষ মত ভেদ নাই। যে রীতিতে মাধুর্য্যাদি দশটি গুণই দেখা যায় তাহাকে দণ্ডী ও বামন উভয়ই গ্রাহ্য ও উপাদেয় বৈদর্ভী রীতি বলেন। কিন্তু শ্লিষ্ট শিথিল অল্প-প্রাণাক্ষরবহুল গৌড়ীরীতিকে দণ্ডী বৈদর্ভীর বিপরীত রীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বামনের মতে কতকগুলি বিশিষ্টগুণের সদ্ভাব লইয়াই গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতির ভেদ; অর্থাৎ শুধু ওজঃ ও কান্তিগুণ থাকিলেই গৌড়ী এবং মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য্যগুণ থাকিলেই পাঞ্চালী রীতি।

---

(১) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার, ২।৪-৬

(২) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার ৭।৩৮-৪১

(৩) রুদ্রটের আবির্ভাবকাল ১০ম শতকের মধ্যভাগ এইরূপ Peterson নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Report J. R. A. S. Bomb 1883 Extra no. p. 17); কিন্তু Pischel প্রভৃতি রুদ্রট ও শৃঙ্গারতিলক-ভাণ রচয়িতা রুদ্রভট্ট একই ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া ৯ম শতাব্দের মধ্যভাগ এইরূপ কালনির্ণয় করিয়াছেন (Indrod. to Pischel's Sringartilaka)। তাহা যদি হয় তবে রুদ্রট আনন্দবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

(৪) বামনের আবির্ভাবকাল কেহ ৮ম (Pathak in J. R. A. S. Bomb. 1892) কেহ ৯ম (Ganganath Jha, Preface to his Trans. of Vamana), কেহ বা ১০ম শতকের মধ্যভাগ (Buhler, Kashmir Report P. 65) ধরিয়াছেন। ধ্বন্যালোকে বামনের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে সুতরাং বামন আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৫) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র, ১।২।৬-৮

কিন্তু 'রীতি' কাব্যের আত্মা হইলেও, শব্দ ও অর্থের সমবায়ই কাব্য, (১) এবং সকল কাব্য গুণ ও অলঙ্কারের জন্য উপাদেয় হয়। (২) গুণ ও অলঙ্কার কি তৎসম্বন্ধে বামন বলিয়াছেন—'কাব্যশোভায়াঃ কর্ত্তারো ধর্ম্মাঃ গুণাঃ' এবং 'তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ' (৩) অর্থাৎ গুণ কাব্যশোভার উৎপাদক এবং অলঙ্কার তাহার বর্দ্ধক। এস্থলে অবশ্য অলঙ্কার শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে লওয়া হইয়াছে এবং কেবল figure of speech বুঝাইতেছে। কিন্তু 'সৌন্দর্য্যমলঙ্কারঃ' (৪) এই প্রসিদ্ধ সূত্রে অলঙ্কার অর্থে বামন কাব্যের সমগ্র সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছেন। "কাব্যের এই 'অলঙ্কার' বা 'সৌন্দর্য্য' কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে তাহার উত্তরে এই কয়টি উপায়ের উল্লেখ আছে—(১) গুণবিশিষ্ট রীতিতে রচনা (২) দোষের বর্জ্জন এবং (৩) অলঙ্কারের (figure of speech) সমাবেশ। (৫)

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে বামনের সিদ্ধান্ত দণ্ডী হইতে বিভিন্ন না হইলেও অনেক বিষয়ে তদপেক্ষা পরিণত, সুস্পষ্ট এবং সুবিন্যস্ত। তথাপি তখনও অলঙ্কার-শাস্ত্রের সব কথা বলা হয় নাই। গুণ (qualities) ও অলঙ্কার (figure of speech) যে কাব্যে সহকারীমাত্র এবং আহার্য্য, তাহা বামন দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু গুণালঙ্কার যুক্ত শব্দার্থ যে কাব্যের একমাত্র উপজীব্য, এ ধারণা তিনি এখনও ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। দণ্ডী রসকে অলঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়াছেন (২।২৭৫; ২।২৮০-২৯২); কিন্তু বামন এ বিষয়ে দণ্ডীকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বামন বলিয়াছেন রচনার মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ (১।৩।৩০-৩৩) এবং বোধ হয় নাটকের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের জন্য ভরতাদিপ্রোক্ত নাটকের উপজীব্য রসকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। 'কান্তি' গুণের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন 'দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ' এবং এইরূপে তিনি রসকে গুণের অন্তর্ভূত করিয়া কাব্যের মুখ্য লক্ষণ-সমূহের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। 'বক্রোক্তি' (৬) অলঙ্কারের ব্যাখ্যায় ব্যঙ্গ্য অর্থের (suggested sense) অস্পষ্ট সূচনা থাকিলেও, ইহাকে বামন লক্ষণা (indication) বলিয়াই ধরিয়াছেন। ব্যঞ্জনাবৃত্তির (suggestion) কোনও আভাস তাহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

'কাব্যপ্রকাশে' (৭) উল্লিখিত শ্রীশঙ্কু নামক অলঙ্কারিকও বোধ হয় এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। যদি ইনি 'রাজতরঙ্গিণী'

---

(১) 'কাব্যশব্দোহয়ং গুণালঙ্কারসংস্কৃতয়োঃ শব্দার্থয়োর্ বর্ত্ততে' (১।১।১ বৃত্তি)।

(২) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র ১।১।১, 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'।

(৩) ঐ, ৩।১।১-২। বামন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে রীতি কাব্যের আত্মা এবং গুণবিশিষ্টপদরচনাই রীতি; তাহা হইলে গুণ কাব্যাত্মার অংশস্বরূপ। তাহারা উপস্কার্য্য (fit to be adorned); উপস্কারক (ornament) নহে। কিন্তু এখানে বামন গুণকে কাব্যোপস্কারক বা কাব্য-শোভাকর ধর্ম্ম বলিয়া অসঙ্গতি আনিয়াছেন।

(৪) ঐ, ১।১।২, ইহার বৃত্তিতে পুনঃ বলিয়াছেন—"করণব্যুৎপত্ত্যা পুনরলঙ্কারশব্দোহয়ং উপমাদিষু বর্ত্ততে।"

(৫) ১।১।৩, 'স দোষগুণালঙ্কারহানাদানাভ্যাম্।'

(৬) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র ৪।৩।৮

(৭) কাব্যপ্রকাশ (Bomb. Sans. Series Ed.) পৃঃ ৯০

গ্রন্থে উল্লিখিত (১) রাজা অজিতাপীড়ের সমকালীন কবি হন তবে ইঁহার আবির্ভাব-কাল নবম শতকের পূর্ব্বার্দ্ধ। (২) ভরতের 'রসোৎপত্তি' বিষয়ক সিদ্ধান্তসম্বন্ধে, মম্মট শ্রীশঙ্কুর যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে শ্রীশঙ্কু রসসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। ঝালকীকর তাঁহার কাব্য-প্রকাশের টীকায় (৩) বলিয়াছেন যে ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক,এবং অভিনব-গুপ্ত এই চারিজন পর্য্যায়ক্রমে মীমাংসা ন্যায় সাংখ্য ও অলঙ্কার মতানুযায়ী ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই কথা তিনি কোনও প্রাচীন টীকায় পাইয়াছেন (৪)।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে ধ্বনি (suggestion) বা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রথম প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃত বিচার 'ধ্বন্যালোকের' সময় হইতে। 'ধ্বন্যালোকে'র প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব্ব
তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।
কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্ ॥"

সুতরাং ধ্বনির ধারণা যে আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল এবং এ বিষয়ে যথেষ্ঠ বাদানুবাদও প্রচলিত ছিল তাহা বেশ বোঝা যায়; কারণ এই শ্লোকে চারিটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইয়াছে (১) কাব্যের আত্মা ধ্বনি (২) ধ্বনির অস্তিত্ব নাই (অভাববাদ) (৩) ধ্বনি লক্ষণার (indication) অন্তর্গত (৪) ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ (suggested sense) বাচ্যার্থ (expressed sense) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনাপূর্ব্বক ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্থাপনাই 'ধ্বন্যালোকের' প্রধান উদ্দেশ্য।

'ধ্বন্যালোক' দুইভাগে বিভক্ত; একভাগ কারিকা, তাহার নাম 'ধ্বনি'; অপরভাগ এই কারিকার বৃত্তি, তাহার নাম 'আলোক'। অভিনবগুপ্তাচার্য্য এই ধ্বন্যালোকের এক অশেষপাণ্ডিত্যপূর্ণ 'ধ্বন্যালোক-লোচন' নামক টীকা করিয়াছেন। জহ্লণ-সঙ্কলিত 'শুক্তি-মুক্তাবলী' নামক সংগ্রহে উদ্ধৃত রাজশেখর রচিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে ধ্বনি ও আলোক, কারিকা ও বৃত্তি, উভয়েরই রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধন। (৫) কিন্তু অভিনব-গুপ্তের 'লোচনে' কারিকাকার ও বৃত্তিকৃৎ এই দুইজন পৃথক ব্যক্তি, এইরূপ অনেকস্থলে সূচিত হইয়াছে। (৬) অভিনবগুপ্ত বোধ-হয় আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকাকাররূপে নির্দ্দেশ

(১) রাজতরঙ্গিনী (Bomb. Ed) ৪।৭০৫

(২) S. P. Pandit in his preface to *Gaudavaho* p. lxxxvii and Peterson in his preface to Subhasitavali p. 127

(৩) কাব্যপ্রকাশ (Bombay, Second Ed.) পৃঃ ৮৩

(৪) পৃঃ ১৮। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকায়ও এইরূপ আছে। ধ্বন্যালোকের লোচনটীকা হইতে বোঝা যায় যে ইহারা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন।

(৫) ধ্বন্যালোক (কাব্যমালা সংস্করণ) সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য। ধ্বন্যালোকের অন্য নাম 'কাব্যালোক' 'সহৃদয়ালোক' ইত্যাদি।

করিয়াছেন (১)। য্যাকোবি দেখাইয়াছেন যে কারিকাকার ও বৃত্তিকৃৎ এই দুজনের মতের অনেকস্থলে পার্থক্য দেখা যায়। আনন্দবর্দ্ধন বোধহয় কাশ্মীরদেশে ৯ম শতকের উত্তরার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। (২)

পূর্ব্বাচার্য্যগণ অলঙ্কারের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ স্থূলতঃ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'ধ্বন্যালোক' হইতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের সূত্রপাত। আনন্দবর্দ্ধনের সময় হইতে মীমাংসা ন্যায় সাংখ্য বেদান্ত ও ব্যাকরণাদির বিভিন্ন মতবাদ আলঙ্কারিকদের বিচারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং সূক্ষ্মানুসন্ধানে নির্ণীত অলঙ্কার-শাস্ত্র কঠিন ও দুরবগাহ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অভিনবগুপ্ত তাঁহার টীকাকে ধ্বন্যালোকের 'লোচন' বলিয়া অভিহিত করিলেও, এই 'লোচন' আমাদিগকে দীব্য চক্ষুদান না করিয়া অনেক সময় আরও অন্ধ করিয়া দেয়; কারণ কারিকা ও বৃত্তি অপেক্ষা তাঁহার টীকা আরও কঠিন এবং তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। মম্মট হইতে বিশ্বনাথ বিদ্যানাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ ধ্বন্যালোকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া এবং ধ্বন্যালোককে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা স্বস্ব মতবাদের স্থাপনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আনন্দবর্দ্ধনই সর্ব্বপ্রথম একটা সম্পূর্ণ ও সুবিন্যস্ত অলঙ্কারশাস্ত্রের ধারণা গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থ তাঁহার গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, শব্দ অর্থ, গুণ দোষ, অলঙ্কার, রীতি প্রভৃতি কয়েকটি মূলতত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহার কিরূপ স্থান তাহা আনন্দবর্দ্ধন প্রথম সুবিচারপূর্ব্বক নিরূপিত করিয়াছেন। রসের স্বরূপ-নির্ণয় এবং রসব্যঞ্জনাই যে কাব্যের উদ্দেশ্য এই কথা তিনি 'ধ্বন্যালোকে' সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই রসাভিব্যক্তি আশ্রয় করিয়াই গুণদোষ অলঙ্কার রীত্যাদির কাব্যে যথাযোগ্য স্থিতি। গুণ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে তিনি বলেন—

রসভাবাদিতাৎপর্য্যমাশ্রিত্য বিনিবেশনম্
অলঙ্কৃতীনাং সর্ব্বাসামলঙ্কারত্বসাধনম্।
তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ ॥(৩)

(১) ধ্বন্যালোক, পৃঃ ২৩৩। ক্ষেমেন্দ্রও তাঁহার 'ঔচিত্য-বিচার' গ্রন্থে (কাব্যমালা সংস্করণ পৃঃ ১৩৪) আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকাকার বলিয়াছেন। কিন্তু মম্মট আনন্দবর্দ্ধনকে কারিকাকার হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন; কারিকাকারকে ধ্বনিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী অলঙ্কার গ্রন্থে ধ্বনিকার এই নির্দ্দেশ করিয়া যুগপৎ কারিকা ও বৃত্তি হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। য্যাকোবির মতে কারিকাকার ও বৃত্তিকার দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি।

(২) Buhler, Kashmir Report (J. R. A. S. Bomb. 1877. Extra no) p. 65-66 Jacobi, Introd. to his translation of Dhvanayaloka.

(৩) ধ্বন্যালোক পৃঃ ৭৪ ও ৭৮। শেষোক্ত শ্লোকের বৃত্তি এইরূপ—'যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনং সন্তমবলম্বন্তে তে গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ। বাচ্যবাচকলক্ষণান্যঙ্গানি যে পুনরাশ্রিতাস্তেঽলঙ্কারা মন্তব্যাঃ।

শৌর্য্যাদি যেরূপ মানবাত্মার ধর্ম্ম, গুণও সেইরূপ কাব্যাত্মার ধর্ম্ম বিশেষ। অলঙ্কার শুধু কটককুণ্ডলাদির মত সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক প্রসাধন স্বরূপ। মম্মটাদি পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

আনন্দবর্দ্ধন কাব্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) ধ্বনিকাব্য (১) (অর্থাৎ যাহাতে ধ্বনির প্রাধান্য) (খ) গুণীভূতব্যঙ্গ্য (২) (অর্থাৎ যাহাতে ব্যঙ্গ্যঅর্থ থাকিলেও তাহা সুস্পষ্ট নহে) (গ) চিত্রকাব্য (৩) (অর্থাৎ যাহাতে ধ্বনির লেশমাত্র নাই)। 'কাব্যপ্রকাশ', 'সাহিত্য-দর্পণ', 'একাবলী', 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ' প্রভৃতি পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত প্রধান অলঙ্কার গ্রন্থে ধ্বন্যালোকনির্দ্দিষ্ট এই শ্রেণীবিভাগ গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চিত্রকাব্যকে সকলেই অধমকাব্যরূপে নিরূপিত করিয়াছেন, (৪) কারণ ইহাতে রসভাবাদির অভিব্যক্তি আদৌ নাই। গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্য মধ্যম এবং ধ্বনি কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই ধ্বনি কাব্য কাহাকে বলে তাহার বিচারে এবং ব্যঙ্গ্যার্থের নিরূপণে প্রায় সমগ্র ধ্বন্যালোক নিয়োজিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে, কারণ ধ্বন্যালোক হইতে আরম্ভ করিয়া এ বিষয়ে এত কথা লিখিত হইয়াছে এবং এত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে তাহার বিবরণ এই ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে দেওয়া যায় না। (৫) মোটামুটি বলা যায় যে সমস্ত উত্তম কাব্যে ধ্বনি (বা suggestion লক্ষিত হয়। শব্দের অভিধা (denotation) ও লক্ষণা (indication) ভিন্ন ব্যঞ্জনা নামক একটি শক্তি আছে; কাব্যেও শব্দার্থসম্ভব ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাবৃত্তি আছে। রসাদির অনুভব এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি (function of suggestion) ভিন্ন হয় না। কারণ শুধু অভিধা দ্বারা রসাভিব্যক্তি হইতে পারে না; অথবা, "ইহা অদ্ভুত রস" এইরূপ শুধু নির্দ্দেশ করিয়া দিলে রসের কোনও প্রতীতি হয় না। লক্ষণার দ্বারাও রসের উদ্‌গম হয় না, কারণ অনুভূতির পূর্ব্বে রসের কোনও বিভিন্ন সত্ত্বা নাই। লক্ষণা, শব্দের গৌণশক্তি মাত্র; এবং যেরূপ লক্ষিতার্থ না থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থ থাকিতে পারে, সেইরূপ লক্ষিতার্থ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যার্থ না থাকিতে পারে। নৈয়ায়িকের অনুমানের দ্বারাও রস ব্যক্ত হয় না, কারণ স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ রসের আস্বাদ ও

(১) ধ্বন্যালোক ১।১৬

(২) ধ্বন্যালোক ৩।৩৫

(৩) ধ্বন্যালোক ৩.৪২-৪৩

(৪) ধ্বন্যালোক ৩।৪২-৪৩, পৃঃ ২২০-২২১। কাব্যপ্রকাশ, ষষ্ঠ উল্লাস। সাহিত্যদর্পণ (বোম্বাই সংস্করণ) ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃঃ ২৩৬। সাহিত্যদর্পণকার ইহার কাব্যত্বই অঙ্গীকার করেন নাই। প্রতাপরুদ্রীয়, পৃঃ ৭১

(৫) এ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য—কাব্যপ্রকাশ ১ম হইতে ষষ্ঠ উল্লাস। ব্যক্তিবিবেক (Trivandrum Sans. Series)। সাহিত্যদর্পণ, ২য় পরিচ্ছেদ, ৪র্থ এবং ৫ম পরিচ্ছেদ। একাবলী, উন্মেষ ১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত। প্রতাপরুদ্রীয়, কাব্যপ্রকরণ পৃঃ ৪২-৯৫। রসগঙ্গাধর, পৃঃ ৯-২০ ইত্যাদি।

অনুমান দুই এক জিনিস নহে। সেইজন্য ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির অঙ্গীকার কাব্যাত্মক রসের অনুভবের জন্য আবশ্যক। ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারাই ইহার প্রকাশ সম্ভব হয়। রসই যে কাব্যের আত্মাস্বরূপ একথা আনন্দবর্দ্ধন স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, অভিনবগুপ্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ৬৫ পৃষ্ঠায় রসাদিধ্বনি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি।' 'যদ্যপি চ রসেনৈব সর্ব্বং জীবতি কাব্যম্' ইত্যাদি। পুনশ্চ ২৭ পৃষ্ঠায়—'রস এব বস্তুত আত্মা বস্ত্বলঙ্কারধ্বনী তু সর্ব্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যেতে'।

এইরূপ ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের স্থাপনা করিয়া ইহার 'বস্তুধ্বনি', 'অলঙ্কারধ্বনি,' 'রসধ্বনি' প্রভৃতি কিরূপ বিভিন্ন ভেদ হইতে পারে এবং কিরূপে ইহা সমাসাদিত হয়, আনন্দবর্দ্ধন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধনের মতবাদের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ইহার উপর বৈয়াকরণদের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হইবে; কারণ আলঙ্কারিক মত হইলেও মুখ্যতঃ শব্দব্যাপারের আলোচনার উপর ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আনন্দবর্দ্ধনও 'শব্দতত্ত্ববিদ্'-দিগের কথা অনেকস্থলে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন (যথা পৃঃ ১৯৯) এবং একস্থলে বলিয়াছেন—'প্রথমে হি বদ্বাংসো বৈয়াকরণা ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যানাম্' (পৃঃ ৪৭)।

অন্যান্য দার্শনিক ও আলঙ্কারিকগণ এই ব্যঞ্জনাবৃত্তির স্বীকার করেন না; কেহ বা ইহাকে অভিধা ও লক্ষণার মধ্যে কেহ বা অনুমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। এইরূপে অভাববাদী, অন্তর্ভাববাদী, অনুমানবাদী, অভিহিতান্বয়বাদী ও অন্বিতাভিধানবাদী, দীর্ঘব্যাপারবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধানতঃ ইহার আলোচনা, ন্যায় মীমাংসা ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। আনন্দবর্দ্ধনের গ্রন্থ প্রথমে যথেষ্ট তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। উদ্ভটের টীকাকার প্রতিহারেন্দুরাজ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আনন্দবর্দ্ধনাদি যাহাকে ধ্বনি বলেন তাহা উদ্ভটনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কাব্যালঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভূত (১)। 'বক্রোক্তিজীবিত'কার কুন্তক বলেন যে 'বক্রোক্তি'ই কাব্যের আত্মা এবং ধ্বনি 'উপচার-বক্রতা' (অর্থাৎ উপচার বা সাদৃশ্যমূলক বক্রোক্তি) নামক ভেদবিশেষের মধ্যে ধর্ত্তব্য। (২) ইঁহারা অন্তর্ভাববাদী অর্থাৎ ইঁহারা ধ্বনিকে গুণ ও অলঙ্কারের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরেন। ভট্ট লোল্লট বলেন যে শব্দের অভিধাশক্তি,

---

(১) 'ননু যত্র কাব্যে সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিনঃ প্রধানভূতস্য স্বশব্দব্যাপারাস্পৃষ্টত্বেন প্রতীয়মানৈকরূপস্যার্থস্য সদ্ভাবস্তত্র তথাবিধার্থাভিব্যক্তিহেতুঃ কাব্যজীবিতভূতঃ কৈশ্চিৎ সহৃদয়ৈ ধ্বনি নাম ব্যঞ্জকত্বভেদাত্মা কাব্যধর্ম্মোঽভিহিতঃ। স কস্মাদিহ নোপদিষ্টঃ। উচ্যতে। এষ্বেবালঙ্কারেষ্বন্তর্ভাবাৎ।' (উদ্ভট, কাব্যালঙ্কারসার লঘুবৃত্তি টীকা পৃঃ ৭১)।

(২) 'বক্রোক্তিজীবিতকারস্তু বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিস্বভাবাং বহুবিধাং বক্রোক্তিমেব প্রাধান্যাৎ কাব্যজীব-

নিক্ষিপ্ত শরের মত, এরূপ 'দীর্ঘব্যাপার', যে তাহাতেই সমস্ত অর্থ ব্যক্ত হয় (১)। ইনি দীর্ঘব্যাপারবাদী। এই সমস্ত মতবাদভিন্ন 'ব্যক্তিবিবেকে'র টীকাকারের কথায় জানা যায় যে ভট্টনায়ক (২) একখানি "হৃদয়-দর্পণাখ্যো ধ্বনিধ্বংসগ্রন্থঃ" রচনা করিয়াছিলেন। (৩) 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থেও মহিমভট্ট আনন্দবর্দ্ধনকে যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। মহিমভট্ট ধ্বনিকে অনুমানের অন্তর্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই এইরূপ বলিয়াছেন—

অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্ব্বস্যৈব ধ্বনেঃ
প্রকাশয়িতুম্।
ব্যক্তিবিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা
পরাং বাচম্॥

রুয্যক 'অলঙ্কারসর্ব্বস্বে', মম্মট 'কাব্যপ্রকাশে' বিশ্বনাথ 'সাহিত্যদর্পণে', বিদ্যাধর 'একাবলী'তে 'ব্যক্তি বিবেকে'র মত নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ তীব্র আক্রান্ত হইলেও, 'ধ্বন্যালোক' কালক্রমে সর্ব্ববাদী সম্মত প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং মম্মট রুয্যক জগন্নাথ হইতে বিশ্বনাথ বিদ্যাধর বিদ্যানাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছেন।

সুতরাং মম্মট প্রভৃতি পরবর্ত্তী অলঙ্কারিকগণের কাব্যের ধারণায় বিশেষ কোনও নূতন কথা পাওয়া যায় না, কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত মতাদির বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। মম্মটের পরবর্ত্তী অসংখ্য আলঙ্কারিকগণের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। শুধু 'কাব্যপ্রকাশে'রই এ পর্য্যন্ত ৫০টি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (৪) ইহাদের ছাড়িয়া দিলেও ভোজ তাঁহার 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে' (৫) কাব্যের যে লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মতাদির সহিত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

---

(১) 'যদি পুনঃ সোঽয়মিষোরিব দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপার ইতি মন্বানাঃ শব্দশ্রবণসমনন্তরং যাবতোঽর্থস্য প্রতিভানং তাবদভিধৈব ব্যাপারঃ প্রগল্ভত ইত্যভিদধতি' ইত্যাদি (বিদ্যাধর, একাবলী, Ed. K. P. Trivedi, p. 42)। একাবলীর প্রথম উন্মেষে এই সকল বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা ও খণ্ডন আছে।

(২) পিটারসন্ (সুভাষিতাবলী ভূমিকা) ইহাকে কাশ্মীরাধিপতি অবন্তীবর্ম্মার সমকালীন (৯ম শতকের শেষভাগ) বলিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত তাঁহার ধ্বন্যালোকলোচনে (পৃঃ ১৫, ১৯, ২২, ২৯, ৬৩, ৬৭) অনেকবার ইহার মতের উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন। রুয্যক (অলঙ্কারসর্ব্বস্ব পৃঃ ৯) ইহার মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'ভট্টনায়কেন তু ব্যঞ্জনব্যাপারস্য প্রৌঢ়োক্ত্যাভ্যুপগতস্য কাব্যে সম্বং ব্রুবতা ন্যগ্‌ভাবিতশব্দার্থস্বরূপস্য ব্যাপারস্যৈব প্রাধান্যমুক্তম্। তত্রাপ্যভিধাভাবকত্বলক্ষণব্যাপারদ্বয়োত্তীর্ণো রসচর্ব্বণাত্মৈব ভোগাপরপর্য্যায়ো ব্যাপারঃ প্রধান্যেন বিশ্রান্তিস্থানতয়াঙ্গীকৃতঃ।' ইঁহার অধুনা লুপ্ত গ্রন্থের নাম 'সহৃদয়-দর্পণ'।

(৩) ব্যক্তিবিবেক (Triv. Ed.) পৃঃ ১ এই 'হৃদয়দর্পণ' ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকা, তাহা অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন।

(৪) Ganganath Jha, Kavyaprakasa, Preface p. viii—ix.

(৫) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—১।২—'নির্দ্দোষং গুণবৎ কাব্যমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্। রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি।

'রসগঙ্গাধর'কার জগন্নাথ, দণ্ডী প্রভৃতির প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়া—'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকশব্দঃ কাব্যম্' (১) এইরূপ বলিয়াছেন সত্য কিন্তু ইহার বিশ্লেষণে তিনি গুণ দোষ অলঙ্কার ধ্বনি রস প্রভৃতি সকল কথারই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতাম্বর জৈন হেমচন্দ্র, মম্মটকে অনুসরণ করিয়া, তাঁহার 'কাব্যানুশাসনে' কাব্যের স্বরূপ "প্রদোষৌ সগুণৌ সাংলঙ্কারৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্" (২) এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ধ্বনি, ব্যঙ্গ্যার্থ, ও রসের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। 'অলঙ্কার শেখরে' (৩) "উক্তঞ্চ ভগবতা শব্দার্থৌ কাব্যস্য শরীরং, আত্মা রসঃ, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ। দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ। অলঙ্কারাঃ কুণ্ডলাদিবৎ' প্রভৃতি যে সকল বাক্য অলঙ্কার-সূত্রকার ভগবান্ শৌদ্ধোদনির মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য-দর্পণকারের মত হইতে বিশেষ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না। 'একাবলী' ও 'প্রতাপরুদ্রীয়ে' 'ধ্বন্যালোকে'র ও মম্মটের মতই সাধারণতঃ অনুসৃত হইয়াছে।

"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণৌ অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি" (৪) বলিয়া মম্মট কাব্যলক্ষণের যে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বনাথ তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভেই (৫) তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এই নির্দ্দেশ যুক্তিসম্মত নহে এবং ইহা যদি গৃহীত হয় তবে কোন কাব্যই তন্নামযোগ্য হইতে পারে না, কারণ কোনও কাব্যই নির্দ্দোষ নহে। (৬) বিশ্বনাথ শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রসই কাব্যের আত্মা; গুণ অলঙ্কার ও রীতি রসের উৎকর্ষবিধায়ক এবং দোষ রসের অপকর্ষক। তর্কের কথা ছাড়িয়া দিলে মম্মট ও সাহিত্যদর্পণকারের মতে যে বিশেষ গুরুতর পার্থক্য আছে তাহা বোধ হয় না। কাব্যপ্রকাশকার গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছেন -'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈক-ময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্। নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতি-মাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।' এবং দ্বিতীয় শ্লোকের বৃত্তিতেও কাব্যের কথা এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'সকল-প্রয়োজন-মৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিত-

---

(১) জগন্নাথ, রসগঙ্গাধর (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৪। সাহিত্যদর্পণকারের রসবিষয়ক মত সম্বন্ধে জগন্নাথ এইরূপ বলিয়াছেন—বস্তু রসবদেব কাব্যমিতি সাহিত্যদর্পণে নির্ণীতম্ তন্ন। বস্ত্বলঙ্কারপ্রধানানাং কাব্যানাম-কাব্যত্বাপত্তেঃ। ন চেষ্টাপত্তিঃ—মহাকবিসম্প্রদায়স্যাকুলীভাবপ্রসঙ্গাৎ (পৃঃ ৪)।

(২) হেমচন্দ্র, কাব্যানুশাসন (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ১৬

(৩) কেশব মিশ্র, অলঙ্কারশেখর (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ২০

(৪) কাব্যপ্রকাশ ১।১ (বোম্বাই সংস্করণ পৃঃ ১৩)।

(৫) সাহিত্যদর্পণ (বোম্বাই সংস্করণ পৃঃ ৬-২২), ১ম পরিচ্ছেদ। সাহিত্যদর্পণের নির্দ্দেশও যুক্তিযুক্ত নহে এবং অসম্পূর্ণ, একথা প্রভাটীকায় বিস্তৃত আলোচনা আছে (কাব্যপ্রদীপ, কাব্যমালা সংস্করণ, প্রভাটীকা ৮-১১)

(৬) কাব্যপ্রকাশ-প্রদীপের উদ্যোত-টীকায় ইহার জবাব দেওয়া হইয়াছে। (চন্দোরকর সম্পাদিত

বেদ্যান্তরমানন্দং প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধান-বেদাদি-শাস্ত্রেভ্যঃ সুহৃৎসম্মিতার্থতাৎপর্য্যবৎপুরাণাদী-তিহাসেভ্যশ্চ শব্দার্থয়ো গুণভাবেন রসাঙ্গভূত ব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণং যৎ কাব্যং লোকোত্তরবর্ণনানিপুণং কবিকর্ম্ম...” ইত্যাদি (১)। তবে সাহিত্যদর্পণকার রসকেই কাব্যাত্মা বলিয়া কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রসের ধারণা সম্বন্ধে তাঁহার মত আলোচনার যোগ্য।

রাজশেখর রসাধিকরণে নন্দিকেশ্বরের নামোল্লেখ করিলেও,রসের আলোচনা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (২) সর্ব্বপ্রথম দেখা যায়। ভরতের মতে শৃঙ্গারাদি অষ্টরসের বিস্তারই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। কেশব মিশ্রের ‘অলঙ্কার-শেখরে’ (৩) সূত্রকার শৌদ্ধোদনির ‘বাক্যং রসাদিমৎ কাব্যম্’ ‘অলঙ্কারাস্তু শোভায়ৈ, রস আত্মা’ ইত্যাদি যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান হয় যে রসের কাব্যাত্মতা সম্বন্ধে এইরূপ মত বহুপূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন তাঁহার রসবাদের বিস্তৃত আলোচনার সময় যে ভরত ও শৌদ্ধোদনির মতের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। ধ্বন্যালোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—‘এতচ্চ রসাদিতাৎপর্য্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভারতাদৌ অপি সুপ্রসিদ্ধমেব···’ ইত্যাদি। (৪) কাব্যের ভেদস্বরূপ নাটকে যাহা ভরতাদি-কর্ত্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত, তাহা যে সমস্ত কাব্যের ধারণায় প্রযুক্ত হইবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

রস কাহাকে বলে এবং তাহার উৎপত্তি কিরূপ তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ ‘রস্যন্তে ইতি রসাঃ’ (‘রস আস্বাদনে চুরাদিঃ’) এইরূপ বুৎপত্তি করিয়া, যাহা আস্বাদ বা উপভোগ করা যায় তাহার নাম রস এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। কাব্যে যাহা আস্বাদনীয় তাহাই কাব্যরস। ইহা মনের একটী স্থায়ীভাব। এই আস্বাদ কিরূপে সম্ভব তাহার সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন—‘বিভাবানু-ভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ (৫) বিভাব (Excitant), অনুভাব (Ensuant) এবং ব্যভিচারিভাব (Accessory) হইতে

---

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯-১০

(২) ভরত, নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়।

(৩) অলঙ্কারশেখর, পৃঃ ২, ৬, ২০ ইত্যাদি।

(৪) ধ্বন্যালোক, পৃঃ ১৮১-১৮২

(৫) নাট্যশাস্ত্র পৃঃ ৬২। (কাব্যপ্রকাশে ধৃত পৃঃ ৮৩, সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৯)। ইহা অনুসরণ করিয়া ধনঞ্জয় দশরূপকে (পৃঃ ১৩৬) বলিয়াছেন—‘বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ। আনীয়মানঃস্বাদ্যত্বং স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ। সোভানি (*Bhandarkar Comm. Volume* p. 388) ভরতের নাট্যশাস্ত্র (৭ম অধ্যায় পৃঃ ৭০) হইতে নিম্নোদ্ধৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই সকল বিভিন্ন মতবাদের অস্পষ্ট সূচনা ভরতের মধ্যেই রহিয়াছে। “যদা অন্যোন্যার্থসম্ভূতৈ বিভাবানুভাবব্যঞ্জিতৈরেকোনপঞ্চাশতা ভাবৈঃ সামান্যগুণযোগেনাভিনিষ্পদ্যন্তে রসাস্তৎ কথং স্থায়িন এব ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি। উচ্যতে·········। বহ্বাশ্রয়ত্বাৎ স্বামিভূতাঃ স্থায়িনো ভাবাঃ।·········যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি

রসের নিষ্পত্তি। বিভাব অর্থে যাহা এই স্থায়ীভাবকে সংবেদনযোগ্য (capable of being sensed) করিতে পারে; যথা শৃঙ্গাররসে ললনাউষ্ঠানাদি। অনুভাব ইহাকে স্পষ্ট সংবেদিত (sensed) করে; যথা আলিঙ্গনকটাক্ষাদি। ব্যভিচারিভাব সহকারি হিসাবে ইহাকে বর্দ্ধিত করে; যথা হর্ষনির্বেদাদি। এই সমস্ত হইতে রসস্বরূপ স্থায়ী ভাবের (permanent mood) নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু ইহাদের সহিত আস্বাদ্যমান রসের কি সম্বন্ধ? উল্লিখিত ভরতোক্তি অবলম্বন করিয়া এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্ট লোল্লট প্রভৃতি মীমাংসামতবাদীগণ বলেন(১)—"স্থায়িনাং বিভাবৈঃ ললনাদিরূপৈরালম্বনকারণৈঃ উষ্ঠানাদিভিরুদ্দীপনকারণৈঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজোৎক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্যৈঃ, ব্যভিচারিভি নির্বেদাদিরূপৈঃ সহকারিভিশ্চ সংযোগাৎ ক্রমেণোৎপাদ্যোৎপাদকভাবরূপাৎ, গম্যগমকভাবরূপাৎ পোষ্যপোষকভাবরূপাচ্চ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চ ভবতীতি সূত্রার্থঃ।" এই রসবাদকে উৎপত্তিবাদ বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের মতে বিভাবাদি কারণ (cause) হইতে রসরূপ কার্য্যের (effect) নিষ্পত্তি। রামসীতাদির মধ্যে স্থিত যে শৃঙ্গারাদি রস এবং যাহা অভিনয়াদির দ্বারা নটনটীর মধ্যে অবিদ্যমান থাকিলেও প্রতীয়মান, তাহা এইরূপে দর্শক বা শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহা এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"যথা অসত্যপি সর্পে সর্পতয়া অবলোকিতাৎ দাম্নোঽপি ভীতিরুদেতি, তথা সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতিরবিদ্যমানাঽপি নর্ত্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তস্মিন্ স্থিতেব প্রতীয়মানা সহৃদয়-হৃদয়ে চমৎকারমর্পয়ন্ত্যেব রসপদবীমধিরোহতি।" কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে যাহা দর্শকের মধ্যে অবিদ্যমান, তাহা কিরূপে তাহাকে চমৎকৃত করিতে পারে তাহা বোঝা যায় না। সেইজন্য কাব্য-প্রকাশের 'প্রদীপ'-টীকাকার বলিয়াছেন—'সামাজিকে তদভাবে চমৎকারানুভববিরোধাৎ।' (২) রস প্রতীয়মান (cognised) হইতে পারে না, কারণ রামসীতাদি দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত নহে; ইহার উৎপত্তি (produced) হইতে পারে না, কারণ বিভাবাদির বাস্তবিকত্বের (reality) অভাব; ইহা অভিব্যক্ত হইতে পারে না, কারণ যাহা সিদ্ধ (estalished) তাহারই, প্রদীপের দ্বারা ঘটাদির ন্যায়, অভিব্যক্তির সম্ভব।

সেইজন্য নৈয়ায়িকমতানুসারী অনুমানবাদীগণ বলেন যে অনুমানের দ্বারা রসের নিষ্পত্তি হয়। শ্রীশঙ্কুপ্রভৃতি এইরূপ বলেন—"স্থায়িনো বিভাবাদিভিরুক্তরূপৈঃ সংযোগাদ্ অনুমাপ্যানুমাপকরূপাৎ সম্বন্ধাদ্ রসস্য নিষ্পত্তিরনুমিতিরিতি সূত্রার্থঃ।" (৩) ইহা এইরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা বোঝান হইয়াছে: যেমন

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৮৭ (কালকীকর টীকা)

(২) প্রদীপ (কাব্যমালা সংস্করণ) পৃঃ ৬৩।

কুজ্ঝটিকাকুলিত দেশে ধূম না থাকিলেও ধূমসাদৃশ্যের অভিমান হইতে ধূমনিয়ত বহ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ নটনটীর মধ্যে রস-বিষয়ক বিভাবাদি না থাকিলেও, নিপুণ অভিনয় দ্বারা তাহাদের মধ্যে ইহার প্রতীয়মান অস্তিত্ব হইতে রামসীতাদির রতির অনুমান করা যায়। এই অনুমিত রত্যাদি স্বীয় চমৎকারিতার বলে দর্শনের প্রতীতিগম্য হইয়া তাহাদের মনে রসস্বরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু ইহাতে আপত্তি এই যে রসের প্রত্যক্ষ আস্বাদ ও অনুমিতির দ্বারা আস্বাদ একই প্রকার সুখকর নহে। সেই জন্য উল্লিখিত 'প্রদীপ'কার বলিয়াছেন —'এতদপ্যহৃদয়গ্রাহি। যতঃ প্রত্যক্ষমেব জ্ঞানং সচমৎকারং নানুমিত্যাদিরিতি লোক-প্রসিদ্ধিমবধূয়ান্যথাকল্পনে মানাভাবঃ।' (১)

ভট্টনায়কাদি সাংখ্যমতাবলম্বীগণ এই দুইটি কোনও মত স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতকে ভুক্তিবাদ বলা যাইতে পারে। ইঁহারা বলেন—"বিভাবাদিসংযোগাদ্ ভোজ্যভোজকসম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিঃ" (২) অর্থাৎ ভোজ্য (enjoyed) এবং ভোজক (enjoyer) সম্বন্ধ হইতেই বিভাবাদি দ্বারা রসের নিষ্পত্তি। একটু বিস্তৃতভাবে ইহা বুঝিতে হইবে। ইঁহাদের মতে শব্দের তিনটি শক্তি আছে—'অভিধা', 'ভাবকত্ব' এবং 'ভোজকত্ব'। ইহারা বলেন যে 'অভিধা' দ্বারা অভিধা (denotation) এবং লক্ষণা (indication) দুই বুঝায়। 'ভাবকত্বের' অর্থ "সাধারণীকরণম্" (generalisation) (৩)। এই শক্তির দ্বারা বিভাবাদি এবং স্থায়িভাব 'সাধারণীকৃত' হয় অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ প্রকৃতি (general character) বুঝায়, ইহাদের কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম (specific properties) বুঝায় না। যেমন 'সীতা' এই বিভাবের দ্বারা 'সীতা' নামক কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বুঝায় না, 'কামিনী' এই সাধারণ বিষয় বুঝায়। এবং রামের সীতাবিষয়ক অনুরাগ এই স্থায়িভাব কেবল সাধারণ রতি বা অনুরাগ (love in general) বুঝায়। রতির কোনও বিশিষ্ট কারক (agent) বা বস্তু (object) বুঝায় না। 'ভোজকত্ব'শক্তির দ্বারা, এই সাধারণী-কৃত বিশিষ্টধর্ম্মবর্জ্জিত স্থায়ীভাব এবং বিভা-বাদির উপভোগ হয়। সুতরাং রসের আস্বাদ অলৌকিক, সাধারণ লৌকিক সুখের আস্বাদ হইতে বিভিন্ন। সত্ত্বগুণোৎপন্ন আনন্দময় জ্ঞানের ন্যায় ইহার উপভোগ। এই মত-বাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি যে এরূপ শব্দের 'ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব' শক্তির কল্পনা সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক। ('এতাদৃশ ব্যাপারদ্বয়কল্পনে প্রামাণাভাবাৎ।' প্রদীপ পৃঃ ৬৬)।

অভিনবগুপ্তাদি আলঙ্কারিকগণের মত এইরূপ ;—'স্থায়িনাং বিভাবাদিভিঃ সমং সংযোগাদ্ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবরূপাৎ সম্বন্ধাদ্ বিভাবাদীনামেব বা পরস্পরং সংযোগাৎ

---

(১) প্রদীপ পৃঃ ৬৪-৬৫, সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ২৪৮-২৫৫। রসের আলোচনা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন একাবলী পৃঃ ৮৬-৮৮, প্রতাপরুদ্রীয় পৃঃ ২১৯-২২৯, রসগঙ্গাধর পৃঃ ২২-৩১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

(২) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯১

মিলনাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিরিতি সূত্রার্থঃ।' (১) ইহাকে অভিব্যক্তিবাদ বলা যাইতে পারে। রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, ললনা উদ্যান কটাক্ষ প্রভৃতি লৌকিক কারণ হইতে অনুমিত (২) হইয়া, সংস্কার বা বাসনা (impression) রূপে সহৃদয়-হৃদয়ে থাকিয়া যায়। যখন কোন কাব্য পঠিত বা নাটক অনুষ্ঠিত হয়, তখন সহৃদয়-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত এই সকল সংস্কাররূপী রত্যাদি ভাব পূর্ব্বোক্ত ললনাদি কারণ দ্বারা অভিব্যক্ত (suggested) হয়; কিন্তু এই সকল কারণ এখন আর লৌকিক কারণ থাকে না, তাহারা বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব নাম গ্রহণ করে এবং পূর্ব্বোক্ত 'ভাবকত্বশক্তি'র দ্বারা ইহারা 'রামসীতা' এই রূপ নির্দ্দিষ্ট (specific) ব্যক্তি বা বস্তু না বুঝাইয়া সাধারণ 'কামিনী' প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। তখন বিভাবাদি 'ইহা আমার, ইহা পরের', এইরূপ কোনও বিশিষ্ট সম্বন্ধ (specific connexion) না বুঝাইয়া দর্শক বা শ্রোতার দ্বারা আস্বাদক্ষম হয়। (৩) স্থায়ীভাবও কোনও নির্দ্দিষ্ট দর্শক সম্বন্ধে প্রযোজ্য থাকে না, দর্শকমাত্রেই প্রযোজ্য হয়, সুতরাং সর্ব্বসম্বন্ধী হইয়া যায় ('পরিমিতাবনধীতী')। যদিও ইহা কোনও নির্দ্দিষ্ট দর্শক কর্ত্তৃক আস্বাদিত হয় বটে, তথাপি আস্বাদনের সময় সে 'আমারই এই বিভাবাদি আমিই রসের আস্বাদয়িতা' এই-রূপ ভাবে না, বরং বিভাবাদির সাধারণী-করণের জন্য ইহা সকল সহৃদয় লোকের আস্বাদ্য এইরূপ তাহার প্রতীতি হয়। এই আস্বাদই রস। সুতরাং যাহাদের কখনও রত্যাদি অনুভব হয় নাই এবং যাহাদের এ বিষয়ে কোনও বাসনা (impression) নাই, তাহারা কখনও রস আস্বাদন করিতে পারে না। এইজন্য সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন যে ইহা বাক্যে বুঝাইবার বস্তু নহে, কারণ ইহা 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' (৪); কেবল 'সহৃদয়হৃদয়-বেদ্য' (৫)। এই বাসনা (impression) স্বাভাবিকী, অথবা কাব্য-নাটকের চর্চ্চাদ্বারা উৎপন্ন হয়। সেইজন্য বৃদ্ধ মীমাংসক বা বৈয়াকরণগণ অথবা যাঁহারা সংসারবিরক্ত তাঁহারা রসাস্বাদে বঞ্চিত, একথা আলঙ্কারিকগণ একবাক্যে বলিয়াছেন (৬)।

সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত অলৌকিক রস, ব্যঞ্জনা (suggestion) দ্বারা, দর্শক বা শ্রোতার মনে অভিব্যক্ত হয়। ইহা অভিধা (denotation), তাৎপর্য্য (import), লক্ষণা (indication), প্রত্যক্ষ (cognition),

(১) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯১। প্রদীপ পৃঃ ৬৭

(২) এই অনুমান কিরূপ তাহা কমলাকরী টীকা (Benares Ed.) এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'অয়মেত-দ্বিষয়-রতিমান্। তৎকার্য্যকটাক্ষাদিমত্ত্বাৎ। যো নৈবং স নৈবম্। যথা বিরক্তঃ॥'

(৩) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮১

(৪) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭২

(৫) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৮

(৬) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭৯। প্রদীপ পৃঃ ৬৩। কমলাকরী টীকায় উক্ত হইয়াছে "রসিকা এব রসাস্বাদে

অনুমান (inference) বা স্মরণ (recollection) ইহাদের কাহারও বিষয়ীভূত নহে। (১) যদিও বিভাবাদি অপরিহার্য্য এবং তদ্ভিন্ন রসের অস্তিত্ব নাই, তথাপি ইহারা রসের কারণ (cause) নহে, রসও ইহাদের কার্য্য (effect) নহে। যাহা কার্য্য তাহা কারণের তিরোভাবের পরও থাকিতে পারে; কিন্তু রস বিভাবাদি না থাকিলে থাকিতে পারে না। (২) সুতরাং ইহা 'বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ।' ইহা অলৌকিক বলিয়া সাধারণ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাপ্য নহে। যেমন খণ্ডমরীচি, শর্করা, কর্পুর প্রভৃতির সম্মেলনসম্ভূত পানীয়ে, ইহার প্রত্যেকের আস্বাদ হইতে বিভিন্ন, আস্বাদ পাওয়া যায়, রসেও সেইরূপ। (৩) বিভাবাদির দ্বারা সম্পন্ন হইলেও রস এক (single or indivisible); এবং ইহা হইতে বিভাবাদির বিভিন্ন প্রতীতি হয় না। সুতরাং স্থায়ীভাব, এইরূপ পানীয়ের মত আস্বাদিত হইলে, রস হয়। তাহা হইলে রস 'চর্ব্বণা' বা 'আস্বাদ' (৪)। 'চর্ব্ব্যমানতাই (state of being relished)। ইহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম (৫)।

রসের আস্বাদ অলৌকিক; কারণ ইহা ব্রহ্মানন্দাস্বাদের মত অপূর্ব্ব। (৬) ইহার আস্বাদনে অন্য কোনও বস্তুপ্রতীতি থাকে না ('বিগলিতবেদ্যান্তরঃ')। কেবল ব্রহ্মাস্বাদ ও কাব্যরসাস্বাদের পার্থক্য এই যে কাব্যরসাস্বাদ বিভাবাদ্যনুসন্ধানসাধ্য কিন্তু ব্রহ্মস্বাদ যোগের দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং এই রসপ্রতীতি 'সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদন সাক্ষিক' অথবা মম্মটের কথায় 'সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা প্রমাত্রা গোচরীকৃতঃ' (৭)।

তাহা হইলে দেখা গেল যে কাব্যের আদর্শ অতি সঙ্কীর্ণ আদিম ধারণা হইতে কিরূপে ক্রমশঃ রসের চরম নিষ্পত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। অলঙ্কারের ভেদ (classification) এবং লক্ষণনির্ণয় (definition) বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। গুণ দোষের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে রীতি বা style যে কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ, তাহা দণ্ডীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই রীতির সংস্থানে সমাধি (harmony) বা সৌন্দর্য্যের (beauty) উৎপত্তি, কারণ এই রীতি 'রসাদীনাং উপকর্ত্রী'মাত্র। অভিধা লক্ষণাদিরূপ শব্দের শক্তিনিরূপণ এবং তাহার পর ব্যঞ্জনার স্থাপনা দ্বারা শব্দব্যাপারের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্যপদ্যের যে ভেদ নাই এবং ছন্দ

---

(১) সাহিত্যদর্পণ ৫ম পরিচ্ছেদ।

(২) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৬। কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯৪

(৩) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৩ 'প্রপাণকরসন্যায়াচ্চর্ব্ব্যমাণো রসো ভবেৎ'। কমলাকরী—'পানকে অম্লখণ্ড-মরীচকাদীনাং চিত্ররসবৎ সংবলিতানাং রসত্বং।' কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯৩। প্রদীপ পৃঃ ৬৯।

(৪) সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৮৯। কাব্যপ্রকাশ ৯৪। প্রদীপ ৬৮-৬৯।

(৫) 'চর্ব্বমাণৈকপ্রাণঃ' কমলাকর।

(৬) 'ব্রহ্মানন্দসহোদরঃ' (সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭২), 'ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্' (কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯৩)।

(৭) কাব্যপ্রকাশ পৃঃ ৯২, সাহিত্যদর্পণ পৃঃ ৭২

যে কাব্যের শুধু বহিরাবরণ বা accident মাত্র, তাহা দণ্ডী হইতে দর্পণকার পর্য্যন্ত সকলেই বলিয়াছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতে স্থির করিয়াছিলেন যে শব্দার্থ প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা কাব্যের শরীরমাত্র (body or material part)। কাব্যের আত্মা (soul of poetry) ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ, কারণ শরীর আত্মার আনুষঙ্গিক মাত্র। কবি ও আলঙ্কারিক রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসায়' যে 'কাব্যপুরুষে'র কল্পনা করিয়াছেন তাহা কবিকল্পিত হইলেও এই রূপকের স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। এই দেহাত্মার রূপক আরও বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে —'কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরং, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ, অলঙ্কারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ।' এই কাব্যের আত্মা এরূপ অজ্ঞেয় ও অগম্য এবং ইহার শক্তি এত বহুবিস্তীর্ণ যে ইহাকে মানবাত্মার সহিত তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের হৃদয়ে যে গভীর আনন্দের উদ্‌গম হয় তাহার দ্বারাই ইহা বোধগম্য।

সুতরাং ভাষার সহিত কাব্যের সম্পর্ক থাকিলেও, ভাষাই ইহার সর্ব্বস্ব নহে; গদ্য পদ্য বা ইহার অন্য কোনও আকারের পরস্পর পার্থক্য নাই, কারণ সহৃদয়-হৃদয়ের আনন্দই ইহার প্রমাণ। কাব্যে কেবলমাত্র ছন্দ বা মাত্রাদির সংস্থান অথবা শব্দবৈভব এই আনন্দের উৎপাদক নহে। সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রকে শুধু Rhetoric বলিয়া বর্ণনা করা যায় না; Poetics বা Theory of Poetic expression বলিলে আরও সঙ্গত হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিক কেবল অক্ষর-প্রাণ কাব্যের (syllabic poetry) বর্ণনা করেন নাই, ভাবনাসম্মত কাব্যের (ideal poetry) বর্ণনা করিয়াছেন। কবির ভারতী, তাঁহাদের মতে, নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা হ্লাদৈকময়ী রসভাবরুচিরা অনন্যপরতন্ত্রা এবং লোকোত্তরচমৎকারিণী।

এইরূপ কাব্যের শরীর ও আত্মাকে পৃথক করিয়া এবং শব্দার্থের মধ্যে প্রতীয়মান রসকে কাব্যাত্মা কল্পনা করিয়া আলঙ্কারিকগণ Æsthetics বা সৌন্দর্য্যশাস্ত্রের আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। রস যখন কোনও মানসিক স্থায়ী ভাব অবলম্বন করিয়া পরিস্ফুট হয়, তখন বিভিন্ন মানসিকবৃত্তির আলোচনাও (analysis of emotions) আলঙ্কারিকগণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেইজন্য কেবল রসের বিশ্লেষণ নহে, হাস শোক ক্রোধ ভয় জুগুপ্সা বিস্ময় নির্ব্বেদ এবং হাবভাব বিলাসাদির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা অলঙ্কারগ্রন্থের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। এই psychology of poetic emotions অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই রসের অনুভূতি ব্যঞ্জনা (suggestion) ভিন্ন হয় না, সেইজন্য ব্যঙ্গ্য কাব্যকেই (suggestive poetry) শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা হইয়াছে। কাব্যের এই ব্যঞ্জনাবৃত্তিই (function of suggestion) সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে রসকে অভিব্যক্ত করে। কিন্তু ভাবকত্ব (imagination)

কেবল কবির মধ্যে থাকিলে হইবে না, পাঠকের মধ্যে থাকাও একান্ত আবশ্যক। 'রসিক' বা 'সহৃদয়' (man of taste) কাহাকে বলা যাইতে পারে তাহা হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসনে' এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'যস্য তু কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনাযোগ্যতা-সহৃদয়সংবাদভাক্ স সহৃদয়ঃ' (চূড়ামণি টীকা পৃঃ ৩)।

রসের ধারণাই সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এই রসের ধারণা কিরূপ সূক্ষ্ম অথচ উন্নত তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। কাব্যামৃতরসাস্বাদকে আলঙ্কারিকগণ স্বপ্রকাশানন্দ অজ্ঞাপ্য অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মরসাস্বাদের সমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাব্য (Poetry) এবং ব্রহ্মজ্ঞান (Religion) প্রায় এক পইঠায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই কাব্যরসাস্বাদে সকলেই অধিকারী নহেন এবং ইহার জন্য ভাবকত্ব (imagination) ও সাধারণী বৃত্তির (community of feeling) আবশ্যক।

এই রসের আনন্দ, চমৎকার (wonder) হইতে সমুদ্ভূত। অদ্ভুত (বা marvellous or sublime) কে রসভেদ বলিয়া নিরূপিত করিলেও, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ ॥

চমৎকার (spirit of wonder) যে কাব্যের মূল তাহা বহুস্থলে উক্ত হইয়াছে এবং এই 'লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণ' কাব্যরসের আস্বাদ কেবল সহৃদয় ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ যোগীদিগের ন্যায় অনুভব করিতে পারেন—

পুণ্যবন্তঃ প্রমিন্বন্তি যোগিবদ্রসসন্ততিম্।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ যেমন সকলকেই কাব্যরসাস্বাদনের অধিকারী বিবেচনা করেন না, সেইরূপ তাঁহারা বলেন যে সকল কবিই এই কাব্যরসের সৃষ্টি করিতে পারেন না। দণ্ডী বলিয়াছেন—

ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা
গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতম্

তাহা হইলে কাব্যরচনা নিষ্ফল; কারণ—'কবিত্ববীজং প্রতিভানম্' (বামন ১।৩।১৬)। এই 'প্রতিভান'—'জন্মান্তরাগতসংস্কারবিশেষঃ কশ্চিৎ। যস্মাদ্বিনা কাব্যং ন নিষ্পদ্যতে। নিষ্পন্নং বা হাস্যায়তনং স্যাৎ।' কিন্তু এই কবিত্বশক্তি থাকিলেও চেষ্টা, একাগ্রতা, লোকশাস্ত্রবৈচক্ষণ্য, লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা, ইতিহাস অভিধান ছন্দ কলাবিদ্যা দণ্ডনীতি প্রভৃতির অনুশীলনও 'কাব্যাঙ্গ' বা কবিত্বের উন্মেষক। (বামন, ১।৩; কাব্যপ্রকাশ ১।৩)। সেইজন্য দণ্ডী বলিয়াছেন—

তদস্ততন্দ্রৈরনিশং সরস্বতী
শ্রমাদুপাস্যা খলু কীর্ত্তিমীপ্সুভিঃ।

শ্রীসুশীলকুমার দে।

স্মরণে

জনম-জনম যাহার পাণি পীড়ন করে' আস্‌ছ বন্ধু মোর,
আবার সে যে পড়্‌ল ছিঁড়ে তোমার তরুণ ফাগুন ফুলের ডোর।
গুঁড়িয়ে গেল পাঁজর-তলা বিদায়-বোঝার পাষাণ-ভাঙ্গা ভারে,
জীবন-নায়ে জল ভরিল, পৌঁছিল না সুখ-দরিয়ার পারে।
মৃত্যু-কালো শূন্য নিখিল, উদাস-করা সকল হাসির সুর—
উষায় এলে ভাসান্ দিয়ে, নতুন স্রোতে যায় সে কতদূর!

ছাইএর সনে ছাই মিশেছে, যে-টুকু তার অমর চিরন্তন,
সেই-টুকু-বাগ্‌দত্তা সে যে, নতুন যুগে কর্‌বে নিবেদন।
বক্ষতলের স্বপ্নাসবে রসিয়ে হিয়ার ব্যাকুল ওষ্ঠাধর,
চির-নারীর বরণ-মালা সেই তোমারে পরায় নিরন্তর।
আকাশ-গাঙের আব্‌ছা-বাঁকে মহানীলের মিলন-মোহানায়,
অনন্ত সেই অন্তরঙ্গ—বুকের তলায় হারাও নি তো তায়।
চোখের জলের মানস-হ্রদে, সেই তো অমল স্মৃতির শরৎ-ভরা,
গৌরবেরি নগ্ন কমল, সেই ফুটেছে শিশির-মোতি-ঝরা।

পরশ-মণির সোনার ছোঁয়া পেয়েছে আজ তোমার মনের মণি,
শুকিয়ে গেছে প্রাণের স্নায়ু, ধমনীতে জমাট্ শোণিত-ধ্বনি।
সাম্‌নে তোমার ঘুমন্ত পথ, ছায়াপুরীর দুয়ার-প্রান্তে শেষ,
নাইকো আলো, নাইকো ছবি, পেরিয়ে চল' দীর্ঘ-শ্বাসের দেশ।
কান্না-ধোয়া ভস্ম-রাশে দাও লুটায়ে সিক্ত যূথীর হার,
বাহির থেকে নেই গো কিছুই, ভিতরকার এই দরদ জুড়াবার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্ন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের জাগ্রত অবস্থায় স্মৃতি যে আমাদের মনের রাজ্যে আনাগোনা করে, তাহা প্রত্যক্ষই অনুভব করিতে পারি। এই সব স্মৃতি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা, বর্ত্তমান কার্য্য, বর্ত্তমান চিন্তা প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

ইতর প্রাণীর উপরও স্মৃতির প্রভাব অল্প নহে। কোন্ সুদূর অতীতে অনুরূপ অবস্থায় ঠিক কি ফল ফলিয়াছিল—স্মৃতিই সে বিষয়ে তাহাদিগকেই সচেতন করিয়া তোলে; এবং সেই সুদূর স্মৃতির সাহায্যেই সমস্ত প্রাণী বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করে।

কিন্তু বর্ত্তমানের সহিত সংশ্লিষ্ট এই স্মৃতিগুলির অন্তরালে আরো বহু সহস্র এমন স্মৃতি আছে, যাহারা চেতন-রাজ্যের পশ্চাতে অচেতনের তিমির-লোকে পুঞ্জিত থাকে। আমাদের সমস্ত অতীত জীবনের স্মৃতি যে এই আঁধার রাজ্যে সুরক্ষিত আছে, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম—নেহাৎ নগণ্য বিষয়ের স্মৃতিও অবহেলিত হয় না—কোনটিই বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যায় না। এই অজ্ঞানময় পাতাল-পুরীর স্মৃতিগুলি কতকটা অদৃশ্য ছায়া-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া আছে। হয়ত তাহাদের জ্ঞানের আলোক-রাজ্যে প্রবেশের সাধ খুবই হইতে পারে, কিন্তু এই সাধ মিটাইবার চেষ্টা মোটেই থাকে না। তাহারা দিকে মনোযোগ দেওয়া ছাড়া আমার অন্য অনেক কাজ আছে। কিন্তু যদি কোন মুহূর্ত্তে আমি, বর্ত্তমান অবস্থা ও বর্ত্তমান কার্য্যের উপর—অর্থাৎ যাহা-কিছু এতাবৎকাল আমার স্মৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তাহার উপর বীতরাগ হই—কিম্বা যে-মুহূর্ত্তে আমি অচেতন বা নিদ্রিত হইয়া পড়ি, সেই মুহূর্ত্তে উল্লিখিত অতীত স্মৃতিগুলি জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের বাধা দূর হইল বুঝিয়া আমার মনের রাজ্যে সজাগ হইয়া উঠে। অতীতের এই অসংখ্য স্মৃতি একসঙ্গেই ছুটিয়া আসে—সকলেই ফুটিতে চায়—কিন্তু মনে এতগুলাকে ঠাঁই দিই কি করিয়া? কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে আসিতে দিব?—এ সমস্যার সমধান কঠিন নহে। ইতিপূর্ব্বে যখন আমি জাগ্রত ছিলাম—তখন যে স্মৃতিগুলি আমার মনের তদানীন্তন অবস্থার সঙ্গে একটা কোন রকম সম্পর্ক পাতাইতে পারিয়াছিল, সেই সব স্মৃতিই সর্ব্বাগ্রে প্রবেশাধিকার পাইবে। নিদ্রিত অবস্থায় অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট দৃশ্যগুলি আমার চোখে পড়িতেছে—অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট শব্দ কাণে আসিতেছে—দেহের উপর যে স্পর্শ লাভ করিতেছি, তাহাও তেমন স্পষ্ট বোধ হইতেছে না—তা ছাড়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে কত সব নানা প্রকারের মিশ্র অনুভূতি আছে!

শব্দ স্পর্শ প্রভৃতির সহিত অর্থাৎ এক কথায় বাস্তবতার সহিত যুক্ত হইতে অভিলাষী, তাহাদের মধ্যে কেবল সেইগুলিই প্রবেশাধিকার পাইতে পারে, যেগুলি আমার দৃষ্টি মণ্ডলের বর্ণ-বিন্দু, আমার বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় অনুভূতির সহিত আপনাদের অস্তিত্ব জুড়িয়া দিতে সমর্থ হয়। ইহা ছাড়া আমাদের সাধারণ প্রকৃতির সহিত তাহাদের খাপ খাওয়াও চাই। যখন এইভাবে স্মৃতি ও অনুভূতির সম্মিলন ঘটে—তখনই আমরা 'স্বপ্ন দেখি'।

স্বপ্নের ভিতর দুর্ব্বোধ রহস্য কিছুই নাই। —স্বপ্ন দেখা ও আমাদের কোন বিষয়ে ধারণা করার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ-কিছু নাই। কোন একটি বাস্তব পদার্থের সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিবার সময় আমরা প্রত্যক্ষ যাহা দেখি, শুনি, তাহা অর্থাৎ আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি স্মৃতি-সমুদ্ভূত অনুমানের সহিত সংযুক্ত হয়। অনুমানের সহিত তুলনায় প্রত্যক্ষ অনুভূতির কার্য্য খুবই সামান্য। যখন আমরা কোন গ্রন্থ বা সংবাদ-পত্র পাঠ করি—তখন কি সমস্ত ছাপার অক্ষরগুলিই আমাদের জ্ঞানরাজ্যে পৃথক পৃথকভাবে সুপ্রকাশিত হয়? না। তাহা হইলে বোধ হয় সমস্তদিন ধরিয়া পড়িলেও একখানা কাগজ শেষ করা যাইত না। আসল ব্যাপার দাঁড়ায় এই, পড়িবার সময় একটা শব্দের এমন কি এক-একটা ছত্রের দুই-একটা অক্ষর, দুই-একটা বিশেষ বিশেষ চিহ্নই সেই-সেই শব্দ বা ছত্রের সম্বন্ধে আমাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দেয়। আমরা দুই-একটা অক্ষর ও শব্দমাত্র প্রত্যক্ষ করি, বাকীটা অনুমানেই বুঝিয়া লই। গোল্ড্‌সিডর এবং মলার যে-ভাবে এই ব্যাপারটি প্রমাণ করিয়াছেন—তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ইঁহারা কতকগুলি সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত বাক্য, যেমন "Positively no admission," "Preface to the Fourth Edition" প্রভৃতি কথা একখণ্ড কাগজে লিপিবদ্ধ করেন; ইচ্ছা করিয়াই ইঁহারা শব্দগুলি ভুল করিয়া লেখেন—এমন কি মধ্যে মধ্যে দুই-একটী অক্ষর একেবারেই বাদ দেন। পরে এক অন্ধকার গৃহে এই লেখাগুলি, যাঁহাকে দিয়া পরীক্ষা করা হইবে—তাঁহার সম্মুখে ধরা হয়। এই ব্যক্তি কাগজে কি লেখা রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই জানিতেন না। বৈদ্যুতিক আলোকে এই বাক্যগুলিকে অতি অল্প সময়ের জন্য পরিদৃশ্যমান করা হয়—এত অল্প সময় যে পর্য্যবেক্ষণকারীর পক্ষে সে সময়ের মধ্যে সমস্ত অক্ষরগুলি পড়িতে পারা অসম্ভব। একটী অক্ষর পড়িতে কত সময় লাগে, তাহা অবশ্য পূর্ব্বেই নির্ণয় করিয়া লওয়া হয়। পরীক্ষা-ক্ষেত্রে চল্লিশ-পঞ্চাশটি অক্ষর-বিশিষ্ট এক একটী বচনের আট-দশটি মাত্র অক্ষর পড়িতে যত সময় লাগিবার কথা—ঠিক ততটুকু সময়মাত্র আলো জ্বালিয়া রাখা হয়। দর্শক কিন্তু তবুও বাক্যগুলি ঠিক-মতই পড়িয়াছিলেন। এই পরীক্ষার ব্যাপারে যে বিষয়টী লইয়া আমাদের প্রয়োজন, অতঃপর তাহারই আলোচনা করিতেছি।

পর্য্যবেক্ষণকারীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন্ কোন্ অক্ষর তাঁহার চোখে পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার নিজের বিশ্বাস

তবে তিনি সম্ভবতঃ যে অক্ষরগুলি প্রকৃতই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—তাহাদেরই দুই-চারিটী উল্লেখ করিবেন। কিন্তু ইহা হওয়াও অসম্ভব নয় যে, যে-সমস্ত অক্ষর বাদ দেওয়া হইয়াছিল বা ভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যেও কোন কোন অক্ষর দর্শক নিশ্চয় দেখিয়াছেন, বলিবেন, অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণকারী পূর্ণ আলোকে বাক্যের ভিতর এমন-সব অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন বলিবেন—যেগুলি সে বাক্যে থাকা উচিত ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই পূর্ব্বপরিচিত বাক্যের কয়েকটী মাত্র অক্ষর প্রত্যক্ষ করাতেই অবশিষ্ট অংশগুলি মনে পড়িয়া যাওয়ায় স্মৃতি কতকগুলি বাস্তবিক-অদৃষ্ট অক্ষরকেও মনের রাজ্যে আঁকিয়া তুলিয়াছে। স্মৃতির দ্বারাই দর্শক এ অক্ষরগুলি শুধু অনুভব করিয়াছেন—চোখ দিয়া প্রত্যক্ষ করেন নাই।

কাজেই জাগ্রত অবস্থায় এবং আমাদের বাস্তব বিষয়গুলির সম্বন্ধে লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যেও—স্বপ্ন দেখার সময় যাহা ঘটিয়া থাকে—সেইরূপ একটা ব্যাপার ভিতরে ভিতরে ক্রমাগতই ঘটিয়া চলিয়াছে। সমস্ত জিনিষেরই আমরা একটা মোটামুটি খসড়া ছবি (sketch) প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ করি। এই অসম্পূর্ণ ছবিটাই আমাদের স্মৃতিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং আমাদের পূর্ণ স্মৃতি—যাহা এতকাল উন্মনা অবস্থায় চিন্তার রাজ্যে লুক্কায়িত ছিল—এই সুযোগে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয়। এই প্রকার অনুমান

হইয়াই আমাদের বোধ-শক্তিকে জাগাইয়া দেয়। নিমেষ-মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। কোন জিনিষকে প্রত্যক্ষ করিতে যত সময় লাগে—মনের ক্রিয়া তদপেক্ষা বহু দ্রুত সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত ব্যাপারে স্মৃতি-মূর্ত্তিগুলির আচরণ বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

কোন বস্তুর আকৃতি প্রত্যক্ষ করায় যখন এই স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়—তখন ইহারা ঠিক যেন সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ-অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, এরূপ মনে করা যায়। মলার এবং গোল্‌ড্‌সিডরের পরীক্ষারও পূর্ব্বে মনষ্টারবর্গের যে-সমস্ত পরীক্ষার কথা আমরা অবগত আছি, (যদিও এই সমস্ত পরীক্ষা ভিন্ন উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল) সেগুলি আমাদের উল্লিখিত অনুমানকে সমর্থন করে। মনষ্টারবার্গের লিখিত শব্দগুলি তেমন সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত ছিল না। এস্থলেও শব্দের সমস্তটা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে যে সময় আবশ্যক—তদপেক্ষা অনেক কম সময়—চোখের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। পর্য্যবেক্ষণকারী যখন শব্দগুলির পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেই সময় এক ব্যক্তি তাহার কাণে কাণে সম্পূর্ণ ভিন্ন-অর্থের অনুরূপ শব্দ বলিয়া যাইতেছিল। ফলে ঘটনা হইল এই যে, দর্শক এমন একটা শব্দ পড়িয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিল, যাহা লিপিবদ্ধ শব্দ হইতে বিভিন্ন; অথচ লিখিত শব্দের সহিত এই নূতন শব্দের মোটামুটি সাদৃশ্য ছিল—এবং ইহার অর্থের সহিত দ্রষ্টার কাণে কাণে উচ্চারিত শব্দের অর্থেরও

লিখিত শব্দটী ছিল—"টিউমাল্ট"। দ্রষ্টার কাণে কাণে বলা হইল, "রেলরোড"—সে পড়িল –"টনেল"। টিউমাল্টে-টনেলে আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু "টনেলের" অর্থগত সাদৃশ্য "রেলরোডের" সহিত। "রেলরোড" শব্দটী কাণের কাছে উচ্চারিত হওয়ায় আমাদের অজ্ঞাতসারে—আমাদের মনে রেলরোডের 'আইডিয়া' বা ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট এক দল স্মৃতি (যেমন গাড়ী, রেলপথ, ভ্রমণ প্রভৃতি) সুপ্রকাশিত হইবার আশায় সজাগ হইয়া ওঠে।

অনুভূতির এবং স্বপ্নের ইহাই হইল ভিতরকার কথা; উভয়ক্ষেত্রেই—একদিকে ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ কতকগুলি বাস্তব ধারণা—এবং অপরদিকে কতকগুলি স্মৃতি—যাহারা এই সমস্ত ধারণার মধ্যে পুষ্ট হয়; পরে এই ধারণা ও স্মৃতি উভয়ে একত্র মিলিয়া স্বপ্নরূপে পুনর্জীবন লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, অনুভূতি ও স্বপ্ন—উভয়ের মধ্যে মূল পার্থক্যটা কি? নিদ্রা ব্যাপারটাই বা কি?—অবশ্য নিদ্রার (physiological) কায়িক ব্যাখ্যার কথা তুলিতেছি না। সে একটা ভিন্ন প্রশ্ন এবং তাহার সমাধানও সুদূরপরাহত। আমি প্রশ্ন করিতেছি, (psychologically) মনস্তত্ত্বের দিক হইতে নিদ্রার ব্যাখ্যা কি?—কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মন, আমরা ঘুমাইয়া পড়িলেও আপনার কার্য্য করিয়া যায়। জাগ্রত ও নিদ্রিত উভয় অবস্থাতে একই ভাবে আমাদের মন যে অনুভূতি ও স্মৃতির উপর কার্য্য করে—তাহা আমরা এইমাত্র দেখিয়াছি এবং আরো দেখিয়াছি, এই স্মৃতি ও অনুভূতিকে ঐ একই ভাবে সংমিশ্রিতও করিয়া থাকে। যাহা হউক—আমাদের এক অবস্থায় পাইতেছি কতকগুলি অনুভূতি মাত্র—অপর অবস্থায় পাইতেছি কতকগুলি স্বপ্ন। তাই প্রশ্ন করিতেছি—পার্থক্যটা কোথায়? মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া নিদ্রিত অবস্থার বিশেষত্বই বা কি?

আমরা কোন থিওরি বিশ্বাস করিতে চাহি না। এ বিষয়ে থিওরি আছেও বিস্তর। কেহ বলেন, নিদ্রা হইতেছে বহির্জগৎ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা—বাহিরের জিনিসকে ইন্দ্রিয়াদির অনধিগম্য করা। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, নিদ্রিত অবস্থাতেও আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কার্য্যকরী থাকে—ইহারাই আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নের বাহ্য আকৃতিটা জাগাইয়া তোলে। কেহ বলেন—"নিদ্রিত হওয়ার অর্থ মনের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির (superior faculties) কার্য্য স্থগিত করিয়া দেওয়া।" ইঁহারা এই সমস্ত বৃত্তির ক্ষণিক নিষ্ক্রিয়তার কথাও বলিয়া থাকেন; কিন্তু এটা তেমন কাজের কথা বলিয়া মনে করি না। স্বপ্নে আমরা যুক্তি-তর্কের ধার ধারি না বটে, কিন্তু এ-বিষয় যে আমাদের ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়, এমন নহে। এমন সব স্বপ্ন আছে যেস্থলে আমরা বেশ সহজ ও শুদ্ধ ভাবেই যুক্তির অনুশাসন মানিয়া চলি, এমন কি এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে স্বপ্ন-দ্রষ্টার ভুল-ভ্রান্তির মূল একটু অতিরিক্ত মাত্রায় যুক্তি-তর্কের বশীভূত হওয়া। যদি স্বপ্ন-দ্রষ্টা, সহজ সরলভাবে স্বপ্নের ভিতর যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়া যায়, শুধু তাহা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবে তাহার স্বপ্নের

মধ্যে অদ্ভুত বিষয় কিছুই থাকিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া যে সে সমস্ত ব্যাপারের একটা অর্থ-নির্ণয়ে প্রয়াস পায়—অসম্বদ্ধ বিষয়াবলীকে যুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করিতে চায়—ইহাতেই তাহার অসঙ্গমস যুক্তি-তর্কের জালে আবদ্ধ হইয়া বাস্তব ঘটনাবলী এক অদ্ভুতরূপে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে, আমাদের উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিগুলি নিদ্রিত অবস্থায় ম্রিয়মান হইয়া পড়ে—স্বপ্ন দ্রষ্টার যুক্তি ও বিচার-ক্ষমতাই যথেষ্ট দুর্ব্বল, এমন কি সময় সময় স্বপ্ন-দ্রষ্টার যুক্তি-বিচারকে নিতান্ত হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় শুধু বিচার-ক্ষমতা কেন—সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। কাজেই ক্ষমতার অভাব বা ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভব-শক্তির লোপ হইলেই আমরা স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করি, এ থিওরিও ঠিক নহে।

আরো কিছু চাই। শুধু থিওরিতে চলিতেছে না। বাস্তব ব্যাপারের আরো একটু বেশী কাছ-ঘ্যাঁসা হইতে হইবে। নিজের উপর পরীক্ষা করিয়াই একটা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। স্বপ্ন ভাঙ্গিবার পর—যেহেতু স্বপ্ন দেখা অবস্থাতেই আমরা আত্মবিশ্লেষণ করিতে পারি না, তাই স্বপ্ন হইতে যে সমস্ত অবস্থার ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠি,—সেই ক্রমবিবর্ত্তনশীল অবস্থাটী অতি নিবিষ্টভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে—এইভাবে অনুসরণ-দ্বারা যাহা আমরা অনুভব করিতে পারিব নাকো তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ—কিন্তু খুব একান্ত-ভাবে মনঃসংযোগ করিলে ইহা একেবারে অসম্ভবও নহে। লেখকের নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। অনতিকালপূর্ব্বে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন, সে স্বপ্নটি কি এবং স্বপ্নভঙ্গের পর যাহা ঘটিয়াছিল—তাহাই বলিতেছি।

স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি যেন কতকগুলি শ্রোতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। যেন রাজনীতি বিষয়ে বলিতেছেন। তারপর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কেমন একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। সেই গুঞ্জনধ্বনি ক্রমে অস্পষ্টতর কলরবে পরিণত হইল—অতঃপর গভীর গর্জ্জন, ও ভয়ঙ্কর চীৎকার-শব্দ উঠিল। অনতিবিলম্বে চারিদিক হইতে সমস্বরে "বেরিয়ে যাও", "বেরিয়ে যাও" এই রব উঠিল। পাশের বাড়ীর বাগানে তখন একটা কুকুর ডাকিতেছিল এবং তাহার প্রত্যেক বারের "ভেউ ভেউ" ডাকের সহিত "আউট, আউট" (অর্থাৎ "বেরিয়ে যাও" "বেরিয়ে যাও") শব্দ স্বপ্ন-দ্রষ্টার কাণে ধ্বনিত হইতেছিল। এই অতি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটিতে অনেকখানি মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

জাগ্রত-আমি মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া নিদ্রিত 'আমি'কে এখন বলিব—"এইবার আমি তোমায় ঠিক ধরিয়াছি! তুমি ভাবিতেছিলে শ্রোতৃমণ্ডলী চীৎকার করিতেছে? না। বাস্তবিক পক্ষে ও একটা কুকুর ডাকিতেছিল। যতক্ষণ না তুমি আমায় বল—তুমি সত্য সত্য কি করিতে-ছিলে ততক্ষণ তোমায় আমি ছাড়িব

না।" স্বপ্নের-আমি ইহার উত্তরে বলিব —"আমি কিছুই করিতেছিলাম না; এবং এইখানেই তোমায়-আমায় প্রভেদ। তুমি মনে কর যে একটা কুকুরকে ডাকিতে শুনা এবং ও ডাকটা যে কুকুরেরই তাহা বুঝিতে পারা—এই দুই ব্যাপারের জন্য তোমায় কিছুই করিতে হয় না? সেটা মস্ত ভুল। এইগুলাও বুঝিবার জন্য তোমায় যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হয়। তুমি বুঝিতে পার না, যে তোমার সমস্ত স্মৃতি, তোমার যাবতীয় সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কতখানি সাহায্য এই একটী বিষয়ের জন্য তুমি গ্রহণ কর। যে শব্দটী শুনিতে পাইলে—তাহার সহিত ঠিক তোমার কোন্ স্মৃতিটীর সাদৃশ্য আছে—সেটা তোমায় নির্দ্ধারণ করিতে হয়—কেবল তাই নয়—এই স্মৃতি ও তোমার শুনা শব্দ উভয়ে মিলিয়া যাওয়া চাই—একটু অমিল বা পার্থক্য থাকিলে চলিবে না—তাহা হইলে তোমার কেবল স্বপ্ন দেখাই সার হইবে—প্রত্যক্ষ অনুভূতি ঘটিবে না। এই সর্ব্বাঙ্গীন সমতা কেবল স্মৃতি ও অনুভূতির প্রয়োগ-দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ যেমন দর্জ্জী একটা নূতন কোট তৈয়ার করিতে হইলে—সেলাই করিবার পূর্ব্বে কাপড়টা টানিয়া ভাঙ্গিয়া ঠিক তোমার শরীরের কাঠামোর সঙ্গে মিশ খাওয়াইয়া লয়, তেমনই আর কি। কাজেই তোমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটিতে তোমায় খাটিতে হইতেছে। জাগ্রত অবস্থায় তোমার জীবন পরিশ্রমের জীবন; এমন কি যখন তুমি কিছুই করিতেছ না ভাব—তখনও তুমি প্রকৃতি পক্ষে কাজ হইতে নিষ্কৃতি পাওনা। কারণ প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমাকে কিছু গ্রহণ করিতে হইতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে কিছু ত্যাগও করিতে হইতেছে। সজ্ঞান অবস্থায় শত সহস্র অনুভাবের বিষয় হইতে এই প্রকারেই অধিকাংশকে বাদ দিয়া কয়েকটী মাত্র বিষয় তুমি সত্যসত্য অনুভব কর। যে পরিত্যক্ত বিষয়াবলী রাত্রে তোমার নিদ্রাবস্থায় পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহা তোমার স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে অতি সন্তর্পণে ও অভ্রান্তরূপে তুমি নির্ব্বাচন করিয়া লও—কেননা তোমার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যেগুলি সম্পূর্ণভাবে মিশ খাইবে না সেগুলি তোমায় বর্জ্জন করিতে হয়। এই যে নির্ব্বাচন যাহা তুমি ক্রমাগতই করিয়া চলিয়াছ—এই যে সামঞ্জস্য যাহা তুমি প্রতিনিয়তই বিচার করিয়া চলিয়াছ—ইহাই মানুষের সাধারণ জ্ঞান বা সাধারণ বুদ্ধির (common sense) গোড়ার কথা। এবং এই-সব তোমাকে অহরহ অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। জল-বায়ুর চাপ যেমন তুমি অনুভব করিতে পার না—তেমনি এই যে তুমি সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত রহিয়াছ—এটুকুও অনুভব কর না—অথচ ইহা তোমায় ক্লান্ত করিয়া ফেলে। সাধারণ জ্ঞান বড় শ্রান্তিদায়ক।

"কাজেই আবার বলিতেছি, তোমার সহিত ঠিক এইখানেই আমার পার্থক্য যে, আমি কিছুই করি না। যে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম-প্রবণতা, নির্ব্বাচন-প্রচেষ্টা তুমি মানুষের ঘাড়ে চাপাও—আমি শুধু তাহা হইতে বিরত থাকি। প্রাণের সহিত নিজেকে সংযুক্ত না করিয়া—আমি প্রাণ হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিয়া লই। কোন বিষয়ের উপরই আমার কোন স্পৃহা বা পক্ষপাতিতা নাই—সমস্ত

বিষয়েই আমি নির্ব্বিকার, নিঃস্পৃহ। ঘুমাইয়া পড়াই হইতেছে, নিঃস্পৃহ হইয়া পড়া। মানুষ যে পরিমাণে স্পৃহার অতীত হইয়া থাকে—ঠিক সেই পরিমাণে সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। সন্তানের পার্শ্বে নিদ্রিতা যে মাতার বজ্র-পতনের শব্দেও নিদ্রা ভঙ্গ হয় না—সন্তানের একটী দীর্ঘশ্বাসেই তিনি আবার জাগিয়া উঠেন—তিনি কি তাঁহার সন্তানের সম্বন্ধে বাস্তবিক নিদ্রিত হন?—যে বিষয়ের উপর নিদ্রাতেও আমাদের সহানুভূতি থাকে, সে বিষয়ের সম্পর্কে আমরা নিদ্রিত হইতে পারি না।

"তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ—আমি যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমি কি করি? আমি তোমায় বলিব—তুমি যখন জাগিয়া থাক, তখন তুমি কি কর? তুমি আমাকে গ্রহণ কর—স্বপ্নের-আমাকে, তোমার অতীত জীবনের সমষ্টি আমাকে, এবং তুমি আমাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া জোর করিয়া আমার যে বৃত্ত তোমার বর্ত্তমান কার্য্যাবলীর চারিদিকে আঁকিয়া ফেল, সেই ক্ষুদ্র বৃত্তের সহিত অবিকল খাপ খাওয়াতেই চাও। ইহাই হইতেছে জাগ্রত অবস্থার স্বরূপ। ইহার অর্থ, সংগ্রাম করা। ইহার অর্থ, ইচ্ছা করা। তারপর স্বপ্নের কথা—সত্যই কি আমার এবিষয়ে কিছু বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে, বোধ কর? ইহা হইতেছে সেই অবস্থা—যে অবস্থায় তুমি তোমাকে হারাইয়া ফেল—যখন তোমার কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার শক্তি থাকে না—যখন তোমার ইচ্ছা-বৃত্তির কার্য্য বন্ধ থাকে।"

স্বপ্নের-আমি যাহা বলিবে, তাহা উপরে উল্লিখিত হইল। যদি আমরা ইহাকে মন খুলিয়া কথা বলাইতে পারি, তবে ইহা ছাড়া আরো অনেক তত্ত্ব সে আমাদিগকে শুনাইতে পারে। থাক্—এখন আমরা যে বিশেষ পার্থক্য জাগ্রত অবস্থা হইতে স্বপ্নকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে সংক্ষেপে তাহা প্রতিপাদন করিব। স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় একই প্রকার বৃত্তির পরিচালনা ঘটিয়া থাকে কিন্তু একক্ষেত্রে উহারা কর্ম্মবন্ধনে বিশেষভাবে আবদ্ধ, অপর ক্ষেত্রে বন্ধন-মুক্ত। স্বপ্ন হইল সম্পূর্ণ মানসিক জীবন হইতে কর্ম্ম, উদ্যম এবং দৈহিক পরিচালনার বিযুক্তি। এ অবস্থাতেও আমরা অনুভব করি, এ অবস্থাতেও আমরা স্মরণ রাখি—স্বপ্নাবস্থাতেও আমরা যুক্তির অনুশাসন মানিয়া চলি। এ সমস্তই স্বপ্নে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইহাদের অস্তিত্ব থাকিলেই যে কর্ম্মোদ্যমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল, এমন নহে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোন বিষয়কে অপর কোন বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য করিতেই উদ্যমের প্রয়োজনীয়তা। একটা কুকুরের চীৎকার শব্দের সহিত শ্রোতৃমণ্ডলীর গুঞ্জন ও হুঙ্কার-ধ্বনির স্মৃতির সম্পর্ক-স্থাপনের মধ্যে কোন উদ্যমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঐ শব্দ যে কুকুরেরই ডাক, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে মস্তিষ্ক চালাইবার প্রয়োজন হয়। স্বপ্ন-দ্রষ্টার এই উদ্যমেরই অভাব। কেবলমাত্র এই উদ্যমের অভাব হইতেই স্বপ্ন-দ্রষ্টা জাগ্রত মানুষ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

মূলের এই পার্থক্যটী অনুসরণ করিলে

আরো অনেক পার্থক্য নির্ণীত হইতে পারে। এই উপায়ে আমরা স্বপ্নের প্রধান প্রধান বিশেষত্বগুলি জানিতে পারিব। বিশেষ-ভাবে তিনটী বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে। স্বপ্নের অসামঞ্জস্য, স্বপ্নের ভিতর সময়ের ব্যাপকতা অনুভবের অভাব এবং কোন্ অনুভূতির সহিত সংমিশ্রিত হইবে তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত স্মৃতিসমূহের স্বপ্ন-দ্রষ্টার মনে উদিত হইবার প্রণালী।

স্বপ্নে অসামঞ্জস্যের অর্থ সহজেই নির্ণয় করা যায়। স্বপ্নের বিশেষত্বই এই যে, ইহা স্মৃতি-চিত্র এবং অনুভূতির মধ্যে পরস্পরের পূর্ণ ভাবের ক্ষমতার দাবী করে না—বরং তাহাদের একটু লুকোচুরিরই সমর্থন করে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের স্মৃতিও একই অনুভূতিতে সংমিশ্রিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—দৃষ্টিমণ্ডলে হয়ত একটী সবুজ স্থান অনুভূত হইল; তাহাতে যেন শাদা শাদা কতকগুলি চিহ্ন আছে। স্বপ্নে ইহা শুভ্রকুসুম-পরিপূর্ণ একটী উদ্যান হইয়া দেখা দিতে পারে—কিম্বা বল-সমেত বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিলও হইতে পারে, আরো কত-কি হইতে পারে। বিভিন্ন স্মৃতি-চিত্রগুলি—যাহাদের সকলেই উল্লিখিত দৃষ্টিমণ্ডলের অনুভূতিতে সংমিশ্রিত হইতে পারে—ইহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে। কখনও কখনও এমনও হয় যে, একাধিক স্মৃতিও ক্রমান্বয়ে সেই অনুভূতিতে মিশিয়া যাইতে সমর্থ হয়। এবং তাই উদ্যান বিলিয়ার্ড টেবিলে রূপান্তরিত হয় এবং আমরা সবিস্ময়ে এই অসাধারণ রূপান্তর-ব্যাপার দর্শন করি; কখনও কখনও একই সময়ে একত্র এই স্মৃতিগুলি অনুভূতিতে লীন হয়—তখন উদ্যানই বিলিয়ার্ড টেবিল হইয়া দাঁড়ায়। এবং দুইটিকে তখন আর দুইটী ভিন্ন জিনিস বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থাতেই সেই সব আজগুবি স্বপ্ন আমরা দেখিয়া থাকি—যাহাতে কোন বিষয়, যেমন আছে তেমনি থাকিয়াও অন্য-কিছু বলিয়া মনে হয়।

আমাদের অনেক স্বপ্নে সময়ের ব্যাপকতা অনুভব করিবার ক্ষমতার যে অভাব দেখা যায়, তাহা এই একই কারণের জন্য। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর আমরা স্বপ্নে এত সব বিষয় দেখিয়া ফেলি—যাহা জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইতে কয়েকদিনও সময় লাগিতে পারে। যখন আমরা জাগিয়া থাকি, তখন আমরা আমাদের অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া চলি—বাহিরের এই সামাজিক জীবনের প্রতি আমাদের যে লক্ষ্য থাকে, তাহা বিশেষভাবে আমাদের হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বপ্নে ইহার অস্তিত্ব নাই। বাহিরের দ্বারা ভিতরের কাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যতটুকু মনোযোগ আবশ্যক—এবং অন্তরে অনুভূত সময়ের ব্যাপ্তির সহিত সাধারণ ঘটনার ব্যাপ্তির সমতা রক্ষার জন্য যতদূর মনঃসংযোগ প্রয়োজন, স্বপ্ন-দ্রষ্টার উহার বিশেষ অভাব থাকে।

এখন স্বপ্ন-দ্রষ্টার মানসিক অবস্থার কিরূপ বিশেষত্বের দরুণ বাস্তব অনুভূতির সহিত সম্মিলিত হওয়ার তুল্য উপযোগী স্মৃতি-সমূহের মধ্যে কোন কোনটীর প্রতি অধিকতর পক্ষপাত প্রদর্শিত হয়, তাহা আলোচনা করিব। আমাদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে দিনের বেলায় যে-যে

বিষয় আমরা অধিক ভাবিয়া থাকি—রাত্রে সাধারণতঃ তাহাই স্বপ্ন দেখি। এ কথা কোন কোন স্থলে সত্য। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার মানসিক জীবন যে এইভাবে নিদ্রা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে—তাহা এই জন্য যে, সে নিদ্রা বাস্তবিক নিদ্রা নয়। এই প্রকার স্বপ্নময় নিদ্রা আমাদের ক্লান্তি অপনোদন না করিয়া ক্লান্তি বাড়ায়। যে-সব চিন্তা পূর্ব্বে আমাদের মনের ভিতর দিয়া অতি দ্রুত বহিয়া গিয়াছে; সাধারণ নিদ্রায় সেই সব চিন্তা লইয়াই আমরা স্বপ্ন দেখি অথবা এমন সব বিষয় লইয়া দেখি, যাহা আমরা অনুভব করিয়াছি মাত্র কিন্তু সে-দিকে তৎপ্রতি বড় একটা মনোযোগ দিই নাই। যদি আমরা একই দিনের ব্যাপার রাত্রে স্বপ্ন দেখি, তবে তাহা এমন সব বিষয় লইয়া, যাহাদের তেমন একটা কিছু গুরুত্ব নাই—তেমন কোন বিশেষত্ব নাই।

এবিষয়ে ডিলেজের W. Robert এর এবং Freud এর সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মতের মিল আছে। আমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—একেবারে রাস্তার উপরেই দাঁড়াইয়াছিলাম—অথচ কোন গাড়ী চাপা বা এরূপ কোন দুর্ঘটনাই চোখের সম্মুখে ঘটে নাই। কিন্তু যদি রাস্তায় কোন গাড়ী আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় আমার মনে বিপদের আশঙ্কামাত্রও স্থান পাইয়া থাকে অথবা আমি জ্ঞাতসারে কোন আশঙ্কা না করিয়া থাকিলেও—অলক্ষ্যে আমার দেহ যদি একটুও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে—তবে আমি সে রাত্রে এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পারি যেন আমার শরীরের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া গিয়াছে! একজন মরণোন্মুখ রোগীর শয্যাপার্শ্বে আমি দাঁড়াইয়া আছি। যদি কোন মুহূর্ত্তে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও আমি এরূপ ভাবিয়া থাকি যে হয়ত রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, তবে আমি হয়ত স্বপ্ন দেখিব, রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আরোগ্য-লাভের বিষয়ই স্বপ্ন দেখিব—খুব সম্ভব রোগের অবস্থা স্বপ্ন দেখিব না। স্থূল কথা এই যে যে-সব বিষয় আমরা অলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছি—সাধারণতঃ সেইগুলিই স্বপ্নে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? স্বপ্নের সত্ত্বা—অস্পষ্ট সত্ত্বা; যে সব স্মৃতি অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে স্বপ্ন সংগ্রহ করে—সেগুলি সাধারণতঃ অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট স্মৃতি।

ইহা সত্য যে খুব গভীর নিদ্রায় যে নিয়মে স্বপ্নে স্মৃতির পুনরাবির্ভাব হয়, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। আমরা এইরূপ গভীর নিদ্রার অবস্থার বিষয়ে কিছুই জানি না। এ অবস্থায় যে স্বপ্ন আমরা দেখি, তাহা সাধারণতঃ আমরা জাগিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ভুলিয়া যাই। ক্বচিৎ একটু আধটু মনে থাকে।

যাহা হউক এই গভীর নিদ্রার অবস্থা মনস্তত্ত্ববিদের গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। ছায়া-দর্শন প্রভৃতি ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানা, মৃত আত্মার আবির্ভাব প্রভৃতি আত্মিক ব্যাপারও উক্ত বিজ্ঞানেরই অনু-সন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত। এ-সব বিষয়ের উপর কোন মতামত প্রকাশ করা চলে না।

কিন্তু Psychical Research Society বলিয়া এইসব আত্মিক ব্যাপারের যে এক অনুসন্ধান সমিতি আছে, তাহার সভ্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশ্চর্য্য উৎসাহের ফলে যে সব তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, যে সব সত্য নির্ণীত হইতেছে, তাহা অশ্রদ্ধা করা চলেনা। যদি আমাদের স্বপ্নের উপর টেলিপেথির কোন প্রভাব আসিয়া থাকে—তবে খুব সম্ভব এই গভীর নিদ্রাকালেই ইহা নিজ প্রভাব বিস্তার করিবে। কিন্তু এবিষয়ে কোন অভিমত ব্যক্ত করা সহজ নয়।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

সুসময়

বসন্ত বায় বহে নাই হায়
কুসুম-বনে।
হাওয়াটুকু তার লাগিয়াছে শুধু
আমার মনে!
না-জানি কেমনে নিমেষের ভুলে
ছেয়েছে হৃদয় পল্লবে-ফুলে,
গুঞ্জন আর কূজন জেগেছে
মনের কোণে!
বসন্ত নাই হাওয়া তারি তবু
লেগেছে মনে।

আজিকে তোমরা দিয়োনা আমারে
দিয়োনা বাধা;
সারাদিন ধরি হবে আজি মোর
বীণাটি সাধা!
নিবিড় নিঠুর পীড়ন মধুর
জাগায়ে তুলিবে বিহ্বল সুর,
তারি সাথে সাথে দুখানি নূপুর
বাজিবে আধা!
গাহিবার দিনে আজিকে তোমরা
দিয়োনা বাধা!

নবীন আষাঢ় আসেনি এখনো
আকাশ জুড়ে।
সজল বাতাস গেয়ে গেছে তবু
হৃদয়-পুরে!
যে নদী লুকায়ে ছিল বালুমাঝ
কূলে-কূলে ছেপে উঠেছে সে আজ,
বিপুল আবেগে কল্লোল তুলি
চলেছে ঘুরে!
শ্যামল আষাঢ় আসেনি যদিও
আকাশ জুড়ে।

আজি এই স্রোতে ভাসাবো আমার,
ক্ষুদ্র তরী।
শপথ তোমার, ডেকোনা আমায়,
রেখোনা ধরি!
ডোবে যদি তরী, ডুবে যাবে হায়
পারিবেনা কেহ ফিরাতে আমায়,
লব সযতনে শীতল মরণ
বরণ করি!
ডুবে যদি যায় তবু আজি হায়
ভাসাবো তরী!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

বরণ

এস এস ঋতুরাজ ! তোমারে বরিব আজ
পল্লব মুকুল ফুল ফলে,
প্রভাত-অরুণ-রাঙা কোকনদ-দলে !
তব পীত উত্তরীয় নূতন রঙায়ে নিয়ো
আমাদের পরাণের রঙে,—
বাসন্তী নহে ত তাহা, রক্তিম বরণে !

কণ্টকী শিমুল গায় যে লালে ছাইয়া যায়
তাই দিয়ে রচিব কেতন,—
ব্যথা পেয়ে যে অশোকে চেতনা নূতন !

কচি কিশলয়-দল সাজাবে আসন-তল,
বর্ষে বর্ষে আরক্ত নবীন,
জরার শাসন যারা ভাঙে চিরদিন।

অপরাজিতার পাঁতি কণ্ঠহারে দিব গাঁথি,
নীলকণ্ঠ নীলকান্তি যার,
বর্ষা শীতে মরেনাক চিরনির্ব্বিকার।
দ্রাক্ষাগুচ্ছ অর্ঘ্য করে' দেব করপুট ভরে'
পীড়নে যে রসধারা ঢালে,—
তন্দ্রাহত মর্ম্মমাঝে অগ্নিমন্ত্র জ্বালে !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল, ১২ শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা। গিরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আড়াই টাকা। গ্রন্থকার 'উপক্রমণিকায়' বলিয়াছেন, শিবচন্দ্র 'দিগ্বিজয়ী বীর, অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি, বাগ্মী, সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য বা লোকহিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এ সকলের কেহই ছিলেন না। সচরাচর বড় লোক বলিলে যে খ্যাতি-প্রতিপত্তি সূচিত হয়, তাহাও তাঁহার ছিল না।' তবে তাঁহার জীবন-চরিত লেখা কেন? কারণ আছে। তিনি একজন মানুষ ছিলেন। গ্রন্থকারের কথায়, "তিনি বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড বিধানে যে সমস্ত দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিনিচয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, ন্যস্তধনের ন্যায় তাহার এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন নাই এবং আজীবন সেই বৃত্তিগুলির সংরক্ষণে ও পরিস্ফুটনে যত্নশীল ছিলেন।" এই বিপুল জীবন-সংগ্রামের দিনে এ বড় সহজ কাজ নহে। হুগলি জেলার কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন, সেকালের সামান্য চাকুরে, একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। শিবচন্দ্র হিন্দু কলেজে পড়িতেন,—সেখানে ডিরোজিও ছিলেন তাঁহার শিক্ষক। তখনকার দিনে ছাত্রেরা পানাহার-সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন,—শিবচন্দ্র কোন দিন তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ না করিলেও পানাহারে রীতিমত সংযমী ছিলেন। তাঁহার কয়েকজন সতীর্থ একবার তাঁহাকে

সবলে শয়ন করাইয়া সুরাপানের চেষ্টা করিয়া ছিলেন কিন্তু প্রতিজ্ঞাপরায়ণ দৃঢ়চিত্ত শিবচন্দ্রকে সুরা পান করাইতে পারেন নাই। বাল্যকালের আর একটি ঘটনায় শিবচন্দ্রের ভিতরের মানুষটিকে সহজে বুঝা যায়। তাঁহার বয়স তখন দশ-বারো বৎসর; বাড়ীর পূজারী ঠাকুর তাঁহার হাত দেখিয়া বলেন, "তুমি হাকিম হইবে। যদি হাকিম হও, তাহা হইলে আমাকে কি দিবে?" বালক শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি যদি হাকিম হই, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব।" ইহার বহু বৎসর পরে হাকিম হইয়া সত্যনিষ্ঠ শিবচন্দ্র ঐ ব্রাহ্মণকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসিক পাঁচটাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়াছিলেন। ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ইহা হইতে যে-মনুষ্যত্বের আভাষ পাই, তাহা অসামান্য।

পনেরো বৎসর বয়সে শিবচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের পর হইতেই শিবচন্দ্র পত্নীর শিক্ষায় মনঃসংযোগ করেন। তখনকার দিনে এ ব্যাপার রীতিমত বিঘ্নসঙ্কুল ছিল, কিন্তু শিবচন্দ্রের অকুতোভয়তা ও তাঁহার স্ত্রীর নিষ্ঠায় কোন বিঘ্নই তাঁহাদের সত্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। স্ত্রীকে দুই-চারিটা গঞ্জনা এজন্ত শুনিতে হইয়াছিল, কিন্তু আদর্শ সহধর্ম্মিণী স্বামীর আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সে সকল গঞ্জনা গ্রাহ্যও করেন নাই। ১৮৫২ খ্রীঃঅব্দে শিবচন্দ্র "কোন্নগর হিতৈষিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সভা শিবচন্দ্রের সাহায্যে গ্রামের রাস্তা মেরামত, সাঁকো নির্ম্মাণ, দরিদ্রদের সাহায্য-দান দস্যুভয়-নিবারণের জন্য সরদার পাইক নিযুক্ত করা বাঙলা, পাঠশালার জীর্ণ সংস্কার, ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য প্রভৃতি বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান-সাধনে" সক্ষম হইয়াছিল। শিবচন্দ্র ডেপুটিগিরি করিয়াও এ-সব সংস্কারের কাজে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন,—এইখানেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। পরে গ্রামে সুরাপান রহিত করাইবার জন্য মদের দোকানগুলি উঠাইবার উদ্দেশ্যে ছয়মাস অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় তাহা ঘটে নাই। কোন্নগরে যে রেলওয়ে ষ্টেশন ও ডাকঘর খোলা হয় তাহারও মূলে শিবচন্দ্রের চেষ্টা।

এগুলা গেল বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের কথা। পারিবারিক জীবনে তিনি আদর্শ গৃহী ছিলেন; সকলের সহিত মিশিতেন, তুচ্ছ ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিতেন না —আত্মীয়-পরিজনের সহিত আচারে-ব্যবহারে খাঁটী ছিলেন। তাঁহার সকল কাজ ঘড়ি-ধরা ছিল; নিয়মের কখনো এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিত না। ডিরোজিওর কাছে শিক্ষাকালে তিনি একেশ্বরবাদী হন; পরে বাংলা ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার গ্রাহক হন্ এবং ঐ পত্রিকায় লিখিত উপাসনা-পদ্ধতি-অনুসারে গৃহে উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব অধিপতির সহিত নববিধান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ প্রকৃত পক্ষে হিন্দুমতে আচরিত হইলে ব্রাহ্মসমাজে যখন হুলস্থূল বাধিয়া যায়, কেশবচন্দ্র তখন নীরব ছিলেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যের পদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, তখন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবচন্দ্র প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস" গ্রন্থে শিবচন্দ্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি বিনয়ী ও সদাশয়, দয়ালু ও সৌজন্য বিশিষ্ট ছিলেন; তিনি যথাসময়ে ও শৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য করিতেন; এবং তিনি পারিবারিক ও সামাজিক সদ্গুণ-নিচয়ে আদর্শকল্প ছিলেন।" শিবচন্দ্রের জীবন সাধারণ বাঙালীর জীবন, তাহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য বা অমানুষিক বিশেষত্ব নাই সত্য, তবে এই Principle প্রভৃতির শিথিলতার যুগে তাঁহার চরিত্রে এমন অনেকখানি তেজ ও দার্ঢ্য দেখা গিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার জীবন-কথা প্রকাশিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। এই দীর্ঘ গ্রন্থখানিতে শিবচন্দ্রের হৃদয়ের বহু গুণের কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিবৃত হইয়াছে এবং তাঁহার জীবনের এমন বহু কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য, অথচ মনুষ্যত্বের গৌরব-মহিমায় সেগুলি রীতিমত সমুজ্জ্বল। গ্রন্থের রচনা-ভঙ্গী বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী, আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। তবে ত্রুটিও যে একেবারে নাই, এমন নয়। পারিবারিক

এমন অনেক কথা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, আত্মীয়-বন্ধুর পরিচয়ও মধ্যে মধ্যে এমন অনাবশ্যক বিশদ করা হইয়াছে যে সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। জীবনী-রচনায় একটা বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয় —যেন Boswellism না আসিয়া পড়ে! কারণ জীবন-কথা ঠিক ঘরের লোকগুলির জন্য ত নয়—ইহার কতটা সাধারণকে দিবার সামগ্রী এবং কতটাই বা শুধু ঘরে রাখিবার, তাহা খুব পাকা হাতে ওজন করা প্রয়োজন। সেই ওজনের মাত্রা মাঝে মাঝে এ গ্রন্থে শিথিল দেখিলাম। আর একটা কথা;—অবশ্য গ্রন্থকার যেন কথাটা অন্যভাবে গ্রহণ না করেন—আমাদের আপত্তি, ঐ গ্রন্থের নামে "নরদেব" কথাটায়। শিবচন্দ্র যে একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,তবে ঐ "নরদেব"কথাটায় অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে—ধর্ম্মগত আপত্তি। আমাদের আপত্তি আছে, অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না। গ্রন্থকার এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ধর্ম্মবীরগণকেই এদেশের লোকে দেবতার আসন দিয়া থাকে—তাই কথাটা তুলিলাম।

মহাত্মা গান্ধী। (জীবনী ও অভিমত সংগ্রহ)। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত কলিকাতা, রুদ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। হাওড়া পানিত্রাস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ভারতের অদ্বিতীয় আদর্শ কর্ম্মবীর অসাধারণ স্বার্থত্যাগী জনবন্ধু দধীচি-কল্প মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কাহিনী অপূর্ব্ব কৌতূহলোদ্দীপক ভঙ্গীতে সুস্পষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি এমনি উপভোগ্য হইয়াছে যে উপন্যাস ফেলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়। গ্রন্থের পাতায় পাতায় গান্ধীর অসাধারণ মহত্বের মহিমাময় ছবি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে গান্ধীর বহুবাণীও সংগৃহীত হইয়াছে; সেগুলির মূল্য মণি-মাণিক্যের চেয়েও বেশী। বাণীগুলি স্বতন্ত্র কার্ডে লিখিয়া ঘরে-দুয়ারে ছবির মত ঝুলাইয়া রাখিবার যোগ্য। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। বাঙালীর ছেলেরা এ গ্রন্থের প্রতিপৃষ্ঠা মুখস্থ করিয়া মজ্জাগত করিয়া ফেলুক। গান্ধীর গুণের সুবাসে তাহাদের নবমুকুলিত চিত্ত আমোদিত হোক, পরিপূর্ণ হোক; গান্ধীর আদর্শ পথের তাহারা পথিক হোক—ইহার চেয়ে বড় কামনা এ-যুগে বাঙালীর আর থাকিতে পারে না। এই সদ্‌গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন—নিঃস্বার্থ মনুষ্যত্বের ছবি আঁকিয়া বাঙলা সাহিত্যকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন; তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

পাণিপথ। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী বি, এ প্রণীত। চট্টগ্রাম, মিণ্টো প্রেস, কে, বি, বসু দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এখানি ঐতিহাসিক কাব্য'। প্রথম সর্গে দেখি, 'স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম' ও সভাসদ্‌গণ—কাছে 'নর্ত্তকীনিচয় * চপলা চমকে অঙ্গে বেষ্টিয়া নয়ন—' 'করিতেছে সুরামুগ্ধ সম্রাট-অন্তরে উদ্দাম লালসা-পূর্ণ কাম উদ্দীপিত।" ক্ষণপরেই "শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর কণ্ঠে উঠিল সঙ্গীত, মধুর পঞ্চমে গৃহ করি উচ্ছ্বসিত"—এই ব্যাপারটি এবং গানের ভাব ও ধরণ একেবারে হুবহু 'পলাশীর যুদ্ধ' স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় সর্গে, দৌলত খাঁর প্রমোদ বন—সেখানেও গান আছে, নারী আছে, এবং থিয়েটারী ধরণে কথা-বার্ত্তাও প্রচুর আছে! একে পাণিপথ, তার উপর গোড়াতেই নর্ত্তকী আর প্রমোদ-বন—কাজেই অধিক দূর অগ্রসর হওয়া গেল না। রচনা বিশেষত্ব-হীন, নকলের নকল, ছন্দ পঙ্গু, ভাব এবং কবিত্ব উভয়েরই অভাব। একটা কথা, যুদ্ধ নহিলে কি কাব্য হইবে না? এবার বোধ হয় বাঙ্‌লার কাব্য-জগতে "জর্ম্মান-ওয়ার" দেখা দিবে! সাধারণ নর-চিত্তে ভাবের যে বিচিত্র লীলা অহরহ ফুটিতেছে, তাহা কি বাঙলার কাব্য-কারগণের চোখে পড়ে না? থিয়েটারের সেই ভীম গর্জ্জন শেষে কাব্যের ক্ষেত্রেও রীতিমত দম্ভ-আস্ফালন সুরু করিয়া দিল!

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।